আয় মন বেড়াতে যাবি

আয় মন বেড়াতে যাবি

পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ :
এপ্রিল ২০০০

প্রকাশক :
যুধিষ্ঠির হালদার
এস. বি. এন্টারপ্রাইজ
বিনয় ভবন
ব্লক-এন, ২৪৩ গড়িয়া
বৈষ্ণবঘাটা, পাটুলি
কলকাতা ৮৪

প্রচ্ছদ :
এস. সেন

অক্ষর বিন্যাস :
প্রিন্ট ম্যাক্স
ইছাপুর, ২৪ পরগণা

মুদ্রক :
বসু মুদ্রণ
কলকাতা ৪

মা

শ্রীচরণেষু

আয় মন বেড়াতে যাবি

এক

কলকাতার সাবেক সাবর্ণ রায়চৌধুরিদের বহু হাতফেরতা হতে হতে এখনকার এই হালিসহরের মস্ত অট্টালিকার দেয়ালে দেয়ালে যাদের ছবি লটকানো তারা কেউ এখানে নেই। দেয়াল চল্লিশ ইঞ্চি। বেশির ভাগ ছবিই আঠারো বাই বারো।

দেয়ালে যেমন ছবি আছে এ বাড়ির লোকজনের, তেমনি আছে ক্যালেন্ডার কেটে বাঁধানো ভয়ঙ্কর ক্রূর রবীন্দ্রনাথ, শার্ট পরা উন্মাদ নজরুল ইসলাম, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বৈজ্ঞানিক, নীলপেড়ে মাদার টেরিজা, বিপ্লবী বিপিন গাঙ্গুলি এবং কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন। রামপ্রসাদ বাদে বাকি সব ছবি ক্যালেন্ডার আর ক্যামেরা জাত। ওটি পুরনো পটচিত্র। কুমারহট্ট হালিসহরেরই এক পটুয়ার আঁকা হুবহু এক চিত্রপট। রামপ্রসাদ ও তাঁর পরিবার সর্বাণী কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়িয়ে আছেন মুখোমুখি। সদ্য স্নান করে এসেছেন এমন ভিজে ভিজে কাপড় চোপড়। মধ্যখানে সোনার বরণ চণ্ডীমূর্তি। পাক্কা ক্যালেন্ডার ধাঁচের ছবির পূর্বপুরুষ হলেও এটি পট। তখন তো ক্যামেরা হয়নি।

এই আমাদের বাড়ি। হেডমাস্টার পিতামহ কিনলেন তাঁর এক ধনী জোতজমাওয়ালা ছাত্রের উপরোধে পড়ে, বছর বছর কিস্তিতে। সরলধরন বইয়ের পোকা জ্ঞানী মাস্টার মানুষ। ঘোড়েল ছাত্রটি বোঝালো, নিত্য গঙ্গাস্নানে হাঁপানি সেরে যায়। কিন্তু এ বাড়ি থেকে গঙ্গা, পায়ে দলে পনেরো-বিশ মিনিট। ফলে বাড়ির পুরনো চাকর রামশরণ সাইকেলটি ঠেলে দিত তিনি চড়ন্ত অবস্থায়। ফেরার সময় গঙ্গার ঘাট থেকে ধরে করে—দাও না বাবা একটু ঠেলে।

হালিসহর চৌধুরীপাড়ার এই তল্লাটের সুনাম আছে, প্রতিটি বাড়িতে দু-তিনটি করে উন্মাদ। আড়ালে চৌধুরীপাড়ার নাম পাগলপাড়া। ছোটোবেলায় ঠাকুর্দার সঙ্গে হয়তো গঙ্গার ধারে বেড়াতে গেছি।

—হ্যাঁ খোকা, তোমার বাড়ি কোথায়?

—চৌধুরীপাড়া।

বলা মাত্র মুখে হাত চাপা দিয়ে ফিক ফিক হাসি।

আমাদের এই চৌধুরীপাড়ার ভদ্রাসনের বাড়ির একটি বাড়ি পরেই গোলাপি রঙা বঙ্কিমচন্দ্রের শ্বশুরবাড়ি। বঙ্কিমবাবুর মেয়ে শরৎকুমারীর কাছ থেকে কিনেছিলেন ক্ষিতীশদাদু—ক্ষিতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। বাড়িটি যত্নআত্তিতে গোড়া থেকেই আছে বলে এখনও খুব টনকো। মনে করলে রোমাঞ্চ হয়, আমাদের বাড়ির পাশের মেটে রাস্তা বরাবর বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর হৃদয়নন্দিনী পরিবার রাজলক্ষ্মী দেবী সন্নিধানে চলেছেন। বিশেষ করে রাজলক্ষ্মী সদ্য সদ্য একটি কন্যাসন্তান প্রসব করেছেন তাঁর বাপগত মায়ের আলয়ে। আর এই বঙ্কিমচন্দ্র, এই পাগলপাড়ার গুরুগম্ভীর জামাতা, কালেভদ্রে শ্বশুরবাড়ি আসেন।

এলেও পড়শিগণের সঙ্গে তেমন মেশেন না। এখানে এসেও সরকারি গুরুকাজে সতত পিষ্ট মানুষটি ফাঁক খুঁজে নেন লেখার জন্যে। দোতলার ঘরের কোণে খোলা ছাদের দিকে, মুখ রক্ষে দুখানি মস্ত জানলার ধারে, টেবিল চেয়ারে ডুব দেন লেখার খাতায়। লিখতে লিখতে অভ্যেস মতো ডান দিকে একটি টিপয়ে রাখা কিছু ফল, মিষ্টি তুলে তুলে টুকটাক মুখে দেন, লিখতে লিখতে উঠে পায়চারি করেন, প্রকাণ্ড আগানবাগান টপকে মাঝে মাঝেই আনচান খোঁজেন পশ্চিমমুখো একখানি ভিটে স্থল। সে ভিটের এখন ভিটেত্ব বলতে প্রায় আর কিছুই নেই।

চৌধুরীপাড়ার জামাতা বাবাজীবন হেঁকো ডেকো ডেপুটি এবং সাহিত্য মহাজন যা খোঁজেন, সেই জায়গাটি তাঁর শ্বশুরবাড়ি আসার পথেই বাঁ হাতে পড়ে। কিন্তু সেই ভিটে এখন প্রায় মানুষ অগম। জঙ্গল ঝোপে বিবর্জিত স্থানটির এক জায়গায় উপুড় চুবড়ি ভিটের ধ্বস্ত নমুনামাত্র। সামনের দিকে এ পাড়ারই সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের এক পুরুষ কুলাচারী তান্ত্রিক রামকৃষ্ণ রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত পঞ্চমুণ্ডি আসন। রামকৃষ্ণ তান্ত্রিক পরলোকে যাওয়ার অনেক পরে—যখন এই পঞ্চমুণ্ডি আসন কুসুম কুসুম গরম—সেটি তাঁর বংশেরই এক সুভদ্রাদেবী বলে পুত্রবধূ রামপ্রসাদ সেনকে ওই জমিখণ্ড দান করেন। কেননা কবিরঞ্জনের লোক প্রচলিত অন্য পরিচয় 'কালীর বেটা রামপ্রসাদ'। কবিরঞ্জন, কালীর বেটা। কালীর বেটা, কবিরঞ্জন। কিন্তু বঙ্কিম জানেন এবং মানেন রামপ্রসাদ সেনের কবিত্বেই এ পোড়া বঙ্গদেশ ইতিমধ্যে নিমজ্জিত। বাঙালি ভিখারি থেকে কুলমানীধনী তক্‌কো প্রসাদী গীতে মজে আছে। তাই থেকে থেকেই ওই পশ্চিমি জানলা বরাবর ইতিউতি খোঁজা আর মনে মনে দলনী বেগমের ন্যায় গুন গুন করা, 'একদিন প্রদোষকালে গঙ্গাতীরস্থ কোন ভবনে বসিয়াছিলাম...। মনে করিলাম কবিতা পড়িয়া মনে তৃপ্তি সাধন করি। ইংরেজি কবিতায় তাহা হইল না—ইংরেজির সঙ্গে এ ভাগীরথীর তো কিছুই মিলে না। কালিদাস ভবভূতিও অনেক দূরে। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র কাহাতেও তৃপ্তি হইল না। চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। এমন সময়ে গঙ্গাবক্ষ হইতে, মধুর সঙ্গীতধ্বনি শুনা গেল।

জেলে হাল বাহিতে বাহিতে গাহিতেছে—

"সাধো আছে মা মনে।
দুর্গা বলে প্রাণ ত্যাজিব।
জাহ্নবী জীবনে।"

'তখন প্রাণ জুড়াইল—মনের সুর মিলিল—বাঙ্গালা ভাষায়—বাঙ্গালির মনের আশা শুনিতে পাইলাম...'

বঙ্কিম নিজের রচিত কথা নিজের মনে মনেই বুজগুড়ি দিয়ে চলেন—অসমাপ্ত প্রবন্ধ টেবিলে রেখে—পশ্চিমা জানলায় বিভোর হয়ে। হ্যাঁ, ঠিক কথাই তো। আজকের দিনের জমজমাট, সুন্দর বাংলা সাহিত্য যত সুন্দরই হোক না কেন, কেবলই মনে হয় এ বুঝি আমাদের নিজের নয়, পরের। খাঁটি বাঙালি কথায়, খাঁটি বাঙালির মনের ভাবটি খুঁজে পাওয়া দুর্ঘট। খাঁটি বাঙালির কবি না হলে বাঙালির ধাত রক্ষে করবে কে। বাঙালি যে ভারি জল মেটো আর বুনো ফুলের সুগন্ধময়। বাঙালির 'বৃত্রসংহার' কাব্য ছাপিয়েও যে

পৌষপার্বন আছে। পিঠে পুলির সুখ কি 'বৃত্রসংহার'-এ মেটে! জন্মভূমির যা প্রসাদ তাই রামপ্রসাদী খাঁটি প্রসাদ। প্রসাদ কণিকামাত্র। তাতে বিলিতি বাজার জাত খাবারের মতো পেট না ভরলেও, তার পরের ওই মুখে না বলতে পারাটুকু তো ভরে ওঠে। সেটুকু তো সদ্য টাটকা নিজের। মানে সাক্ষাৎ গর্ভধারিণী। কিন্তু আমাদের এই বাড়ি ঘিরে—এই চৌহদ্দি নিয়ে যে কত কথা। কত ইতিহাসের ধরতাই, এঁটোকাঁটা। এঁটো যদি হয় পাগলপাড়া, তাহলে কাঁটা হলেন শ্রীচৈতন্য, রামপ্রসাদ, বঙ্কিম—আরও কত না মেটো লোকজন। বস্তুত এরা সকলেই পাগলস্য পাগল। তার পরে আর কোনও কথা নাই।

যেমন কথা নেই—কথা ছিল না কাঁচরাপাড়ার রেল কোয়ার্টার পরিমণ্ডলের আঁচে থাকা নামকরা উচ্চবিদ্যালয়ের হেডমাস্টার শিশিরকুমার মুখোপাধ্যায়ের এই অজাগর হালিসহরে চলে আসার। কাঁচরাপাড়ার সামান্য টিনের চালা দোতলার কোয়ার্টারে বৃদ্ধা মা জননী, একপুত্র বিচক্ষণ বলে কথা—আমার বাবা নরনারায়ণ, ছেলের বউ আর চার-চারটি পুত্র-কন্যা সমেত এতকাল বসনবাসন। সে সব ছেড়ে, এক ছাত্রের ঠেলায় পড়ে, হুট করে নিত্য গঙ্গাস্নানের টোপ গিলে, অত্রস্থ পাত্তাড়ি গুটিয়ে নেওয়া। গঙ্গাস্নান হল কি হল না সে কথা হিসেব করে না করে, কিস্তিতে কিস্তিতে ভূ-সম্পত্তির দাম শোধ হওয়ার দিনক্ষণের কার্য-কারণ না কপচে, এখানে নিবাস করবার বাসনা যে বড়ো কম ফল ফলল না। বঙ্কিম চাটুজ্যের শাশুড়ির তরফ হতে জামাতা পুত্রবৎকে যাবতীয় ভূ-সম্পত্তি দানপত্র করে দেওয়া একটি সুবৃহৎ বাগানে হরেক ফল গাছের মধ্যে এই হালিসহর কুমারহট্টের বিচিত্র আর অলীক ফললাভ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন।

এই হালিসহর কুমারহট্টের যদি মূল শোভা হন রামপ্রসাদ তো এর সেই শোভাটিকে চৌতালে সাজিয়ে দিয়েছেন মা গঙ্গা। সাহেবদের কথায় যা হুগলি রিভার তাই তো হালিসহরের তাবৎজনের কাছে সুরধুনি জগন্মোহিনী গঙ্গা। ও সব ভাগীরথীটথির খবর কে বা রাখে। তার চেয়ে সহজ ভালো ঘরের কন্যে গঙ্গা। কখনও আবার মা গঙ্গা। মা গঙ্গা, কন্যে গঙ্গা। রামপ্রসাদের কাছে তাঁর যাবতীয় গীত ও কবিতার আধার সতত বয়ে চলা অহর্নিশে অহোরাত্র কবিতা গীতি স্রোত —'উত্তরবাহিনী গঙ্গা জল চলেছে দিবানিশি।'

পাগল পাড়ার এই বহু প্রাচীন ছত্রিশ ইঞ্চি দেয়ালধারী অট্টালিটার শেষ বাসিন্দে—একা একা নাগাড় বারোটি বছর একানড়ে ভিটে কামড়ে পড়ে থাকা আমার বাবা নরনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের অত মস্ত নাম লোকে জানে না। তার বদলে ছোট্ট এক ফোঁটা ডাক নাম, কানু। নরনারায়ণ থেকে কোন পথে কানু হয়, মহা শ্রদ্ধেয় নামজাদা স্কুলের হেড মাস্টার ধর্মপ্রাণ শিশিরকুমারের এক মাত্র পুত্র কেমন করে এমন বেলাগাম মদ্যাসক্ত হয়, এমন খামখেয়ালি উগ্রচণ্ডাল এবং আরও বিস্তর ইত্যাদি ইত্যাদি, তা নিয়ে সংসার সমাজে এখন আর তেমন আলোচনা নেই। তবে লোকে জানে ও মানে এই হালিসহরের অনেক তাবড় তাবড় প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট বা সম্পাদক হয়ে কানুবাবু সব ধুলো ঝেঁটিয়ে বিদেয় করতে সর্বদাই তৎপর। আর সে তৎপরতা এমনই চূড়ান্ত যে সকলের প্রাণ ঠোঁটের ডগায়। চোর আর চুরি, ধামাধরা আর ধামা, সবই যাকে বলে ত্রাহি মাং। ছিলেন ক্যালকাটা টেলিফোনসের নিতান্তই ছোটো খাটো এক ব্যক্তি। রিটায়ার করে এত প্রকার সমাজ ত্রাসন ও শাসন।

কানুবাবু--শিশু তক্‌ বুড়ো, কানুদা—জনপ্রিয় আর জনাতঙ্ক একই সঙ্গে—হালিসহর বয়েজ স্কুল, রাজলক্ষ্মী বালিকা বিদ্যালয়, রামপ্রসাদ পাঠাগার এবং রামপ্রসাদ সেন স্মারক সমিতিতে। কোথাও সেক্রেটারি, কোথাও প্রেসিডেন্ট। সংসারেও তিনি কখনও প্রেসিডেন্ট, কখনও সেক্রেটারি। আমার ঠাকুর্দা, তাঁর প্রায় একশো বছরি মা জননী গিরিনন্দিনী, আমার মা, আমরা চার ভাইবোন, বাগানের নানাবিধ ফল-ফুলের গাছ, ভাগের পুকুরের কচুরিপানা, তেতলার ছাত, খিড়কির দরজা, সদর দরজা দিয়ে হঠাৎ বাড়িতে ঢুকে পড়া বোস্টম ভিখিরি, সরকার বাজারের সরল ইনটেলেকচুয়াল অঙ্কন রায়, বেচাল ভাড়া হাঁকা রিকশাওয়ালা—এরকম মহা নির্ঘন্টব্যাপী সমাজসংসার পরিস্থিতি যে কোনও সময়েই একা কানুবাবুর মহা ডাকসাইটে আব সর্বদাই খাম এবং খেয়াল, জনগণে রটিত পাগলামি—সে বড়ো উস্তমপুস্তম পরিস্থিতি। আমার মা প্রায়ই চিৎকার করে ওঠে—এতলোক বাস-লরি চাপা পড়ে মরে, এ লোকটার হয় না কেন। আমার সাইকেলে উড়ন্ত কানু বাবা তোলা উনুনে ফুটন্ত ভাতের হাঁড়িতে বাঁ পায়ে কিক সপাট হাঁকিয়ে গ্যাটম্যাট বেরিয়ে যান। আমাদের বাড়ির অদূরে বসে রামপ্রসাদ সেন গেয়ে চলেন, 'বল গে যা তোর যম রাজারে, আমার মতোন নিছে কটা, আমি যমের যম হইতে পারি, তা বলে ব্রহ্মময়ীর ছটা।'

দূর হয়ে যা যমের ভটা
ওরে আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা
বলগে যা তোর যমরাজারে
আমার মতন মিছে কটা
আমি যমের যম হইতে পারি
ভাবলে ব্রহ্মময়ীর ছটা
প্রসাদ বলে কালের ভটা
মুখ সামলায়ে বলিস বেটা
কালীর নামের জোরে বেঁধে তোরে
সাজা দিলে রাখবে কেটা।

এই গীত যখন হচ্ছে রামপ্রসাদ সেনের কণ্ঠে, তখন তাঁর আসন হয়েছে তাঁর বাসস্থান কুঁড়ে হতে খানিক দূরে। পঞ্চমুণ্ডির আসনের অদূরে সামান্য এক তেঁতুল গাছ তলে। এখন এই সন্ধ্যাকালে আকাশময় পাখ-পক্ষী ঘুরছে। কণ্ঠে গীত হলেও তাঁর মন বলছে সুমুখের ওই পঞ্চমুণ্ডি আসন পীঠে বসবার মতন অধিকার হল না। কেননা ওটিতে তাঁর কোনও হকদারি নেই। ওই সাধনপীঠখানির মালিকানা খতিয়ান আসলে এই হালিসহর কুমারহট্টের চৌধুরীপাড়ার সাবর্ণ চৌধুরীদিগের প্রকাণ্ড অট্টালিকার কোনও স্যাঁতসেঁতে ঘরের সিন্দুকে গুপ্ত আছে। সেখানে হাত বাড়ানো কিংবা হস্তপাত দুই ফয়জত। অথচ এই বুনো বিপিনে, অজাগর না হলেও মনুষ্য বিরল জায়গাটি দীর্ঘসময় ঝোপ জঙ্গলে পূর্ণ। দিবসে এ স্থলে বনজ ফুল ফোটে। জন্মায় বুনো আলু, তেলাকুচো, কাঁকরোল, আরও কত কি। রামপ্রসাদ সেই দিকে চেয়ে চেয়ে দেখেন. কখনও মনে মনে কখনও জোরালো কণ্ঠে তাঁর শ্বাসবায়ু

রূপিনী কবিতা আর জগন্মাতা কালী ঠাকুরানী আন্দোলন করে চলে। অসহায় প্রসাদের কিছু করার থাকে না। কেননা এ ঘোড়া রোগ তো বাল্যকাল হতে। কবিতা ও কালীকা দুই দিনে দিনে একাঙ্গী। এই চরাচরের আলো, হাওয়া, জলস্থলের দোসর এক যুগল তিন আখরি এই বৃত্তান্ত। কে কাকে অবলম্বন করে আছে বোঝা মুশকিল।

কিন্তু অদূর সামনের ওই বুনো পঞ্চমুণ্ডির সিদ্ধ আসনখানি যে কতকাল অভিরাম হাতছানি দিয়ে চলেছে। আর সেই প্রলোভনের বাইরে কুমারহট্ট হালিসহরের পণ্ডিতসমাজ সদাই কল এবং কাঠি নেড়ে চলেছেন, যাতে করে বৈদ্য সন্তান বুনো-মাতাল রামপ্রসাদ সেন এ দিগরে মনের মতো আপনাতে আপনি থেকে বসবাস না করতে পারে। ক্ষণে অক্ষণে সেই পণ্ডিত কুলতিলকগণ প্রসাদকে ত্যক্ত করার অভিসন্ধি পেতে চলেন। এই যেমন—দীর্ঘ সময় বরাবর চলেছে সাবর্ণ চৌধুরীদের কুলসম্পত্তি ওই পঞ্চমুণ্ডি তন্ত্র আসন নিয়ে।

কিন্তু যে রামপ্রসাদের মুখে এমনতর যম হাঁকানো গীত, তাঁর মনে কেন তার বিপরীত শঙ্কা। গীতি কবিতার আখরে যদি তপ্ত কটাহের শোণিত ফোটে তাহলে বুকের আবডালে কেন ওই সিদ্ধাসনের জন্য এমন গুরুগুরু প্রমাদ। তাহলে কি মনে এমন শঙ্কা মেঘোদয়—সেই ছেলেকাল থেকে যে মানুষ এত গীত-কবিতার অফুরন্ত ভাঁড়ার, তার ঘরে কি টান পড়ল! অথবা কালীকা ও কবিতা এই দুইয়েরই উদ্দীপন কি ওই সিদ্ধাসন স্পর্শের সঙ্গে জড়িয়ে আছে!

গীত ফুরোলে এত সব চিন্তা জাল। ফলে হাতের কাছে রাখা পান পাত্রে হাত বাড়ানো। সখা, আত্মজন, ভৃত্য, সচিব এমনি বহু নাম আর গুণধারি ভজহরি এটি সর্বদাই মজুদ রাখে রামপ্রসাদের জন্য। সে জানে প্রসাদ খালি গলায় গান করতে পারেন না। শূন্য কণ্ঠে জগদম্বার নাদ শোনা যায় না।

প্রসাদ পাত্র নিয়ে মগ্ন হওয়ার মুখে। সন্ধ্যা কখন রাত্রির দিকে জাগ্রত হচ্ছে সে খবর নেই। এমনই সময়ে এই নিঝুম অজাগর বনভূমি কাঁপিয়ে এক অট্টহাস্য ওঠে। তীক্ষ্ণ তীর পুরুষালি এক স্বর শান্ত গাছ বর্গ আর রাত্রির আকাশ কাঁপিয়ে বেজে ওঠে।

দুই

পান করা আরম্ভ সবে হলেও প্রায় দুই-তিন পাত্তর ঘটে গেছে। কেন না প্রসাদ সত্যসত্যই ঝটিকাপায়ী। পাত্র আরম্ভ করলে অভিনিবেশ এমনই গূঢ় হয় যে লম্বা বিরাম মোটে মনের মতো হয় না। ফলে কিঞ্চিৎ পরেই প্রায় প্রেমানন্দে পূর্ণ অবস্থা—যেমনটি ঘটে কালীঠাকুরানী ভর করা কবিতা উচ্চারণকালে। তাতে সুর আধারিত কণ্ঠ পেতে দেওয়ার মুহূর্তে। সুরা ও সুর দুই বড় আশ্চর্য বিষয়।

কিন্তু এই নিঝুম ঝিঁ ঝিঁ ও থেকে থেকে পেচক ককানো বনভূমিতে এমন করে হাসে কে? এ কি ত্রাস শাসানো না নেহাৎই বদখেয়াল!

রামপ্রসাদ চোখ তুলে এধার ওধার দেখেন। তারপর গলা চড়িয়ে বলে ওঠেন, কে রে বত্তমিজ। অসময়ে রসিকতা হচ্ছে!

ওধার হতে কোনও জবাব আসে না। রাত্রির বুনো গাছ দিগরের উলুক শুলুক দিয়ে কিঞ্চিৎ চাঁদ কটাক্ষ করে। ঝিঁ ঝিঁর দোয়ারকি দিয়ে নবীন এক পোকা ক্যাট ক্যাট কিট কিট শব্দ তোলে। চতুষ্পাঠির দঙ্গল থেকে সংস্কৃত পড়ুয়াদের গুঞ্জরণ থেকে থেকে উড়ে আসে। এতক্ষণ প্রসাদ একমনে গানে ও পানে ছিলেন বলেই এত সব কানে আসেনি।

প্রসাদ গলা আর এক প্রস্থ চড়ান, মুরোদ থাকে তো সামনে আয়। যে ভয় ডরে, সেই আড়ালে থাকে।

বন ঝোপে এবার উশখুশুনি ওঠে। শুকনো পাতা মচমচানির তাড়সে রাত পেঁচার পাহারায় ব্যাঘাত আর সেই সঙ্গে বিরক্ত বাখারি চাঁছা তীক্ষ্ণ ডুকরে ওঠা। বিলম্বি গাছতলার দিকে ক্রুদ্ধ পেঁচাদের ছড় ছড় বিষ্ঠা পাত।

প্রসাদ তৃতীয়বার মুখ খোলার আগেই বনঝোপ আর অন্ধকার সরিয়ে যে মানুষ মূর্তিটি সামনে এসে দাঁড়ায় তার মুখময় কান উচ্ছিষ্ট করা হাসি। আধা আলোকিত গাত্রবর্ণ। মাঝারি আর কিঞ্চিৎ স্থূল কাঠামোর গলায় তুলসীমালা, নাক বরাবর রসকলি আর কাঁধ তক বাবরি। সাফ সুরত ক্ষৌরি মুখের ভাঁজে ভাঁজে সদানন্দ মিচকে কৌতুক। এই অযোধ্যানাথ গোস্বামী হালিসহর শিবের গলিরই বাসিন্দা আর প্রসাদের প্রায় পড়শি, সখা, আর তাঁর গীতের পাল্টা জবাবী সদাই। এ কথা এ দিগরের পঞ্চজনায় জানে। জানেন নবদ্বীপ অধিপতি মহাগুণাকর সুপণ্ডিত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়। মহারাজ কুমারহট্ট হালিসহরের কাছারিবাড়িতে যখনই আসেন তখনই উভয়ের এত্তেলা পড়ে। রাজা দুইজনার গীত যুদ্ধ উপভোগ করেন। অযোধ্যানাথের হালিসহরি নাম আজু গোঁসাই। পঞ্চজনে পাগলাটে—আজব গোঁসাই। আর দুজনাই প্রায় সমবয়সী।

আজু বলে ওঠেন, বলি মুচ্ছো যাওয়ার দাখিল হলে যে। এই তোমার নির্জনে স্বজনে কালীভজনা আর কাব্যরচনা! ভয়ে দেখছি তুমি মেড়ার মেড়া তস্য মেড়া।

প্রসাদ মিটি মিটি হাসেন, কি করে জানব বলো। বোষ্টম গোঁসাইও যে খ্যানে অখ্যেনে ভেড়া হয়ে যায় তা তো জানা ছিল না।

—ভেড়া! আর কোনও পশু পেলে না!

—তোমার পানা বস্তুকে বড় জোর গর্দভ বলতে পারি। এর বেশি আর কিছু ভেবে পাচ্ছিনে যে।

আজু রামপ্রসাদের থেকে খানিক তফাতে বসে পড়েন মাটিতে থেবড়ে। তারপর নাকের সুমুখে উত্তরিয় আড়াল দেওয়ার ছলনায় বলে ওঠেন, কি আনন্দে যে ওই ছাই পাঁশ খাও, বুঝিনে বাবা। গন্ধে অন্নপ্রাশনের অন্ন উঠে আসে।

— কিন্তু আজু, এটি না হলে যে আমার মুখে অন্ন ওঠে না।

—তোমার মা যে আসলে কোনটি বুঝি না। অন্নপূর্ণা না কালীকে।

—এই জন্যেই তোমায় মুখ্যু বলি। যিনি অন্নপূর্ণা তিনিই তো কালী।

—আহা, তোমার রূপটি তো কালী। তোমার ঠাঁয়ে অন্নপূর্ণার কোনও রূপ নেই। তা না হলে যে অসুবিধে হবে।

—কি অসুবিধে শুনি!

—অন্নপূর্ণায় এত ঘড়ি ঘড়ি কারণ চলবে না। কালী হলে একেবারে মোচ্ছব।

—হুঁ, মোচ্ছবেই তো আছি আজু। এ সবই হল মাগীর খেলা। মাগীর আপ্তভাবে গুপ্তলীলা।

—পেটে দ্রব্য পড়লে মা তখন মাগীই হয়ে যায়।

—আর তোমাদের দ্রব্য ছাড়াই বোষ্টম নেড়ানেড়ির কি আড়খ্যামটা ঢলাঢলি। সে বড় বিষম ব্যবস্থা।

—আড় খ্যামটায় একখানা গান বাঁধোনা ভায়া।

—গান তো আমি বাঁধি না আজু। জগজ্জননী প্রকৃতি বাঁধান। তিনি যেমনটি ইচ্ছে করেন তেমনটিই যে ঘটে।

—হুঁ, বোঝা যাচ্ছে, তোমার ধাত বেশ চড়েছে।

—হক কথাটি কি জানো আজু, যেমন করে নিত্যি আকাশে তারা ফোটে, চন্দ্র, সূয্যি উদয় হন, আমার এই বুনো জাঙালের গাছে গাছে ফুল ধরে, ঠিক তেমনি করেই আমার পদ লাভ হয়। তাতে সুর ফোটে। এ তত্ত্ব কেমন, তা আমি তোমায় মুখে বলে সমঝাতে পারব না।

—হল, হল। রাধেকৃষ্ণ, রাধে কৃষ্ণ। ধাত এমনই চড়া যে দিবসেতে, চন্দ্র ওঠে। কিন্তু সে সব না হয় হল, আমি এমন অসময়ে কেন উদয় হলাম সেটি তো বলার ফুরসৎ হল না।

—বলো আজু, বলো।

অযোধ্যানাথ এবার খানিক নিচু স্বরে বলে ওঠেন, মহাবিপদ উপস্থিত। একেবারে জোড়া বিপদ।

প্রসাদ নূতন করে পানের উদ্যোগ করবেন বলে গলা তুলে ডাক পাঠান, ভজহরি, বলি অ ভজহরি।

ঠিক তখনই বুঝি প্রথম প্রহর ঘটে। বুনো ভূমির যথাতথা থেকে এক সঙ্গে কত না স্বরে শিবাদল ফুকরে ওঠে। রামপ্রসাদ টের পান শিবাভোগের সময় হয়ে এল। তাহলে ভজহরির এখন জোড়া কাজ।

—ভজহরি, বলি গেলি কোথা?

প্রসাদের উচ্চগ্রামী ডাকে ক্ষুধার্ত শিবাদলের প্রহর ভঞ্জনের ঘোষণা আরও উলসে ওঠে। এ এলাকার থেকে দূর অঞ্চলের শিয়ালেরা সংক্রমণে পড়ে একে একে, বহুতে বহুতে সাড়া দেয়। মুহূর্তে কুমারহট্ট হালিসহরের নিশার প্রথম স্তবকটি শিবা হুঙ্কারের প্রচণ্ড আড়ালে নিমজ্জিত হয়। সংসারে বুঝি আর কোনও প্রাণের সমাচার থাকে না।

কর্মকারদের সন্তান ভজহরি যেহেতু তার প্রভু কিংবা অগ্রজের বড় বেশি অনুগত তাই সেও সদাই নেশার দোসর। তার ঘর একখানি আছে বটে তবে ঘরনি নিয়ে সংসার পাড়েনি। প্রসাদী চেলা হয়ে তার জন্য শুকনো ব্রহ্মাণ্ড। জড়িপাতার সপ্তমী বা গাঁজা। সেই তৈরি অবস্থাতেই এসে দাঁড়ায় সে আলো আঁধারে পিঠ দিয়ে।

—দা ঠাকুর।

—কোথা ছিলি বাপ।

—এই তো। তোমার [illegible] নিকটে

—হুঁ, তাহলে শূন্য হাতে এলি কেন রে?

ভজহরি শিবনেত্র হাসে। সে আর বলতে। এই যাব আর আসব।

প্রসাদ বাধা দিয়ে বলেন, ওধারে সংসারের খবর কিরে?

—সংসার সংসারের মতোই আছে। তোমার মা বুড়ি সিদ্ধেশ্বরী পিদিমের সলতে পাকাচ্ছেন। আমাদের বৌঠান ভাতের মাড় গালছেন। আর তোমার কন্যে আর পুত্তুর ইদিক সেদিক কোথাও আছে বৈকি।

আমার বিমাতা কালীঠাকরুণের ঘরে পিদিম দেওয়া হয়েছে তো?

—এ কথাটা কি না জিজ্ঞেস করলেই নয়।

—না, তাই বলছিলাম আর কি।

—যা, আর বকাসনে। দ্রব্য নিয়ে আর তাড়াতাড়ি।

অযোধ্যানাথ এতক্ষণে কথায় উঁকি দেওয়ার সুযোগ পেয়ে যান। —এবার আমার দুটো কথা হোক।

—বলোই না আজু।

আজু আবার স্বর নত করেন, প্রথম দফায় হল মহারাজ কেষ্টচন্দর-এর খাস বেক্তি আমায় বলে গেছে সেখানে তোমার সত্বর নেমন্তন্ন এল বলে।

—কে সেই ব্যক্তি? আর কিসেরই বা নেমতন্ন?

—আমার বোনের বেটা। নবদ্বীপেই থাকে কি না। সে তত্ত্ব করতে এসেছিল আমার। বললে মামা, তোমার সংসারধর্ম্মো নেই। চলো আমার কাছে ক'দিন থেকে আসবে।

—নবদ্বীপে। বেশ তো, ক'দিন ঘুরে এসো। আমার হাড়ে বাতাস লাগুক।

—সেটি হচ্ছে না। এখানে থেকে তোমার হাড়ে দুব্বো গজানোর দায় দিয়েছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ।

—বটে।

—কিন্তু শুনলাম রাজা কেষ্টচন্দর তাঁর পাত্রাপাত্রের ঠাঁয়ে খপর নিয়ে জেনেছেন তাঁর পূর্বপুরুষ কেউ কখনও যজ্ঞ করেনি। ডাক পড়ল পণ্ডিতদের। রাজা পণ্ডিতদের আশীর্বাদ চান শুনে ষড়দর্শনবিৎ পণ্ডিত শিবরাম বাচস্পতি প্রথমেই বললেন—মহারাজ অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী যজ্ঞ করুন।

—হুঁ, তার মানে ঘি আর আগুনের ছেরাদ্দ। আর যজ্ঞ চলবেও একটানা দীর্ঘদিন ধরে।

—সব যজ্ঞেই তো ঘি লাগে।

—কিন্তু বাজ কথাটির মানে তো হবি বা ঘৃত।

—বুঝেছি। তা ঘৃত তো রাজার। তাতে তোমারই বা কি আমারই বা কি।

—হুঁ, অপচয় তো। রাজার অপচয় মানে যে প্রজারই দায়।

—তোমার চিন্তা নিয়ে তুমি থাকো না বাপু। আদার ব্যাপারি। কিন্তু আমার কাছে খবর আছে রাজা তোমায় নেমতন্ন করবেন।

—আমি তো ব্রাহ্মণও নই পণ্ডিতও নই।

—কিন্তু তুমি রাজার বুকের নিধি। তোমায় কত ভালোবাসেন তিনি। কিন্তু মনে হচ্ছে এবার পিরিত বুঝি কেঁচে যাবে।

—কেন?

—কেন আবার, তুমি তো নেমতন্ন রক্ষে করতে যাবে না। অসামাজিক বলে তোমার সুনাম যে দেশে রটে বসে আছে।

—না, এমন কিছু কড়ার নেই যে যেতে হবে। তবে মন চাইলে একবার ঘুরেও আসতে পারি।

—গেলে নৌকো বোঝাই পাওনাগণ্ডা মিলবে।

—তুমি তো জানো বন্ধু, আমার কাছে অন্ধের কি বা দিন, কি বা রাত্রি। এবার বলো দ্বিতীয় কথাটি।

আজু সামান্য হাসেন। ইতিমধ্যে ভজহরি মাটির হাঁড়ার মুখে বিচালি বাঁধা দ্রব্যপাত্রটি এনে নামিয়ে রাখে। তারপর রামপ্রসাদের সামনে রাখা মৃৎ গোল বাটিতে ঢেলে দেয় খানিক। প্রসাদ নিবিষ্ট গলায় উচ্চারণ করেন, কালী-কালী-কালী।

অযোধ্যানাথ কথা বলেন, এবার শেষ কথাটি বলে মানে মানে সটকে পড়ি।

প্রসাদ পাত্র মুখে নেন। যুগপৎ ঢালেন ও অযোধ্যার দিকে চোখ রাখেন।

অযোধ্যানাথ বলে ওঠেন, মুরসিদাবাদের নবাব বৃদ্ধ আলিবর্দি যে কচি দৌহিত্রটিকে তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলে ঠিক করেছেন সেটি হল স্রাজেরদৌলা না সেরাজদৌলা, কি এক ভজকট নাম।

—হুঁ।

—সেটি এ বয়সেই একটি আস্ত পাষণ্ড হয়ে বসে আছে। চোখের সুমুখে নৌকাডুবি দেখতে ভালোবাসে বলে নাও বোঝাই মানুষ ডুবিয়ে মারে। কারুর বাড়ি সুন্দরী কন্যের খবর পেলে তখনই সেটি হরণ করে।

—হুঁ।

—আরও রটনা শুনবে! গর্ভিনী রমণীকে ধরে পাকড়িয়ে এনে তার পেট চিরে দেখে কোনখানে শিশু থাকে।

প্রসাদ হাসেন, রটনায় কান দিতে নেই।

ঠাকুর্দা শিশিরকুমার মুখোপাধ্যায়ের অবিরল গ্রন্থপাঠ আর নিত্য অমৃতবাজার পত্রিকার পাশাপাশি আরও দুটি ব্যাপার আছে। প্রথমটি সাধুসন্ত ও ভবঘুরে সেবা। আর দ্বিতীয়টি দাতব্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা।

ফলে দিনরাত আমাদের এই মস্ত তেতলা বাড়িটি মানুষ পূর্ণ। বাইরের আর ভাঁড়ার ঘরের এ কোণে সে কোণে প্রায়ই দু-তিন প্রস্থ গেরুয়া, শ্বেত কিংবা রক্ত বস্ত্র আর কাঁথাঝুলি। কোথাও মেলেটারি প্যান্ট, কোথাও তালি-তাপ্পা ওভারকোট। কোথাও তিলক সেবা, কোথাও সিন্দুর চর্চা। আর হোমিও ওষুধ নিতে সব সময়েই মানুষজন। দাদু রোগ লক্ষণ চোখ বুঁজে, নস্যি টিপে শুনে অদূরে দাওয়াইয়ের বাক্স আগলে বসা মা'র দিকে পুরু কাঁচের চশমা বরাবর তাকান।—তিন ডোজ আর্স অ্যালব থার্টি দিয়ে দাও।

ওদিক থেকে নমস্কার বলে এসে দাঁড়ান বেলুড় মঠ থেকে আলাদা হওয়া সাধু স্বামী তৃপ্তানন্দ মহারাজ। ধবধবে আর স্থূলকায়। মাথা কামানো। টুকটুকে লাল পুরু ঠোঁট। প্রকাণ্ডভুঁড়ি। আর শিশু থেকে বুড়ো সবাইকে 'আপনি' সম্বোধন।

দাদুও সঙ্গে সঙ্গে জোড় হস্ত। নত মাথা। আসতে আজ্ঞা হোক মহারাজ, আসতে আজ্ঞা হোক।

এ সাধুর কাঁধে ঝোলা নেই। তার বদলে হাতে ধরা চামড়ার ব্যাগ। আমাদের কমপাউণ্ডার মা ওষুধের পুরিয়া পাকাতে পাকাতে ভাবে, যাক, এঁর নিরিমিশটিশ ব্যাপার নেই। মাছ ডিম সব সাপটে খেয়ে নেন। তবে খাওয়ার পরিমাণটি বেশ। সঙ্গে তরকারিপাতি নিজের মতো করে চেয়ে নেন। আর খেতে খেতেই ঢেঁকুর তোলেন।

পাড়ার একদা জমিজমাওয়ালা ধনীর সন্তান—ইদানীং কলকাতার মাস্তান নাটু কাকার ভগ্নীর পূর্ণগর্ভ। হয়তো আজ রাতেই খালাস হবে।

নাটুকাকা কেন যে বোনের জন্যে এত বিচলিত বোঝা যাচ্ছে না। যতই দাদু বলেন, ওহে, যে পাওয়ারের ওষুধ দিয়েছি ওতেই হয়ে যাবে—

তিনি নাছোড়। জ্যাঠামশাই, এখনও হচ্ছে না যে।

দাদু এবার মার দিকে তাকিয়ে এক চক্ষু টেপেন। তারপর বলে ওঠেন। তাহলে বলো বাবা নাটু, সিকি পরিমাণ না আধুলি পরিমাণ।

বেশ চিন্তায় পড়েন কাকা। ভগ্নীর জন্মদ্বারের বিষয়ে প্রশ্ন তো। মোটা জোড়া ভ্রূর মাঝখানটি টিপে ধরে বলেন, আজ্ঞে, সে সব তো মা জানেন।

দাদুর মুখ গম্ভীর, মার কাছ থেকে ভালো করে জেনে এসো।

তবু চিন্তায় অবিচল নাটুকাকা, এক পুরিয়া অন্তত দিন জ্যাঠামশাই। ভারী যন্ত্রনা পাচ্ছে।

দাদু এবার আবার কমপাউন্ডার মার দিকে আস্তে করে বলেন, একডোজ রুব্রাম টু হানড্রেড।

মা জানে এর মানে একটা ফলস্। একটু সুগার অফ মিল্কের সঙ্গে এক ড্রপ মেথিলেটেড স্পিরিট।

দাদুর দোতলার ঘরের উত্তর কোণে একহারা খাটে আমাদের বড়মা—পিতামহের প্রায় একশো ছুঁই ছুঁই মা জননী। এতক্ষণ সবই শুনছিলেন চুপটি করে। মাঝে মাঝে বুরুশ কুচি বরফ চুলে হাত বুলোচ্ছেন আর মস্ত শব্দে হাই তুলছেন। আফিমের মাত্রা কম হল কি?

একই ঘরে মা বেটা থাকেন আর দুজনেই আফিম নেন। ফলে তাঁদের ঘন দুধের যোগান মেটাতে বাড়ির গোয়ালে এখনও পর্যন্ত তিন তিনটি গাই। তাদের সেবা করে পুরাতন ভৃত্য আমাদের রামশরণ কাকা। সোজা পরিচয়ে চাকর স্থানীয় হলেও বস্তুত সে আমার বাবার ভাইয়ের স্থলে। প্রায়ই তার হস্তে আমাকে ও পরের বোনকে চড়-চাপড় খেতে হয়।

বড়মা সুযোগ পেলেই তাঁর নাতবউ—আমাদের মাকে ঠোকর দেন। যেমন এইমাত্র, মেলা, দুধে জল না হয় দিলেই। তবে দিদি, আমাদের বেলায় একটু বুঝেসুঝে দিলে হয় না।

আমার মার নাম মৃদুলা। ডাক নাম মিলা। বড়মার মুখে অপভ্রংশ হল মেলা।

মা চমকে একবার তাকায় মাত্র।

দাদু নস্যির টিপ হস্তে বলে ওঠেন, মা, হরিনাম করো, হরিনাম করো। জল দুধের হিসেব আর কত কববে।

—না। তাই বলছিলাম আরকি। ঘড়ি ঘড়ি হাই উঠছে তো।

দাদু নতুন পেশেন্টের পালস, দেখতে দেখতে চোখ বোঁজেন, হুঁ, টেম্পারেচার তো আছে সামান্য। নাড়ি চঞ্চল। তা মা, মাসিক পরিষ্কার হয় তো?

—না জ্যাঠাবাবু।

—সাদা স্রাব হচ্ছে কদিন?

—উঁ-তা বছর দুয়েক।

—বলো কি মা। এই নিয়ে ঘরে বসে আছো। বয়েস কত শুনি।

—সাতাশ।

—বাপ-মা বিয়ে-থা দেননি কেন এ্যাদ্দিন?

মেয়েটির ভাঙাচোরা মুখ নিজের পা দেখে।—মা নেই। বাবার বয়েস হয়েছে তো। কে দেখবে।

—কত বয়েস শুনি?

—ষাট-বাষট্টি হবে।

দাদু ঝমিটে ওঠেন। ষাট-বাষট্টি! এ বয়েসে হুদো হুদো লোক বিয়ে করছে।

বড় মা ঘরের কোণ থেকে হাই তোলে, হরিবল, হরিবল।

দাদু চমকে তাকান, কি হল মা!

—না, কেলান্তি বাবা। তবে তুই তো দু-দুটো বিয়ে করলি। একটাও টিকল না।

তিন

আমার নরনারায়ণ বা ডাকনামি কানু বাবা ত্যারছা গলায় বলে ওঠে, আপনার প্রথম পক্ষ আমার জীবনের ধ্রুবতারা—আমার কণা মা।

দাদু, ভালো নাম সুবোধশশী। তোমার মার পাশে আমায় চাকরের মতো মনে হত। এমনই সুন্দরী, রূপসী।

—কিন্তু আপনার নিরিমিশ খাওয়ানোর টর্চারে মাত্র উনিশ বছর বয়েসেই ও কম্মো হলেন। তখন আমি আড়াইমাসের শিশু। আপনি অনুকূল ঠাকুরের শিষ্য। আমার মরা মাকেও দীক্ষা নেওয়ালেন। বউ মরল তো ভারী বয়ে গেল, আপনি তো ঋত্বিক হয়ে বসলেন।

—আমার শ্বশুর মশাই—মানে তোমার মাতামহ সেকালের এল এম এফ ডাক্তার ছিলেন। মোট এগারোটি সন্তানের জন্মদাতা। ভাগ্যিস সবাই বাঁচেনি।

—ভাটপাড়ার মহেশ ডাক্তার। আপনি তাঁর জামাই ঋত্বিক হয়ে শিষ্যের বংশ বৃদ্ধি করে চলেছেন।

—ডাক্তার মহেশ্বর রায়। দীর্ঘাকৃতি। গৌরবর্ণ। খড়গনাসা। আর আয়ত লোচন। ওষ্ঠাগ্রে সুচারু গুম্ফ। মাথায় অভিজাত টাক।

—ক্ষমা করবেন বাবা, আপনার শ্বশুর একজন নারী ধর্ষণকারী।

—এ্যাঁ!

—মাত্র এগারোটি সন্তানের বাবা। আর আপনি একজোড়া বিবাহ করেও এ তরফে দুই, ও পক্ষে এক—মাত্র তিন। আমার অকালমৃতা দিদি আর আমি। আর আপনার এ পক্ষের দরুণ আমার বৈমাত্রেয় বোন দীপা। আপনার গুরুদেবের কটি ছিল বাবা?

—অবান্তর প্রসঙ্গ বলে লাভ আছে কি? আর তাছাড়া বিষয়টা তো একেবারেই পারসোনাল।

—বেশ কথা। ভালো কথা বাবা। তাহলে আমার গর্ভধারিণীর অমন কচি বয়েসে বোন টিবি হল কেন। সার্টেনলি ম্যালনিউট্রিশন। মানে পাথরের থালায় হবিষ্যি—মানে নিরামিষ। মাছ-মাংস না খেলে গ্রোথ হবে কি করে। মার অসুখের পর ডাক্তার বলেছিলেন রোজ টেংরির য্যুস খেতে। আপনার নিরামিষ সংস্কারে সেটি হয়ে ওঠেনি।

—তুমি কি বলতে চাও বলতো কানু।

—আমি অবশ্যই বলতে চাইনা আমার কণা মায়ের হত্যাকারী আপনি। তবে আমার দাদু—মানে আপনার শ্বশুর মশাই সে কথা বলতেন। শুনেছি আমার মা'র অকাল মৃত্যুর পর আমার দিদিমা দুপুরে বাড়ির সবাইকে খাইয়ে প্রায় বিকেলের মুখে গঙ্গার আঘাটায় চান করে এসে দু'মুঠো যা হোক খেতেন। আরও শুনেছি—তিনি বাকি জীবন আপনার মুখ দর্শন করেননি। থালায় ভাত বেড়ে দিয়ে ঘোমটা টেনে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতেন। আরও জানি, দিদিমা পাঁচজনের সঙ্গে স্বাভাবিক কথাবার্তাই বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

—উঃ উঃ। এনাফ ইজ এনাফ। তুমি থামবে।

সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের এই অট্টালিকার রন্ধ্রে রন্ধ্রে কত শত জমাট বদ্ধ হাওয়া আর হুতাশ ধুলোর পর ধুলো পলেস্তারা সাজাতে ব্যস্ত থাকে তার স্বভাব মতো। পাগলপাড়ার এই বাড়ি ঘিরে কত না মিথ, বাদ-প্রতিবাদ, অভিমান, বিনয়, সকাম আশ্লেষ, তথাকথিত অনাচার—আরও বহু শত অস্বাভাবিকতা নির্বিকার কুয়াশা পাথার হয়ে সেজে থাকে। কোথায় কোন বইয়ে লেখা হয়, এই বাড়ির দোতলার উত্তরের খড়খড়ি জানলা আঁটা ঘরে, ইংরেজদের সঙ্গে কলিকাতাদি মহাল বন্দোবস্তী দলিলের খসড়া লেখা হয়। কথা হয়, এ বাড়িতে তিন তিনটি সোনার ইট তিন গুপ্ত স্থানে পোঁতা ছিল। শিশির কুমারকে সাফ কোবলা বিক্রির আগে তাঁর ধনী জোতজমাওয়ালা ছাত্রটি বাড়ি সারানোর রাজমিস্ত্রি আনলেন খোদ মুর্শিদাবাদ থেকে। দিনের বেলার বদলে সারারাত কাজ করত মিস্ত্রিরা। আর সেই লোকের চোখ আড়াল করা সারাই কর্ম রাত জেগে পাহারা দিতেন সেই প্রৌঢ় আর তাঁর এক আধ পাগলি অবিবাহিতা মেয়ে। পরপর দু'খানি সোনার ইঁট পাওয়া যায়। প্রথমটি একতলা থেকে তিনতলা পর্যন্ত উঁচু উঁচু সিঁড়ির নিচ থেকে। দ্বিতীয়টি সেই দোতলার দলিল খসড়ার ঘরের বায়ু কোণ থেকে। ওই ঘরে আমার পিতামহ শিশিরকুমারের বসবাস। তৃতীয় ইঁটখানির কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি। এ বাড়ির শুধু নয় পাড়া পরিজনও সে কথা বলাবলি করে। বলে যত্ন করে খুঁজলেই মিলবে সেই সোনার ইঁট।

কানু বাবা রাম-এর গ্লাস হস্তে প্রকাণ্ড বারান্দার খাবার টেবিলে এক হাত ভেরে আমায় বলে চলে, আমার রাণু দিদি। দোজবরে লোকের সঙ্গে তার বিয়ে দিলেন বাবা। কে জানো,

তোমাদের শান্তিপুরের ভোলানাথ দাদু। যিনি দিদি মারা যাওয়ার পর তোমার গর্ভধারিণীর ছোট পিসিমাকে বিয়ে করেন। এবং অনর্গল ছেলেপুলের বাপ হতে থাকেন।

বড় মা কথা বলে, আহা, ভোলানাথ। রূপটিও শিবের মতো।

—ঠাক্‌মা, তুমি যত নষ্টের গোড়া।

—ওমা, আমি কি করলুম ভাই।

—তুমিই তো ভোলাদার সঙ্গে আমার তেরো বছরের দিদিকে ভিড়িয়ে দিয়েছিলে। তখন ভোলাদা নয় নয় করে তিরিশ।

আমি মনে ভাবি শান্তিপুরের ভোলাদাদু তাহলে আদপে আমার পিসেমশাই! এ কি গোলমেলে ইকুয়েশন!

বাবা গর্জায, বিয়ের পরের বছরেই পেটে সন্তান এল। প্রসব হল মরা ছেলে।

বড় মা হাই তোলে, কেন মিছিমিছি অনাছিস্টি কথাগুলো কপচাচ্ছিস্ ভাই।

আমার কমলা মা সাধুদের রাতের রুটির আটা ঠেসতে ঠেসতে গজগজ করে, নিজের মাথা খারাপ। ছেলেটারও মাথা খারাপ করে দেবে।

ও ঘর থেকে এক শাদা থান পরা বুড়ো ঢ্যাঙা ব্রহ্মচারী লম্বা লম্বা পায়ে রোয়াকের নালিতে পেচ্ছাপ করতে বসেন। সেখান থেকেই সরু মিনমিনে গলা তুলে আমার মা'র প্রতি বলে ওঠেন, মা জননী, আমার রুটি ক'খানা একটু ঘিয়ে ভিজিয়ে দিও। না থাকলে নেই নেই। জলে একবার করে চুবিয়ে নিও মা। দাঁত নেই তো।

বাবা বলে চলেন, আমার দিদির পেটে পরের বছরেই আবার সন্তান এল। দিদি আর পারল না। প্রসব করতে গিয়েই মরে গেল। ভেতর থেকে জরায়ু বাইরে ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল ছেলে সমেত।

শুনে আমার গা কীরকম করে। বমি বমি ভাব হয় বিনা অম্বলে।

বড়মা আবার হাই তোলে, হয়েছে, এবার খ্যামা দে দিকিনি।

কানু বাবা বলে যায়, তোমার মনে আছে ঠাক্‌মা, ভোর রাতে দিদিকে পুড়িয়ে আমি ছেলের দুধ খাওয়ানোর জন্যে মা খুঁজতে বেরোলাম। তখন কত বয়েস হবে আমার, বড় জোর তেরো। কাঁচরাপাড়ার বাবু ব্লকের কোয়ার্টারে থাকতাম তো। তাই গেছনকার মথুরা বিলের পাড় ধরে হাঁটতে লাগলাম।

বড়মা বলে ওঠে, সেসব কথা কি ভোলা যায় ধন।

—হ্যাঁ, যায় না বলেই তো বলছি। খুঁজতে খুঁজতে, লোককে জিজ্ঞেস করতে করতে প্রায় দুপুর বেলা সেই কাঁপা গ্রামের দিকে এক মুসলমান গাড়োয়ানের ছেঁচা বেড়ার ঘরের সামনে এসে খবর পেলাম তার বউটি সদ্য বিইয়েছে। সব ঘটনা শুনে আর আমায় ছেলেমানুষ দেখে হয়তো মায়া হল। বলল, রোজ সকাল সন্ধে দু-বেলা শিশুটিকে নিয়ে যেতে। সে মাই দেবে।

বড়মা হাই তুলতে গিয়েও তোলে না। মাই-এর আবার হিঁদু মোচলমান কি। মায়েরই তো মাই হয়। বাবার তো ও জিনিস নেই।

—হ্যাঁ ঠাক্‌মা, সেই শিশুকে দু-বেলা সেই দয়ালু মায়ের দুধ খাওয়াতে নিয়ে যেতাম। দাওয়ায় বসে শুনতাম, আমার সদ্য মা হারা দিদিটির শিশু চকাত্ চকাত্ দুধ খাচ্ছে।

মাতৃদুগ্ধ বলে কথা। মার সেই ছেলে জ্যোতিপ্রকাশ এখন চাকরি-বাকরি করে আর সংসার নিয়ে বড় ব্যস্ত। একবারও এ পথে মাড়ায় না।

বড় মা এবার অধৈর্য গলায়, ও ছাইপাঁশ আর খাসনে মাণিক আমার। তোর বাপ এমন সাধু পুরুষ, তার ছেলে তুই কেন এমন হলি!

—জিন। জিন বোঝো?

—দানো নয়তো!

—হ্যাঁ দানোই একরকম বটে। আমার বাবা না হয় নিরিমিষ সাধুপুরুষ। কিন্তু তার বাবা—মানে তোমার বর? ঈশ্বর শিবরাম মুখোপাধ্যায়।

—ও আবার কি কথা।

—ওই কথা ঠাক্‌মা। বলব, যখন পেট একেবারে খোলসা করে বলব। আমার ঠাকুর্দা বদ্ধমানের ধুলুক গ্রামের বাসীন্দে!

—হুঁ, পূর্বপুরুষের ভদ্রাসন তো।

—হ্যাঁ, ঈশ্বর শিবরাম, তস্য বাবা লোকনাথ, তস্য বাবা পার্বতীচরণ—তারপর সব যথানাম।

—একি নান্নীমুখ কচ্ছিস তুই।

—বর্দ্ধমান জেলার, জামালপুর থানার ধুলুক গ্রামে ভদ্রাসন। বর্দ্ধমান মহারাজার দান করা দেবত্তর সম্পত্তি আর বংশ কালী মূর্তি সিদ্ধেশ্বরী মাতাঠাকুরানী। মার আদেশ, তিনি মেটে ঘর খড়ের চালে বাস করবেন। মাটির দশাসই প্রতিমা। লাল পেড়ে শাড়ি পরণে আর এই অ্যাত্তোখানি লাল জিভ। ঘরটা অন্ধকার ছমছমে। হঠাৎ করে দোর খুললে মনে হয় মা বুঝি ঘাড়ে পড়লেন বলে। বহু বছর পর পর মায়ের অঙ্গরাগ হত। কথিত আছে, যে পুরুষটি ওটি সেই বিশেষ পোটো ডেকে করাবেন তাঁর আয়ু ফুরোবে। মা'র নতুন অঙ্গ হবে প্রাচীন কাঠামোর ওপর। সেবাইত পুজো করবেন। আর তার কিছুদিনের মধ্যেই তিনি হত হবেন।

—তোর পিতেমো মাত্তর বেয়াল্লিশ বছরে দিন কয়েকের পেট খারাপ আর জ্বরে চলে যান। তোর বাপ, পরের ছেলে দীননাথ আর আমার টুকটুকে সুন্দরী বালিকা মেয়ে যোগেশ্বরীকে নিয়ে ভরা যুবতি আমি বেধবা হলুম। অভাবের সংসারটি ভেসে গেল।

দাদু খড়ম খটখটিয়ে অদূরে এসে দাঁড়ান। লম্বা আড়া। পরণে লুঙ্গি-গেঞ্জি। পাকা চুলের মাঝখানে সিঁথি কাটা। হাতে ঘটি। কানে পৈতে পেঁচানো। বাথরুমে যাবেন তো। হঠাৎ দেখলে মনে হয় ইনি বুঝি যামিনী রায়ের যমজ ভাই।

—বাঃ। বেশ লাগছে শুনতে। একটু নস্টালজিক হয়ে পড়ছি।

বাবা চোখ বড় বড় করে বলে, বলুন বাবা, বলুন। সব সত্যি বলছি তো।

—আমার বাবা পুজোর ঘরে ঢুকতেন সাতসকালে। আর ভোর রাতে আমায় উঠে জবা ফুল, দুর্বো আর একশো আটখানি নিশ্চক্র বেলপাতা তুলতে হত। একটি পাতায় যদি চক্র থাকত সেদিন বাবা আমার পিঠে খড়ম হাঁকড়াতেন!

আমি মনে মনে ভাবি বাবার বলা জিন এর কথা! সে কথা কি আমার জন্যেও তোলা রইল।

ওধারে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ অদূরস্থ ভিটেয় বসে উচ্চগ্রামে গেয়ে চলেন, গুরু দত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি মশলা দিয়ে মা, আমার জ্ঞান শুঁড়িতে চুয়ায় ভাঁটি, পান করে মোর মন মাতালে...

এদিকে আমার কানু বাবা থ্রি একস্ রাম টানছেন, ওদিক থেকে রামপ্রসাদ রাম-এর ফর্মূলা কপচাচ্ছেন।

গুড় তো শুনেছি রাম-এর মূল প্রেরণা।

অযোধ্যানাথের বিবরণের শেষ অংশটুকু শুনে বেশ খানিক সময় প্রসাদের মুখে বাক্য সরে না। নবাব আলিবর্দীর মতো সুশাসক আর ভদ্রজন এমন দৌহিত্রকে যদি মুরসিদাবাদী সিংহাসনে বসানোর ঘোষণা দিয়ে থাকেন তাহলে এই বাংলার ভবিতব্য কি হবে। অযোধ্যা এও বলেছেন যে সেরাজদৌলা নবাব না হতেই মুরসিদাবাদের মানুষ ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। এক কথায় নগরস্থ লোকজন পলায়নপর। দিকে দিকে মানুষের হাহাকার ঘটে চলেছে। এই অত্যাচারী বালকটির অমানবিকতায় মানুষের মধ্যে জাতিগত বিভেদ দেখা গেছে। আজুর সমাচার বলছে—মুরসিদাবাদের মানুষ এখন থেকেই ভাবতে বসেছে এ দেশ যবন অধিকারী হলে সাধারণের গতি কি হবে। প্রসাদ অপরের মুখে ঝাল খাননা বলেই আজুর বাড়াবাড়ি রকম বিবরণে মুখ রাখেননি।

এ কথাও তো সত্য যে যবন বললে বিচার যথার্থ হয় না। ভারতভূমির একদা সম্রাট আকবব কিংবা বাংলার নবাব আলিবর্দী তো সে অর্থে যবন নন।

অযোধ্যানাথ কখন যে ফিরে গেছেন তা কে জানে। তবে প্রসাদের সামনে—কিঞ্চিৎ তফাতে উপবিষ্ট ভজহরি। সে ইতিমধ্যে একটি মেটে হাঁড়ার মধ্যে আকারে বড় এক প্রদীপ জ্বেলে এনেছে, যাতে বাতাসে সেটি নিবে না যায়।

ভজহরি বলে, তাহলে দাঠাকুর আমরা এবার শিবা ভোগে যাই।

প্রসাদ চিন্তিত স্বরে শুধু বলেন, হুঁ।

—তাহলে বৌঠানকে ভোগ আনতে বলি?

—হুঁ।

—কিন্তু দোহাই তোমার দাঠাকুর, আর ও দব্য খেওনা।

প্রসাদ নিঃশব্দে হাসেন। তারপর বলে ওঠেন, শোন রে গণ্ডমুখ্যু—পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা যাবৎ পততি ভূতলে, উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।

শুকনো সপ্তমীর ঘোরে ঝাঁকুনি লাগে ভজহরির।

—মানে!

তাই তো বলি মুখ্যু। ওরে মানে অতি সরল। পানের পর পান করে যাবে। সুরাপান করতে করতে ভূতলে পতিত না হওয়া পর্যন্ত পুনঃপুনঃ পান করে যাবে। ভূমিতে পড়ে গেলে সেখান থেকে উঠে আবার পান করবে। এইরূপ পান করে গেলে তোমার আর পুনর্জন্ম হবে না।

ভজহরি কিছু বলবার আগেই হেঁড়ো প্রদীপের আলোর পিছনে একটি ঘোমটাবতী ছায়ামূর্তি দুলে ওঠে। ভজহরি ব্যস্ত হয়। প্রসাদ নিরুদ্বেগে চেয়ে থাকেন। কেননা তাঁর

সুমুখে বুনো জাঙালের পটে যে চিত্রখানি এইমাত্র আঁকা হল সে যে সর্বানী। এই নদে জেলারই ভাজনঘাট থেকে বিবাহ করে আনা লোকনাথ দাশগুপ্ত কন্যা ওই রমণী। বড় কম কথা কয়। সারাদিন প্রসাদের সংসার কয়েদে খেটে মরে। বুড়ি শাশুড়ি, এক যুগল সন্তান আর এসোজন বোসোজনের আবদার সামলায়। মা জগদম্বার পূজার যোগান দেয়। ভোগরাগ শয়ন উত্থান নিয়ে সজাগ থাকে—যদিও প্রসাদী কালীঘরে মূর্তির বদলে তাম্রঘট আব ত্রিশূল। বৎসরান্তে কালীপূজার দিন কেবল প্রতিমা গড়িয়ে পূজা হয়। তাহলেও সর্বানী জানে ঘট মানেই আকাশ। মহাশূন্য। জগদ্‌জননীর ত্রিলোক জোড়া সংসার। এখানে এসেই প্রসাদের মন বিষণ্ণ হয়। হায়, তাঁর গীত ও কবিতা কেন আজ অবধি ত্রিলোক দেখল না।

রামপ্রসাদ মৃদু হেসে বলেন, আয় পাগলী। সব তোয়ের তো?

সর্বানী মাথা হেলিয়ে ইঙ্গিতে দেখায় হাতে ধরা কাঁসার থালাখানি। তবে তার ঘোমটার আবডালে কিঞ্চিৎ অস্বস্তি জাগে এই গুপ্ত সম্বোধনে।

—আজ কি মাছ দিলে শুনি।

—বেলে আর ল্যাটা।

—বাঃ।

—সঙ্গে ডাল আর আলু সেদ্ধ চটকে দিয়েছি।

—চমৎকার।

—সিঁদুর মাখানো বিল্বিপত্তর আর দুব্বো দিয়েছি।

—সেব সব তো রোজই দাও। বলি নতুন কিছু কি দিলে?

—এক ফোঁটা পরমান্ন। ওবেলা মায়ের ভোগ দেওয়ার আগে তুলে রেখেছিলাম।

প্রসাদ ঘাড় ঘুরিয়ে হাসেন ভজহরির দিকে তাকিয়ে। অনুগতটি সে হাসির ছটায় নিজের হাসি পেতে দেয়। রামপ্রসাদ যথারীতি তাঁর আনন্দ উল্লাসে বলে ওঠেন, কালী-কালী-কালী।

সর্বানী ভোগ মণ্ড সাজানো কাঁসার ফুলকাটা থালাখানি ভজহরির দিকে বাড়িয়ে দেয়। রামপ্রসাদ সর্বানীর প্রতি ঘাড় কাত করেন। সর্বানী পিছু ফেরে চলে যাবে বলে।

তারা সব আশেপাশেই আছে এ কথা তো জানা। অতএব এই বুনো ঝোপ ভিটা পরিবেশের কিছু তফাতে চারিদিকে ঘোর আর মধ্যখানে সামান্য খানিক কাটা ছাঁটা। একজোড়া দুল দুলন্ত ফল সমেত বিলম্বি গাছ। একটি বেলগাছ। জনাকয় ঝাঁকড়া দুর্মর খেজুর। বাকিরা সব বুনো আশ শ্যাওড়া। ডগডগে মানকচু, গেঁড়ি কচু। একটি পিটুলি। এদের জড়িয়ে মড়িয়ে হরেক লতার যেমন খুশি বিস্তার। জানা অজানা এই সব লতারা বুনো ভূমিখণ্ডটিকে মনের আনন্দে সাজিয়ে দিয়েছে কতক বিনি সাজেই। সন্ধ্যা পেরনো এই রাত্রি সময়ে গোটা জায়গা জোড়া লতাগুল্মের বুনো গন্ধ অতি নিবিড়। প্রতিটি গাছ ও লতার আলাদা আলাদা গন্ধ কীরকম মিলে মিশে রইলেও কোনও ঘণ্ট পাকানো আলাদা গন্ধ তৈরি হচ্ছে না। প্রসাদ ভজহরির এখানে পা রাখা মাত্র, ভজহরির এক হাতেধরা ভোগের থালা আর এক হস্তে সেই হেঁড়ো দীপের আলোয় শান্ত অপেক্ষার স্থানটি অতিরিক্ত জুড়িয়ে যায়। রামপ্রসাদ সেই বনজ গন্ধের ভিতর থেকে ছিমছিমে চাঁদের

আলোর দিকে মুখ তুলে ডাক পাঠান শূন্যে, আয়-আয়-আয়। আয়-আয়-আয়। আয়-আয়-

মুহূর্তে এই অপরিপাটি কাননে উতরোল জাগে। অন্ধকারের চিত্রপটে কয়েক যুগল জ্বলন্ত সবুজ আলোক দানা থরথরিয়ে ওঠে! গাছে গাছে, ঝোপে ঝোপে নতুন অতিথির গায়ের ক্ষুধার্ত গন্ধ বেসামাল হয়ে দাঁড়ায়। ক্ষুধার পাত্র ওই শরীরগুলি কিন্তু অটল থাকে। তারা অভ্যস্ত আর পরিচিত নিত্য এই সান্ধ্য ক্রিয়ার জন্যে। যার আসল নামটি ক্ষুধা।

চার

রামপ্রসাদ বিলম্বি গাছটির দিকে এগিয়ে যান। হাতে ভোগের থালা। তাতে গোল গোল দলা পাকানো ভাত-মাছ ইত্যাদির মিশেল। প্রসাদ এগোন। তারাও গুটি গুটি এগিয়ে আসে সামনে। এবার পিছন থেকে ডাক ধরে ভজহরি, কালী কালী কালী—

গাছতলে তাল পাকানো ভোগ খণ্ডগুলি ভারী যত্নে ঢেলে দেন প্রসাদ। ঢেলে দেন কিংবা নামিয়ে রাখেন। অন্ধকারের সন্তান শৃগালের দল যে যার এসে মুখ নামায় খাদ্যের ওপর। ভজহরির হাতে ধরা প্রদীপের আলো আর ছিমছিমে আকাশের আলোর মহিমায় গডজঙ্গল এই অঞ্চলটি আশ্চর্য ক্ষুধা নিরসনের মহিমা দেখে। কিন্তু আজ যেন ওই নিয়মতান্ত্রিক শিবাদলের মধ্যে সেরকম কোনও উল্লাস-আনন্দ নেই। কোথাকার কোন বিষণ্ণতা এসে ছেয়ে দিয়েছে এই পরিমণ্ডল। তবে কি এ রামপ্রসাদের নিজের মনোভাব! তারই ছটা পড়েছে কি ওখানে!

আসলে মন খারাপ করে দিয়ে গেল অযোধ্যানাথ। তার মুখে আলিবর্দীর দৌহিত্র আর বাংলার ভাবী নবাবের বিবরণ শুনে মনটা কিরকম নেমে দাঁড়াল। সেই সঙ্গে এসে জুটল রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রসঙ্গ। এই রাজা শুধু গুণগ্রাহী পণ্ডিতই নন ভারী লাঞ্ছনা বহন করেছেন মুরসিদাবাদি নবাবের দ্বারা। রাজার পিতামহ রাজা রামজীবন, তস্য অগ্রজ রাজা রামচন্দ্র ও পিতামহের বৈমাত্রেয় ভাই রাজা রামকৃষ্ণ—এই তিন মহাশয়ের দরুণ নবাব আলিবর্দী খাঁর কাছে দশ লক্ষ ধারী হয়ে পড়েন। এর সঙ্গে নবাব আরও বার লক্ষ টাকা নজরানা জারী করেন। বিপদগ্রস্ত রাজা আচম্বিতে এত অর্থ কোথা পাবেন! ফলে রাজার দণ্ডভোগ কারাবাস। তারপর, বহু প্যাঁচ ও পয়জারে, অনেক পরিকর পরামর্শে রাজা এক সম্ভ্রান্ত আর কায়স্থ সন্তান রঘুনন্দনকে দায়িত্ব দিলেন। এবং এই কর্মচারীর বিশেষ বুদ্ধিবলে ও কৌশলে নদীয়ারাজ ধনে প্রাণে বাঁচলেন। আর কি আশ্চর্য, তারপর থেকেই নবাব আর পাঁচটি ভূম্যধিকারীর চেয়ে নদীয়ার রাজাকে আলাদা চোখে দেখতে থাকলেন। তাঁর মধুর ও বিদগ্ধ স্বভাবে নবাবের মন মজল। তিনি এমনই হলেন যে, প্রায় কৃষ্ণচন্দ্রে চক্ষে হারা। তাহলেও রাজার মাথার ওপর ধারী কথাটি ঝুলে রইল। সেই সঙ্গে মনে মনে সে ত্রস্তও। নবাবী প্রাসাদের অলিন্দ থেকে ঘুরতে ঘুরতে এ দায় প্রবাদের মতো দেশময় ঘুরে বেড়াতে লাগল। প্রবাদ হল, নদীয়া রাজের মাথায় বিশলাখি দায় সাপের বাঁধন হয়ে গেড়ে বসে আছে। তথাপি রাজার স্বভাবগুণের এমনই আকর্ষণ যে আলিবর্দী রাজার মোহে পতিত। প্রায়ই তিনি মহারাজকে ডেকে নিয়ে ধর্ম বিষয়ে নানান আলোচনা করতেন। নিত্য সন্ধ্যায় রাজা নবাবকে মহাভারতাদি পুরাণের উর্দু অনুবাদ করে শোনাতে লাগলেন।

কিন্তু মনোপথে ঘুরে বেড়াতে লাগল বিশলাখি দায়। একদিন খবর হল আলিবর্দী জলপথে কলিকাতা যাবেন। রাজা যেহেতু এই মহাল তাঁর এলাকা অধীন, তাই সুযোগ বুঝে নবাবের সঙ্গী হলেন। কেননা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মহালের চৌহদ্দি ছিল উত্তরে মুরসিদাবাদ, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে ধুলিয়াপুর আর পশ্চিম সীমা ভাগীরথী। এ বাদেও ভাগীরথীর পশ্চিমপারে কুবেজপুর নামে একটি বৃহৎ পরগণা রাজ অধিকৃত ছিল।

জলপথে যেতে যেতে বজরা যখন পলাশী পরগণার কাছে এল তখন শস্যহীন খাঁ খাঁ প্রান্তরের দিকে নির্দেশ করে কৃতাঞ্জলি রাজা বললেন, হুজুর, আপনার সেবকের জমিদারীর এই হাল। কোথাও শস্যশূন্য, কোথাও বনাঞ্চল। আমার সমুদায় পরগণাই কোথাও জলহীন, কোথাও বন, কোথাও অনুর্বরা। এমত অবস্থায় রাজস্ব অর্থ যোগাড় করা যে কি অসম্ভব। নবাবী জলপোত এগোতে লাগল। রাজা নদীর পূর্বতটের গ্রামসমূহ দেখাতে লাগলেন নবাবকে। একসময় নবদ্বীপ এল জলপথের ধারে। সেই সময় নবদ্বীপ ছিল বাঁশবনে ঘেরা দুর্ভেদ্য অঞ্চল। বড় বাড়ি বা অট্টালিকা, সে সবই বাঁশবনের আড়ালে। নদীগর্ভ থেকে কতিপয় তৃণ আচ্ছাদিত কুঁড়ে নজরে পড়ে। রাজা জোড় হস্তে বললেন, বঙ্গেশ্বর, আপনি তো জগদীশ্বর। এই নবদ্বীপ হল আমার সবচেয়ে সেরা মহাল। আমি যে কিরূপ ভাগ্যবান তার প্রমাণ দিচ্ছে এই গ্রাম। নবাব কোনও জবাব দিলেন না।

ক্রমে কলিকাতা নগরী এল। কলিকাতা এক নগণ্য গ্রাম। শুধু এই নগরীর উত্তর অংশে গঙ্গার ধারে কিছু লোকবসতি দেখা যায়। কিন্তু পূর্ব ও দক্ষিণ অংশ বাদাবনে আচ্ছন্ন। এমন ঘন অরণ্য যে দিনমানেও গা ছমছম করে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র শেষ ফন্দী আঁটলেন, নবাবকে একবার গভীর অরণ্যের সমীপে নিয়ে যেতে পারলে হয়। জলপোত রাজার নির্দেশে আরও দক্ষিণে গহণ বনের দিকে বয়ে চলল। রাজার শিখিয়ে দেওয়া কথা অনুযায়ী নবাবের সঙ্গীরা নিজেদের মধ্যে পরস্পর আলোচনা করতে লাগল, হুঁ, এবার যে মহাবিপদ। এ বনে বাঘ আছে। বুনো দাঁতাল শূকর আছে। বাঘ মানে সাক্ষাৎ শমন। সে নবাব-বাদশা মানে না। মনুষ্য হলেই সেটি তার খাদ্য।

নবাবের কানে এই আলোচনা গেল। তিনি মাঝি-মাল্লাদের বজরা ফেরাতে আদেশ দিলেন। ফিরে চলো। আর এগিয়ে কাম নেই। ফেরো সব, ফেরো।

বুদ্ধিমন্ত নদীয়া রাজ তো হাত জোড় করেই আছেন।

—হুজুর, আর সামান্য পথ।

বৃদ্ধ নবাব প্রাণভয়ে ব্যস্ত সমস্ত, না না, আর প্রয়োজন নেই। যথেষ্ট মহাল দেখা হল।

রাজার দুই চোখে এবার কুটিল জলের উদ্ভাস। সেই সঙ্গে যথারীতি হস্তজোড়। খোদাবন্দ। ধর্মাবতার, যদি আমার সৌভাগ্যক্রমে কৃপা করেও বিশেষ ক্লেশ স্বীকার করে এতদূর পথ এলেন, তাহলে আর কিছুদূর গমন করুন। তা হলে সেবকের অভীষ্ট সিদ্ধির আর কোনও সন্দেহ থাকে না।

নবাব রাজার প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত করলেন। তারপর মৃদু হেসে বলে উঠলেন. কৃষ্ণচন্দ্র, আর অধিক দূর গমনের প্রয়োজন নেই। অদ্যই তোমায় পৈত্রিক দায় থেকে মুক্ত করা গেল।

বামপ্রসাদ আজ আর শিবাভোগে তেমন মনযোগ বহাল রাখতে পারলেন না। রাজা

কৃষ্ণচন্দ্র বাদেও তাঁর মনে বঙ্গদেশের হাল হকিকত কেবলই হুঙ্কার দিতে লাগল। যেহেতু রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে তাই দেশের হাঁড়ির খবর সদাই তাঁর সঙ্গে ফেরে। মহারাজা সময় পেলেই কুমারহট্ট-হালিসহরে আসেন। বায়ু সেবনার্থে এখানে তাঁর একটি সুরম্য কাছারি বাড়ি আছে। রাজার সৌজন্যে প্রসাদ জানেন মুরসিদাবাদের মূল ভিতটির অবস্থাও নড়বড়ে। কেননা শতাধিক বৎসর বরাবর ইংরাজ বানিয়ারা ভারতবর্ষময় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে শিল্প আর ব্যবসার খোঁজে। তারা পায়ে পায়ে এসে উপনীত হয়েছিল মুরসিদাবাদে বা তখনকার মুকসুদাবাদে। ঘন ঘন যাতায়াত করছে লোভনীয় রেশম শিল্পের বাড়বাড়ন্ত দেখে। সেই সঙ্গে তো অনেক আগে হতেই কাশিমবাজার ও সৈদাবাদে ফরাসি ওলন্দাজ দিগর বাণিজ্য বসিয়েছে। বিদেশী বানিয়ার এমত সব বাণিজ্য তৎপরতার একমাত্র সহায় সুরধুনি ভাগীরথী। মা গঙ্গা তাঁর বুক পেতেই রেখেছেন বিশ্ব সংসারের সন্তানদের জন্য। সেখানে দেশবিদেশ প্রাচির নেই।

ভজহরি প্রায় সর্বদা প্রসাদ সমীপে বাস করে তার দাঠাকুরটির প্রভাব পেয়েছে। প্রসাদের ভিজে নেশার সঙ্গে যেমন তার শুকনো নেশা, তেমনই প্রসাদী পাণ্ডিত্যের রসকষ তার স্বভাবে বর্তমান। ফলে একেবারে গণ্ডমুখ্যু নয় বলেই সে প্রসাদকে প্রায় আপাদমস্তক পড়ে ফেলেছে। তাঁর কবিতা ও গীত সে বেসুরো গলায় আওড়াতে পারে। সে জানে প্রসাদের বিষাদ-দুঃখের একমাত্র সহায় তাঁর নিজ গীত। তাই সে বলে ওঠে, দাঠাকুর, এবার ঘরে চলো। আর চলতে চলতে একখানা গান বলো দিকিনি।

—গান! হঠাৎ এ কথা বললি কেন?

—তোমার এই গোমড়া না আমড়া মুখ আমার আর সইছে না। থাকে থাকে কি যে হয় তোমার।

রামপ্রসাদ আড় নয়নে ভজহরিকে দেখেন। দেখেন আর মিটি মিটি কৌতুকি হাসেন। তাঁর দীর্ঘ গৌরবর্ণিত আড়ার শোভা কুঞ্চিত বাবরি আর সদ্য ক্ষৌরি করা ঝকঝকে যুবা মুখমণ্ডলে হাঁড়ার সামান্য দীপ আলোক চমকায় করে। ঘাম তেল মাখানো মাটির দেবমূর্তির অকলঙ্ক শোভা নাগাড়ে পানের কারণে সে মুখে অনলে অনল এঁকে দেয়।

ভজহরি বুঝতে পারে তার মণিব সখাটির মন ভিজল এই সামান্য দু'কথার তাড়সে। সে আরও খানিক উসকে দিয়ে বলে, ধরো ধরো। তাড়াতাড়ি গান ধরো না দাদাঠাকুর।

রামপ্রসাদ ঘর মুখে চলতে চলতে গান ধরেন,

আমার কপাল গো তারা
ভাল নয় মা, ভাল নয় মা,
ভাল নয় মা, কোন কালে।।
শিশুকালে পিতা মলো,
মাগো রাজ্য নিল পরে,
আমি অতি অল্পমতি ভাসালে সাগরের জলে।।

ভজহরি চলতে চলতে, পাশাপাশি যেতে যেতে মাথা নাড়ে মহা সমঝদারিতে। পথ না বুনো বিপথের দু-পাশে কোথাও ঠাসবুনট কোথাও আলগা আলগা হরেক গাছেরা সে

পাষাণ মূর্তির অঙ্গে নতুন বেনারসী। মাথায় সোনার মুকুট। গলায় সোনার রত্ন হার আর রক্তজবার মালা। চার হাতে শাঁখা-পলা-নোয়া আর মকরমুখী বালা। পদতলে শিবের মাথায় টাটকা বিল্বপত্র। বেদীর সুমুখে আসনে বসে কোমর নত অতিবৃদ্ধ পুরোহিত পান্তা ভট্টাচার্য। পাশে তন্ত্রধারক তাঁর বড় ছেলে—রিটায়ার্ড রেলকর্মচারী। হেঁট কোমর যথাসম্ভব টেনে তুলে পান্তা ভট্টাচার্য প্রাণায়াম, ঋষ্যাদি ন্যাস আর ষড়ঙ্গ ন্যাস করে এবার কুল্লুকা জপ আরম্ভ করলেন। পাশে রাখা আছে দাউ দাউ জ্বলন্ত পঞ্চপ্রদীপ। বাবার এই সব আচার কর্মের একপাশে ছেলে ফুল-জল এগিয়ে দিচ্ছে। ওধারে আমাদের হরপণ্ডিত মশাই পূজার ঘরের এক কোণে বসে পক্ক বাবরি আর দাড়ি নেড়ে মাইকে তারস্বরে চণ্ডীপাঠ করে চলেছেন, বৈষ্ণবী সমরে চৈনং চক্রেণাভিজঘান হ, গদয়া তাড়য়ামাস ঐন্দ্রী তমসুরেশ্বরম্...। পান্তা পুরুতের ডান পাশে চালকুমড়ো, আখ, কলা বলির জন্য রাখা। আর একখানা তামার বড় থালায় চোখ আঁকা খড়গ। পুরুত মশাই পূজা করতে করতে পাশে তামার গ্লাসে রাখা নারিকেলের জলে চুমুক দিচ্ছেন। আসলে নাকি তাম্রপাত্রে নারিকেল বারি রাখলে সেটি কারণ হয়ে যায়। তন্ত্রমতে কালীপূজায় যেহেতু ওটি লাগে তাই অনভ্যাসীদের সেটি ওইভাবে ব্যবহারের নাকি বিধান আছে।

পান্তা ভট্টাচার্য প্রাণায়ামাদি সারছেন। তামার গ্লাসে রাখা শাস্ত্রীয় কারণে থেকে থেকে চুমুক দিচ্ছেন। আর ওদিকে মায়ের ভোগের ঘরের পাশের জমিতে ম্যারাপ বেঁধে মস্ত মস্ত কাঠের জ্বাল দেওয়া উনুনে কড়াইয়ে ডগমগিয়ে খিচুড়ি নৃত্য করছে। মায়া পিসি, জ্যোৎস্নাদিরা বঁটি পেতে রাশীকৃত আলু, বেগুন ইত্যাদি ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ কুটে চলেছে। ওদিকে গোয়ালা এসে প্রকাণ্ড সব টিনের নৌকায় দুধ ঢালছে তো ঢালছেই।

নরনারায়ণ, মূল ঠাকুর ওড়িশার মানুষ পূর্ণ ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে নেড়ে বোঝাচ্ছেন রাত ক'টা অবধি ভোগের স্লিপ কাটা হবে। মোট খবর অনুযায়ী কেমন করে, কত সময়ের মধ্যে মেটে সরাগুলো সাজাতে হবে। বাবার পরনে আজ ধুতি-গেঞ্জি, কাঁধে গামছা! কোঁচাটি পেটের কাছে তুলে গোঁজা। খালি পা।

পান্তা ভট্টাচার্য নিয়ম রক্ষা করতে তামার গ্লাসে নারিকেল বারি পান করছেন। আর নরনারায়ণ তাঁর জিন-এর নিয়মে কেবলই ভোগের ঘর ছেড়ে বাইরে পঞ্চবটির পেছনে চলে যাচ্ছেন। গেঁজে থেকে বার করে রামের বোতল গলায় ঢালছেন খানিক। তারপর টেনে নস্যি নিয়ে আবার যথাস্থানে।

পাঁচ

অনেকে মজা করে হীরেন জ্যাঠামশাইকে এনশিয়েন্ট হিস্ট্রি বলে। আর আমাদের হালিসহর হাইস্কুলের বাংলার মাস্টারমশাই তপনবাবু স্যারকে মডার্ন হিস্ট্রি বলে। দু'জনের মধ্যে বয়স আর কাজ কর্মে বিস্তর তফাৎ। দু'জনেই আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা করেন। টুকটাক প্রবন্ধটবন্ধ লেখেন এধার ওধার।

জ্যাঠামশাই সভাসমিতিতে বিশেষ নেই। আর তপনবাবু কলকাতা থেকে লেখক বা অন্যান্য গুণীজন পাকড়ে এনে প্রায়ই রামপ্রসাদের ভিটেয় সভা বসান। এ সব করতে

করতেই কলকাতার এক বাংলা কাগজের স্থানীয় সংবাদদাতা। আর একই সঙ্গে প্রফুল্ল সেন সিদ্ধার্থ রায়ের পশ্চিমবঙ্গে দোর্দন্ড কংগ্রেসী নেতা। পরের ধাপে, ধরে আন, পেড়ে ফেল, পুঁতে ফেল বাহিনীর কর্তা।

জ্যাঠামশাই রিটায়ারমেন্টের পব ধুতি পাঞ্জাবি পরে মাথায় ছাতা আর এক হাতে চটের থলি বোঝাই খাতাপত্র নিয়ে পথে নামলেন। রোজ সকালবেলা তাঁর এই পরিব্রাজন আরম্ভ হত। থামতেন বেলা দুপুরে। বাড়ি বাড়ি ঘুরে, পুরোটাই নিজের উদ্যোগে যোগাড় করতে লাগলেন হালিসহরের প্রতিটি বাড়ির পরিচয়। কোথা থেকে এলেন তাঁরা, ক-পুরুষ এখানে আছেন ইত্যাদি। দলিল দস্তাবেজ বা পুরনো কাগজপত্র সব খুঁটে খুঁটে দেখতেন। সব খবর থলে বোঝাই খাতায় লিখে রাখতেন। সেই পরিশ্রমের ফল ফলল নিজের অর্থে অতি সযত্নে লোকাল প্রেসে ছাপা বই 'হালিসহরের মানুষ।'

একেবারে শুরুতেই জ্যাঠামশাই লিখছেন, 'দিল্লির আফগান সম্রাট 'শের শাহ' (১৪৭২-১৫৪৫), বাঙ্গালার শাসনকর্তা খিজির খানকে পরাস্ত করিবার পর, শাসন ব্যবস্থায় সুবিধার জন্য সমগ্র বঙ্গদেশকে সাতচল্লিশটি 'সরকারে' এবং প্রত্যেক সরকারকে কয়েকটি 'পরগণায়' বিভক্ত করেন। এইরূপ সাতগাঁ সরকারের অধীনে 'হাবেলীসহর' একটি পরগণা। হাবেলিসহর পরগণার অন্তর্গত কুমারহট্ট গ্রাম এই হালিসহর। হাবেলী অর্থে অট্টালিকা; পরগণার অন্তর্গত সকল গ্রামের মধ্যে কুমারহট্টই সর্বাপেক্ষা হাবেলীসমৃদ্ধ গ্রাম ছিল বলিয়া কুমারহট্টই এখন হালিসহর। হালিসহর কলিকাতা হইতে প্রায় ত্রিশ মাইল উত্তর দিকে ভাগীরথী নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত। পৃথিবীর মানচিত্রে ইহার অবস্থান ২২°৫৬´/উত্তর ৮৮°২৯´ পূর্ব।

হীরেন জ্যাঠামশাই তথ্য সংগ্রহে আমাদের বাড়ি এসে দুপুরে বার রোয়াক থেকে আমার ছোট ভাইয়ের নাম করে ডাকছেন, মলয়, মলয় আছ।

আমার মা যুবতী বয়েস থেকেই বাড়িতে খড়ম পরত। আর পরতেন দাদু। ডাক শুনে মা খড়ম খটখটিয়ে এসে দোর খুলতে জ্যাঠামশাইয়ের নির্লিপ্ত মুখ, আমি এমন মিঠে করে ডাকছি—মলয়, মলয়, আর বউমা যদি খড়ম খটখটিয়ে এসে দোর খোলেন তাহলে কেমন লাগে বলুন দিকিনি।

সকাল বেলা সাইকেলে যাচ্ছি। জ্যাঠামশাই তিনতলা বাড়ির বার বারান্দায় বসে আছেন। আমি নেমে গিয়ে কথা বলি, কেমন আছেন জ্যাঠামশাই?

ম্লান হেসে কাসতে কাসতে জবাব দেন, আর বাবা, বার্ধক্যের বারাণসী। রাত ভোর ঘুমোতে পারিনে।

মানেটা অনেক পরে ধরতে পেরেছি। বারাণসীর ডাক নাম তো কাশী। সেখান থেকে এসে মিলল কাসিতে।

আসলে আমাদের এই জ্যাঠামশাইয়ের দৌলতে হালিসহরের অনেক অতীত খবরপত্র পাওয়া যায়। একদিন বলে বসলেন, এককালে হালিসহর ছিল মদের ভাটিখানার জন্যে নামজাদা। প্রায় ঘরে ঘরে মাতাল। আর ঠাক্‌মা বলতেন সন্ধেবেলা মাঠ থেকে গরুগুলো পর্যন্ত ঢুলতে ঢুলতে বাড়ি আসত।

এবার আর এক মাতালে গপ্পো। কে জানে একে মিথ বলা যায় কি না। একবার

আমাদের চৌধুরীপাড়ারই কালোয়াতি গায়ক যতীন মুখুজ্যে এক বন্ধু পুত্রের বিয়েতে নৌকো করে ওপার বাঁশবেড়িয়ায় বরযাত্র গেলেন। বিশাল দল। আর সবাই টলোমলো। সে যা হোক, পান ভোজন সেরে মাতালের দল তো প্রায় মাঝরাতে নৌকোয় এসে জমল। মাঝিরাও চুরচুর। দুগ্গা দুগ্গা বলে নৌকো তো ছাড়ল। যাত্রীরা হই হল্লা, খেউড় গান, টপ্পা—কেউ বা রামপেসাদী। বাঁশবেড়ে থেকে নৌকো চলে ঠিক উল্টো দিকের হালিসহর মুখো। একটু আড়াআড়ি। চলেছে তো চলেছে। ছপাত্ ছপ্ দাঁড় বাইছে মাঝি। একজনা তটস্থ হাল ধরে বসে আছে তো আছেই। গান হচ্ছে, হুল্লোড় হচ্ছে। সময় এগোচ্ছে। মাঝরাত টাল খাচ্ছে। কিন্তু ওপার যে আর আসে না। সবাই রাগে নিজেদেরই দুষতে লাগল। এত মদ মানুষে খায়। এই করতে করতে একসময় আকাশ পরিষ্কার হই হই। তাতেও চেতন হয় না—আমরা তাহলে যাচ্ছি কোথা। ওই তো, ওপার হালিসহরের গ্যাসবাতিগুলো এখনও যে দেখা যাচ্ছে। বলি হলটা কী। কি হল মাঝি? মাঝি আর হালধারীও নিবু নিবু চোখে বলে—তাই তো। আরও জোরে জোরে দাঁড় বায়। অবশেষে প্রভাত থেকে পরিস্কার দিনমান হয়। স্পষ্ট রোদে জলস্থল জেগে ওঠে। আর তখনই সকলের চোখে পড়ে যেখানকার নৌকো সেখানেই আছে। খোঁটা থেকে কাছি দড়িটাই খোলা হয়নি।

১৯১০ সালের বেঙ্গল ডিসট্রিক্ট গেজেটিয়ার—নদীয়াতে, আই সি এস গ্যারেট সাহেব লিখছেন, 'As Guptapara is noted for its monkeys, Halisahar for its drunkards...।'

জ্যাঠামশাই আর পাঁচজনের মতন আমার দাদুকে মাস্টারমশাই বলেন। দাদুর কাছে আসেন, বসেন। নানান আলোচনা হয়। আমি পাশ থেকে শুনি হালিসহরের পুরাবৃত্ত। এখানকার টোল-চতুস্পাঠির কথা। শাক্ত-বৈষ্ণবের এক ঠাঁইয়ে বসবাস কাহিনি। সেখান থেকে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ছটা। আমাদের হালিসহরের চৈতন্য ডোবার কাহিনি। সেখানে তাঁর গুরু ঈশ্বরপুরীর পাট। ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্য প্রয়াত গুরুর ভিটা দর্শনে এসেছিলেন সদলবলে। জ্যাঠামশাই তাঁর সুরেলা গলায় নিচু স্বরে আউড়ে যান, 'প্রভু বোলে কুমার হট্টেরে নমস্কার। শ্রীঈশ্বরপুরী যে গ্রামে অবতার।।'

কিন্তু এই সব ছাপিয়ে বারে বারেই উঠে এসেছে রামপ্রসাদী প্রসঙ্গ। সে সময়ের হালিসহর। অযোধ্যানাথ বা আজু গোস্বামীর ভগ্ন ভিটার হদিস তিনিই দেন। শিবের গলির এক তস্যগলির ভেতরে অযোধ্যানাথের পোড়ো ভিটে আর সেই বিলম্বী গাছ। টক টক স্বাদু ওই ফল ছেলেপুলেদের প্রিয়। সে সময়ে হালিসহর ম্যালেরিয়ার দাপটে অস্থির। হীরেন্দ্রনাথ আর বন্ধুরা বিলম্বি ফল পাড়তে গেলে ওই পোড়োর ভেতর থেকে 'গোঁসাই গিন্নী' নামে এক রাগী বুড়ি তাড়া দিতেন। ছেলেরা দৌড়ে আখড়াবাড়ির ঢিপি পার হয়ে পালাত।

লীলাকীর্তন ফুরলে এবার মূল পূজা আরম্ভ। মন্দিরের ললাটে লেখা 'প্রসাদময়ী জগদীশ্বরী'। প্রসাদের আমলের বাইরে এই এখনটিতে আসামের এক ভক্ত স্বপ্ন পেয়ে ভিটায় পাথুরে কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৫৭ সালের ২৬ জানুয়ারি। সেই থেকে ফি বছর এখানে অন্নকূট উৎসব হয় ওইদিন। সে যাই হোক, পালা থামলে বাইরে সুনসান

এত মানুষ সত্ত্বেও। সবাই প্রায় চুপ করে। পঞ্চবটির দিকটা প্রদীপ নিবু নিবু নিঝুম। অদূরের বাড়ি বাড়ি দীপাবলীর মোমবাতি ও দীপমালা। কারও বাড়ি টুনি ল্যাম্প। দূরে কাছে প্রচণ্ড শব্দে বাজী ফাটছে। আকাশে হাউই খেলছে। রাস্তায় পথিকের পেছনে ছুঁচোবাজী। রাস্তা দিয়ে প্যাঁকর প্যাঁক রিকশো যাচ্ছে। মাতালেরা মহা উল্লাসে হইরই করছে। হালিসহরের জনগণ সারারাত্রব্যাপী কালিপূজা দেখতে বেরিয়েছে মহাশ্মশান, রামপ্রসাদ ভিটা।

ওদিকে ভোগের ঘরে তুমুল ভোগ রন্ধন চলছে। বিপুল শব্দে সম্বার পড়ছে পূর্ণ ঠাকুরের হাতে। ওই সম্বারটাই নাকি খিচুড়ি রান্নার আসল তুক। সেটি যে পারে তার নাম পূর্ণ ঠাকুর। নরনারায়ণ ঘন ঘন পঞ্চবটির পেছনে যাচ্ছেন ও ফিরে আসছেন। উনুনের গণগনে আগুনে তাঁর তামাটে মুখমণ্ডল লালচে আকার ধারণ করছে। উনুনে থেকে থেকে বিকট শব্দে কাঠের গাঁট ফাটছে। বাবা কারণ আনন্দে সুর করে বলে উঠছে, এবার কালী তোমায় খাবো।

পূর্ণ ঠাকুরের মতন যারা বাবার কার্য আর কারণ জানে তারা কিছু না বলে মিচ্‌কি হাসছে। অজানাগণ অবাক হয়ে দেখছে। তারা ঠিক ধরতে পারছে না এই ঘন ঘন পুলকের কারণ কি।

ভোগ নামে ভোরবেলা। বাবার দায়িত্ব এখনকার মতন শেষ। তাই সিধে বাড়ি। মা উঠে দোর খুলে দেয়। চা করে দেয় বড় এক কাচের গ্লাস। মশারি খাটানোই ছিল। বাবা বাঁ নাকে দীর্ঘ নস্যি নিয়ে পাশবালিস সাপটে শুয়ে পড়েন। একটু পরেই তাঁর নাক ডাক ছাড়ে।

সকালবেলা বাবা মন্দিরে যাবার আগে মা কেবল বলেছিল, দুটো মায়ের ভোগ পাঠিয়ে দিও না।

বাবার গম্ভীর জবাব, সম্ভব নয়।

—কেন! পয়সা দিয়ে নেবো। ভোগের টিকিট কাটলে তো যে কেউ পায়।

—এটা তো যে কেউর বাড়ি নয়। প্রেসিডেন্টের বাড়ি। লোকে বলবে ওনার বাড়ি ফ্রিতে ভোগ যাচ্ছে।

—কেন টিকিট কাটবো তো।

—টিকিট কাটলেও। পাঁচজনে জানবে কি করে।

—ভেবেছিলাম আজ একটু ভোগ খাবো।

—এককাজ করো। বাড়িতে গোবিন্দভোগ চালের খিচুড়ি রেঁধে তাতে দুটো তুলসী পাতা ফেলে দাও। বাস্—ভোগ হয়ে যাবে।

বড়মা ঘরের কানাচ থেকে বলেন, ওরে পাষণ্ড কালীপুজোয় তুলসী নয়। বিল্বিপত্তর বল্।

নিধিরাম সেন সেনজ রামপ্রসাদের বৈমাত্রেয় অগ্রজ হলেও সম্পর্কটি রক্তের বাইরে বাইরে নয়। প্রসাদ অগ্রজকে মান্য করেন। অগ্রজও যথার্থ স্নেহ-বশত ভাইয়ের খবর করেন প্রায়ই।

নিধিরাম উঠানে নেমে দাঁড়িয়েছেন—প্রসাদের সুমুখে। ভজহরি হাতে ধরা হেঁড়ো আলোখানি একপাশে নামিয়ে রেখে নিধিরামকে একটি পেন্নাম ঠুকে দ্রুত স্থান ত্যাগ করে।

রামপ্রসাদ হেঁট হয়ে দাদার পায়ে হাত ছোঁয়ান। নিধিরাম তাঁর মাথায় হাত রাখেন। প্রসাদ সেই অবসরে শত সহস্রবার মনে করা উপমাটি মনে মনে ঝালিয়ে নেন। না নিয়ে পারা যায় না। নিধিরাম সেন ভিষক-বৈদ্য, বাবা রামরাম সেনের বৃত্তিধারী। আর তাঁর চেহারাটিও পিতৃদেব ছেনে বসানো। যেন মৃত পিতা এসে দাঁড়িয়েছেন প্রসাদের সঙ্গে কথা কইবেন বলে। এখানে—এই কবিরাজ বংশে রামপ্রসাদই একমাত্র বৃত্তিছাড়া মহাপাষণ্ড।

রামপ্রসাদ বলেন, কখন আসা হল দাদা? সব কুশল তো?

নিধিরাম অস্পষ্ট হাসেন, সব কুশল কি করে বলি প্রসাদ।

—কেন দাদা! একথা কেন!

একটুক্ষণ বিরাম। এক ফোঁটা দীর্ঘশ্বাস। তারপর নিধিরাম কথা বলেন, সব কুশল তো তোকে বাদ দিয়ে নয় প্রসাদ।

রামপ্রসাদের সিন্দুর আঁকা কপাল মধ্যে কুঞ্চন। হেঁড়ো প্রদীপটির এলে পড়া আলোয় সেখানে বিজাতীয় রক্ত আখর। পান রসাক্ত দু-চোখে ছলছল উৎকণ্ঠা।

—কি হল দাদা! এমন করে কথা কইছ কেন!

নিধিরাম ম্লান হেসেও হাসেন না। সে কথা কি তোকে সমঝাতে হবে! এত লেখা পড়া—আরবি, ফার্সী, সংস্কৃত শিক্ষা করার ফল এই।

—কি ফল দাদা?

—তাছাড়া কলকাতার নবরঙ্গকুলাধিপতি দুর্গাচরণ মিত্র মহাশয়ের কাছারিতে অমন মুহুরির কাজটা ছেড়ে চলে এলি। সেও তো আজকের কথা নয়।

—হ্যাঁ দাদা, তখন সবে বাবা গত হয়েছেন। সংসারে অভাব। জোতজমাও এমন কিছু নেই যে তাই দিয়ে সংসার নির্বাহ হয়।

—কিন্তু বাবা চেয়েছিলেন তুই পূর্বপুরুষের বংশবিদ্যে কবিরাজী নিয়ে থাকিস।

—কবিরাজ না হোক্ কবি তো হয়েছি দাদা। পাঁচজনে সে কথা বলে।

—মিত্তির মশাই তো মাসিক ত্রিশ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করেছেন।

—হ্যাঁ দাদা, হিসাবের খাতায় গণেশের বদলে শ্রীশ্রী দুর্গানাম লিখেছিলাম। আর একদিন দেহে কিরকম উন্মাদনা হল। আমি তো জানি না দাদা কেন হল, কেমন করে হল। তবে ওই জমাবন্দী খাতায় একখানি গীত লেখা হয়ে গেল।

—জানি প্রসাদ। সেই তোর প্রথম গান রচনা। আমায় দেও মা তবিলদারী। আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী। পদরত্ন ভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি। ভাঁড়ার জিম্মা আছে যার, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি।

রামপ্রসাদ কতক আত্মগত স্বরে বলেন, হ্যাঁ দাদা, গীতখানির শেষে ছিল, প্রসাদ বলে এমন পদের বালাই লো' য় আমি মরি। ও পদের মত, পদ পাই তো, সে পদ লোয়ে বিপদ সারি। কিন্তু দাদা, তহবিলদার খাতা নিয়ে মিত্তির মশাইকে দেখিয়ে বললে, একটা পাগল মাতালকে খাতা সারতে দিয়ে কি সর্বনাশ করেছেন। এমন সুন্দর পাকা খাতাখানা একেবারে নষ্ট করে সেরেছে।

—হ্যাঁ প্রসাদ, আর মিত্তিরমশাই সে খাতা দেখে কেঁদে আকুল। তিনি বললেন, এ বেক্তি তো পাকা খাতায় পাকা কর্মই করেছে। তারপর মাসিক ত্রিশ টাকা বৃত্তি ধার্য করে তোকে কর্ম থেকে খালাস দিলেন।

—হ্যাঁ দাদা, আমি প্রতিদিন সেই অন্নদাতা মানুষটির কথা স্মরণ করি। আমি তো নিমকহারাম নই দাদা।

—তাছাড়া রাজা কেষ্টচন্দরও তো কিছু ভূমিদান করেছেন।

—হ্যাঁ। মহারাজ আমায় তাঁর সভাসদ করতে চেয়েছিলেন। কিছু মাসিক বৃত্তি দিতে চেয়েছিলেন। তা আমি তো দাদা কোথাও বাঁধা থাকতে পারিনে।

—ছেলেকাল থেকেই যে বুনোবাদাড়ে স্বভাব। সংসার হল. ছেলেপুলে হল। কিন্তু মনে মনে সেই বনেই রয়ে গেলি তুই। রাজার সভার খাতির সম্মান কে না চায়। এই তো, মূলাযোড়ের ভারতচন্দ্র রায় তো দিব্যি সেটি লুফে নিয়ে সভা হাকিয়ে বসেছেন। দেশের রাজার পাশে পাশে থাকা মানে তো গোটা দেশের মানুষকে পাশে পাওয়া।

—ভারত রায় ভারী রসের মানুষ দাদা। কিন্তু আমি তো মহারাজকে অসম্মান করিনি। আমি তাঁর সভাপদ বা বৃত্তি না নিলেও ভূসম্পত্তি তো গ্রহণ করেছি।

—হ্যাঁ, একশো বিঘা নিস্কর জমি। সে ভারী কম নয়।

—কিন্তু সে সব জমি কিছু পাঁচভূতে লুটেপুটে খাচ্ছে। বাদবাকি পতিত হয়ে পড়ে আছে। বচ্ছরকার চালটুকুও বুঝি কোনওমতে হয় না।

—তার দায় কার শুনি।

রামপ্রসাদ মাথা হেঁট করেন। —আমারই। আমিই দোষী দাদা।

—কিন্তু সংসার তো সে কথা মানতে চাইবে না। তার উপর তোর ঘরে এসো বসো লেগেই আছে। রোজই অতিথি সৎকার।

—মার মন্দিরে পূজা দিতে এলে দুটো প্রসাদ না পেয়ে কি কেউ যায়! কত দূরে দূরান্ত থেকে মানুষ আসে। কেউ কেউ আবার আমার গান শুনে শ্রবণ দক্ষিণাও দিয়ে যায়।

—কিন্তু শুনতে তো অনেক। চোখে দেখতে পাওয়া যায় না।

প্রসাদ এবার সিধে চোখ রাখেন অগ্রজের চোখে। ঘরের আলো আঁধারিও দেখে নেন। তারপর গলা নামিয়ে বলে ওঠেন, এ বিষয়ে তোমার বৌমা কিছু বলেছে বুঝি।

নিধিরামও প্রসাদের চোখে দৃঢ় চোখ স্থাপন করেন, নিজের পরিবারকে চিনিস্ না তুই! সে কিছু মুখ ফুটে বলবার মেয়ে!

—তাহলে!

—সবাই জানে। পাড়াপড়শী সকলেই জানে তোর সংসারের হাল। আর আমি এমন কিছু তফাতে থাকি না। এ পাড়া সে পাড়া।

রামপ্রসাদ বিড়বিড় করেন, এ পাড়া, সে পাড়া।

—বড় কন্যে জগদীশ্বরীর বে-থা হয়েছে। এখনও একটি বাকি।

—পরমেশ্বরী। আমার কোলের মা।

—তাহলে এত সব দায় নিয়ে কি করে উতরোবি সে কথা কি একটিবারও ভাবিস্ প্রসাদ!

রামপ্রসাদ হাসেন, আমার আবার ভাবনা কিসে দাদা। ভাবনা বলে বস্তুটাই জানা নেই। তবে হ্যাঁ, একটি ভাবনা আমায় দিবানিশি অতিষ্ঠ করছে।

—কি সে ভাবনা শুনি।

—ওই যে, পঞ্চমুণ্ডির আসনটি। সাবর্ণ রায়চৌধুরী দিগরের সম্পত্তি ওটি। ওঁদের বংশেরই এক বীরাচারী রামকৃষ্ণ রায়চৌধুরী ওটি পিতিষ্টে করেছিলেন। আমি যে বছর জন্মেছিলাম তার ঠিক আটষট্টি আগে তাঁর জন্ম। কিছুকাল আগে তিনি দেহ রক্ষে করেছেন। তাহলে দাদা, এখনও ওই সিদ্ধপীঠ শীতল হয়নি।

—তারপর?

—তারপর দাদা, নিজের চোখেই তো দেখেছো, স্থানটি এখনও বুনো জাঙলায় ঢাকা। দিনমানেও ওদিকে যেতে মানুষ ভয় পায়।

—হুঁ।

—ও বাড়ির লোকেরা আমায় কথাও দিয়েছিলেন ওটি দানপত্তর করে দেবেন বলে। কিন্তু আজও সেটি হয়ে উঠল না। এখানকার পণ্ডিত সমাজের আপত্তি। আর তাঁদের মূল পাণ্ডা হলেন পণ্ডিত বলরাম তর্কভূষণ। নৈয়ায়িক তার্কিক মানুষ তো।

—কেন? আপত্তি কেন?

—কেন আবার, তাঁর বাড়ির নিকটে একটা মাতালের আখড়া হবে। আরও পাঁচটি মাতাল এসে জুটবে। ফলে ভদ্দর মানুষদের অসুবিধে হবে।

—কিন্তু এত কথা উঠত না যদি তুই কৌলিক ব্যবসা শিখতিস। আয়ুর্বেদ বিদ্যেটা রপ্ত করতিস। যে ছেলে শুধু সংস্কৃত নয় যবনভাষাও জেনে বুঝে বসে আছে, তার কাছে এ তো নস্যি।

—কিন্তু দাদা, ওই সিদ্ধাসনে বসা তো নস্যি নয়।

কথা চলতে চলতে দুই ভাই ঘরের দাওয়ায় উঠে পড়েন। আর অমনি ছোটোখাটো কচি শোর পড়ে যায়। ছেলেমেয়ে পরমেশ্বরী আর রামদুলাল দুদ্দাড় ঘর হতে বেরিয়ে আসে। দুটি ভাইবোন পিতৃসঙ্গ থেকে প্রায়ই বঞ্চিত, ফলে কাছে পেলে তারা উত্তাপ চায়। যেহেতু ছেলে রামদুলাল কন্যার চেয়ে কিছু বড় তাই তার উল্লাস প্রকাশ খানিক সাব্যস্ত। সে এসে শুধু বাবার বাম হাতের উপর দিকটি ধরে দাঁড়ায়। আর মেয়ে লাফ দিয়ে দিয়ে বাবার গলা জাপটে ধরতে চায়। প্রসাদ হাসতে হাসতে বলেন, রোসো মা, রোসো মা। অমন কল্লে আমি পড়ে যাব যে।

হেঁশেল থেকে ঘোমটাবতী সর্বানী এসে হাত মুখ ধোয়ার গাড়ু আর গামছা রেখে যায়। যাওয়ার সময় সে পরমেশ্বরীর হাতে ধরে টান দিলে প্রসাদ বাধা দিয়ে বলেন, থাক্ না, থাক্ না। মায়ে-পোয়ে বলে কতক্ষণ পর সাক্ষেৎ হল।

মা সিদ্ধেশ্বরী প্রসাদের মতন গৌর অঙ্গ না হয়ে বুঝি তাঁর নিজের পিতৃ-মাতৃধারায় চাপা রঙা। মাথার চুলে কোঁচকানো ধাত রইলেও কোথাও একটু সারল্য। আর বেশিরভাগই দুধ ঢালা। প্রায় নিদন্ত মুখ জোড়া হাসি।

কি ভাগ্যি আমার। জোড়া ছেলেকে এক ঠাঁয়ে বলে কতদিন পরে পেলুম। বলি অ বৌমা, আমার পুত্তুরদের কি সেবা করাবি আজ?

তারপর সিদ্ধেশ্বরী গলা নিচু করেন, বলে তো দিলুম। ভাঁড়ার তো সব সময়েই বাড়ন্ত।

এই কথাটুকু দু-ভাইয়েরই কানে যায়। প্রসাদ কতক দণ্ড পাওয়া আসামীর ধারায় পরমেশ্বরীকে কোলে তুলে নিয়ে তার মুখে চুমো দেন। চুমো দেন আর বলে চলেন, মা মা, মাগো।

পাশ থেকে নিধিরাম বলে ওঠেন, আজ বরং মাড় ভাত হোক্ না। তুমি তো জানো মা, আমি ওটি কত ভালোবাসি। সঙ্গে একটু আলু-বেগুন ভাতে। তোমার উঠোনে দিব্য বেগুন হয়েছে মা। মুক্তকেশী বেগুন।

রামপ্রসাদ মেয়ের কানের কাছে গুন গুন করে ওঠেন, মুক্ত কর মা মুক্তকেশী, ভবে যন্ত্রণা পাই দিবানিশি—

পুত্র হাসে, বেগুন থেকে গান বল্লে বাবা।

প্রসাদ গান থামিয়ে বলেন, গান তো পথে ঘাটে. ভূমগুলে ছড়ানো আছে বাবা।

ছয়

বলরাম আড়াল করে বলা ফেনচাটা তার নামটি হলেও আদপে সে রসিক মহাজন। সে একজন নামজাদা কীর্তনওয়ালা বটে। নিবাস হালিসহর-কুমারহট্টে। প্রায় সারা বছর ভরই সে সারা বাংলা চষে বেড়ায় কীর্তন গেয়ে। এমনই চাষকার্য মোতাবেক তার একদিন বায়না পড়ল মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায়। বলা রাজার ধাত বুঝে বিস্তর দণ্ডপাতাদির পর গান ধরল। তার স্বদেশী গান, প্রসাদী কালীকীর্তন।

শ্রীশ্রী কালীকীর্তনের মুখবন্ধ হল—'ভবজলধি-নিমগ্ন-রুগ্ণ জনগণ-বিমোচন-করণ-কাবণ ভুবন-পালিকা কালিকার গোষ্ঠাদি লীলা বর্ণন।'

গলবস্ত্র বলা ফেনচাটা কীর্তন সভায় করজোড়ে দণ্ডায়মান। দু'ধারে শ্রীখোল, তবল, বেহালা, বাঁশি, মন্দিরা। সঙ্গে জনা কয় দোহার। সভা[illegible] স্বয়ং মহারাজা। সভাপূর্ণ পণ্ডিত, রসিকজন, তোষামোদী ও অন্য পরিজনে।

বলা কণ্ঠ ছাড়ল বাদ্য অনুষঙ্গের পাশাপাশি। আরম্ভ হল 'মায়ের বাল্যলীলা।'

বন্দে শ্রীগুরুদেবকি চরণম্।
অন্ধ পুট খোলে ধ্বন্ধ সব হরণম্।।
জ্ঞানাঞ্জন দেহি অন্ধকি নয়নম্।
বল্লভ নাম শুনায়ত কারণম্।।
কেবল করুণাময় গুরু ভবসিন্ধুতারণম্।
তপন-তনয়-ভয়-বারণ-কারণম্।।
সুচারু চরণদ্বয় হৃদে করি ধারণম্।
প্রসাদ কহিছে হয় মবণের মরণম্।।

গান পথ দেখেছিল রাত্রির প্রথম প্রহরে। যখন সমাপনে পৌছাল, তখন তো নিশা

অবসান। সকাল বেলাকার প্রসন্ন রোদ, অলিন্দে অলিন্দে গোলা পায়রার বকবকম্, নহবতখানায় সানাই-এর মুখপাত, এমনই আবহ।

সভাপূর্ণ তাবৎ মানুষের মন বিমোহিত অবস্থার তুঙ্গে। কোথা দিয়ে যে পার হল সদ্য রাতটি। রাত্রি কি দিন এই সব বাখানের দুস্তর বাইরে এই বিগত সময়াবলী। সকলেই নিজ নিজ কপালে চাঁদের আলো দেখছে, এই সকালে, কীর্তনের একটুকরো আখর ধারণ করে।

গান ফুরিয়েছে। আত্মগত আর শ্রান্ত বলা ফেনচাটা উত্তরিয়ে কপালের শ্রমজল মুছে সকলকে নমস্কার করে আসনে বসেছে। সভাময় নিস্তব্ধ মুগ্ধতা ছাড়া আর কোনও উল্লাস নেই। মহারাজ শান্ত কণ্ঠক্ষেপে বলে উঠলেন, বলরাম! এতদিন তোমার নাম ফেনচাটা ছিল, এই ক্ষণে আমি তোমার নাম মধুচাটা রাখলাম।

বলরাম আভূমি প্রণিপাত পূর্বক বলল, মহারাজ, আমি কৃতার্থ হলাম। কিন্তু আক্ষেপ এই যে, আপনি রাজাধিরাজ হয়ে আমার ফেন ঘুচিয়ে দিলেন, চাটা টুকু ঘোচাতে পারলেন না।

সুররসিক ও গুণদর্শী রাজা বলরামকে যথোপযুক্ত পারিতোষিক প্রদান করলেন। এবং তারপর রাজার প্রকৃত উদ্‌যোগ পর্ব আরম্ভ হল। বলরামের কণ্ঠ ধরেই তিনি সেনজ রামপ্রসাদের তালাশপত্র করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি প্রসাদের কাছে দূত পাঠালেন একটিমাত্র বাসনায়, কবি তাঁর অধীনস্থ রাজসভার বাস্তব সদস্য হোন এবং নিরন্তর রাজসঙ্গে থাকুন। কিন্তু যে মানুষের গলে উড়োপাখির বুনো মালা পরানো আছে জন্ম ইস্তক, সে কি অন্য কারও অধস্তন নিগড়ে বাঁধা রইতে পারে। তার উপর রামপ্রসাদ বিষয় বাসনা থেকে বহু দূরে। তাঁর একমাত্র আসক্তি কবিতা ও কালীকায়। এই দুয়ের কে যে কার পরিপূরক সে রহস্য স্বয়ং প্রসাদেরও অগম। অতএব বুঝি রাজার গুণপিপাসার টানেই দু'জনার মধ্যে সেতু বাঁধা হল। হালিসহর-কুমারহট্টে নদীয়াপতির যে সুরম্য কাছারিবাড়ি আছে সেখানে যখনই তিনি বিষয়কর্মে আসেন তখনই ডাক পড়ে কবির। কখনও বা সেই সঙ্গে আজব ক্ষেপা অযোধ্যানাথ গোস্বামীরও। রাজা শাক্ত ও বৈষ্ণবের মুখোমুখি গীতসমর উপভোগ করেন। সে ভারী রমণীয় যুদ্ধ।

কিন্তু এমন যে সম্পর্ক, সেখানে অতি সামান্যে চিড় ধরতে পারে এক কথা সর্বানী বুঝেছে। আজ সকালে কৃষ্ণনগর থেকে রাজার লোক এসেছিল বাজপেয়ী যজ্ঞে রামপ্রসাদকে নিমন্ত্রণ করতে। তার হাতে ছিল রাজার সীলমোহর আঁটা দস্তখতি পত্র এক। প্রসাদ পত্রখানা খুলে পড়েনওনি। সেই থেকে গোঁজা আছে ঘরের খোড়ো চালের বাতায়।

রাতে দুজনার দেখা হল শয়ন ঘরে। সর্বাণী আর রামপ্রসাদ মুখোমুখি। ঘরের কোলঙ্গায় পিদিম জ্বলছে। বাইরে সবে ঝড় আরম্ভ হয়েছে। বিকেলের মেঘ এখন ঝড়ের পুচ্ছ ধরেছে। সেই সঙ্গে শিলাবৃষ্টিও। বন্ধ দরজার কপাটে আকাশ হতে পাঠানো মেঘ ফুটন্ত পাথরগুলো আছড়াচ্ছে ঘরে ঢুকবে বলে। প্রসাদ শুনছেন কালী রমণীর বিরাট দুই পদে আর চার চার হাতে নূপুর, মল, চুড়ির একত্র বাজনা ঝমাঝম্ ঝমাঝম্, ঠনাঠন্ ঠনাঠন্। ঝড়ের তাড়সে অতর্কিতে কোনও ভাবী ঘনঘটার সমাচার। দরজার লোহার কড়াগুলো বেজে চলেছে এ ঘরে সে ঘরে। গোহালে কালো গাইটির সদ্য বাছুরটি ভয়ে ডাক ছাড়ছে। তার বছর বিয়োন মা জননী ছানাটির সর্বাঙ্গে নিজের জিভ বোলাতে

বোলাতে বলছে, ভয় কি রে বাছা। আমি না তোর মা। রামদুলাল আর পরমেশ্বরী সুখে ঘুমোচ্ছে তাদের ঠাকুরমার বিছানায়, পাশের ঘরে। ঝড়ের মুখে কচি আমের সুবাস ঘুরছে।

সর্বাণী দেখছে তার সুগৌর স্বামীরত্নটির আরক্ত মুখমণ্ডল। হালে ক্ষৌরী হওয়ার পর এখন সুঠাম গালে চিকন চিকন চকচকে দাড়ির ফুটি ফুটি বাহার। পলকা গোঁফের ছটা। কাঁধ ছোঁয়া বাবরির কুঞ্চিত গুছি। পরণে রক্তরঙা ধুতি বরাবর পুষ্ট জানু ঢাকা। চওড়া বুকে কুঞ্চিত রোমের উপর এক যুগল রুদ্রাক্ষ মালা এলিয়ে রয়েছে। দুই হাতে রুদ্রাক্ষ বালা। এবং বাম হস্তের উপর এলাকায় রূপার পুরু তাবিজ। সর্বাণী দেখছে তার স্বামী দেবটি নিজের প্রতি এত অনাচার আর বেখেয়াল সত্ত্বেও এখনও কি মনমোহন। যদিও বয়স মধ্য ত্রিশ পেরনো, তবু দু-বাহুর আঁটনে আর বলিষ্ঠ বাঁধনে সদাই যৌবন বহাল। লালাভ টানা টানা দু-চোখের ফাঁদে উদাস মদিরা। পুরুষ্টু ঠোঁটে মেটে কার্তিকেয়র ঘাম তেল মাখানো। কোলঙ্গার দীপ আলোয় মহাশয়টির মুখের একপাশ থরথর করছে। রামপ্রসাদ তক্তপোশের ধারে দু-পা ঝুলিয়ে বসে আছেন।

সর্বাণী বলে, পান দেব তো?

আনমনা কথা ফেরে, দে একখানা।

দরজার চৌকাঠের ভাঙা আর আলগা অংশ গলে একটুকরো বরফ শিলা হাউই বাজী হয়ে ঘরের মেটে মেঝেয় ঠিন্‌কে পড়ে। প্রসাদ চমকে বলেন, দেখ পাগলী দেখ্‌।

সবাণী হাসে, এ বছর আর আম হল না। সবই বুঝি শিলে খেল।

—কিন্তু প্রকৃতির মার কেমন সেটা দেখলিনে। ফাঁক ফোকর যা পায় সেঁধিয়ে পড়ে।

—কিন্তু তুমি কি পিকিতির বাইরে!

— সে কি কথা!

—এটিই তো আসল কথা গো। সকালে দেখলুম রাজার লোকটিকে তুমি যেন আমলই দিলে না। এটা কি ভাল হল!

—এতে আবার মন্দ ভাল কি!

সর্বাণী একখানা রেকাবির ওপর ডাবর কোলে রেকাবিতে পেতে রাখা পানে লম্বা লম্বা আঙুল দিয়ে চুন সাজাতে সাজাতে বলে, মহারাজা বলে কথা! তোমার মুখের জব না পেয়ে লোকটি ফিরে গেল। এখন রাজা কি ভাববেন বল দিকিনি।

ঘরের পিছন বাগে মড়মড়াৎ শব্দে বুঝি বা কোনও গাছের ডাল ভাঙে। ভেঙে পড়ে বুনো ঝোপ ঝাড়ের গায়ে। ফলে জল, বন ঝপাস ঝম বিচিত্র মিশেল হয়ে যায়। সর্বাণী চমকে ওঠে, বেলগাছটার বড়ো ডালখানা পড়ল বুঝি।

—কেন সবেদা গাছের ডালও তো হতে পারে।

সর্বাণী আড় চোখে একবার দেখে তার কর্তাটিকে। তারপর পানটি হাতে করে প্রসাদের মুখের সুমুখে তুলে ধরে, নাও, হাঁ করোসে দিকি খোকা।

প্রসাদ এই প্রথম হাসেন। অসম্বিত প্রায় ভূমি হতে নেমে দাঁড়ান। একটু ঘুরে বসেন রমণীর দিকে। তারপর ডান হাতে তার পিঠে বেড় দিয়ে ধরে আলগা করে আকর্ষণ করেন নিজের দিকে। সর্বাণী বাম হাতে প্রসাদের গাল টিপে ধরে সহজেই হাঁ হয়ে যাওয়া মুখ

গহ্বরে পানটি গুঁজে দেয়। প্রসাদ বদ হাসির শোভায় পান চিবোতে চিবোতে বলে ওঠেন, মনে একখানা পদ এল যে।

—আপদ নয় তো।

—আপদ ধরলে আপদ।

—শুনিই না।

—কেহ বলে মরুক গলায় দিয়া দড়ি।

রাতে দিনে পড়ে থাকে দুটা জড়াজড়ি।।

বিয়ারাত্রে দেখিলাম বর চান্দ পারা।

ছুঁড়ির হাঁপানে ছোঁড়া হল তন্তুসারা

সর্বাণীর পিঠে প্রসাদের অপর হাতের বেড় এবার। রমণী বলে, একজোড়া ছেলেপুলের বাপের এমন তত্ব। কাঁঠালের আমসত্ব! বাইরে ঝড় বাদল বলেই কি?

—এ তত্ত্বের ঝড়ও নেই, বাদলও নেই। তবে একেই বলে রমণীবচন সুধা।

—আর। আর কি বলে?

প্রসাদ হেঁট হন সর্বাণীর প্রতি। রমণীর গলার কাছে নিজ মুখ স্থাপন করে বলেন, রমণীরতন। মনে ভার জমলেও তোমার ঠাঁয়ে এলে নেমে দাঁড়ায়।

—মন নামে কিন্তু শরীর দাঁড়িয়ে যায়।

প্রসাদ সর্বাণীকে চুমায় চুমায় অতিষ্ঠ করে তোলেন।

—তোর পান সাজার ইঙ্গিতটি ভারী মধুর রে পাগলী।

সর্বাণী প্রসাদের বুকে হাত ঠেলার ভান করে, ঘরের মেঝেয় কিন্তু শিলের টুকরোখানা পড়ে আছে। ওটি গলতে সময় লাগবে।

—শিলার কি প্রাণ আছে রে পাগলী?

—সে কথা আমার চেয়ে তুমি তো ভালো জানো।

—কেমন করে?

—তুমিই তো বলো শিলা, মাটি, জল সবখানে প্রাণ আছে। তা না হলে মায়ের মেটে পিতিমে গড়িয়ে বচ্ছর বচ্ছর পুজো করো কেন?

রামপ্রসাদ আরও একবার চমকিত হন। বাইরে গাছের ডাল ভেঙে পড়ার তর্জন এবার অন্তরে ঘটে। শিল পাথরের সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির গমক বেড়ে চলে। মুহুর্মুহু মেঘ গর্জায়। এমনতর সব শব্দবৃন্দে মনে হয় আরও একবার অতি গোপন মন্ত্রমাহাত্ম্য কথন। কথা হয় মনে মনে, সর্বাণীর পৃষ্ঠ আকর্ষণ করে, এই স্থূল ও সূক্ষ্ম তত্ত্বাত্মক সংসার যাবতীয়ই ব্রহ্মময়। কিন্তু প্রকৃতি ভিন্ন বিশ্বসংসারের রচনা হয় না। প্রকৃতিই সৃষ্টির মূল ও কারণরূপে পরিদৃশ্যমান। এই প্রকৃতির রূপ অনন্ত। আর এই অনন্ত মহিম রূপমধ্যে প্রকৃতির কালীকা রূপই সর্বাপেক্ষা মনোহরা। এই কলিযুগে কালীই মানবকুলের ভোগ ও মোক্ষদায়িনী।

কিন্তু এই সর্বাণী, স্বয়ং ভোগের আগুন জ্বেলে দিয়ে কেমন করে নাছ দুয়ার দিয়ে পালিয়ে গেল! কিন্তু এ কথা তো সার যে, মৈথুনেন বিনা মুক্তির্নেতি—মৈথুন ভিন্ন মুক্তি লাভ ঘটে না। তাই তো আগমে বলে বসে আছে, জগন্ময়ী আদ্যাশক্তি হলেন যোনিরূপা। তাঁরই অপর নাম কালীকা।

কিন্তু যিনি কালী, তিনিই ত্রিপুরা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ছিন্নমস্তা, তারা, মহালক্ষ্মী, মাতঙ্গী, কমলা, সুন্দরী, ভৈরবী—ইত্যাকারময়ী।

তাহলে প্রসাদের কাছে যদি কবিতা ও কালীকা সমান হয় তাহলে ওই ইত্যাদি সকলের শেষতমে কেন পাগলী সর্বাণী সাব্যস্ত হবে না।

সর্বাণী হাসি মুখে বলে, কি হল খোকার! বুঝি নতুন দেখছে গা!

বিমোহিত রামপ্রসাদ রমণীরতনের স্তনে মুখ রাখেন। দুই সুচারু বিল্বফলের উপত্যকায় ঠোঁট পেতে দেন।

সর্বাণী বাইরের বজ্রপাতের অনুষঙ্গে দু'হাতে সাপটিয়ে ধরেন বীর সন্তানের ঝাঁকড়া মাথা। রামপ্রসাদ ক্ষুধার্ত স্বরে বলে যান, মাটির মূর্তি। মেটে পিতিমে। জ্যান্ত পিতিমে। পাগ্‌লী, পাগ্‌লী, পাগ্‌লী কমনেকার—

বড়মার সুমুখে রামের গ্লাস হাতে দণ্ডায়মান আমার কানুবাবা। পাজামা আর কলার তোলা গেঞ্জি। ট্যাঁকে নস্যির রুমাল।

—তাহলে ঠাক্‌মা তুমি স্বীকার করলে না, তোমার স্বামী তান্ত্রিক ক্রিয়া করতে বসে মদ্যপান করতেন।

বাবা ইস্টবেঙ্গল টিমে প্রাক্তন ফুটবলার হেতু একটু উত্তেজিত হলেই কথার সমে ফাঁকে তড়াক তড়াক লম্ফ দিয়ে ওঠে। কলকাতার ফার্স্ট ডিভিশনে বলাই চ্যাটার্জী, শৈলেন মান্নার সমসাময়িক খেলোয়াড় এবং বরাবরই সেন্টার ফরোয়ার্ড। বল নিয়ে একবার এগোলে কার সাধ্যি থামায়। একবার তৎকালীন ঢাকায় খেলতে গিয়ে সেকি দারুণ অভিজ্ঞতা। বাবার বল দৌড় দেখে মহামেডান স্পোর্টিং সমর্থকেরা চিকরে ওঠে, বাইঠ্যাটারে পারাইয়া দে।

বাবা তো আদপে পাঁচ ফিট বড়জোর। দাদু কিন্তু দীর্ঘাকৃতি। কিন্তু স্বভাবে, দাদু অসহায় পরনির্ভরী আর সাত্ত্বিক পণ্ডিত। বাবা তার উল্টোবাগে নিদারুণ স্বাবলম্বী, মহা ক্রোধী আর একেবারে তথাকথিত ম্লেচ্ছ। ফুটবল সত্ত্বেও কিন্তু খালা গানের গলাটি খাসা। একটুখানি নাকি নাকি, মানে রবীন মজুমদার-সায়গল জাতীয়। গলার সুর আর জোয়ারি দুই-ই চমৎকার।

বড়মা সন্ধের খাবার আটাভাজা পাকলাতে পাকলাতে আর গলায় ঘটি উপুড় করতে করতে বলেন, তুই যদি হয়কে নয় কর্‌লিস্‌, থালে আমি কি করব!

বাবার তিড়িং বা তড়াক্‌ লাফ্‌ ঘটে আরও কয়েকবার। সেই সঙ্গে বারকয় নস্য নেওয়া। থালে কে জানবে বলতো ঠাক্‌মা। তুমি ঠাকুর্দার পরিবার হয়েও কিচ্ছু জানো না! জানবে ওপাড়ার অন্নপিসী!

—ছি ছি। ও কথা বলিসনে। পরিবার ভিন্ন আর কিছু জানতো না মানুষটা।

—ও সব কথা সবাই বলে। রাখো তো। তোমার বড় পুত্র এমন পণ্ডিত, আচারি বিচারি। কিন্তু তার পরেরটি কেন অমন লম্পটস্য লম্পট হলেন।

—ছেড়ে দে না ভাই। সংসারে ভালো কথাটুকু কেবল আঁচলে গেরো দিয়ে রাখতে হয়।

—উঃ ভালোরে ভালো। অমন যার বাপ, অমন যার রামতুল্য দাদা সেই দীননাথ কাকা শুধু নয় আমার কাকীমাটিও তো স্বামী মারা যেতে তেঁতুলে বাগদির সঙ্গে পালিয়ে গেলেন। তেঁতুল আমাদের গাঁয়েরই শেষমাথায় হাকুলির মার ভিটেয় থাকত। ঘরে চোলাই বানাত।

—দীনু। ছেলেটা কালাজ্বরে মরে গেল টুক করে।

—বাঁচা গেল। তোমার মনে আছে ঠাক্‌মা, একবার সম্পত্তির লোভে আমার বাবার হুঁকোয় শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো মিলিয়ে রেখেছিলেন কাকা। একবার টান দিতেই বুক গেল, বুক গেল।

—কি জানি ভাই।

—কি জানি বললেই হল। আর চেহারা চরিত্রেও বাবার সঙ্গে কোনও মিল নেই। একেবারে রঘু ডাকাত, রঘু ডাকাত।

—ওরে তোর গুরুজনরে। অমন করে বলতে নেই।

—নিকুচি করেছে গুরুজনের। কিন্তু তিনি মরেও কি শান্তি আছে। নষ্টা কুলটা যুবতি বউ রেখে গেলেন। তেঁতুলে বাগদী ছিল বাড়ির মাহিন্দর। কাকা জমিদারের নায়েবগিরি করতেন এ দেশ সে দেশে। কালে ভদ্রে দেশে আসতেন। ফলে যা হওয়ার তাই হল।

—হরিবল, হরিবল।

—হুঁ, অনেকে দেখেছে, কাকীমা বাড়ির কুয়োতলায় সন্ধেবেলা গা ধুচ্ছেন। আর তেঁতুল বাগদি তাঁকে সর্বাঙ্গে সাবান মাখিয়ে দিচ্ছে।

—হরিবল। হরিবল।

—একজোড়া ছেলে তিনচারটি মেয়ে তোমার ঘাড়ে ফেলে রেখে তোমাদের বৌমা তেঁতুলে বাগদীর হাত ধরে গিয়ে উঠলেন হাকুলির মা'র ভিটেয়। তারপর চখা-চখি মিলে ধেনো মদের কারবার। সে কি রমরমা।

—হরিবল। হরিবল।

—হরি নয়, কালী কালী বলো ঠাক্‌মা। তান্ত্রিকের পুত্রবধূ আর ডাকাত ডাকাত পাষণ্ডের বউ। এ না হলে মানাবে কেন। তবু রক্ষে জন্মনিয়ন্ত্রণটা কায়দা করে করেছিল। বাচ্ছা-কাচ্ছা হয়নি।

মা বারান্দা দিয়ে রান্নাঘরে যেতে যেতে বলে, মুখ না নর্দমা।

কানুবাবা গর্জে ওঠে, না, গঙ্গাজল হবে।

মার কথা রান্নাঘরে ভসস্ জলে ফোড়নের তলে হারিয়ে যায়। সেই সঙ্গে ঝাঁঝ। ওদিকে সন্ধে পড়ে বড়মার হাতে ধরা শাঁখে পরপর তিনবার। এই বয়েসে এখনও কি দম।

সদর দরজায় অমনি গম্ভীর গাঢ় গলায় ডাক ওঠে, মা আছিস রে, আমার কমলা মা।

গলার আওয়াজ আমাদের সকলের চেনা। অনেকদিন পর পর আসেন তিনি। শোনা যায় সোহং স্বামীর প্রত্যক্ষ শিষ্য। ওঁকে দেখলেই বাঘের সঙ্গে লড়াই মনে পড়ে যায়। কোথায় থাকেন, কি খান, কেউ জানে না। লম্বা চওড়া দশাশই কালো রোম বহুল চেহারা। গোলাকার উদর। মাথা নেড়া। আর পরণে গেরুয়া লুঙি, ফতুয়া। কথার টানে বাঁকড়ো

ছটা। থাকেন বড়জোর হপ্তাখানেক। আর আমাদের মাকে ভারী স্নেহ করেন। এত বড় সংসার, এক জোড়া বুড়ো-বুড়ি, সাধুসন্ত, অতিথি—সব মা সামলায় একা হাতে। অতিথি সেবা করতে করতে এক একদিন দুপুরে ভাত খাওয়াই হয় না। দাদুর নির্দেশ, বাড়িতে অতিথি এলে আগে তাঁকে দেখশোন করতে হবে। এই সাধুটি—সংসার বিবাগী হলেও আমার মার প্রতি অদ্ভুত মায়া।

বড় মা গলা তুলে ডাকেন, ও মেলা, বলি গেলি কোথায়?

সাধু সামনে এসে দাঁড়ান। কাঁধের ঝোলা থেকে বিড়ির ডিবে বার করেন। তুলে নেন একটি বিড়ি। তারপর সেটি কানের পাশে তুলে ধরে দু-আঙুলে ঘোরাতে ঘোরাতে বলেন, অত বেস্তো হওয়ার কি হল শুনি। মেয়েটিকে কি তোমরা মেরে ফেলবে।

বড় মা ভূমিতে মাথা ঠেকান, পেন্নাম বাবা, পেন্নাম!

আমাদের রামশরণ কাকা এসে পা ছোঁয়। তারপর গলা খাটো করে বলে, আর বোলেন না সাধুজি। এ বাড়ির রীতই অলগ। সবার হুকুম তামিল করবেন ওই বউদি।

সাধু শুধু বলেন, হুমম্।

বাবা সহাস্যে বলে ওঠেন, কিস্যু করার নেই সাধুবাবা। কিস্যু করার নেই। তাহলে আর সংসার কেন বলেছে।

সাধু এ কথার কোনও জবাব না দিয়ে শুধু বলেন, তাহলে রামশবণ, আমি থাকব্য কুথা! দোতালা, না একতালা।

রামশবণ কাকা ওপরে হাত দেখায়, দুতলার বারান্দায় বাবা।

দোতলার সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে সাধুবাবা আমার দিকে ঘাড় ঘোরান, কি বাবু। পড়ালিখ্যার খবর তো লিব না। অ্যাকটু গান শুনব্য তোমার মধুর গলায়। মন রে কৃষি কাজ জান না।

সাত

দোতলার প্রকাণ্ড টানা বারান্দার এক কোণে বাঘ লড়াকু সোহং স্বামীর চেলা আমাদের বাঁকড়ি সাধুবাবার কম্বল পড়ে। তার ওপর হাল্কা একখানি চাদর। বালিশ-টালিশ লাগে না। কাঁধের ঝোলা মাথায় দিয়েই শোয়া হয়।

সাধুর সঙ্গে আমাদের রামশরণ কাকার ভারী ভাব। কারণ তিনি নিত্য ক-বার গাঁজা টানেন। কাকা তার প্রসাদ পায়। ফলে এ বাড়িতে আসা হরেক সাধুদের মধ্যে বাঁকড়ি সাধুর খাতির-তোয়াজ তার দিক থেকে খানিক বাড়তি।

রামশরণ কাকা সাধুর যাবতীয় ব্যবস্থা করে, তাঁর নিজস্ব লোটায় জল ভরে এনে বারান্দায় কষে ধুনো দেয় মশার কারণে। ফলে বারান্দায় এখন ধূম্রাকারে মেঘাকার কারবার। তারই মাঝখান দিয়ে কতক সন্তরণরত অবস্থায় মাত্রাতিরিক্ত মাইনাস পাওয়ার সামলে, খড়ম খটখটিয়ে দাদু এসে দাঁড়ান।

দু-হাত জোড় সামনে নুয়ে বলে ওঠেন, প্রণাম মহারাজ।

সাধু গোলাকার চক্ষু তুলে তাকান, শরীর কেমন মাস্টারমশাই?

—আজ্ঞে, ওই হাঁপের টান। মানে শীতে-ঠান্ডায় তো কিছু হয় না। আকাশে মেঘ করলেই বুক ভার। ব্যাস্—অমনি স্প্যাজম শুরু।

—হাঁ, তা সিবার বল্যে গেল্যম কি সকালে প্রাণায়াম করুন আর গরম জলে ডুশ লিন। সিটি কি হচ্ছে?

দাদুর চোখে মুখে বৃদ্ধকালের লজ্জা সত্যিই কেমন শিশুমুখী। সেই সঙ্গে লম্বা লদলদে নাসাগ্রে নামো নামো চশমা আর ছিদ্রপথে নস্যকথা। এ কথা সারা দিনমানে অগণ্যবার। যেহেতু তাঁর বচনে—নাকে না থাক্ হাতের দু-আঙুলের টিপে অবশ্যই নস্য রইবে সদাই। ওই টিপটুকু না রইলে বৃদ্ধ পুরোদস্তুর অসাব্যস্ত। এমনিতে হয়তো দৃষ্টির কারণে কথা বলতে আরম্ভ করার একটু পরেই পুরু কাঁচের আবডালে বৃহৎ চক্ষু জোড়া মুদিত। এ বুঝি এক ধরনের অভ্যাস। আজীবন ছাত্র ঠেঙানো জীবনযাপনের কারণে কথা বলতে আরম্ভ করলেই নিমিলিত চক্ষু। তা এখন—সোহং বাবার চেলার কথার কারণে সেই অধোমুখী চক্ষুতলে কি আমাপাই না লজ্জা।

সাধু তড়পান, কি হল্য মাস্টরমশাই। প্রাণায়াম, ড্যুশ, ইসব কি কেবল কথার কথা!

—না, মানে, আপনার গিয়ে, ওই প্রাণায়াম করতে গেলে নাসা বন্ধ। মানে নস্যি তো নিচ্ছি সেই ইশকুল বেলা থেকে। আর ড্যুশ—সেও এক ভজকট ব্যাপার সাধুজি।

রামশরণ কাকা পাশ হতে ফুট দেয়, বাবুর ধৈরজ বহুত কম সাধুবাবা। কেবল ধ্যান-পূজা আর বই পড়ার সময় উনি স্থির মস্ত্ থাকেন।

দাদু এবার চাকরের বেইমানিতে চড়াং কুপিত। সেই সঙ্গে অতিথি সাধুর সামনে অপদস্থও। তুমি থামবে হে। বেটা মেড়ো ভূত কমনেকার। আমার বড় গার্জেন হয়েছেন!

—লাও সাধুবাবা। সচ্ বাত বোললে বাবু বিগড়ে যান।

ধুনোর কড়া ঘোরের ভেতর থেকে সাধুর জলদ নাদ উলসে ওঠে, চোরায় না শুনে ধর্ম কথা। তা বাবা আপনি এত জ্ঞানীধ্যানী মানুষ। একটুকুন শ্রম করলে তো আপনার হাঁপও থাকে না টানও থাকে না। এখন যদি মিছামিছি কষ্ট পেতে চান তবে আর কি বলব্য।

দাদু এবার কথার মোড় ঘোরাতে নাছোড় হয়ে পড়েন, তাহলে এবার যে অনেকদিন পরে এলেন সাধুজি। হুঁ, তা প্রায় বছর দেড়েক তো বটেই।

সাধু যথারীতি ঘুরে যান, হাঁ, তা হত্যে পারে। আমার ঘুরা ফিরার কি ঘড়ি-ঘণ্টা আছে মাস্টারমশাই। তবে হাঁ, ইবার দেওঘরে বেশ কিছুদিন গুরুদেবের আশ্রমে থাকত্যে হল্য।

—বাঃ। দেওঘর!

--হাঁ, তবে ইবার মনে সাধ হচ্ছে একবার জন্মভূমিটির মাটি ছুঁযে আসি। যাবার আগে ইখানে অ্যাকটু ঘুরে গেল্যম।

—জন্মভূমি, মানে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর।

—আজ্ঞা। বিষ্টুপুর। তা সেখানে শুধু ভূমিটি আছে। শুন্যেছি কেউ নাই সেথা। অ্যাকটি ভাই ছিল। সে দিল্লি-বম্বাই কোথা যেন আছ্যে। ঘরবাড়ি সব বিখে দেয়া হয়েছে বলে শুনেছি।

দাদু চমৎকৃত, তাহলে! তাহলে সেখানে গিয়ে দেখবেনটা কি!

সাধুর চক্ষু বৃহৎ। এবার সেই বৃহৎ যুগল ঘোরে। সিকি কথা বাবা: জন্মভূমিই তো দেখব্য। দেখার বস্তু তো অ্যাকটিই।

দাদু এবার বুঝি বাগে পেয়ে যান গেরুয়াধারীটিকে। পুরু কাঁচবন্দী চক্ষু জোড়া কিঞ্চিৎ কুঁচকে বলে ওঠেন, মার্জনা করবেন সাধুজি। একটা কথা না বলে যে পারছি না।

—কি কথা?

—আপনি সেই কোনকালে সংসার ছেড়েছেন। বনে, পর্বতে জীবনযাপন করেছেন। সংসার বস্তুটি কি আপনার জানা নেই। তাহলে হঠাৎ করে জন্মভূমি দেখতে যাওয়ার অর্থ কি!

—এর আবার অর্থ-অনর্থের কি আছে মাস্টারমশায়। সন্ন্যাসী হবার আগে নিজের মরণের শ্রাদ্ধ করতে হয়। কিন্তু জনমের কথাটি তো মুছে যায় না। সিটি কি ফেল্‌না বাবা।

দাদু কিঞ্চিৎ অবাক অবাক তাকান সাধুর এমত জন্ম-মরণ বিবরণের দিকে। এরপর আর অগ্রসরের পথ রয় না এত মস্ত জ্ঞানী আর পণ্ডিত মানুষটির সামনে।

সাধু কথা বলেন, মাস্টারমশাই, আপনি গৃহী, আমার গৃহ নাই। এই অ্যাকটুকুনই তফাৎ। কিন্তু দুজনাই ত হাত-পা ধারী মানুষ, ঠিক কি না।

দাদু হাতের টিপে ধরা নস্য নাকের সুমুখে ধরেন। —হুঁ। হুঁ।

—ইটির নাম ত জীবধর্ম। আপনি ত পণ্ডিত মানুষ। ই সবই ত আপনি জানেন।

দাদু নাকে নস্য গুঁজে, কি জানি. এমতভাবে হাত ওল্টান। তারপর দু-হাঁটু ধরে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলেন, তাহলে যাই সাধুজি। আমার আবার মৌতাতের সময় হল। কেবলই হাই উঠছে। মানে আফিমের ডাক পড়েছে।

সাধু হো হো হেসে ওঠেন, ভাল, ভাল। আপনি গুলি খান আর আমি শিকড়-বাকড়ে ধুঁয়া দিই। তব্যে কি না আপনার লুঙ্গিটির বর্ণও গেরুয়া।

—আজ্ঞে ওই অবধিই। আসলে তো গৃহগত প্রাণ।

—আমারঅ ত একই হাল। তব্যে গৃহ বদল হয় নিত্য। আজ যদি হেথা ত কাল আর কথাও।

দাদু এখন কিছু পলকা হওয়া ধুনোব ধোঁয়া পাথার পেরিয়ে বারান্দার উল্টোদিকে তাঁর নিজের ঘরখানির দিকে যাত্রা করেন খড়ম দাবড়িয়ে। তাঁর রোগা আর কিছুটা সুমুখে ঝোঁক পাওয়া আড়ার পাঁজরায় নিত্যি লাইফবয়ে কাচা লালচে পৈতে গাছটি দুল দুল করে। রামশরণ কাকা লম্বা এক হাই তোলে। সাধু টেরিয়ে তাকান তার দিকে। বাপরে, আমি এল্যেই তুমার হাই এর কি ঘটা রামশরণ।

—জি সাধুজি। সহি বাত বোলেছেন।

সাধু ঝোলায় হাত ভরে বলেন, বেশ কথা। তাহলে আর বিলম্ব করে লাভ নাই বাপ্‌।

রামশরণকাকার হাতে কলকে, টিকের কৌটো আর একটি ঠোঙায় রাখা বস্তু ওঠে। উঠে পড়ে ছোট্ট একখানি হাত ছুরি আর একখণ্ড মাঝখানে নামো কাঠের পাটা। সাধু গেরুয়া ফতুয়া খুলে আবলুশ কালো খালি গা হয়ে পড়েন। তাঁর মস্ত ভুঁড়ির নিচের তলে ডগডগে গভীর নাভিমূল, বুকময় পাকা রোমের জাঙালভূমি, আর গলার গড়নে থাক থাক দোমেটে গয়না।

আমার প্রতি সেই বর্তুলাকার চক্ষু ভাসিয়ে সাধু বলে ওঠেন, লাও হে খোকা, ইবার

তুমার কণ্ঠে সেই কৃষিকায্যের গানটি শুনি। জন্মভূমি দেখত্যে যাওয়ার আগে অই গানটি দেখা বস্তুত জরুরী।

আমি মাটিতে বাবু হয়ে বসি। তারপর কতক শূন্য থেকে তুলে নেওয়া স্বভাবে গেয়ে উঠি,

মনরে কৃষি কাজ জান না
এমন মানব জমিন্ রইলো পতিত,
আবাদ করলে ফলতো সোনা...

ব্রাহ্ম সময়ে শয়নঘর থেকে বেরোবার কালে সর্বাণী তার পাগল স্বামীধনটির গলা জাপটে পুষ্ট ঠোঁটের গায়ে আলগা চুমো রেখে বলে, তাহলে দুপুরে খেতে আসবে তো। প্রসাদ হাসেন উদাস, দেখি কি গতিক হয়।

—সে আবার কি কথা!

—ওরে পাগ্লি দিন তো এখনও ফোটেনি। আগে আলো হোক। বেলা গড়াক। তারপরে তো দুপুর।

—হুঁ। সে কথা আমি খুব ভালো করেই জানি। একবার ঘর ছাড়লে পেছনকার কথা তো মনেই থাকে না।

—মন বলে কিছু আছে কি আমার! আছে হয়তো।

—তোমার না থাক্, আমার তো আছে।

—আমার মন নেই এ কথা তো বলিনি। তবে কোনখানে তার নিবাস সে কথাটি আজও জানা হল না।

—তাহলে তো তোমার মনের মহারোগ। সেটি আছে কিন্তু নেই—এমন ভাবের তো গতিক ভালো নয়।

—হুঁ, তাই বটে। এ মনোব্যামোর যদি চিকিচ্ছে ধরি তাহলে বদ্যি তুই ছাড়া আর কে বা আছে আমার।

—একেবারে রাজবদ্যি। তাহলে ভালো করে তো নাড়িটি দেখতে হয়। কোপো নাড়ি যে নয় সে কথা তো জানা আছে।

—ভারি হক কথা।

রামপ্রসাদ দাওয়া হতে নেমে দাঁড়ান উঠানে। গেল রাত্রির ঝড় বাদুলে স্মৃতি নিয়ে চৌদিকে পাতা-পত্র ছিটানো আর হেলে পড়া নুয়ে পড়া কিছু গাছময় এই উঠান এখন বিপন্ন রণভূমি প্রায়। হেথা হোথা নারকেল পাতা ডাল্ডি সমেত। ওইখানে চাক চাক গাঢ় আবির রঙা করমচার ছত্রাকার। লতানে জুঁই হতে ছিন্ন হওয়া রজতকুচি ছোট ছোট ফুলদল। অন্ধকারেও চেনা যায় দু-চারটি বৃকোদর ব্যাঙ। প্রকৃতির নির্বিকার রসলীলা।

কচার বেড়া পার হওয়ামাত্র সর্বাণী ও তার মহিম সংসারটি মুহূর্তে পশ্চাৎ হয়ে যায়। শুধু মনে মনে গুঞ্জরায় সদ্য সর্বাণীর বলা কওয়া কথার আগাপাছাগুলো। মনোব্যামো তার রাজপাট এবং চিকিৎসাপত্র।

আর এ সবের বিপরীতে নদীয়ারাজের আন্তরিক নিমন্ত্রণ বাজপেয়ী যজ্ঞ অনুষ্ঠানে, মুরসিদাবাদে শাসকের নব পর্যায়—বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দীর তরফে তাঁর কচি দৌহিত্রটিকে

সিংহাসনে বসাবার উদ্‌যোগ, এবং সেই দৌহিত্র সম্পর্কে হরেক রটনা, যা কানে এলে ত্রাস হয়। তবে প্রসাদ যেহেতু অন্যের কান কথায় ভরসা করেন না, তাই ও নিয়ে এতটা চিন্তিত নন এখনও।

আসলে এই বর্ষা ঝড়ের মাতন রাতের পর এই আঁধার আঁধার শেষ রাতে দেশ সংসারের হাল হকিকত মনের ওপর এমনই চাপানদারি করছে যে সবকিছু কিরকম উলটপালট দেখছে—অনেকটা অস্পষ্ট এই প্রকৃতি সংসারের মতো।

বুনো জঙ্গুলে আঁকা বাঁকা মেটে পথের নিশানা ধরে রামপ্রসাদ ক্রমে এসে পড়েন বাঁ হাতি বুড়োশিব মন্দির বাগে। ভিতরে প্রাচীন পাথুরে শিব আছেন, যেটি উঠে এসেছিল মস্ত এক কষ্ঠিপাথর খণ্ড হয়ে, সাবর্ণ পরিবারের বিদ্যাধর রায়চৌধুরির হাত বরাবর। এক চাঙাড় পাথর থেকে জন্ম নিয়েছিলেন তিন তিনটি দেব-দেবী মূর্তি—শিবলিঙ্গ, কালিকাদেব্যা ও শ্যামরায়।

বুড়োশিব বাঁয়ে রেখে খানিক এগোতেই গঙ্গার রাজপাট। যেহেতু অন্ধকার তরল হচ্ছে ক্রমে, তাই নদীর ছবিখানি এখান থেকেই প্রকট হয়ে বসে আছে। গেল রাত্রির ঝড় বাদল অবসিত এই ব্রাহ্ম সময়ে গঙ্গার প্রসন্নতা যেন বা হাতছানি দিচ্ছে। প্রতিদিনই মনে হয়—আহা কতকাল পরে বুঝি এ নদীতে অবগাহন হল। নদীর ওপারে ঘনগাছপালাময় ঘোর এখান থেকেও আন্দাজ হচ্ছে। কাছে গেলে প্রতিদিনই নব নূতন আবিষ্কার ঘটে। গঙ্গার মতো বহুরূপীনি আর কে বা আছে!

ঢালু ঘাট পথ বরাবর নামতে নামতে কানে আসে নদীতীর থেকে ডাকছাড়া হাঁক, দা ঠাকুর-র-র-র—

চেনা কণ্ঠ। তবে পর পর ক'দিন দেখা হয়নি। আজ নির্ঘাৎ সহজে ছাড়ান দেবে না।

আবার ডাক, দা ঠাকুর-র-র-র—

রামপ্রসাদ কোনও জবাব না দিয়ে সর সর দ্রুত নামতে থাকেন। মাথা বরাবর পটপট বট পাতা চুমা দেয়। নদী পার হতে বর্ষা ঋতুর হাওয়া ঠেলা মারে। সে হাওয়া অতর্কিত ঝাপটা দিয়ে যায় থেকে থেকে। অর্বাচীন বটগাছের ঝুলন্ত ঝুরিগুলো ভিজে বাতাসে যথাইচ্ছা আন্দোলন করে চলে। গঙ্গার হাওয়ায় ইলিশের তামসিক আর স্বাদু গন্ধ বিহার করে। রামপ্রসাদ বুঝতে পারেন ডাকছাড়া ওই কেনারাম মাছ ধরিয়ে অনেকদিন পর যেন বাগে পেয়েছে। আজ আর ছাড়ান নেই। একখানি গান শিখে নিয়ে তবে রেহাই দেবে।

কিছু পরেই দৃশ্যটি পাল্টে যায়। রামপ্রসাদ ঘাটে বাঁধা একখানি বারো মুঠো খিলে নৌকার পাটায় বসে। নৌকার পাছায় জালের আন্ডিল। নাওয়ের মাঝি ও মাছ ধরিয়ে কেনারাম প্রসাদের মুখোমুখি দুই পা মুড়ে বসে। তার আগ্রহটি বড় কম নয়। বিপরীতে তার গানের কাণ্ডারি প্রসাদের কণ্ঠস্বর সুরে হলেও কিঞ্চিৎ ফাটা ফাটা আর উচ্চগ্রামে বাঁধা। কিন্তু মাছ পাকড়ানো এই কেনারাম ভারী চিকন আর মিঠাকণ্ঠী। যাকে বলে আখগন্ধী কচি কঞ্চি চাঁছা।

রামপ্রসাদ কিঞ্চিৎ আগেকার অতীতে ফিরে তাকান। আজ এই আলো আঁধারি রাত্রিশেষের মুখে ঘর ছেড়ে বেরোবার কালে সর্বাণীর সঙ্গে মনোরোগ আর তার চিকিৎসা নিয়ে কথোপকথনের সূত্র মনে পড়ে। রামপ্রসাদ মুখ তুলে দেখেন পূর্বদিকে আলো ফুটছে। তমসার মুখ ক্রমে মুক্তাভ হচ্ছে।

প্রসাদ চোখ রাখেন কেনারামের মুখমণ্ডলে। বেচারি মাছ ধরিয়ের এ ভারী ঘোড়া রোগ—গান ভিক্ষা, দেখা হলেই। আর সে কারণে ওই নিপাট অজটিল মুখে সতত গান ক্ষুধা। আহা, প্রকৃতির কি লীলা। প্রসাদ ফুটি ফুটি আকাশের দিকে চোখ রেখে মন সলিলে ডুব দেন ধীরে ধীরে—সামনেকার ওই দিন পাওয়া পুব আকাশের ধারায়। জলতলের চোরা স্রোতে বুজগুড়ি দেয় মনোব্যামোর বদ্যি। রাজবৈদ্য।

জল অতলের পেয়ে হারাই স্রোত হতে গুঞ্জরণের বুজগুড়ি ওঠে। বুড় বুড়, বুজ বুজ, গুন গুন গুন...গুন গুন গুন গুন...

—মন যদি মোর ঔষধ খাবা—

প্রথম সিঁড়িটির পত্তনে দাঁড়িয়ে প্রসাদ আস্তে আস্তে চোখ মুদে কেনারামের প্রতি বলেন, বলো ভাই বলো। মন যদি মোর ঔষধ খাবা—

কেনারাম মাছ ধরিয়ে এবার প্রসাদী সুর শিকারী হতে চায়। ঘুমন্ত জাতিসর্প আস্তে আস্তে মাথা তোলে। ফণা তাগ করে সামনে এসে দাঁড়ানো মূর্তিমান সুরের দিকে। কেনারাম ভারী মিঠা সুরে উচ্চারণ করে, মন যদি মোর ঔষধ খাবা—

প্রসাদ পরের ধাপে উঠে দাঁড়ান, আছে শ্রীনাথ দত্ত, পটল-সত্ত্ব, মধ্যে মধ্যে ওইটি চাবা—

উচ্চারণ বৈকল্যে কেনারাম সরল বলে ওঠে, আছে ছীনাথ দত্ত—

প্রসাদ মন অতলে পরের চরণখানি পেয়ে যান, সৌভাগ্য কর রে দূরে, মৃত্যুঞ্জয়ের কর সেবা—

কেনারাম স্বভাবতই বলে, মিত্যুঞ্জয়—

প্রসাদ সহজিয়ায় বিশ্বাসী বলে সংশোধনে যান না। তার বদলে পরের ধাপটি পেয়ে যান, রামপ্রসাদ বলে তবেই সে মন, ভবরোগে মুক্ত হবা।

গীত রচনা ও পাত্রস্থ করার পাশ দিয়ে পুব দিকের ফুটন্ত আলো গোটা আকাশ চাবিয়ে যায় ক্রমে। নিচেকার স্রোতবতী গঙ্গা টাটকা আলোয় কলকলিয়ে ওঠে। আজকের এই নবীন দিনটি এইমাত্র ঘটে যাওয়া বিমূর্ততার রাজসাক্ষী হয়ে দাঁড়ায়। নদী জল বলে, আকাশটি যে কি মনোহর। আকাশ হেসে কয়, গঙ্গার রূপ যে আর ধরে না।

ওদিকে আঘাটায় পোঁতা বিবাহের পোশাকধারী টোপর পরা বৃষকাষ্ঠ বর মহাশয়ের অন্তর্গত আত্মা মনে মনে মাথা নাড়ে, আহা, বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধের বদলে এমন একখানি গীত হলেই তো অক্ষয় স্বর্গবাস।

রামপ্রসাদের কথার প্রায় ছায়া কথায় কেনারাম মাছ শিকারি বার তিনেক রপটানির পর ছোটখাটো এই গীতের সুর ও কথাগুলি প্রায় কবজা করতে পারে। আর এই অবসরে তার ছোট্ট ছেলেটি বাপের জন্যে পান্তা আর গুড় সমেত এসে উপনীত ঘাটের মুখে। এই ন-দশ বছরি বালকের আজ অবধি কোনও নামকরণ ঘটেনি এ ভবসংসারে। যেহেতু সে জন্ম বোবা, তাই তার নাম নেই। যেহেতু নিয়মমাফিক কথার সঙ্গে মিল রেখে শ্রবণও বন্ধ, তাই তার নামের দরকার হয়নি। ফলে তার সম্পর্কে বোঝাতে গেলে লোকে দু-অক্ষরি গোঙা কথাটি ব্যবহার করে। রামপ্রসাদও এ কথা জানেন। আর জানেন বলেই তাঁর আরও জানা গোঙা কথাটির একটি অব্যর্থ অশ্লীল মানে হল গৃহ্যদ্বার।

রামপ্রসাদ হাত নেড়ে বালককে ডাকেন। আর তার বাপের দিকে বলে ওঠেন, ছেলে যে ভাত নিয়ে ডাঁড়িয়ে আছে কেনারাম। বলি জলখাবার খেতে হবে তো।

কেনারাম ঘাড় ঘোরায় ছেলের প্রতি। আর সোময় পেলনি তোর মা। মাছ ধরলে খিদে পায় বটে। গান ধরলে তো পেট ভরে যায়।

বাপের আকার ইশারায় ছেলে ধরতে পারে কিছু একটা বেচাল হয়েছে।

কেনারাম বলে, থালে দাঠাকুর, আর একটিবার বলো ওই শেষের আখরটি। রামপেসাদ বলে তবেই সে মন—

প্রসাদ অবাক হাসেন, অ্যাতোটুকুন ছেলেকে ডাঁড় করিয়ে রাখলে ওর মা যে ওকে বকবে ভায়া।

—মার বকুনি তো মিঠে দাঠাকুর। থাক না একটুখানি।

আট

কেনারামের এইমাত্র বলে দেওয়া মার বকুনির মিঠেত্ব রামপ্রসাদের বুকের ভিতরে নবীন এক গুঞ্জরণ তোলে। সে গুন গুন ওই গঙ্গা গর্ভের অতলে অভিরাম বুজ বুজ বুজগুড়ি সমতুল, চোরাগোপ্তা স্রোতঃপুঞ্জে নবীন এক জীবন দহন। আশ্চর্য ওই মাছ শিকারির অন্তর্গত চিন্তা স্রোত। তা বুঝি হুবহু ওই জল অতলের ক্ষিপ্র স্রোতমুখী।

রামপ্রসাদ চুপ করে চেয়ে রন গঙ্গার আশ্চর্য এই প্রভাতী ধারার দিকে। কতকাল, কোন কাল হতে বয়ে চলেছে কূলহারিণী এই মাতঃ নদী। কত না জনপদ, জনমানব ছুঁয়ে, এই নদী গতি পেয়েছে সাগরে। সেই সাগর ঠেলে, তিথি ঘন্টা সালীশ করে, জোয়ার ঘটে। ভাঁটি টানে। তেমনই এই বিচিত্র মানবজীবন। সেখানেও প্লাবন ঘটে, কখনও জীবনধারা পুইয়ে আসে। তারই মাঝখানে জীব সংসার ক্রীড়া করে। সে খেলা রঙ্গময়ী প্রকৃতির ঋতু বদলের পারা। এই করতে করতেই মানুষ তার জীবনখানি গুটিয়ে ফেলে। তার সংক্ষিপ্ত জীবনধারা মিশে যায় অনন্ত মানবজীবন প্রবাহে। কিন্তু সেই বিপুল ধারায় একটি মানুষ জীবনের তো কোনও অর্থ হয় না। তাকে আলাদা করে চয়ন করা যায় না। সেটি করতে হলে বিশ্বজননী এই বিপুল প্রকৃতির কৃপা দরকার। মার কটাক্ষ ছাড়া সন্তান বাড়তে পারে না। হায়রে মানুষ। হায় গো মা জননী।

কেনারাম বোবা ছেলের দিকে হাত বাড়িয়ে গামছা বাঁধা সান্‌কি তুলে নেয়। তারপর কতক আনমনা অবস্থায় নৌকোর ধার থেকে হেঁট হয়ে জলে হাত ধোয়। তার মন এখন পান্তার বদলে রয়েছে সদ্য শেখা গীতখানির আঁকে পাঁকে। —আছে শ্রীনাথ দত্ত, পটল সত্ত্ব, মধ্যে মধ্যে ওইটি চাবা—। তারপরের আখরটুকুর সুর এখনও ঠিক মনে বসছে না। জালের সুতোয় হাত দিয়ে ধরতে পারা যাচ্ছে না ওটি মহাশোল না আইড় মাছ।

গুড়ের ঢেলার সঙ্গে পান্তা চটকে হাপুস মুখে দেয় কেনারাম। আঘাটায় দণ্ডায়মান টোপরধারী বৃষকাষ্ঠ বর হুতাশ নেত্রে চেয়ে চেয়ে ওই ক্ষুধার মূর্তি দেখে আর ভাবে, এতসব কাণ্ডাকাণ্ডময় দান উপাচার জোড়া, হবিঃ আর রজত কাঞ্চন ঘটিত যজ্ঞ হোম পরিশেষেও পাপীষ্ঠের কোনও গতিই হল না। কত দান সমারোহ ঘটল, জোড়ায় জোড়ায়

ব্রাহ্মণগণ মহাভারতের বিরাটপর্ব পাঠ করলেন হেঁকে ডেকে, দেড়েল ব্রাহ্মণ গীতার মোক্ষযোগ পাঠ করলেন তারস্বরে, ব্রাহ্মণগণ দান ভোজনান্তে উপবীত আঙুলে পাক দিয়ে আশীর্বাদ করলেন, দানের ঘটাছটায় রজতকাঞ্চনমূল্য ভেসে গেল, দধি-ঘৃত-তিল-তণ্ডুলে শ্রাদ্ধবাসর পিচ্ছিল হয়ে পড়ল এমনতর, যাতে করে মৃত আত্মা অতি দ্রুত স্বর্গলোকে গতি পান। অবশেষে, এই পবিত্র গঙ্গাতীরে, চতুর্হস্তো ভবেদ্‌যূপঃ যজ্ঞবৃক্ষ সমুদ্ভবঃ। বর্ত্তুলঃ শোভনঃ স্থূলঃ কর্তব্যো ধেনুমৌলিকঃ। যজ্ঞীয় বৃক্ষদ্বারা চারি হস্ত পরিমাণ, গোলাকার, স্থূল ও ধেনুমৌলিক সুন্দর যুপ নির্মাণ করিবে।

সেই নিয়মেই এখন এই বরবেশী বৃষকাষ্ঠ গঙ্গার পঙ্কে পোঁতা অবস্থায় ওই গানএঁড়ে জেলিয়াটির প্রাতঃরাশ ভক্ষন দেখছে আর ভাবছে দ্বিতীয় ওই শোভন সুন্দর রামপ্রসাদ মানুষটির শেখানো গীত পেয়ে ওই অধমটি চতুর্বর্গের স্বাদ পেয়ে গেল—কি অক্লেশে। কোথায় বৃষোৎসর্গ, আর কোথায়ই বা দানসাগর।

বৃষকাষ্ঠ বরের মস্তকের টোপরে একটি দাঁড় কাক এসে বসল। বসে বসে কাকটি উলুক শুলুক নদী দেখছে। এতবড় গঙ্গা, কিন্তু মাছের নাম গন্ধ নেই আজ সকালে। তার বদলে কোথা থেকে রাজ্যের কুমড়ো বোঝাই গরুর গাড়ি এসে নদীধারে থামল। চারজনা মুনিষ ঘাটে রাখা একটি নৌকায় কুমারহট্ট হালিসহরের নামডাকওয়ালা কুমড়োর পাঁজা ধপাধপ নামাতে শুরু করল। পাঁচ দফা ব্যক্তি কুমড়ো মালিক ও কচুয়ান গো-গাড়ির পাটায় বসে আরাম করে লম্বা তামাক ধরাল। তার পাকানো গোঁফ জোড়া কি মনোহর।

ঠিক এমনই সময়ে গঙ্গা বরাবর বয়ে চলা একখানি সওয়ার টানা নাও ঘাটস্থ কুমড়ো-মুনিষ ইত্যাদির আওতায় এসে পড়ল। নৌকায় বেশ জনাকয় বাবু-সাবু মানুষ। সেখানেও হুঁকো উড়ছে। দেদার পান সাজা হচ্ছে। গঙ্গায় পিক ফেলা হচ্ছে। রামপ্রসাদের আজ স্নানে বিস্তর বেলা হয়ে গেল। তিনি ওই খিলে নৌকা থেকে এবার পায়ে পায়ে ঘাটবরাবর জলের দিকে এগিয়ে এলেন।

অমনি ঘাটের গো-গাড়ির মাচায় বসা সেই তামাকটানি লোকটি ধোঁয়া সমেত গলা তুলে হাঁক দিল, বলি বাড়ি কোথায়?

নৌকাসওয়ারি একজনা সিধে সাপটা জব দিল, উলো।

—তোর পোঁদে ঢুকলো মুলো।

বাস্, এবার খানিক হতচকিত এবং চুপচাপ। এমন কথা কি মুখে আনা যায়! বেটা কেমন বেখেয়ালে জব্দ করে ছাড়ল।

রামপ্রসাদ কোমর জলে দাঁড়িয়ে। সবে একটি ডুব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এমন একটি অতর্কিত কথার সামনে দ্বিতীয়বারটি ঘটেনা। বোঝা যায় ব্যাপারটি এমনি এমনি একতরফা ঘটবে না। কিছু একটা হবেই হবে।

চক্ষুবুঁজে তামাকে মহাটান দিচ্ছে কুমড়ো মালিক। তার মুখ ছাড় ধোঁয়া নদীর দিকে নিশ্চিন্তে গড়িয়ে গেল। বৃষকাষ্ঠের কাকও সে ঘটনা দেখল। দেখল কত না আকাশচরা পাখি। এমনকি ঘাটের কাদামাটি হাঁতড়ানো কির কির বুকে হাঁটা যত্তসব কাঁকড়াছানার দঙ্গল। নদীর ওপারে বংশবাটির ঘন বন-জাঙলা সংসার শুধু কোনও আগ্রহই দেখাল না।

গাঙে ভাসন্ত নৌকার এমনিতেই শিথিল গতি। এখন যেন বা আরও খানিক জুড়িয়ে গেল। তখনই—ঠিক তখনই, নৌকার মাঝখান হতে পালটি প্রশ্ন উড়ে এল, তা তোমার বাড়ি কোথায় শুনি?

চক্ষু বোঁজা আয়েশি তামাকু জবাব দিল, হালিসহর।

বলামাত্র জলের উপর থেকে তীর ছুটে এল, তোর পোঁদে ঢুকল তালগাছ।

ভারী নিশ্চিন্ত আর তাচ্ছিল্য উক্তি হল কুমড়োওয়ালার তরফে, মিলল নারে মিলল না।

নৌকা এবার দুরে সরে যেতে যেতে বলে গেল, মিলল না তো কি হল, চিরল তো। হাঃ হাঃ হাঃ...

অনেক হাসি একসঙ্গে নদীস্রোতে কলরব করতে করতে সটকান দিল। সেই সব দলবাঁধা হাসি এসে বটগাছের ঝুরিদের দুলিয়ে দিল! কাদাচরা কাঁকড়া শিশুগণ কিরি কিরি বাড়তি নড়ে উঠল। অদূরে দাঁড়ানো গোঙা ছেলেটিও অনুমান পেল—কিছু একটা হয়ে গেল এখুনি।

রামপ্রসাদ মুহুর্মুহু ডুব দিতে দিতে টের পেলেন ওই বালকটির নাম নিয়ে মোদ্দা কথাটি কেমন করে এতসব কাণ্ডাকাণ্ড সেরে বসল। এসব থেকেও বুঝি কবিতা হয়।

এদিকে কুস্মাণ্ড মালিক কচুয়ান আর চারজনা দন্তবারকারী মুনিষদের দিকে তেড়ে ফুঁড়ে তম্বি আরম্ভ করে দিল। কেন নৌকায় মাল বোঝাই দেরি হয়ে যাচ্ছে এ নিয়ে তার মহাশোরগোল। আসলে প্রচুর মানে লাগা অবস্থার সমীপে অমন করে দন্তপাতি বাহির করা তো দগ্ধস্থানে জলবিছুটি।

স্নান সেরে ভিজা বস্ত্রে প্রসাদ ঘাট ছেড়ে কাঁচা পথে ওঠেন। ডাইনে বামে চলে গেছে বড় সড়ক। বাঁয়ে কাঞ্চনপল্লীর দিক। ডাইনে নবহট্ট বা নৈহাটি ছুঁয়ে ভট্টপল্লী। ভট্টপল্লী ডাকছাড়া পণ্ডিতগণের নিবাসভূমি। এরপর নোনাচন্দন পুকুর বারাকপুর হয়ে সিধে কলিকাতা। সিধে রাস্তার ছব্বা আছে, কিন্তু সঙ্গে জনপদের জটিলতা। এক এক স্থলের মানুষ এক এক প্রকার।

বড় সড়ক পেরোতেই শিবেরগলির মুখে মিচকে হাসি মুখে এসে দাঁড়ায় যে মানুষ তার নাম রামতনু গঙ্গোপাধ্যায়। ডাক নাম তনু ঢুলকি। প্রসাদের চেয়ে বয়সে বেশ খানিক বড়ো এই ব্যক্তি এক ধরনের অতি সুজন আর বান্ধব। ব্রাহ্মণ সন্তান, গলে উপবিত ধারী হলেও রামতনু চর্ম বাদ্য ঢোলক বাজিয়ে। এই শিবের গলিরই বাসীন্দে মানুষটি বাড়ির বারান্দায় বসে একা একাই বাদ্যি বাজায়। আর মাঝে মধ্যে ডাক পেলে রামপ্রসাদের সঙ্গে ঢোলক সঙ্গত করে। বিশেষ করে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কুমারহট্টের রাজকাছারি বাড়িতে এলে, যখন প্রসাদী গানের আসর বসে, তখন রামতনু গানের পাশে ঢোলক নিয়ে হাজির থাকে। লোকে বলে রামপ্রসাদের গানের সঙ্গে রামতনুর ঢোলক যেন কথা কয়।

তনু প্রসাদকে দেখে সহাস্যে বলে, বদ্যির চান আগে হল, বামুন এবার নাইবে ভায়া।

প্রসাদ হাসেন, বামুনের যে পৈতে বড়ো। মাজতেই বিস্তর সময় চলে যায়।

রামতনু মুখে কপট গাম্ভীর্য এনে বলে, হুঁ, কথায় বলে না, আজন্ম খচড়া বৈদ্যা।

—সাতসকালে খিস্তি খামারি কি বড়ো পৈতেধারী বামুনের মুখে মানায়। গোবিন্দ, গোবিন্দ বলো দাদা!

—সব্বোনাশ, রক্ত খেকো কালীর বেটার মুখে আতপ চাল, কাঁচকলা।

—দাদাগো, তোমার গোবিন্দির নামে ছারপোকা মারণ দোষ খণ্ডন হয়। আর কালীর নামে যম দোষ কেটে যায়। মরা মানুষও বেঁচে ওঠে।

—হুঁ! সে কথা না হয় হল। একা একা কত আর ঢোলক বাজাবো। তোমার রাজা কেষ্টচন্দরের তো দর্শনই নেই। কতকাল আসেন না। এলে তবু ডাকটাক পড়ে। ব্রাহ্মণের প্যালাপত্তর ঘটে।

—রাজা এখন বাজপেয়ী যজ্ঞ করবেন বলে ভারী ব্যস্ত।

—সে আবার কি বস্তু ভায়া!

—পোড়া কপালে বামুন। বাজপেয়ী যজ্ঞ জানোনা, অথচ গলায় কাছির মতন পৈতে।

—আসলে ব্যাপারটি কি হয়েছে জানো পেসাদ, ভাগ্য করে জন্মেছো তুমি। নিজে চাঁড়াল জীবন যাপন করলেও অনেক বামুনের সঙ্গ করো তুমি। আর আমি জাত বামুন হয়েও তোমার মতন চাঁড়াল ছাড়া আর কারো সঙ্গ পাইনে।

—কপাল, কপাল গো দাদা।

—হুঁ, কপালই তো বটে। নিজের সংসারেও কম হেনস্তা। ব্রাহ্মণি বলে, আমি আর জন্মে ডোম ছিলাম।

—কেন দাদা! তুমি তো কারণ টারণ পান করো না।

—না করলেও চামড়ার বাদ্যি বাজাই। তারপর তোমার তোমার মতো বদ্ধ মাতালের সঙ্গ করি। আমার এই পৈতেটুকু ছাড়া বামুনত্বের কিছু আছে কি।

রামপ্রসাদ সামনে এগিয়ে এসে রামতনুর বুকের মাঝখানে নিজের তর্জনীটি রাখেন। তারপর কতক গাঢ় স্বরে বলে ওঠেন, দাদাগো, পৈতে টৈতে ওসব তো বাইরের ভেক। তোমার মতো সাদা মনের মানুষের এসব দড়াদড়িতে কি বা আসে যায়।

—বলছো!

—হ্যাঁ দাদা, একেবারে সাঁচি কথাটি বলে দিলাম।

—কিন্তু ব্রাহ্মণি যে বলে আমার মতো প্যাঁচোয়া আর দুটি নেই।

অদ্য অব্দ শতান্তে বা
বাজেয়াপ্ত হবে জান না
এখন আপন ভেবে যতন করে
চুটিয়ে ফসল কেটে নে না
গুরু রোপন করেছেন বীজ
ভক্তিবারি তায় সেঁচ না
ওরে একা যদি না পারিস মন
রামপ্রসাদকে ডেকে নে না।।

এখানে এসে আমার গান ফুরোয়। শেষ হওয়া মাত্র সাধু পাশে রাখা ঝোলা থেকে দুটি লজেন্স তুলে আমার দিকে বাড়িয়ে দেন।

—লাও বাবু ধর। আমার তরফে সামান্য গান দক্ষিণা। আহা, কি কথা ভায়া—এখন আপন ভেবে যতন করে চুটিয়ে ফসল কেটে লাও না—

আমি তাড়াতাড়ি সংশোধন করি। লাও না নয়, নে না।

—হুঁ হুঁ, ঐ হল্য আর কি। যাঁহা বাহান্ন, তাঁহা তিপ্পান্ন।

কলকে সাজা প্রস্তুত। রামশরণ কাকা বাঁ হাত দিয়ে ডান হস্তের কনুই ঠেকনো দিয়ে ডান হাত দিয়েই কলকে বাড়িয়ে দেয় সাধুর দিকে।

সাধুবাবা এবার এক চমৎকার মুদ্রায় বাঁ হাতের দু আঙুলের খোপে কলকেটি সেঁটে তাকে ডান হাতে বিচিত্র বেড় দিয়ে মুখের সামনে ঠুসে ধরেন। তারপর টান টান, মহাটান। দুধারের ফোলা গাল ভেতরে সেঁধোয়। এবার একটুখানি দমবন্ধ জিরেন। তারপর মুখ দিয়ে ফুর ফুর, ফর ফর ধূম উদ্‌গিরণ।

এইরকম পর পর তিন তিন টান দিয়ে কলকে বাড়িয়ে দেন রামশরণ কাকার দিকে। গোল গোল চক্ষু, দুধারে শানানো কালো মোচড়ানো গোঁফ আর ওপর দিককার সামনের একটি দাঁতে সোনার জলের ফুটকিওয়ালা কাকা মহাসুখে কলকেয় টান দেয়। এদিকে বারান্দাময় ধুনোর ধোঁয়ার চক্রাকার ঘুরঘুট্টি, তার সঙ্গে মিঠে মিঠে, আবার কড়া কড়াও কলকে জাত ধোঁয়া পড়ে সে এক মহা তাড্ডিম অবস্থা। ও ঘর থেকে হাঁপ রোগী দাদু কাসতে কাসতে দোর বন্ধ করেন। সিঁড়িতে গ্যাটম্যাট পায়ের শব্দ ওঠে। বোঝা গেল বাবা আসছে।

—কি খবর সাধুবাবা। অনেকদিন পর যে!

সাধুর দিকে এবার কলকে। মুখে সাঁটবার আগে তিনি শুধু বলেন, হুঁ।

বাবার পরণে এখন ফুলপ্যান্ট, হাফ শার্ট ইন্, দু-কোমরে হাত। —তাহলে গান বাজনা হচ্ছে। নিচের থেকে শুনছিলাম বটে। হুঁ, ছেলেটা গায় মন্দ না। আরে বাবা হবে না কেন। আম গাছে কি আর আমড়া ফলে।

সাধু এবার বলেন, তা সমাজ সেবাটেবা কেমন চইলছ্যে বাপ?

বাবা পকেট থেকে ডিবে বার করে বাঁ নাকে নস্যি নেয়। সঙ্গে সঙ্গে সাধু বলে ওঠেন, কি বেপার বলতো বাপ। যখনই দেখি, অই অ্যাকটিই নাকে নস্য নাও। তোমার বাবা ত দু নাকেই নেন!

বাবা মিচকি মিচ্‌কি হাসে, হুঁ হুঁ এর পেছনে একটা স্টোরি আছে সাধুবাবা।

—কি শুনি।

—ব্যাপারটা হল—আমি ক্লাস সিকস থেকে নস্যি নিই বুঝলেন। তা সেটাও বাবার দেখাদেখি।

—আর কারণবারিটি?

—ওটি আমার ঠাকুর্দার থেকে ইনহেরিট করেছি। তিনি কালীসাধক ছিলেন তো।

—ঠাকুর্দাকে দেখ্যেছ নাকি?

—কি করে দেখব। বাবার যখন সাত বছর বয়েস তখন তিনি ও কম্মো

—তাহলে উটি কেমন করে হল! তুমি ত বাপু কালীসাধক লও।

—আরে বাবা জিন বোঝেন জিন।

—হুঁ। জিন মানে মোচলমানদের ভুত।

—আপনার মুণ্ডু! আর একটা কথা—কিছু মনে করবেন না, অমন মোচলমান মোচলমান বলবেন না তো।

—সে আবার কি কথা। হিঁদু-মোচলমান বলব্য না!

—দয়া করে বলবেন না। ঐ যে, যার সঙ্গে বসে একই কল্কেতে গাঁজা টানছেন, ঐ রামশরণ একটি ঠান্ডা মাথায় নরহত্যাকারী।

রামশরণ কাকা গাঁজার ধ্বকে কিরকম হিংস্র আর টেবিয়ে টেরিয়ে হাসে। হাসে আর বিড় বিড় করে, দিয়েছি দু-দুটাকে খতম করে।

সাধুর গঞ্জিকা আরক্ত দুচোখ প্রায় কপালে, বল্য কি বাপ!

বাবা গলা খাটো করে বলে, কাঁচরাপাড়া রেল স্টেশন থেকে একটা মেঠো পথ মথুরাবিলের ধার দিয়ে চলে গেছে কাঁপা গ্রামের দিকে। সেই ফর্টিফোরের দাঙ্গার সময়কার কথা। কলকাতায় তখন আগুন জ্বলছে। বুঝতেই পারছেন এক সম্প্রদায় আর এক সম্প্রদায়কে কিরকম ভীষণ নজরে দেখছে। তা সেদিন সন্ধের ঠিক আগে রামশরণ যাদব ঐ পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। হঠাৎ দেখতে পেল উল্টো দিক থেকে একজন বৃদ্ধ শাদা দাড়ি মুসলমান আসছেন—কাঁপা গ্রামের দিক থেকে। বেশ বয়েস হয়েছে মানুষটির। কি রে রামশরণ, তারপর কি হল? নিজের মুখেই বল্‌না সাধুবাবাকে।

রামশরণ যাদব কাকা গাঁজা রক্তাক্ত দু চোখ টেনে টেনে তাকায়। সে চোখ দেখে আমার কেমন ভয় ভয় করে। বইয়ে পড়া নবহত্যাকাবীর চোখ কেমন তা আমি টের পেয়ে যাই। রামশরণ কাকা বলে ওঠে, হাঁ, আমার মাথায় খুন চড়ে গেল।

—কি করলি সেটা বল্‌।

—হাঁ দাদা, বুঢ়ঢাটা সামনে এল। আমি সিধা ওর সামনে গিয়ে বুকে একটা ধাক্কা দিলাম। বুঢ়ঢা মাটিতে গিরে গেল।

রামশরণ কাকা থামে। বাবা ওসকায়, তারপর? তারপর কি হল?

—আমি ওর বুকে বসে গলাটা দুহাতে দাবাতে লাগলাম। বুঢ়ঢা দমবন্ধ হালতে আমার দিকে বড়ো বড়ো চোখ করে কি সব বোলতে চাইল। মনে হয়, আমায় মিছামিছি মারছ কেন বাবা—এমন কুছু কথা। কিন্তু বোলতে পারল না। ওর চোখ সামনে ঠেলে এল। মুখ দিয়ে পান খাওয়া জিভ বেরিয়ে এল। ওর পা দুটা ঝটাপট্ ঝটাপট। ব্যস্ খেল খতম। বুঢ়ঢার শরীর থেমে গেল।

—তারপর?

—হামি ওর দু-ঠেঙ ধরে মথুরা বিলে নামিয়ে দিলাম। লাশটা কচৌরি পানার নিচে চলে গেল। হাঃ।

বারান্দার ধুনোর ঘেরাটোপেব মাঝখানে সাধু মাথা হেঁট করে বসে থাকেন। বাবার মতো কঠোর প্রাণও কিরকম থম মেরে যান! রামশরণ কাকা বলে, আউর একটা মুসলমান মেরেছিলাম। তবে সেটা বুঢ়ঢা নয়, জওয়ান।

সাধু একটি হাত তুলে তাকে থামতে বলেন। বাবা বোঝে অবস্থা বেগতিক। তাই রামশরণ কাকার দিকে এক চোখ টিপে সাধুকে বলে, এক নাকে নস্যির গপ্পোটা পরে বলব!

সাধু আমায় বলেন, আকটি জানালা খুলে দাও ভাই! আমার দম লাগছে।

নয়

সোহং স্বামীর খাস সাগরেদ সাধুবাবা পরদিন রাত থাকতে উঠে চলে যান। বোধহয় তাঁর বাঁকুড়ার জন্মভূমি দেখতে। বেলায় ঘুম থেকে উঠে তাঁকে দেখতে না পেয়ে যখন জানতে পারলাম এই চলে যাওয়ার সমাচার, তখন মনে হল খুনে রামশরণ কাকার ভয়ে সাধুবাবা সটকান দেননি তো। কিন্তু বাবার বরাবর এক নাকে নস্যি নেওয়ার কাহিনিটি সাধু শুনে যেতে পারলেন না ভেবে অকারণ মন ব্যাজার হয় আমার।

কিন্তু বাবার ওই এক নাকে নস্যি নেওয়ার গল্প আমি জানি। সে সময়ে আমাদের কাঁচরাপাড়া বাবু ব্লকের রেল কোয়ার্টারে সপরিবারে থেকে দাদু স্কুল মাস্টারি করতেন। তখন তিনি অ্যাসিস্টেন্ট হেডমাস্টার। বাবার স্কুল জীবন, বুনো স্বভাব, ফুটবল চষে বেড়ানো, মানে সেই কবেকার কাহিনি। যাই হোক. ওই কোয়ার্টারেও দাদুর অতিথি সাধু ইত্যাদি আগমনের কোনও কামাই ছিল না। যেমন হাওড়া জেলার এক গ্রামে বাস আর কাঁচরাপাড়া রেল ওয়ার্কশপে কাজ, এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক এ বাড়ির পেয়িং গেস্ট থাকতেন। আর মাইনে পেয়ে মাসে একবার বাড়ি যেতেন। যেহেতু তিনি বাইরের ঘরে থাকতেন, তাই আমার বাবা ইত্যাদির কাছে তাঁব নাম পরিচয়—বাইরের ঘরের জ্যাঠামশাই। নিরীহ নিপাট আর ভারী কেপ্পন মানুষটি শীতকালেও সোয়েটার পরতেন না। তার বদলে ধুতি জামার সঙ্গে পায়ে মোজা। সেই মোজার আবার ওয়াড় থাকত। মাথায় মাফলারের বদলে ভয়ঙ্কর ঠান্ডায় দু-কানের লতি কানের ছিদ্রে মুড়ে দিতেন।

কিন্তু সে তো অন্য কথা। তার আগে বাবার এক নাকে নস্যি কথা। সে সময় দেশ জুড়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম বইছে। গান্ধি আর অস্ত্রবাদী অনুশীলন সমিতি ইংরেজ অভিযানে মেতে আছে। আমাদের বাড়িতে হঠাৎ হঠাৎ এসে উপনীত হতেন ধুতি শার্ট, পুরু কাঁচের চশমাধারী ঢাকা শহরের মানুষ—বাবাদের সতীশ কাকা। ওটি ছদ্ম নাম। আসল পরিচয় হল বিনোদবিহারী চক্রবর্তী আর অনুশীলন সমিতির সক্রিয় সদস্য। সংসার করেননি। দু-হাতে রিভলবার চালাতেন অব্যর্থ। সতীশ এসে দাদুর সংসারে টানা বেশ ক'দিন থাকতেন। তারপর হঠাৎ একদিন কোথায় যে উধাও হতেন। সতীশ কিছু বইও রচনা করেছিলেন আসল নামে। বেশিরভাগই 'ঝাঁসির রানী' গোছের। তবে 'যূথভ্রষ্ট' নামে একটি উপন্যাসও লিখেছিলেন। বিষয়বস্তু বেশ জটিল আর মানুষের পারিবারিক সম্পর্ক, টানাপোড়েন, ভালবাসা এইসব। সেখানে অস্ত্রবাদী দেশপ্রেমের নমুনামাত্র ছিল না।

বাবাকে কানুর বদলে কান্টু বলে ডাকতেন। ভালোবাসতেনও খুব। ফুটবল কাতর বাবাকে ধরে বেঁধে পড়াতে বসতেন। একদিন বাবার গা থেকে সন্দেহজনক নস্যির গন্ধ পেয়েই হাত চেপে ধরলেন, এইটুকু বয়েস থেকে নেশা! তুই নস্য নিস কান্টু! দেখি, তোর নাক দেখি।

মা মরা আর বিমাতা তাড়িত বাবা কিন্তু সেই স্কুল কাল থেকেই ঘড়িয়াল। যেহেতু সতীশ কাকা বিরল মাইনাস পাওয়ারধারী, তারওপর হ্যারিকেনের আলো, তাই যতবারই নাক টেস্ট করেন বাবা ঘুরে ফিরে কেবল ডান নাকটিই দেখান। সতীশ নাকে আঙুল সেঁধিয়েও কিছু করে উঠতে পারেন না। সেই থেকে বাবা ওই বাঁ নাকেই নস্যি নেয়।

এ বাড়ির ভেতরে ও বাইরে সকাল সন্ধে হরেক ডামাডোল। ভেতর মহল যদি জমিয়ে রাখেন একাই সহস্র কানু বাবা তো বাইরে অগণিত পাগল সমাজ। আমাদের বাড়ির মাঝখানে পড়ো পড়ো পুরনো পাঁচিল। তার গায়ে পেঁপে গাছ, সুপুরি গাছ, শিউলি চাঁপা। পাঁচিল পারের বাড়িটি আমাদের বাড়িরই দ্বিতীয় অংশ। সাবর্ণ চৌধুরীদের মূল বাড়ির দ্বিতীয় মহল। ওখানে চৌধুরীদেরই দত্তক নেওয়া এক সন্তানের বংশধরেরা থাকেন। ও বাড়ির প্রায় উন্মত্ত উন্মাদ বৃদ্ধ যতীশ রায়চৌধুরী একদা কাঁচরাপাড়ার রেলে চাকরি করতেন। মাঝারি গড়ন, পাকা-কাঁচা চুল আর চার-পাঁচকোণা ভাঙাচোরা মুখ সমেত গুরুতর ট্যারা। তাঁর এক পূর্বপুরুষ অন্নদাপ্রসাদ যজ্ঞেশ্বর রায়চৌধুরী নামে এক বালককে পোষ্যপুত্র নেন। দত্তক নেওয়ার কালে আসল নাম গুপ্ত রেখে ছোটখাটো হোম-যজ্ঞ করে ওই যজ্ঞেশ্বর নামটি বহাল হয়। পাগল যতীশ এই যজ্ঞেশ্বরেরই দ্বিতীয় ছেলে। বড় পুত্র হরিনাথের বিক্রি করা অংশে আমাদের বসবাস।

পাগল কিংবা কখনও সেয়ানা স্বভাব হলেও যতীশ তিন-তিনটি বিবাহ করেছিলেন। তিন পক্ষ মিলিয়ে মোট সন্তানের সংখ্যা তেরোটি—পুত্রকন্যা ধরে। কারওর চেহারাই বনেদি নয়। সব কালোকুলো, অষ্টাবক্র মুখাবয়ব আর প্রখর কামাচারী। বাপের সিধে সরল কাম আচরণের ফলাফল তেরো হলেও তাঁর পুত্র-পৌত্রাদিরা বনে বাদাড়ে নারী সেবায় পোক্ত। কারখানা, পুরসভায় কাজ করা আর ইলেকট্রিক-এর ব্যবসাধারী প্রতি সন্তানের একটি করে সাইকেল আছে। কি এক রহস্যজনক কারণে সবার কথাই আধো আড়ষ্ট আর কথা বললে মুখ দিয়ে খপাত খপাত নাল পড়ে। এক আধজন ছাড়া সবাই স্কুল ঘেরেই কিছুকাল কালাতিপাত করে ক্ষান্ত দিয়েছে।

পোড়ো পাঁচিলের গায়ে দুপুরের কাক ডাকে। টনকো গ্রীষ্মে আমাদের পাঁচিল ঘেরা ভেতর বাগানে চুবড়ি আকৃতির পাকা বেল পড়ছে দমাস দমাস। যতীশ জমিদার পুকুরে চান করে ভিজে বস্ত্রে কাককে হুমকি ধামকি দিচ্ছেন, হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ, এখনও বুঝতে পারোনি। শালা গেঁড়ে বেটাচ্ছেলে। হুঁ হুঁ। ওই আকাশ থেকে পরী নামছে সব। কি সব গতর, আঃ। গতরের নিকুচি করেছে গুয়োর বেটা। হুঁ. ওই আকাশ থেকে নামছে লক্ষ্মীঠাকুর, হরির ছেলে, এখনও বুঝতে পারোনি শালা।

উঠোনের কলতলায় আমাদের বাসন মাজুনি সরস্বতী দিদি। সেও পাগলিনী। গলা তুলে একই সুরে গান গাইছে—যা অনেকটা রামপ্রসাদী সুর ঘেঁষা।—আমার কথা যায়রে ভুলে, লোকের কথা বলিবে বলে, উচ্ছে গাছে পটল হলে, বেগুন গাছে সর্ষে হলে। বোম্ ষট্‌কে ওই ওপাড়ার আম গাছের মগডালে গিয়ে আটকে। হ্যাঁ, আমার কথা যায়রে ভুলে, নন্দ এবার মরিবে বলে—হা হা হা।

এখানে নন্দ মানে তার তাড়িখোর ও নষ্ট স্বভাব অসামাজিক বর।

আর যতীশের উক্ত লক্ষ্মীঠাকুর-এর অর্থ বলতে বাংলার প্রাচীন ইতিহাসে গিয়ে ধাক্কা খেতে হয়। এই বঙ্গদেশে কনৌজ থেকে আসা পঞ্চব্রাহ্মণের অন্যতম সাবর্ণ গোত্রজ বেদগর্ভের অধস্তন পঞ্চদশ পুরুষ পঞ্চানন বা পাঁচু শক্তি খান—যিনি আদপে মোগল সম্রাট হুমায়ুনের সৈন্য বাহিনীতে যোগ দিয়ে বিস্তর ক্ষমতা প্রদর্শন করে 'শক্তিখান' উপাধি পান। তাঁরই পুতি কামদের ব্রহ্মচারীর পুত্র লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় দিল্লির মোগল দরবার

থেকে মজুমদার বা রাজস্ব সচিব পদে থাকার সুবাদে 'রায়চৌধুরী' উপাধি পান। বই-পুস্তক অনুযায়ী 'রায়' অর্থে বিত্তশালী বা রাজা আর 'চৌধুরী'র মানে হল জমিদার কিংবা প্রধান। বলাবাহুল্য, এই লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার রায়চৌধুরীর ধারাটি 'সাবর্ণ চৌধুরী' শাখা হিসাবে পরিচিত হতে আরম্ভ করে।

রামপ্রসাদ আর একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ান রামতনুর দিকে। তারপর গাঢ় স্বরে বলেন, খাস বাত হল দাদা, তোমার ব্রাহ্মণি ভারী সরলমতি।

রামতনু বা তনু দুই চক্ষু বৃহৎ করে তাকায় রামপ্রসাদের দিকে। যেন এমন কথা সে এ জীবনে শুনছে এই পয়লা দফায়।

—হ্যাঁ দাদা, মিছে বলিনি। বৌঠানের মতো সরলা রমণী যে বারেন্দ্র বামুনের সাক্ষেতে এতকাল কেমন করে সংসার করছেন সেইটেই অবাক কথা।

—তার মানে!

—তুমি নিজে বারেন্দ্র বামুন। তা তোমার লীলা তোমার নিজের চেয়ে ভালো বুঝবে কে বলো।

—বারিন্দির কি বদ্দিরও ওপর দিয়ে যায়।

—ক্ষেত্র বিশেষে যায় বৈকি। যাকগে, ভিজে গায়ে দাঁড়িয়ে তোমায় আর বকাবো না। পার তো সন্ধের ঝোঁকে ঢোলকখানা নিয়ে একবার এসো না।

—সে না হয় যেতে পারি। কিন্তু যা বন জঙ্গলে বাস করো, দিনমানেও যেতে বুক ছম ছম করে। তবে হ্যাঁ, গান বাজনার বরাত পেলে যমদ্বারেও যেতে রাজি ভায়া।

রামতনু গঙ্গার দিকে চলে যায়। প্রসাদ উল্টোবাগে শিবের গলি পথ ধরে নিজের গড় জঙ্গল বাস্তুর দিকে পা রাখেন।

ভোর থেকে সকাল হয়েছে অনেকসময়। পাখ-পাখালেরা যে যার সংসার ছেড়ে খাবার সংগ্রহে উড়ে চলেছে। রাস্তায় গঙ্গা স্নানার্থী মানুষজন দুটি-একটি-চারটি-পাঁচটি। সাধারণ শ্রমজীবি মানুষের চেয়ে গৃহস্থ এবং কুমারহট্টের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের দলই বেশি। তারস্বরে শ্লোকোচ্চারণ করতে করতে তাঁরা চলেছেন। প্রাতঃকৃত্যের পর অনেকেরই কর্ণপীঠ থেকে এখনও পৈতে নামানো হয়নি। বোধহয় পবিত্র গঙ্গামৃত্তিকা দিয়ে উপবীত মার্জনা করে তা আবার যথাস্থানে নেমে দাঁড়াবে। পণ্ডিতগণের অগ্রে পিছে প্রায়ই মাথায় মেটে হাঁড়ি পাতিলের আন্ডিলধারী এখানকার ডাকসাইটে কুম্ভকাররা পথে নেমেছে। তারা বেশিরভাগই যাচ্ছে গঙ্গাতীরে। মৃৎপাত্রগুলো নদীতীব থেকে নৌকায় চড়ে ভেসে পড়বে বাণিজ্য তাড়নায়। আর আছে যথারীতি বৃহদায়তন কুষ্মাণ্ড নিয়ে গো-গাড়ি বা মাথায় অতিবৃহৎ ঝাঁকা সমেত মানুষজন। এই সকালেই ঘটনা প্রমাণ দাখিল করছে কুমড়ো আর মেটে হাঁড়ি পাতিলের কুমারহট্টত্ব। বাণিজ্য এখানে লক্ষ্মী প্রাপ্ত হয়ে চলেছে এই এক জোড়া ভুঁই সাব্যস্ত উপাচার দিয়ে।

ঠিক তেমনই বিপরীত বাগে সংস্কৃত বিদ্যাচর্চার সাধনপীঠ হয়ে বসে আছে এই ভূখণ্ড। রামপ্রসাদ স্বয়ং সংস্কৃত ছাড়াও তাবৎ বিদ্যাপ্রিয় মানুষের মতো পারসী ও হিন্দি এমনকী উর্দুও কবজা করে বসে আছেন পিতৃ তাড়নায়। বাড়তি হিসাবে বংশবৃত্তি ভিষক বা বৈদ্য

বিদ্যাও তাঁকে রপ্ত করতে হয়েছে। মনে ভাবলে অবাক হতে হয়, বালককাল হতে যে জীবনখানি কালী আধারিত কবিতার পাকে পাকে বাঁধা তার ক্ষেত্রভূমি বুঝি গড়ে উঠেছে এইসব হরেক বিদ্যা কর্ষনে। ফললাভ মন্দ ঘটেনি। কবিতাগুলি বুঝি নবীন এক দিগন্ত দেখেছে।

বুড়ো শিবের মন্দির পার হয়ে খানিক গেলে একটি বাঁক। ঠিক সেই মুখেই পথের দুধারে সার সার চতুষ্পাঠি। সংস্কৃত পড়ুয়ারা উচ্চৈঃস্বরে পুথি পাঠ করছে। ওই চতুষ্পাঠি দিগরের মধ্যে একটি প্রসাদের কাছে ভারী স্মৃতিবহুল। ওখানে, মৃত বিদ্যানিধি মশাইয়ের কাছে প্রসাদের সংস্কৃতের প্রথম পাঠ। বিদ্যানিধি প্রসাদকে খুব স্নেহ করতেন। কেন না এই ছাত্রটি ইতিমধ্যেই তার পিতাব কাছে মহাভারতাদি বই, প্রাচীন কবিগণের পদাবলী সবই আত্মস্থ করে বসে আছে। ফলে ক্ষেত্র প্রস্তুতই ছিল। বিদ্যানিধি বুঝতে পেরেছিলেন এই বালক কাব্যপাঠে অনুরাগী। তাই ব্যাকরণ-এর পাশাপাশি কাব্যশাস্ত্রে প্রসাদকে চালিত করেছিলেন ভট্টাচার্য বিদ্যানিধি। সেই স্বর্ণসম মানুষটি আজ নেই। প্রসাদের স্মৃতিপথে তাঁর স্নিগ্ধ স্মৃতি আনন্দ ভ্রমণ করে।

কিন্তু এই আনন্দ সমাগমের মুহূর্তে তাঁর জন্যে যে এক অতর্কিত অপমান আঘাত অপেক্ষা করে আছে তা প্রসাদের জানা ছিল না। তাই পণ্ডিত বলরাম তর্কভূষণের চতুষ্পাঠির সুমুখ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি যথারীতি শিক্ষাগুরু বিদ্যানিধির স্মৃতিতেই ছিলেন। তাঁর মনে নেই এখন তিনি যাঁর টোলের সুমুখ বরাবর যাচ্ছেন, তিনি শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণের ত্রিরত্নের একটি। সেই রত্নমালিকাটি হল, পণ্ডিত কামদেব, বলরাম ও শিশুরাম।

বলরাম পণ্ডিতের চতুষ্পাঠির সম্বন্ধে যদি প্রসাদের চেতন থাকত তাহলে নিশ্চয়ই তিনি স্মরণ করতেন বঙ্গগৌরব বলরামের তত্ব। তাঁর মনে পড়ে যেত নির্ঘাৎ 'শ্রীকান্তঃ কমলাকান্তো বলরামশ্চ শঙ্কর'। এই বলরামের বিদ্যাচর্চা প্রথমে সুগম ছিল না। পরে তাঁর শিক্ষাগুরু হন তাঁর নিজেরই অগ্রজ মহাপণ্ডিত কামদেব। অথচ এই বলরাম প্রথম বয়সে ছিলেন আকাট মূর্খ আর গোঁয়ারগোবিন্দ। উনিশ-বিশ বয়সাবধি তিনি শুধুই মৎস্য শিকার আর সাঁতারে ব্যস্ত ছিলেন। বলরামের বিবাহ ঘটে গুপ্তিপাড়ায়। একদিন শ্বশুর ঘরে শালাজ এসে তাঁর কান মলে দিলে, বলরাম প্রতি কানমলার জবাব দিতে গেলে, সেই শালাজ রক্ত নয়নে সেখানে হাজির অন্যান্য রমনীদিগে বলে ওঠেন, শুনেছিলাম যে বলা লাঙ্গলা। এখন দেখছি সত্যিই তাই। আমার ভগ্নীটি একটি আস্ত জানোয়ারের হাতে পড়েছে। এই মহা অপমানের পর বলরাম শ্বশুর আলয় ছেড়ে ঘরে ফিরে এলেন এবং প্রাণপাত পরিশ্রমে লেখাপড়া আরম্ভ করলেন। সরস্বতীর কটাক্ষে এই শ্রম আর জিদের ফল ফলল। বলরাম তর্কভূষণ একটি শিখিপাখায় রূপান্তরিত হলেন।

কিন্তু সেই শিখরস্পর্শী পণ্ডিত এখন এই সকাল বেলা তাঁর এক ঘর বারান্দা পড়ুয়া ছাত্রদের সামনে রামপ্রসাদকে দেখে হঠাৎ গলা চড়িয়ে ডাকলেন, কি রে বেটা মাতাল, সাত সকালেই পাত্তর চড়িয়েছিস।

রামপ্রসাদ যেন শুনেও না শোনা, এমন ভাবেই আপনমনে চলতে লাগলেন। বলরাম পণ্ডিত কিন্তু ছেড়ে দেওয়াব পাত্র নন। এবার তিনি ছাত্রদের দৃষ্টি টেনে আনলেন আর উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, ওরে তোরা দেখ দেখ, মাতাল বেটা যাচ্ছে।

রামপ্রসাদকে এবার দাঁড়াতেই হল। এমন ডাক ছাড়া অপমান তাঁর বুকের কর্ষণভূমিতে নতুন এক নাদ তৈরি করতে আরম্ভ করল। তিনি অনুভব করলেন, কোনও অভিনব আর নতুন আরম্ভের কাঠামো বাঁধা চলছে খটাখট-খটাখট। অনতিপরেই খড় বাঁধা হতে থাকল। তারপরে পরেই তার গায়ে মাটি চড়ানো। ছাঁচকোঁচ দিয়ে প্রতিমার মুখ-চোখ- কান-ছোট ছোট দন্তপাতি—লজ্জাশীলা জিহ্বা। পদতলে ভৈরব মহাদেব। রামপ্রসাদের কালিকা ও কবিতা একই লগ্নে ক্রীড়ারম্ভ করল। এমনটিই বুঝি ঘটে। প্রতিটি গীতি কবিতার অন্দরপটে এমন স্বাভাবিক নিস্তরঙ্গতা ফণা মেলে দাঁড়ায়। আস্তে আস্তে কবিতার জন্ম হয়।

প্রসাদ মনে মনে পণ্ডিতকে ধন্যবাদ দিলেন। তারপর হাসি মুখে বলে উঠলেন। বলি ও তার্কিক ভট্টাচার্য—কি বলছ গো?

বলরাম তার্কিক ওই হাসি মুখ সইতে পারেন না। ফলে ফুঁসে ওঠেন এবার, দূর দূর, বেটা পাষণ্ড মাতাল।

রামপ্রসাদ টের পেলেন হৃৎকমলে কবিতা কালিকার দিব্য আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। বুকের তলদেশে গুন গুন ভ্রমর গুঞ্জন গান ধরেছে। সেই সুপ্ত তান এবার বার হওয়ার পথ পায়।

রসনে কালী রটরে।
মৃত্যুরূপা নিতান্ত ধরেছে জটরে।।
কালী যার হৃদে জাগে, তর্ক তার কোথা লাগে, কেবল বাদার্থমাত্র, ঘট পটরে।
রসনারে কর বশ, শ্যামানামামৃত রস, গান কর, পান কর, পাত্র বটরে।।
সুধাময় কালীনাম কেবল কৈবল্যধাম, করে জপনা কালীর নাম, কি উৎকটরে।
শ্রুতি রাখ সত্বগুণে, অন্য নাম নাহি শুনে, প্রসাদ বলে দোহাই দিয়া, শিবে কঠোরে,

বলরাম পণ্ডিত নাক উঁচু করে মন্তব্য ছুঁড়ে দেন, শ্যামানামমৃত রস না হাতি। ও সব হল মাতালের সুরাপানের ছল।

রামপ্রসাদ সঙ্গে সঙ্গে আর একখানি জো পেয়ে যান। আর এবার তাই যেতে যেতে বলে যান, সুরা পান করিনেরে।

সুধা খাই কুতূহলে।।
আমার মন মাতালে মেতেছে আজ,
মদ্ মাতালে মাতাল বলে...

বলরাম পণ্ডিতের পরবর্তী কথাবার্তা আর কানে আসে না। তবে এটি সাব্যস্ত হয়ে যায় যে গুরুমশাইয়ের ওসকানি সত্বেও প্রথম প্রথম হু দিয়ে উঠলেও কিছু পরেই পড়ুয়া কিশোর বালকের দল নিঝুম জুড়িয়ে যেতে বসে—ক্রমে। ডোবা ছেড়ে গড় জঙ্গল ভূমি নিজের ভিটার আওতায় ঢুকে পড়েন প্রসাদ। দূর হতে বলরাম পণ্ডিতে হাঁপকাস ব্যামোর-খক খকানি শোনা যায়।

দু-জোড়া মাহিন্দর শ্রেণির মানুষ এসে কতক পথ আগলে দাঁড়ায়। দু-জনারই মাথায় ঝাঁকা। ঝাঁকা বোঝাই তরিতরকারি আনাজ, চাল-ডাল, গামছা ইত্যাদি। ঝাঁকার বোঝা এমনই যে লোক দুই টলমল করছে।

প্রসাদ কিছু বলবার আগেই একজন হাঁফাতে হাঁফাতে বলে, আজ্ঞা, কাঞ্চনপল্লির জমিদার মুকুজ্যে মশাই কিঞ্চিৎ সিধে পাট্টেচেন মায়ের ভোগরাগের জন্যে।

প্রসাদ সামনে হাত তুলে বলেন, ঐখেনে মায়ের ঘরের সুমুখে রাখো বাবারা। আর দুপুরে দুটি পেসাদ পেয়ে যেও।

আর একজনা বলে, দাঠাকুর, সিধের মধ্যে বাবুর পুকুরের একখানি রুইমাছও আচে। হুঁ, তা পাঁচ-ছ সের তো হবেই।

প্রথমজন বলে, আজ্ঞে দুধও আচে এক ঘড়া। সঙ্গে আতপ চাল। মায়ের ভোগের পরমান্ন হবে।

প্রসাদ হাসেন, বাঃ, তাহলে ষোলকলা পূর্ণ হল। মায়ের আজ ক'দিন আলোচাল আর বাগানের কাঁচকলা বরাদ্দ হচ্ছে। মাছ তো দূরের কথা, ঘরে ডালও বাড়ন্ত।

বন ঝোপের ভিতর থেকে ভজহরি মুখ বার করে হাসে, রাজার দেওয়া সম্পত্তি, নবরত্ন দুগ্গাচরণ মিত্তিরের দেওয়া জমিজমা—সব পাঁচভূতে বেদখলি হয়ে আছে। এখন পোলোয়া-কালিয়ার বদলে কাঁচকলার কোপ্তা আর আতপের ভোগ। অমন অছেদ্দা কল্লে মা শিগ্গিরই সটকান দেবে।

দশ

ভজহরির খোঁটা দেওয়া কথায় প্রসাদের অস্বস্তি হয়। কাঞ্চনপল্লির যে গরিব মানুষ জোড়া মাথায় ঝাঁকা বয়ে মায়ের ভোগের তৈজস নিয়ে এসেছিল মুখুজ্যে জমিদারের তরফ হতে, তারা প্রসাদ পেয়ে উদগার তুলতে তুলতে চলে গেল। আর এক একটি উদগার প্রসাদকে মনে করিয়ে দিল, বিষয় আশয় থাকা সত্ত্বেও কি উড়ুনচণ্ডে হাভাতে সংসারের হাল হকিকত। দিনে দিনে ছেলেপুলেদিগের উদর বড়ো হচ্ছে, সংসারে এসো জন বসো জন তো লেগেই আছে। এ অবস্থায় যদি সদাই বেভুল স্বভাব হয় তাহলে আর সংসাব করা কেন। বিনি অপরাধে প্রায় কয়েদবদ্ধ আত্মজনদের সাজা দেওয়া।

বেলা মধ্যাহ্নপারে, যখন বেশ ক-পাত্তর ঘটে গেছে রামপ্রসাদের, বলতে গেলে হঠাৎ করেই সংসার চেতনা মনে এল। এই মনে হওয়ার আশপাশটি দুপুর গড়ানে নামা এবং বিচিত্র লতাগুল্ম ঝাঁজগন্ধি, বুনো, তেলাকুচো, আর ভাট বনে বাতাস হাঁটকানো বাস, তেলাকুচো আর কুঁচ ফলেদের শরীরে বাতাসের খত্তাল, বকুল ফুলের ঝুরঝুর ঝরণ, মস্ত মস্ত কেয়া ঝোপে গন্ধগোকুলের উলুক শুলুকে মাথায় টুপটাপ পাকা খেজুর পাত, ডাঁটো আকন্দ ঝোপে দুপুর চরা শৃগালের সন্দেহবাই, খেজুরপাতার দোলায় উপবিষ্ট চন্দনা-টিয়াদের ক্যাটর ক্যাটর গল্পগাছা, কালো ময়নার শিসবাহারের সমে ফাঁকে মস্ত মানকচু পাতাদের আয়েশি হেলদোল। এমনতর নিত্যিকার অবস্থায় আজকের এই সংসার চেতনার মুখে পড়ে প্রসাদ বিজড়িত গলা তুলে ডাকলেন, ভজহরি---ওরে ভজহরি, একবার ইদিকে আয় না বাপ।

ভজহরি নিকটেই ছিল। একটি শিশু তালগাছতলে দুপুরের খোয়ারি ভাঙছিল। যেহেতু

আজ এখানে প্রসাদ পাওয়া হয়েছে এবং ভোজন দিব্যু হয়েছে, তাই তেলাকুচোর ঝোল আর পুঁই মেটুলির হুতাশ মনে নেই।

—কি হল রে ভজহরি। বলি ঘুমিয়ে গেলি কি?

ঝোপ ঝাড় সরিয়ে ভজহরির ফোলা মুখ আর রক্ত চোখ উঁকি দেয়। —হুঁ, হুজুরে হাজির আছি।

—বলিহারি, তুইও দেখছি যবন ভাষা কপচাচ্ছিস। বলি হল কি তোর!

—দিবানিশি তোমার সঙ্গ করে করে এমন হাল।

প্রসাদ ডান হাতখানি সামনে তুলে বলে ওঠেন, একবার যা দিকিনি। আমার তক্তাপোশের নিচে একখানা হাতবাস্কো আছে। ঝট্ করে যেয়ে নে আয় সেখানা।

ভজহরি যথারীতি—এই যাবো আর আসবো বলে ঝোপের আবডালে সেঁধিয়ে পড়ে। প্রসাদ মনে মনে হিসেব কষেণ, রাজা কেষ্টচন্দর, তারপরে গিয়ে তোমার দুর্গাচরণ মিত্তির—। হুঁ, শুধু নামই মনে আছে। জমির পরিমাণ, দাগ-খতেন কিছু মনে নেই। এমনকি মৌজার নামও বেভুল হয়ে গেছে।

খানিক পরে একটি মাঝারি আকারের কাঠ বাক্স বগলদাবা করে ভজহরি ফিরে এল। বাক্সটি বুঝি তিনপুরুষের। পিতলের আঙটা আঁটা। ডালার বুকে চিত্তির বিচিত্তির নকশা। ফুল, লতাপাতার ঝালর। বাক্সের উপরে দেবনাগরিতে খোদাই করা, ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ।

যেন কতকাল পরে এই প্রাচীন বাক্সটি খোলা হচ্ছে এমনতর প্রসাদী ভঙ্গী হলেও আদপে তা সত্য নয়। যখনই কোনও দান-দলিলপত্র এসেছে, এই বাক্সের গর্ভে সেঁধিয়েছে। সে কাজ অবশ্যই সর্বানীর হাত বরাবর। প্রসাদের হাত এর গায়ে বড় একটা পড়েনি।

প্রসাদ হেঁট হয়ে বলেন, খোল্, বাস্কোটা খোল্।

ভজহরি বাক্সের ডালা খুলে মেলে ধরে। অমনি ভিতর হতে কয়েকটি তেলাপোকা শুঁড় ফরফরিয়ে সড়াৎ সর বেরিয়ে এল। তারা বন্ধপুরীর এলাকা ছেড়ে বাহিরের এই ঝোপ-জাঙালে দ্রুত হারিয়ে যায়।

প্রথমেই বার হয় যে দলিলটি সেটি চোখের সুমুখে তুলে ধরেন রামপ্রসাদ। তুলট কাগজে চোখ পেতে মনে হয় কি অপরিচিত ওই লিখন। কোনওদিন কি দেখা হয়েছে, না জীবনে এই প্রথম!

নং ১৮৩৪৮

শ্রীশ্রীরাম

শরণং

পারশী ১৫৮৩

ইঙ্গরাজী

[illegible]

শ্রীরামপ্রসাদ সেন সুচরিতেষু শুভাসীঃ প্রয়োজনঞ্চ বিশেষঃ এ অধিকারে তোমার ভূমিভাগ কিছু নাহি অতএব বেওয়ারিষ গরজমা জঙ্গল ভূমি সমেত পতিত পরগণে হাবেলীসহর ১৬ ষোল বিঘা এবং পরগণে উখড়ায় ৩৫ পয়ত্রিশ বিঘা একুনে একার্ন্ন বিঘা

তোমাকে মহোত্তরাণ দিলাম নিজ জোত করিয়া ভোগ করহ ইতি সন (অস্পষ্ট) তারিখ ৪ঠা ফাল্গুন শহর—

* রামপ্রসাদ নদীয়াধীপ দস্তখতি কাগজখানি নেড়ে দেখেন। চমৎকার হস্তাক্ষর এই দলিল লেখকের। তেমনই খাসা মহারাজার সংস্কৃত পাকমারা স্বাক্ষর। ডাইনে বাঁয়ে রাজার সীলমোহর কপচানো।

কিন্তু কোথায় ষোল বিঘা আর কোনখানেই বা উখড়া গ্রামের একান্ন! মাঝে মধ্যে ভাগীদাররূপী কিছু ধর্মপ্রাণ মানুষ ধানপত্র ভাগ দিলেও সে সবই অকুলান। অতঃপর আরও একখানি দলিল, তায়দাদ নং ১৮৩৫০

দর্পনারায়ণ রায়, শ্রীরাম রায় ও কালীচরণ রায় মহাশয়গণ একযোগে ১৭ চৈত্র ১১৬০ সনে ৮% বিঘা জমির সনন্দ—

পলাসি ২% হাবিলিসহর পরগণা

তেতুল্যা ২% হাবিলিসহর পরগণা

বালিয়া ১% হাবিলিসহব পরগণা

কাটা পুখরিয়া ১% হাবিলিসহর পরগণা

ডাসি ২% হাবিলিসহর পরগণা

দ্বিতীয় কাগজখানি দেখার পর প্রসাদ সেটি নামিয়ে রাখেন বাক্সের ভিতরে। হায়, কালীঠাকুরানীর করুণায় এই যাবতীয় কাগজলিখন এখন নেহাৎই কথার কথা। কোথায় দাগ নং, খতিয়ান নং-এর নিবাস, কোনখানে জমির আইল, জমাবন্দী, লাখেরাজ ইত্যাকার হিসাবনিকাশ। সবকিছুই যে এখন একাঙ্গী হয়ে জগাখিচুড়িবৎ সাব্যস্ত হয়েছে। কার জমি জিরেত, কে কাকে দেয়, কে তার ফসল রোপন করে, কর্ষণ করে। কিছুকাল আগে রচনা করা একখানি গীতের তুচ্ছ এক অংশ মনে মনে রপটানি খায়, 'ইজারার পাট্টা পেয়ে, এত কি গৌরব বেড়েছে, ওরে স্বয়ং থাকতে কুশের পুতুল, কে কোথা দাহন করছে...।'

গীতের এই দাহন করা সমাচারের পিছু পিছু নিঝুম বনভূমিতে ব্যস্ত পায়ের শব্দ ওঠে। রামপ্রসাদ দলিল-দস্তাবেজ, খতেন-দাখিলা স্তূপ হতে মুখ তুলে তাকান। তাকায় ভজহরিও। কে জানে, কে এল মধ্যাহ্ন পারে, এত ব্যস্ত সমস্ত পায়ে।

রহস্য বেশিক্ষণ বহাল থাকে না। খানিক পরেই আকাট এই জঙ্গল গড়ের গাছ পালার ফাঁক দিয়ে যে মানুষ মূর্তিটি প্রকাশিত হয় সে প্রসাদ আর ভজহরি দুজনারই চেনা। শীর্ণকায় তাল ঢ্যাঙা এই মধ্যবয়সী মানুষটির খালি গা। মালকোঁচা আঁটা ময়লাধুতি। গলায় লাল সুতো বাঁধা প্রকাণ্ড তাবিজ। উশকো কাঁচা-পাকা মাথা আর মুখময় অচ্ছেদ্যা কপচানো দাড়ি গোঁফ।

প্রসাদ তাকে দেখামাত্র বলে ওঠেন, এসো এসো গজানন, ঠিক সময়েই তুমি এলে।

কতক হাঁফাতে হাঁফাতে গজানন বলে, বেশি কথা বলার সময় নেই বাপ। যা করার এখনি করো।

প্রসাদ মুহূর্তে স্থির হয়ে যান। সুচারু দাড়ির আবডালে তাঁর চোয়াল কঠিন হয়ে যায়। দাঁত দিয়ে উপর ঠোঁট বরাবর পেষণ যন্ত্র নামে। নিঃশ্বাস পাত কিঞ্চিৎ বদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। তিনি শুধু বলেন, তাহলে খপর আছে কোনও?

গজানন ঝটিতি বলে, খপর আছে বৈকি। তা না হলে এমন করে দোড় দিয়ে আসি!

—বলো গজানন। খপর বলো।

—হুঁ, সেই চাঁড়াল বেক্তির নাম গণেশ। জলে ডুবে মরেছে, বিস্তব মদ খেয়ে নাইতে নেমেছিল বলে। বয়েস বেশি নয়, পঁচিশ তিরিশ।

—চমৎকার। তাহলে এবার বলো—শরীরে কুঠ রোগটোগ নেই তো?

—একদম পয়পরিস্কার। একটা ফুসকুড়ি অবদি নেই শরীরে।

—বেশ। তাহলে শরীরটি এখন কোথায় আছে শুনি?

—আজ্ঞে যথাযথ স্থলেই আছে। মরেছে আজ দুকুরের খানিক আগে। অপঘাত—তারপর কি সব নেশাপঘাত বলে টলে ওদের কুলপুরুত বিধেন দিয়েছে, বড়তির বিলের ধারে পুঁতে দাও। তাই দেওয়া হয়েছে আজ্ঞে।

প্রসাদ একবার ভজহরির দিকে কটাক্ষ করেন। ভজহরি সঙ্গে সঙ্গে মাথা কাৎ করে মিচকি গম্ভীর হাসে।

প্রসাদ বলে ওঠেন, তাহলে আর বিলম্বে কাজ কি ভজহরি।

ভজহরি দীর্ঘ সায় দেয়, ঠিক কথা, ঠিক কথা।

প্রসাদ নিচু স্বরে উচ্চারণ করেন, বড়তির বিল। অর্থাৎ বারিতির বিল। জোয়ার ভাটি হয়। গঙ্গার সঙ্গে যোগ আছে।

সঙ্গে সঙ্গে ভজহরি জানান দেয়, এখন হাঁটতে আরম্ভ করলে বড়জোর ঘণ্টাটাক লাগবে। যাকগে, আমি থালে তোমার ওই কারবারের জিনিসপত্তরগুলো জলদি করে গুছিয়ে নিই।

গজানন বলে ওঠে, কাল হল গে মঙ্গলবার। সেই সঙ্গে ভরা আমাবস্যে। আর আপনার বায়না মোতাবেক ওখেনে একটি বেলগাছও আছে।

—আর কি আছে শুনি?

—কেন নিঝুম জলাশয়। জনমানুষ নেই এমন তেপান্তর।

—বটে।

—বেশি বিলম্ব করবেন না আজ্ঞে। মড়াটা এখনও টাটকা আছে।

ভজহরি কটাক্ষ, রাখে, টাটকা।

গজানন গর্জে ওঠে, টাটকা বলে টাটকা। একেবারে সদ্য জালে তোলা মস্ত কালবোস মৎস একখানি।

আমাদের এই তিনতলা বাড়িটির মাথায় সন্ধে ঘনাচ্ছে। ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষী ঘুরছে আকাশময়, প্রকাণ্ড সব গাছপালা ঘিরে। তিনতলার ছাদের সানসেটে এইমাত্র এক জোড়া ভুতুম পেঁচা-পেঁচানি এসে বসল। জানান দিল, হুম হুম, হুম হুম। বঙ্কিম চাটুজ্যের শ্বশুর সম্পত্তির প্রকাণ্ড বাগানে সাবেক ভুতো বোম্বাই গাছখানি এমনিতে কালো, সর্বাঙ্গে লম্বা লম্বা শুঁড়ওয়ালা পরগাছা সমেত, এখন আরও খরতর কালোর দিকে যাচ্ছে। বাড়ির ভেতরে ভাঁড়ার ঘরে শাঁখে ফুঁ দিচ্ছেন লম্বা লম্বা টেনে টেনে আমাদের প্রপিতামহী বড়মা। এই শত ছুঁই ছুঁই বয়েসেও কি দম। ওদিককার ঘরে রেডিওয় সন্ধেবেলার রম্যগীতি

বাজছে। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের পরিচালনায় গান হচ্ছে, রোদে রাঙা ইটের পাঁজা, তার উপরে বসল রাজা, ঠোঙাভরা বাদাম ভাজা, খাচ্ছে কিন্তু গিলছে না...

ভেতরকার লম্বা বারান্দা বয়ে এসেছে আমাদের বাইরের ঘর হয়ে। ও ঘরের বাইরে একটি রোয়াক, দুধারে সিঁড়ি। পেছিয়ে এসে সদর দরজা। তার ওপারে প্রকাণ্ড খোলা রোয়াক। উঠোন, বাগান, ইঁদারা। ভেতর বারান্দা পেরিয়ে ডান হাতে ওপরে ওঠবার সিঁড়ি। ঠিক সেই ওঠার মুখে বাঁ হাতে জালের দরজা সাঁটা চোরকুঠুরি, ভেতরপানে লম্বা সেঁধিয়ে গেছে। রাতের বেলা তো কথা নেই, দিনমানেও বিকট কালো ঘুরঘুট্টি। লাইট জ্বেলে ঢুকতে হয়। ওখানে স্তূপ করা থাকে আমাদের বাগানের নারকোল পাতা চেঁছে বার করা ঝাঁটার কাঠির আন্ডিল। থাকে গোরুদের খাবার ভূষি, খোল, ডাল ভাঙা, পাতলা গুড়ের টিন। পাকা কলা কাঁদির বোঝা। বস্তা বোঝাই সুপুরি। কাতার দড়ি, বাগান সামগ্রী—কোদাল, খুরপি, নিড়েনি, শাবল, হেঁসো, নানা আকৃতির দা, ঘাস ছাঁটা কাঁচি। ইঁদারায় পড়ে যাওয়া বালতি, গেলাস ইত্যাদি ওপরে তুলে আনার ইকড়িমিকড়ি কাঁটা। চুবড়ির থাক। সন্দেহ করা, এ ঘরের কোনও কোণে চৌধুরীদের তিন নম্বর সোনার ইঁটখানা পোঁতা আছে। খুঁজলে এখনো পাওয়া যেতে পারে।

কালো রঙা চওড়া আর লম্বা সিঁড়ির ধার উঠে গেছে ওপরে। সিঁড়ির বুকে খোপ খোপ নকশা কাটা। ডান হাতে দোতলার দরজা। তারপরেই একতলার সঙ্গে মিল রেখে মস্ত দালান। দখিন দিকে প্রকাণ্ড চেহারার দরজাসম সার সার জানলা। বাইরের দিকে খড়খড়ি আঁটা দু-প্রস্থ কবাট, ভেতর বাগে পুরু সার্সি আঁটা আর একজোড়া পাল্লা। কবাট যাতে উড়ুক্কু বাতাসে না আছড়ানি খায় সে জন্যে জানলার পাটার গায়ে কাঠের ব্যাঙ বা ফিরকি সাঁটা। বারান্দার গায়ে বাঁ হাতে বাবা-মার শয়ন মন্দির। আর তারই গায়ে বারান্দার দিকে মুখ করা ঠাকুর্দা আর বড়মার ঘর। দুখানি ঘরই বৃহৎ। দৈত্যসম জানলাধারী আর আলো হাওয়াময়। তবে বারান্দার কড়ি বরগার ফাঁক-ফোকরে গোলা পায়রাদের সংসার গেরস্থালি।

তিনতলার সিঁড়ির আধখানা উঠে একটি বাঁক। ঠিক ওইখানে রাস্তার দিকের দেয়ালে একেবারে বর্তুলাকার বিচিত্র জানলা। তার গায়ে আধখানা চাঁদ আকৃতির দু-পাল্লায় নকসাধারী দু-টুকরো জানলা। তার গায়ে সবুজ রঙ। এপারে কালো বর্ণ দুটি পা রাখার পা-দান। পাশে ছোট বালতিতে জল. মগ। রাতে ভিতে দোতলার মানুষজন ওখানে প্রস্রাব সারে।

সিঁড়ি গিয়ে ঘা দিয়েছে তিনতলার ঘরে। দরজা খুললে ছোটো-খাটো ঘর। ভেতরে ঢুকে ওই ঘরের দেয়াল খাবলে—একটু উঁচুতে আর একখানি লম্বাটে গুহা ঘর। তিন তিনটি নিচু নিচু আর ছোট ছোট জানলা। একটি দরজা ছাদমুখো। এ ঘরের নিচে একটি গুপ্ত কুঠুরি আছে। মেঝের সঙ্গে সমান একটি চৌকোণা বিচিত্র ডালা। তার সঙ্গে লাগানো একজোড়া লোহার বালা। ডালার ওজন মস্ত। বালা ধরে টেনে তুললে রহস্য খালাস হয়ে যায়। নিচে প্রকাণ্ড ছ-কোণা গহ্বর কিংবা ঘর। ওপরের মেঝে থেকে নিচেকার দূরত্ব প্রায় এক মানুষ। মেঝের দু-ধারে হাত ভর করে নেমে পড়তে হয়। লোকশ্রুতি, এই ঘরস্য ঘরে রায়চৌধুরী জমিদারদের ধন দৌলত থাকত। থাকত হীরে জহরত। আমাদের দু-দুটো

বাগানের কলার কাঁদি খানিক পুষ্ট অবস্থায় বাবা এই গুম ঘরের পেটে নামিয়ে দেয়। একরাতেই সব কলা পেকে হলুদ। এত কলা যে কলা খাই, কলা মাখি, কলায় শুই এমত অবস্থা।

ছাদের দরজা খুললেই সেই পদ্যটির মতো, আনখ সমুদ্দুর। এত বৃহৎ বাড়ির মাথায় যাকে বলে ঠিক বাড়ি সই ছাদ। মাঝখানে বেশ খানিক তফাতে ছাদের ওপর ভেদ রেখা টানার কায়দায় আড়াআড়ি লম্বা আর দিব্যি চওড়া একটি বাঁধানো থাক। তার ওপর একটি টিনের বড় ভান্ডে মাটি ঢেলে ফণীমনসা গাছ। এটি নাকি বাড়িকে বজ্রপাত হতে রক্ষে করে। ছাদের আলসের যেদিকেই দাঁড়াও না কেন চোখ জুড়িয়ে যাবে। আম, জাম, সবেদা, জামরুল, নারকোল, তাল, খেজুর ইত্যাকার বাগানের মাথায় মাথায় হাওয়া খিলখিল। দেদার বাতাসের হু হু মেলা। মস্ত মস্ত বাড়িদের নিঝুম নিরীক্ষণ করা। অনেক ওপর থেকে দেখা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানুষ হেঁটে, সাইকেলে। ক্বচিৎ রিকশার পঁক পঁক। ছাতা মাথায় নিপাট বৃদ্ধ। ঝাঁকা কাঁধে টানা বাসনওয়ালার ঠন্ ঠনাত্ কাঁসর। বিহারি কেক বিস্কুট বিক্রেতার ফোকলা মুখো হাঁক, কেকআলা-ম্-ম্। আমরা শুনি কি খাইলাম-ম্-ম্। অথবা নিঝঝুম দুপুরে—কুলফি মালাই-ই-ই। হঠাৎ হঠাৎ এক বিহারি মোটা থলথলে বৃদ্ধের ভাঙাচোরা তৈজসপত্র, খবরের কাগজাদি খরিদের বিচিত্র সুরে ছড়া কাটা, ভাঙা পিতল ভাঙা, কাচকড়ুয়া ভাঙা, বই হো বই—। বুড়োর পেছনে ছেলেপুলেরা লাগলে সে ধুতি তুলে অস্থান দেখায়।

হিসেব না করলেও প্রমাণ হয় বঙ্কিমবাবুর গোলাপি রঙা দোতলা শ্বশুর বাড়িটি আমাদের বাড়ির থেকে উচ্চতায় কম হলেও আড়ায় একইরকম। আর ও দিকটায় যেন গাছ গাছালের রাজত্ব ঠাসা। যাকে বলে সবুজঘন জঙ্গলগড়। ও বাড়ির মালিক ক্ষিতীশদাদু। হাতে সবসময়েই ফোঁকা কল। মানে হাঁপানির ইনহেলার। ভারী সুপুরুষ এই বৃদ্ধ। চওড়া ছাতি, বৃষস্কন্ধ আর গৌরবর্ণ। গলায় পৈতে পাক দিয়ে পরলেও ঠাকুর দেবতা মানেন না। একদা রেলে চাকরি করতেন। এখন সারাদিন এক টঙধারী চেয়ারে বসে বিকটশব্দী মারফি রেডিওয় সেন্টার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সারা পৃথিবীর সংবাদ শোনেন—হরেক ভাষায়। মাঝে মধ্যে উচ্চাঙ্গ সংগীত। নিয়মিত 'আনন্দবাজার' আর 'বেতার জগৎ' রাখেন। আর পাড়ার রিফুউজি কলোনির গরিব মানুষদের ছেঁড়া জামাকাপড় পা দিয়ে চালানো উষা মেশিনে সেলাই করে দেন। দুপুরে পিঁড়িতে বসে ভাত খান মস্ত থালায়। চারদিকে গণ্ডা গণ্ডা বেড়াল চোখ মটকায়। দাদুর ভাত খাওয়া দেখার মতো। কানা উঁচু থালায় ভাতের সঙ্গে রুটি ছিঁড়ে দেন। এবার তাতে ভাতের মাড়, দুধ, ডাল, তরকারী, মাছ, অম্বল, পাকা আম, কলা সব একত্রে চটকে মটকে হাপুস হুপুস মুখে তোলেন আর থেকে থেকে ফোঁকা কল টানেন। মাঝে মাঝেই বেড়ালদের ওই মণ্ড না পিণ্ড ছুঁড়ে দেন।

বঙ্কিম ডেপুটির কন্যা শরৎকুমারী দেব্যার কাছে হতে এ বাড়ি কেনেন দাদু। তারও আগে একখানি দলিল আছে। তার টুকরো অংশ, '...এক্ষণে কোনও তীর্থস্থানে বাস করিবার আমার নিতান্ত মানস হইয়াছে। তুমি আমার পরম উপকার করিয়াছ...সৎকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণ। অতএব উপরোক্ত সমুদয় সম্পত্তি জমি জেরাত বাগ

বাগিচা বাস্তু পুস্কর্ণি ইত্যাদি স্বামী মহাশয়ের স্বর্গার্থে তোমাকে দান করিয়া লিখিয়া দিতেছি...।'

দলিল লেখা হচ্ছে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে। দানপত্র করে দিচ্ছেন বঙ্কিম শাশুড়ি নৃত্যকালী দেব্যা।

এগারো

বঙ্কিমচন্দ্রের এই শ্বশুর বাড়ি—তাঁর মেয়ে শরৎকুমারীর হাত ফেরতা হয়ে কিনে নিলেন আমাদের ক্ষিতীশ দাদু, যিনি সদাই ফোঁকাকলধারী শ্বাসরোগী আর চমৎকার সুদর্শন। আমার মাঝে মাঝে মনে হত সিনেমার ছবি বিশ্বাসের আদল যেন থাকলেও থাকতে পারে। ছবি বিশ্বাসকে তো আমি দেখিনি তবে রেডিওয় শাজাহান নাটকে যখন উনি 'জাহানারা' বলে হাহাকার করতেন তখন ক্ষিতীশ দাদু তাঁর আধপাগল বড়োছেলে গোপালকাকার সঙ্গে মাঝে মাঝে যেভাবে কথা বলেন—তা মিলে যায়। উক্ত গোপালকাকা কাঁচরাপাড়া রেল ওয়ার্কশপে কেরানি। ভালো ছাত্র ছিলেন স্কুলে। প্রচণ্ড নস্যি খোর। এখানে পুনরপি বলে নেওয়া ভালো, গোপালকাকা আমাদের চৌধুরীপাড়ার অজস্র বনেদি পাগলদের একজন। সকালে অফিস সাইকেল করে আর একঘণ্টার মধ্যে ব্যাক টু প্যাভেলিয়ান। জামা-প্যান্ট ছেড়ে সাত বাসটে লুঙি, খালি গা আর ট্যাঁকে সচিত্র নস্যির রুমাল। স্বভাব মতো আপনমনে সদাই বিড় বিড়। মস্ত বাগানে ইতস্তত ভ্রমণ। শীতকালে অগুণতি খেজুরগাছে রস কামনায় হাঁড়ি বাঁধা। বাড়িতে থাকলে বাবার সঙ্গে মুখে মুখে প্রায় খণ্ডযুদ্ধ। বাসন কোশনে দুম্ দাম্ লাথি। পুরনো ৭৮ রেকর্ড পাঁজা তুলে চুরমার। আর তখনই গান প্রিয় দাদুর জাহানারার বদলি আর্ত শ্বাসকাতর চিৎকার, গোপাল গোপাল---। দাদুর চোখের সামনে টুকরো টুকরো হচ্ছেন, গওহরজান, বেদানাদাসী, কে মল্লিক, জমিরুদ্দিন খাঁ, মিস লাইট...। গ্রামাফোন কোম্পানির চোঙা মুখে কুকুর আঁকা টিনের বাক্সো উঠোনে কেতরে পড়ে ফ্যাক্ ফ্যাক্ হাসছে। দাদু আর্তনাদ করছেন। গোপাল—গোপাল। আবার এই গোপালকাকা ঘনঘটার একটু পরেই পুকুরধারে হাতছিপ ফেলেছেন কেঁচোর টোপ সহকারে। টুপ টুপ ফাতনায় টনক নড়ছে। গোপালকাকা আপন মনে তাঁর নস্যপূর্ণ খোনা খোনা বেসুরো গলায় গেয়ে চলেছেন স্বরচিত মৎস সঙ্গীত, খাঁবি খাঁ, না খাঁবি খাঁ। খাঁবি খাঁ—ঘুরে ফিরে এইমাত্র দুটি কলি। কি অনবদ্য ভাবানুভূতি আর অকৃত্তিম আকাট পরিবেশন।

মনে ভাবি বঙ্কিম যদি গোপালকাকা বা এ বাড়ির পরিবেশ পরিস্থিতি দেখতেন তাহলে নির্ঘাৎ নিজের লেখা থেকেই আওড়াতেন, 'সচরাচর মনুষ্যের বোধ এই যে, গতি জগতের বিকৃত অবস্থা, স্থিরতা জগতের স্বাভাবিক অবস্থা। কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিলে বুঝা যাইবে যে, গতিই স্বাভাবিক অবস্থা; স্থিরতা কেবল গতির রোধ মাত্র।'

সেই সঙ্গে কি আশ্চর্য, মাত্র বাইশ বছরে বিপল্লিক কুঞ্চিত কেশ আর গৌরবর্ণ যুবাপুরুষ, যাঁকে প্রকাশ্যে অশ্রুপাত করতে কেউ কখনও দেখেনি, তিনিই সুদূর যশোহরে ডেপুটির চাকরি করতে বসে নিভৃতে অশ্রুপাত করেছিলেন, 'মনে করি কাঁদিব না রব

অন্ধকারে, আপনি নয়ন তবু ঝরে ধারে ধারে, গোপনে কাঁদিবে প্রাণ সকলি আঁধার, জীবন একই স্রোতে চলিবে আমার।' মৃত্যুকালে বঙ্কিমের মনলোভা সেই সখীটির বয়েস মাত্র ষোলো।

আরও আশ্চর্য, দ্বিতীয় বিবাহ করতে না চাওয়া এই যুবা অবশেষে বাবা-মার উপরোধে হ্যাঁ দিলেন। সেই কোনওমতেই হ্যাঁ মাত্র চতুর্দিকে পাত্রী খোঁজার জাঁক পড়ে গেল। জনাকয় ঘটক নিযুক্ত হল। দিকে দিকে ঘটক ছুটল পাত্রী অন্বেষণে। এদিকে একখানা বাসোপযোগী বড় বোট ভাড়া করা হল। বঙ্কিম অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র আর স্বয়ং বঙ্কিম ভেসে পড়লেন নদীপথে।

এদিকে, ইতিহাসের এঁটোকাটা এক ব্যক্তি, আমাদের এই হালিসহরেরই, যার কাছে বাংলা সাহিত্য ও সমাজ ঘুরপথে আকণ্ঠ ঋণী, নাম তার তারানাথ। এ কথা হিসেব না করেই বলা যায়, এই তথাকথিত সাবঅলটার্ন তারানাথ না থাকলে বাংলা সাহিত্য সংসারে বঙ্কিমচন্দ্র বুঝি একটি বয়ে যাওয়া মানুষ হিসেবে কোথায় তলিয়ে থাকতেন। কেননা স্ত্রী রাজলক্ষ্মী সম্বন্ধে তাঁর অকপট কথন, '...এক জনের প্রভাব আমার জীবনে বড় বেশি রকমের—আমার পরিবারের। আমার জীবনী লিখিতে হইলে তাঁহারও হয়। তিনি না থাকিলে আমি কি হইতাম, বলিতে পারি না।'

আর আমাদের গর্ব ইতিহাসের আঁদাড়ে উধাও সেই তারানাথকে নিয়ে, যার ঘটকালির কলকাঠি না থাকলে বাংলা সাহিত্যে সম্রাটের আসনটি বুঝি শূন্য রইত। সে যাইহোক, এই ঘটক যতবার পাত্রীর তত্ত্ব নিয়ে নৈহাটির কাঁঠালপাড়ায় গেছেন ততবারই দেমাকি চাটুজ্যেরা তাকে হাত নেড়ে হাঁকিয়ে দিয়েছেন। এমনকী বোটে চড়ে পাত্রী দেখতে বেরোবার আগ মুহূর্তেও তারানাথ কাঁঠালপাড়ায় উপনীত হয়ে বেহায়ার পানা নিবেদন রেখেছিল, বাঁশবেড়ে যাওয়ার আগে যদি মশায়রা একটিবার হালিসহরে নেবে পাত্রীটি দেখে যান। এখানেও অপমান আর হাঁকানি এল চাটুজ্যে ডেপুটিদের তরফ থেকে। ঘটক কিন্তু নাছোড়। তার অলখ বিধি হয়তো ভেবে রেখেছিলেন ভাবী বাংলা সাহিত্যের কথা। সেই জন্যেই বেচারী সে রাতেই বাঁশবেড়িয়ায় দীনবন্ধুর শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে হাজির। বলাবাহুল্য, চাটুজ্যে দুই তখন সেখানে মজুদ। তাঁরা যুগপৎ বিরক্ত ও হতবাক এই নেই-আঁকড়া ঘটকটিকে দেখে। তখন হতচ্ছেদ্দা বঙ্কিম উক্তি করলেন, 'এত কাছে যখন এসেছি, তখন দেখে গেলে ক্ষতি কি। অন্তত তারানাথের হাত থেকে তো পরিত্রাণ পাওয়া যাবে।'

তারানাথের উদ্দেশ্য এবার সিদ্ধির পথ দেখল। পরদিন তিনজন মিলে কনে দেখতে এলেন নদী পার হয়ে—হালিসহর চৌধুরীপাড়ায়। কন্যা দেখে বঙ্কিমের প্রথম দফেই পছন্দ হয়ে গেল। কিন্তু সদ্য ম্যালেরিয়া থেকে ফিরে আসা রোগাভোগা শরীর দেখে সঞ্জীবচন্দ্র মোটে পছন্দ করলেন না। কিন্তু বঙ্কিম তাঁর স্বভাব মতনই অনড়। তিনি বলে উঠলেন, আমি একেই বিবাহ করব।

বলে নেওয়া ভালো, বিপত্নীক হওয়ার আটমাস পরে বঙ্কিম দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করলেন। আর হালিসহর চৌধুরীপাড়ার সূত্রে আমি মনে মনে কালাকাল টপকে তাঁর সঙ্গে মিঠে কুটুম্বের সম্পর্ক, শালা পাতিয়ে ফেললাম। প্রথম প্রথম ভাবলে রোমাঞ্চ হত,

বঙ্কিমচন্দ্র আমার জামাইবাবু—মানে রাজলক্ষ্মী দিদির বর। সঙ্গে সঙ্গে মন খারাপও হয় বৈকি, বেচারি অভাজন তারানাথের কথা ইতিহাস মনে রাখেনি বলে।

স্কুলের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে আমাদের স্পোর্টস টিচার সদানন্দবাবু স্যার মালকোঁচা ধুতি শার্ট এঁটে আকাশে মুখ তুলে তীক্ষ্ণ গলায় গাইছেন বন্দেএএএএএ, মাতরম্...। মনে মনে রোমাঞ্চ হচ্ছে—পুজো এল বলে। রেডিওয় 'চারঅধ্যায়' নাটকে এলার বুকে রিভলবার দেগেছে অ্যানারকিস্ট অন্তু। ব্যাকগ্রাউন্ডে ঝোড়ো কোরাসে—বন্দেমাতরম্ দম্‌কা তুলছে। শুনে বুকের মধ্যে কেমন করছে। আবার 'জরুরি অবস্থা' ও তার আগে পরে বন্দেমাতরম হুঙ্কার রাত্ত নিশুতি কিংবা দিনমানে বুক বরফ ঠান্ডা করে দিচ্ছে। আমার জামাইবাবুটি একটি ধ্বনি বার করেছেন বটে!

সামিষান্ন, গুড়, সুরা, পায়স, পিষ্টক, কয়েকবিধ ফল, নৈবেদ্য এবং যথার্থ পূজাবিহিত দ্রব্য আনা হয়েছে এই বড়তি বা বারিতির বিলধারে। আনা হয়েছে দুগ্ধ, মূল। ফুল, চন্দন, বিল্বপত্রাদি। এ সবই ধামায় বোঝাই করে এখানে বহন করে এনেছে ভজহরি আর সেই খপর টেনে আনা গজানন। সঙ্গে এসেছে বলিদানের জন্য এক ছাগশিশু। তৈজসাদি নামিয়ে রাখা হয়েছে বিলধারের একখানি বেলগাছ তলে।

এখন—এই মঙ্গলবারের অপরাহ্ন, কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতিথিময়। সাধনের যথার্থ সময় আসতে এখনও দেরী আছে। রজনী সার্দ্ধপ্রহর গত হলে শব স্থাপন করা হবে বেলগাছ তলে। তন্ত্রোক্ত বিধান মতে শ্মশানের বদলে এই বিল্বতলেও বীরসাধন করায় কোনও নিষেধ নেই। তাছাড়া এমন মনোহারি নিভৃত সৌন্দর্য তো রামপ্রসাদ কবির কাছে অতিরিক্ত মধুক্ষরা। পুনঃপুনঃ মনে পড়া হেতু কবিতা ও কালিকার সম্মিলনের এ বড় ভারী আজব স্থান। ফলে এখানে বিশ্বজননী কালিকা দেব্যার যথারীতি বদনমণ্ডল বলাকবলী সমান, বিদ্যুৎকান্তি দন্তপংক্তি কটাক্ষ করে, দেহখানি মুণ্ডমালাবলী দ্বারা সুশোভিতা, মুক্তকেশী ও দিগম্বরা, এই বিশ্বেশ্বরী ও বিশ্বজননী কালোমেঘের বর্ণধারিণী। তিনি লোলজিহ্বাময়ী, লোচনত্রয় অলক্তবর্ণ এবং ভয়ঙ্কর রবময়ী। তাঁর মুখমণ্ডল হতে কোটিচন্দ্র বিগলিত হচ্ছে। এই চতুর্ভুজা দেবীর চারি হস্ত খড়্গ, মুণ্ড এবং বরাভয় শোভিত। তিনি প্রেতরূপী শিবের উপর আরূঢ়া এবং মহাকাল-এর বুকে সংস্থিতা। সেই মহাকাল প্রদীপ্ত সোনার পারা লোমরাজি বিশিষ্ট, যোগনিদ্রাভিভূত, মহাঘোর দর্শন, জটাজাল আর উশৃঙ্খল দাড়ি মণ্ডিত। তাঁর যোগনিদ্রিত মুখকমল ঈষৎ হাস্যময়। এখানে দেবী কালিকে মহাকালের বিপরীত সুরতে আসক্তা।

রামপ্রসাদ এমত পরিবেশে আরও একবার মনে মনে বীরতন্ত্রের বিধান নিচয় স্মৃতিতে আনতে চান। তন্ত্র বলছে, সার্দ্ধপ্রহর রাত্রি গত হলে পর চিতাস্থানে একটি শব এনে মন্ত্রধ্যাণপরায়ণ হয়ে হিতসাধন কার্য করবে। এই সাধনকালে সাধক যেন ভীত না হন। হাস্য পরিহাস যেন দমন করেন। কোনওদিকে অবলোকন না করে কেবল মন্ত্র জপ করে যাবেন। মহানির্বাণতন্ত্র বলেছেন, বীরসাধন কর্মাণি প্রত্যক্ষাণি কলৌ যুগে। এই কলিযুগে কেবল বীরভাবের সাধনাই প্রত্যক্ষ ফলদায়ক। যেমন কিনা সে ফললাভ কবিতার ক্ষেত্রেও কিছু ঘুর পথে অশেষ ফলবতী। কে জানে, শবোপরি সাধন সাধলে তা কোনও অভিনব

আর নবীন কবিতার মুখের আভাস এনে দিতে পারে হয়তো। আহা, সেই সময়টি যে কি অভিরাম পরমানন্দী।

আসলে, এ কথা তো সার যে তন্ত্রোক্ত ষটচক্র নিরূপণ আদপে পরমানন্দ লাভের কথাই ঘোষণা করে। এই আনন্দ এ দেহের মূলাধার চক্র থেকে সহস্রার পদ্মদল পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। আর এই তত্ত্বের রচনাকার অথবা শ্রীতত্ত্বচিন্তামণিঃ গ্রন্থের জন্মদাতা শ্রীমৎপূর্ণানন্দ আদপে ছিলেন এ বঙ্গেরই ময়মনসিং-এর অধীন কাটিহালী গ্রামের সুসন্তান। তিনি রাঢ়িয় ব্রাহ্মণ। পাকড়াসি গাঁই। তাঁর পূর্বপুরুষ অনন্তচার্য মুরসিদাবাদের অন্তর্গত বড়নগর হতে ময়মনসিংহ গিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে প্রবাদ এই যে যবন বিভীষিকাই আচার্যকে গঙ্গাক্ষেত্র ত্যাগ করে বহুদূরের জনবহুল প্রদেশে বিতাড়িত করেছিল।

এ সব ইতিহাস মনে হলে প্রসাদ বিমনা হয়ে পড়েন। মানুষে মানুষে বিজাতীয় বিসম্বাদের কথায় মন অবনত হয়ে যায়। অনন্তাচার্যের দেশ ছেড়ে পরবাস যাত্রা ইতিহাসের দলিত দুঃখকথার ঘোষণা দেয়। সেদিন অযোধ্যানাথের ইশারায় আলিবর্দীর দৌহিত্র সম্পর্কে যে সব কথা উঠে এল, যে সব বিজাতীয় নিপীড়নের সমাচার রটিত হল, তার সঙ্গে এই পণ্ডিত বিতাড়নের স্মৃতিকথা কেমন যেন জড়িয়ে মডিয়ে রয়। প্রসাদ মন থেকে মনখানি সরিয়ে নিতে চেয়ে বারত্রয় গম্ভীর উচ্চারণ করেন, কালী-কালী-কালী।

এই বারত্রয় উচ্চারণের চাপা ও গভীর তাড়নায় রামপ্রসাদ মনোমাঝারে মূলাধারচক্র চতুর্দলের চার চারখানি রক্তবর্ণ পত্রের আভাস টের পান। আহা, দক্ষিণাবর্ত এই চারদলি পদ্মের চারিবর্ণ যে ব-শ-ষ-স। তারা সকলেই সোনার বরণী। এখান হতে যাত্রা আরম্ভ করে কুণ্ডলিনীর দিকে এ এক গুপ্ত ক্রিয়ার পাড়ি। সেই যাত্রাপথে, যদিও মূলাধার পদ্মের মুখ সদাই আনত, তাই চিন্তার কালে উর্দ্ধমুখরূপ চিন্তা করতে হবে। কেন না, শেষ গতি তো কুলকুণ্ডলিনীর মহাজাগরণ।

কিন্তু, আজ যে প্রসাদের মনে মনে কেবলই অসম্বিত ভাবনা-যা কি না দেশকাল বিড়ম্বিত। এই শবসাধনের উদযোগ করতে বসেও অযোধ্যানাথের সেদিনের সমাচার বাদেও গাঙে ভেসে আসা মাঝি মাল্লাদের মুখে আলীবর্দীর নবীন দৌহিত্র সিরাজদৌলা বিষয়ে মনে মনে উতরোল ঘটে চলে। সে উতরোল দেশবাসীর মানস ত্রাসেরই ছটাধারী। এসব কথা হরেক পণ্ডিতবর্গ নানাভাবে বিবৃত করে চলেছেন লিখিত রচনার দ্বারা। এঁদের মধ্যে আছেন ইংরাজ ছাড়াও আরবি ও ফরাসি ঐতিহাসিকরা। সিরাজের নবাব হওয়ার আশঙ্কায় তাঁরা বলে বেড়াচ্ছেন, এই যুবক নিষ্ঠুর, উদ্ধত, নির্দয় আর আপাদমস্তক দুশ্চরিত্র। সিয়র গ্রন্থের লেখক গোলাম হোসেন খান লিখে দিচ্ছেন, অজ্ঞ অর্বাচীন এই যুবক। সে পাপপুণ্যের বা ন্যায় অন্যায়ের কোনও তফাৎ করে না। হৃদয়ে দয়া মায়ার লেশমাত্র নেই। সেই সঙ্গে রূঢ়ভাষী, হৃদয়হীন। অজ্ঞতা আর অহমিকায় সে বিকৃতমস্তিষ্ক। যৌবন, ক্ষমতা আর আধিপত্যের নেশায় এই যুবক আত্মহারা। অপব এক ইংরাজ কুঠিয়াল লিউক বলছেন, সিরাজ সর্বদাই লাম্পট্য ও অতিরিক্ত মদ্যপানে ডুবে থাকেন। তাঁর ইয়ার-দোস্তগণও অতীব নিকৃষ্ট স্তরের মানুষ।

তথাকথিত বনবাসী রামপ্রসাদ দিব্য ভালো করে জানেন যে মির্জা মহম্মদ

সিরাজদৌলা নবাব আলিবর্দীর তৃতীয়া কন্যা আমিনা বেগম আর আলিবর্দীরই ভাই হাজি আহমেদের পুত্র জৈনুদ্দিন আহমেদের খোদ পুত্র। ফলত এই সিরাজ আলিবর্দীর নাতি। এই চরিতমালায় এক টুকরো ক্ষুদ্র কন্টক আছে। তা হল আলিবর্দীর প্রথমা কন্যা মেহের উন্নিসা বা ঘসেটি বেগম। তার বিবাহ হয়েছিল হাজি আহমেদের বড় ছেলে নওয়াজিস মহম্মদের সঙ্গে।

প্রসাদ এ কথাও স্মরণে রাখেন যে সিরাজ আলিবর্দীর প্রায় চক্ষে হারা। নাতিকে নবাব কখনওই কাছ ছাড়া করেন না। নবাব সিরাজকে হাতে কলমে রাষ্ট্রনীতি, শাসনকার্য ইত্যাদি নিজ হস্তে শেখাতেন বাল্যকাল হতে। নাতির যাবতীয় অপকর্ম তিনি দেখেও দেখেন না। শুনেও শোনেন না। ফল যা হয় তাই ফলল। মাতামহের অন্ধ আদরে সিরাজ এক নষ্ট চরিত্র উন্মত্ত বালকে পরিণত হল।

এখানে এসে প্রসাদ অনুভব করেন শবসাধনের প্রস্তুতিপর্বে এসেও তাঁর মন জোড়া দেশকাল কখনওই বিচলিত হয় না। অথচ আপন পরিপূর্ণ সংসারের প্রতি, তার সব থেকেও প্রায় কিছু না থাকা নিত্যি অনটনের দিকে তাঁর মন অচঞ্চল। কালিকা আর কবিতার উর্ধ্বে বা অধে তাঁর জন্য আর কোনও জীবন সাজানো নেই। এর অপর নাম কি স্বার্থপরতা! কালিকাময়ী কবিতা কি এতই একালষেঁড়ে।

রামপ্রসাদ অপরাহ্নময়ী এই বিল্বতলে বসে বসে দেখছেন অগাধ জলসঞ্চারী এই বারিতি বিলের মোহ। এত বড় দেহধারী জলাশয়ে হু হু বাতাস বইছে দেদার অনিয়মী। জলে প্রকম্পিত স্রোত দ্রিমি দ্রিমি কম্পন তুলছে যথা ইচ্ছা। এপার থেকে ওপার দেখা যায় না। শুধু তার আবছা আভাসটুকু জেগে রয় ওখানকার নিবিড় গাছপালার কৃষ্ণাভ সবুজে। আর দুধারের বনজ গাছ—যজ্ঞডুমুর, পিটুলি, কালো জাম, হরিতকি, বট, অশ্বত্থ ইত্যাকার চেনা অচেনা গাছেদের জড়াজড়ি ধরাধরি এ স্থানটিকে অগম রহস্যময় করে রেখেছে। মনে হচ্ছে এমন নিভৃত বিরলতম সংসার বুঝি সংসারেই উর্ধ্বে কোনও অপর লোক। এখানে লোক বা মনুষ্য বলতে আপাতত তিনজন। রামপ্রসাদ, ভজহরি আর ওই অনুগত গজানন।

ভজহরি কথা বলে, হুঁ, থালে নৈবিদ্যিগুলো সাজিয়ে ফেলি।

প্রসাদ মাথা হেলান নীরবে।

ভজহরি আবার বলে, আর বলিদানের দ্রব্যগুলো? মানে মাছ, অন্ন, গুড়, ছাগল, মধু পিষ্টক, পরমান্ন, দুধ, ফলমূল।

প্রসাদ শুধু বলেন, চারদিকে চারটিপাত্র। আর মধ্যে তিনপাত্র।

ভজহরি তাকায় গজাননের মুখপানে। কেমন যে অপরিচিত দূর হতে কথা কচ্ছেন রামপ্রসাদ! এরকম কণ্ঠস্বর সচরাচর শোনা যায় না। গলায় যেন বা দূর আকাশের মেঘ ভর করেছে। মেঘে মেঘে নিরন্ধ্র ওই স্বর। কি জানি কি হল এখন!

রামপ্রসাদ আত্মগত স্বরে নাদ গভীর বলে ওঠেন, হুঁ, এখনও সময় আছে বিস্তর। সাধনের সময় তো রজনীর সার্দ্ধপ্রহর পার।

গজানন ও ভজহরি মুখ তাকাতাকি করে।

প্রসাদ বলে যান,

কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্তিতঃ।
মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা।।
কালসংগ্রহণাৎ কালী সর্বেষামাদিরূপিনী।
কালত্বাদাদিভূতত্বাদাদ্যা কালীতি গিয়সে।।

ভজহরি ফস্ করে বলে, থালে মানেটা কি শুনি।

প্রসাদ মেঘার্ত স্বরে বলে যান, সর্বপ্রাণীকে কলন অর্থাৎ গ্রাস করেন বলে তিনি মহাকাল বলে প্রকীর্তিত হয়েছেন। তুমি মহাকালকে গ্রাস কর, তাই তোমার নাম আদ্যা পরমা কালিকা। তুমি কালকে গ্রাস কর, তাই তুমি কালী।

অবেলা আরও অধিক গভীরতর অবেলার খাতে নামতে বসে। বিলের জলে ছায়া গাঢ়তর হয়। জলাশয়ের দু-তীরবর্তী নিবিড় গাছশ্রেণির বুকে পিঠে ঘর ফিরন্তি পাখিরা কল কল, কল কল করে। ঝিঁ ঝিঁর পাল ডাক দেয়।

বারো

গভীরতর অবেলার খাতে এই বর্ষা দিনের ভারী আশ্চর্য কটাক্ষ মোহ পাত-এর মুখ সাপটে ধরেছে বারিতির বিলধারে। রাগ-রাগিনীর ছকে এ সময় অবশ্যই সেই ইমনের। আহা, কারা সব এত কলস্বর দেশকালে হিন্দু-মুসলমানের বিসম্বাদ নিয়ে। কবিতার শরীরে গীত আরোপ করতে গেলে তো সেখানে একটি রাগের অনুপান লাগে। এখন এই অধোগামী দিন শেষের কালে সেই ইমন রাগের কথাই মনে পড়ছে, যেটি নাকি মিঞা তানসেন বাদশাহ আকবরের দরবারে বসে পরিবেশন করতেন। সেই সুরের ছটা এখন প্রকৃতির অঙ্গরাগ। হিন্দু যবন হানাহানির বহু উর্দ্ধলোক দিয়ে বয়ে চলা অভিরাম সুরধুনী এক। আর সেই পটমণ্ডল ঘিরে ওই বিশাল জলরাশির বুকে আবর্তিত হচ্ছে কি এক অলখে, এই অনন্তরূপমধ্যে কালীরূপা প্রকৃতিই সর্ব অপেক্ষা মনোহর।

বারিতির বুকে শ্রাবণের মেঘ সন্নিপাতি আকাশ বুঝি নেমে এসে নিজ মুখ দেখেই চলে। দু-পাঁচ বিন্দু টিপ টিপ হয়। বিলের পটে হিলহিলিয়ে সাড়া দেয় অগণিত পদ্মকুঁড়ি। তল থেকে মৃদু ঘা দেয় জলসর্পের লেজ। বৃহৎ শোল মাছটি তার কচি ছানা পোনাদের নিয়ে আগলে আগলে চলে। প্রাচীন বোয়াল মাছ ঘোরতর পাঁকে মুখ রেখে একধারে ঘাপটি দিয়ে বসে শুধু অলস নিরীক্ষণ করে। আকাশ হতে জল অতল রসাতল অবধি কালীকার সংসার ব্যাপ্ততর হতে থাকে।

এই কালী প্রকৃতই করালবদনা, ত্রিলোচনা, ঘোরদংস্ট্রা, শবের কর পঙতির গহনাময়ী এবং দিগম্বরী।

তিনি মহাকালের উপর বীরাসনে সমাসীনা, তাঁর ওষ্ঠের প্রান্তভাগ আকর্ণ টানা এবং তিনি ঘোর নাদিনী।

তিনি মুণ্ডমালা চ্যুত রক্তের দ্বারা চর্চিত, তাঁর স্তনদ্বয় অতি বৃহৎ। মদিরাপানে প্রমত্তা হয়ে তিনি সমগ্র মেদিনীকে প্রকম্পিত করছেন।

তাঁর বাম হস্তে খড়গ আর দক্ষিণ হস্তে ছিন্নমুণ্ড। তিনি বরাভয় প্রদায়িনী, ঘোর বদনা আর জিহ্বা চপলা।

এই দেবীর কর্ণ পক্ষীপালকযুক্ত বাণের দ্বারা ভূষিত। তিনি আগত প্রলয়ের মতো ঘোর রবধারী শিবাদের দ্বারা সেবিতা।

প্রচণ্ড হাস্য, প্রচণ্ড নাদ, আর প্রবল কলরবের দ্বারা জয়শব্দ পরায়ণ ভৈরবগণ তাঁর সমীপে নরকঙ্কাল ধারণ করেছে। শ্রাবণের আকাশ জোড়া ত্রিনয়নীর মাথার মরকত মুকুট চূড়া, মেঘ হতে মেঘান্তরে দ্যুতি ছলনা রচনা করেছে। কোথাকার কোনও অমর্ত্য আকাশ কোণ থেকে পাঠানো নবজলধর অন্তরীক্ষে দ্রিমি দ্রিমি মৃগঙ্গ বাজাচ্ছে। আর বাজছে ঝাঁঝর, করতাল। থেকে থেকে মেঘ নিরন্ধ্র ঘর্ষণে ত্বরিত আলো ছিল্‌কে উঠছে। সে আলোয় স্ফটিকের রহস্য। কালীরমনীর কটাক্ষ। আর সেই কটাক্ষ বিস্তারে মেঘে মেঘে জটিল বোঝাপড়ায় আকাশ আর বুকের অভ্যন্তর হতে নাদ উঠছে, ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং, হ্র হ্র হূং হূং ক্রীং ক্রীং ক্রীং...

আকাশ এবং বুকের অভ্যন্তরে এই নাদ গুড় গুড় করে চলে। শরীরের আনাচে কানাচে কি এক বিচিত্র কলক্রিয়া হতে থাকে। এদিকে আকাশ হতে অতি নিবিড়ে টিপি টিপি জল পাত ঘটে চলেছে খানিক বিরতি বরাবর। বারিতির অগাধ জলরাশির বুকে অন্ধকার সন্তরণ দিতে আরম্ভ করেছে—এপার ওপার এবং দুধার ঘোর করে। কালীরমনীর ঘন কৃষ্ণ বর্ণের শ্রমজল বা ঘর্ম এই বিপুল চরাচর অঙ্গে মেখে চলেছে অবিরত। বিলের জলে পদ্মবন ঠেলে হাওয়ার চপল স্রোত বইছে। বিলধারের গড় জঙ্গল হতে কুতুহলী মুখ বার করে বন্য শিবাদল একে একে ডাকতে আরম্ভ করেছে। রামপ্রসাদ দুচোখ ভরে এই অপার্থিব প্রাকৃতিক লীলা দেখছেন। তাঁর হৃদয় হতে নাদ উঠছে,

কাল মেঘ উদয় হল অন্তর অম্বরে।
নৃত্যতি মানস শিখী কৌতুকে বিহরে।।
মাভৈঃ শব্দে ঘনঘন গর্জে ধারাধরে।
তাহে প্রেমানন্দ মন্দ হাসি তড়িৎ শোভা করে।।

অদূরে বসে, এই টিপির টিপির বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ভজহরি আর গজানন একে অপরের মুখ তাকাতাকি আর উশখুশ করে। প্রসাদী উন্মত্ততার সঙ্গ মুখ বুঁজে করে গেলে কেবল ভেজাই সার। তাঁর আর কি। হাতের কাছে তো মস্ত দু'খানি মেটে হাঁড়ায় সুরা তৈরিই আছে। কিন্তু আমরা কি অপরাধ করেছি, যে একটু শুকনো শেকড় বাকড়েও দম দিতে পারব না। নিকুচি করেছে!

প্রসাদ আপন মনে বিল্বতলে গেয়ে চলেন। আর তারা দুটিতে একটু আড়ে আড়ে বসে সপ্তমী সাধাব ব্যবস্থা করে চলে।

ভজহরি বলে, চলবে নাকি ভায়া!

গজানন অবিলম্বে নিচু গলায় বলে, না চললে বিষ্টিতে ভিজে যে কাঁপ ছটকে যাবে।

কুট কুট, কুট কুট, ছুরিতে শেকড়-বাকড় কাটা ছাঁটা হতে থাকে। ঠিক তখনই প্রসাদ একটি নারিকেল মালায় মেটে ঘড়া কাৎ করেন। কলকলিয়ে আসব নেমে আসে। আর তখনই তার তীব্র মদির গন্ধে বিলধারের পরিবেশ আরও সঘন হয়ে ওঠে। মস্ত

চরাচরখানি মুহূর্তে ওই পানপাত্র বন্দী হয়ে যায়। প্রসাদ উচ্চারণ করেন, কালী, কালী, কালী।

ভজহরি-গজানন চমকে দেখে প্রাসাদের এই গভীর নাদ আঁধার বিল বরাবর একটি ডাহুক পক্ষী হয়ে উড়তে উড়তে চলে যায়। পাখিটির ঘোর কৃষ্ণ রং এই আঁধার শ্রাবণ আকাশতলে আরও এক প্রস্থ কালি রচনা করে। সে রচনায় কি যে অস্থিরতা আর দমিত উল্লাস।

সময় চলে যায় সময়ের মতন তার নিজেরই খেয়ালে। বৃষ্টি কখনও দ্রুত লয়ে কখনও ঝিমিঝিমি তাল তরঙ্গ রচনা করে ঘন অন্ধকার এই বিলধারের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জুড়ে। রাত্রির আকাশে মেঘ তরঙ্গ বজায় রইলেও প্রসাদ ও বাকি দুজনা ঠিক অনুমানে থাকে, রজনী সার্দ্ধ প্রহর আসতে আর বেশি দেরি নেই। ঠিক ওই সন্ধিকালে বিলধার হতে সেই চণ্ডালের শব তুলে এনে বিল্বতলে স্থাপন করতে হবে। আর তারপরেই আরম্ভ হবে শবসাধনা। যেহেতু এই শবদেহ তুলে আনার দায় ভজহরি ও গজাননের তাই তারা সপ্তমীতে মজলেও প্রসাদের দিকে সদাই খেয়াল রেখে চলেছে। কেননা ইতিমধ্যেই সাধকপ্রবরটির প্রায় তুরীয় গতি। তবু, একমাত্র ভজহরিই জানে, তার সখা কিংবা প্রভুটির জাতি গাঁই মাতাল হলেও সুর-তাল কদাপি কাটে না। হয়ও তাই। রামপ্রসাদের আপাদমস্তক যেন ঘড়িঘণ্টার হিসেব কষে আঁটা। রজনী ঘোর আঁধার হলেও সেখানে তিলমাত্র পা হড়কায় না। নারকেল মালায় পুনঃপুনঃ পান করতে করতে একসময় প্রসাদ ডান হাতখানি উপরে তুলে হাঁক দেন, কালী, কালী কালী।

চমকে গাঁজার খোয়ারি ভেঙে সামনে তাকায় ভজহরি-গজানন। সামান্য দূরে— বিল্বতলে যে মানুষ উর্দ্ধবাহু সটান বসে, তার চক্ষু জোড়া এই অমাবস্যার অন্ধকারে কি বিষম জ্বল জ্বলন্ত। জোনাকির বর্ণ যদি রক্তাভ হয়, যদি সেখানে পারা ঢালা থাকে, তাহলে যা হয় এও তাই। সেই চোখ যুগল ধ্বক ধ্বক অবস্থায় কথা বলে, ওরে ভজহরি। এবার তাহলে তোল শবটিকে।

পলকে প্রায় তারা দুজনা উঠে দাঁড়ায় খোয়ারি ঝেড়ে। পাশে রাখা কোদালখানা তুলে নেয়। তারপর যুগলে প্রায় লম্ফ দিয়ে পড়ে বিলধারের সেই বিশেষ জায়গায়, যেটি আগে থেকেই গজানন ভজিয়ে রেখেছিল।

কাদা পাঁকময় ভিজে মাটিতে ঘপাঘপ কোদাল হেনে চলে গজানন। ভজহরি দুহাতে মাটি মুক্ত করে যায়। বৃষ্টি আবার ঝেঁপে আসে। মেঘ গর্জায় পলকে পলকে। সেই সঙ্গে দোহার তড়িৎ চিড়িক্ চিড়িক্। বিলের কৃষ্ণমূর্তি জলে চড়বড় চড়বড় জীবন নৃত্য করছে। ফুটন্ত জলে হিল হিলোচ্ছে ঠাসবুনট পদ্মবন। পদ্মকুঁড়িগুলির মুখ ফাটছে একে একে। গজানন সহসা চেঁচিয়ে ওঠে, পেয়েছি ওই তো একখানা হাত—কেতরে আছে ভজাদা। ধরো দিকিনি, টেনে ধরো।

ভজহরি ভিজে জাব চোখ মিট মিট গতিকে বলে, দে ভাই, দে। হাতখানা আমার হাতে তুলে দে।

—হাঃ হাঃ হাঃ। শালা গেঁজেল কমনেকার। মানুষের হাত-পা চেনে না।

—না রে গদর্ভ গাঁজাড্ডু, বলি অব্যেস নেই তো খাস কেন!

—হুঁ, না খেলে বলে বিষ্টিতে জাড়ে আমার দাঁত নেগে যাচ্ছিল।

—অমন দাঁত রাখিস কেন! উবড়ে ফেলে দে।

ভজহরি অবশেষে শবের ডান হস্তখানি ধরে। গজানন এতক্ষণে তার মুণ্ড বার করে ফেলেছে। ফলে সে ধরে চুলের মুঠি।

প্রায় টাটকা আর যেন সদ্য পুঁতে দেওয়া চণ্ডাল শবদেহটি উপরে ওঠার জন্যে আকুলি বিকুলি ছিল এমনই ভাব। সেই সঙ্গে নাগাড় বৃষ্টিতে অতীব শিথিল মাটি। তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে বিলধারের এমনিতেই তলতলে থলথলে আদেখলা পেঁকো মাটি।

দুই গাঁজাড়ু—যারা এখনও টাটকা জীবনে আছে, মাটির তলে আরও শীতল মৃতের হাত আর মুণ্ড খামচে ধরে ভেতরে ভেতরে কি এক মহাঘোর অনুভব করে। ফলে তারা দুজনাতেই একত্রে এক স্বরে কতক আর্তনাদের গতিকে চিকরে ওঠে, আঁ আঁ আঁ আঁ...

সেই তর্জনে ঘোর কালো জল স্থল আর বৃষ্টিমুখী সংসার কিঞ্চিৎ টলে যায়। প্রসাদ বিল্বতল হতে হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন, কালী, কালী, কালী—

কড় কড় কড়াৎ বাজ হাঁকার দেয়। গজানন-ভজহরি মরণ বাঁচন আর্তনাদ ধরে, আঁ আঁ আঁ-ই-ই-ই...

অদূরে কোথায় বাজ পড়ে। মাটির তল হতে দুই পাষণ্ডের হেঁচকা আকর্ষণে শব চণ্ডাল উপরে উঠে আসে। রামপ্রসাদ আনন্দে দু'হাত তুলে চিকরে ওঠেন, কালী, কালী, কালী।

এতক্ষণে বুঝি প্রকৃত ঘোর সময় হাজির রামপ্রসাদের অপেক্ষার দোরগোড়ায়। শব সাধনার মহাঘোর নিশার সার্দ্ধপ্রহর সমাগত। সেই সমাগমে সামিলধারী রাত পেচকের হুম হুম, বন্য শৃগালের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ, বনপথের ধার কামড়ে গন্ধ গোকুলের গা শোঁকাশুঁকি, মেঠো বৃহৎ ইঁদুরদিগের ঘন ঘন পদতাড়না, গোখুরো-চন্দ্রবোড়াগণের সর সর ভিজে পাতা-নাতায় অকারণ চিত্ত চাঞ্চল্য—আরও না কত কি যাবতীয় পার্থিবতার মিলিত উচ্ছ্বাস। এতসবের দোহার ধারী একমাত্র এই বর্ষারাতের নাগাড় বৃষ্টি স্রোত আর তার সহচর বিদ্যুৎ কটাক্ষ ও মেঘগর্জন। সব ছাপিয়ে রামপ্রসাদের নাদ সপ্তমে, কালী-কালী-কালী। কালী-কালী-কালী...

জটাধর-ভজহরির চার হস্তের দোলায় চড়ানো চণ্ডালের কাদা পঙ্কের দেহখানি আস্তে ধীরে বিল্বতলে এনে শুইয়ে দেওয়া হয়। সেখানে আগেভাগেই পূজার সামগ্রী সাজানো। আর আছে মস্ত এক খোঁদলওয়ালা মেটে হাঁড়ি—যার গর্ভে এত বাদলা সত্ত্বেও এখনও মিটমিট করছে বৃহৎ গর্ভা ঘৃত পিদিমটি। প্রসাদ এবার কর্মে নামেন।

প্রথম পূর্বাভিমুখ হয়ে মূলমন্ত্র ফট্ উচ্চারণে যাগস্থল অভ্যুক্ষণ করেন। অনন্তর পূর্বদিকে গুরু, দক্ষিণে গণেশ, পশ্চিমে বটুক ও উত্তরে যোগিনীর পূজা। ভূমিতে বীরার্দন মন্ত্র লিখন—হূং হূং হ্রীং হ্রীং কালিকে ঘোরদংস্ট্রে প্রচণ্ডে চণ্ডনায়িকে দানবান্ দারয় হন হন শবশরীরে মহাবিঘ্নং ছেদয় ছেদয় স্বাহা হূং ফড়িতি। এখানে মনে রাখার কর্তব্য সাধকের, যে এই সাধন সময়ে তিনি যেন ভয় কাতর না হন।

এবার কর্পূর মিশ্রিত শ্বেত আকন্দ ও শ্বেত বেড়েলার তুলা দ্বারা বর্তি প্রস্তুত করে দীপ জ্বালার ছল করলেন। কেননা, বৃষ্টি বাতাস, অব্যাহত। এবার সুদর্শন মন্ত্র পাঠ—আত্মানং

রক্ষ রক্ষ...। অতঃপর জয় দুর্গামন্ত্র স্মরণ। চতুর্ধারে সর্ষপ বিক্ষেপ। তিলোহসি মন্ত্রে তিল বিকিরণ, ইত্যাদি।

অতঃপর বলা হচ্ছে, শবসমীপে উপবেশন করতে হবে এবং শব স্পর্শ করতে হবে। তাই স্বীকার করলেন রামপ্রসাদ। তন্ত্রে বলছে, ওঁ ফট্ ইতি শবমভ্যুক্ষ্য ওঁ হূঁং মৃতকায় নমঃ ফড়িতি পুস্পাঞ্জলি ত্রয়ং দত্ত্বা শবং পৃষ্ট্বা প্রণম্যেৎ। এখানে একটি খটকা আছে যে, যদি শব রক্তবর্ণ হয় তাহলে সে সাধককে ভক্ষণ করে। এখানে এই যুবা চণ্ডালের শব এমনই প্রখর কালো যে সে প্রশ্ন ওঠে না।

এবার কুশ দ্বারা শব শয্যা প্রস্তুত করা হল। প্রায় চোখের পলকে তিনজনের হাতে হাত তাকে পুবমুখো মস্তক করে কুশ শয্যায় স্থাপন করা হল। এবার শবমুখে জাতী ফল, খদিরাযুক্ত তাম্বুল প্রদান করে তার মুখখানি অধোগামী করে বাখা হল। শবের পৃষ্ঠদেশ চন্দন ঘৃতাদি দ্বারা অনুলেপন করা হল। সেই সময় প্রসাদের মন্দ্র স্বর বলে গেল, বীরেশ পরমানন্দ শিবানন্দ কুলেশ্বর। আনন্দভৈরবাকার দেবীপর্য্যঙ্কশঙ্কর...ওঁ হূঁ মৃতকায়নমঃ...। শবের অঙ্গরাগ অন্তে তার বাহুমূল হতে কটিদেশ পর্যন্ত চতুরস্র মণ্ডল লেখা হল। তারপর শবের উপরে ওই চতুরস্র মধ্যে অষ্টদলপদ্ম ও চতুর্দ্বার আঁকা হল। পদ্ম মধ্যে ওঁ হ্রী ফট্ মন্ত্র ও পীঠমন্ত্র রচিত হল। তারপর কম্বল আসন বিছিয়ে দেওয়া হল শবপৃষ্ঠে।

তন্ত্রোক্ত বিধি অনুযায়ী রামপ্রসাদ এবার শবের কটিদেশ ধারণ করলেন দৃঢ় হস্তে। মনে মনে হাস্য করলেন মনে পড়ায়, যদ্যুপদ্রোবয়েত্তস্য দদ্যান্নিষ্ঠিবনং শবে। শব যদি কোনওপ্রকার উপদ্রব করে, তবে শবগাত্রে নিষ্ঠিবন বা থুথু নিক্ষেপণ করবে। এবার জপ স্থানের দশদিকে দ্বাদশাঙ্গুলি পরিমিত অশ্বত্থ আদি যজ্ঞীয়কাষ্ঠ প্রোথিত করে ইন্দ্রাদি দশদিকপালের পূজা! তৎপরে বলিদান।

ওঁ লাং ইন্দ্রায় সুরাধিপতয়ে ইমং বলিং গৃহ্ন গৃহ্ন গৃহ্নাপয় গৃহ্নাপয় বিঘ্ননিবারণং কৃত্বা মম সিদ্ধিং প্রয়চ্ছস্বাহা। এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ লাং ইন্দ্রায় স্বাহা।

ছাগ বলিদান সম্পন্ন হয় ভজহরি আর গজাননের সহযোগিতায়। ছিন্ন মুণ্ড রুধির সমেত তাম্রপাত্রে রাখা হয়। ওঁ বাং অগ্নয়ে তেজোধিপতয়ে মেষবাহনায় সপরিবারায় শক্তিহস্তায় সায়ুধায় নমঃ।..

অতঃপর দিকপালগণের পূজা ও প্রতীকি সর্বভূতবলিদান। সামিষ অন্ন দ্বারা সকল দেবতার বলি। অধিষ্ঠাতৃদেবতা, চতুঃষষ্ঠি যোগিনী ও ডাকিনীগণের প্রতীকময় বলি প্রদান।

অনন্তর মূল শবসাধনে আরোহন। চতুর্ধারে যথাবিধি উপাচার। আকাশ মুচড়ে ঘোর শ্রাবণ নিশীথিনির ধারাপাত। মত্ত ঝোড়ো বাতাস। সামনে বারিতির বিলের জলে হাওয়ার তাড়নায় যথা ইচ্ছা জলঘূর্ণী। জলসর্পদের আনন্দিত মুখ জাগানো অবলোকন। গূঢ় বনে মুর্হুমুহু শিবাধ্বনি। এমত পরিবেশে কালীর বেটা শ্রীরামপ্রসাদ মূলমন্ত্র ও পরে হ্রীঁ ফট্ মন্ত্র উচ্চারণান্তে অশ্বারোহন কায়দায় শবপৃষ্ঠে চড়ে বসেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজের পাদতলে কিছু কুশ নিক্ষেপ করেন। তারপর শবের কেশগুচ্ছি দু'হাতে ধরে ঝুটিকা বন্ধন করেন। তৎসহ গুরু, গণপতি ও দেবীকে নমস্কার। এবং তার পরে পরেই প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গন্যাস ও তৎপরে বীরার্দন মন্ত্র সহযোগে দশদিকে লোষ্ট্র নিক্ষেপ। অতঃপর আসন অর্চনা, হ্রীঁ আধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ।

এবার নিজ বামভাগে শবসমীপে অর্ঘস্থাপন ও শবঝুটিকায় পীঠপূজা। পরে সাধ্যানুযায়ী পঞ্চ উপচারে ইষ্টদেবতার পূজা। তারপর শবমুখে সুগন্ধি জল সহকারে দেবীর তর্পণ। তর্পণান্তে শবদেহ ত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়ে মন্ত্রপাঠ, হে দেবেশ, তুমি আমার বশীভূত হয়ে সিদ্ধি প্রদান কর। হে মহাভাগ, যে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করে, তুমি তার প্রতি অনুরক্ত থাক। তৎপরে পট্টসূত্র দ্বারা শবের চরণজোড়া বন্ধন করেন প্রসাদ। বেঁধে নেন অতি দৃঢ়রূপে শবদেহ। সেই সঙ্গে মন্ত্র উচ্চারণ, ওঁ মদ্বশোভব দেবেশ বীরসিদ্ধিকৃতাস্পদ। ভীমভীরু-ভয়াভাবভবমোচন ভাবুক। ত্রাহি মাং দেবদেবেশ শূরাণামধিপাধিপ।...মন্ত্রান্তে শবের পাদমূলে ত্রিকোণযন্ত্র লিখতে হয়।

রামপ্রসাদ এবার শবের উপরে চড়ে বসেন—পুনর্বার। শবের দু'খানি হাত দু'ধারে প্রসারণ করে সেখানে কুশাস্তরণ করেন। এবার সেই কুশ বিছানো দুই হস্তের উপর প্রসাদ তাঁর দুই পাদ স্থাপন করেন। এবার যথাবিহিত প্রাণায়ামক্রিয়া, শিরঃস্থিত পদ্মে গুরুদেবকে ও স্বহৃদয়ে দেবীকে চিন্তা করতে করতে ওষ্ঠদ্বয় সংপুটবৎ করে বিহিত মালাদ্বারা একেবারে মৌনী হয়ে শ্মশানসাধনক্রমানুসারে জপ আরম্ভ করেন।

এখানে সাধকের স্মরণীয় যে জপকালে যদি কোনওপ্রকার ভয় ত্রাস উপস্থিত হয়, যদি আকাশ হতে কেউ অলখে বলি প্রার্থনা করে, তা হলে তার প্রতি বলতে হবে, আমি দিনান্তরে তোমাকে কুঞ্জরাদি বলি প্রদান করব। তুমি কে? কি তোমার নাম? এই উত্তর প্রদান করে পুনর্বার জপ আরম্ভ করতে হবে। এরপরেও যদি সে মধুর বাক্যে নিজ নাম বলে, তাহলে পুনর্বার বলতে হবে, তুমি আমাকে বর প্রদান করবে, এই প্রতিজ্ঞা কর।

কার্যসিদ্ধি হলে সাধনপর্ব সমাপন। কিন্তু রামপ্রসাদের ক্ষেত্রে এসব কিছুই ঘটে না বা তার প্রয়োজন হয় না। তিনি কালক্রমে নিরলস, নিরবচ্ছিন্ন ধ্যান বারিধিতে তলিয়ে যেতে থাকেন। এখানে স্বার্থাস্বার্থের কোনও কারণ ঘটে না। অদূরে বর্ষাপীড়িত দুই সহচর ভজহরি-গজানন কতক বিমূঢ় অবস্থায় প্রসাদের এই অতল ভাব নিমজ্জন হাঁ করে দেখে যায়। তারা পুনর্বার গাঁজা খেতেও ভুলে যায়।

আলো ফুটি ফুটি আকাশ ক্রমে। শেষ প্রহরের শিবাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে শ্রাবণের ধারা খানিক প্রশমিত হওয়ার পথ দেখে। বিলের পদ্মবনে ফুটন্ত ফুলগুলি আস্তে আস্তে মুকুলদল বুঁজিয়ে ফেলতে চায়। ব্রাহ্ম মুহূর্তের ভিজে বাতাস চরাচরের সর্বকূলে তাড়না সঞ্চার করে। রামপ্রসাদ আস্তে আস্তে চোখ খোলেন। সঙ্গীজোড়া অবাক আর ঘুমকাতর ভাঁটা নেত্রে লক্ষ করে অপরূপ মুখশ্রী এই মানুষটির মুখে শ্রমের কোনও কাঁটামাত্র নেই। তার বদলে সেখানে রাতভর সুনিদ্রা আর নিশ্চিন্ত বিশ্রামের দিব্য ছটা।

রামপ্রসাদ দীর্ঘ একটি আড়ামোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়ান। সুঠাম হাড়ে হাড়ে মটমটি ভাঙা হয়। এমনকি একটি ক্ষুদ্র হাইও।

ভজহরিই প্রথম কথা বলে, বলি হল দাদা?

প্রসাদ সম্মোহন করা অথবা রাইভুলানো হাসি হাসেন। তারপর বলে ওঠেন, এক ঘড়া জল লাগবে যে।

জল আনা হয় মেটে কলসিভরে। প্রসাদ শব চণ্ডালের ঝুটিকা মোচন করেন হেঁট হয়ে। তারপর কলসের জল ঢেলে তাকে স্নান করান। তার দু-পায়ের বাঁধন খুলে দেন। এবার

দেহখানি নিজের স্কন্ধে তুলে নেন। ভজহরি-জটাধর পূজার দ্রব্য সমুদয় গুটিয়ে নিয়ে আসে।

চণ্ডাল শবের সাধনমুক্ত দেহখানি রামপ্রসাদ সশব্দে জলে নিক্ষেপ করেন। মুহূর্তে সেটি পদ্মবনের আবডালে নিমজ্জিত হয়। মুদিত কমলগুলি সামান্য মাথা হিন্দোল করে।

দাদু বললেন, শোনো ভাই। আমাদের বংশবৃত্তান্ত তোমার অন্তত জেনে রাখা প্রয়োজন। তোমার বাবার তো ও সবে মতি নেই।

আমি কি আর বলব। কেশব নাগের পাটিগণিতের ভয়ঙ্কর পীড়নের চেয়ে বরং গল্পকথা অনেক ভালো। অঙ্ক কষাতে বসলে দাদুর রোগা পাখার বাঁট আপসানো আর এক মূর্তি। আর গল্প বলতে বসলে একেবারে ভিন্ন।

—আমার বাবা গোপালচন্দ্র। তাঁর বাবা লোকনাথ। তস্য পিতা পার্বতীচরণ। পার্বতীচরণ শুনেছি খুব খাইয়ে লোক ছিলেন। একসঙ্গে গোটা দশেক পাকা তাল আর বেড়াল ডিঙনো ভাত তাঁর কাছে নস্যি।

—বলো কি!

—হুঁ, বলি। তবে আমার বাবা ছিলেন একাহারী। সক্কাল বেলা কালীর ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে শেকল তুলে দিতেন। একশো আটটি নিশ্চক্র বিল্বিপত্তর আর রক্তজবা চয়ন করা ছিল আমার নিত্যি কাজ। একটি বেলপাতায় চক্র থাকলে সেদিন বাবা আমার পিঠে খড়ম হাঁকতেন। তা সে যা হোক, বাবা পুজোয় ঢুকতেন। সিদ্ধেশ্বরী কালীর ঘর মানে—খোড়ো চাল আর মস্ত মেটে দোচালা। সুমুখে অবিশ্যি পাকা বারান্দা। যা হোক—বাবা পুজো সেরে বেলা দুপুরে দোর খুলতেন। চোখ জোড়া টকটকে লাল। আর বুকের এই মাঝখানটিও জবা ফুলের মতো লাল।

মনে ভাবি এ নির্ঘাৎ বাবার বলে দেওয়া কারণবারি বা মদ্যপান-এর ফল।

—বাবা বাড়িতে এসে এক দলা এখো গুড় আর এক ঘটি জল ঢকঢক করে খেতেন। তারপর ডাবা হুঁকোটি হাতে করে যেয়ে বসতেন আমাদের সিদ্ধেশ্বরী মাতাঠাকুরাণীর ঘরের সামনে মেটে রাস্তার ধারে। বলতে গেলে মাঝদুপুর পার, মানে আমাদের গাঁ-ঘরে একেবারে নিঝ্‌ঝুম অবস্থা। যে যার খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘরে দোর দিয়েছে। আর বাবা পথের ধারে উবু হয়ে বসে তামাক টানছেন। এমত অবস্থায় প্রথম যে অভুক্ত পথিকটিকে পাবেন তাকে করজোড়ে অনুরোধ করবেন দুটি অন্নগ্রহণ করতে। সে যদি রাজি হত বাবা তাকে নিয়ে আসতেন সমাদরে আমাদের বাড়িতে। সেখানে জাত-অজাত বলে কোনও কারবার নেই। অর্থাৎ অতিথি নারায়ণ। মানুষটি আমাদের বাড়ির সুমুখের গোঁড়া পুষ্করিণীতে চান করতেন। তারপর সেদিন গরীব ব্রাহ্মণের বাড়িতে যা রান্না হত তাই দিয়ে নরনারায়ণ সেবা হত। তারপর বাবা খেতে বসতেন। দুপুর গড়িয়ে অপরাহ্ন হয়ে যেত। বাবা এক কাঁসার থালা ভাত, আনাজপাতির তরকারী, মাছ হল হল, নেই নেই, আর অবধারিত একবাটি ঘন কঁড়াইয়ের ডাল, আলুভাতে আর পোস্ত। শেষ পাতে একটু অম্বল।

—বাঃ। চমৎকার।

—বাবা ছিলেন একাহারী। রাতে সিদ্ধেশ্বরীর শেতল ভোগ আর আরতি সেরে এক ঢেলা এখো গুড় আর এক ঘটি জল। সকাল সকাল শুয়ে পড়তেন। তবে তার আগে হুঁকো হস্তে আমায় পড়ানো। সে এক মহাপর্ব।

তেরো

আমি অবাক শুনি পিতামহের মুখে তাঁর পূর্বপুরুষের বিবরণ। তিনি যথানিয়মে দু-চক্ষু মুদে আর দু-আঙুলেব টিপে নস্যি ধারণ করে কথা বলে যান। আমি টের পাই যামিনী রায়ের একেবারে কার্বন কপি কি অবাক কায়দায় কথায় ছবির আঁচড় টানছেন।

দাদু বলেন, হুঁ ভাই, আমার বাবার পড়াতে বসা—সে এক কাণ্ড বিশেষ। সন্ধে হল। আমি চার ক্রোশ পথ যাতায়াত করে পাঁচটা ইশকুল থেকে ফিরে পুকুরে হাত-পা ধুয়ে সবে দুটি মুড়ি খাচ্ছি। মানে, আমাদের বদ্ধমেনে জলখাবার যে রকম হয় আর কি। বড় একখানা জামবাটি বোঝাই মুড়ি। তাতে না জল ঢেলে, আর আলু চচ্চড়ি চটকে, কাঁচা লঙ্কা আর প্যাঁজ দিয়ে সে কি হাপুস হুপুস খাওয়া। অমনি দাওয়া থেকে বাবা গোপালচন্দ্রের গম্ভীর ডাক, খোকা, পড়তে বোস।

মা উনুনে চ্যালা কাঠ গুঁজতে গুঁজতে বলে, এবার শুরু হল জমদগ্নি মুনির পাঠশালা। আমার মা এমনিতে নিরক্ষর। কিন্তু যেহেতু বিদ্যাসাগরের চেয়ে বয়েছে বড়ো, অথচ সমসাময়িক নবদ্বীপের মহাপণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যেরত্ন মশাইয়ের মার তরফে নাতনি, তাই টুকটাক সংস্কৃত শ্লোটটোক বলতে পারেন। তা পড়ি কি মরি চ্যাটাই বগলে করে বাবার পাঠশালায় গিয়ে উপনীত হলাম। দাওয়ায় মা পিদিম জ্বেলে দিয়েছে। বাবা দুপা মুড়ে বসেছেন। বুকের ওপর আড়াআড়ি ধবধবে পৈতেগাছটি। তিনি চক্ষু মুদে ডাবা হুঁকোয় তামাক টানছেন।

বাবা বললেন, শেলেট পেনসিল নাও। বলার আগেই শেলেট বাগিয়ে বসেছি। জানি এবার অঙ্ক কষানো হবে।

বাবা গম্ভীর গলায় বলে চলেছেন, একখানা চৌবাচ্চার এক নালি দিয়ে এত জল বেরুচ্ছে, অন্যটা দিয়ে এত জল, আর একটা দিয়ে এত জল ঢুকছে। তাহলে চৌবাচ্চায়—

ঠাকুর্দা লদলদে নাকেব সামনে নস্যির টিপ তুলি তুলি করেও আধখানি উঠে থমকে থাকেন। আমি জানি, এবার হাতটি নেমে আসবে যথাস্থানে।

—মজাটা হল. অঙ্কটা মুখে মুখে বলা শেষ হওয়ার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে উত্তর দিতে হবে। তা না হলে কুরুক্ষেত্র। হাতের কাছে যা থাকবে তাই দিয়ে বেদম প্রহার। কতবার যে শেলেটের বাড়িতে মাথা ফেটেছে। ওদিকে আমার মা বাববার হেঁশেল থেকে বেরিয়ে এসে গরু ঠেঙানো দেখছে। যদি একবার ভুল করেও সামান্য প্রতিবাদ করেছে—বাস অগ্নিতে ঘৃতাহুতি।

আমি মনে মনে হিসেব কষে মিলিয়ে নিতে চেষ্টা করি দাদুব বাবার মারের সঙ্গে আমার বাবার প্রহারের কায়দার কি মিল। আমাদের ভেতর বাড়ির বারান্দা থেকে ইস্টবেঙ্গলের একদা সেন্টার ফরোয়ার্ড বাঁ পায়ে সপাটে একটি কিক কষালেন আমার

পিঠে। রোগা পটকা আমি শূন্যপথে উড়ে গিয়ে আছড়ে পড়লাম উঠোনের মধ্যিখানে। তারপর স্বভাব মতো জামা-হাফ প্যান্টের ধুলে ঝেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ছোট থেকে ফুলের মালার ওপর ভারী লোভ ছিল। দাদুকে নানান সভাসমিতেতে যেতে হত। এক একদিন ফিরতে রাত হয়ে যেত। আমি কিন্তু ঠায় জেগে বসে থাকতাম, কখন দাদু আসবে। তিনিও জানতেন আমার মালা দুর্বলতার কথা। ফলে, এমনও হয়েছে, কোনও সভা থেকে উঠে আসার সময় মালাটি টেবিলে ফেলে রেখে এসেছেন। রাস্তায় বেরিয়ে হঠাৎ মনে পড়ে গেল। তখন কাঁচরাপাড়া স্টেশন রোডের ফুলের দোকান থেকে একটি মালা কিনে তারপর বাড়ি।

আর একবার, ক্লাস টু থেকে থ্রী, ফার্স্ট হয়ে উঠেছি। বাবা বলল, কি প্রাইজ নেবে বলো।

সোজা জবাব, ফুলের মালা।

তারপর থেকে রোজই আমাদের কাঁচরাপাড়া স্কুল বাড়ির ছাদের আলসেয় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করি—বাবার ফুলমালার জন্যে। আর রোজ রোজই আশাহত হই। —মালা এনেছো?

—ভুলে গেছি বাবা। আচ্ছা, কাল ঠিক আনব। এখন পড়তে বোসো দিকি।

অবশেষে মালা এল। থোকা হলুদ গাঁদা ফুলের। বাস, অমনি সেটি না গলায় পরে সারা বাড়িময় ঘুবে ঘুরে দানাই নেত্য। আমার যখন তখন হঠাৎ আনন্দের প্রকাশ হল লম্ফ দিয়ে নৃত্য। বাবার সান্ধ্য চা পান হল। ঘরে মা লণ্ঠন জ্বেলে দিয়েছে।

—খোকা, পড়তে বোসো। অমনি আমার লম্ফঝম্ফ জুড়িয়ে জল। গলা থেকে গাঁদা ফুলেব মালা কিন্তু খুলিনি। সেই হকিকতেই বাবার সামনে পড়তে বসলাম। বাবাও কিন্তু সেই একই ট্রাডিশনের সম্মান। ফলে, প্রথমেই অঙ্ক দিয়ে আরম্ভ। বরাবর এই বিষয়টাতে আমার কাঠখোট্টা অনীহা। যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ সবটাতেই আমি সমানদর্শী। ফলে যা অঙ্ক বাবা দেয়, ঢ্যাড়া, গোল্লা, শূন্য। আসলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়তো, অঙ্কের রাজত্বে এই চারটি বস্তুরই কোনও দাম নেই। অঙ্ক বলতে আমার কাছে এই চতুবর্গের বাইরে আর কিছু। সে যাই হোক, এই করতে করতে রাত গড়াতে লাগল। আমিও ঘুমে ঢুলতে লাগলাম। ওদিক থেকে বাবার রণদামামা এবার মুখ থেকে হাতে নেমে এল। বিপুল চড় কিল ইত্যাকার বাহু তর্জনে আমি গরু ঠ্যাঙানি রপ্ত করে চললাম। একসময় বাবার কেঠো হাতের আকর্ষণে আমার ডান কানের গ্রন্থি ছিঁড়ে ঝরঝরিয়ে রক্তপাত হতে আরম্ভ করল। মা দরজায় দাঁড়িয়ে হাউ হাউ কেঁদে উঠল। দাদু বহুদূরের ঘর থেকে খড়ম আর লুঙি সামলাতে সামলাতে, তিনচার সিঁড়ি টপকে, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে গলা তুলে ককিয়ে উঠলেন বাবার প্রতি, ওহে-ওই মারগুলো সব আমার গায়ে পড়ছে। সেদিনকার মতো আমার নিশিপাঠ ফুরলো। সেই সঙ্গে গলার সাধের গাঁদা ফুলের মালাটি মারের দাপটে ছিঁড়ে ছত্রাকার। মা আমার ছিন্ন কানে ডেটল বুলিয়ে দিল। আমি তিড়িংবিড়িং লম্ফ দিতে লাগলাম।

দাদু বললেন, একবার হয়েছে কি, বাবা আমার হাতে একখানা পোস্টকার্ড ধরিয়ে দিয়ে বললেন, আমি বলে যাচ্ছি, চিঠিখানা লেখো দেখি। তখন আমার পাঁচ বছর মতো

বয়েস। মনে আছে সেটা দুপুর বেলাকার ঘটনা। তা বাবা বলে যাচ্ছেন, আমি দোয়াতে কলম ডোবাই আর লিখি। পত্রের মাথায় যথারীতি, শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী মাতাঠাকুরানী সহায়। বাবা গড়গড়িয়ে বলে যাচ্ছেন। আমি তরতরিয়ে লিখে যাচ্ছি লাটসাহেবের সবুজ ছবিওয়ালা পোস্টকার্ডে। বাবা থামলেন। আমিও। হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা নিয়ে চোখের সুমুখে মেলে ধরলেন। টকটকে ফর্সা মুখখানা আস্তে আস্তে আরও ঘোরতর লাল হতে লাগল। চোয়াল এঁটে বসল চোয়ালে। বাবা চিঠিখানা পাশে রেখে সটান উঠে দাঁড়ালেন। তারপর আমার নড়া ধরে টেনে তুলে আমার পরণের ধুতিখানা একটানে খুলে আমার চার হাত-পা একলপ্তে বেঁধে, বাঁ হাতে আমায় চ্যাং দোলা না চতুর্দোলা এমনি করে ঝুলিয়ে ধরে দাওয়া থেকে নামলেন। মা এসে দুয়ারে দাঁড়িয়ে। টের পাচ্ছি, মার কথা বলবার জো নেই। আমি কাঁচুমাচু ঝুলতে ঝুলতে আকাশ দেখছি, ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা গাছ দেখছি। বাবা হনহনিয়ে হেঁটে চলেছেন দুপুরের রোদ ভেঙে। এমনি সময়ে সামনে একটি চেনা মানুষ।

—কি মুকুজ্যে মশাই, বলি হলটা কি! ছেলেটাকে অমন করে বেঁধে কোথায় নিয়ে চল্লেন?

বাবার গম্ভীর জবাব, গোঁড়া পুস্করণীর পাঁকে পুঁতবো।

—কেন, কেন! কি অপরাধ?

—অপরাধ! যে ছেলে একখানা পোস্টকার্ড লিখতে লাইন বেঁকিয়ে ফেলে সে তো হাসতে হাসতে বাপকে খুন করতে পারে।

আমি আর থাকতে না পেরে বলে উঠি, তোমার বাবার রাগটা তাহলে আমার বাবায় এসে নেমেছে দাদু। কেবল মধ্যিখানে একটা ছাড় গেছে। সেটা তুমি।

বড়মা ওধার থেকে কোমরে হাত ভেরে এসে দাঁড়ায় আমাদের কথার মধ্যিখানে। দাদু চোখ তুলে বলেন, কি হল মা?

—আর কি হবে বাবা।

—বলোই না।

—তুই আমায় একটা টাকা দিবি? কবে থেকে তোর পুত্তুরের বউকে বলছি—মা মুখে বড্ড অরুচি। একটু কৎবেল পেলে খেতাম।

—কৎবেল! হাড়ের জ্বর টেনে আনে যে মা। আর এক টাকায় তো চার-চারটে কৎবেল হয়ে যাবে।

—বেশ তো। এক হপ্তা ধরে খাবো। মুখটা যদি ছাড়ে।

মন কি কর ভবে আসিয়ে।
ওরে দিবা অবশেষ, অজপার শেষ,
ক্রমেতে নিঃশ্বাস যায় ফুরায়ে।।
হং বর্ণ পুরকে হয়, সং বর্ণ রেচকে হয়,
অহর্নিশি কর জপ "হংস হংস" বলিয়ে।।

অজপা হইলে সাঙ্গ, কোথা তব রবে রঙ্গ।
সকলি হইবে ভঙ্গ ভবানীরে গো ভাবিয়ে।
চলনে দ্বিগুণ ক্ষয়, ততোধিক নিদ্রায় হয়।
বিনয়ে রামপ্রসাদ কয়, ততোধিক সঙ্গম সময়ে।।

আজ এই শ্রাবণী প্রভাত সময়টি যে কি মনোহরা। একটি রাত সংসার বাস্তু হতে দূরে থেকে আজ এই ফিরে আসা যে কি অভিরাম সে কথা বুঝিয়ে বলবার নয়। এখন মন জোড়া গেল রাত্রির তপ্ত আর হিম শীতল শবারোহন অভিজ্ঞতা। লোক-অলোকের মাঝ সংসারের টান রপটানি। সেই সঙ্গে জীবন মরণেরও। এই সব কিংবা আরও অকৈতব অভিজ্ঞতার সার তত্ত্বগুলো অনেকটা মনের কথা মনকেই সমঝানোর মতো। সেখানে মুখ বাখান একেবারেই ম্লেচ্ছ। ফলে গেল রাতের সাধন সমরের আঁকাড়া ফললাভ এখন, এই ভিটায় পা রাখা মাত্র, মনে মনে গুঞ্জরিয়া উপছে পড়া এই গীত উপহার।

এই গীতের শেষ পাত বলে দিচ্ছে ক্ষযের সর্বোত্তম বর্ণনা। সে কিস্যা বা সঙ্গমের সার ফল তো প্রসাদের জীবনের পরতে পরতে জড়িয়ে আছে। সর্বাণীর অক্ষত যৌবন আর সদাই অনাঘ্রাত সুগন্ধি আকর্ষণ তাঁকে বিভোল করে দেয় কাছে গেলেই। ফলে নিজ মুখ হতে বাহির হওয়া এই ক্ষয়ে যাওয়া জীবনের তত্ত্বকথা মনে মনে কিঞ্চিৎ বাতাস তুললেও, রামপ্রসাদ জানেন তাঁর এই ঘরনিটি হেঁশেল আর শয়নমন্দিরের আপাত সামগ্রী হলেও, অন্তরে অন্তরে সে তাঁর সাধন সহচরী। আর সবার উর্দ্ধে প্রসাদী কবিতা ও গীতের চালিকা শক্তি। ফলে এখানে এক জোড়া নয়, তিন তিনটি শক্তির ঘট স্থাপন করা আছে। কবিতা কালিকা আর চালিকা—এই সর্বাণী। কিংবা কে জানে, হয়তো আদপে এই তিনের একমাত্র মিশেল বা তিনে মিলে এক এই সর্বাণী। হ্যাঁ, তাকে এখনও পুরোপুরি বোঝা হল না এই মূঢ় প্রসাদের।

সকালে ভিটায় পা রাখার আগে গঙ্গায় নেয়ে এসেছেন প্রসাদ, ভজহরি সমেত। তৃতীয়, গজানন আর এত পথ আসেনি। সে তার বাড়ির কাছেই স্নান করে নেবে। এই বড়ো শাদা আর ভালো মনের সহচরটিকে বিদায় দেবার সময় রামপ্রসাদ তার বুকের মধ্যখানে নিজের বাম হস্তের তর্জনী স্থাপন করে বলেছেন, তুমি ভালো থাকো, আনন্দে রও ভাই। তবে গেল রাতের মড়াঘাঁটা কারবারটির কথা কাউকে বোলনি যেন। এ যে ভারী গুপ্ত তত্ত্ব ভায়া।

গজানন গাঁজা ড্যাবডেবে রক্তচক্ষু ভাসিয়ে শুধু বলেছে, বাপরে, এ কথা বদনে কেন মনে আনতেও গা কাঁপে।

ভিটার মুখে পৌঁছে আজকের এই সকালটি যে কি মনোহর। গেল রাতের ঝড় বাদলি আকাশ এখন প্রসন্ন ঝকঝকে। সবেমাত্র পলকা রোদ উঠেছে বুনো ভিটার লতায়-পাতায়। প্রকাণ্ড পঞ্চবটির টঙে আলো এসে পড়েছে সদ্য। ওইখানে পাখি ডাকছে ঘুম ভাঙানিয়া। শ্রাবণমাসে—আগামী আসি আসি শরৎকালের মায়া ভারী কিঞ্চিৎ টের পাওয়া যায়। সেই অনুভবটি এই এখনকার প্রভাতী আলোয় জড়িয়ে রয়েছে। ভেসে রয়েছে মেঘ পলাতক আকাশে। বনস্থলের পাতাপত্রে। আকাশ-জল-মাটির পাথারে।

ভজহরির প্রায় পড়ি পড়ি ঘুম টলোমলো হাল, রাত জাগরণ আর গঙ্গাস্নান সারার

কারণে। কিন্তু এখনও, যেহেতু কিছু কর্ম বাকি তাই বিশ্রামের ফুরসৎ কই। সেও যথারীতি রাঙা চক্ষু আর বিচলিত দেহ।

প্রসাদ বলেন, দেখ, ওদিকের কি হাল। তোর বৌঠানকে খপর দে। আর শোন, এখন আর ঘরে যেয়ে লাভ নেই। তোর আজ বামুন ভোজনের নেমতন্ন এখানে।

ভজহরির চক্ষু চড়কে, আমি! বামুন!

প্রসাদ হেসে কন, তন্ত্রে আছে শব সাধনা অন্তে পঁচিশটি বামুন ভোজন না করালে নির্ধন হতে হয়। তা আমি আর কত নির্ধন হবো। আর পঁচিশটি বামুন খাওয়ানোর সঙ্গতি কি আমার আছে।

—কিন্তু দাঠাকুর, আমি কর্মকারদের বেটা, বামুন হলাম কেমন করে।

—ওরে পাবণ্ড, তুই না কালীর বেটা। তোর আবার জাত আছে নাকি!

—কিন্তু বামুন, ওরে বাবা। মহাপাতকি হবো যে দাঠাকুর।

—হলে আমি হবো। তুই নয়। নে, এবার যা দিকিনি। ঘরে খপর দে।

ভজহরি প্রসাদের ঘর পানে চলে যায় বন জাঙালি মেটে পথ ভেদ করে। প্রসাদ পেছন হতে গলা তুলে বলেন, আসার সময় এক বাটি বিল্বিপত্র বাটা রস নিয়ে আসবি। ওটি আজ পান করতে হয়।

বনান্তর হতে সাড়া ফেরে, যে আজ্ঞা-আ-আ-আ...

রামপ্রসাদ সদ্য সদ্য জন্ম নেওয়া গীতের আখরগুলো মনে মনে আর নিচু স্বরে গুনগুনিয়ে ভাঁজতে ভাঁজতে, এখনও না অধিগত হওয়া পঞ্চমুণ্ডধারী পঞ্চবটির অদূরে একটি আমগাছ তলে বসে পড়েন। মনের আড়ে আবডালে পাক দেয় শব সাধনান্তে তন্ত্রোক্ত বিধি। যথা, পরদিবস স্নানান্তে কুঞ্জরাদি বলি প্রদান, যদি কোনও দেবতা ধ্যান স্বপ্ন পথে কুঞ্জর, অশ্ব, নর অথবা শূকর বলি প্রার্থনা করে তা হলে দেবতার যাঞ্চা মোতাবেক পিষ্টকনির্মিত যথাযথ বলি প্রদান করে সাধক স্বয়ং উপবাস পালন করবে। পরদিন প্রাতঃক্রিয়াদি সম্পন্ন করতঃ পঞ্চগব্য পান করতে হবে আর পঞ্চবিংশতি ব্রাহ্মণকে ভোজন করাবে। যদি সাধক এ বিষয়ে অশক্ত হন, তাহলে নিদেন পক্ষে দশটি ব্রাহ্মণ সেবা করাতে হবে। এখানে এসে রামপ্রসাদের ওই কর্মকার বংশজ ভজহরির চেয়ে আর কোনও বড়ো ব্রাহ্মণের কথা মনে আসে না। এমন সোজাসাপটা আর নিখাদ মানুষের চেয়ে যে কোনও পৈতেধারী যথেষ্ট অবনত।

এরপর তন্ত্র বলেছেন, এরপর সাধক স্নান-ভোজনান্তে উত্তম স্থানে বাস করবেন। এই প্রকারে তিনি মন্ত্রসিদ্ধ হলে ত্রিরাত্রি, ছয় রাত্রি, কিংবা নয়রাত্রি পর্যন্ত এ ভাব সমাচার গুপ্ত রাখবেন। মন্ত্রসিদ্ধির পর নাগাড় পঞ্চদশ দিবসাবধি সাধক যদি স্ত্রী শয্যায় গমন করেন তাহলে তিনি ব্যাধিগ্রস্ত হন, যদি গীত শ্রবণ করেন তাহলে বধির, আর নৃত্য দেখলে অন্ধ হয়ে পড়বেন। দিবসেতে কারও সঙ্গে কথা বললে তিনি মূক হবেন। এ সময়ে তিনি কোনও সুগন্ধী ফুল গ্রহণ করবেন না। যে সময়ে বাহিরে যাবেন তখন পরণের বস্ত্র বদলে বসনান্তরে যেতে হবে। কখনও গো-ব্রাহ্মণের নিন্দা করবেন না। দুর্জন, পতিত ও ক্লীব মনুষ্য স্পর্শ করবেন না। প্রতি প্রাতে বিল্বপত্রোদক পান করবেন। আর মন্ত্রসিদ্ধির ষোড়শ দিবসে গঙ্গাস্নানান্তে স্বাহান্ত মূল মন্ত্র উচ্চারণ করে দেবতা বা দেবীর উদ্দেশ্যে...দেবতাং

তর্পয়ামি নমঃ—উচ্চারণে তর্পণ করবেন তিনশতবার। ততোদক্ষিণাং দত্বাচ্ছিদ্রাবধারণং কুর্য্যাৎ। 'তৎপরে দক্ষিণা প্রদান করিয়া অচ্ছিদ্রাবধাবণ করিতে হইবে।'

এ পর্যন্ত মনে মনে কপচে রামপ্রসাদ মনান্তরে অট্টহাস্য করেন। হায়, শাস্ত্রোক্ত এত শত শিকড়বাকড় বিধি নিষেধ যে তাঁর পক্ষে অগম। বিশেষ করে স্ত্রী সর্বাণীর মধুর সঙ্গ আর গীত নিষেধ। এর চেয়ে বিধিদণ্ডে বধির আর দৃষ্টিহারা হওয়া ভালো। প্রসাদ এ কথা মনে মনে সহজেই স্বীকার যান যে গেল রাতে শীতল শবারোহন করে একসময় চূড়ান্ত নেশা কিংবা ধ্যান ঘোরে তাঁর মনে হয়েছিল আহা, এই বৃষ্টি নিঙড়ানো রাতে সর্বাণীর দেহ এমন নিরুত্তাপ কেন। প্রসাদের পলকের জন্যে এমত মনে হলেও মনে মনে অপরাধ ভঞ্জনের কোনও ডাক আসেনি। যদিও দেহখানি ছিল মৃত পুরুষের, তথাপি আজ এই এখন মনে হল, মৃতারমণীর দেহ বরাবর যে শবমৈথুন-এর বিকৃতাচার ঘটে, তার চেয়ে আপন নারী সর্বাণীর চিন্তা ভ্রমে পতিত হওয়া অনেক ভালো।

বেলা দ্বিপ্রহরে প্রসাদ ও ভজহরির পাশাপাশি পিঁড়ি পড়ে দাওয়ায়। মা সিদ্ধেশ্বরী আর সর্বাণী মিলে খাসা রেঁধেছে বটে। সুক্তো, মুগডাল, আলুভাতে আর বেলে মাছের ঝাল। ক্ষুধার্ত দুজনেই হাপুস তুলে খেতে থাকে। মা সিদ্ধেশ্বরী পাখা হস্তে সামনে বসে দুজনার ক্ষুধার মহিমা দেখে চোখের জল আগলে। পরিবেশন করতে করতে ঘোমটার আড়ে সর্বাণী দেখে তার পুরুষরতনটির চোখে মুখে রাত জাগা শ্রমের ক্লান্তির বদলে কি যে অপরূপ শোভা। টানা টানা সুকুমার দু'চোখে রক্ত ছিটা যেন তাকে খোকা কার্তিকটি সাজিয়ে দিয়েছে। ঘি মাখানো দুই পুরুষ্ঠু ঠোটে চিরকেলে মদনবান। ধুতি তুলে পিঁড়িতে বসা দুই জানুতে বলবানের থমকানো তাড়না। হায়, সর্বাণীর নবীন গর্ভধারণ যে সাত সাতটি মাস পেরলো, সে সমাচার কি ওই ডাকাতটি জানে।

কিন্তু ডাকাতটির মন হঠাৎ উড়ে গিয়ে বসে বারান্দার চালের আড়ায়। সেখানে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পাঠানো অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী যজ্ঞের নিমন্ত্রণ পত্র সেই যে গুঁজে রাখা আছে, আর তো পেড়ে দেখা হয়নি। তারিখটি কিন্তু মনে আছে, যে লোকটি পত্র বয়ে এনেছিল তার মুখের কথার কারণে। এই শ্রাবণী অমাবস্যা পেরলো সবে গতকাল। যজ্ঞানুষ্ঠান আগামী সাত দিনের মাথায়। তিথি তারিখ নাকি সে কথাই বলছে। যেহেতু সহসা মন চঞ্চল হয়ে যায়. তাই খাওয়া সারা হয় অতি দ্রুত। মা বলে, কি হল রে বাপ, এত হুড়োতাড়া কিসের?

প্রসাদ লম্বা উদগার তুলে বলেন, মা গো, সবে গেল কাল যে কর্মটি করলাম তার নিয়ম মতো আজ তো ফলার খাওয়ার কথা।

সিদ্ধেশ্বরী হেসে কন, তুই তো সব নিয়ম কানুনের বাইরে ছেলে। তোর বিমাতা আমি, কিন্তু গব্বধারিণী তো সাক্ষেৎ মা কালী। তোর ভয় কিসে।

প্রসাদ এঁটো পাত কুড়োন। মা আবার বলে, আমি তো এখনও গঙ্গা পাইনি বাবা। তোকে যে পাত কুড়োতে নেই।

প্রসাদ মিচকে হাসেন, কে বললে এ সব। আমাদের এই টুলো পণ্ডিতরা কতগুলো দেশাচার তোয়ের করেছে যে যার মতো। কোনও পুথি পাতড়ায় এ সব লেখা নেই।

--কি জানি বাপ এ সব তো দেখে আসছি সেই ছেলেকাল থেকে।

—মাগো, অপরাধ নিওনা, সমাজের একটা পক্ষ চিরকাল এই সব আজগুবি তত্ত্ব আমাদের দেখিয়ে আসছে। তারা কি না সমাজপতি। সবাই ভক্তিতে নয়, ভয়ে তাদের বাক্য মান্যি করে। তা আমার তো কোনও ভয়ডর নেই মা। আমি ভূত পিশাচের সঙ্গ করি। সাক্ষেৎ ব্রহ্মময়ীর বেটা গো মা।

সর্বানী দাওয়া হতে নামতে নামতে, ঘোমটার আড়ে মুখ টিপে হাসে। ডাকাত বলে ডাকাত, একেবারে বর্গী ডাকাত।

চোদ্দো

সর্বাণীর টেপা হাসির আড়ে তার স্বামীধণটির সম্বন্ধে বলে যাওয়া ডাকাত আর বর্গী ডাকাত কথা জোড়ার সঙ্গে ডাকাতিয়া তত্ত্ব জড়িয়ে রইলেও দুটি যে জাতে আলাদা। সে তত্ত্ব প্রসাদনী অত জানবুঝ না করলেও, এমনকী একটু বাড়তি হলেও কোথায় যেন মানিয়ে যায়। কোথাকার তত্ত্বকথা কোথায় এসে যে ঘা দিয়ে বসে, কখনও তার খবর বধূটির আপন মনও জানে না। আসলে মনের খবর যদি মন রাখতে চায় তাহলে সে মনের থাকা না থাকা সমান।

দুপুরের ভোজন গুরুতর হলেও রামপ্রসাদ দিবানিদ্রা স্বভাবী নয়। অতএব তিনি ভজহরি সমেত এসে বসেছেন প্রিয় পঞ্চবটির সুমুখে। আসার সময় বারান্দার চালের আড়া হতে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বাজপেয়ী যজ্ঞের নিমন্ত্রণ পত্রখানি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন। মাঝখানে আর সাতটি দিন মাত্র। হালিসহর থেকে কৃষ্ণনগর—এতখানি পথ। এখান থেকে নৌকায় নবদ্বীপ। তারপর আবার জলঙ্গি নদীপথ অথবা হন্টন। অবশেষে রাজ আলয়। সমস্ত ব্যাপারটিই তো হ্যাপাময়।

তুলট কাগজে গোটা গোটা দেবভাষায় রচিত নিমন্ত্রণ পত্রের তলে নদীয়াধীপের মোটা খাগের কলমি স্বাক্ষর। পত্রের মাথায় সিঁদুর, হরিদ্রা, শ্বেতচন্দন আরও কত কিছুর মিশ্রিত মঙ্গল ছাপ। শুভকর্মের ঘোষণায় কোনও ত্রুটি নেই। নিমন্ত্রণের সনির্বন্ধতায় কোনও ব্যাসকম নেই। সব ছাপিয়ে রাজার সুচারু চিত্রবৎ স্বাক্ষরখানির অলখে প্রসাদ এক পরম বান্ধবের বুক ছোঁয়া আবাহনকারী চক্ষু জোড়া টের পান। না গেলে দণ্ড নয় বেদনার মেঘ সঞ্চারিত হবে মহারাজার প্রশস্ত অন্তঃকরণে। কিন্তু প্রসাদের মতো ভিটে কামড়ানো অলসের পক্ষে এই দূর যাত্রা কালহরণ আর নিছক সৌজন্য রাখা ছাড়া আর কি বা হতে পারে!

পত্রখানা চোখের সুমুখে তুলে নেড়েচেড়ে দেখেন প্রসাদ। কি বাহারি লিখন। আর তেমনই হংসরাজ উড়ে যাওয়া রাজ দস্তখত। অদূরে ঝিম ঝিমন্ত ভজহরির দিকে চোখ ভাসিয়ে প্রসাদ বলে ওঠেন, কিরে ভজা, যাবি নাকি রাজভোগ খেতে।

ভজহরি ঝিমুনি চমকে চোখ কচলিয়ে তাকায়। তারপর প্রসাদের মজা মজা মুখের দিকে তাকিয়ে চমকিত বলে, অ্যাঁ! অ্যাঁ!

—বলি বসে বসে ঘুমোচ্ছিস, না রাজভোগের খোয়াব দেখছিস।

—আজ্ঞে রাজভোগ। সে কি আর আমাদের পোড়া কপালে আছে।

—ধরে নে আছে।

—ধরলাম আজ্ঞে।

—তাহলে ধরলি যেকালে, চল দুজনাতে ঘুরে আসি নদীয়ারাজের বাড়ি। ওখেনে মহাধুম হবে। মানে মস্ত যজ্ঞ।

—ধুম মানে ধোঁয়া নয়?

প্রসাদ এবার শব্দ করে হাসেন, তুই দেখছি একটি সিকিখানা পণ্ডিত হয়ে বসে আছিস।

—সে তো তোমার সঙ্গদোষ দাঠাকুর।

—বাঃ বাঃ, চমৎকার। তাহলে বোঝা গেল তুই আমার সঙ্গে যাবি।

—হুঁ, পেটপুজোর খপর থাকলে কে না যায় দাদা।

—কিন্তু যেতে হলে কাল পরশুই রওনা হতে হবে।

—এখেন থেকে রাজার বাড়ি এত পথ।

—না না। মাঝখানে সাতটি দিন আছে। কিন্তু গায়ের ব্যথা মরাতেও তো সময় নেবে।

—ব্যথা কেন হবে। নৌকোয় দিব্যি শুয়ে শুয়ে যাবো। আঃ, একে গাঙের ঠান্ডা বাতাস, তার ওপর নাওয়ের দুলুনি।

ঠিক এমনি সময়ে, বলতে গেলে আকাট অসময়ে জাঙাল পথের ও মুড়ো থেকে যাকে এগিয়ে আসতে দেখা যায় সে রামতনু গঙ্গোপাধ্যায়। পঞ্চজনার সাক্ষেতে তনু ঢুলকি।

তাকে দেখে মহা উল্লসিত রামপ্রসাদ গলা তুলে ডাক দেন, আরে আরে, কি সব্বোনাশ, দাদা যে। বলি না চাইতেই জল।

রামতনু আসতে আসতে এক পল থমকে দাঁড়ান, হুঁ. থালে ভর দুকুরেই পান করা হয়েছে।

রামপ্রসাদ হেসে বলেন, ওখেন থেকেই বুঝি গন্ধ পাচ্ছো?

—না, ঠিক গন্ধ নয়। প্রথমেই জলের কথা বল্লে তো। আর তাছাড়া তোমার হাবে-ভাবে যা বলছে সেটি সুবিধের নয়কো।

—বটে। তা কি বলছে শুনি।

ভজহরি পাশ থেকে বলে ওঠে। না কত্তা না, যা ভাবছ তা নয়কো।

রামতনু আবার হাঁটতে আরম্ভ করে। তার হাসি হাসি মিচকে মুখের চালচিত্রে মস্করার ছবিটি ভারী সুচারু ফুটে ওঠে। রামপ্রসাদ সেটুকু অনুধাবন করেন।

রামতনু ভজহরির প্রতি প্রশ্ন তোলেন, কেন, হঠাৎ এ কথা কেন ভায়া। শুঁড়ির সাক্ষী গেঁজেল বলেই কি!

ভজহরি দন্ত বাহির করে হাসে, শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল দাদা, গেঁজেল নয়।

—বটে! বটে! কথার একেবারে বেরস্পতি দেখছি।

ভজহরি সেই দন্ত শোভাধারী অবস্থাতেই বলে, আমার মনিব বা দাদাটি যদি সাক্ষেৎ শনি হন থালে আর বেরস্পতি হতে ক্ষেতি কি!

রামপ্রসাদ এমত খটাখটি ঝুটো তর্ক সমরের এক পাশ থেকে মিটি মিটি হাসেন। এই

প্রায় রসহীন সময়ের অবসরে এমন সব কথা চালাচালি তাঁকে আনন্দের মুখ দেখায়। আহা, এই সময়ে যদি সেই বোষ্টম খ্যাপা অযোধ্যানাথটি দাখিল থাকত।

রামপ্রসাদ বলেন, বোসো দাদা, ওই ঘাসের ওপরেই বোসো। এখেনে আর আসন কোথা পাবো।

রামতনু হাঁটু তক ধুতি সমেত পা জোড়া ভাঁজ করে উবু হয়ে বসে পড়েন প্রসাদের অদূরে ঘাসের উপর। তারপর ভজহরির দিকে হাস্য কটাক্ষ রেখে বলেন, বাড়িতে অতিথ এলে একটু তামুকটামুক তো দিতে হয়।

প্রসাদ তাকান ভজহরির পানে, তোর কি বুদ্ধিসুদ্ধি দিন দিন নেমে ডাঁড়াচ্ছে।

ভজহরি দু-হাঁটু ধরে উঠে দাঁড়ায়। তারপর গলা খাটো করে বলে, আমাদের বউঠানের চুলোয় তো সব সময়েই আংরা রাখা আছে। থালে দেখি তামাকের কি করা যায়।

ভজহরি নিষ্ক্রান্ত হয় গাছ-গাছালির কোঠা ছেড়ে। প্রসাদ বলেন, হুঁ দাদা, তোমার মুখ বলছে মনে কোনও কথা আছে। তা বলেই ফেলো।

রামতনু একটি লম্বা শ্বাস ফেলে বলেন, শুনলুম তুমি নাকি রাজা কেষ্টচন্দরের বাড়ি যাচ্ছো কি এক মহা যাগ দেখতে। তোমার নাকি সেখেনে মহা নেমতন্ন।

প্রসাদ হাসেন, কে খপর দিলে তোমায়?

—এ খপর দিতে হয় না, রটে যায়। রাজার ডাক বলে কথা।

—কিন্তু তোমার কি মতলব শুনি।

—গরিব বামুনের যা মতলব হয় তাই। একটু রাজভোগ। মোটাসোটা দক্ষিণা। ছাঁদা। আর কি চাই।

—কিন্তু দাদা, আমি যে এখনও বুঝে উঠতে পাচ্ছিনে যাবো কিনা।

—এর আবার বোঝাবুঝির কি আছে। আমি তো ঢোলক নিয়ে তোয়েরই আছি। আমি পাঁজি দেখে এসেছি। কাল সন্ধে গতে বারবেলা ছাড়ছে। আর ঠিক তার পরেপরেই জোয়ার আসছে। একবার ভেসে পড়তে পারলে আর দেখে কে। একেবারে তরতরিয়ে চলে যাবো।

ভজহরি তামাক সেজে দখিন হাতের কনুইয়ে বাম হস্ত ঠেকিয়ে মহা সৌজন্য প্রদর্শনাৎ সেটি মেলে ধরে রামতনুর দিকে। ঢুলকি বামুন কিঞ্চিৎ পরেই দু-চোখ মুদে মহাসুখে তামাকুর ডাবায় ঠোঁট পেতে দেয়। নিঝুম মধ্যাহ্নে প্রসাদী বুনো জাঙালে পরিমণ্ডল ঘিরে অলস শব্দ ওঠে, ভুড়ুক-ভুড়ুক-ভুড়ুক...

আজও শ্রাবণী রাতে বাইরে সহসা মেঘ গর্জন ও তুমুল বৃষ্টিপাতের নাগাড় পার্বন। রামপ্রসাদ-সর্বাণীর শয়ন মন্দিরে ভিন্ন এক লীলার মাতন। আজকের বারিপাতে শিলা মূর্চ্ছনা নেই। তার বদলে মেঘ হুঙ্কার কিছু বেশি বটে। প্রসাদ আজ বিকেলের পর থেকে যথেষ্ট পান করেছেন। পানে তাঁর চরণ টলে না। কণ্ঠ চল্‌কায় ঘন ঘন। সেই আবেশে, ঘরের কোলঙ্গায় টিমি টিমি মেটে পিদিমের শোভায় তিনি তক্তপোষের ধারে যথারীতি দু পা ঝুলিয়ে বসে গান বুনছেন। সর্বাণী মেঝেয় বসে ভারী যত্ন করে পান সাজছে। তার কপালে ও নাকের আগায় এই বাদলেও বিন্দু বিন্দু স্বেদ।

প্রসাদ সুরে সুরে বাক্য বুনছেন—

আ মরি কি লাজের কথা মিন্‌সের উপর মাগী।
পদে পড়িয়ে ভোলা অদ্ভুত এক যোগী।।
এ কেমন নির্লজ্জ মেয়ে, পতির উপর চরণ দিয়ে,
রয়েছে উলাঙ্গী হয়ে রণ-অনুরাগী!
নয়নে দেখ না চেয়ে, শিব আছেন শব হয়ে,
একি সর্বনাশী মেয়ে লজ্জা সরম ত্যাগী।।

গীত শুনে পান সাজুনি সর্বাণী মনে মনে শিউবে ওঠে। তার নাসাগ্রে স্বেদবিন্দু আরও বিচলিত হয়। গুরুস্তনী বুকের ভিতরে ঢেঁকি পাছাড় দেয়। দিয়েই চলে। এখনও তার ঘরের মানুষটি জানে না, নতুন করে জঠর পূর্ণ হয়ে সাত মাস টপকে গেছে। আহা, এই রাতে কারণবারি টুবু টুবু পুরুষটির সর্বাঙ্গে আবার সেই ডাকাতটি ভর করেছে। আকাট বক্ষে কুঞ্চিত রোম, বলিষ্ঠ দুই হাতে পাথুরে পীড়ন ক্ষমতা, বলিষ্ঠ জানু বরাবর বলবান পেশি তাড়ন। সুচারু করে ছাঁটা কোঁকড়ানো কার্তিকেয় চুল, চোমরানো গুম্ফ আর বাহারে দাড়ির আড়ালে লালাভ গাল। টানা টানা চোখে সুরা আর গীত বিহ্বলতা একই সঙ্গে বহাল। এমত কাণ্ডাকাণ্ড আর পাত্রাপাত্রের নেপথ্যে বৃষ্টি তাড়িত এই মেটে ঘরের আবহে সঘন বজ্রপাত আর মুষলধার কোথা থেকে কামঘন চোরা বাতাস টেনে আনে। বাতাসের ঝোড়ো ঝাপটায় শ্রীমহাদেব উবাচ,

নটী কাপালিনী বেশ্যা রজকী নাপিতাঙ্গনা।
ব্রাহ্মণী শূদ্রকন্যা চ তথা গোপালকন্যকা।।
মালাকারস্য কন্যা চ নব কন্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ।
অথবা সর্বজাতীয়া বিদগ্ধা লোললোচনা।।

মহাদেব কহিলেন, নটী কাপালিকা, বেশ্যা, রজকী, নাপিতাঙ্গনা, ব্রাহ্মণী, শূদ্রকন্যা, গোপযুবতী, মালাকার কন্যা এই নবজাতীয়া যুবতি শুভযোনী। অথবা সর্বজাতীয়া বিদগ্ধা এবং লোললোচনা কুলযুবতি এই উদ্দেশ্যে প্রশস্তা।

মহাদেব বলছেন, তৎপরে সাধক ওই কুলযুবতিকে স্বীয় বাম উরুর উপরিভাগে স্থাপন করে কূলাচারানুযায়ী তাঁর পূজা করবেন। তারপর শকুন্তলা সেই যুবতির যোনি বা শক্তিপীঠে পূজা করবেন।

সাধক ওই কূলযুবতিকে কারণবারি পান করিয়ে তার কপালে সিন্দুর দিয়ে অর্দ্ধচন্দ্র আঁকবেন।

তৎপর কুচদ্বয়মর্দনপূর্বক তিনি যুবতির গণ্ডদেশে চুম্বন করবেন এবং যোনিমণ্ডলে অষ্টোত্তর শত বা অষ্টোত্তর সহস্র মূলমন্ত্র জপ করবেন।

কেবলমাত্র মাতৃযোনি পরিত্যাগ করে অন্য সমস্ত কুলযুবতির যোনিতেই তাড়না প্রশস্ত।

যোনৌ লিঙ্গ, সমাক্ষিপ্য তাড়য়েদ্বহুযত্নতঃ।

আদপে এ হল আদ্যাশক্তিরূপা জগন্মাতার পূজা। শক্তিরূপা সেই দেবী যদি বিপরিতরতিতে প্রবৃত্ত হয় তাহলে কোটিকূল সহ সাধকের জীবন ধন্য হয়।

শেষতঃ মহাদেব পার্বতীকে বলছেন, যোনিপূজা ভিন্ন আর সকল পূজাই নিস্ফল। যোনিপূজা ভিন্ন মন্ত্র সিদ্ধ হয় না। অতএব অন্য যাবতীয় পূজা পরিত্যাগ করে যোনিপূজা বা শক্তিপূজা সম্পন্ন করবে। হে পার্বতি, এই সাধনায় গুরুপদেশ ভিন্ন আমার ভক্তও সিদ্ধিলাভ করতে পারে না। অতএব, পুনরপি, সর্বাং পূজাং পরিত্যজ্য যোনিপূজাং সমাচরেৎ।

বাতাসের প্রবল তাড়নায় এই যোনিতন্ত্রাচার ঘটে যাওয়ার পরেও এই স্বল্পালোকিত ঘরে কিছু অবশেষ থেকেই যায়—প্রসাদ ও সর্বাণীর জন্য। বিশেষতঃ প্রসাদ যেহেতু এখন পূর্ণমাত্রায় কারণ নিমজ্জিত তাই, অভাবে গন্ধপুষ্পাভ্যাং কারণেনাপি পূজয়েৎ। পূজায় গন্ধপুষ্পের অভাব হলে কেবলমাত্র সুরা দ্বারা পূজা সম্পন্ন করবে।

প্রসাদের জন্য আরও একপ্রস্থ নিদান, যিনি কালী, তিনিই ত্রিপুরা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ছিন্নমস্তা, তারা, মহালক্ষ্মী, মাতঙ্গি, কমলা, সুন্দরী, ভৈরবী প্রভৃতি বিদ্যারূপে প্রকাশিতা। তাহলে কি এখানে ওই সর্বাণী রমনীর নামটি যুক্ত হতে পারে না। সে কি কম মেয়ে!

রাত্রির গভীর প্রহরে বাইরের তাণ্ডবময় প্রকৃতির বিপরীতে এই মেটে ঘরের নিস্প্রদীপ এলাকায় আজ এক মহাসমর দাখিল হয়েছে। উন্মত্ত প্রসাদের শায়িত শরীরের উপর যথার্থ ভৈরবী রূপিনী স্বয়ং সর্বাণী সঘন শ্বাস সমেত নৃত্য করে চলেছে অনির্বচনীয়, অভিরাম। সেই বিপরীত বিহারি নৃত্যের দাপটে প্রায় ত্রিকাল লুণ্ঠন। অহং মৃত্যুঞ্জয়ো দেবি তব যোনিপ্রসাদতঃ। তব যোনিং মহেশানি ভাবয়ামি অহর্নিশম। দে দেবী, তোমার যোনি অর্থাৎ শক্তি প্রভাবেই আমি মৃত্যুঞ্জয়ী। তোমাকে আমি অহর্নিশি চিন্তা করি, হে মহেশানি।

সর্বাণীর সাতসাতটি মাস গর্ভধারণের সমাচার পেয়ে প্রসাদ কোনও বাড়তি মন্তব্য করেননি। কেননা তিনি জানেন অভাবের সংসারে অতিরিক্ত আর একজন তো অতিথিবৎ। এ সংসারে তো এসো জন, বোসো জন লেগেই আছে। অতএব বাইরের ওই ঝড় দাপটের মতো রামপ্রসাদ সর্বাণীর আপাততঃ কুলাচার সমর সব কিছুর অতীত সাব্যস্ত হয়ে গেছে। প্রসাদ দেখছেন এই দেবী নীলমেঘপ্রভা, তন্বী, ঘোররূপা ও দিগম্বরী। সর্বাণী বুঝতে পারছেন, মহাকালেন রত্যর্থমুপবিষ্টাং স্মরাতুরাম...মহাকালের সহিত রতির নিমিত্ত তিনি কামার্তা হয়ে স্বয়ং শিবের হৃদয়োপরি উপবিষ্টা। তাঁর চর্তুদিকে ঘোররবা শিবাকুল বিদ্যমানের বদলে অঝোর বৃষ্টি আর ঝোড়ো তাণ্ডবের মহাঘোর উপস্থিত রয়েছে। আহা, এই সুজটিল দীপ নেবা অন্ধকারেও সর্বাণী ওই কৃতকৃতার্থ পুরুষটির সকাম আর হাস্য বিজড়িত মুখাবয়ব টের পাচ্ছে।

ক্ষিপ্ত শবসমান প্রসাদের মনে পড়ছে, শক্তিরূপা চ সা দেবী বিপরীতরতা যদি, শক্তিরূপা সেই দেবী যদি বিপরীতরতিতে প্রবৃত্ত হয়, তা হলে কোটিকুলসহ সাধকের জীবন ধন্য হয়।

দাদু বললেন, আমার বাবার আর একটা ঘটনা তোমায় বলি শোন। এসব অতিপ্রাকৃত আর লৌকিকতার বাইরের ঘটনা, এখনকার দিনে আর ঘটে না। ঘটলেও আমার জানা নেই। আমি অবাক হয়ে দাদুর বলা ওই দুটো খটোমটো শব্দ দেখি। কেন যে মাঝে মাঝে এমন সব শব্দ আমার সঙ্গে ব্যবহার করেন।

—একদিন, হয়েছে কি, বেলা দুপুরে, বাবা বসে আমায় অঙ্ক কষাচ্ছেন, এমনি সময় গাঁয়ের একজন এসে বল্লে, মুখুজ্যে মশাই, ওই গোঁড়া পুস্করণির পাড়ের বড় বড় গাছগুলো তো আপনার বলেই জানতাম।

বাবার সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, তা কি হয়েছে শুনি!

—আজ্ঞে শ্রীধর চাটুজ্যে গরুর গাড়ি ডেকে গাছ কাটাচ্ছে আর তুলছে। দেশের হলটা কি। আইন কানুন বলে কিস্যু নেই।

বাবা শুধু একবার বললেন, হুঁ।

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন, চল্ তো দেখি খোকা, কি ব্যাপার। আমি বাবার পেছু পেছু যাই। তিনি আগে আগে। গৌরবর্ণ দীর্ঘ পুরুষ। পরণে ধুতি। টকটকে বুকের আড়াআড়ি পৈতেগাছটি শোভা পাচ্ছে। আর আমি ভাবছি, কি জানি কি হয় এখন। কেমন একটা ড্রামাটিক অবস্থার সুমুখে পড়েছি যেন। অবশেষে বাপ-বেটায় উপনীত হলাম আমাদের সেই গোঁড়া পুস্করণির পাড়ে। গিয়ে দেখি, যথার্থ কথা, শ্রীধর জ্যাঠামশাই দু কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে। গেঁড়াপানা মানুষ। মাথায় চকচকে টাক। গলায় ময়লা পৈতেগাছটি। দেখি একখানা গোরুর গাড়িতে কাটা গাছ তোলা হচ্ছে। হুঁ, ইতিমধ্যেই খান দুই তো ধ্বংস হয়েছে। বাবা ঠান্ডা গলায় বললেন. দাদা, গাছগুলো যে কাটছেন বড়।

শ্রীধর জ্যাঠা ঘুরে দাঁড়ালেন বাবার দিকে। তারপর চোখ পাকিয়ে গলা তুলে বলে উঠলেন, আরে য্যা য্যা। কাটছি, বেশ করছি। আমার দরকার আছে তাই।

বাবার গলা যেন আরও ঠান্ডা হয়ে নেমে দাঁড়াল। তিনি বললেন, না, সে কথা হচ্ছে না। আপনার প্রয়োজন হতেই পারে। কিন্তু গাছগুলো যেহেতু আমার, তাই আপনি চাইলেই তো দিয়ে দিতাম।

চাটুজ্যে জ্যাঠার গলা আরও চড়ল. বললাম তো, আমার দরকার, আমি কাটছি। তুই যা পারিস করগে যা।

বাবার স্বর এবার কঠিন হয়ে দাঁড়াল। আপনি এভাবে আমার সঙ্গে কথা কইতে পারেন না দাদা।

—বেশ করছি। একশোবার বলব। বললাম তো—য্যা য্যা—

বাবা বললেন, আপনাকে কিন্তু আমি নিষেধ করছি দাদা। আর সীমা ছাড়াবেন না।

—দুঃশালা, শালা গুয়োর বেটা। চোখ রাঙাচ্ছিস শ্রীধর চাটুজ্যেকে!

বাবা এবার ডান পায়ের হাঁটু তুলে গলা থেকে পৈতেগাছটি খুলে নিলেন। তারপর হাঁটুতে পৈতেটি দু-হাতে ছিঁড়ে ফেলে শুধু বললেন, তুমি নির্বংশ হও।

বাবার পেছু পেছু আমিও বাড়ি ফিরে এলাম। তখন কি জানতাম আসল ড্রামা এখনও শুরুই হয়নি। ঠিক সন্ধের ঝোঁকে দাওয়া থেকে দেখি কি শ্রীধর জ্যাঠামশাই হাঁপাতে হাঁপাতে রাস্তা দিয়ে আমাদের বাড়ির দিকে দৌড়ে আসছেন। তাঁর খোলা কাছা পথের ধুলোয় লুটোচ্ছে। কোঁচা ঝুলঝুল করছে। তিনি আর্তনাদ করছেন, রক্ষে করো বাবা, রক্ষে করো। আমার একটি মাত্তর পুত্তুর। বাঁচাও ভায়া বাঁচাও।

বাবা শান্ত গলায় বললেন, আমি তো তখন বলেছিলাম। আপনি আমার কথায় কর্ণপাত করলেন না।

দু-হাতে বাবার পায়ের সামনে নতজানু হয়ে বৃদ্ধ ককিয়ে উঠে বললেন, আমার একমাত্তর বংশধর—অধর, দুকুর থেকে পায়খানা আর ভেদবমি করছে। তুমি না রক্ষে করলে ও বাঁচবে না বাবা।

আমি মনে ভাবি একই ব্যক্তিকে একবার ভাই আর একবার বাপ কেমন করে বলা যায়। শেষে অনেক কাকুতি-মিনতির পর বাবা বললেন, আমি যা বলেছি তা ফেরাবার সাধ্য আমার নেই। এখন দেখি, মা সিদ্ধেশ্বরী কি করেন।

বাবার পেছু পেছু আমিও গেলাম। বাবা মায়ের ঘরে ঢোকবার সময় জ্যাঠাকে বললেন, আধঘণ্টা অন্তর মায়ের চরণজল নিয়ে যাবেন। যতক্ষণ না দাস্ত-বমি বন্ধ হবে, চলবে। এই বলে বাবা মায়ের ঘরে ঢুকে দোর ছিলেন। ঠিক আধঘণ্টা অন্তর বৃদ্ধ আসেন। বাবা দুয়ার খুলে একটি তাম্রপাত্রে মায়ের চরণজল দেন, তিনি চলে যান। আমি ঠায় বসে রইলাম ঠাকুর ঘরের দাওয়ায়—ব্যাপারটা কি হয় দেখবার জন্যে। তা তোমায় কি বলব ভাই, এভাবে সারা রাত বৃদ্ধ লণ্ঠন হাতে আসেন আধঘণ্টা অন্তর, আর চরণ জল নিয়ে ফিরে যান। আমি দাওয়ায় বসে মশার খাদ্য হই। রাতটা কেটে গেল। ভোরবেলা—শেষবারের মতো চরণজল নিতে এসে বৃদ্ধ হাঁপছাড়া গলায় বললেন, পুত্র ভালো আছে। বাবা দোর খুলে বাইরে এলেন। টকটকে লাল চক্ষু। আর বুকের মাঝখানটিও রক্তবর্ণ।

এরপর যখনই দেশে গেছি আমাদের কাঁচরাপাড়া থেকে স্কুলের চাকরির ছুটিছাটায়, পথে দূর থেকে দেখছি শ্রীধর জ্যাঠামশাইয়ের একমাত্র পুত্র অধর আসছে। আমায় দেখে দূর থেকেই জোড় হাত করে পেন্নাম করে বলত, ওরে বাবা, কেউটে সাপের বেটা আসছে।

আসলে, অধরের কোনও ছেলেপুলে হয়নি। বংশ রক্ষে হয়নি। মনে মনে ভাবতাম, আমার লেখাপড়া করার বিচার বুদ্ধি দিয়ে—এ কি করে সম্ভব।

পনেরো

ঠাকুর্দার মুখে তাঁর পিতৃবর্ণনা আমি অবাক হয়ে শুনি। শুনি এই বৃদ্ধ, সুপণ্ডিত আর অনবদ্য কথক মানুষটির বলে যাওয়া। এখন মনে হয়, লিখিত সাহিত্য বা ইতিহাসের চেয়ে এই মৌখিকতার কোনও তুলনাই চলে না। পিতামহর কথার আঁকে বাঁকে কি যে রত্ন মণিমানিক গাঁথা।

আমি বলি, তোমার বাবা আসলে তান্ত্রিক ছিলেন বলেই কি এমন নিষ্ঠুর।

দাদু হাসেন, কে বললে নিষ্ঠুর। একে বলা হয় নিয়মনিষ্ঠ। ওখানে কোনও কমপ্রোমাইজ করার ব্যাপার নেই। আর একটা ঘটনা বলি শোনো। একদিন দুপুর বেলা মাঠের দিকে একা একা ঘুরতে ঘুরতে দেখি মাঠময় অজস্র তাল আঁটি পড়ে আছে। খুব লোভ হল। ধুতির কোঁচড়ে করে যতগুলো পারলাম তুলে নিয়ে এলাম। এসে দেখি, বাবা সবে দুপুরের ভাত খেয়ে উঠে দাওয়ায় বসে তামাক সাজবার জোগাড় করছেন। আমায় দেখেই বলে উঠলেন, তোমার কোঁচড়ে ওগুলো কী?

আমি কোনও জবাব না দিয়ে চুপটি করে দাঁড়িয়ে। বাবা না সাজা হুঁকো হাতে করে খড়ম পায়ে দাওয়া থেকে নেমে এলেন। তারপর কোনও কথা না বলে আমার কোঁচড়ে হাত দিয়ে বলে উঠলেন, তাল আঁটি। কোথায় পেলে? আমি মিনমিনিয়ে বলি, না মানে—ওই ওদিককার মাঠে পড়েছিল। বিস্তর পড়ে আছে বাবা।

—হুঁ, গাছগুলো কি তোমাদের?

—না, মানে, এমনি এমনি পড়ে আছে তো।

—এমনি পড়ে আছে। বেশ, তাহলে এটাও এমনি এমনি তোমার মাথায় পড়ুক। এই না বলে হাতে ধরা থেলো হুঁকোর ডাবাটা সপাটে আমার মাথায় হাঁকালেন। সেই সঙ্গে আদেশ জারি হল, যেখান থেকে কুড়িয়ে এনেছো, ঠিক সেখানে একটা একটা করে সাজিয়ে রেখে এসো।

আমি মাথায় হাত দিয়ে দেখি ঝরঝরিয়ে রক্ত পড়ছে। সেই রক্তাক্ত অবস্থাতেই তাল আঁটিগুলো ঠিক যেখান যেখানটিতে পড়েছিল, সেই ঘাসচটা জায়গায় আবার সাজিয়ে রেখে আসি।

দাদুর কাছে আমার এই গল্প শোনার কোনও সময় অসময় নেই। সকালে, সন্ধে, পড়াশোনার ফাঁকে। তবে অঙ্ক যা নাকি আমার কাছে যমসম, কষাতে বসলেই সব গল্প বাঁধন ঘুচে গিয়ে তালপাতার পাখার বাঁট—পটাং পটাং। দাদুর রোগা দেহে এমনিতেই জোর নেই। তার ওপর মারা হচ্ছে আমাকে, যে বাবার দ্বারা শুম্ভ-নিশুম্ভ পীড়নাভ্যস্ত। কেবল বধটুকু পড়ে থাকে। সে যাইহোক, গল্প শোনা নয়, আস্ত গিলে খাওয়া যেহেতু আমার কুস্বভাব, তাই যেখানে ওটি পাই আমি অমনি সেখানটিতে আঠাকাঠি হয়ে যাই।

ভোরবেলা, জমজমাট শীতের কুয়াশার ভেতর থেকে প্রাণে ছোবল দেওয়া আর্তস্বর ডুকরে উঠল আমার বাবার নাম ধরে, কানু, ওরে কানু আছিস ভাই। দোর খোল রে, দোর খোল—

ধড়মড়িয়ে উঠে বসি বিছানায় লেপ ছুঁড়ে দিয়ে। কে? কে এমন করে প্রাণ তাড়ানো ডাক দিচ্ছে!

ও ঘর থেকে বাবা-মাও উঠে পড়ে। বাইরে থেকে ডাক ধেয়ে আসে, কানু রে, ভাই কানু, দোর খুলে দে ভাই—

ফুটবলার বাবা যদি চার লম্ফে সিঁড়ি ভাঙে তো আমি তিন। পেছনে দ্রুত খুরখুরে পায়ে মা। এ বাড়িতে তখন সবাই ঘুমন্ত। আমার বাকি তিন ভাই বোন, বড়মা, দাদু, রামশরণকাকা ইত্যাদি।

বাবাই সদরের তালা খোলে। অমনি, ঠিক তখনই আমাদের সামনে এতক্ষণ বরাবর কানু কানু আর্তনাদ ছাড়ি মূর্তিটি প্রকট হয়। তালতোবড়া খর্বকায় বৃদ্ধের পরণে কোনওমতে আঁটা যৎপরোনস্তি লুঙি, গায়ে ঝলঝলে জীর্ণ মিলিটারি খাঁকি সোয়েটার, গলার কাছে জড়ানো কালো রংচটা র‍্যাপার। পায়ে পাটকিলে কাপড়ের কেডস্ মোজা। এসব ছাপিয়ে তাঁর মুখাবয়ব, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—যেটুকু দেখা যাচ্ছে—সবই অচিরাচরিত। মাথায় চটা ওঠা আর যথা-তথা ছাল ওঠা চুল, চোখ জোড়া তেড়াবাঁকা অথচ বিস্ফারিত, ভেতরের জল টলটল আর চোখের কোণে রক্ত ছিটে। বিশেষ করে নাকটি কে যেন অতি

নরম ভেবে টিপে বসিয়ে দিয়েছে। দু-হাতের আঙুলগুলোর বেশিরভাগই চিমটে দিয়ে চেপে বসানো যেন। তাও ক'টা আঙুলের মাথা নেই। কেউ মাঝখান থেকে খসে গেছে।

আমার মা এগিয়ে গিয়ে বৃদ্ধর ডান হাতের কনুই ধরে। তারপর আর্দ্র গলায় বলে ওঠে, আসুন দাদু, ভেতরে আসুন।

বৃদ্ধ এবার হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠেন নিথর শীত ভোরের কুয়াশা কাঁপিয়ে, ওরে ভাই কানু, ও রে মিলা, আমায় তোরা একটু ঠাঁই দিবি!

মা-বাবার সম্বোধনী গলায় বাড়তি মায়া ঢেলে দিয়ে শুধু বলে, ভেতরে আসুন দাদু।

পেছন থেকে বাবা, হ্যাঁ হ্যাঁ তাই তো। ঠাণ্ডায় এমন পথে দাঁড়িয়ে থাকলে হয়।

এই আমার বাবা-মা'র সূর্যকুমার দাদু, রক্ত-নিরক্তের সীমানা ছাড়িয়ে। কোথাকার কোন ঘুর পথ দিয়ে আজ এসে আশ্রয়প্রার্থী এখানে, আমাদের বিচিত্র সংসারে। সম্পর্ক খুঁজতে বসলে সে কিঞ্চিৎ ভজকট। আমার বাবার প্রাক্তন ভগ্নীপতি আর মার এখনকার পিসেমশাই, শান্তিপুরের ভোলানাথ দাদুর সাক্ষাৎ অগ্রজ এই বৃদ্ধ সূর্যকুমার। একদা নাকি কনিষ্ঠর চেয়ে সুপুরুষ ছিলেন। কালক্রমে এই কুঠ ব্যাধি, আস্তে আস্তে সুকুমার দেহের স্খলন আর ভাঙন ধরাতে ধরাতে এখন উপনীত এই গলিতাবস্থায়। দেহের যথাতথা থেকে মাংস খসে, মামড়ি ওড়ে। সেই সঙ্গে পুঁজ-রক্ত রস। এখানে সেখানে ছেঁড়া ন্যাকড়ার ব্যান্ডেজ বাঁধা। এই সূর্যকুমারের স্থূলকায়া স্ত্রী ভারী ভোজন-বিলাসিনী। সারাদিন মুখ চলে। দুই পুত্রের বড়জনা গুপী—কলকাতায় এলআইসির চাকরি, বাঁজা পরিবার আর স্বয়ং শ্বাস রোগ নিয়ে ভারী জ্বালাতন। পরজন—পরিতোষ বা পরু অর্দ্ধোন্মাদ। ফলে দারা আর পাগলা-ছাগলা সবেধন নিয়ে বসবাস আমাদের সেই ধুলুক গ্রামের গোঁড়া পুষ্করনীর ধারে, বাঁশঝাড় আর ধানের মরাইয়ের আবডালে, দু-কামরা মেটে ঘরে। কিন্তু এ জীবনযাপন মোটে নিরাপদ নিশ্চিত নয়। এই গ্রামেই সূর্যকুমারের এক বিষধর ভাগ্নে শশীপদ আছে। সে হতশ্রী মামার জমি জিরেত দেখবার ছলে সবই হরণ করে। এবার অঘ্রাণে এই ভাগাভাগি ধান নিয়ে তুমুল বিবাদ। মাতব্বর ভাগ্নে মামাকে ইলোপ করার শাসানি দিয়েছে। সেই গণ্ডগোলে পাগল ছেলে পরু বাপকে ধরে আচ্ছা করে পিটিয়েছে। ফলে গ্রাম থেকে পলাতক বৃদ্ধ প্রায় প্রাণ হাতে করে উপনীত—আকাট শীতভোরে, আমাদের হাটখোলা সংসারে।

আমাদের বাইরের ঘরে ঠাঁই হয় সূর্যকুমারের।

দেখভাল সব কিছুই আমার মায়ের হাত বরাবর। শুধু খাওয়া থাকার পরিপাটি নয় গলিত বৃদ্ধ রোগীর ছাড়া জামা-লুঙি ডেটল জলে ভিজিয়ে কাচা, তাঁর ক্ষত-বিক্ষত দেহে ডেটল জল বুলিয়ে দেওয়া। অঙ্গ থেকে খসে পড়া শুকনো অথবা ভিজে মাস, ছেঁড়া খবরের কাগজে করে নিয়ে গিয়ে বাগানের মাটিতে পুঁতে ফেলা। আমি আর তিন ভাইবোন এ দৃশ্যের সবটুকু বুঝি না। ধরতে পারি না। কেবল লক্ষ্য করি একজন নিঃসহায় রুগ্ন আর জীর্ণ মানুষকে কেমন করে নিঃসঙ্কোচে ভালবাসতে হয়। এখন তো বুঝতে পারি--এ ভালবাসা সংসারের মায়া টান আর রক্তের নিয়ম মানে না।

সন্ধে বেলা সূর্যকুমারের ঘরে এ বাড়ির নিয়ম মোতাবেক ঠেসে ধুনো দেওয়া হয়েছে। ঘরে নীল রঙা ডিম লাইট জ্বলছে, উনি চড়া আলো চোখে সইতে পারেন না বলে। সেই

রহস্যজনক আবছায়ায় তিনি বসে আছেন তক্তপোশে। পেছনে মশারির আন্ডিল স্তূপ করা আছে।

এধারে আমার কানু বাবা সান্ধ্য কয়েক ঢোকের পর সূর্যকুমারের ঘরে উপনীত। দুজনায় বাক্য চালাচালি হচ্ছে, আচ্ছা দাদু, আপনি বলুন তো, এই ধার্মিক লোকগুলোকে দেখলে কেন আমার মাথায় খুন চড়ে যায়।

সূর্যকুমারের রুগ্ন জটিল মুখে সহাস্য জবাব, সে কথা তোমার মাথাই জানে ভাই।

—না, না, এড়িয়ে যাবেন না, এড়িয়ে যাবেন না। এই যে সব লোকজন, যারা সারাদিন লোকের সব্বোনাশ চিন্তা করছে, পরের মেরে খাচ্ছে, আর নিত্যি দুবেলা ঠাকুরঘরে বসে পুজো করছে। এর মানে কি?

—আমি তো পুজো আচ্চা করি না। আবার লোকের সব্বোনাশ কামনাও করি না। তাহলে এর মানে কি?

—দুটোরই কোনও মানে নেই দাদু। অল বোগাস।

—তা হবে।

—তা হবে নয়, তাই হবে।

—আসলে, যে যাতে আনন্দ পায় ভায়া।

—আনন্দ। চোখ বুঁজে ঠাকুরের সামনে বিড় বিড় করছে আর মনে মনে প্যাঁচ কষছে। আপনার ওই আনন্দ কথাটার ডেফিনেশান কি বলুন দেখি। মানে, আপনি যেমন সন্ধেবেলা ধুনো দিয়ে বসে থাকতে আনন্দ পান. আর আমি একটু ইয়ে করে—

মা এসে দোরগোড়ায় দাঁড়ায়, দাদু, আপনার রাতে খাবার রুটি ক'খানা কি জলে ভিজিয়ে নেবো?

—হ্যাঁ দিদি, কালব্যাধি তো। দাঁতও খেলাতে পারি না।

বাবা গলা চড়িয়ে বলে ওঠে, কে বললে আপনার কালব্যাধি। এতে তো পটাং করে মরে না।

সূর্যকুমার বীভৎস মুখে ঘরের নরম সবুজ আলো টলিয়ে বলে ওঠেন, ওরে ভাই, আর পাঁচজন মানুষের কাছে আমিই তো সাক্ষাৎ একটি কাল।

এই সুরধনী গঙ্গা বক্ষে মহানন্দে গান ধরেছেন প্রসাদ। সঙ্গে তালবাদ্যধারী রামতনু বা তনু ঢুলকি। অনেকদিন পর তিনি ঢোলক বাগিয়ে সঙ্গতে বসেছেন। গান হচ্ছে খাম্বাজরাগিনীতে। তাল, একতাল।

যদি ডুবলো না ডুবায়ে বা ওরে মন-নেয়ে।
মন হালি ছেড়না ভরসা বাঁধ,
পারবি যেতে বেয়ে।।
মন—চক্ষু দাঁড়ি বিষম হাড়ি,
মজায় মজে চেয়ে।
ভাল ফাঁদ পেতেছ শ্যামা বাজিকরের মেয়ে।
মন—শ্রদ্ধা বায়ে ভক্তি বাদাম,

দেওরে উড়াইয়ে।।
রামপ্রসাদ বলে কালীনামের
যাওরে সারি গেয়ে।।

প্রসাদের পরনে আজ শোভন বেশ। পরিধানে ধুতি আর একপাট্টা দোবজা। তার উপর জরিদার উত্তরিয় ফেলা।

যেকালে এখন সন্ধ্যা পেরিয়েছে, তাই গীত হচ্ছে খাম্বাজ রাগিনী বরাবর। শান্ত তরণী, অমাবস্যা আঁধার নদীবক্ষে এখন কি আকাট নীরবতা। মাঝির হস্তে দাঁড় সঞ্চালন, জলের স্রোত চিরে ছপাত ছপ, ছপাত ছপ, আর সব ছাপিয়ে প্রসাদী উচ্চগ্রামী কণ্ঠস্বরে—মন হালি ছেড়না ভরসা বাঁধ—ইত্যাকার কথন বন্দী সুরস্রাব এই নদী ও তার দু-কুলকে মুহুর্মুহু ঠোনা দিয়ে চলেছে। প্রসাদ গাইছেন রজনীর মুখপাত খাম্বাজ সুরে, তনু ঢোলকে আড়া একতালে যথারীতি কেরদানি দেখাচ্ছেন, আর ভজহরি মহাসুখে নৌকার হালধারীর পাশে বসে সপ্তমী ছাঁটছে কাঠের ক্ষুদ্র পাটায়, কিট কিট, কিট কিট। নদীর দু'তীরে ঘন অন্ধকার, ক্কচিৎ কোথাও বা নিবিড় গাছ বুনন ভেদ করে কিঞ্চিৎ দীপ আলো। গঙ্গার বাদুলে হাওয়ায় দূর হতে বয়ে আসা সলতে পোড়া গন্ধ। রামপ্রসাদী গানের আড়ে আড়ে শবসাধনার তিল ঘৃতাদির বাস আর সদ্য গেল রজনীর স্বকীয়া যামে সর্বাণীর সঘন নিতম্ব চালনা—বিপরীত বিহারের সকাম উন্মত্ততা। আহা, এই তরণী এখন বুঝি বহমান সংসারেরই ধারণকারী চলচ্ছবি শক্তি। আসলে এ সবই এই তদগত অপার প্রকৃতিরই লীলারূপ। এই প্রকৃতিই স্ব-ইচ্ছায় স্বয়ং ও আত্মাকে মায়া, বিদ্যা এবং পরমা—এই ত্রিবিধ রূপে বিভক্ত করে বসে আছেন।

অথচ এই শান্ত অন্ধকারে, আপনার গীতখানি গাইতে গাইতে প্রসাদ কি যে মায়াটান টের পাচ্ছেন. সর্বাণী, জোড়া পুত্র-কন্যা, বৃদ্ধা মাতা এবং সব ছাপিয়ে ওই বুনো গম্ভীর ভিটেখানির জন্য। এসব ছেড়ে দূরে যেতে হৃদি না চাইলেও যেতে হচ্ছে। যেতে হচ্ছে রাজ ডাকে এবং এক বন্ধু স্বজনের আহ্বানে। এমন করে প্রপঞ্চময়ী মায়ার অতীত বাহির কোনও মায়াদিতে জড়িয়ে পড়া তো মানুষেরই ধর্ম। মানব শরীরে এর নাম বিড়ম্বনা, কোন মূর্খ বলে। রক্তমাংসে সকল চাঞ্চল্যই ঘটে, আকাশের মতো শূন্য নিরাবয়বে নয়।

যদি সর্বাণী, কেবলমাত্র সর্বাণীই হয় তাহলে তাঁর সুমুখে প্রশ্নকারী প্রসাদের সাজপত্তনে মহাদেব বলছেন, হে জগদ্ধাত্রি, তাহলে তোমার মহাবিদ্যায় মূর্তিভেদেব কথা আমায় বল।

দেবী বলছেন, তোমার সুমুখে এই যে আমি কৃষ্ণবর্ণা, যার পানে চেয়ে তুমি আমায় ভীমলোচনা বলে সম্বোধন করছ, সে তো আসলে কালী, এবং তা তোমাকে ঘিরেই। তোমার উর্দ্ধভাগে আমি বিরাজিতা এই কালী বা মহাকাল-স্বরূপিনী মহাবিদ্যা তারা। তোমার দক্ষিণে অতিভয়ঙ্করী দেবী মহাবিদ্যা ছিন্নমস্তা। বাম ভাগে দেবী ভুবনেশ্বরী। পৃষ্ঠভাগে বগলামুখী। তোমার অগ্নিকোণে বিধবারূপীনি মহাবিদ্যা মহেশ্বরী দেবী ধুমাবতী। নৈর্ঋত কোণে ত্রিপুরসুন্দরী কমলাত্মিকা। বায়ুকোণে মাতঙ্গী। ঈশান কোণে মহেশ্বরী ষোড়শী। আর অধোভাগে অবস্থিতা আমার এই ভীমা মূর্তিই ভৈরবী। আর সব অতিক্রম করে এই কুলহারিণী গঙ্গার রম্য বাতাসে রামপ্রসাদ যদি মাঝখানে থাকেন, তাহলে তাঁকে ঘিরে এই এতগুলি কোণাকোণে হবেক মূর্তির একটিমাত্র সমাহার—সর্বাণী।

গান ফুরোয় এখনকার মতো। এবার হালে বসে ভজহরি। ইতিমধ্যে এক প্রস্থ কলকে কীর্ত্তন ঘটে গেছে। প্রসাদ তাঁর প্রিয় মেটে পাত্র সমেত কারণ নিয়ে বসেছেন। আর বেচারি অধম রামতনু বসে বসে হর্তুকি চুষছে।

হালের মাঝিও মোটামুটি তুরীয় ভাবে তোলা উনুনে চালে ডালে চড়িয়েছে। তারই মধ্যে আলু, বেগুন, মুলো, সীম ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ছইয়ের তলে খিচুড়ি টগবগাচ্ছে। রামপ্রসাদ জল পথ নির্দেশ যেহেতু জানেন, তাই সামনেই ত্রিবেণী। তারপর গাঙ বেয়ে সিধে নবদ্বীপ। সেখান হতে ডাইনে জলঙ্গী নদীর ছুতো ধরে একেবারে রাজধানী কৃষ্ণনগর।

রামপ্রসাদ কারণ পান করতে করতে পরম বৈষ্ণব বৃন্দাবন দাস ঠাকুরকে মনে করেন, নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাই, যথা অবতীর্ণ হইলা চৈতন্য গোঁসাঞি।

রামতনু প্রশ্ন করেন, নেশা দেখছি বেশ চেগেছে ভায়া। তা কি অত নবদ্বীপ নবদ্বীপ করছ শুনি?

প্রসাদ মুখ হতে পাত্র নামান। তারপর মন্দ্র স্বরে বলেন, হুঁ। কালীকার পাত্রে কৃষ্ণকথা বটে। তাহলে বলি শোনো, আমাদের হালিসহরে তো শ্রীচৈতন্যদেব এসেছিলেন তাঁর গুরু ঈশ্বরপুরীর দেহান্তের পর। মহাপ্রভুর জন্মস্থান নদীয়া নবদ্বীপের নাম নিয়ে পণ্ডিতেরা অনেক বাক্যি বলেন। প্রদীপকে তো আগে বলা হত দীয়া। ওই ন'টি দীয়া বা দ্বীপ থেকে হল নদীয়া বা আমাদের এই নদে জেলা। আবার অনেকে বলেন যে অনেককাল আগে নদীর চরে এক তান্ত্রিক সাধু এসে থাকতেন। প্রতি নিশায় তিনি ন'টি দ্বীপ জ্বেলে ওখানে সাধনা করতেন। মানুষ দূর থেকে সেই ন'টি আলো দেখে বলাবলি করত, ন-দীয়ার চর। পরে যখন এ তল্লাটে মানুষ বাস করতে আরম্ভ করল তখন থেকেই তার নাম হল নদীয়া।

রসাল হরিতকি চুষতে চুষতে রামতনু বলেন, এতখানি লম্বা চওড়া বাক্যি শুনে মনে হল তুমি ভায়া খটমট একখানা পুঁথি পাঠ করছ। আমার মতো মুখ্যু বামুন তোমার বদ্যিগিরির ঠাঁয়ে যে হার মেনে বসে আছে তাতো তুমি জানোই ভাই। তার চেয়ে যা বলবার টুকটাক সুরে বলো, আমি একটু মনের সুখে হাত গরম করে নিই।

প্রসাদ আনমনা হাসেন, যা বলছি সেও তো সুর দাদা। বেসুরে তো আমি হারগিস বাতচিত করি।

—হুঁ। বুঝিচি। জবর নেশা চড়লে তোমার বদন দিয়ে এমন যবন ভাষা বেরোয়।

প্রসাদ বলেন সেই একই রকম অন্যমনে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ্যপাটখানি ভারী কম নয়। উত্তরধারে পলাশী, দক্ষিণে সাগর, পূবে ধুলিয়াপুর আর পশ্চিমধারে মা গঙ্গা ভাগীরথী। মোটমাট এই এলাকাটি হল, একবাক্যে চৌরাশী পরগণে।

—বাপরে কাণ্ড! তুমি দিন ভিখিরি হয়েও রাজত্বের হিসেব রাখো।

—হুঁ, রাজা রাজড়ার হিসেব রাখি বলেই তো আজ আমার বেশবাস ভদ্রস্থ করেছি। আর একটি জিনিসও তোলা আছে ভজহরির ঝোলায়। সেটি কেবল রাজসভার জন্যে।

—বটে বটে! তা সেটি কি শুনি?

ভজহরি হালের ধার থেকে বলে, একটি পাক্‌ড়ি। তাতে আবার জরি বসানো। হুঁ হুঁ বাবা। মাথায় দিলে আমার দাদাটি একেবারে সাক্ষেৎ রাজপুত্তুর।

তনু দত্ত প্রকটিয়া হাসেন, বলিহারি। বলিহারি।

প্রসাদ এবার বলেন, রাজা-রাজড়ার কথা তো আছেই। তার আগে এক ফোঁটা এই জলপথের কথা কই।

—কও ভায়া।

—আদপে এই ভাগীরথী মুরসিদাবাদের সুতির কাছে ছাপঘাটি গ্রামের নিকটে এসে মূল নদী ছেড়ে দিশে পাল্টেছে। বিধুপাড়ার কাছে পৌঁছে আর খানিক পথ পেরিয়ে সে নবদ্বীপের নিচস্থলে জলঙ্গীর সঙ্গে মিলেছে। এই জলঙ্গীর একটি ভারী মিঠে আর আদুরি নাম হল গে খড়ে নদী। আর একটি নদীও আছে কৃষ্ণনগরের ধারে পাড়ে। তার নাম অঞ্জনা।

—বলিহারি। নাম শুনলে দ্বিতীয়বার বে বসতে সাধ হয়।

—আর আছে বাচকোর খাল। এই খালধারে চৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদ শান্তিপুরের অদ্বৈত গোঁসাই দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। সেই গ্রামটির নাম হল নৌকাড়ি। আসলে এখেনে একসময় নৌকোর আড়ত ছিল তো।

—ভাল কথা, অদ্বৈতও বোষ্টম, আবার আমিও প্রায় বোষ্টম। থালে আর একটি বিবাহে দোষ নেই।

হাল থেকে ভজহরি বলে ওঠে, উঃ, রস যে উবজে পড়ছে।

তনু বলেন, ভাল কথা ভায়া, এখুনি বলে রাখি। শুনিচি এই কেষ্টনগরের ধারে খালে বিলে বিস্তর মাছ পাওয়া যায়। তা রুই-কাতলা তো আমাদের দেশে মেলে। আমি শুধু চাট্টি ভাত খাবো মোতিচিঙড়ি আর কাঁকলে মাছ দিয়ে।

রামপ্রসাদ বলেন, এবার থালে রাজার কিচ্ছে শোনো।

রামতনু ট্যাঁক থেকে আর এক টুকরো হরিতকি বার করে মুখে দিয়ে বলেন, বলো।

—রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বুদ্ধির ব্যবস্থাটা বাল্যকালে থেকেই। তাঁর পিতা রাজা রঘুরাম যখন দেহ রক্ষে করলেন তখন তাঁর বয়েস মাত্র আঠারো। কিন্তু কি এক আশ্চয্যি কারণে পুত্র কৃষ্ণচন্দ্রকে সিংহাসন না দিয়ে নিজের বৈমাত্রেয় ভাই রামগোপালকে আসন দেবেন বলে মনস্থ করলেন নবাবকে বলে কয়ে। এই রামগোপাল বিদ্যে বুদ্ধিতে কিন্তু একেবারেই খাটো আর কাণ্ডজ্ঞানহীন। তিনি সবসময় তামাক খেতেন। যাকে বলে ধূমপান-পরতন্ত্র।

—বাবারে, এখেনেও তন্ত্র।

—তা ঠিক যে সময় রামগোপাল নবাব সাক্ষেতে যাবেন ঠিক তার আগেই কৃষ্ণচন্দ্র এক কল করলেন। মুরসিদাবাদ চকের রাজপথের দুধারে কয়েকজনা লোক বসে বসে অতি উৎকৃষ্ট আর সুগন্ধি তামাক খেতে লাগল। রামগোপাল ওই পথে যেতে যেতে নাকে অমন খোশবাই তামাকের বাস পেয়ে তো একেবারে বিমোহিত। মনে হল, নবাবের কাছে গেলে তো অনেকক্ষণ তামাক সেবা হবে না। তারওপব, এমন উৎকৃষ্ট তামাক। এক ছিলিম না খেলে যে প্রাণ যায়। রামগোপাল বাহকদের বললেন, পালকি নামাও। তারপর খাস চাকরকে ডেকে বললেন, ওরা যে তামাক খাচ্ছে—এখুনি আমায় এক ছিলিম সেজে দে বাপ। এ দিকে যারা তামাক খাচ্ছিল তাদের আগে হতে শেখানো পড়ানো ছিল। ফলে তারা নানা ছলে কৌশলে তামাক দিতে বিলম্ব করল। এদিকে যখন পথের ধারে তামাক

সাজা হচ্ছে, ওধারে নবাব সভায় বসে পড়েছেন। কৃষ্ণচন্দ্র তড়িঘড়ি নবাবের সুমুখে দরখাস্ত্ হয়ে সজল চোখে তাঁর সিংহাসন দাবীর কথা নিবেদন কল্লেন। নবাব এই কিশোরের বিদ্যে বুদ্ধি আর বিজ্ঞতা দেখে তো যারপরনাই অবাক। তিনি মনে ভাবলেন—এমন তরুণ আর বুদ্ধিমান তনয় থাকতে রঘুরাম কেন নিজ ভাইকে বিষয়াধিকারী কল্লেন। নবাব প্রশ্ন কল্লেন, রামগোপাল কোথায়? অমনি কৃষ্ণচন্দ্রের শেখানো কথা মতো এক নবাব কর্মচারী বল্লে, শুনলাম, তিনি চকের পথের ধারে বসে তামাক খাচ্ছেন। কথাটা ভজিয়ে নিতে নবাব লোক পাঠালেন। সেই দূত ফিরে এসে বল্লে, জাঁহাপনার যা কর্ণগোচর হয়েছে সেটি সত্যি। আমি স্বচক্ষে দেখলাম তিনি বাস্তবিকই রাজপথে দোলাযানে বসে তামাক খাচ্ছেন। নবাব তৎক্ষণাৎ রামগোপালকে নিতান্ত অপদার্থ আর অসার ভেবে কৃষ্ণচন্দ্রকে রঘুরামের স্থলে বসবার আদেশ জারি করলেন।

নৌকা এসে পড়ল ত্রিবেণীর বাঁকে। মূল মাঝি নোঙর করল নদী পাড় খানিক তফাতে রেখে। এবার খাওয়া দাওয়ার তোড়জোড় করতে হবে তো।

ষোলো

—ন মাধব সমো দেবো ন চ গঙ্গা সমা নদী।
ন তীর্থরাজসদৃশং ক্ষেত্রমস্তি জগত্রয়ে।।

মাধবের মতো আর কোনও দেবতা নেই। গঙ্গার ধারা দ্বিতীয় কোনও নদী নেই, আর এই ত্রিজগতে ত্রিবেণীর পারা আর কোনও তীর্থক্ষেত্র নেই।

এ পর্যন্ত বলে রামপ্রসাদ নৌকার পাটায় উঠে দাঁড়িয়ে রাত্রির অন্ধকার বরাবর ত্রিবেণীর প্রত্যক্ষতা নজর করতে লাগলেন। ইতিমধ্যেই নৌকার ছই-এর তলে চালে-ডালে-আনাজের এক লপ্ত টগবগানিতে বাড়তি এক ত্রিবেণীর রচনা হয়েছে। সেই সঙ্গে যদি চতুবর্গ চিন্তা করা যায়, তাহলে শেষকালে মুক্ত হতেই পারে, এতক্ষণ নাওয়ের বাতাসভোগী মানুষদিগের ক্ষুধা। বিশেষত মাল্লার হাতের গুণেই ওই সামান্য আয়োজন ভারী সুগন্ধ পরিবেশন করছে। রামতনু হরিতকি মুখে করে নদীবাতাসে ঝিমোচ্ছে। ভজহরির শরীরে কড়া বড় তামাক সেঁধনোয় তার পেটে ছুঁচোর তাণ্ডব আরম্ভ হয়েছে।

রামপ্রসাদ মনে মনে নিজ মনকেই বলে চলেছেন, এই ত্রিবেণীতে স্নান করলে নিদ্রিতা শক্তি কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ ঘটে। মূলাধারে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না এই তিন তিনটি নাড়ি এসে যদি মেলে, তাহলে মাঝখানে আছেন সরস্বতী নদী—যিনি সুষুম্না, বামধারে ইড়া—অর্থাৎ যমুনা, আর দখিনধারে পিঙ্গলা—সাক্ষাৎ মা গঙ্গা। এই তিন তিনটি নদীর সঙ্গম স্থলেই হল মূলাধার।

হরিতকি চোষণ চমকিয়ে রামতনু বলে ওঠেন, কি বিড় বিড কচ্ছ ভায়া। নেশার জোর বড় জবর বোধ হচ্ছে।

রামপ্রসাদ হাতে ধরা ভাঁড়ের তলানচিটুকু আত্মসাৎ করে মৃদু মৃদু হাসেন। সেই গতিকেই তিনি বলে ওঠেন,

দেখিয়া ত্রিবেণী গঙ্গা চাঁদরাজা মনে রঙ্গা

কুলেতে চাপায় মধুকর
আনন্দিত মহারাজ করে নানা তীর্থ কাজ
ভক্তিভরে পূজে মহেশ্বর

রামতনু দ্বিগুণ চমকিয়ে বলে, এ পদখানি তো তোমার রচা বলে মনে হচ্ছে না।

প্রসাদ জবাব দেন, না দাদা, এ আমার কম্ম নয়। এটি দ্বিজ বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল থেকে আওড়ালুম। তিনি দশম শতাব্দীর মানুষ ছিলেন।

রামতনুর অবিস্মিত চোখে মুখে তিলমাত্র ভাবপ্রকাশ ঘটে না। তিনি নাওয়ের ছই বরাবর ক্ষুধা পাবণের ফুটন্ত বিষয়ের দিকে চোখ রাখেন। প্রসাদ আত্মগত আপন মনে আউড়ে যান মৃদু স্বরে,

বামদিকে হালিসহর দক্ষিণে ত্রিবেণী।
যাত্রীদের কোলাহলে কিছুই না শুনি।।
লক্ষ লক্ষ লোক এক কালে করে স্নান।
বাস হেম তিল ধেনু দ্বিজে দেয় দান।।
গর্ভে বসে শিবপূজা করে কোন জন।
ব্রাহ্মণের সাথে কেহ করয়ে তর্পণ।।
শ্রাদ্ধ করে কোন জন জলের সমীপে।
সন্ধ্যাকালে কোন জনা দেয় ধূপ দীপে।।

রামতনু ক্ষুধা অলস স্বরে বলে ওঠেন, ইটি আবার কেটা?

প্রসাদ নিজ মনেই বলে যান, কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এই ছবিটি লিখে গেছেন। এ বাদে দ্বাদশ শতাব্দীতে 'পবণ দূতম' নামে সংস্কৃত কাব্যে, তারপর 'গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিনী' কাব্যে এই ত্রিবেণীর কথা ভারী চমৎকার করে বলা আছে।

ওধার থেকে ভাত চড়ানো হালের মাঝি গলা তুলে বলে, ত্রিবেণী ত্রিবেণী, এসব কি বলছ গা ঠাকুর। আমরা তো জানি তিরপানি।

প্রসাদ সেই আনমনেই হাসেন, হ্যাঁ ভাই, তুমি যথার্থই বললে। তিনধারার পানি যখন এখেনে বহাল তখন তিরপানি বললে দোষ কি সে। কেউ কেউ বলে, ত্রিপানি, তারবানি, ত্রিভেণী, ত্রিপণী—এমনি আরও কত কি। তবে উচ্চারণটারণ যাই হোক না কেন, এ স্থানটি তো নবদ্বীপ, ভট্টপল্লি, গুপ্তিপাড়ার সঙ্গে সমানে হাল টেনে দেবভাষা সংস্কৃত শিক্ষার একখানি ডাকসাইটে ভূমি। পণ্ডিত কূল চূড়ামণি জগন্নাথ তর্ক পঞ্চানন মশাইয়ের নিবাস তো এখানেই। হাতে সময় থাকলে তাঁকে একবার দর্শন করে যেতাম।

—বটে, বটে।

—হ্যাঁ, ওঁর মতো পণ্ডিত এখন গোটা বঙ্গদেশে নেইকো দাদা। মা সরস্বতী তাঁর আপন মা। তবে যতদূর শুনেছি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র পণ্ডিতমশাইকে তাঁর বাজপেয়ী যজ্ঞে নেমন্তন্ন করেননি।

—কেন ভায়া?

—পণ্ডিতমশাই এক সমাজভ্রষ্ট গরিব ব্রাহ্মণকে শাস্ত্রীয় প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে আবার

সমাজে তুলেছিলেন। এ কাজে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের তরফ থেকে বাধা ছিল। পণ্ডিতমশাই সে নিষেধ কানে নেননি। ফলে রাজা কুপিত।

তনু কান উচ্ছিষ্ট করা হাসি হেসে বলে ওঠেন, ফলং, রাজার বাড়ি এত বৃহৎ যাগ অনুষ্ঠানে পণ্ডিতের নেমন্তনং নাস্তি।

ভজহরি ছইয়ের মাথা হতে বলে, বাবারে, বাবারে, একেই বলে বামুনের পৈতের জোর। ঢোলক বাজালে কি হবে, অংবংএ কামাই নেই।

প্রসাদ বলেন, পণ্ডিতমশাইয়ের বিদ্যের একটি গপ্পো বলি শোনো। ছেলেকালে তাঁর মা গত হন। তা সে সময় তিনি তাঁর পিতৃদেবের কাছে সংস্কৃত পড়ছিলেন। মা গত হওয়ার পর পণ্ডিত জগন্নাথ বংশবাটিতে এসে তাঁর জ্যাঠা ভবদেব ন্যায়ালঙ্কারের টোলে স্মৃতিশাস্ত্র পড়তে এলেন। তা সে যা হোক, একদিন ভবদেব তাঁর জেঠাঠাকুর পণ্ডিত চন্দ্রশেখর বিদ্যাবাচস্পতির রচিত দ্বৈতনির্ণয় বলে একখানি স্মৃতিগ্রন্থ এক ছাত্রকে পড়াচ্ছিলেন। পড়াতে পড়াতে এক জায়গায় এসে তিনি কিছুতেই একটি আর্থিক আপত্তির উপপত্তি করতে পারছেন না। তখন তিনি ছাত্তরের সামনে কতক হতাশ অবস্থায় বলে উঠলেন, এই স্থানটি আমার জেঠাঠাকুর যথাযথ বুঝতে পারেননি। ভাইপো জগন্নাথ অদূরে বসেছিলেন। তিনি ঈষৎ হেসে কইলেন, মহাশয়ের জেঠা যথার্থই উত্তম বুঝেছিলেন। এখন দেখছি আমার জেঠা বুঝতে পারছেন না।

ভজহরি ওধার থেকে গলা তুলে বলে, আজ রাতে আর সুমুখে অগ্রসর হয়ে কাম নাই। ডাঙায় বর্গী ডাকাত। আর জলে রঘু ডাকাত।

প্রসাদ বলেন, একবার এক ডাকাত সর্দার শ্যাম মল্লিক যেয়ে উপনীত জগন্নাথ পণ্ডিত মশায়ের সুমুখে। সে জানত, পণ্ডিত মশাইয়ের কিঞ্চিৎ কেপ্পন স্বভাব আছে। তা যাই হোক, সেই ডাকাত প্রথম দফেতেই পণ্ডিত মশাইকে তুষ্ট করে ভুরি ভুরি দক্ষিণা নিবেদন করে জানতে চাইল, লুঠ করা দ্রব্যের উপর তার স্বত্ব আছে কি না। পণ্ডিতমশাই বিধান দিলেন, পাশ্বিকদ্যূতচৌর্যাদি প্রতিরূপকসাহসৈঃ, ব্যাজেনোপার্জিতং যচ্চ তৎকৃৎস্নং সমুদাহৃতম। অতঃপর পণ্ডিতি বিধান হল, ইতি বচনেন চৌর্যস্য স্বত্বজনকত্বম্। আর শেষ কালে বচন হল, পিতামহচরণাশ্চ চোরিতদ্রব্যে চৌরস্য স্বত্বং স্বীকুর্বন্তি।

ভজহরি কথা কয়, এত সব অং বং-এর ক্ষীরটি কি দাদা? মানে বিধেন কি হল?

—বিধেন হল স্বত্ব আছে।

—বলো কি দাদা।

প্রসাদ হেসে কন, আর সে রাতেই পণ্ডিতমশাইয়ের বাড়িতে ডাকাতি হল।

টগবগানো চালে ডালে নেমে দাঁড়ায় উনুন থেকে। আজ এই অবধি। আর কোনও ব্যাঞ্জন নেই। কিন্তু যেহেতু মূল গায়েন প্রসাদের তরফ থেকে এখনই খেতে বসার কোনও উদযোগ নাস্তি তাই বাকিরা চুপ। বাধ্য হয়েই ভজহরি হালের ধাবে চিৎপাত হয় এবং অবিরাম আকাশ দেখে চলে। সে আকাশে এখন শ্রাবণী মেঘ রইলেও তেমন ঘনঘোর নয়। ফলে মাঝেমধ্যে পয়পরিষ্কার আকাশ চোখে পড়ছে। তৎসঙ্গে আনাজ মিশেল খিচুড়ির গরম বাস দিব্য লাগছে ক্ষুধার্ত মুখে।

রামতনু এতক্ষণে গল্পে মতি পেয়ে যান। ফলে ট্যাকের ডিবে থেকে মুখে আর একপ্রস্থ হরিতকি।

রামপ্রসাদ এবার নতুন করে কথা পাড়ার ব্যবস্থা করেন। হ্যাঁ দাদা। আমার কাছে খপর আছে বাজপেয়ী যজ্ঞে রাজার বাড়ি পণ্ডিতমশাইয়ের নেমতন্ন হয়নি।

তনু বলেন, তাতে ভারী এল গেল তেনার।

—সে তো ভিন্ন কথা। কিন্তু এ অপমান তিনি মেনে নেবেন কি না আমি জানি না।

—তনু বলে ওঠেন, বেশ বেশ। এবার নতুন একখানা কিচ্ছে বলো দিকিনি ভায়া। বেশ জমে গেছে।

—কিস্যা নয়, একেবারে সাঁচি কথা দাদা। বেশ তাহলে আর একটি বেক্তির কথা বলি তোমায়। সেও এক আজব সংস্কৃত পণ্ডিত। তবে কি না জেতে হিঁদু বামুন নয়। একেবারে তোমাদের সমাজের খাতায় সাক্ষাৎ যবন। নাম তাঁর জাফর খাঁ

—সে আবার কেটা?

—এই ত্রিবেণী সেই ত্রয়োদশ সালে যখন মুসলমানদের খাস দখলে আসে তখন এ অঞ্চল প্রথম শাসন করেন জাফর খাঁ। তিনি ছিলে সপ্তগ্রামের মালিক। বহু হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে তিনি সেই সব ভাঙাচোরা মালমশলা দিয়ে এখানে পাঁচ পাঁচটি গম্বুজধারী একখানি মসজিদ তোয়ের করান। এই মসজিদের গায়ে পাথুরে নকশায় অজস্র ভাঙাচোরা দেবদেবীর মূর্তি টের পাওয়া যায়। এমনকী পাখনাধারী সাপখোপের মূর্তি আছে। পণ্ডিতগণ বলে থাকেন এমন স্থাপত্য বাংলার আর কোথাও নেই।

তনু অবাক হরিতকি চোষণ সমেত। বলছো কি ভায়া। এ যে ভারী তাজ্জব।

—জাফর খাঁর বউ ছিলেন হুগলির মেয়ে আর হিঁদু। আর এখানে যে জোড়া পাঁচিল আছে তার দ্বিতীয়টির গায়ে 'সীতা বিবাহ', 'শ্রীরামাভিষেক', 'কংস বধ' প্রভৃতি সংস্কৃত লিপি খোদাই করা আছে। রহস্য হল, গাঁথনির সময় অনেকগুলো পাথুরে লিপি উল্টে গাঁথা হয়েছিল বলে সিধে ভাবে পড়া মুশকিল। আবার অনেকগুলো আঁকা ছবিও আছে যেমন—'শ্রীরামেন রাবণ বধঃ', 'ভরতাভিষেক', আরও কত কি।

—কি কাণ্ড! অবাক কাণ্ড। বলি তোমার এই খাঁ সায়েব আর জম্মে হিঁদু বাউন ছিলেন গা। তা না হলে এমন কারবার কেমনে ঘটে!

প্রসাদ কথার জোয়ার ঠেলে বলে ওঠেন, জাফর খাঁ এত সব হিন্দু মন্দির ভাঙলেও এই মা গঙ্গার প্রতি ভারী ভক্তি ছিল।

—বটে!

—হ্যাঁ, তিনি নিত্যি গঙ্গা পূজো করতেন। তার কারণ হল, তাঁর তৃতীয় পুত্তুর বর খাঁ গাজী হুগলির রাজকন্যেকে বে করেন। সেই কন্যেটির ভারী গঙ্গা ভক্তি ছিল। এই দেখে জাফর আর তাঁর বাকি পুত্তুরগণ মা গঙ্গার দিকে টাল খান। শোনা যায়, সেই মেয়েটি নাকি বিস্তর অলৌকিক ভেল্কি দেখায় গঙ্গা পূজো করে। ফলে হয়তো এমত ভক্তি। লোকে অবিশ্যি না জেনে বলে, একখানি গঙ্গা স্তোত্র তাঁর রচা। কিন্তু আদপে এটি বেদব্যাসের তোয়ের করা।

স্তোত্রটি হল,

যৎত্যক্তং জননী—গণৈর্যদপি ন পৃষ্টং সুহৃদ্বান্ধবৈ—

যস্মিন পান্থ দিগন্ত সন্নিপতিতে তৈ স্মর্য্যতে শ্রীহরি...

ফুরফুরে বাতাসে নেশা ঘুমে বিভোল ভজহরির কানের পাশে বিকট শব্দে ঢোলক দাবড়িয়ে তাকে সটান দাঁড় করিয়ে দেন রামতনু। জোড়া মাঝি হেসে আকুল। রামপ্রসাদও চাপা হাস্যে ঠোঁট টেপেন।

গাঙধারের আঁধার ঝোপ থেকে এক মাল্লা বড় বড় মানকচুর পাত কেটে আনে। সেগুলো নদীর জলে ধুয়ে নৌকার পাটায় পাত পড়ে। তিন আর দুই—এই পঞ্চজনে তপ্ত খেচরান্ন আহার, নদীর মন্দ মন্দ কখনও মিঠে হল্কাধারী বাতাসের গড়নের মাঝখানে বসে, মাথার উপর রাজসাক্ষী নিগূঢ় আকাশে কতিপয় তারা মিট মিট, এ ভারী অভিরাম কারবার।

সপাত সপ খিচুড়ির হাঁকরানি বয় পঞ্চজনার হাতে মুখে—যেন বা গাঙে দাঁড়ের ছপাত ছপ। রামপ্রসাদ খেতে খেতে চারিধারে কুতূহলী দেখেন। দেখেন তীরের সঘন আঁধারে প্রকৃতি রূপিণীর আশ্চর্য কলাছলা, রসরচনা, দিগন্তজোড়া জলমণ্ডলের রহস্য অতীত আর কোনও ছলনা।

খিচুড়ির সপ সপাত তালে তালে রামপ্রসাদ তাঁর কবি সংসারের পূর্বপুরুষ মুকুন্দরামের চণ্ডী হতে দরাফ খাঁ গাজী বা জাফর খাঁর বর্ণন আওড়ান।

পাজোয়ায় বন্দিয়া যাবো শুভি খাঁ পীরে।
দফর খাঁ গাজিরে বন্দো ত্রিবেণীর ধারে।।

সূর্যকুমারের মুখে নিজেকে সাক্ষাৎ একটি কাল বলাব কারণাকারণ তখন বুঝিনি। তবে আন্দাজ করেছিলাম ব্যাপারটা খুব একটা ভাল কিছু নয়।

এই মানুষটি নাগাড়ে ক'দিন আমাদের বাড়িতে থাকার দরুণ তাঁর কতগুলো স্বভাব আমার কূট নজরে পড়ে যায়। যেমন তিনি চোখে রোদ সইতে পারেন না। এমনকী রাতে, ঘরে জোরালো আলো জ্বলাও অসুবিধে। ফলে কতক রাত পেঁচার মতন এই কদাকার, জরদগব আর ছেঁড়া খোঁড়া মাংস পিণ্ড সর্বস্ব বৃদ্ধ আমাদের একতলি বাইরের ঘরবন্দী—প্রায় অহর্নিশি।

তবে মাঝে মাঝে কিছু অদ্ভুত ব্যতিক্রম হয়। যেমন দুপুরবেলা মা হয়তো ভাঁড়ার ঘরে মেঝেয় একটু গড়িয়েছে। পাশে ট্রানজিস্টার রেডিওটা আলগোছে খুলে রাখা। সেখানে মিন মিন করে গান হচ্ছে। বাইরে হঠাৎ টিপটাপ বৃষ্টি এল। অমনি বাইরের ঘরের ভেজানো দরজা ঠেলে টলোমলো হন্তদন্ত সূর্যকুমার বার রোয়াকের তারে মেলে দেওয়া জামা-কাপড় দু'হাতের আধখোলা আর টেপা আঙুলে টেনে হেঁচড়ে তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। মা হঠাৎ পাতলা আবুল্লি চমকে এ দৃশ্য দেখে প্রায় লাফ দিয়ে উঠে পড়ে।—আপনি কেন এ সব তুলছেন দাদু। বুড়ো মানুষ!

সূর্যকুমার বীভৎস মুখ ভাসিয়ে হাসেন। মেঘলা আর আলো আলো দুপুরবেলা সে মুখে অকস্মাৎ রাক্ষস পিশাচ ভর করে।

—তাতে কি হয়েছে দিদি। তুমি চৌপর দিন খেটেখুটে একটুখানি গা পেতেছো। আর আমি বুড়ো মদ্দ কিনা খাচ্ছি আর শুয়ে বসে থাকছি। এটুকু করতে আমি খুব পারি।

—না, না, আপনি এ সব করলে যে আমার পাপ হবে দাদু।

সূর্যকুমারের হাত থেকে পুঁজ-রক্তের ছোঁয়াচ লাগা ভেজা-আধভেজা কাপড়ের পাঁজা মা টেনে নিতে চেয়েও পারে না। সূর্যকুমারের গলিত রাক্ষুসে চোখে মুখে কি এক অজানা জিদ চমকায়। জামা-কাপড়ের আন্ডিল বুকের সঙ্গে সাপটে ধরে রাখেন তিনি।

—পাপ, কিসের পাপ! আমার চেয়ে পাপীষ্ঠ আর কে আছে এ সংসারে।

মা কেমন যেন ভয় পেয়ে হাত গুটিয়ে নেয়। ঠিক তখনই বড়মা বাথরুমের দরজা খুলে থপথপিয়ে বেরিয়ে আসতে আসতে বলে, সূয্যিকুমারের বরাবরই মায়ার শরীর।

সূর্যকুমার সেই রকমই বঙ্কিম হেসে বলেন, তাহলে, তাহলে। তোমার নাতবউ তো কালকা যোগী। তোমার মতো কজনা চেনে আমায় বলো মা।

বড়মা মাথার বুরুশ কুচি ফটফটে পাকা চুলে হাত দিয়ে জল মুছতে মুছতে ভেতরে সেঁধোয় আর বলে, আহা, যেমন দয়া, তেমনি মায়া। সূয্যিকুমার আমার সাক্ষাৎ ধম্মপুত্তুর।

সদর দরজা ঠেলে বাসন মাজতে আসা পাগলিনী সরস্বতী দিদি তার নিজের মনে বিড়বিড়িয়ে বলে, ও মা কী ঘেন্না। কী ঘেন্না!

মা শুনতে পেয়ে চাপা দেয়, আজ কি দিয়ে ভাত খেলে সরস্বতী?

সরস্বতী দিদি তার মাড়ি ভাসানো ঝকঝকে দাঁতের শোভা আর বৃহৎ চোখ জোড়া দুলিয়ে একগাল হেসে বলে, আজ এক কড়া প্যাঁজ পোস্ত রাঁধলাম। সঙ্গে আপনার গে কড়াইয়ের ডাল। আর হল গে উচ্ছে পুটপুটি। আর এই অ্যাতো টুকুন-টুকুন বেলে মাছের ঝাল—সর্ষে না বেটে, গেদে লঙ্কা বাটা ঠুসে—

সূর্যকুমার ঘরে ঢুকে দমাস করে দরজা বন্ধ করেন। মা জামা-কাপড়গুলো একখানা বড় বালতিতে ডেটল ঢেলে চুবিয়ে দেয়। বড়মা, বিকট গলা টিপেছে কেউ এমন শব্দে উচ্চগ্রামী হাই তোলে তিন-চার রকমের সুর তুলে। সরস্বতী পাগলি দিদি কুয়োতলায় ঝিমি ঝিমি বৃষ্টিতে বাসন মাজতে মাজতে গলা তুলে বিচিত্র আর স্বরচিত গান ধরে। বলা বাহুল্য এই গীতমালায় যতনা গরমিল ততই মিল শেষকালে, খানিক সমে ফেরার কায়দায় ধুয়ো ধরা তার নন্দ স্বামীর মুণ্ডুপাত করে। গান হয়, আমার কথা যায় রে ভুলে, লোকের কথা বলিবে বলে, বর্ষাকালে পান্তা খেলে, নন্দ এবার মরিবে বলে।

মা বারান্দায় দাঁড়িয়ে মুখ টিপে হাসে। দিদি গেয়ে চলে, তেঁতুল গাছে বেগুন হলে, কুমড়ো গাছে সর্ষে হলে, নন্দর মুখে কুষ্ঠ হলে, নন্দ এবার মরিবে বলে।

মা দূর থেকেই শিউরে ওঠে। চোখ রাখে ও ঘরের ভেজানো দরজায়। পাগলি দিদি গান গেয়ে যায় রামপেসাদী সুরের ধারে পাড়ে। এবার গানের তাল বা গতি ক্রমে ক্রমে বাড়ে। গান হয়, হালিসহরের রামপেসাদে, পাঁটা বলি হয় না বলে, পটল গাছে কাঁটাল হলে, নন্দ এবার নাচিবে বলে।

এবার পদ্য ছেড়ে গদ্যে নামে দিদি, বোমমম্ ষটকে, ওইইই নন্দর চিলুতে গিয়ে আটকে। হুঁ হুঁ হুঁ, নন্দর চিলুতে ক্যাঁটাল কাঠের বদলি চ্যালা চ্যালা পেঁপে কাঠ দোবো। রোগা মাকড়া নন্দ পেঁপে কাঠে জ্বলবে। হাড়গুলো ফাটবে পট পটাং, মট মটাং—

বড়মা দোতালা থেকে গলা তুলে মাকে বলে, বলি অ মা, তুমি কি রেডিও শোনার আর সোময় পেলে না। সারা দুপুর দু'চোখের পাতা এক করতে পাল্লুম না। কি গানের ঘটা।

মা আপন মনেই মুখ টিপে হাসতে হাসতে রান্নাঘরে চায়ের জল চড়াতে যায়। ঠিক তখনি বারান্দায় এসে দাঁড়ায় মা'র পাড়াতুতো ননদ দত্তবাড়ির অন্নপিসী। ভারী স্নেহময়ী এই স্বামী পলাতক মানুষটি। বিয়ের সময়, ফর্সা, লক্ষ্মী ট্যারা আর টাক মাথা মাঝবয়সী বরটিকে আমরা একবারই দেখেছিলাম। পরণে ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবি, বিয়ে করতে বসেও ঘনঘন নস্যি নিচ্ছে। পকেট থেকে রুমাল বার করে নাক ঝাড়ছে। গলায় বেল গোড়ের মালার সঙ্গে ওই নাকঝাড়া ব্যাপারটি আমার বিকট লেগেছিল। অন্ন পিসীর আইবুড়ো রেলে চাকুরে আমাদের বলুকাকা, বৃদ্ধ বাবা-মা, আধ উন্মাদ ভাই বনু আর একটি ভগ্নী গন্নাকাটি—মানে ওপরকার ঠোঁট কাটা—চানুকে নিয়ে সংসার সামলে, অতিকষ্টে বোনটির বিয়ে দিল। রিকশোয় বর-কনে বিদায়ের কালে সে কি অঝোরে কান্না কাকার। যদিও জানা ছিল এই অতীব কু-মুখশ্রী আর কতক কুবজাকৃতি বোনের বিয়ে দেওয়া যে সে কর্ম নয়। আশ্চর্যের কথা পিসীর বররত্নটি ফুল শয্যের পরদিন ভোরেই উধাও। তারপর আর ফেরেনি। এ নিয়ে পাড়ার এক বুড়ি মানুষকে আমার মার সাক্ষাতে বলতে শুনেছি, বরটা পালিয়ে বাঁচল। অমন কাঠের সখী নিয়ে করবেটা কি।

অন্ন পিসীর কণ্ঠস্বরও বেশ ব্যাটা ব্যাটা। সেইরকম স্বরেই সে বলে, বউদি, আমার জন্যে চায়ের জল নেবেন কিন্তু। আপনার ওই লেড়ো বিস্কুট দিয়ে খাবো।

মা মুখ ঘোরায়, তুমি না অম্বুলে রুগী। বাবার কাছে হোমিওপ্যাথি ওষুধ খাও।

—তা হোক গে। ওষুধও খাবো, কুপথ্যিও করব। কি হবে আমার বেঁচে থেকে।

—ও মা, সে কি কথা।

পিসী গলা খাটো করে বলে, হ্যাঁ বউদি, লোকটার পরণের জামা-কাপড়গুলো সুটকেসে ন্যাপথলিন দিয়ে রেখেছি। সবে তো ছটি বছর গেল। ফিরতেও তো পারে।

কথা বলার সমে ফাঁকে পিসীর মাথায় ক্যাটকেটে সিঁদুর চমকায়। হাতের একগাছি করে ব্রোঞ্জের চুড়ির সঙ্গে শাঁখা নোয়া পাল্লা দেয়।

সতেরো

প্রায় প্রতিদিন না হলেও মাঝে মাঝেই দাদু সাত সকালে আমায় তলব করেন। হেতু, পর পর কয়েকটি গান শোনানো। দাদু মেঝেয় পাতা মেদিনীপুরী সরু কাঠির মাদুরের ওপর দু-পা মুড়ে—কতক পদ্মাসনের ভঙ্গীতে বসে। আর আমার স্থান দখিন ধারের জানলার নিচে একধাপ উঁচু বাঁধানো বসবার জায়গায়। একই ঘরের কোণার দিকে বড়মা তাঁর নিজের নিচু চৌকিতে—যার দুধারে হাসপাতালের মতো একজোড়া উঁচু কাঠের পাঁচিল তোলা।

দাদুর গান শোনা ফরমায়েশ অনুযায়ী। প্রথমে, রামধুনটা গাও।

সকাল বেলা রেডিওয় গান্ধি চর্চা অনুষ্ঠান থেকে বিজনবালা ঘোষ দস্তিদার কিংবা পালুসকর থেকে শেখা, রঘুপতি রাঘব রাজা রাম, পতিত পাবন সীতারাম দিয়ে আমার সঙ্গীত পরিবেশন শুরু।

আমি প্রভাতী জানলায় বসে গান গাই। দাদু দু-চোখ বুঁজে একটু সামনে ঝুঁকে নিবিষ্ট ভঙ্গীতে গান শোনেন।

পরের গান, প্রেম মুদিত মনসে কহো রাম রাম রাম, পাপ কাটে দুখ মিটে লেকে রাম নাম...। এও বিজনবালা।

তিন নম্বর, অলখ ইলাহী এক হ্যায়, নাম ধরায়া দো, কৃষ্ণ করিম এক হ্যায়, নাম ধরায়া দো...।

এই গান থেকেই পিতামহের ঠোঁট ফুলিয়ে ফুলিয়ে ফোঁপানো আরম্ভ। কি যে হয় ওঁর অন্দরমহলে বুঝতে পারি না। এ গানে এমন কান্না দমনের কি আছে!

শেষ গান রামপ্রসাদী, মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া- -

মুশকিল হয় একটাই। কোনওদিনও দাদু এই গানখানি পুরোটা শুনে উঠতে পারেন না।

মায়ে যত ভালবাসে, বুঝা যাবে মৃত্যু শেষে

মোলে দন্ড দু-চার কান্নাকাটি, শেষে দিবে গোবর ছড়া...

এই স্থানটিতে এসে দাদু আর কান্না রোধ করতে পারেন না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কতক ডুকরে কেঁদে ওঠেন বৃদ্ধ। আমায় হাত তুলে ওই একই পংক্তিটুকু আবার, আবার গাইতে বলেন। পরপর অন্তত বার তিন চারেক। তারপর হাত ইশারায় আমায় থামতে বলে কোনওমতে বলেন, দোরটা ভেজিয়ে দিয়ে যাও।

বড়মা ঘরের ও প্রান্তের খাট থেকে ভ্রু কুঁচকে বলে, কি জানি বাপু, ছেলেটা আমার বড়ই হল না।

সেদিন সন্ধেবেলা দাদুর সামনে ইংরেজি ট্রানস্লেশন রপটাচ্ছি। দাদু উচ্চারণ বিষয়ে ভারী সতর্ক। যেমন THE কে দ্য বলতে হবে। WAS হবে ওয়জ-এর কাছাকাছি, FIGURE এর শেষে R উচ্চারণ কীরকম ভাসন্ত হয়ে শেষ অক্ষরটি বাতাসে উড়বে। দাদু তাঁর রাঁচি স্কুলে পড়বার স্মৃতি টেনে তাঁদের ইংরেজি শিক্ষক উইলিয়াম টিপিং-এর উচ্চারণ শেখানোর কায়দাকানুন আমায় বোঝাচ্ছেন। সাহেব ঠিকঠাক উচ্চারণের সহজ দৈহিক টোটকা হিসেবে জিভের নিচে একটি উড পেনসিল গুঁজে বলতেন, ওয়জ, ওয়জ, ইত্যাদি।

আজ পড়ানো শেষে দাদু কীরকম স্মৃতিকাতর হয়ে পড়লেন।

—আমার বাবার কথা বলে শেষ করা যায় না। মাত্র একচল্লিশটি বছর জীবিত ছিলেন। অথচ কি কালারফুল।

আমি গল্পের নেশায় পড়ে আস্তে আস্তে বইখাতা গোটাই।

—ব্যাপারটা ভারী অদ্ভুত ভাই! আমাদের মা সিদ্ধেশ্বরী তো দশাসই খড়-মাটির মূর্তি। তাঁরও তো পরমায়ু আছে। মানে দেহটার। তা শোনা ছিল, বেশ অনেক বছর পর দেবীর অঙ্গরাগ হয়। তার মানে সম্পূর্ণ মূর্তিটি ধসিয়ে ফেলে, পুরনো কাঠামোর ওপর আবার নতুন করে প্রতিমা তৈরি করাতে হয়। আরও শোনা ছিল, এর মিস্তিরি আলাদা! তাঁরা বংশ পরম্পরায় কিছু চাকরান জমি পেয়ে এ জেলারই কোনও গ্রামে বাস করেন।

—চাকরান মানে কি?

—চাকর থেকে চাকরাণ। অর্থাৎ কে কোন পূর্বপুরুষ ওই মিস্তিরিদের এক পূর্ব-পুরুষকে খানিকটা জমি লিখে পড়ে দিয়েছিলেন প্রতিমার অঙ্গরাগ-এর দায় দিয়ে। কতকটা বেঁধে রাখা গোছের ব্যাপার আর কি।

—চাকর! কথাটা যেন—

হ্যাঁ ভাই, আমারও ভাল লাগে না শব্দটা। আসলে সেকালে জমিদারি সেরেস্তায় এমন সব আরবি, ফার্সীর চল ছিল। এইট্টিনথ সেঞ্চুরির শাসন ব্যবস্থা, রাজকার্য তখন এসব ভাষাতেই হত। সে যাই হোক, আর একটি কথা প্রচলিত ছিল। আমাদের বংশের যে ব্যক্তির উদ্যোগে এই অঙ্গরাগ করানো হবে তাঁর জীবনের ওপর নোটিশ জারি হয়ে যাবে। অঙ্গরাগ-এর পর বড়জোর মাসখানেক তাঁর পরমায়ু।

—সেকি!

—হ্যাঁ, তাই। তা একদিন সেই বিশেষ মিস্তিরিরা এসে বাবার সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে গেল। সবাই তাদের খবর করেছিলেন। তারা বলে গেল সামনের আমাবস্যের দিন কাজে হাত দেবে। আমি শুধু প্রতিমার নবকলেবরের খবরটা জানি। বাকি কাহিনি জানি না।

—আশ্চর্য।

—হ্যাঁ, আশ্চর্যই। যা হোক ঠিক এক আমাবস্যের ভোরে সেই জোড়া মিস্তিরি এল। তারা আসলে বাপ-বেটা। আমি কিন্তু লক্ষ করছি তারা আসামাত্রই বাবা কেমন পানসে বিষণ্ণ হয়ে গেলেন। স্বভাব গম্ভীর মানুষটি সেদিন আরও গম্ভীর হয়ে দেবীর পূজো সারলেন। মিস্তিরি বাপ-বেটা ঠাকুর পেন্নাম করে কাজে হাত দিল।

—তারপর?

—তারা কাটারি দিয়ে মূর্তির যেখান সেখান দিয়ে খড় বেরনো আর রং মাটি খসে পড়া স্থানে খপাখপ কোপাতে লাগল। তার আগে অবিশ্যি মাতাঠাকুরানির অঙ্গ থেকে গয়নাপত্র, চাঁদমালা আর মস্ত লালপেড়ে শাড়িখানা খুলে নিল। আমাদের গৃহদেবী, মানে ফ্যামিলি গার্জেনকে এই প্রথম ন্যাংটো দেখলাম। কেন না, বাবা কাপড় পরাতেন দোর বন্ধ করে। সে এক ভারী বিচিত্র দৃশ্য। অতখানি বৃহৎ মেটে প্রতিমা, অত তাঁর সাজপত্তন। মুহূর্তে সেই তেজি আর ভয়ঙ্করী প্রতিমাটিকে দিগম্বরী আদুল অবস্থায় কেমন যেন অসহায় বলে মনে হল আমার। যাঁর কাছে এসে পাঁচজন পুজো দেয়, মানত করে, ভয়ে ভক্তিতে সমঝে চলে, তাঁর অবস্থাটি এখন ভারী অনাথিনী আর অভাগী। ওই জোড়া মিস্তিরির হস্তে তাঁর যেন মরণবাঁচন। বাবা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন বুকের কাছে দু-হাত মুড়ে। ছেলেমানুষ আমি, তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে চুপটি করে এই কাণ্ড দেখছি। কালীর গায়ে কাটারির কোপ পড়ছে, আমি শিউরে শিউরে উঠছি। ঘরের কোণে তাঁর হাতের অস্ত্র শোভা প্রকাণ্ড খড়গটি পড়ে আছে।

—কি সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড গো।

—সাঙ্ঘাতিক বলে সাঙ্ঘাতিক। সেই দৃশ্যটা মনে করলে এখনও আমার বুক কেমন করে। তারপর, নাগাড়ে ক'দিন কাজ চলল। কারিগররা আমাদের দাওয়াতেই থাকত, খেত। শেষ যেদিন রংচঙ করে, ঘামতেল চড়িয়ে প্রতিমাকে নতুন বস্ত্র, গহনা পরানো হল, সে কি শোভা। বিশেষ করে নাক থেকে কান বরাবর সোনার চেন টানা। ডগাটা নাকের

ঝুমকোয় বাঁধা। সত্যিই নবকলেবর। কারিগররা কাপড়-চোপড়, সিধে আর দক্ষিণা নিয়ে বিদায় নিল। বাবা সেদিন ঠাকুরঘরে অনেকক্ষণ থাকলেন। সন্ধের শেতল দিতে এসে বেশ অনেকক্ষণ ধরে সন্ধ্যারতি করলেন আমার হাতে বাজানো কাঁসরের সঙ্গে। গ্রামের মানুষজন সেদিন ভিড় করে এল ঠাকুরতলায়। কিন্তু কোথায় যেন একটু বিষণ্ণতা ছড়িয়ে ছিল সবার মধ্যে। বাবা দেবীকে শয়ান দিয়ে আমার পেছু পেছু ঘরে ফিরলেন। আমার হাতে ধরা লণ্ঠন।

—তারপর?

—ঘরে এসে বাবা যথারীতি তামাক সাজতে বললেন। আমি আনন্দ করে বাবার জন্যে তামাক সেজে নিয়ে এসে দেখি তিনি দাওয়ার একধারে মাথাটা হেঁট করে বসে আছেন। লণ্ঠনটা কমানো আছে। আর দেখি, বাবার টকটকে গৌরবর্ণ লম্বা চওড়া চেহারাটা কেমন যেন নুয়ে গেছে—অনেকটা ওই কমিয়ে রাখা আলোর মতো। বুকের মাঝখানটা যেন আরও বাড়তি লাল। মাথার কোঁকড়া চুলগুলো কেমন অবসন্ন আর অকারণে ভিজে ভিজে। খড়গ নাসাটি বল্লমের ফলার মতো নিজের বুকের দিকে তাগ করে আছে। তামাক এগিয়ে দিতে বাবা টানা টানা চোখ দুটি তুলে আমার পানে চাইলেন। দেখলাম চোখ জোড়াও টকটকে লাল। বাবা কি কাঁদছিলেন! কে জানে। আমার হাত থেকে বাবা এক হাতে তামাক নিলেন, আর এক হাত বাড়িয়ে আমার এক হাতের মাঝখানটি ধরে টেনে নিয়ে আমায় নিজের কোলে বসিয়ে দিলেন। আমি কেমন যেন হতভম্ব বনে গেলাম। যে বাবার কাছে পাষণ্ড পীড়ন ছাড়া কোনওদিনও বাবা-বাছা শুনিনি, তাঁর এই হঠাৎ ভাব পরিবর্তন আমায় অবাকের একেবারে চড়া ধাপে তুলে দিল। আমার ভারী অস্বস্তি হতে লাগল। আমি কেমন যেন পাথুরে জরদগবের মতো তাঁর কোলে বসে রইলাম—অকালে, কোলে না বসার বয়েসে।

আমিও অবাকের সাততলায় উঠে দাদুর বিবরণ শুনি।

—বাবা আমার মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন। যে হাত এতকাল আমার চুলের মুঠি খামচে ধরেছে, সে হাতের স্বভাব কি করে এমন পাল্টে গেল আমার বোধগম্য হল না। আমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বাবা বলতে লাগলেন, দেখ বাবা, বাপ-মা কারও চিরকাল থাকে না। এটাই সংসারের নিয়ম। কিন্তু তাই বলে তুই যেন অমানুষ হোস না। মনে রাখবি, তোকে মানুষ হতেই হবে। মনে জিদ রাখতে হবে। সংসারকে দেখতে হবে। স্বার্থপর হলে চলবে না। মনে থাকবে তো। কিরে মনে থাকবে তো বাবা।

আমায় কোলে করে বসে আছেন আমার নতুন বাবা। একেবারে অচেনা বাবা। কিরকম অভিনব একজন কাঙাল বিষণ্ণ মানুষ। আমার কাছে কাকুতি মিনতি করে আমার কাছে ভিক্ষে চাইছেন—আমি যেন মানুষ হই।

এর এক মাসের মধ্যে আমার বাবা কি এক অজ্ঞাত জ্বরে পড়লেন। তিনদিনের মাথায় চলে গেলেন সন্ধে রাতে। সেদিন ভরা আমাবস্যে।

আমি, আমার বিধবা মা, ছোট বোন আর এক ভাই সমেত এক লপ্তে অনাথ হলাম।

ত্রিবেণীতে রজনী বাস। তারপর দিনমানে নদীপথ আর নিশায় নোঙর করে জঙ্গলগড় নদীতীরের কাছাকাছি কোথাও রাত্রিবাস। এভাবে অতিক্রান্ত হল তিনদিন তিন রাত্রি। চতুর্থদিনের প্রভাতে দেখা গেল নবদ্বীপের মুখপাত। সেখান হতে গঙ্গার মায়া ত্যাগ। এবার দক্ষিণ বাগে জলঙ্গী বা খড়ে নদীর নিচু খাতে পড়ে রাজধামের দিকে। এখানে দুই নদীর জলের বর্ণে আশ্চর্য তফাৎ। এতক্ষণ বয়ে আসা গঙ্গার দেহবর্ণ যেমন গেরুয়া ঘোলা তেমনি জলঙ্গির বর্ণ তার মিঠে আর গূঢ় নামটির সঙ্গে যোগ বেখেই কি আশ্চর্য সবুজাভ গভীর। গঙ্গার উদাসী দেদারের সঙ্গে এই ক্ষুদ্র শাদামেটে গ্রামিন নদীটির জাতিগাত্রি একেবারেই ভিন্ন। এখানে গঙ্গার দ্রিমি দ্রিমি উধাও, কলস্রোত বাজনের সঙ্গে বহু যোজন তফাতি মৃদু মৃদু কল কল জলতরঙ্গ বজায় আছে। তাতে করে বড় নদীর সঙ্গে ছোটটির কোনও বিসম্বাদ নেই। হিঁদু-মুসলমানের বিবাদ যেমন সাঁচি মানুষী, জলে জলে ভাব ভালবাসার অবস্থান তেমনি অমানুষী প্রাকৃতিক। এই সব তত্ত্বাতত্ত্বের মন গড়া অবস্থার গতিকে রামপ্রসাদের কেবলই মনে পড়ে, কত দূরে রয়েছে নিজবাসভূমি হালিসহরের সেই ছায়া ছায়া বুনো জাঙালে পরিমণ্ডল। সেই নিবিড় আশ্রয়ে তাঁর সংসারটি কি করছে এখন। কেমন আছে বুড়ি মা জননী। ছেলেমেয়ে, আর গর্ভীনি গৃহিনী।

জলঙ্গির পথে সুমুখে কৃষ্ণনগর-এর ডাক। ওখানেই পরম বান্ধব আর মহাপণ্ডিত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য অধিষ্ঠান। আর মাত্র কটি দিন পরেই সেই বিশেষ যাগ অনুষ্ঠান। রাজার রাজকীয়তার মহাতুঙ্গী উদাহরণ।

রামপ্রসাদ জানেন এই রাজার পিতৃদেব রাজা রঘুরাম রায় অতিবড় দাতা আর পুণ্যবান। তস্য পিতৃদেব রাজা রামজীবন দ্বারা এই কৃষ্ণনগরে রাজধানী আদপে স্থাপিত হয়নি। এই রাজধানী প্রকৃতপক্ষে স্থাপন করেন তাঁর পিতৃদেব, বাইশ লাখি জমিদারির অধিকারী রাজা রামকৃষ্ণ রায় মহাশয়।

কিন্তু তার আগে এই রাজ আলয় ছিল মাটিয়ারি পরগণায়। রাজা রামকৃষ্ণের পিতা মহারাজ রুদ্র রায় রাজ্যাভিষিক্ত হয়ে মনে বাসনা করলেন, মাটিয়ারি গিয়ে বসবাস করবেন। রাজার হুকুমে তাঁর প্রধান চাকর পহেলা দফে সেখানে গেল এবং রাজপুরী নির্মাণে লেগে পড়ল। রাজালয় প্রস্তুত হলে রুদ্র রায় সপরিবারে পাত্র-মিত্রাদি সহ মাটিয়ারিতে চলে এলেন। পরকালে তাঁর তিনতিনটি পুত্র হল। রামচন্দ্র, রামকৃষ্ণ আর কনিষ্ঠ রামজীবন। জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র রাজা হলেন। তিনি ছিলেন অতিবড় বলবান। ফলে বহু ক্ষুদ্র জমিদারগণের জমি অধিকার করলেন নিজ বলশক্তিতে। রাজ এলাকা আরও বৃহৎ হয়ে দাঁড়াল। রামচন্দ্রর অবর্তমানে রাজা হলেন রামকৃষ্ণ। এবং ঠিক এই সময়ে ইতিহাসের একটি পাক পড়ল। এইকালে ঢাকা নগরের সুবা মুরশিদ কুলি খাঁ ওই নগর ছেড়ে চলে এলেন গঙ্গাতীরের এক সুরম্য স্থানে। স্থান নাম নিজ নামেই রাখলেন মুরশিদাবাদ। এবং এই হল বাংলার নবরাজধানী।

রামপ্রসাদ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বিচিত্র জন্ম বৃত্তান্তের খপর রাখেন। সে কথা মনে করলে যে কোনও মানুষেরই রোমাঞ্চ হতে পারে। রাজা রঘুরাম রায় মহাপ্রাণ, সদাশয় আর প্রজানুরঞ্জক। কিন্তু মনে দুখ বড়ো যে দিনে দিনে রানির বয়স বাড়ছে, তথাপি কিছুতেই গর্ভসঞ্চার হচ্ছে না। ফলে শত সুখেও মনে মনে কাঁটার খেদ। অতঃপর রাজা-রানি যুক্তি করে স্থির করলেন, পুত্রার্থে কঠিন তপোব্রত পালন করবেন। দুইজনায় প্রতিদিন অতি

প্রাতে গাত্রোত্থান করে স্নানানন্তর ঈশ্বরের কঠিন পূজা বা সাধনা 'সূর্যদৃষ্টি' আরম্ভ করলেন। এই সুকঠিন তপশ্চারণ দেখে মানুষজন চমৎকৃত হল। সেই অবস্থায় ব্রত উদযাপন ঘটল ঠিক এক বৎসরের মাথায়। অতঃপর রাজা এক মহতী যজ্ঞ করলেন বিস্তর ঘটাপটা সহকারে। তারপর ঘটল এক বিচিত্র স্বপ্ন কাণ্ড। এক দিবস রাজারানী শয়নমন্দিরে ঘুমে বিভোল। সেই রজনী শেষে রানী এক অভিনব স্বপ্ন দেখলেন। এক অপূর্ব পুরুষরতন তাঁর স্বপ্নে এসে বললেন, আমি তোমার পুত্র হবো মা। আমার দ্বারা তোমাদের সুখের সীমা রইবে না। লোকে তোমায় সুবর্ণগর্ভা বলে সম্বোধন করবে। রানী প্রশ্ন করলেন, আপনি কে? কি আপনার পরিচয়? উত্তর হল, তোমরা যাঁর পূজা করেছিলে আমি তাঁর অনুগৃহীত। আমার প্রতি আজ্ঞা হয়েছে তোমার পুত্র হতে। এ কথা বলে সেই স্বপ্নপুরুষ অতি ক্ষুদ্র মূর্তি ধারণ করে রানীর মুখ গহ্বরে প্রবেশ করলেন। মহারাজা সব শুনে মহানন্দার্নবে মগ্ন হয়ে রানীকে বললেন, আজ তোমার গর্ভাধান হল। তোমার বালক হবে। এ কথা আর কারোকে বলবে না।

দিনে দিনে রানীর গর্ভ বাড়ে। ক্রমে ক্রমে সে সমাচারের প্রচার হয়ে যায়। পাত্রমিত্র সকলে আনন্দে মাতে। একদিন অবশেষে রানীর প্রসব বেদনা উঠল। সংবাদ পেয়ে রাজা জ্যোতিষশাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণকে নিয়ে রাজ অন্তঃপুরের আঁতুড় ঘরের বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। প্রধান ভৃত্যেরা সব তটস্থ হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল, কখন কি খপর হয়। অবশেষে, শুভলগ্নে রানীর এক পুত্র হল। সেই পুত্রের রূপে রাজপুরী চন্দ্র শোভায় আলোকিত হয়ে পড়ল। রাজপুরে জয়ধ্বনি উঠল। রাজ অট্টালিকার উপর বেজে উঠল, শঙ্খ, ঘণ্টা, ঘড়ি, তুরী, ভেরী, ঝাঁঝরি, রামশিঙ্গা, ঢক্কা, ঢোল, দামামা, বীণা, মৃদঙ্গ, কাংস্য, করতাল, রামবেনী ইত্যাকার বাদ্যবৃন্দ। সে শব্দে নগরীর রমনীরা বাড়তি যোগান দিল হুলুধ্বনি সহকারে। রাজা মহা আহ্লাদে একশত এক সুবর্ণ মুদ্রা ব্রাহ্মণদিগে, অন্ধ আতুর খঞ্জদের এবং অবশেষে উদাসীন বা উন্মাদদের দান করতে লাগলেন। কিঞ্চিৎকাল পরে মহারাজা নগরস্থ সকল লোকের ঘরে মৎস, দধি এবং সন্দেশ পাঠালেন ভারে ভারে। সবাই নিবেদন করল, মহারাজ এবার পুত্রের মুখ দর্শন করুন। রাজা সহাস্যে বললেন, কর্তব্য বটে। অবশেষে রাজা অন্তঃপুরে গিয়ে পুত্ররত্ন দেখলেন। দাসীদের হুকুম করলেন পাত্র ভৃত্য সকলকে ক্রোড়ে করে পুত্র দেখাতে। রাজা এবার সভায় এসে বসলেন। ব্রাহ্মণগণ বেদধ্বনি করতে লাগলেন।

প্রজাপতেরাবৃতো ব্রহ্মণ্য বর্মণাহং কশ্যপস্য জ্যোতিষা বর্চসা চ।
জরদষ্টিঃ কৃতবীর্যো বিহায়াঃ সহস্রায়ুঃ সুকৃতশ্চরেয়ম॥

প্রকাশ, বৃষ্টি প্রভৃতির দ্বারা প্রজাপালক সূর্যের তেজোময় স্বরূপের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে, কশ্যপের অন্ধকার নিবারক প্রকাশের দ্বারা আবৃত হয়ে, জরাকাল পর্যন্ত নীরোগ দেহে যথাযুক্ত ভোজন করে, অপরিমিত আয়ু লাভ করে লৌকিক ও বৈদিক সকল ধর্ম পালন করে কৃতকৃত্য হবো।

জ্যোতিষি ভট্টাচার্যরা হরেক শাস্ত্র বিচার করে দেখলেন এই রাজপুত্র দীর্ঘায়ু হবেন। সর্বশাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায়, বুদ্ধিতে বৃহস্পতিতুল্য এবং বৃদ্ধিতে ধর্মাত্মা হবেন। পুনরপি এই পুত্র অতিশয় যশ লাভ করবেন এবং মহারাজ চক্রবর্তী রূপে বহুকাল রাজত্ব করবেন।

পরবর্তী কালে চন্দ্রকলার মতো রাজপুত্র দিনে দিনে বেড়ে উঠতে লাগলেন। মহারাজা পুত্রের নাম রাখলেন কৃষ্ণচন্দ্র। সেই বালক এখন মহামহিম রাজচক্রবর্তী।

এতক্ষণ আপনমনে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বিবরণ দাখিল করতে করতে প্রভাতি আনন্দ বিরচিত এই জলঙ্গির শ্যামল গভীর নদীপথে প্রসাদ অন্তঃকরণে ভারী প্রসন্নতা পেয়ে যান। ফলে তাঁর মানসে গীতি কবিতার ভ্রমর গুঞ্জরণ উলসে ওঠে। তিনি আপন মনে গেয়ে ওঠেন,

জাল ফেলে জেলে রয়েছে বসে।
তবে আমার কি হইবে গো মা—
অগম্য জলেতে মীনের আশ্রয়
জেলে জাল ফেলেছে ভুবনময়
ও সে যখন যারে মনে করে
তখন তারে ধরে কেশে।
পালাবার পথ নাইকো জালে
পালাবি কি মন ঘেরেছে কালে
রামপ্রসাদ বলে মাকে ডাক
শমন দমন করবে এসে।।

প্রভাতকালে, বলতে গেলে অসকালে, এই গীত জংলা রাগিনীতে বাঁধা হল এইমাত্র। কিন্তু তাল বলতে সেই একতাল। ফলে ঢোলকিয়া রামতনু মনে মনে কিঞ্চিৎ বিরস বটে। তার কপালে রামপ্রসাদী হিসেবে আদ্ধা, যৎ, আড়া চৌতাল ক্বচিৎ জোটে। বেশিরভাগ গানই একতাল নিবদ্ধ।

গানের সঙ্গে মৃদু মৃদু ঢোলক সঙ্গত করতে করতে রামতনু মনে ভাবেন, তাল যেমন বা সুর যেমনই হোক না, কেন এই প্রায় একসুরি আর একতালি গীতমালা আজ পর্যন্ত একঘেয়ে মনে হল না। প্রসাদের মতো কেতাবপত্র পড়া পণ্ডিতজন না হলেও তনু বুঝতে পারেন, প্রতিটি গীতের মধ্যে কি আশ্চর্য নেই আঁকড়া সুধা মিশে আছে। প্রতিটি গান একে অপরে মেলে না। একের স্বভাব অন্যের চেয়ে আকাশ-পাতাল।

প্রসাদী গানের পাশাপাশি নাও বয়ে চলে জলঙ্গি বরাবর রাজধানী কৃষ্ণনগর মুখে। বেশীরভাগ পথই দু-তীরে মাঠ আর গাছপালা গভীর। কোথাও কোথাও মাঠে হেলে চাষী. নদীঘাটে নাইতে আসা মেয়ে মর্দ। কোথাও বালকেরা হু দিয়ে সাঁতার কাটছে। এতক্ষণ গঙ্গার দেদার রাজত্বের পর এই খানিক সঙ্কীর্ণ নদী পথের দু-ধার যেন বা হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়।

ভজহরি গান শেষে বলে ওঠে, বলি অ দাদা, তোমার রাজা কেষ্টচন্দর লোকটা কেমন?

প্রসাদ হেসে তাকান ভজহরির দিকে, ভয় নেই, গেলে তোকে মারধোর করবে না। বরং পেটপুরে রাজভোগ খাওয়াবার জোগাড় করবে।

রামতনু বলেন, হুঁ আমারও তাই বিশ্বেস। মানুষটি গুণীর সমাদর করেন বটে।

প্রসাদ বলেন, রাজা ভারী বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ আর কাজের মানুষ। আবার তেমনি

দয়ালু, ধার্মিক আর ন্যায়বান। বিশেষ কোনও শাস্ত্রে বিচক্ষণতা না রইলেও সর্বশাস্ত্রেই তাঁর অধিকার আছে। রাজসভা আলো করে থাকেন মহা মহা পণ্ডিত। যেমন ধরুন, নবদ্বীপের ন্যায়শাস্ত্র ব্যবসায়ী হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি, রামগোপাল সার্বভৌম, মধুসূদন ন্যায়ালঙ্কার, তারপর গুপ্তিপাড়ার প্রসিদ্ধ কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, কত নাম বলব দাদা।

ভজহরি অবাক লোচনে বলে, এতসব গাদাগুচ্ছের পণ্ডিত মশাইরা ঘর সংসার ফেলে রাজার কাছে বসে থাকেন। এতো একরকমের কয়েদ বাস দাদা।

—না না তা হবে কেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ রাজার সাক্ষেতে বাস করেন। অন্যেরা রাজার ডাক পেলে দাখিল হন। তবে পণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার প্রায় নিরন্তরই রাজবাড়িতে থাকেন। তাঁকে নিয়ে একটি গপ্পো বলি শোন।

ভজহরি উৎসাহিত হয়ে বলে, তাহলে এখন খিদের মুখে গপ্পোই খাই।

—একবার গঙ্গা বেয়ে বজরায় কলিকাতা যেতে যেতে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ত্রিবেণীর কাছে এসে পারিষদের জিজ্ঞেস করলেন—এ স্থলে ভাগীরথীর মন্দ গতি কেন? অন্য পণ্ডিতেরা অনেকানেক শ্লোক রচনা করে ব্যাখ্যা দিলেন। তাতে রাজার মন ভরল না। তখন পণ্ডিত বাণেশ্বরের দিকে চাইলেন তিনি। পণ্ডিতমশাই বললেন,

সাগরসন্ততিসন্তরণেচ্ছয়া প্রচলিতাতিজবেন হিমালয়াৎ।
ইহ হি মন্দমুপৈতি সরস্বতী-যমুনায়া বিরহাদিব জাহ্নবী।।

অর্থাৎ কিনা, সাগরবংশ উদ্ধারের জন্যে হিমালয় থেকে নির্গতা বেগবতী গঙ্গা যেন সরস্বতী আর যমুনা সখী জোড়ার বিরহের কারণে এই স্থানে মন্দগতি হয়েছেন।

রামতনু ঢোলকে গদাম গুম চাপড় বাজিয়ে বলে ওঠেন, বলিহারি। বলিহারি।

প্রসাদ বলেন, আর একখানি পদ্য শোনো। একদিন রাজা বাণেশ্বরকে শুধু বললেন, 'কিমদ্ভুতম্'। বিদ্যালঙ্কার মশাই সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন—

শিবস্য নিন্দয়া তু যাত্যজদ বপুঃ স্বকীয়ম্।
তদঙঘ্রি পঙ্কজদ্বয়ং শবে শিবে কিমদ্ভুতকম্।।

অস্যার্থ, যিনি শিবের নিন্দেমন্দ শুনে নিজের শরীর ত্যাগ করেছিলেন তাঁরই পাদপদ্মদুখানি শিবের বুকে স্থাপিত হয়েছে, এর চেয়ে আর অদ্ভুত কি থাকতে পারে।

আঠারো

জলপথে জলঙ্গি ভাঙতে ভাঙতে রামপ্রসাদ ইতিকথায় চলে যান বারেবারেই। সেই সব কথন কভু প্রক্ষিপ্ত কভু সংবদ্ধ।

এই যেমন এখনই তাঁর মনে হল সদ্য ফেলে আসা গঙ্গার কথা। আর অমনি কথা হল, আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে গঙ্গার জোয়ার নবদ্বীপ পর্যন্ত আসত। এখন সেটি কালনার কাছ পর্যন্ত এসে থমকে যায়।

রামতনু আর ভজহরি একে অপরের মুখ তাকাতাকি করে।

রামপ্রসাদ নিচু স্বরে বলে যান. জানিনে এত সুখী রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নসীবে কি আছে।

তবে তাঁর পূর্বপুরুষরা ভারী হেনস্থা আর দুঃখভোগ করে গিয়েছেন। যেমন কিনা রাজা রামকৃষ্ণ যবনদের অত্যোচারে কারাগারে মরণদশা পেলেন। তাঁর গত হওয়ার সময় এই নদের সিংহাসনে নিয়ে সে কি ডামাডোল। রামকৃষ্ণের পুত্রাদি ছিল না। ফলে সিংহাসন নিয়ে মহাঘোর উপস্থিত। সে সময়, আর এক নামে যবন কিন্তু কর্মে মানুষ, রাজা রামকৃষ্ণের পরম সখা সাজাদা আজিম ওসান করলেন কি শাসক জাফর খাঁর ওপর এক পরোয়ানা জারি করে ঘোষণা দিলেন, নদীয়ার রাজ্যপাট তাঁর ছেলেপুলে না থাকার কারণে দত্তক পুত্র বা ওই ধরনের কোনও আইনি বেক্তিকে যেন দান করা হয়। এর উত্তরে জাফর খাঁ পত্র লিখে বললেন, যেহেতু রামকৃষ্ণের বংশ লোপ পেয়েছে তাই রাজসম্পত্তি যেন কোনও রাজকর্মচারীকে দান করা হয়। এখানেই জাফর খাঁ নিজের কলে নিজে পড়লেন। তিনি আবার পত্র লিখলেন, রাজা রামকৃষ্ণের বড় ভাই রামজীবনকে, যিনি বহুদিন বরাবর ঢাকায় বন্দীদশা পার করছেন, অনুমতি হলে তাঁকেই নদীয়ার সিংহাসনে বসানো যায়। সাজাদা আজিম ওসান এ কথায় রাজি হলেন। রামজীবন অবশেষে জাফর খাঁর কাছে বিস্তর মুক্তিপণ দাখিল চুক্তি করে নদের সিংহাসনে বসলেন। কিন্তু মন্দবরাত, যথাসময়ে কড়ার করা টাকা না দিতে পারায় জাফর খাঁ আবার রামজীবনকে কয়েদ করলেন মুরসিদাবাদে। এই সময় আলি মহম্মদ আর কালু জমাদার বলে দুই যবন সেনার সাহায্য নিয়ে রাজসাহীর জমিদার উদয়নারায়ণ বিদ্রোহ করে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বঙ্গেশ্বরের অধিকার স্বীকার করলেন আর বীরকাটি, নারায়ণ গড়, দেবীনগর ইত্যাকার জায়গায় অনেক দূর্গ বানিয়ে নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা দিলেন। নবাব মুরসিদকুলী খাঁ তাঁকে দমনের জন্যে লহুরীমল্ল ইত্যাদি সেনাপতি দিগরকে পাঠালেন। তখন কয়েদবাসী রাজা রামজীবনের উপযুক্ত ছেলে, ভারী বলবান আর সাহসী যুবরাজ রঘুরাম নিজের ইচ্ছেয় পড়ে সেনাপতি লহুরীমল্লের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে ধেয়ে গেলেন। যুদ্ধ করলেন মহা তেজে। তাঁর বাহুবলে আর যুদ্ধবুদ্ধিতে আলি মহম্মদ প্রাণ হারাল। বিদ্রোহ দমনের কাজ ফুরলে নবাব মুরসিদকুলী তাঁর প্রিয়পাত্র রঘুরামকে রাজস হীর মস্ত জমিদারি মহাল লিখে পড়ে দিলেন। এই রঘুরামই হলেন নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি তখনকার বাংলার সদর কানুনগো দর্পনারায়ণের কর্মচারী ছিলেন। রঘুরামের বন্দী বাপ রামজীবন—বাড়তি তোফা হিসেবে কয়েদ থেকে মুক্তি পেলেন। বাপের মরণ হলে পর এই রঘুরাম টানা তেরো বছর রাজত্ব করেন। মরণকালে গঙ্গাতীরে তাঁর অন্তর্জলি হয়। এই রঘুনন্দনের উপযুক্ত পুত্তুর রাজা কেষ্টচন্দরের নেমতন্ন রক্ষে করতে এখন আমরা যাচ্ছি। বুঝলে তো।

রামতনু বিস্ময়ে উক্তি করেন, রঘুরাম না হয়ে ভীমরাম হলে ভালো ছিল।

—হ্যাঁ, তোমাদের তো আগেই বললাম, রঘুরাম মহা বলবান ছিলেন। সেই বলবানীর গপ্পো শোনো একখানা। একবার হল কি, মুরসিদাবাদের নবাব বাড়িতে দু'জন প্রসিদ্ধ মল্লবীর এসেছেন। নবাব দেখলেন এই জোড়া পালোয়ানের সঙ্গে লড়তে পারে এমন কেউ নেই। তখন নবাব রঘুরামের কাছে পত্র লিখলেন, দু'জন মল্ল পাঠাতে বলে। বৃত্তান্ত পড়ে স্বয়ং রঘুরামই এসে উপনীত। নবাব শুধোলেন, তোমার বীর জোড়া কোথা? তিনি বললেন, তারা নিকটেই আছে। এই না বলে তিনি নিজের গা থেকে জামা আর মাথা

থেকে পাগড়ি খুলে ফেলে নিজেই রণভূমিতে অবতীর্ণ হলেন। তাঁর সুমুখে দণ্ডায়মান দুই মল্লবীর। তিনি অমনি সামনে এগিয়ে গিয়ে দু'জনার গলা নিজের দু'বাহুতে বদ্ধ করে ফেললেন। ওই অবস্থাতেই রঘুরাম দাঁড়িয়ে আছেন। তারাও নড়ে না, চড়ে না। নবাব ব্যাপার দেখে তো অবাক। তিনি বলে উঠলেন, কি হল, যুদ্ধ কর। তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করলেন, যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব, তারা পঞ্চত্ব পেয়েছে।

রামতনু উৎসাহে বলে ওঠেন, তাহলে নামটা খুব একটা ভুল বলিনি ভায়া।

জলঙ্গি বরাবর আরও খান তিন-চার নৌকা এসে পড়ে। তারা যেহেতু লম্বা আর আড়ায় বড় তাই এই নৌকার সমানে সমানে ধরে ফেলে পিছন হতে। সেই সব নৌকায় টিকিধারী পণ্ডিতের পাল। ভজহরি নাওয়ের মাঝিদিগে একে একে শুধোয়—কে কোথা হতে আসছে। কেউ বলে গুপ্তিপাড়া, কেউ ভট্টপল্লী, মূলাযোড় ইত্যাদি। ভজহরিকে ওদিকের নাও থেকে প্রশ্ন হয়, তোমরা কোথা থেকে আসছ গা?

—আজ্ঞে কুমোরহট্ট—হালিসহর।

—হুঁ, সে তো মহা মহা পণ্ডিতদের দেশ। তা তোমাদের নাওয়ে কে যান?

রামতনু হেসে কন, এখেনে কোনও পণ্ডিত নেই। সব গো মুখ্যু।

—তা রাজবাড়ি যাওয়া হচ্ছে কোন কামে?

—নাচ-গান করতে ভায়া।

ওদিক থেকে খানিক অছেদ্দার সুর আসে, অ বুঝিচি। নাটুয়ার দল। তা ভাল, তা ভাল। তা কি পালা গাওয়া হবে শুনি?

ভজহরি গোমড়া বদনে বলে, ছিকেষ্টর বস্ত হরণ।

—বলো কি, বলো কি। এ যে উল্টোপালা।

ভজহরি এবার বিরক্তি চেপে রাখতে না পেরে বলে, আমরা সব উল্টো দেশের লোক তো। তাই আমাদের পালাপত্তরও উল্টো।

—বটে বটে। তাহলে পালাটি শুনতে হচ্ছে বটে।

কথা বলা নাওখানি এগিয়ে যায় তরতরিয়ে। ধেয়ে আসে পাশাপাশি আর এক নৌকা।—কি গা ভায়া, তোমরা আসছো কোথা হতে?

আগে থাকতেই বিরক্ত ভজহরি বলে, কলকেতা।

—বাপরে, কলকেতা—মানে সমুদ্দুরের নিকটে।

—যথাত্থ কয়েছেন বটে মশায়।

—তা তোমাদের বাটি থেকে সমুদ্দুর কদ্দুর শুনি?

—আজ্ঞে এধারে দাওয়া, তারপর ঘরদুয়ার। মধ্যিখানে উঠোন। উঠোন শেষে হেঁশেল। ঠিক তারপরেই সমুদ্দুর।

—বলো কি ভাই।

—ওই কথাই বলি। সমুদ্দুরে জোয়ার এলে আমাদের উঠোন সমুদ্দুর হয়ে যায়। ঘরের দাওয়া প্রায় ডুবু ডুবু।

—কী কাণ্ড!

—হুঁ, কাণ্ড বলে কাণ্ড। আমরা সব দাওয়া থেকে ছিপ ফেলে মাছ ধরি।

—সমুদ্দুরে ছিপ! অতো সব মস্ত ঢেউ। তার মধ্যে ফাতনা ভাসবে কেমনে?

—ফাতনা লাগে না তো। মাছ এমনিই খেয়ে বসে থাকে।

—বাপরে, তা কিসের টোপ দাও শুনি?

—আজ্ঞে ভারী সোজা কথা। চাঁপা কলার টোপ দিই কত্তা।

—মাছ খাবে নিরিমিষ্যি চাঁপা কলা। কি আশ্চয্যি কথা।

—আজ্ঞে কলকেতা স্থানটিই তো আশ্চয্যির পীটস্তান।

—হুঁ, কালীঘাট তো একটি পীঠ জানি। তা তোমাদের ঘরখানি কোন পীঠ শুনি?

—ওটি হল গে আপনার বোয়াল পীট।

—বোয়াল পীঠ! নাম শুনিনি তো বাপের জন্মে।

—শুনবেন কি করে। কলকেতা না গেলে, নিজ চক্ষে না দেখলে, তবে কিনা চক্ষু কন্নের বিবাগ ভঞ্জন হবেটা কেমন করে।

—তা ভায়া এমন নাম কেন?

—ওই যে বল্লাম—সমুদ্দুরের ধারে এই পীটস্তান। আর মাছ বলতে শুধু তাগড়া তাগড়া বোয়াল মাছ। বোয়াল আবার চাঁপা কলা ছাড়া ভিন্ন কোনও টোপ পছন্দ করে না।

—এতদিন জানতুম বোয়াল আমিষ খায়। মানে জলে ভাসা মড়া তেনার ভারী পছন্দের খাদ্য।

—হা ভগবান, এটাও জানেন না, চাঁপা কলা য্যাতক্ষণ আস্ত থাকে ত্যাতসময় সে নিরিমিষ্যি। তার খোসা যেই না ছাড়াবে অমনি সেটি এক্কেবারে গো-মাংস।

—ছ্যা ছ্যা ছ্যা। এরা কেরে।

পাশ থেকে আর এক সওয়ার বলে, কলকেতার লোকগুলো সব গোলমেলে দাদা। শুনিচি জায়গাটি আরও গোলমেলে। ওখানে নলবনে দিবসেতে সব শাঁকচুন্নী, বেম্মদত্যি ঘুরে বেড়ায়। দিনমানেও ঘুটঘুটে অন্ধকার।

যে এতক্ষণ কথা কইছিল, সে এবার দ্বিতীয় জনের প্রতি চাপা গলায় বলে, যাদের সঙ্গে অ্যাতো কথা কইছি তারা আবার তেনাদের অংশ নয় তো।

ভজহরি আকাশ ফাটিয়ে হো হো হেসে ওঠে।—রাম রাম বলো দাদাগণ, রামরাম বলো।

পাশের নাওহেয়র মাঝি মাল্লা জোরে জোরে দাঁড় মারে। ফলে তারা কতক সাঁ করে সামনে এগিয়ে যায়। এগোয়, আর ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনের নৌকা যাত্রী দিগরের দিকে আড়ে আড়ে চায়।

রামপ্রসাদ এতসময় কোনও কথা বলেননি। তিনি হাস্য দমন করে এই কথোপকথন উপভোগ করছিলেন। এবার আর থাকতে না পেরে তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলে ওঠেন,

গজাহ্বপিপ্পলীমূলব্যোযামলকসর্ষপান।

গোধানকুলমার্জারঋক্ষপিত্তপ্রভাবিতান্।

নস্যাভ্যঞ্জনসেকেষু বিদধ্যাদ্‌যোগতত্ত্ববিৎ।

ভজহরি এবং রামতনু এই হঠাৎ চিৎকৃত খটমট সংস্কৃত বাক্য শুনে প্রায় একত্রে চক্ষু

কপালে তোলে। রামতনু বলে ওঠেন, সব্বোনাশ। তাহলে কি সত্যিই আমাদের ভূতে ধরেছে। এ কি ভূত তাড়ানো মন্তর।

রামপ্রসাদ নির্বিকারে বলে যান, গজপিপ্পলীর মূল, ত্রিকুট অর্থাৎ মরিচ, পিপ্পলী ও শুণ্ঠী এবং আমলকি ও সর্ষপ, এই সকল দ্রব্য একত্র করে গোসাপ, বেজি, বিড়াল ও ভল্লুকের পিত্তে ভাবনা দিয়ে মেশাতে হবে। এই ঔষধ নস্যে, অঙ্গমর্দনে ও স্নানে প্রয়োগ করবে। তাহলে ভূত ছেড়ে যাবে।

বেলা দুপুরে দেশ অর্থাৎ বর্ধমানের ধুলুক গ্রাম থেকে এসে উপনীত আমাদের কামাখ্যা কাকা। কাকা, মানে আমার দাদুর অকালে চলে যাওয়া ভাইয়ের বড়ো পুত্র। খর কালো গায়ের রং, রোগা কঞ্চি, আর মোটামুটি ঢ্যাঙা। তবে কিনা অকারণেই একটু সামনে ঝোঁক প্রাপ্ত। মাথায় উশকো খুশকো মিশ কালো চুল। ভাঁটা ভাঁটা গোলাকার চক্ষু। লম্বা লম্বা কান আম আঁটি মুখে। আর বাঁ গালে আব কাটানো প্লাস চিহ্ন।

কামাখ্যা কাকার ধুতি-পাঞ্জাবি পাটকিলে। পায়ে বুট জুতো। আর দু-হস্তে দু-খানি চটের থলে। কাকার নানান গুণের মধ্যে কানে ভারী কম শোনে। তবে আকথা দিব্যি শুনে নেয়। আমার ইঞ্জিনিয়ার আর সরল পাগলা বড়মামা আমাদের বাড়ি এসে যদি কাকার সাক্ষাৎ পায় তো অমনি তার পশ্চাতে। প্রথমেই উক্তি, কামাখ্যা—গাল ফুলিয়ে তামাক খা।

কামাখ্যা কাকার আরও একটি গুণ—তার কথার আড়ষ্টতা। এই চল্লিশ পার বয়েসেও আধো আধো কথা কয়। যেমন, আমার দাদুকে জ্যাঠামশাইয়ের বদলে অক্লেশে জাতামছাই। আমার প্রপিতামহি বড়মাকে ঠাকুমার বদলি খাক্‌মা। তবে আমার বাবা-মাকে দাদা-বউদি বলতে সেরকম অসুবিধে নেই। কাকা আমাদের ভাগের দেবত্র আর বাদবাকি যাবতীয় ভূসম্পত্তি, পুকুর, ভোগ করে সপরিবারে। মাটির বাড়ি ভেঙে আমার ঠাকুর্দার তৈরি করা পাঁচিল ঘেরা একতলা বেশ বড়ো-সড়ো পাকা দালান কোঠায় স্ত্রী, চারচারটি পুত্র আর গোটা পাঁচ কন্যা সমেত বসবাস করে। সাবেক ইঁদারার মহা হজমি জল পান করে। দু-বেলা সিদ্ধেশ্বরী মাতাঠাকুরানীর পূজো করে। পূজোর মন্ত্র একেবারেই স্বরচিত আর বিচিত্র অদ্ধস্ফুট সুরারোপিত। যথা, মা মা, আমি মন্তর তন্তর জানিনে মা, আমি কিস্যু জানিনে, মা মা গো, মা লক্‌খী, মা কালী, মা—আমার দাদা কানু মুকুজ্যে, ছালা ভারী খচ্চর। ও ছালাকে টাইট দে মা। কানুবাবুর পক্ষেঘাত করে ছেড়ে দে মা। তোমার ছেবা করা নিয়ে, তোমার জমি নিয়ে, দাদা ছালা থাকে থাকেই আমার পেছুতে লাগে মা।

দেবীকে ভোগ নিবেদনের মন্ত্র বলতে, মা গো মা, খাও মা, পেট ভরে খাও গো মা...

কামাখ্যা কাকা এসেই টিপ টিপ করে পেন্নাম সেরে নিল দাদুকে। আমার বাবা বাড়ি নেই। থাকলেও বাবা কারোর প্রণাম নেয় না, এমনকি বিজয়া দশমীতেও আমাদের, মানে ছেলেমেয়েদের তরফ থেকেও নয়। কাকা এবার আমাদের ভেতর দালানে উবু হয়ে বসে চটের থলে থেকে হরেক সামগ্রী বার করতে লাগল। খবরে কাগজে দড়ি দিয়ে বাঁধা শুকনো পাকা কুল, মা কালীর দরুণ পাওনা একখানি লালপেড়ে শাড়ি, একজোড়া শালগ্রাম শিলা মোড়ার আধহাতি গামছা, খানিকটা বোগড়া লাল আউশ চাল—মুড়ি

ভাজার জন্যে, এক খাবলা পাকা তেঁতুল, একজোড়া চালতে, আর কলাপাতায় মোড়া মা সিদ্ধেশ্বরীর বাতাসা প্রসাদ, আর চরণপুষ্প। সবশেষে এক ডিবে সিঁদুর মা'র জন্যে।

কাকা এসব বার করতে আমার মা'র দিকে তেরছা চোখে বলে, বাইরের ঘরের দেখলুম ছেই ছব্বোনেছে সূয্যিকুমার দাদু।

মা গলা চেপে বলে, আস্তে কামিখ্যে। উনি শুনতে পাবেন যে।

—ছুনলেন তো ভারী বোয়ে গেল। তা আপনি কেমনধারা লোক বউদি। ছংছারে ছেলেপুলে নিয়ে বাছ করো। আর ঘরে কিনা ছাক্ষাৎ কাল রোগ।

মা বলে, একে কালরোগ বলে না কামিখ্যে।

ঠিক তখনই দোতলার সিঁড়ি ভেঙে ওদিকের দরজা দিয়ে বড়মা থপথপিয়ে এসে পড়েন। আর এধারে বাইরের ঘরের দরজা ঠেলে সূর্যকুমার লুঙি সামলাতে সামলাতে বেরিয়ে আসেন।

বড়মা কাকাকে দেখে আহ্লাদে বলে ওঠে, অ মা, আমার কামিখ্যে যে। কখন এলি রে।

কাকা লম্ফ দিয়ে প্রায় তাঁর পায়ে দু-হাত একত্রে ছুঁইয়ে পেন্নাম করে। তারপর সেই হাত দু'খানা জিভে ছোঁয়ায় চুক্ শব্দে।

—খাক্‌মা, খাক্‌মা, কেমন আচো আপনি।

—আর আছি ভাই। সব্বাঙ্গে ব্যতা। কোমর বেশিক্ষণ সিধে রাখতে পারিনে। কবে যে ভগবান আমায় গেরণ করবেন।

—ছি ছি। ছাট ছাট। ও কতা বোলতে আচে।

—ও মা, বলব না। আমি কি আজগের মানুষ। নবদ্বীপের পণ্ডিত ব্রেজনাথ বিদ্যেরত্ন বলে আমার দা-মশাই। আমার মাত্‌রি দেব্যার সাক্ষেৎ বাপ। তিনি বিদ্যেসাগর মশাইয়ের চে বয়েসে বিস্তর বড়ো ছিলেন।

কামাখ্যা কাকার চোখ পড়ে এবার অসাব্যস্ত সূর্যকুমারের দিকে। অমনি কালো বদনে ঘোরতর কালোর ছপটি পড়ে। কাকা কিছু বলার আগেই সূর্যকুমার তাঁর সদাই জলকাটা অক্রবক্র ড্যাবা চক্ষু ভাসিয়ে বলে ওঠেন, কি খবর কামিখ্যে। এই অবেলায় কি মনে করে।

কাকা এরকম সরাসরি বাঁকা তীরে জন্যে তৈরি ছিল না। মা সঙ্গে সঙ্গে পাশ থেকে বলে ওঠে, না দাদু, অনেকটা দূরের পথ তো।

সূর্যকুমারের বক্র চোখ এবার মার দিকে, থাক থাক, তোমায় আর ধুলুকের পথ চেনাতে হবে না আমায়। আমিও সেখেন থেকেই এসেছি তোমাদের এখানে। একেবারে কাক ভোর থাকতে।

কামাখ্যা কাকা এবার কথা বলে। একে কানে খাটো, তার ওপর খোঁচাটা কানে গিয়েছে। কি করব দাদু, আপনার মতো ছংছার ছাড়া তো হতে পারিনে। আমার তো কাজ কম্মো করে খেতে হয়।

—কাজ বোলে কাজ। পরকে ঠকিয়ে দিন কাবার। লোককে মাদুলি বিলি করে অর্থ রোজগার। আর অকাজ বলতে, এই বাজারে ন-নটি ছেলেপুলে। পেত্যেক বছর বউয়ের গব্বোধারণ।

বড়মা গলা তুলে বলে, দুকুর বেলা, ছেলেটা তেতেপুড়ে এল। এসব কি অনাছিস্টি কতা।

কাকাও গলা তোলে, তাতে আপনার কি দাদু। গুরুজন মানুষ, কিছু বলতে পারিনে তো।

—কি করবি, কি করবি রে হারামজাদা। বল দিকিনি, বল।

লুঙি সামলাতে সামলাতে সূর্যকুমার কামাখ্যার দিকে ধেয়ে যান। মা মাঝখানে এসে কোনওমতে তাঁকে সামলায়। থাক দাদু থাক। রাগ করবেন না এত। আপনার শরীর খারাপ হবে।

—শরীর। একে কি শরীর বলে।

কাকা বলে ওঠে, মনে ছব ছময় গু-মুত ঘাঁটছেন। ওই জন্যেই তো এমন কুঠ ব্যামো।

মা এই অনাসৃষ্টির মাঝখানে পড়ে কি করবে বুঝতে পারে না, থামো না কামিখ্যে, একি হচ্ছে। কত রাস্তা ভেঙে এতদূর এলে—

বড়মা ওধার থেকে বলে, তোর কাছে ব্যাগত্তা করি কামিখ্যে। আর কতা বাড়াসনে ভাই। তাড়াতাড়ি নেয়ে দুটো গরম গরম ভাত খেয়ে নে দিকি।

ঠিক তখনই সদর রোয়াকে এসে দাঁড়ান এক মাঝবয়সী গেরুয়াধারী। কামানো মুখ। কাঁধ ছোঁয়া কালো বাবরি। বেশ কালো রং। আর ভয়ঙ্কর ট্যারা। এই সাধুটিকে আমার মা কেন জানি পছন্দ করে না। দু'চক্ষে দেখতে পারে না রামশরণ কাকা। লোকটির নাকি মা'র দিকে কুনজর আছে। তার কথায়, সাধু নাকি মার দিকে প্রায়ই হাঁ করে চেয়ে রয়। সাধু বলে, জয় হোক মা, বড় অসময়ে এসে পড়লুম, হুঁ, আমিও দুটি গরম গরম ভাত খাবো।

সূর্যকুমার লোকটির দিকে ড্যাবা ড্যাবা কটাক্ষ ছুড়ে বার বারান্দার নালিতে লুঙি তুলে পেচ্ছাপ করতে বসে যান।

বড়মা মাথার বুরুশ কুচি চুলে আলগোছে শাদা ঘোমটা টেনে দিয়ে বলে, হুঁ, হল আজ মেলার ভাত খাওয়া। একসঙ্গে জোড়া অতিথি।

গেরুয়া ট্যারা লোকটি বারান্দার কোণ ঘেঁসে তার ঝুলি রাখে। তারপর তার ভেতর থেকে একখানা কম্বল বার করে ঝটাপট পেতে ফেলে মেঝেয়। কামাখ্যাচরণ হাঁ করে চেয়ে থাকে এই নতুন অতিথির দিকে।

বড়মা বলে, ভাত তো তোর বাড়তি থাকেই মেলা। নাকি চড়াতে হবে।

মা শুধু বলে, দেখি।

সাধু মেঝেয় পাতা ব্যবস্থায় বসে পড়ে বলে, মা অন্নপূর্ণার ভাঁড়ার বলে কথা। কিছুই বাড়ন্ত হয় না।

বাইরের নালি থেকে উঠে ঘরে যেতে যেতে সূর্যকুমার বলে যান, এটা সংসার, না হোটেল! মেয়েটা খাটতে খাটতে মরে যাবে। সে খেয়াল কারুর আছে।

মা রান্না ঘরে যেতে যেতে শুধু একবার তাকায় বৃদ্ধের দিকে। বড়মা বলে, অতিথি নারায়ণ বলে কতা।

কামাখ্যাচরণ মার হেঁসেলের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। বউদি, এট্টুখানি ছর্ষের তেল দিন তো।

বড়মা বলে গরমকালেও সব্বাঙ্গে তেল মাখবি ভাই।

—আমরা তো গ্রামে বাছ করি। তুমিও তো ছিলে সেখেনে। এর মধ্যেই ছব ভুলে গেলে।

—তা, আমার জন্যে কি আনলি ভাই?

কাকা ধুতিটুতি খুলে গামছা পরতে পরতে বলে, গাছের ছুকনো কুল। তুমি অম্বল খাবে খাক্‌মা।

—আমসি আনিসনি, আমসি?

কামাখ্যাচরণ রোগা ডিগডিগে কালোকুলো পাঁজরে, বুকে তেলের চাপড় কষাতে কষাতে বলে, বউদি, ঘানির তেল নাকি? দিব্যি ঝাঁজ আছে। হুঁ।

উনিশ

বাবা সন্ধেয় অফিস থেকে বাড়ি ফিরতে কামাখ্যা কাকা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে সাইকেল খানা হাত থেকে নিয়ে হ্যাণ্ডেলে ঝুলন্ত ভারী বাজারের ব্যাগ সমেত ঘর পেরিয়ে বারান্দায় নিয়ে আসে। তারপর বুট পরা পায়ে দু-হাত ঠেকিয়ে প্রথমে জিভে, পরে কপালে। অথচ এই মানুষটির মৃত্যু কামনায় সে নিত্যি মা সিদ্ধেশ্বরীর কাছে মানত রাখে।

বাবা আজ বাইরে থেকেই তৈরি হয়ে এসেছে। মুখভঙ্গী তো তাই বলছে। বেশ চমচমে ছমছমে—যাকে বলে দিব্যাবস্থা। ফলে কামাখ্যাকাকার এমত ব্যবহারে আর আপ্যায়নে বাবা স্বাভাবিকতার ওপরে আর প্রস্থ চড়ে বসে।

—কি ব্যাপার কামিখ্যে! কি মনে করে?

কাকা চোয়াড়ে চোর ও চুরি মুখ যৎপরোনাস্তি কাঁচুমাচু করে বলে, আপনাদের জন্যে বড্ড মন কেমন কচ্ছিল। তাই আর থাকতে পাল্লুম না দাদা! চলে এলুম।

—বটে! বটে!

—হুঁ দাদা, আপনি, জেটামছাই, খাক্‌মা, বউদিদি, ভাঃপো-ভাইঝি ছকলের জন্যে যে কি মনকেমন দাদা, কি করে বলি তোমায়।

—হুমম্! তা দেশের জমিজমার খবর কি? কতকাল আর আমাদের ভোগা দিয়ে খাবি বাপ?

কাকা দু-কানে হাত রেখে, মুখে চুক চুক শব্দ তুলে বলে, ছি ছি দাদা, এ ছব কতা ছোনাও পাপ। আমার মতো ছরলধরল ভাইকে তোমার মতো রাম ছমান দাদা এমন ভুল বুঝলে আমি কোতায় যাবো।

—হুঁ, এবার তোর বউদিকে নিয়ে যাবো। সামনের কালীপূজোয়।

—নিচ্চই দাদা, নিচ্চই। আমার ভাইপো-ভাইঝিদেরও নিয়ে যাবে। কতায় বলে—অক্তের ছম্পক্ক।

—হুঁ, প্রথম কথা সিদ্ধেশ্বরীর পালা, ওটা আমার চাই। তারপর আমাদের রাঁচির কাকারা আছেন। তাঁদেরও ভাগ আছে।

—ঠিক কতা।

—তারপর তোর গিয়ে, আমাদের ভাগের জমিজমার পরচা-পত্তর বার করে এবার বন্টননামাটা সেরে ফেলতে হবে।

—ঠিক কতা।

—তারপর যে পাকা কোঠা বাড়িটায় তোরা বাস করিস, ওটা তো আমার বাবার বানানো। তোর মরা বাপ, মানে আমার উড়নচন্ডে লুচ্চো কাকার জন্যে দয়ালু দাদা বানিয়ে দিয়েছিলেন।

—ঠিক কতা। তবে কি না পিত্তি নিন্দে কানে ছোনাও পাপ।

—আমার বাবা হলেন দৈত্যকূলে পেল্লাদ। এমন লোকের কি করে এমন রাসকেল ভাই হয়রে শালা।

—জেটামছাই হলেন ছাক্ষাৎ ভগবান। উনি অমানুছ।

—মানে! অমানুষ বললি তোর জ্যাঠামশাইকে!

কাকা কালোবরণ জিভ বার করে বলে, গন্ডমুখ্যু দাদা। জল বলতে তেল বলে ফেলি।

—তুই শালা ভারী সেয়ানা। তোকে আমি তো আজকে নতুন দেখছি না।

—ছালা মানে তো ভাই দাদা। তোমার বড় ছম্বন্ধী বাবুয়াকে তো তুমি ভাই ভাই বলে কতা কও।

কানুবাবা আর কামাখ্যাচরণের কথাবার্তায় মোটামুটি মূর্তিমান শোরগোল উপস্থিত হয়। প্রথমত বাবার ছোটখাটো চেহারা হলেও গলা সদাই চড়া। দ্বিতীয়ে তিনি তৈরি হয়ে থাকলে স্বর আরও তিনচার কিস্তি চড়ে বসে। অন্যধারে কানে বয়রা-কালা কাকা এমনিতে মিন মিনে কণ্ঠ হলেও এখন বাবার সঙ্গে সম্ভবত যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা বোধে বিকট জোরে কথা কইছে।

বাবা বলে ওঠে, বাবু, আমার শ্যালক হলেও সাক্ষাৎ সোদর। আর তুই হলি মিচকে খচ্চর একটা বাঁদর।

—দাদা, কি ছুন্দর পদ্য বললে আপনি। ছোদর আর বাঁদর।

—পদ্য। পদ্য আবার কি। কবিতা, কবিতা। আমি যেমন ফুটবলার, তেমনি আবৃত্তিকার, আবার তেমনি অভিনেতা।

বড়মা গুটি গুটি জলের ঘটি হস্তে দোতলা থেকে নেমে আসে রাতের খাবার সময় হল বলে। কোনও ঘড়িঘণ্টা ছাড়াই রাত সাড়ে সাতটায় এক দু মিনিট-এদিক ওদিক—নিচে নেমে আসে। বড়মাকে দেখে বাবার উল্লাস আরও উলসে ওঠে।—ঠাক্‌মা, তুমিই বলো।

বড়মা সান্ধ্য আফিমের দাপটে ঝিম ঝিম, টলটল। ঢুলু ঢুলু নেত্র।

—কি হল ভাই। একটু আবুল্লি এসেছিল। হঠাৎ মনে হল, হয় বাড়িতে ডাকাত পড়েছে নয় রেডিওর যাত্রাপালাটা একটু বাড়িয়ে দিয়েছিস।

—না না, সে কথা নয়, সে কথা নয়। আমার 'দেবতার গ্রাস' তারপর 'এবার ফিরাও মোরে, তারপর গিয়ে 'বিদ্রোহী' তোমরা শোনোনি।

—আহা, সে আর বলতে।

—তারপর নাটক।

—হুঁ, কাঁচরাপাড়ায় কি একখানা বেশ নবাব-বাদশার পালা—

—আরে দূর দূর, পালা নয়, নাটক, নাটক, ডি এল রায়ের শাজাহান।

বড়মা হাই আড়াল করতে করতে বলে, হুঁ হুঁ, তুই ছিলি রাজপুত্তুর।

—হ্যাঁ, মহম্মদের পার্ট। আর শাজাহান কে ছিলেন। হুঁ হুঁ, অহীন্দ্র চৌধুরী। যাঁর নামের আগে লেখা থাকত নটসূর্য।

—তুই চাঁদ। তিনি সূয্যি।

—এবার বলি শোনো, অহীনবাবুর রিহার্সাল টিহার্সাল দেওয়াব সময় কৈ। উনি আসলে ভাড়াকরা বোর্ড আর্টিস্ট। তা সেদিন তোমার ওই কাঁচরাপাড়া বেল ইনস্টিটিউটে প্লে হবে। উনি দুপুরের একটু আগে কলকাতা থেকে গাড়িতে চলে এলেন। সঙ্গে নিজস্ব মেকআপ ম্যান। উনি গ্রীন রুমে রয়েছেন। আমরা এধারে। ভেতর থেকে তিনি ওঁর কোঅ্যাক্টর-অ্যাকট্রেসদের এক এক করে ডাকছেন। এবার আমার পালা। ভেতরে গিয়ে দেখি লম্বাচওড়া, টাকমাথা, অহীনবাবু একটা রিভলভিং চেয়ারে ড্রেসিং গাউন পরে বেশ আয়েশ করে বসে আছেন। ওঁর তিনদিক ঘেরা একখানা-আধখানা চাঁদ টেবিল। তার ওপর একধারে গ্লাস-বোতল-সোডা। আর একটা মস্ত প্লেটে সুন্দর করে সাজানো আনারসের টুকরো। উনি এক সিপ নিচ্চেন। একটি করে আনারসের পিস কাঁটা চামচে করে তুলে মুখে রাখছেন।

কামাখ্যাকাকা জিভ সড়াৎ বলে ওঠে, আনারছের ছঙ্গে মাল।

—আমায় দেখে কপালে তুলে রাখা হাই পাওয়ারের চশমাটা চোখে নামালেন। কি মর্মভেদী চাউনি। অ, তাহলে তুমিই মহম্মদ. হুমম্, তোমার সঙ্গে আমার বেশ কয়েকটি ইমপর্টান্ট সিকোয়েন্স আছে। চলো দেখি। বলে সেই প্রকাণ্ড লম্বা মানুষটি উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সেই মেকআপ ম্যান আর আমি। একেবারে স্টেজে। স্টেজের মাঝখানে গিয়ে বললেন, তোমায় আমার সঙ্গে স্টেজে অভিনয় করবার সময় একটা অঙ্ক মনে রাখতে হবে। আমি দেখি. স্টেজে চক দিয়ে খোপ কেটে কেটে এক, দুই, তিন ইত্যাদি লেখা। তারপর বলে উঠলেন, শোনো হে ছোকরা, আমি যখন তিন-এ দাঁড়াব, তুমি তখন এক নম্বর ঘরে। আমি যখন চার-এ, তুমি তিন-এ। আমি যখন ছয়ে. তুমি দুই। এটা মনে রাখলেই অভিনয় ঠিকঠাক হয়ে যাবে। এই বলে ভেতরে চলে যাওয়ার সময় আমার পিঠে বাঁ হাত দিয়ে ছোট্ট একটা টোকা দিয়ে বললেন, দেখো নাতি, ঘর যেন ভুল করো না। তাহলেই কলিশান হয়ে যাবে। আর আমি পড়ে যাবো।

আমি পাশ থেকে হাঁ করে বাবার বিবরণ গিলতে থাকি।

বাবা বলে চলেন আপন মনে। রাতে নাটক যখন আরম্ভ হল, তখন গ্রীনরুমে উঁকি দিয়ে দেখি ওঁর টেবিল থেকে মাথা তোলার ক্ষমতা নেই। ভাবি কি করে এমন গলা অব্দি ড্রাংক মানুষ অভিনয় করবেন। কি কেলেঙ্কারিই না হয়ে যায়।

বড়মা আফিম ঢুলু ঢুলু নেত্রে বলে, কি সব্বোনেশে কতা।

—তারপর পর্দা উঠল। আমি দেখলাম ওঁর সঙ্গী সেই লোকটি প্রায় বেহুঁশ ওঁকে কোনওমতে উইংসের পাশে ধরে ধরে নিয়ে দাঁড় করাল। তিনি দাঁড়াবার অবস্থায় নেই। সঙ্গীর কাঁধে মাথা রেখে অচৈতন্য। ওঁর সিন এল। লোকটি ওঁকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে

পেছন থেকে পিঠে একটা ধাক্কা দিল। অহীনবাবু স্টেজে ঢুকে পড়লেন। ব্যস্, অমনি ম্যাজিক। একেবারে স্বাভাবিক। আর কি হাইটের অভিনয়। কে বলবে একটু আগেও উনি ডেড ড্রাংক—দাঁড়াতে পারছিলেন না। সিন ফুরলো। উইংসের পাশে সেই লোকটি তাঁকে ধরে ফেলল কতক লুফে নেওয়ার কায়দায়। আবার তিনি অচেতন। সঙ্গীর কাঁধে পুরো শরীরের ভার।

যে জলপথে এতক্ষণ আসা হল তার নামটি জলঙ্গী বা জালঙ্গী। এই নদী পদ্মা হতে মুখ পেয়ে গঙ্গায় এসে মিশেছে নবদ্বীপে। গঙ্গা নদীর শরীরে বুঝি ত্রিলোক জোড়া দ্রিমি দ্রিমি মহাকালের ডাক। সে মহানদীর স্রোতে দিনমানে সূর্য আর নিশাকালে জ্যোৎস্না ঢালা আগুন তরঙ্গ সদাই গুঞ্জরিত। আর এই ক্ষুদ্র. জলঙ্গীর স্রোত সলিলে, কি এক অজানা, চোখ নিচু, ডাবের শাঁস মধুর ভারী মায়া টুব টুব করছে। এমনতরই মনে হল রামপ্রসাদের।

এই মনে হওয়ার পিছনে এই ক'দিন কুমারহট্ট-হালিসহরের সংসর্গ ত্যাগ আর দূর জলপথ ভাঙার অনুষঙ্গ বিজড়িত হয়ে আছে। সে ভাব তরঙ্গ এমনই যে তার মিশেল থেকে সহজে পরিত্রাণ পাওয়া অতীব খিটকেল। যেমন কিনা কালীকা ও কবিতার মিলমিশ একীভূত ভাবনা সমাহার সংসারের আর যাবতীয়ের অতীত হয়ে দাঁড়ায়। সেই জমাট অথচ স্খলিত তরল ভাব পিণ্ডের নাম কি, তার পরিচয়ই বা কোন মুখে, সে সমাচার বহুদূরে। যেমন কিনা, এই জলঙ্গী পথে ফেলে আসা নদী গঙ্গা এখন দূরের কথা। ঠিক তেমনই অতি কাছের কথা এখন, নদীয়াধীপ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আবাস এই রাজবাটি। সুমুখে তার সিংহদুয়ার। আর তার ওপারেই—কিঞ্চিৎ পদব্রজান্তে রাজপুরী। এবং সেখানে প্রথমেই নায়েব—গোমস্তাদিগরের খাস দপ্তর অন্তে মহারাজার রাজসভা। ওই সভায় উজ্জয়িনীর মহারাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অনুকারে 'পঞ্চরত্নসভা' বহাল আছে। তার সুমুখে রামপ্রসাদের মতো কূলশাস্ত্র ধর্মাধর্ম অজ্ঞান প্রাণীর কি মূল্য!

রামপ্রসাদ আড় চোখে লক্ষ করেন বামতনুর স্কন্ধের একধারে একটি পুঁটুলি আর অপরদিকে লাল শালুতে মোড়া তার প্রিয় ঢোলকটি। আর এধারে—ভজহরির হাতে এক জোড়া পুঁটুলি। তার মধ্যে অবশ্যই রামপ্রসাদের দ্বিতীয় প্রস্থ পোশাক আব সেই বিশেষ পাক্ড়িটি রাখা আছে। নাওয়ের মাঝিমাল্লারা নাওয়েই আছে। তারা শুধু ভোজনের খপরাখপর নিয়ে রাজবাটি আসবে-যাবে।

সুমুখে বিশাল গম্ভীর রাজদুয়ার অথবা প্রবেশতোরণ। অনবদ্য এই রাজালয় সম্বন্ধে ইতিহাসের খবর আছে এই প্রকার যে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপিতামহ রাজা রুদ্র সুদূর ঢাকা হতে একজন ডাকসাইটে স্থপতিকে এনেছিলেন বহু ফয়জতে, এই প্রাসাদ নির্মাণের জন্য। সেই যবন শিল্পীর নাম হল আলাদস্ত্। সেই আলাদস্ত যেহেতু একা এসেছিল তাই তার প্রধান দায় হল এতদ্ঞ্চলের গাঁড়ার জাতীস্থ কিছু মানুষকে স্থপতিবিদ্যা শিক্ষা করানো। ফলে ওই আলাদস্ত্ এবং তার গাঁড়ার সহশিল্পীগণ ক্রমে গড়ে তুলল এই অতিসুন্দর, সুপ্রশস্ত আর সুদৃঢ় রাজপ্রাসাদ, বিবিধ মন্দিব, আশ্চর্য শোভাধর পূজার দালান, ইত্যাদি।

আপাতঃ সুমুখের ওই রাজদ্বার মহামহিম আকর্ষণে গম্ভীর দণ্ডায়মান। চোখ মেলে

বিশদিয়ে দেখলে ওই তোরণের মোট পাঁচটি ধাপ পাদভূমি থেকে উচ্চে উঠে গিয়েছে। আর রয়েছে মূল ও সুবৃহৎ দুয়ার বাদে ডাইনে বামে চারচারটি দরজা। ওই চার দরজার নেপথ্যে আছে উত্তম প্রকোষ্ঠ। দুয়ারের মহার্ঘ কাঠের বুকে আছে খোপ কাটা মোট বারোখানি নকশা ঘর। ওই চারঘরে থাকে পাহারাদার, নহবতি সানাইবাদকের দল আর হঠাৎ গুপ্ত খবরদার। চারদুয়ারের দুধারের মাপা দেওয়ালে আশ্চর্য রমণীয় নকশা। মাথার আধো চাঁদ খিলানে ত্রিভঙ্গ চতুর পঙ্খের কাজ—যা কিনা মূল চৌকোনা নকশাদারির ঘেরে বন্দী হয়ে আছে। আর এক ধাপ উচ্চে আবার এক প্রশস্ত চতুস্কোনি নিপুণ আর জটিল নকশার মোহপাত। তদুপরি টানা দীঘল বাঁধানো পাটা। তার উপরে—দুই দুয়ারের মাথা বরাবর দু'জন মনুষ্যমুখী শান্ত ব্যাঘ্র বসে আছে। তাদের লেজের দিকে আর এক উঁচু ধাপ। সেই বেদীভূমে দু'ধারে দুজন তেজবান আর চলন্ত সিংহ, লেজ বাঁকিয়ে কেশর উড়িয়ে সুতীক্ষ্ণ নজর রেখে চলেছে সর্বত্র। এই দুই সিংহের মধ্যবর্তী আর সুবৃহৎ আয়তক্ষেত্রের দু'পাশে চার প্রকার রঙধারী আর নকশা সমাহারি লম্বা লম্বা পাটা। এই ঘের-এর মধ্যখানে সেই আয়তক্ষেত্রের রং গভীর কৃষ্ণ। তার মাঝে রয়েছে এক গোলাকৃতি সোনার থালবৎ কিংবা সুবৃহৎ মুদ্রাসম প্রতীকি চক্র। তার ঠিক হৃদয়ে, তুলনায় ক্ষুদ্র একমুঠি কারুকাজ। এই চক্রস্তম্ভের দু'ধারে জোড়া সিংহ পাহারায় রেখে পরপর তিনখানি তিন আকৃতির ধাপ রচনা। তার মাথায় রয়েছে ত্রিভূজাকৃতি কারুকাজময় স্তূপের দু'ধারে এক যুগল বাজপক্ষী। তীক্ষ্ণ অথচ শান্ত চোখে রাজনগরী পর্যবেক্ষণ করে চলেছে। এই দুইয়ের মাঝখান থেকে সটান উঠে গিয়েছে রৌপ্য দণ্ড। তার টঙে পতপত করে নদীয়াধীপের রাজপতাকা উঠছে শ্রাবণী বাতাসে। আর দুই মানুষমুখী স্নিগ্ধ ব্যাঘ্রের সামনে ছড়িয়ে বসা দুই থাবার সন্নিধানে একেবারে ভূমিতল থেকে সটান উঠে এসেছে একজোড়া মনোহর সুচারু স্তম্ভ। তাদের মাথায় খাঁজকাটা রঙিন নকশাময় তীক্ষ্ণ চঞ্চু। এই চঞ্চুজোড়া পতাকাবেদীর ঊর্দ্ধে উঠে রৌপ্যদণ্ডের জানুর নিচাংশ-এর রুজু রুজু হয়ে আছে। শ্রাবণের গম্ভীর আকাশে রাজপতাকা উড়ছে নির্ভার।

সেই দিকে তাকিয়ে রামপ্রসাদ নিচুস্বরে বলে ওঠেন, নদীয়া কেন, বাংলার আকাশে কোথাকার মেঘ যে কোথায় গড়ায়।

পাশ থেকে রামতনু বলে, কিন্তু এখনও যে রাজভোগের গন্ধ পাচ্ছিনে ভায়া।

ভজহরি বলে, সেকি কতা, এই তো একটু আগে নৌকো থেকে নামার আগে জলপানি হল যে!

—দূর দূর, কোথায় রাজবাড়ির ছানাবড়া, দইয়ের ভাণ্ড, ক্ষীরভোগ! তার বদলি দু'মুখো শুকনো চিঁড়ে আর নারকেল।

প্রসাদ হাসেন, হবে হবে। সব হবে।

রামতনুর ভ্রূকুঞ্চিত, কিন্তু তুমি যে বললে ভায়া রাজা এখেনে যে যাগ করছেন তাতে নাকি ঘি-এর ছেরাদ্দ। কিন্তু কোতায় ঘিয়ের বাস। ভাবলুম সকালবেলাতেই খানকতক গব্য ঘেরতোর নুচি আর একবাটি ক্ষীর দিয়ে প্রাতরাশ সারবো।

ভজহরি, থালে কিসের বাস পাচ্ছো শুনি?

—কিসের আবার। দিনরাত্তির যার সঙ্গ করছি তার। একধারে ধান্যেশ্বরী, আর একধারে সপ্তমীসুধা।

প্রসাদ মিটি মিটি হাসেন। হাসতে হাসতে কবিকঙ্কন আওড়ান।

—মসুরি মিশ্রিত মাষ সূপ রান্ধে রসবাস
হিঙ্গু জীরা বাসে সুবাসিত।
ভাজে চিতলের কোল রোহিত মৎসের ঝোল
মানকচু মরিচভূষিত।।
বোদালি হিলঞ্চাশাক কাটিয়া করিল পাক
ঘন বেসার সম্ভোলিয়া তৈলে।
কিছু ভাজে রাইখাড়া চিঙ্গড়ীর তোলে বড়া
খরসুলা ভাজি কিছু তোলে।।
করিয়া কণ্টকহীন আম্রযোগে শোলক্ষীন
খর লোণ ঘন দিয়া কাঠি।
রান্ধিল পাঁকাল ঝষ দিয়া তেঁতুলের রস
ক্ষীর রান্ধে জ্বাল দিয়া ভাটি।।
কলাবড়া মুগসাউলি ক্ষীরমোননা ক্ষীরপুলি
নানা পিঠা রান্ধে অবশেষে।
অন্ন রান্ধে সব শেখে শ্রীকবিকঙ্কন ভাষে
পণ্ডিত রন্ধন উপদেশে।।

রামতনু এবার প্রকৃতই অধীর স্বরে বলে ওঠেন, রোসো রোসে ভাই। পেটে যখন ছুঁচোর কেত্তন তখন এতসব খাবারদাবারের নাম শোনাচ্ছো কোন মুখে। তার চেয়ে রাজাকে বলে আমায় শূলে চড়াবার ব্যবস্থা করো।

রাজদ্বারের ওধারে নিবিড় গাছগাছাল শ্রেণী। তার নিচে—এখান হতেই রাজপুরীর আন্দাজ হচ্ছে। ধবধবে শ্বেতবরণ প্রাসাদ পংক্তির পত্তন ওখান থেকেই। লম্বা টানা ভবনের মাথায় খানিক বিরতি দিয়ে এক একটি করে সুদৃশ্য গম্বুজ। গম্বুজের মস্তকে চূড়া। এই শিল্পরীতিটি অবশ্যই মোগলাই। উচ্চবর্ণী হিন্দু রাজা এই কৃষ্ণচন্দ্র—যিনি কুলমর্যাদার মহাবাহক—তাঁর ভবনের ঢঙে এমত মুঘলচর্চা সত্যিই ভারী অভিনব। কে জানে, এর নেপথ্যে হয়তো মহারাজার কূটজ্ঞান কাজ করে চলেছে যথারীতি।

ওই গাছগাছাল শ্রেণীর দিক থেকে দু'জন মানুষ এদিকেই এগিয়ে আসছে। পরনের পোশাক দেখে অনুমান হয এরা রাজকর্মচারী অবশ্যই। দু'জনারই পরিধানে পায়জামা আর জোব্বা। পায়ে জুতা। কেবল মস্তকে কোনও ঢাকনা নেই। লোকজোড়া যে ব্রাহ্মণেতর তার নমুনা তাদের মাথার চুলের তদ্বির দেখে মালুম হয়। এ বাদেও আছে দাড়ি গুম্ফের তোয়াজ। দুজনার একজন ওষ্ঠলোম বা গুম্ফ সম্পন্ন। দ্বিতীয়ের গালের দু'ধারে গালপাট্টার বাহার।

রামতনু অতি সন্তর্পণে প্রসাদের কানের গোড়ায় মুখ নিয়ে গিয়ে বলে ওঠেন, এ দুটি কে বটে? কোতোয়াল নয় তো।

প্রসাদ বলেন, তুমিও যথা, আমিও তথা। ওরে ভজহরি, রাজার নেমতন্ন পত্রখানা পোঁটলা থেকে বার কর দিকিনি। চাইলে প্রমাণ দিতে হবে তো।

ভজহরি ফিসফিসিয়ে কয়, সে আর বলতে। এইবার কল্লুম বলে।

লোকদুটি ক্রমশ এগিয়ে আসতে থাকে। এখন তাদের দুই কর্ণে একটি করে সোনার গুজি টের পাওয়া যায়।

রামপ্রসাদ রামতনুর দিকে আড়চোখে বলে ওঠেন, ডরো না। এরা কোতোয়ালও নয়, কোতল করনেওয়ালাও নয়। এরা রাজার লোক।

ভজহরি হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসে। সে ঝোলা থেকে রাজনিমন্ত্রণ পত্রখানি বার করে দু'হাতে উপরে তুলে ধরে আন্দোলিত করতে থাকে। তার এমত কাণ্ডে রামপ্রসাদের হাসি এলেও তিনি কোনও রা করেন না। রামতনু অবাক হাঁয়ে ভজহরির নিশানদারী দেখে যায়।

লোকজোড়া এবার এ তরফের তিনজনার সুমুখে এসে দাঁড়ায়। তাদের মুখে গুম্ফ গালপাট্টার মুখোশ রইলেও মুখের আভাসে রাজকীয় সৌজন্য ও চাপা চাপা হাস্য। প্রসাদ বুঝতে পারেন এ হাসিটুকু কেবলমাত্র ভজহরিরই পাওনা। ফলে ভজহরি দ্বিগুণ উৎসাহে পত্রখানি আরও দ্রুত সঞ্চালন করতে থাকে।

দু'জনার একজনা—সেই গালপাট্টাই কথা বলে প্রথমে, আসতে আজ্ঞা হোক মহাশয়রা।

দ্বিতীয়—গুম্ফওয়ালা বলে, আপনারা মহারাজার অতিথ। মহা সম্মানীজন। কতক্ষণ যে এভাবে পথে দণ্ডমান আছেন।

লোকটির বিদ্যের দৌড় এখানে এসে ফাঁস হয়ে যায়। রামতনু একবার ভাবলেশহীন রামপ্রসাদের দিকে তাকান।

প্রসাদ বলেন, যথার্থ ভাই। অনেক সময় এখানে দাঁড়িয়ে থাকাও তো দণ্ড বটে। তাহলে চলো ভাই।

গালপাট্টা বলে, চলুন আজ্ঞে। আপনাদের জন্যে ... অতিথিশাল তোয়ের আছে।

গুম্ফ বলে, মোটঘাটগুলো আমাদের দিন।

প্রসাদ কন, না না, এগুলো মোটও নয় ঘাটও নয়। এ তো সামান্য ভাই।

এবার তারা সুমুখের রাজদুয়ার পানে দু হস্ত পেতে হেঁট হয়ে বিস্তর সৌজন্য প্রদর্শনাৎ একত্রেই বলে ওঠে, আস্তাজ্ঞে হোক।

প্রসাদ এই যুগল শব্দের গ্রাম্য সন্ধিটুকু উপভোগ করতে করতে পা বাড়িয়ে বলেন, যে আজ্ঞে ভাই।

সঙ্গে সঙ্গে তারা যুগলে জিভ কাটে।—ছি ছি। অমনি করে ঘোষণা করবেন না। আমাদের মহাপাপ হবে।

ভজহরি প্রসাদের দিকে ঝুঁকে বলে, অ দাদা, এরা রাজার দরবারের খাস পোশাক পরলেও আসলে আমার মতোই আকাট।

রামপ্রসাদ নত স্বরে বলেন, কে বললে তুই আকাট।

কুড়ি

দ্বিপ্রহরের গুরুতর ভোজনের পর খপর হল মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সারাটি দিবসব্যাপী বৃহৎ যজ্ঞানুষ্ঠানের খুঁটিনাটি হিসাবপত্র এবং ফর্দ নিয়ে গুরুতর ব্যস্ত। রামপ্রসাদ এ সমাচার পেয়ে তাঁকে কোনও খপর দিতে নিষেধ করেছেন। মনে স্থির করেছেন সন্ধ্যার পর রাজা যখন দিন শেষের সংক্ষিপ্ত সময় রাজসভায় বসবেন তখনই যেন রামপ্রসাদের সস্বজন আগমনের কথা জানানো হয়। অতএব বৈকালিক রাজ নগর ভ্রমনই ভাল এখন।

ভজহরি, রামতনু এবং রামপ্রসাদ এই ত্রিমূর্তি অতঃপর কৃষ্ণনগরের পথে নামেন। এ পথে নামতে হলে ভিতরের অতিথিনিবাস থেকে মূল ফটক অবধি বেশ খানিক পথ পার হতে হয়। সেই অবসরেই এই সুবিশাল আর রম্য রাজালয় বাহির হতে দর্শন করে তিনজনারাই মন কৃতার্থ হয়। রাজবাটির শিরোভূষণ কতিপয় দেবদেবী মন্দির। অট্টালিকার শরীরে 'গথিক' খিলানের অপূর্ব কারুকাজ—যা কি না মূল রাজদ্বারে বেশিমাত্রায় প্রকট। সুশোভন পঙ্খের কাজ এবং টেরাকোটার আশ্চর্য যুগলবন্দী। হিঁদুয়ানার সঙ্গে মুসলমানী কারুকলার অনবদ্য মিশ্রণ। এক এক মন্দিরে এক এক রূপসাজ। মন্দিরগুলির গঠনরীতি ভারী অভিনব। সমতল ছাদ এক দালানের উপর—একজোড়া সুঁচালো শীর্ষ গম্বুজধারী। কোথাও আবার এক শীর্ষ। আর সবখানেই মন্দির-মসজিদ স্থাপত্য ধারার অভিনব সংযোজন আর মিশ্রণ। তাবাদে এই রাজপ্রাসাদচক আর নহবতখানা মোগল স্থাপত্যরীতির চারমিনারধারী। ইমারতের দেওয়ালে দেওয়ালে হিন্দু-মুঘল শিল্পকলার সম্মিলন। এই সব যাবতীয় শিল্পকলার দিকে তাকালে মনে হয় এই বিভিন্ন ফুলদল, পাখপক্ষী, মনুষ্য ও পশুগণ যেন নিম্নস্বরে কথা কইছে।

প্রসাদের স্মরণে আসে পুরাকালে এই স্থানের নাম ছিল ভারী শাদামাটা, ঘরের অনূঢ়া কন্যার মতো 'রেউই'। সে সময় এখানে প্রধানত আর গরিষ্ঠত গোপজনের বাস ছিল। তারা মহাসমারোহে এই রেউই-এ কৃষ্ণউৎসব করত জন্মাষ্টমী ও অন্যান্য সময়ে। বর্তমানে রাজার পূর্বসূরী রাজা রুদ্র এই জনপদের নাম সে কারণে 'কৃষ্ণনগর' রেখেছিলেন। সেই কারিগর শিল্পী আলাদস্ত্—যাকে ঢাকা বা জাঁহাগীর নগর হতে আনানো হয়েছিল তার হাতেই তো এই সব চক, নওবৎখানা ইত্যাদি রচিত। ঢাকা-জাঁহাগীর নগরীর হর্ম্যাদি রামপ্রসাদ দেখেননি। তবু শোনা আছে—এই কৃষ্ণনগরের হর্ম্য আর শিল্প রচনার সঙ্গে আলাদস্ত স্থপতির নিজ নগরখানির অতীব মিল।

তিনজনাতে মহানন্দে ঘুরে ঘুরে রাজনিবাস দর্শন করে বেড়ান। রাজা রুদ্র রাজবাটির তিনদিকে যে প্রশস্ত পরিখা খনন করিয়েছিলেন তা এখন স্তিমিত হলেও জেগে আছে। সেই ত্রিবল্লী জলে এখনও পুরাকালীন আলোছায়া খেলে বেড়াচ্ছে। বৃদ্ধ জলতরঙ্গে এখনও বিগত যৌবনের ছটা থেকে থেকে মাথা তুলছে। আর আছে রাজবাটির পশ্চিম ধারে এক মস্ত দির্ঘিকা। এই দিঘির সঙ্গে অঞ্জনা নদীর মরতে বসা খাতের স্মৃতিরেখ। এই মরা অঞ্জনা তো জলঙ্গীরই এক শাখা নদী। অতীতকালে অঞ্জনা কৃষ্ণনগরের পশ্চিমধার দিয়ে বয়ে গিয়ে অবশেষে দক্ষিণমুখে যাত্রাপুর গ্রামের কাছে এসে দ্বিধারা হয়ে যায়। রাজা রুদ্রের সময় এই অঞ্জনা সম্বৎসরই মনমরা শীর্ণা হয়ে থাকত। শুধু বর্ষাকালে তার দেহে কিঞ্চিৎ হৃত যৌবন দেখা দিত। সেই সময়কার এক কাহিনীর কথা এখানে মুখ তোলে।

একদা এক যবন সেনাপতি ওই অঞ্জনা বরাবর চলেছিলেন। তাঁর বজরার অনুসরণকারী নৌকাসকল রাজা রুদ্রের খিড়কি দুয়ারের ঘাটে উপনীত হলে রাজার দৌবারিকরা তথায় নৌকা লাগাতে বারণ করল। যবনরা সে কথায় কান দিল না। তখন উভয় দলের মধ্যে প্রবল যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। ফলে দু-তরফেরই কতিপয় লোক হতাহত হল। যুদ্ধ মিটল। কিন্তু রাজা রুদ্র ছাড়লেন না। পরের বছর তিনি নদী বন্ধ করে দিলেন। এর কারণে পুরবাসীদের যাতায়াতের সমূহ অসুবিধা ঘটল।

রাজা রুদ্র যেমন এ কর্ম করে মানুষের অহিত করেছিলেন, তেমনি তিনি কৃষ্ণনগর থেকে শান্তিপুর যাতায়াতের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, জনগণের অসুবিধার কথা ভেবে। সেই প্রশস্ত রাজপথের দুধারে অশ্বত্থ আর বটের শ্রেণী রোপণ করেছিলেন—যাতে পথিক দু-দণ্ড জিরোতে পারে। তবে এখানে একটি 'কিন্তু' আছে এই যে, রুদ্ররাজার পিতা রাঘবই প্রথম এই সড়কখানি তৈয়ার করার দায় নেন। তাঁর হাত দিয়েই কর্মটি আরম্ভ হয়েছিল। সে কারণেই এ পথের নাম 'রাঘব রায়ের জাঙ্গাল'।

পথ চলতে চলতে তিনজনার মনে তিনপ্রকারের গুঞ্জরণ ঘটে চলে। হয়তো চিন্তার কখনও আগান, আবার কখনও বাগান। যেমন কিনা রামতনু ভাবেন—মহারাজাকে কখন তার ঢোলবাদ্যি শোনাবেন। তার পরে পরেই কৃষ্ণনগরের খাল-বিল বাওড়ের মাছের ঝোল-ঝাল-অম্বল ভাবনা। সরলমতি ভজহরি সত্যি বলতে এমন চকমিলন্তি সব রাজসম্পত্তি দেখে মনে মনেও হতবাক। তার মনের মধ্যে শুধু একটি কথাই ঘটে চলেছে, আহা, কি চমৎকার, কি চমৎকার।

রামপ্রসাদের মনে পড়ছে রাজা রঘুরামের ইতিকথা—যা সবই লোকমুখে শোনা। যেমন কি না তাঁর পিতামহ রুদ্রর তোয়ের করা শ্রীনগরের পুরীর কথা। ওই স্থানের জলাশয়ে অজস্র পদ্ম ফুটে থাকতে দেখে রুদ্র স্থান নাম অমনি রেখেছিলেন। রটনা আছে, ওই পুরীর কোনও গোপন মাটির তলে রুদ্র রাজা বিস্তর লক্ষ টাকা পুঁতে রাখেন। এ খবর কেবল তাঁর খাস ধনরক্ষক জানতেন, যাঁর এ গুপ্ত কথা বলার নিষেধ ছিল। তিনি প্রতিজ্ঞা পালন করেছিলেন। রুদ্রের পুত্র রাজা হলে পর তিনি ওই ব্যক্তির কাছে বারংবার জানতে চান ওই গুপ্তধনের খবর। বৃদ্ধ ধনরক্ষক তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা মনে করলেন। তাঁর মনে পড়ল পরলোকগত রাজা বলেছিলেন, বিশেষ বিপদ্‌পাত ছাড়া ওই গুপ্ত সম্পত্তি যেন উত্তরাধিকারীদের হদিশে না আসে। ফলে বৃদ্ধের মুখে কুলুপ। তখন রাজপুত্র আদেশ দিলেন তাঁকে প্রহার করতে। সে প্রহারের মাত্রা এমনই চড়ল যে বৃদ্ধ প্রাণত্যাগ করলেন। এরপর থেকে পরপর ওই ধনের খোঁজপর্ব জারী থাকে। এমনকী বর্তমান রাজা কৃষ্ণচন্দ্রও এর ব্যতিক্রম নন। কিন্তু হায়, সে ধন অধরাই রয়ে গেল।

এই রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বাপ রঘুরামকে মানুষ রঘুবীর বলে সম্বোধন করত। তিনি প্রকৃতই মহাবীর ছিলেন। নবাব মুরশিদ কুলির আমলে রাজশাহীর রাজা উদয়চাঁদের সঙ্গে নবাবের এক রণ উপস্থিত হয়। রঘুরাম সে সময় তস্য পিতার সঙ্গে মুরসিদাবাদে ছিলেন। তিনি এমত অবস্থায় নবাবের সেনাপতি লাহরিমালের সঙ্গে যুদ্ধে গমন করলেন। একদিন, যুদ্ধক্ষেত্রে, লাহরিমালের সৈনানিবাসের অদূরে স্বয়ং সেনাপতি রঘুরামের সঙ্গে কিছু পরামর্শ সারছিলেন। সে সময় তাঁর সঙ্গে পাঁচজনা মাত্র যোদ্ধা হাজির ছিল। সুযোগবুঝে উদয়চাঁদ তাঁর সৈন্যাদি লয়ে অতর্কিত আক্রমণ করে বসলেন। ভীত লাহরিমাল রঘুরামকে

ডেকে বললেন, আমরা দুর্বল। বিপক্ষ অতীব প্রবল। এখানে যুদ্ধ করার অর্থ পরাজয়। রঘুরাম বলে উঠলেন, রণবিমুখ হওয়া ভারী লজ্জার। আমরা যদি পলায়ন করি তাহলে আমাদের সৈন্যদল নির্ঘাৎ পলায়ন করবে। আপনি বিচলিত হবেন না। প্রথমে ও তরফের চারপাঁচজন আমার হস্তেই মরবে। ঠিক এমনি সময়ে আলিমহম্মদ নিষ্কোষিত অসি হস্তে সাক্ষাৎ কালান্তকের মতো এগিয়ে এলেন। উদয় দেখলেন, রঘুরাম এখনও নিশ্চিন্ত রয়েছেন। কিন্তু এরপর প্রতিপক্ষ আর খানিক অগ্রসর হতেই রঘুরাম আকর্ণপূরিত শর নিক্ষেপ করলেন শত্রুর প্রতি। তাঁর সেই তীর শত্রুর বর্ম আর দেহ ভেদ করে বহুদূর তক্ চলে গেল। তাঁর সঙ্গী সেনারা পলায়ন করল। আলিমহম্মদ অশ্ব থেকে ভূপতিত হলেন। তিনি অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বলে উঠলেন, আমি অনেক যুদ্ধ করেছি এবং অনেকানেক বীর দেখেছি। কিন্তু তোমার পারা ধনুর্ধর আমি আব দুটি দেখিনি। আমার অত্যন্ত পিপাসা পেয়েছে। তুমি আমায় কিঞ্চিৎ জল দাও। রঘুরাম এই মৃত্যুপথযাত্রীকে বারি প্রদান করলেন এবং বললেন, আমার শিবিরে চলুন। আমি আপনার সেবা-চিকিৎসার ব্যবস্থা করছি। পরাস্ত পুরুষ উত্তর করলেন, আর ও কথা কেন বলো। আমার আয়ু শেষ প্রায়। এমন বীরের হাতে অকালমরণও ভাগ্যের কথা। বরং যতক্ষণ আমার প্রাণবায়ু নির্গত না হয় তুমি আমার কাছে রহো। এই বাক্য শুনে সদয়স্বভাব রঘুরামের নেত্র বরাবর অশ্রুপাত হতে লাগল। কিছু পরেই বীর সেনানী বিগত প্রাণ হলেন। এসময় নবাবের কারাগারে রঘুরামের পিতা রাজা রামজীবন রাজস্ব অনাদায়ে বন্দী ছিলেন। বীর রঘুরামের এই যুদ্ধবিক্রম শ্রবণ করে নবাব মুরশিদকুলি তাঁর পিতাকে কারামুক্ত করলেন।

এই রঘুরামও কিন্তু স্বয়ং বিপুল রাজস্বের দায়ে বারংবার কারাগারে পতিত হন। এমনকী কারাবাসাবস্থাতেও এই দয়ালু নৃপতি পাত্র বিশেষে বিস্তর ভূমিদান করেন।

রাজপথ পরিক্রমা করতে করতে রামপ্রসাদ তাঁর সঙ্গীদ্বয়কে নগরীর হালহকিকত বোঝান। যদি মধ্যখানে কৃষ্ণনগর রাজবাটি হয় তাহলে তার উত্তরধারে চাঁদসড়ক আর গোবিন্দসড়ক। দক্ষিণে বৈকুণ্ঠ সড়ক আর নতুন সড়ক। আবার উত্তরদিকেই জলঙ্গী নদী বয়ে চলেছে।

রামতনু ঘোর ঘোর স্বরে বলে ওঠেন. তোমার রাজ্যটির আদি অন্ত পাওয়া ভারী মুশকিল।

—কেন দাদা?

—ওই যে—গোবিন্দ, বৈকুণ্ঠের সঙ্গে ফস্ করে একাসনে যবন শব্দ চাঁদ বসিয়ে দেওয়া। আজব ধাঁধা।

রামপ্রসাদ মিটিমিটি হেসে কন, হুঁ, রাজ্যটিকে চোখে দেখলে নিঘ্ঘাৎ আরও ধাঁধা বাড়বে বৈ কমবে না।

রাজার কাছে যথাকালে খপর হয় সপার্ষদ রামপ্রসাদের আগমন বার্তার। প্রসাদ আর তাঁর সহচরজোড়া তখনই এসে পৌঁছেছেন অতিথিবাসে। এই শ্রাবণের শেষ গড়ানে পড়ে আবহাওয়া যথার্থই ম্যাজমেজে, গরম। হাওয়া-বাতাসের সমাচার খুবই স্বল্প। সদ্য হাত-পা ধুতে যাবেন বলে সসহচর রামপ্রসাদ মন করছেন. এমনই সময় এত্তেলা হল—রাজার তরফে ডাক পড়েছে।

অবশেষে রাজদর্শন। কিন্তু দর্শনের পহিলে সভার পথে এগোতে এগোতে কানে আসে গীত। গীত গাইছেন সুকণ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র রায়। সঙ্গে দোহার পড়ছে তিনচার স্বরে। সাথ সঙ্গতে মৃদঙ্গ, মন্দিরাদি। তবে বাদ্য বাজছে অতি সুনিপুণ আর মন্দ্র চাপা রবে। মূল গীত গাইছেন ভারতচন্দ্র।

প্রথমেতে জ্যৈষ্ঠ মাস, নিদাঘের পরকাশ,
কৃষ্ণনগরেতে বাস, গেল এক বর্ষা।
শরদে অম্বিকা পূজা, রাজঘরে দশভূজা,
দেখিনু মৈনাকানুজা, জগতের হর্ষা।
হিম শীত তারপর, শীর্ণ করে কলেবর।
পূণ্যাবাদে যাব ঘর, সেই ছিল ভর্সা।
বসন্ত নিদাঘ শেষ, পুন তোর পরবেশ,
ভারত না গেল দেশ, আ, আরে বর্ষা।।

আমাদের এই অট্টালিকায় ছুটির দিন, বিশেষ করে রবিবার আত্মীয়স্বজন, তারপর হঠাৎ হঠাৎ অতিথি আগমনের কোনও কামাই নেই। ফলে ভোররাত্তির থেকে উঠে আমাদের মায়ের বলতে গেলে দু মিনিট বসবার জো নেই। সেইসঙ্গে আমাদের রামশরণ কাকারও প্রাণান্ত। ফাইফরমায়েশ আর হুকুমদারি রক্ষে করতে করতে তার মেজাজ সর্বদাই টঙে। আমরা চার ভাইবোন মিলে বেশি হুটোপাটা করলে কাকার হস্তে টুকটাক কানমলা, চুল খামচানো বরাদ্দ হয়।

আজ সকালে প্রথমেই এসে পড়েন উত্তরপাড়া থেকে আমার বাবার একমাত্র পিসিমা বৃদ্ধা যোগেশ্বরী। সঙ্গে একমাত্র জীবিত ছেলে—আমাদের জ্যেঠুমনি সুবোধ চাটুজ্যে। এই জ্যেঠুমনি মানুষটি যাকে বলে একেবারে সরল সিধে। চাকাপানা মুখের মধ্যিখানে সিঁথি কাটা পাতা চুল। ফর্সা গড়নের ওপর মালকোঁচা ধুতি, শার্ট। কাছে গেলেই সুন্দর গন্ধওয়ালা পরিমল নস্য-র বাস ভুরভুর করছে। দাদু, বাবার ডাবল এক্স নস্যির কড়া ঝাঁঝালো গন্ধের পাশে এই পরিমল জ্যেঠুমনিকে ভারী মানায়। তার দ্বিতীয় কারণ হল, আসা মাত্র দু-পকেট থেকে মুঠো মুঠো বিচিত্র চেহারার লজেন্স বেরোয় আমাদের ভাইবোনেদের জন্যে। তারমধ্যে একটা লজেন্স-কাম বিস্কুট আমাদের চৌপাট করে তোলে। মানে, বস্তুটার দেহ হল বিস্কুটের, কিন্তু মধ্যিখানে গোল চাকতির মতো লজেন্স গোঁজা। সেই সঙ্গে জ্যেঠুমনির চোখ মুখ বাঁকিয়ে নাট্য সহকারে আশ্চর্য সব গল্প পরিবেশন। আমি যতক্ষণ পারি, তাঁর থেকে গল্প শুষে নিই। তাঁর মা—আমার বাবার যোগেশ্বরী পিসিমার মধ্যে আমি আন্দাজে তাঁর অকালগত কালীসাধক বাবার দিব্যকান্তি খুঁজে পাই। বৃদ্ধা আমায় ভাইটি বলে ডাকেন। আমি ও আমার ভাইবোনেরাও তাঁকে ওই নামে ডাকি। যাকে বলে টকটকে গাত্রবর্ণ, শীর্ণা এই বৃদ্ধার মাথা বোঝাই কোঁচকানো পাকা চুলের সাম্রাজ্য। ছোট্টখাট্টো গড়ন। নাক, চোখ, মুখ সব যেন কেটে কেটে বসানো। পাতলা গোলাপি ঠোঁটের ওধারে ছোট্ট ছোট্ট শ্বেতআতপ দাঁত। এই যোগেশ্বরী ভারী অভাগিনী। যুবতী বয়েসে যুবক স্বামী সন্যাস রোগে মারা যান। সেই স্বামী ছিলেন সে

সময়ের নামকরা ছবি আঁকিয়ে। তাঁর অয়েল পেন্টিং-এর মধ্যে একটি হল—একজন রয়েল বেঙ্গল টাইগারের ছবি। দু-পা মেলে বসে আছেন বনের রাজা। হঠাৎ তাকালে মনে হয়—এই বুঝি ঘাড়ে লম্ফ দিয়ে পড়ল। এই শিল্পী মানুষটির ছিল মাথার ব্যামো। ভাইটির স্বামী চলে যাওয়ার পরপরই তাঁর একটি জোয়ান পুত্র, আর এক মেয়ে মারা যায়। তারপর এই সবেধন সুবোধ ছেলেকে নিয়েই তাঁর স্নেহ বিস্তার।

আমি ভাবি দুর্ভাগিনী যোগেশ্বরীর নদীর এ কূল ভাঙলেও আর এক কূলে এখনও প্রায় একশো স্পর্শী মা জননী বেঁচে। রয়েছেন নিজ সহোদর আমার দাদু। তাই বুঝি বছরে অন্তত দুবার তিনি আমাদের বাড়িতে আসেন। টানা তিন মাস প্রায় থেকে যান। সেই থাকার পর্বটি আনন্দ দুঃখ মেশানো। ভাইটির মৃগী রোগ আছে। আমার কানু বাবার সঙ্গে তাঁর নানা সূত্রে প্রবল বচসা হয়—প্রায় একতরফাই বাবার দিক থেকে। বাবার পেটে দ্রব্য পড়লে পিসিমার গুষ্টির তুষ্টি করে ছাড়েন। তার প্রধান হেতু বুঝি আমার বাবার কর্কট রাশি আর প্রবলতম পুরুষকার। আর তাঁর রোগা শীর্ণা পিসিমার অকালে স্বামী-পুত্র-কন্যা চলে যাওয়ায় কিরকম যেন আলগা পলকা অভিমানিনী। একটুতেই ফোঁপান। কেঁদে ভাসিয়ে একসা করেন। বাবা একে কারণে, দ্বিতীয়ে হেঁকো ডেকো ব্যাটাছেলে, অতএব মুহূর্তে লঙ্কাদহন। পিসিমা যদি ককিয়ে ডাক ছাড়ে, ওরে বাবারে, কানুরে, অমন করে বলিসনে। আমার বুকের ভেতরটা কেমন করছে রে।

বাবা গলা তোলে, ন্যাকামো কোরোনাতো। মেলা নাটক কোরো না।

—ওরে কানুরে, অমন করে বলিসনে। আমি শোকাতপা নারী।

—নিকুচি করেছে তোমার শোকতাপের। কচি খুকি, উঁউঃউঃ।

বৃদ্ধা এবারে দুটি ক্ষীণ হাতে নিজের বুক চাপড়াতে আরম্ভ করেন। বাবার গলা আর এক সিঁড়ি চড়ে, ওঃ, নাটক হচ্ছে। শালা যাত্রা-পালা হচ্ছে।

পিসিমা এবার তারস্বরে আর্তনাদ করতে করতে দু'হাতে নিজের বুকে কিল মারতে থাকেন গায়ের জোরে।

মা ছুটে এসে বৃদ্ধাকে দু'হাত দিয়ে চেপে ধরতে চায়। বৃদ্ধার শরীরে তখন মহাবল। তাঁর ঝটকায় মা টাল খায়। আমরা দেখি তাঁর বুকের কাপড় পড়ে গিয়ে টকটকে লাল বুক বেরিয়ে পড়েছে। আমি অনুমান করছি—তাঁর কালীচারী বাবার বুকের মধ্যখানও এমন টকটকে ছিল। বৃদ্ধা যোগেশ্বরী দু'খানি ফর্সা—প্রায় পাটকাঠি সম হাতে বুকে গুমাগুম কিল মেরে চলেন নাগাড়ে। তাই দেখে আমার বুক কেমন করে। বাবা তুমুল তড়পে চলে, বেরিয়ে যাও। আমার বাড়ি থেকে দূর হও--

বৃদ্ধা এবার মাটিতে মাথা ঠুকতে থাকেন। সঙ্গে আর্তনাদ, উঃ উঃ, শালা প্রাণটা বেরোয় না কেনরে। ওরে প্রাণ—প্রাণ, বেরো না, একটিবার বেরো—।

মা এবার গায়ের জোরে তাঁকে মাটিতে চেপে ধরে। এলোমেলো পাকা চুলে জলের ঝাপটা দেয় আমার পরের বোন সেবা। বৃদ্ধা তীব্র হাত পা ছুঁড়তে থাকেন। মাথাটা কেবলই এধার ওধার ঘোরে, উঃ উঃ, শাল্লা, শাল্লা—আমি শোকাতপা নারী, নারীঃ, নারীঃ, ইঃ ইঃ, ইঃ।

ক্রমে তিনি জুড়িয়ে আসেন। মা চেঁচিয়ে বলে, চামচে, একখানা চামচে—

বোন সেবা ছুটে গিয়ে রান্নাঘর থেকে চামচে নিয়ে আসে। মা অমনি সেটি তাঁর দাঁতে দাঁত জোড়ার ফাঁকে গলিয়ে দিতে চায়। কানু বাবা দুপ দাপ, দুপ দাপ বাইরের ঘরে ঢুকে দড়াম দরজা বন্ধ করে। অবশিষ্ট দুই কনিষ্ঠ ভাই বোন মলয় আর সোমা ভ্যাবাচ্যাকা হতেও ভুলে যায়, এতই ছোট বলে। বন্ধ দরজার ওধার থেকে বাবার চড়া গলা একাই কলরোল তোলে, গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে, মৈত্র মহাশয় যাবে সাগরসঙ্গমে—তীর্থস্নান লাগি...

কলতলায় বাসুন মাজুনি সরস্বতী দিদি হাঁক ছাড়ে, বোমম্ ষট্‌কে, উইই নারকোল গাছের মগডালে গিয়ে আটকে। লোকের কথা বলিবে বলে, নন্দ এবার নাচিবে বলে...

দোতলা থেকে বড়মা আমার মাকে উদ্দেশ্য করে বলে, বলি হ্যাঁ মা, তোমার জমদগ্নি স্বামী আমার কোলের মেয়েটাকে শেষ কত্তে পেরেছে কি?

বাবা দরজার ওধার থেকে দেবতার গ্রাস কবিতা রপটায় উচ্চৈঃস্বরে, মাসি, মাসি, মাসি...

বড়মা ওপর থেকে ডাক পাড়ে, আপন পিসিকে বলছে মাসি। ওমা ইকি ঘেন্না।

বাবার পিসিমা, আমাদের ঠাক্‌মা বা ভাইটি এবার খানিক ধাতে ফেরেন। রক্তাক্ত চোখ মেলে চান। পাতলা ঠোঁট জোড়া ফাঁক করেন। মা অমনি পাশে রাখা ছোট হাতঘটি থেকে তাঁর মুখে জল ঢেলে দেয়।

দাদু হঠাৎ খড়ম খটখটিয়ে দোতলা থেকে নিজে নেমে আসেন।

—কি হল? কি হল?

মা বলে, না না, কিছু না বাবা।

—কিছু না বাবা বল্লেই আমি মেনে নেবো। আমাকে কি তোমরা কচি খোকা পেয়েছো!

মা আবার বলতে চায়, না বাবা, না—

সেই ফাঁকে আমাদের মাত্র দেড়বছুড়ি বোন সোমা আপন মনে বলে যায়, আমার ডাক নাম সোমা, ভাল নাম সোমাভা। আমার পুরো না বাদ্‌দি সোমাভা—

বাদ্‌দি মানে, বলতে চায় বাদ্‌লি। ও যেদিন জন্মায় সেদিন প্রবল ঝড় বাদল তো। তাই পাঁচজন ওকে বাদ্‌লি-বাদ্‌লি বলায় নিজের নামের সঙ্গে বিশেষণটি জুড়ে নিয়েছে। আর সোমাভা নামটি আমার খলিফা, বাংলায় এম এ পাস পিসিমার দেওয়া।

সরস্বতী দিদি গলা চড়িয়ে গায়, নন্দর মড়া পচিবে বলে, আমার কথা যায় রে ভুলে—

দাদু সরল ধরল স্বরেই বলেন, কেন যে আসিস এ বাড়িতে। কি আনন্দ পাস বলদিকিনি!

ভাইটি যন্ত্রণা ঠেলে ম্লান হাসে, মা আছে, তুমি আছো। আমার কি ভাগ্যি দাদা। এ বয়েসে ক'জনার কপালে এমন হয় বলো।

একুশ

আমাদের যোগেশ্বরী ঠাক্‌মা বা ভাইটি, ভোলানাথ ছেলে সুবোধ জ্যেঠুমণি, আমাদের বাড়ি এলে আনন্দের জোয়ার ডাকে। শোকাতপা নারী হলেও ভারী স্নেহময়ী। আমাদের আদর ভালবাসার কথা আলাদা করে বলার কিছু নেই। তিনি এলে, আমার চৌপরদিন খেটে চলা মায়ের শ্রম অনেক শিথিল হয়। কখনও সুক্তো, কভু টক ডাল, ধোঁকার ডালনা ইত্যাদি। তবে সে নিয়ে একটু খিটকেল আছে।

এই বৃদ্ধার মধ্যে অনেক অভিনবত্ব আছে। যেমন নিত্য প্রাতঃস্নান করেন। মাঝে মধ্যে আমায় নিয়ে গঙ্গাস্নানে। আমবারুনীতে গঙ্গায় কচি আম ভাসান। এ ছাড়া রোজ রাতে শোবার আগে মাঝারি হাত ঘটিতে জল রেখে দেন। প্রাতে উঠে দুই নাক বরাবর সেটি পান করেন। আমি অবাক হয়ে দেখি, নাক দিয়ে, গলা বেয়ে জল পেটে যাচ্ছে। তাঁর গলায় জলপানের ঢক ঢক আওয়াজ হচ্ছে। তারপর পূজো আহ্নিক সেরে ছোট্ট ফর্সা কপালের মাঝখানে এক ফোঁটা গঙ্গা মৃত্তিকার টিপ, কি যে মানায়। তারপর আমার বড়মার পাশটিতে বসে সংস্কৃত গীতা পাঠ। সঙ্গে নিচে লিখে দেওয়া বঙ্গানুবাদ। ভারী মিঠে আর সুরেলা গলা ভাইটির। ঠিক যেন বাচ্ছা মেয়েটি। প্রায়ই রান্নাবান্না করতে করতে চিকন স্বরে গেয়ে ওঠেন, মেরে তো গিরিধর গোপাল, দুসরা না কোঈ...। এই গানখানা রেডিওয় যুথীকা রায়ের রেকর্ডে শুনেছি।

ভাইটি মাঝেমাঝেই আমায় নিয়ে ধর্মমূলক—বিশেষ করে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবন কাহিনী নিয়ে ছবি দেখাতে নিয়ে যান। সে সব ছবিই গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনীত। একবার, বোধহয় 'যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ' নামে একটি ছবিতে কানু বন্দ্যোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ সেজেছিলেন। আমি মেনে নিতে পারিনি। ভাইটি আমার গলায় রামপ্রসাদী শুনতে ভারী পছন্দ করেন। আমায় প্রায়ই বলেন—আশার আশা, ভবে আসা, আশা মাত্র হল—গানটি গাইতে। পান্নালাল ভট্টাচার্যের রেকর্ড রেডিওয় শুনে শুনে গানখানা তোলা আমার। কি আশ্চর্য, এই গানটি শুনে ভাইটি তাঁর অগ্রজের মতো কেন যে একইভাবে ফোঁপাতে থাকেন তা আমার মাথায় ঢোকে না। তবে এই ভাইটির দৌলতে একবার মা-বাবা-দিদিমা সকলের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া হয়েছিল সেই শিশুকালে। সে স্মৃতি আমার কিছুই মনে নেই। কেবল মনে আছে পঞ্চবটি ঘিরে রাজ্যের বাঁদর দাপাদাপি করছে।

বড়মা ওপর বারান্দার জানলা থেকে ডাক দিল, ও মা যোগেশ্বরী। একবারটি ওপরে আয় না মা।

আমি বড়মার সামনে বসে কি একখানা বই পড়ছি। লম্বা লম্বা সিঁড়ি টপকে ভাইটি খুরখুরে পায়ে ওপরে উঠে এল। বড়মা বলে ওঠে, আজগের শরবত কে তৈরি করেছে রে?

ভাইটি বড়ো বড়ো চোখ তুলে বলে, কেন মা? হঠাৎ এ কথা কেন?

—না, অমনি বললুম আরকি।

—না, মা, তোমার বয়েস হলেও ধাত তো দিব্যি টনকো আছে। অমনি অমনি, অমনি বল্লেই হবে।

—বেশ থালে বলি। আজগে মিছরির শরবত কে ভিজিয়েছে বলদিকিনি?

—আগে বলো কেন?

—বলব বলেই তো ডাকলুম। তোর বউমাকে বলিস, বুড়ো মানুষ আমি, আমার সঙ্গে যেন ছলনা না করে।

—কিসের ছলনা মা।

—শরবতটা একটু মুখে দিয়ে দ্যাখ দিকি।

—কেন বলতো!

—এ নিঘ্‌ঘাৎ মিলার তৈরি করা। ওরে আমি আর কত খাই। শরবতে এক ঢেলা মিছরি বাড়তি দিলে কি সংসারে কম পড়বে।

ভাইটি এবার একগাল হেসে চোখ বড়ো বড়ো করে বলে ওঠে, বলি অ মা, তুমি আমায় পেটে ধরেছো না পিঠে?

—ও মা সে কি কতা!

—নিজের মেয়ের হাতের বাস তোমার তো অচেনা নয়।

বড়মা এবার খানিক অপ্রস্তুত। মুখে পলকা কালো চমকায়। তারপর কোনওমতে হেসে বলে, আসলে আমরা মায়ে-পোয়ে আফিং খাই তো। মিষ্টি আর জিভে লাগে না।

ভাইটি নিচে চলে যাবে বলে উদযোগ করে। হুঁ মা, শান্তিপুরে ধারেই তো নবদ্বীপ। তোমার মা তো নবদ্বীপেরই মেয়ে।

—সে আবার কি।

—হুঁ. শান্তিপুর, নবদ্বীপের মানুষের মুখ ভারী মিষ্টি। তুমি তো জানো মা, তোমাদের পণ্ডিতবংশের নাড়ির ধাত।

—হুঁ, আমার দা মশাই ছিলেন পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যেরত্ন। বিদ্যেসাগর মশাইয়ের নাকে ঝামা ঘষে দিয়েছিলেন।

ভাইটি এবার সিঁড়ির দুয়ারের কাছে যেতে যেতে বলে, কি যেন সেই শ্লোকটা—মুখে মধু আর বুকে হলাহল।

আমি মা-মেয়ের এই সোজা-সাপটা কথোপকথন শুনে অবাক।

কিন্তু এ দিকে যে নবদ্বীপের সঙ্গে আজই একেবারে সাক্ষাৎ যোগাযোগ ঘটে যাবে তা তো জানাছিল না। সে ব্যাপারটা ঘটল বিকেলের দিকে। কিন্তু তার আগে দুপুর বেলা দাদু ভাতে বসেছেন। ভাইটি বুঝি দোতলায় মাকে ভাত দিতে গিয়েছে। দাদু মা'র দিকে চেয়ে চাপা গলায় বলে ওঠেন, সুক্তোটা কে রাঁধলে আজ বলদিকি।

মা মুখ টিপে হেসে বলে. আমি।

—তাই বল।

—কেন বাবা?

দাদু সন্তর্পণে এদিক ওদিক দেখে নিয়ে বলে ওঠেন, তুই তো বাঙাল দেশের মেয়ে। তোদের রান্নার তারই আলাদা। যোগেশ্বরী তো খাস বদ্ধমেনে। রান্না মানেই গুচ্ছের মিষ্টি। বাপরে, মুখে দেওয়া যায় না।

—না না বাবা, ও কথা বলতে আছে। আমায় বিশ্রাম দেবেন বলে রান্না নিজের হাতে করেন। কত ভালবাসেন আমায়।

—ভালবাসা বিষয়ে আমার কোনও প্রশ্ন নেই। তবে ভাল রান্না করা নিয়ে তো প্রশ্ন থাকতেই পারে।

বাবা হঠাৎ কোথা থেকে এসে উপনীত। কথার শেষটুকু বুঝি কানে গিয়েছে। দাদুর উদ্দেশ্যে বলে ওঠে, ঠিক বলেছেন বাবা। মুখে দেওয়া যায় না পিসিমার রান্না। হরিবল।

দাদু চোখ তুলে বলেন, অমন করে বল্লে শুনতে পাবে যে।

বাবা যথারীতি সাধা গলায় বলে যায়, তারপর, রান্না করছেন আর কোঁৎ পাড়ছেন। কেন রে বাবা। এত কষ্ট করে কে ওঁকে রাঁধতে বলেছে।

—ওরে বাবা, ওর একটা উইন্ড-এর পুরনো পেন আছে। তাই অমন করে।

বিকেলবেলা একটু মেঘ করল। কোথা থেকে একটা উড়ো বাতাস এসে পড়ল আমাদের টিনের চালি গোয়াল ঘরের মাথায়। পুরনো খাটা পায়খানার পাশে দণ্ডায়মান হাজারি নারকোল গাছ থেকে মস্ত একখানা পাতা দড়াম করে আছড়ে পড়ল গোয়ালের চালে। সেই সঙ্গে টিপটাপ বৃষ্টি। আর তখনই বাইরে থেকে রিকশার ঘনঘন হর্ন। তার মানে নতুন কোনও অতিথি এসেছেন আমাদের বাড়ি।

একটু পরেই সদর দরজায় এক অচেনা বৃদ্ধা। এক হস্ত বুকের কাছে কুঁড়োজালির ভেতরে সেঁধানো। অন্য হাতে ছোট পুঁটলি। বেশ স্থূলকায়া। পরনে থান। মাথায় বিনবিনে পাকা কদম ছাঁট চুল। আর মাথার পেছনে বেশ বড়োসড়ো পাকানো শিখা। কপালে তিলক। ভাঁটা ভাঁটা চক্ষু। গলায় মহানাদ, বলি বাড়ির লোক কি কানের মাথা খেয়ে বয়রা হয়ে বসে আচে।

ময়ূর ময়ূরী নাচে, চাতকিনী পিউ যাচে,
আর কি বিরহী বাঁচে, বুঝিনু, নিষ্কর্ষা।
ভারতের দুঃখমূল, কেবল হৃদয়ে শূল,
ফুটালি কদম্বফুল, আ আরে বর্ষা।।

যেমন সুচারু কণ্ঠস্বর তেমনই অভিরাম দর্শনধারী কবি ভারতচন্দ্র। রামপ্রসাদের মতন গৌর না হলেও পুরুষালি—যাকে বলে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, এই দীর্ঘাকৃতি যুবাসম মানুষটি। বাবরি কেশের ঝাড় আর কতক পালোয়ানি পাকানো গুম্ফ। ফলে দেহের বলবানত্ব আরও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি রাজসভায় বিছানো মহার্ঘ জাজিমের উপর দুই পা মুড়ে বসে গান করছেন। দু'ধারে যন্ত্রীগণ। কবিবর গাইতে গাইতে মাথা আন্দোলিত করছেন। সুমুখে হাত দু'খানি মেলে দিয়েছেন। তাঁর হাতের উপর মহলে পুরু স্বর্ণ তাবিজ ঝকঝক করছে রাজসভার অপরিমিত দীপ আলোয়।

ভজহরি সন্তর্পণে প্রসাদের কানের নিকটে বলে, দাদাগো, তোমার রাজাটি ভারি কেপ্পন। ঝাড়বাতিগুলো সব নিবিয়ে রেখে রাজ্যের পিদিম জ্বেলে রেখেছে।

প্রসাদ কন, আস্তে আস্তে। রাজা শুনে ফেলবেন যে।

সভাজনের বসবার জায়গার তফাতে খানিক দূরে উঁচু মঞ্চ। তার উপরে বিস্তারিত রাজ সিংহাসন। ভালো করে খুঁটিয়ে দেখলে রাজাসনের বাহার সাজ ভারী কম নয়। মাথার উপর চৌকোণা ঘন নীল চন্দ্রাতপ। সেটি ধারণ করে আছে চারটি রূপার দণ্ড। রাজার বসবার মুখ নির্দেশ হল পূর্বাস্য। উত্তরধারের দেওয়ালে কৃষ্ণবর্ণ পাথুরে চাতাল। তার বুকে

কোনও কারুকাজ নেই। সুঠাম কালো কষ্ঠিপাথুরে আবরণ রাজার উত্তরদিক গূঢ় করে রেখেছে। ঠিক তার নিচে শ্বেত পাথুরে ঢেউ খেলানো প্রাচীর গতিকের এক প্রস্থ আড়াল শোভা। তারপর রূপার দণ্ড কেটে কেটে নিচু বেড়াধারী পাহারা ঝিকিমিকি ঝিলিক ধরছে। রাজার পৃষ্ঠপ্রদেশে হেলান দেওয়ার জন্য মেহগনি কাঠের বাঁকানো পাটার বুকে শ্বেত মখমলের গদি। দু'ধারে দুই আকারি খর রক্তবর্ণ মখমলে মোড়া তাকিয়া। তবে কিনা তাঁর বাম ধারের তাকিয়াটি কিঞ্চিৎ নিচু আর কতক কোণ ভোঁতা আয়তক্ষেত্রবৎ। তাঁর বসবার আসনখানি শ্বেতশুভ্র। প্রথমে একপ্রস্থ আয়তক্ষেত্রাকারী আসন। তার ভিতরে আর এক প্রস্থ চৌকোণা আর মুসলমানী সূক্ষ্ম নকশার বিভাজন রেখা। হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের ছাঁদে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুড়কির কাজ সেই নকশার বাহারি অঙ্গবিভঙ্গে। শুভ্র মূল আসনপীঠের বুকে এক এক সারে পাঁচটি করে ছোট্ট ছোট্ট রক্ত ফুটকির শোভা। মূল নকশার চার চার কোণে যাবনিক চিকনের কাজ চিত্রিত সূক্ষ্ম সোনার জরির নকশা। তার আঁকে বাঁকে পঙ্খের কাজ অনুপম রচনা। এই মহিম শিল্পকলার মূর্ত বেদীর উপরে বঙ্গাধিপ মহারাজ। এখানে এসে রামপ্রসাদের মনে মনে কথা হয়, মহারাজের সঙ্গে তাঁর মতো অকিঞ্চিৎ জনের কত মিল আর বেমিল। মিলের দিকে গেলে এই রাজা তন্ত্রপ্রিয় আর শাস্ত্রাদিতে যথেষ্ট অধিকারী, প্রসাদের চেয়েও। আর বেমিলে—তিনি যে আসনটিতে বসে আছেন সেটিও একপ্রকারের সাধনার পীঠভূমি। এর নাম রাজসাধনাসন হলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু দীন রামপ্রসাদের দিকে হালিসহরের যে পঞ্চমুণ্ডি আসনখানি অবিরাম হাতছানি দিয়ে চলে, সেটিতে এখনও তাঁর অধিকার হল না। অধিকার হল না আজও মনের মতো একখানি কবিতা রচনার।

রামতনু, ভজহরির এ উঞ্ছবৃত্তি জীবনে এই প্রথম নিকট হতে রাজদর্শন। কিন্তু মনে মনে যে চিন্তার মূর্তিখানি আঁকা ছিল তার সঙ্গে কোনও মিল নেই ওই মহার্ঘ মানুষটির। আকারে প্রকারে সুদীর্ঘ আর বলবন্ত মহারাজার দেহের মধ্যপ্রদেশ খানিক স্ফীত আর নিম্নভাগ যথেষ্ট গুরুতর। সুচারু কুঞ্চিত কেশ—সুঁচালো যাবনিক জুলফি সমেত। সেই সঙ্গে ওই একই যবন ধাঁচে নিম্নাভিমুখী তীক্ষ্ণ গোঁফ। মাথার শোভা—মুসলমান-হিন্দু মিশ্রিত কায়দার শাদা উষ্ণীষ—যেটি মাথার সুমুখ প্রায় উন্মুক্ত রেখে ব্রহ্মতালুর নিচাংশ থেকে নেমে গিয়েছে পিছনে। শিরোভূষণের সুমুখ হতে বক্র ধারার একখণ্ড সুচারু শ্বেত পালক পশ্চাতে আধো হেলে রয়েছে। রাজার পরিধানে চুড়িদার পায়জামা ও বাহারি চিকনের কাজধারী জোব্বা। কোমরে গাঢ় নীলরঙা কোমরবন্ধ। তার বহিরাংশটি তাঁর ডান হাঁটুর উপর দিয়ে নিচে ঝুলন্ত আছে। সবশেষে, এই রাজার চোখ জোড়া যৎপরোনাস্তি বাজপক্ষীসম তীক্ষ্ণ ও তীর নজরি। বুদ্ধির ছটায় আর গাম্ভীর্যে এমন চোখ সত্যিই বিরল। একবার নেত্রপাত করলে মনে হয় অন্তঃকরণ পড়ে ফেলছেন।

ভারতচন্দ্রের গীত ফুরলো। তিনি দুই হস্ত জোড় করে রাজাকে অভিবাদন জানালেন। রাজা তৎক্ষণাৎ হাতজোড় এবং মস্তক ঝুঁকিয়ে প্রতি অভিবাদন রাখলেন। সভাস্থ যে সামান্য ক'জন মানুষ আছেন তাঁরা বলে উঠলেন, বাঃ বাঃ, কেউ বললেন, সাধু সাধু। ভারতচন্দ্র সকলকে নমস্কার জানালেন।

রাজা বলে উঠলেন। ধন্য তোমার পিতৃদেব মৃত নরেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয়। ধন্য এই অবনীমণ্ডল—যেদিন তুমি ভুমিষ্ঠ হয়েছিলে।

ভারত নিচু স্বরে বলেন, আজ্ঞা, পিতৃদেবের কনিষ্ঠতম সন্তান আমি।

রাজা হেসে কন, তাহলে সেই চৌপদীতে রচা সত্যপীরের কথা কিঞ্চিৎ শুনি—সেখানে তোমার আত্মপরিচয় আছে।

ভারত বিনীত ভঙ্গীতে বলেন, সে কথা তো অনেকবার হুজুরের সাক্ষেতে কয়েছি।

—হোক না আরও একবার। অমৃতকথা বারংবার শুনেও আশা মেটে কি।

ভারত দুই হাত জোড়ে বলে ওঠেন,

ভরদ্বাজ অবতংস ভূপতিরায়ের বংশ, সদাভাবে হতকংস, ভুরসুটে বসতি।
নরেন্দ্ররায়ের সুত, ভারতভারতী যুত, ফুলের মুকুটি খ্যাত, দ্বিজপদে সুমতি।।
দেবের আনন্দ ধাম, দেবানন্দপুর নাম, তাহে অধিকারী রাম, রামচন্দ্র মুনসী।
ভারতে নরেন্দ্র রায়, দেশে যার যশ গায়, হোয়ে মোরে কৃপাদায়, পড়াইল পারসী।।

রাজার চোখ পড়ে রামপ্রসাদের দিকে এবার। তিনি হাত তুলে ভারতকে থামতে বলে সহর্ষে বলে ওঠেন, আহা, আজ কি আনন্দ আমার। একই নভে একজোড়া চাঁদ-এর উদয় যে। বলি এসেছো, সে খপর তো পেয়েছি, কিন্তু দর্শন হল এতক্ষণে।

প্রসাদ করজোড়ে বলেন, মহারাজ, গলতি মাফ করবেন। উনি যদি মহাকবি চন্দ্র হন তাহলে আমি যে জগন্মাতার এঁটো পেসাদ।

—বাঃ বাঃ, বেশ বলেছো। তবে কিনা জগন্মাতার কোলেই তো এ ব্রহ্মাণ্ড। তাহলে তোমার সঙ্গে ভারতের সম্পর্কটা কি দাঁড়াল প্রসাদ?

প্রসাদ হেসে মাথা নিচু করেন, আজ্ঞা, সেটা মহারাজই বিচার করবেন।

কৃষ্ণচন্দ্র কিয়ৎসময় চুপ করে থাকেন। তাঁর ভ্রু মধ্যে কুটীল রেখা সঞ্চারিত হয়। তারপর তিনি মিচকে হেসে কন, হুঁ, তাহলে দেখা যাচ্ছে ভারতচন্দ্রের নিকটাত্মীয় হল রামপ্রসাদ।

সভাজন অবাক। অবাক কবি যুগলও। সবার মনেই প্রশ্ন—এ কেমন ধারা। এ কেমন ধারা।

রাজা মন্দ্রস্বরে বলে যান, সর্বাঃ পিতৃপত্ন্যো মাতরস্তদ্‌ভ্রাতরৌ। অর্থাৎ কিনা পিতার সকল পত্নীই মাতৃস্থানীয়। অতএব তাঁদের ভ্রাতৃগণ হলেন মাতুল।

সভামধ্যে নীরবতার মহা প্রতীক্ষা। মহারাজ কোথা হতে কোথা যাচ্ছেন। কিসের সঙ্গে কি মেলাচ্ছেন।

মহারাজ বলে চলেন, রামপ্রসাদের জগন্মাতা আসলে ভারতের ভগ্নী। তা না হলে ও এমন করে ফুলের মুকুটি হতে পারত না। কথায় কথায় পদ রচনায় এত কামকলার হুদ্দমুদ্দ সারতে পারতে না।

প্রসাদ সবিস্ময়ে বলেন, ঠিক বোধগম্য হল না মহারাজ।

রাজা হেসে বলেন, কেন, এ তো সিধে হিসেব। প্রসাদ সুরাপায়ী মাতৃপন্থী আর ভারত উপবাসী থেকে মদন ত্রয়োদশী পারণ করে। যে সে তার মা হতে পারে না। বড় জোর ভগ্নী অবধি বরদাস্ত করা যেতে পারে।

ভারতচন্দ্র সহাস্যে বলেন, মামা-ভাগ্না। তাহলে প্রসাদ আমার ভাগ্না।

রামপ্রসাদ তৎক্ষণাৎ বলে ওঠেন, যম, জামাই, ভাগ্না. তিন নয় আপনা।

ভারত বলেন, ভাগ্না, তোমায় কিন্তু মাথায় পাক্‌ড়ি পরে দেখাচ্ছে খাসা। এ বেশ তো আগে কখনও দেখিনি।

প্রসাদ ঝটিতি জবাব দেন, রাজসভায় তো এর আগে কখনও আসিনি মামাবাবু। এই তো প্রথম বার আসা হল। সভার এক স্থল থেকে রাজবয়স্য বীরনগরনিবাসী মুক্তারাম মুখোপাধ্যায় গলা তুলে রাজার প্রতি বলে ওঠেন, বলি অ বেয়াই, এ যে ভারী ভজঘট পরিস্থিতি।

রাজা তাকান মুক্তারামের দিকে, কিন্তু বেয়াই, তোমার বউ ভাগ্যিস এখানে হাজির নেই। থাকলে কি যে হত।

মুক্তারাম চোখ ভাসিয়ে কন, কি হত বেয়াই!

—না, আমি শুনেছি, তোমার ওখানে—মানে উলো বীরনগরে নাকি বউ বিক্রীত হয়।

মুখুজ্যে গম্ভীর বদনে তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন, হাঁ মহারাজ, গত মাত্রেই।

সভাজন হো হো হেসে উঠল। রাজা রসিকতার রাশ ছাড়েন না।—আচ্ছা বেয়াই, গতকাল তুমি যে মাগুর মৎসটি পাঠিয়েছিলে তার অন্ত নাই।

মুক্তারাম সঙ্গে সঙ্গে জব দেন, মহারাজ, যার অন্ত নাই, তার আদিও নাই।

রাজা এক ধাপ চড়ে বলে ওঠেন, মুখুয্যে, গত রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম বড় বিচিত্র।

—কি স্বপ্ন বেয়াই?

—বললে অবিশ্যি, তুমি আনন্দই পাবে। কিন্তু আমার সে কথা বলতে ভারী দ্বিধা হচ্ছে যে।

—বলেই ফেলুন মহারাজ।

—দেখলাম, যেন তুমি বিষ্ঠার হ্রদে পড়েছো আর আমি পায়সের হ্রদে।

—বেয়াই যথার্থই দেখেছেন। তবে মহারাজ, কিমাশ্চর্যম। আমিও অমন একখানি স্বপ্ন দেখেছি বটে!

—কি দেখলে শুনি।

—দেখলাম, হ্রদজোড়া থেকে আমরা দুজনায় উঠে একে অপরের গাত্র লেহন করছি।

সভাস্থ সকলেই হাস্য রোলে পতিত হন। কিন্তু রামপ্রসাদের কাছে এমন সব কদালাপ মোটে ভাল লাগে না। মহারাজার মতো এমন একজন শাস্ত্রজ্ঞ আর বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিতজনের কাছে এমন স্থূল ব্যবহার তিনি ধারণ করতে পারেন না। প্রসাদ উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, মহারাজ, আমরা এখন বিদায় হই। আপনি আপনার সভার কাজ করে চলুন।

বুদ্ধিমন্ত রাজা বুঝতে পারেন, রামপ্রসাদের মতো সুক্ষ্মরসবেত্তা কবির কোথায় লেগেছে। তিনি তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, বলে কদ্দিন পর তোমায় দেখলাম। এখনই চলে যাবে।

—আজ্ঞে না, চলে যাব না, আপনার বাজপেয়ী যজ্ঞ না দেখে কৃষ্ণনগর পরিত্যাগ করব না।

মহারাজ এবার কণ্ঠস্বরে খানিক অভিমান টেনে এনে বলেন, তাহলে এক আধখানা গান না শুনিয়েই চলে যাবে মিতে।

এই মিতা সম্বোধনে রামপ্রসাদ মনে মনে খানিক টলে যান। তবু স্বভাবের অন্তরে যেহেতু ভারী জিদ গুপ্ত আছে তাই নিজেকে দমন করে বলে ওঠেন, বেশ, যেকালে আদেশ কল্লেন গান তো করতেই হবে মহারাজ।

—আদেশ নয় মিতা, আবদার।

প্রসাদ মাথা হেঁট করে বলেন, বেশ তাই হোক। তবে বুঝি পুরোদস্তুর গান এখন বেরোবে না।

—বেশ তো, আধা খেঁচড়াই হোক না কেন।

রামতনুর দিকে তাকান প্রসাদ। তনু বুঝে নেন এবার ঢোলক কাঁধে নিতে হবে। প্রসাদ তাঁর কানের কাছে নিচু গলায় বলেন, কালটা বর্ষা হলেও মনে মনে বসন্ত বাহার বলছে দাদা। একটু শিক্ষে দিই এঁয়াদের। বাজাও দাদা।

গীত আরম্ভ হয়,

ত্যজ মন কুজন—ভুজঙ্গ-সঙ্গ।
কাল মত্ত মাতঙ্গেরে না কর আতঙ্গ।
অনিত্য বিষয় ত্যজ, নিত্য নিত্যময়ে ভজ,
মকরন্দ রসে মজ, ওরে মনোভৃঙ্গ।

বাইশ

নতুন জায়গায় এমনিতেই ঘুম আসে না। তার উপর আজ প্রথম দিনেই মহারাজার সঙ্গে কিঞ্চিৎ মনবিরাগ ঘটেছে। ফলে কৃষ্ণনগরের বাজ অতিথিশালার সুখদ শয্যায় রামপ্রসাদের ঘুম আসতে চায় না। ওধারের বিছানায় রামতনু আর ভজহরি নিশ্চিন্তে নাসাধ্বনি করে চলেছে রাত্রির গুরুতর রাজভোগের পর। আজ, এই প্রথম রজনীর ভোজ্য তালিকায় ছিল, উৎকৃষ্ট গব্যঘৃতের লুচি, পুরু ক্ষীর, সন্দেশ, পিঠা, মাঝখানে কিছু নিরামিষ ব্যাঞ্জনাদি। ফলে, এই মহার্ঘ খাদ্য উদরীভূত করার পর প্রায় কৈবল্য লাভ ঘটেছে এই দুজনার। ঘুমে তাদের বাহ্যজ্ঞান গত হয়েছে।

ঠিক এমনই সময়ে, রাত গভীরে মহারাজার এক আপ্তসহায়ক দুয়ারে এসে ঘা দিল। রামপ্রসাদ দরজা খুলতেই সেই গুম্ফধারী সাজোয়ান ব্যক্তি তাঁকে হাত ইসারায় পিছু পিছু আসতে বলল।

রামপ্রসাদ সেই লোকটির অনুসরণে যেতে যেতে এই গভীর রজনীর রাজপ্রাসাদ বিশদভাবে নিরীক্ষণ করার সুযোগ পেলেন। এই কৃষ্ণনগরপুরীর একধারে ভবনের পূব দিকে সমান শোভাধারী চার-চারখানি প্রাসাদ। সেই প্রাসাদশ্রেণীর নিম্নতলের মধ্যভাগ বরাবর এগিয়ে গিয়েছে গজ-অশ্ব ইত্যাকার যানবাহনাদির যাতায়াত যোগ্য একখানি বিস্তৃত সরণি। প্রাসাদগুলি বিরাটাকৃতি এবং তাদের উপরিতল বিচিত্র বর্ণধারী—এই নিশীথিনীর ক্ষীণ জ্যোৎস্নায়। একদিকে রয়েছে প্রকাণ্ড গজশালা আর মনোরম অশ্বশালা। মূল প্রাসাদ ভবনের উপরতলে দুন্দুভি, ডিণ্ডিম-শানী-তুনী ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের বাদকদের বসে বাজাবার জন্য একখানি ইষ্টক নির্মিত প্রাসাদ। তার পাশের প্রাসাদটির মধ্যভাগ দিয়ে অন্দরমহলে প্রবেশযোগ্য পথ রয়েছে। তার পশ্চিমে আর এক মনোরম প্রাসাদ আর পুবধারে মনোরম অট্টালিকাবর্গ। ওই দিকেই অতিশয় শোভাকর দেবীপ্রাসাদরূপ অন্তঃপুর। সেই পথেই নিয়ে চলল রাজার অনুচর।

কিছুক্ষণ পরেই রামপ্রসাদ এসে পড়লেন দেবীপ্রাসাদরূপিনী রাজ অন্তঃপুরের প্রথম

কক্ষে। এ ঘরের বাইরে জনা চার বলিষ্ঠ রক্ষী, নিস্পন্দ পাথরের পারা অস্ত্র নিয়ে প্রহরায়। এখন প্রসাদ রাজসভার পোশাকে নেই। সাধারণ ধুতি আর উত্তরীয় পরেই এসেছেন।

লোকটি প্রথম কক্ষের দুয়ারে দাঁড়িয়ে তিন তিনবার করতালি বাজাল। অমনি ভেতর হতে তালি ফিরল। লোকটি এই প্রথম কথা বলল—প্রসাদের দিকে ফিরে।

—ভিতরে আসতে আজ্ঞা হোক।

প্রথম কক্ষ পার হয়ে দ্বিতীয়ে আসা হল। আর এখানেই গূঢ় দীপালোকে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দর্শন মিলল। রাজা এখন ঘোরো পোশাকে স্বাভাবিক। ধুতি আর পিরাণ ছাড়া তাঁর অঙ্গে কিছু নেই। ভ্রু মধ্যে গভীর চিন্তারেখা।

কপালের মাঝখানে সিঁদুর টিপ। পাশে রাখা নিচু পাটার উপর কনুই রেখে গালে হাত। রাজা বসে আছেন একখানি কেদারায়। পাদুকা বলতে খড়ম, সেটি অদূরে খুলে রাখা। প্রসাদকে দেখে তিনি সুমুখে রাখা কেদারার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, বোসো প্রসাদ।

রামপ্রসাদ বলে ওঠেন, কিন্তু এত রাতে—

রাজা সিধে তাকান প্রসাদের দিকে, সবার সুমুখে সবাইকে সব কথা বলা যায় না প্রসাদ। মনে হল, মনের কথা তোমায় বুঝি বলা যেতে পারে। তাই এই গভীর রাতে তোমায় ডাক করালাম।

—আমায়!

—হ্যাঁ একমাত্র তোমায়। আমার দেশে হালহকিকত। ঘোর বিপদের মধ্যে আমরা আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছি। তুমি তো একজন স্পর্শকাতর কবি প্রসাদ। আশাকরি তুমিও কিছু কিছু সমাচার রাখো।

প্রসাদ এবা কেদারায় বসে পড়েন। তারপর ঠোঁটের আড় ভেঙে মৃদু হেসে বলেন, স্রাজেরদৌলা না সিরাজদ্দৌলা। ঠিক বলেছি কি মহারাজ?

কৃষ্ণচন্দ্র মৃদুস্বরে উচ্চারণ করে যান, মনসুরোল-মোলক্—সিরাজদ্দৌলা শাহকুলী খাঁ মিরজা মাহম্মদ হায়বৎজঙ্গ বাহাদুর। মুরসিদাবাদের সিংহাসনে বসলে নামের আগে শুধু নবাব কথাটি বসবে। এখন তারই অপেক্ষা।

রামপ্রসাদ হেসে কন, জানি। নবাব আলিবর্দী বৃদ্ধ আর দৌহিত্র সিরাজ বলতে একচক্ষু।

—হুঁ। আরও আছে।

—আছে জানি। বর্গীর হাঙ্গামা। তবে সে তো প্রায় গুটিয়ে এল। নবাব আলিবর্দী ওই দমন কার্যটি করতে নিজেকে পুইয়ে ফেললেন।

রাজা নিচু কণ্ঠে বলে যান,

সাহুরাজা বোলে তবে রঘুবাজার তরে।
অনেকদিন বাঙ্গালার চৌত না দে এ মোরে॥
দূত পাঠাইয়া দেয় বাদসার স্থানে।
বাঙ্গালার চৌথাই না দে এ কীসের কারণে॥

প্রসাদ বলেন, হ্যাঁ, এখান থেকেই যে শুরু বর্গী হানার। খাজনা আদায়ের নামে লুঠপাট।

রাজা,

বাঙ্গালা মুলুক সেই ভুঞ্জে পরম সুখে।

দুই বৎসর হইল লালবন্দি না দে এ মোকে।

রামপ্রসাদ, ঠিক কথা আজ্ঞা। চৌথ অর্থাৎ খাজনা আদায় করার রণ।

রাজা,

জবর হইল সুবা বাঙ্গালা সহরে।

দুই বৎসর হইল খাজানা না দে এ তারে॥

রামপ্রসাদ, আজ্ঞা হ্যাঁ এরপরেই তো ভাস্কর পণ্ডিতের উদ্ভব।

রাজা, আজ্ঞা দিল বাদসা ফৌজ পাঠাইঞা।

চোথাই নৈ এন জেন জবর করিঞা।।

রামপ্রসাদ, যথার্থ। যথার্থ।

রাজা,

রঘুরাজা নিকটে আছিলা বসিআ।

কহিতে লাগিলা তিনি হাসিয়া হাসিয়া॥

আঙ্গা কর বাঙ্গালা মুলুকে আমি জাই

জবর করিয়া তথা আনিব চৌথাই।

তবে তারে আজ্ঞা দিলেন রাজন।

তিনি পাঠাইলেন দেওয়ান ভাস্করণ॥

রঘু তবে আজ্ঞা দিলা ভাস্করে।

তৎপর করিয়া চৌথাই আনি দিবা মোরে॥

রামপ্রসাদ, এবার আরম্ভ হল ভাস্কর পণ্ডিতের শুল্ক আদায় পর্ব। সে ভারী ভয়ঙ্কর। ভারী নিষ্ঠুর।

রাজা,

রাজার আদেশ পাইয়া, ভাস্কর চলিল ধাইয়া

সন্য সঙ্গে করিয়া সাজন।

ডঙ্কা নাগারা কত নীসান চলে সত সত

সন্য মধ্যে বাজিছে বাজন॥

রামপ্রসাদ, যুদ্ধের তর্জনগর্জন। সে ভারী ভয়ঙ্কর। নিরীহ মানুষকে ভয় দেখাতে এর কোনও জুড়ি নেই। প্রথমে ভাস্কর এসে উপনীত হলেন বীজাপুর। সেখান হতে কটক, নাগপুর, পঞ্চকোট, অবশেষে আমাদের এই বর্ধমানে।

রাজা,

বৈসাখের উনিশা জাত্র বরগি আইলা তাত্র

মহা য়ানন্দিত হইয়া মনে।

বিরভূই বামে থুইয়া গোঅলা ভুইর কাজ হইয়া

আসিয়া ঘেরিল বর্ধমানে।

রামপ্রসাদ, বাংলার আকাশে ঘোর বিপদ, বর্গী কথাটির অর্থ তো লুঠারু। ফলে এ বঙ্গদেশে চৌথ আদায়ের নাম করে এক মহালুণ্ঠন পর্ব।

রাজা,

চব্বিশ জমাদার ভাস্কর সরদার।
চল্লিশ হাজার ফৌজ লইঞা।
সেতারা গড় হইতে বরগী আইল চৌথ নিতে
সাহু রাজার হুকুম পাইঞা।

রামপ্রসাদ, ভাস্কর পণ্ডিত নবাবের উকীল দূতকে তড়পালেন বিস্তর। বলে পাঠালেন, সিধে আঙুলে যদি ঘৃত না উঠে তখন তো আঙ্গুল বক্র করতেই হবে।

রাজা,

ভাস্কর তবে কত্র বাদসার হুকুম হএ
চৌথ নিবার কারণ।
চৌথাই না দিবে জবে রায্য নষ্ট হবে তবে
তার সনে করিব আমি রণ॥

রামপ্রসাদ, হ্যাঁ, তাই ঘটল অবশেষে। ভাস্কর পণ্ডিত নিজ হুঙ্কার বহাল রাখতে মহা আক্রমণ ঘটালেন বাংলার ওপর।

রাজা,

চাইরদিগে লোক পলাঞ ঠাঞি ঠাঞি।
বর্ত্তিস বর্ণের লোক পলাএ তার অন্ত নাই॥
এই মতে সব লোক পলাইয়া জাইতে।
আচম্বিত বরগি ঘেরিল আইসা সাথে॥

রামপ্রসাদ, ঠিক কথা। ভারী নিষ্ঠুর সে অত্যাচার। কত লুণ্ঠন, অসহায় মানুষের হাত-পা-নাক-কান কর্তন করা। এমনকী স্ত্রীলোকের উপরেও পশ্চাচার।

রাজা,

ভাল ভাল স্ত্রীলোক জত ধইরা লইয়া জাএ।
আঙ্গুষ্ঠে দড়ি বাঁধি দেয় তার গলাএ॥
একজনে ছাড়ে তারে আর জনা ধরে।
রমণের ভরে ত্রাহি শব্দ করে॥

রামপ্রসাদ, কত গ্রাম যে ছারখার করল এই পাষণ্ডের দল। যেমন কিনা, চন্দ্রকোণা, মেদিনীপুর, দিগনপুর, খিরপাই, সহর বর্ধমান, নিমগাছি, সেড়গা, সিমইলা, চণ্ডীপুর, শ্যামপুর, ডামদ্বৈ, যদুপুর, ভাটছালা, মেজাপুর, চাঁন্দড়া, কুড়বন, পালাসি, বউচি, সমুদ্রগড়, জার্ন্ননগর, নদীয়া, মাহাতাপুর, সুনন্টপুর, কুমিরা, বউতলি, নিমদা, বিষ্ণুপুর, নৈহাটি, উর্দ্ধারণপুর, কাটোয়া, কাঠালিয়া, আঁধারমানিক, আরও কত শত নাম যে বলি। তারপর দাঁইটাটে উপনীত হয়ে ভাস্করপণ্ডিত বল্লেন—আমি এখানে জগৎজননী মায়ের পূজা করব। কিন্তু এ ধারে নবাব একেবারে মরণকামড় দেওয়ার জন্যে তৈরি।

রাজা,

সাইটহাজার ঘোড়া ডেড়লাক বহনিয়া।
তারকপুর আইলা নবাব এত ফৌজ লইয়া॥

যেই মাত্র নবাব সাহেব তারকপুর আইল।
ফৌজের ধমক দেখি বরগি পিছাইল॥

রামপ্রসাদ, হ্যাঁ, ঠিক কথা। নবাবের আক্রমণে এবার বুঝি অত্যেচারী বর্গীদের প্রাণে ডর এল। এদিকে ভাস্কর পণ্ডিত সপ্তমী, অষ্টমী মাত্র এই দুটি দিন দুর্গা পূজা করে প্রতিমা ফেলে রেখে পলায়ন করল। সে গেল অনেক দূর। সে ছিল আশ্বিন মাস। কিন্তু চৈত্র মাস আসতেই সে আবার সেজেগুজে এল।

রাজা,
জেই মাত্রে পুণরুপি ভাস্কর আইল।
তবে সরদার সকলকে ডাকিয়া কহিল॥
স্ত্রী-পুরুষ আদি করি যতেক দেখিবা।
তলয়ার খুলিয়া সব তাহারে কাটিবা
এতেক বচন জদি বলিল সরদার
চতুদিকে লুটে কাটে বোলে মারমার॥

রামপ্রসাদ, এদিকে ভাস্কর পণ্ডিত পঞ্চকোটের পার্বত্যপথ বরাবর নিজের দেশে পলায়নের উদ্যোগ করলে নবাব আলিবর্দীর সৈন্য তাঁর পিছু ধাওয়া করল। কিন্তু তার পরের বছর রঘুজি ভোঁসলে ভাস্করকে আবার সদলবলে বাংলায় পাঠালেন। আবার নতুন করে বঙ্গদেশ বর্গী হামলায় পড়ল। এদিকে নবাব আলিবর্দী এতদিন ধরে লড়াই যুদ্ধু করে ভারী ক্লান্ত। তাবাদে তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গও হয়েছে বটে। নবাব তাঁর মন্ত্রী জানকিরাম আর মুস্তাফা খাঁর সঙ্গে মন্ত্রণা করে দূত পাঠালেন ভাস্করের কাছে, ছল করা সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে।

রাজা,
প্রথমে বৈশাখ মাস শুক্রবার দিনে।
ভাস্কর চলিল মিলিতে নবাবের সনে॥

রামপ্রসাদ, বহরমপুরের তিনক্রোশ দখিনে—পলাশীর দিকে যেতে পড়ে মনকরা। সেই স্থানের এক শিবিরে ভাস্কর পণ্ডিতকে চাতুরি করে নিয়ে আসা হল। তারপর ইঙ্গিত করা মাত্র ভাস্কব পণ্ডিত ও তাঁর কয় সেনানী পট্টাবাসের আবডালে লুকানো অস্ত্রের ঘায়ে হত হলেন। সে হল আজ থেকে বেশ ক-বছর আগে—অর্থাৎ ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে।

রাজা,
জেইমাত্র ভাস্কর ঘোড়ায় চড়িতে।
তরোয়ার খুলিয়া তখন মারিলেক তাথে॥
সেইক্ষণে তবে ঘটাচট্টি হইল।
জত জনা য়াইসা ছিল সব জনা মইল॥
তারপরে নবাব সাহেব সমাচার সুনে।
সুনি আনন্দিত নবাব হইল সেইক্ষণে॥
সাদিয়ানা নহবত কত বাজিতে লাগিল।
ফকির ফুকুরাকে খএরাত কত দিল॥

রামপ্রসাদ, কিন্তু মহারাজ, ভাস্কর হত হলেও বর্গীরা সমূলে বিনাশ হল না যে! নবাব কিছুদিনের জন্যে হাঁপ ছাড়লেও আবার তারা ফিরে এল। এরপর এলেন রঘুজি ভোঁসলে—ভাস্কর পণ্ডিতের মরণের প্রতিশোধ নিতে।

মধ্যরাতের এই বিষণ্ণ গম্ভীর কথোপকথনের মারাঠা অত্যাচারের বিবরণের টুকরো বিনিময় হতে থাকে রামপ্রসাদ ও নদীয়াধীপের মধ্যে। অর্থ আর ধন সম্পত্তি লুণ্ঠনের অকথ্য বর্ণনা, যা দুটি মানুষের বুকের খাঁচায় বদ্ধ হয়ে ছিল, হয়তো এই নিবিড় আলাপে খানিক রাগমোচন ঘটল। গৃহদাহ থেকে আরম্ভ করে মানুষের কর্ণ-হস্ত-পদ ছেদনের বীভৎসতা রাত্রির এই মধ্যযামকে আরও জটিল করে তুলল। এমনকী অবলা রমণীর স্তন কর্তনও মনে পড়ে গেল দুজনার! হায়, মানবদলনের কি মহাঅভিশাপের পর্ব এই বাংলায়—এখন সদ্য অতীত।

বাইরের ওই হেঁকোডেকো আওয়াজ শুনে প্রথম চোটে নারী কি পুরুষ ভেদ না হওয়ারই কথা। গলায় শাদা বাক্যে বাজ কড়কানো কারবার। তারওপর মাথার কদমছাঁটের পশ্চাদ্দেশে সাবেক পণ্ডিত সদৃশ ওই জাঁহাবেজে শিখা। গায়ের খর কালো বর্ণ আর বিপুলকায়ার সঙ্গে এমনতর সাজপত্তন—কি যে অনন্য। আমাদের বড়মা গিরিনন্দীনি দেব্যার এক মায়ের পেটের সোদরা এই শৈলনন্দীনি দেব্যা। নিবাস, সেই দূর নবদ্বীপ ধামে।

শৈলনন্দীনিকে কতক ঘেরবন্দী করে মহাসমাদরে ঘরে নিয়ে আসে আমার মা, বাবার পিসিমা—আমাদের ভাইটি। সামনে পেছনে আমরা তিন ভাইবোন। একেবার ছোট বোন সোমা এখনও সাব্যস্ত হয়নি বলে সে তার নিজের বিস্ময়ের জগতেই পড়ে থাকে।

টানা রোয়াক পেরিয়ে, ভেতর দালানে, আমাদের এই প্রথম দেখা নতুন বড়মার প্রবেশ ঘটে। প্রবেশ নয়, মহাপ্রবেশ। যাকে বলে জমজমিয়ে ঘরে ঢোকা। মার চোখ ইশারায় আমরা ছোটরা ঢিপ ঢিপ পেন্নাম সারি। সঙ্গে সঙ্গে অবাক হয়ে শুনি শৈলনন্দীনি দুহাত তুলে বলছেন, জয়স্তু, জয়স্তু। কি পরিপাটি আর স্পষ্ট উচ্চারণ। কনিষ্ঠ ভাই—ছেলেমানুষ মলয়, এমনিতে চুপ স্বভাব হলেও এই প্রায় রণহুঙ্কার শুনে হকচকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে—এটা ধমক হল, না আর কিছু। ফলে সেও দুবার নিজের মনে আধো আড়ষ্ট বলে ওঠে, জয়ন্তু, জয়ন্তু।

নতুন বড়মা তার দিকে ভাঁটা নেত্র কোণ দিয়ে একবার দেখে নিয়ে বলে ওঠেন, এই পোঙাপাকাটা কে র‍্যা!

আমার বড়মা নিচের শোরগোলে নেমে আসে। আগে আগে আমার পিতামহ। ঠিক তখনই ভাই মলয়, যেহেতু সে ল বর্ণে দুর্বল, আধো আড়ষ্ট বলে ওঠে, মড়য়—মড়য়। আমার নাম মড়য়।

বৃদ্ধা চোখ কুঁচকে বলেন, এ কি দেবভাষা বলচে না যবন ভাষা!

দাদু হেঁট হয়ে পা ছোঁন তাঁর, মাসিমা, আগে কেমন আছেন বলুন।

—কেমন আবার। কেষ্ট যেমন রেকেচেন তেমনি আচি। পাইখানার ধাত কসা ছাড়া আর কোনও ব্যামো নেই।

দাদু ভ্রু কুঁচকে বলেন, হুঁ, আপনার সিমপটমগুলো ভাল করে শুনে তারপর ওষুধ দেবো।

—টমটম শুনবি! মানে!

—না না, সে কথা নয়। মানে—আপনার কিছু লক্ষণ জেনেবুঝে তারপরে একটু হোমিও ওষুধ দেবো।

—হুঁ, রোজ প্রাতে আমি হরিতকি ভেজানো জল খাইরে বাপ। মাতৃদেব্যা কুপিতা হলেও হরিতকি কখনও কুপিতা হন না।

ওধার থেকে হঠাৎ আমাদের সবার ছোট বোন সোমা, পুরো নাম সোমাভা, কণ্ঠ তুলে বলে ওঠে, আমার নাম ছোমাভা। ভাল নাম বাদদী ছোমাভা।

দাদু তাড়াতাড়ি রহস্যটা বুঝিয়ে বলতে চান, না মানে, ও বলতে চাইছে যে ও যেদিন জন্মায় সেদিন নাগাড় বৃষ্টি। ফলে ওকে বলা হত বাদলি। সেটার সঙ্গে ওর নাম সোমাভা যুক্ত কল্লে আরকি।

বৃদ্ধার ভ্রু এবার আরও কোঁচকায়, সোমাভা। অর্থাৎ, চন্দ্রের আভা। বাঃ, কে রাখলে এ নাম শুনি!

দাদু সলাজ হেসে মুখ নিচু করেন, না মানে, আমার কন্যা, মানে আপনার নাতনি রেখেছিল আরকি।

বড়মা সুমুখে আসতেই শৈলনন্দীনি মস্ত বপু হেঁট করতে চেষ্টা করেন। একটা মট মট, থস থস শব্দ হয়। বড়মা বলে ওঠে, থাক থাক শৈল।

শৈল কোনওমতে সোদরার পা ছোঁন, বেশি ন্যাকামো কোর না তো দিদি। বাপ পিতেমো যেটা শিখিয়েচেন তার বাইরে গেলে এখনকার ছেলেপুলেরা কি শিকবে শুনি!

বড়মা বলে, থাক না এসব তক্কাতক্কি। তা বলি হ্যাঁ শৈল, রাতে কি খাবি বল আগে। নাত বউকে তো ব্যবস্থা কত্তে হবে।

—ব্রাহ্মণের বিধবা রাতে কি খায় তুমি জানো না বুঝি! ন্যাকা।

বড়মার মানে লাগে বুঝি, আমি তো আর তোর মতন পণ্ডিত নই। আমার জন্যে চাট্টি খই আর দুধ বরাদ্দ।

শৈলনন্দীনি বলে ওঠেন, নক্তং হবিষ্যান্ন মনোদনং বা ফলং তিলাঃ ক্ষীরমথাম্বু চাজ্যম। যৎ পঞ্চগব্যং যদি বাথ বায়ুঃ প্রশস্তমত্রোত্তরমুত্তরঞ্চ॥

—বাপ্‌রে

—মানে হল, রাতে হবিষ্যান্নমাত্র ভোজন, অথবা লুচি ও খই প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন, ফল, তিল, দুগ্ধ, জল, ঘৃত, পঞ্চগব্য আর বায়ু। রাতে হবিষ্যান্ন ভোজন না করে লুচি ইত্যাদি ভোজন করাই প্রশস্ত এবং লুচি প্রভৃতি ভোজন না করে কলা প্রভৃতি ফলাহার করা প্রশস্ত।

—বাপ্‌রে। খাওয়ার এত সব শব্দ জানতুম না। খালি জানতুম হাপুস আর হুপুস।

—পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্নর দৌহিত্তির হয়ে তুমি এমন গণ্ডমুখ্যু কেমন করে হলে দিদি। ছ্যাঃ।

তেইশ

আমাদের এই চৌধুরীপাড়ার বাড়িতে এখন যাকে বলে চন্দ্রসমাগম।

এই সবে এসে উপনীত হলেন আমার পিতামহের আপন মাসিমা, আমাদের বড়মা গিরীনন্দিনী দেব্যার সোদরা ভগ্নী—শ্রীধাম নবদ্বীপবাসিনী শৈলনন্দিনী দেবী। অর্থাৎ, আর একটু গড়ানো সরল হিসেবে আমার কানুবাবার ঠাকুরমা। ভাবতে বসলে সে ভারী ভয়ঙ্কর হিসেব।

এদিকে বেশ কিছুকাল যাবৎই আছেন আমার বাবা-মা'র সূর্যকুমার দাদু, যাঁর সর্ব অঙ্গে মহামহিমব্যাধি। রয়েছে আমাদের বর্ধমান জেলার সাবেক পূর্বপুরুষ-এর শেকড়, বাবার খুড়তুতো ভ্রাতা আধফুটি কথার কামাখ্যাচরণ। আছেন পিতামহের অভিমানিনী বিধবা ভগ্নী যোগেশ্বরী, আমাদের ভাইবোনেদের সবাকার ভাইটি। আর এ বাড়িতে সদাই বাইরের উটকো সাধু, অতিথি ঠাঁই পাওয়ার খোলা খাতা মোতাবেক, সেই মাঝবয়সী গেরুয়াধারী কামানো মুখো আর বাবরি চুলো, খব কালো এবং ভয়ঙ্কর ট্যারা সে সাধু না অসাধু—তিনিও রয়ে গিয়েছেন। লোকটি তার ট্যারা চক্ষু প্রসাদাৎ কখন কোন দিকে চেয়ে আছে বোঝা দায়। কেবল আমার মা ঠিক ধরে ফেলে—লোকটি কীরকম অপলকে মাকে জরিপ করে। একমাত্র নারীরাই আন চক্ষুর সূঁচ বেঁধা পুরুষের চেয়ে কিছু আগাম টের পায় কি?

আমাদের নতুন বড়মা শৈলনন্দিনী এক রাত না কাটতে নিজমূর্তি ধরলেন। রাতে গাওয়া ঘিয়ের গরমাগরম লুচি, মাখো মাখো আলুচচ্চড়ি, এক বাটি ক্ষীর আর আমাদের মণিমান্নার বোম্বেটে রাজভোগ দিয়ে কোনও মতে পিত্তি রক্ষা করে শুয়ে পড়লেন আমাদের নিজস্ব বড়মার পাশেই। বড়মা কতক দায়ে পড়েই তাঁর একটেরে খাট ছেড়ে মাটিতে নামতে বাধ্য হলেন। সেখানেই কম্বলাসনের শয্যে পাতা হল। দুই ভগ্নী পাশাপাশি শুয়ে পড়লেন। দোতলার এ ঘরের সামনেকার মুক্ত বারান্দায় আমরা ভাইবোনেরা শয়ান, তাই ও ঘর থেকে ভেসে আসা জোড়া ভগ্নীর কথোপকথন কানে পাই। যেমন কিনা—বড় ভগ্নী প্রশ্ন করেন, তোর জমিজমা, খাজনাপত্তর আদায়, এ সব তো কম হ্যাপা নয় শৈল। তা দেখাশোনা করবার গোমস্তাপত্তর আচে তো?

ছোট ভগ্নীর জবাব, শোনো দিদি, বিষয়পত্তর তো তোমার ভগ্নীপত খুব একটা কম রেকে যাননি। লোক লস্কর কিছু আচে বৈকি। কিন্তু সে সুমুন্দিদের হাতে সব ছেড়ে দিয়ে বসে রইলে সব ও কম্মো হয়ে যাবে। তাই নিজেকেই চৌপরদিন নজরদারী করতে হয়।

—তা ভালো। তা ভালো। নিজেব জিনিস, নিজ হাতেই নাড়াচাড়া করা ভাল।

—হুঁ, শ্বশুরের সম্পত্তি বলে কতা। তবে ধর্মে বোষ্টম হলেও আমার শ্বশুর লোকটি শুনিচি মহা ডাকাত। লুটতরাজ তাঁর পেশা ছিল।

—তা লুটের ধন ভোগ না করে বিলিয়ে দিলেই তো পারিস।

—কেন দেবো! সে কাজ তো আমার ডাকাত শ্বশুরই করতে পারতেন।

—কিন্তু, তোর তোর ছেলে নেই, পুলে নেই। চোখ বুঁজলে এত সম্পত্তি খাবে কে?

—নবদ্বীপের আখড়ায় আখড়ায় সব বিলিয়ে দিয়ে যাবো, হুঁ। ডাকাতের ভূ-সম্পত্তি বৈষ্ণব সেবায় লাগবে। ব্যাপারটা কেমন হবে বল দিকিনি।

বড়মা বুঝতে পারে কথা এবার গোলমেলে খাতে বইছে। তাই ভিন্ন কথায় গিয়ে বলে, থালে কাল সকালে কি গঙ্গা নাইবি?

সকাল কেন ভোর হতেই বাড়িতে শোরগোল পড়ে যায়। আমাদের নতুন বড়মা গঙ্গা চানে যাবেন। রিকশো হাজির। আর হাজির আমি, রামশরণ কাকা আর কামিখ্যে কাকা। নিয়ে যাবে আমাদের পাড়ার চেনা রিকশা চালক অনিল কাকা। আমাদের নিজের বড়মাকে কালেভদ্রে গঙ্গায় যেতে দেখেছি। তাছাড়া এই প্রায় একশো বছরি অবস্থায় আর এত পথ যাওয়া হয়ে ওঠে না। সেই জন্যেই তাঁর বক্তব্য, গঙ্গা থেকে দু-ক্রোশ তো গঙ্গা ক্ষেত্তর। সেখেনেই তো বাস কচ্চি দিবানিশি।

নতুন বড়মার সঙ্গে রিকশায় কামিখ্যে কাকা। পদতলে একধারে রামশরণ কাকা, আর একধারে আমি। রিকশা চলেছে আমাদের হালিসহরের এবড়ো খেবড়ো, ইট বার করা দোমেটে রাস্তা কপ্‌চে। সেই সঙ্গে এই রিকশা বরাবর বিচিত্র সব কথোপকথন হয়ে চলেছে।

চালক অনিলকাকা, তাইলে ঠাকুরমা, আপনে এই পরথম হালিসহরে আসলেন, কী কন।

—এই প্রথম। এই শেষ। বাব্বা, এমন রাস্তায় চলাফেরা করা কি যে সে কম্ম। মাজার আর কিছু থাকে না।

বড়মার পাশে উপবিষ্ট কানে খাটো কামিখ্যো কাকা কিন্তু জবাবটা শুনে ফেলে।

—এতখানি রয়েছে আপনার মাজা। এ কি কম কতা খাক্‌মা।

রামশরণ কাকা মন্তব্য করে, উমর হোলে কি হোবে, ঠাকুরমার মাজা বহুত চাঙ্গা আছে।

বড়মা, আরে মরণ মিন্‌সে মেড়োর। আমার মাজা নিয়ে তোকে কে প্রবন্ধ লিখতে বলেচে রে।

কামিখ্যে কাকা, খাকমার মাজা নিয়ে কতা কয়ে লাভ কি রামছরণ দাদা। তার চেয়ে একটা ছুক্‌রির মাজা ধরো না।

বড়মা, হংসঃ শ্বেতো বকঃ শ্বেতঃ কো ভেদো বকহংসয়োঃ।

কামিখ্যে কাকা, বাপ্‌রে, হংস মানে হাঁস, আর বক মানে তো ছবাই জানে।

বড়মা, কিন্তু শ্লোকটার মানে তোরা দুই মুখ্যু জানিসনে।

অনিলকাকা, অর্থডা কি কন।

বড়মা, হাঁসও শাদা, বকও শাদা। দুটিকে দূর থেকে দেখতে একইরকম লাগে। তাহলে ওদের তফাৎটা কোথায়?

আমি আর চুপ করে থাকতে পারি না। কেন না আমাদেব বাড়িতে বাবার পোষা হাঁসগুলোর কাজকারবার থেকে এ অভিজ্ঞতাটা আমার আছে। আমি নতুন বড়মার পদতলে বসে বলে উঠি, হাঁস দুধে জল মিশিয়ে দিলে, জল বাদ দিয়ে দুধটুকু খেয়ে নিতে পারে।

বড়মা আমার মাথায় মৃদু একটি মৃদু গাঁট্টা কষিয়ে বলে ওঠেন, হুঁ, হুঁ। বটে, বটে। নীরক্ষীর বিভাগে তু হংসো হংসো বকো বকঃ॥

রামপ্রসাদের ঘাটে চান করতে নামার পথটা বেশ খাড়াই থেকে চালু। সেই সঙ্গে

অতীব এবড়ো খেবড়ো। বয়স্ক, অচল মানুষকে খুব সাবধানে নামতে হয়। ঘোষপাড়া রোড— পীচ রাস্তা থেকে সাবেক গঙ্গাপথ নেমে গিয়েছে নব্বই ডিগ্রী না হলেও বেশ খাড়াই। খানিক নেমে ডান হস্তে বহু প্রাচীন ঝুরি ঝুলন্ত মস্ত বটবৃক্ষ এক। তার নীচে ভগ্ন জীর্ণ মুড়িকোটা কিংবা সাজানো কথায় যাকে বলে, সেকালের অন্তর্জলি যাত্রার প্রতীক্ষালয়। মুমূর্ষু মানুষ এখানে মরণকে দেখবে বলে অপেক্ষা করত। এই ঘরখানির পেছনে পাহাড় সমান বালির আণ্ডিল। কুণ্ডু কোম্পানীর ব্যবসা। এই নামো পথের দুধারে অন্ধ-খঞ্জ ভিখিরিরা পরপর বসে আছে সুমুখে গামছা বা ট্যানা বিছিয়ে। কেউ খঞ্জনি ঠুকে গীত গাইছে। কেউ আবার, দুটি ভিক্ষে দাও গো—। ইত্যাকার অবস্থা বিরচিত সকাল বেলার নদীঘাট বেয়ে নতুন বড়মাকে ধরে পাকড়ে আমরা নিচে নামছি। সামনে দেদার গঙ্গা কলকল করে ডাকছে আমাদের। নতুন বড়মা নামতে নামতে বলছেন, দিবারাত্রৌ চ সন্ধ্যায়াং গঙ্গায়াঞ্চ প্রসঙ্গতঃ। স্নাত্বাহশ্বমেধজং পুণ্যং গৃহেহপ্যুদ্ধৃতজ্জলৈঃ॥

দিবা, রাত্রি কিংবা সন্ধ্যাকালে কিংবা অন্য কোনও উদ্দেশ্যে গঙ্গায় স্নান করলে অশ্বমেধযজ্ঞসম ফল লাভ হয়...

মধ্যরাত পার হওয়া কি এক বিষাদগ্রস্ত প্রহেলিকা মগ্ন হয়ে আছে এই রাজার নিভৃত আলাপ কক্ষ বরাবর। নদীয়া অধীপ শ্রীমন্মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, যিনি অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী যজ্ঞের সমীপবর্তী, ভবিষ্যতের মহা খেতাব নাম উল্লেখমাত্র এমনই অভিপ্রায়, আজ বুঝি দেশকালের ভারী দুর্দিন প্রসঙ্গে একমাত্র নিভৃতে যে কথা বলতে পারার পাত্র ও সখা এই সেনজ রামপ্রসাদ সুমুখে উপস্থিত, তাঁর কাছে সব অকপটে বলা মানে বুকের পাথরে আরও একখানি নিঃস্বার্থ অথচ সহমর্মী বুক প্রাপ্তি। সংসারে এমন সুযোগ কদাপি ঘটে। দিনে ও রাতে মহামহিম রাজসভাতলে যাঁরা তাঁকে ঘিরে থাকেন, সেই পাত্র, মিত্র, অমাত্য, পণ্ডিতবর্গকে সরিয়ে রেখে এই প্রসাদ সত্যিই ভারী অভিনব ভার লাঘবী আধার। এমন সান্নিধ্য পেয়ে রাজা আজ সত্যিই অন্তরে কৃতকৃতার্থ।

দুরে, প্রাচীরের প্রহরাকক্ষে রাজরক্ষী পেটা ঘণ্টায় রাত্রির অগ্রবর্তী সময় হাঁকল। সেই গম্ভীর মন্দ্রস্বরের অদূরে রাজা একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করে আবার উচ্চারণ করলেন, মনসুরোল-মোলক্-সিরাজদ্দৌলা শাহকুলী খাঁ মিরজা মাহম্মদ হায়বৎজঙ্গ বাহাদুর।

রামপ্রসাদ চোখ তুলে তাকান রাজার বিষণ্ণ সুচিন্তিত মুখে। সেখানে এই বিরাম কক্ষের ম্লান দীপালোক জম জম করছে, যেন বা এই সেদিন রাত্রির জলপথে দেখা গঙ্গার বিস্তৃত আর অপার রহস্যাবলী। মনে হয় এ রহস্যের মুখপাত সদ্য না হলেও এমন কিছু দূর অতীত নয়। আপাততঃ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এবং সেনজ রামপ্রসাদের দৃষ্টি সেই যৎকিঞ্চিৎ অতীতাভিমুখে। হায়, অতীত নিছক অতীতই নয়। তার গর্ভকথায় কত না বোধন, কত নিবঞ্জন।

আজ এই ঘোর রজনীর নিস্তব্ধ মুহূর্তে কবি প্রসাদ ভাবী নিঃসহায় প্রত্যক্ষ করছেন বঙ্গদেশের উপ অধিকারী, ভারী শুভচেতধী এই মহারাজটিকে। এই রাজার নামাঙ্কন বৈষ্ণবরসরাজ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাড়িত হলেও আদপে তিনি রামপ্রসাদের রীতিতেই তন্ত্রাধ্যায়ী। এবং সেই মানুষ আজ জন্মভূমির ভাবনায় নিভৃতে কি কূটই না পীড়িত। সেই যাতনার নেপথ্যচারী কি বিচিত্র বিমূর্ত গাথা। সেই প্রশ্নাবলি বিলম্বিত অগণ্য কবিতানিচয়

মধ্যরজনীর এই গভীর অন্ধকারে পক্কাভ আঙুর ফলের মতো দুলদুল, টলটল করছে। বলা বাহুল্য, খুব স্বাভাবিক কারণেই রাজার পাদভূমির চিন্তাও এখানে ঘোরতর। অস্তিত্বের দোলাচল প্রমেহ তাঁকে ব্যাকুল করে রেখেছে।

সদাশিব কহিলেন, হে মহাভাগে দেবী, তোমা হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, তুমি জীবের জননী। হে ভদ্রে, মহত্তত্ত্ব হইতে পরমাণু পর্যন্ত এবং সমস্ত চরাচর সহিত এই জগৎ তোমা হইতে উৎপাদিত। এই নিখিল জগৎ তোমা হইতে উৎপাদিত। এই নিখিল জগৎ একমাত্র তোমারই অধীনে আবদ্ধ।

ত্বমাদ্যা সর্ব্ববিদ্যানামস্মাকমপি জন্মভূঃ।

ত্বং জানাসি জগৎ সর্ব্বং ন ত্বাং জানাতি কশ্চন॥

তুমি সমুদয় বিদ্যার আদিভূত এবং তুমিই আমাদের জন্মভূমি...

জন্মভূমি, জন্মভূমি, জন্মভূমি। বারত্রয় এই চতুর্বর্ল্লী শব্দটি উচ্চারণ করেন প্রসাদ। এই সামান্য শব্দ ও তার অস্তিত্বই এখন রাজন্ ও প্রসাদের আশ্রয়গত। যাবতীয় ভাবনাচিন্তা, দ্বিধা, মনস্তাপ, সকলই এই চারটি মাত্র আখরাভিমুখী।

জন্মভূমির জের, বহু দূরে ভারতভূমির দিকে অবধারিতভাবে যাত্রা করে। সেই শূন্য যাত্রাপথের নিশানমুখে আপাততঃ রাজচিন্তার অতীত কেবলমাত্র একখানি জাগ্রত মাতৃমূর্তি, যা বুঝি আসলে বিমূর্ত, মাতৃকাযন্ত্র। মন্ত্রাণাং মাতৃকাযন্ত্রাদুদ্ধারো জননং স্মৃতং। মাতৃকাযন্ত্র হতে যে মন্ত্রবর্ণ সকল উদ্ধার করা তাকে জনন বলে। তার পরে পরেই ক্রমে আছে জীব সাধনের পর্যায়ধারা, জীবন, তাড়ন, বোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ—ইত্যাদি। কিন্তু আপাতত এই সকল যাবতীয় ভাব অতিক্রম করে একটিমাত্র সত্য প্রসাদের সুমুখে দাঁড়িয়ে আছে। তার নাম জন্মভূমি। এই চারআখরি শব্দটিকে মনোহর ঘিরে আছে অসংখ্য রক্তজবা ফুলদল। সেই ফুলের শোভা হতে চন্দনোদকের তাড়না মুখরিত হচ্ছে। আহা, দেশজননীর কী সুগন্ধ!

সেই সুগন্ধের রঙ্গ ভারী কম নয়। জননী কখন কী ভেবে বসেন সে কথা আগেভাগে আঁচ করা দেশের সন্তানদের পক্ষে বাতুলতা। দেশ মা কখন কী ভাবেন, কখন কী নিদান হেঁকে বসেন তা সমঝানো স্বপ্ন অতীত। সেই খেয়ালেই রামপ্রসাদের মনে পড়ে ১৭৩৭ সালের স্মৃতি। তখন প্রসাদ সজীব সতের বছুরি কিশোর। হালিসহরেরই এক বৃদ্ধ, নবজীবন কবিরাজ মহাশয়, সপরিবারে গঙ্গাসাগর গিয়েছিলেন মকরস্নানের আগে, আশ্বিন মাসে। হালিসহর থেকে নৌকায় চড়ে সেই যাতায়াত ঘটেছিল। ঘটেছিল অকাল সাগর স্নান। আর সেই অসময়েই এক রাতে সাগর জলে মহাপ্রলয় ঘটে গেল। হঠাৎ এক প্রবল ঝটিকা সমুদ্রগর্ভ হতে জন্ম নিয়ে ধাবিত হল বিপুল বেগে উত্তরাভিমুখে। সেই ঝোড়ো তাণ্ডবের ভোঁতা তীর উত্তবে প্রায় একশত ক্রোশ এলাকা ছিন্নভিন্ন করে দিল মুহূর্তে। সেই সঙ্গে ঘটে গেল এক চাপা ভূমিকম্প। কলিকাতা নগরীর বুক ফালা ফালা হয়ে গেল। প্রায় দুইশত ইঁটের তৈরি বাড়ি একেবারে বিচূর্ণ হয়ে গেল। কোম্পানির গির্জার মস্ত চূড়া উপড়ে মাটিতে গিঁথে গেল। ভাগীরথীর উপর নাকি বিংশতিসহস্র জাহাজ নৌকাদি ধ্বংস হল। ইংরেজদের নয়খানি জাহাজেব মধ্যে আটখানি লোকলস্করসহ বিনষ্ট হল। ৬০ টন বোঝাই নৌকাগুলি গাছের মাথা টপকে এক ক্রোশ দূরে পতিত হল। গঙ্গার জল চল্লিশ ফুট উচ্চে লম্ফ দিল। লক্ষাধিক মানুষ মরণ দেখল। আর ঠিক তারপরের

বৎসর দুর্ভিক্ষ এসে দুয়ারে দাঁড়াল। তারপর থেকেই, বোধহয় এমন এক নমুনা নিদানের মারফৎ দেশের মানুষের শাসনযন্ত্রের উপর আগামী বহুতর ঝাঁকুনির ইশারা দাগা হয়ে গেল। দেশের মা থাকে থাকে অপরিচয়ের সম্পর্ক জারি করে মনে করিয়ে দিতে লাগল, সে যে কৃতান্ত দলনী শ্যামা, বড় ক্ষেপা মেয়ে।

নিজেরই রচনা কোনও একখানি গীতের একখণ্ড উড়ে এল মনে মনে, এখন, ঠিক এ পর্যন্ত এসে। আর এখান হতেই অতীতকাল থেকে উড়ে এল একখণ্ড নামের আলো আঁধার, জাফর খাঁ নাসিরী। কী বিচিত্র জীবন এই মানব সন্তানটির। সেই আলো এবং কুয়াশা আঁধারী মানুষটি যে আদপে দাক্ষিণাত্য নিবাসী জনৈক সুদরিদ্র ব্রাহ্মণের পুত্রসন্তান। দরিদ্র পিতা বালকপুত্রকে বাধ্য হয়ে বিক্রয় করলেন ইস্‌পাহান নগরের এক বণিক হাজি সফীর কাছে। সেই বণিক বালকের নব্য নামকরণ করলেন মহম্মদ হাদী এবং তাকে সঙ্গে করে নিজ দেশে নিয়ে গেলেন। বলতে গেলে, এখানেই ইতিহাসের পাকে নতুন এক গ্রন্থী জন্ম নিল। এখানে অবশ্যই ঘোষিত হল, হাজির পুত্রগণের দ্বারা বালকের দাসত্ব মোচন। বালকের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দেখে হাজি সাহেব তাকে দাসত্বে না জুতে নিজ সন্তানবৎ লালনপালন করে লেখাপড়া শেখাতে লাগলেন। দয়ালু বণিক বৃদ্ধ হয়ে যখন মারা গেলেন তখন হাদী স্বদেশে ফিরে এলেন। সুবে বেরারের দেওয়ান হাজি আবদুল্লা খোরাসীনের অধীনে রাজস্ব দপ্তরে একটি যৎকিঞ্চিৎ কাজ নিলেন। পরিশ্রমী, উদ্যোগী ছেলে ক্রমে একদিন হায়দরাবাদের দেওয়ান বনলেন। আর সেই সূত্রেই দাক্ষিণাত্য প্রবাসী বাদশাহ আরঙ্গজেবের দরবারে পরিচিত হলেন। বাদশাহ তাঁর গুণগ্রাহী হয়ে পড়লেন অচিরেই। তাঁকে কারতলব খাঁ উপাধি আর মন্‌সবি বা সেনানায়কত্ব প্রদান করে দেওয়ানি পদে তুলে ধরলেন। পরে বাংলার দেওয়ানের পদচ্যুতির পর তিনি বঙ্গের দেওয়ান হয়ে এলেন। সেই ব্রাহ্মণ সন্তানটির ললাটচক্র কোথা থেকে কোথায় ঘুরতে লাগল তা কি তিনি নিজে কল্পনাও করেছিলেন। গরিব বামুনের ছেলে, চতুষ্পাঠী-যজমানি করবার বাঁধা বরাত ফেলে রেখে, চাল-কলা হবিষ্যির বরাদ্দকৃত জীবনে গঙ্গাস্নান, শিখাবন্ধন, জপ আহ্নিকাদি, গোময়, চন্দনতুলসী দূরে এড়িয়ে রেখে, বাংলার সিংহাসনের দিকে ধাবিত হলেন। কালক্রমে তিনি স্বনামে প্রকাশিত হলেন। সেই নাম—মুর্শিদকুলী খাঁ—আজও ভাগীরথীর স্রোতঃপুঞ্জে কী অমলিনই না বয়ে চলেছে।

মুর্শিদকুলী, মুর্শিদকুলী হতে নবাবের ঘোষণা মোতাবেক, রাজধানীর নব নামকরণ হয়ে বসল মুর্শিদাবাদ। অথচ বুদ্ধিমান এই মানুষটি নগরীর পূর্ব নামটিকে এমন কিছু বিকৃত করেননি। লোকশ্রুতি বলে, মুখ্‌সুস খাঁ নামে এক ডাকসাইটে ব্যবসায়ী একদা এই মুখসুসাবাদের নামকারী। তবে মাঝখানে এক বৈষ্ণব মুকসুদন দাসের নাম উড়ো পাতা উঠে এলেও পরে তা আবার উড়ে যায়। আবার এ কথাও বহাল আছে যে বাদশাহ আকবরের কালে এই নগরী বনেছিল। সেই কালে বাংলার এক শাসক মুখ্‌সুস খাঁর নাম থেকেই নগরীর নাম।

কিন্তু এত সব কচকচানি সরিয়ে রেখে সেই গরিব বামুনের ছেলেটির কথাই যে ঘুরে ফিরে মন পড়ে। পিতৃদত্ত কী নাম ছিল তার? মধুসূদন? মদনমোহন? মুরলী? সে যাই হোক, এই নবাব মানুষটি ভারী কেজো ছিলেন। রজনীতে সামান্য নিদ্রা আর অতীব ধর্মাচারী মুসলমান। যথানিয়ম নমাজ, ব্রতপালন, নিজ হাতে প্রতিদিন কোরাণ লেখা, দুই

সহস্র কোরাণ পাঠকারী রাজধানীতে বহাল রাখা, তসবীমালা জপকারীদের মজুদ করা, রবিয়ল্. আওয়েল মাসের প্রথম দ্বাদশ দিবস গরিব মানুষকে করজোড়ে পান ভোজনে আপ্যায়ন। ওই সময় মাহীনগর থেকে লালবাগ—ভাগীরথীর দু'তীর আলোকমালায় সাজানো হত। ভাগীরথীর স্রোতে ভাসিয়ে দেওয়া হত ছোট ছোট কাগজের নৌকায় অজস্র দীপমালা।

পাশাপাশি প্রজাপালক এই নবাব ভারী সুপণ্ডিত। গণিতশাস্ত্রে দক্ষতার ফলে নবাবী হিসাব নিকাশ নিজহস্তে। নবাবের যাবতীয় দস্তখত হত লালকালিতে, সেইসব সেরেস্তার পাতে পাতে। সেই রক্ত লিখনের তদবিরে শাসন কাজ চলত। একবার হুগলির কোতোয়াল এমানুদ্দিন্ এক মুঘল কন্যাকে বলপূর্বক অপহরণ করলে নবাব কোরাণের হুকুম পালন করে সেই পাষণ্ডকে পাথর মেরে হত্যা করার আদেশ দিলেন।

তাহলে ঘুরেফিরে মনে মনে ঘণ্ট পাকায়—কী নাম ছিল সেই বামুনের ছেলেটির? গলায় যজ্ঞ-উপবীত ধারণ করে তার বলবার কথা ছিল, পশ্যেম শরদঃ শতম্, জীবেম শরদঃ শতম্॥ হে সূর্য, তোমায় শত বৎসর দেখব, শত বৎসর বেঁচে থাকব। তার বদলে তার ললাট লিপি তাকে কঠোর নমাজী মুসলমান করে দিল। আহা, সে কি জানত, আল্লা শব্দটির সঙ্গে অথর্ববেদের অল্‌লাহ, অল্ল-ল্লা-অর্থে পরমেশ্বরের কী সাযুজ্য। ঈশ্বর আর খোদা, হিন্দু মুসলমানী মানুষী কায়দায় পড়ে ভারী গোলমাল রচনা করে চলেছে সেই কোনকাল থেকে। আহা, সেই কথাগুলি কি হিঁদু মোচলমানগণ কদাপি কানে শুনেছে। সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং ব্রতং সহ চিত্তমেষাম্। তোমাদের মন্ত্র এক হোক, তোমাদের কর্ম প্রবৃত্তি এক হোক। তোমাদের অন্তঃকরণ এক হোক। শুনলে কি আর দেশজোড়া এমন ডামাডোল, হিন্দু-যবন কাটাকাটি, দ্বন্দ্ব থাকত!

কৃষ্ণচন্দ্র বললেন, নবাব মুর্শিদকুলী কাঠ্‌রা মসজিদ বেঁচে থাকতেই নির্মাণ করেন। ওখানে মসজিদের প্রবেশ দ্বারের সিঁড়ির নিচে তাঁকে কবর দেওয়া হয়। তাঁর বাসনা ছিল, মসজিদে আগন্তুক মানুষজনের পদধূলি তাঁর কবরস্থানের উপর যেন পড়ে। মসজিদ দুয়ারের উপর এক অভিরাম পারসী কবিতা লেখা আছে।

রামপ্রসাদ বলেন, হুঁ, সেটি আমার মনে আছে।

—বলো দেখি একবার শুনি।

—স্বর্গ ও মর্ত্য উভয় লোকের গৌরব, আরবের মহম্মদের জয়। যে ব্যক্তি তাঁর দ্বারের ধূলিও নয়, তার মস্তকে ধূলিরাশি বর্ষিত হোক।

রাজা বলেন, সমানীব আকুতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ। সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥

প্রসাদ হেসে কন, তোমাদের সংকল্প একরূপ হোক, হৃদয় এক হোক, মন সমান হোক...

রাজা বাইরের অন্ধকারে চোখ পেতে দেন, ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে ওই মসজিদ নির্মাণ শেষ হল। মুর্শিদকুলী এর দুবৎসর পরে গত হন।

চব্বিশ

মুর্শিদকুলীর পরের কথা, বাংলার সমাচার, সে সবই আজ জনসুমুখে হাট করা। তারপরের হাল হকিকত, সরফরাজ খাঁর নবাবী, ইত্যাকার ইতিহাসও আজ শাদা কথা। এই সরফরাজ বাংলার মানুষের কাছে যৎপরোনাস্তি বিস্মৃত হওয়ার পাত্র। তাঁর জীবনযাপন, রাজ্যশাসন, বাংলার কৃষ্ণবর্ণ অধ্যায়। তাঁর পিতা নবাব সুজাখাঁর আমলে বাংলার শাসনকালে একজোড়া নাম উঠে পড়েছিল। তাঁরা হলেন হাজি আহমদ আর আলিবর্দী খাঁ। তাঁরা সুজা খাঁর দখিন হস্ত হয়ে দাঁড়ান। মুর্শিদাবাদী মন্ত্রণা ভবন থেকে এই দুইজনা উড়িষ্যা ও পাটনার রাজকাজে নিযুক্ত হন।

সরফরাজ সম্বন্ধে ভালো-মন্দ দুটি কথাই বর্তমান। যথা, তিনি রাজকাজ কিছুই বুঝতেন না। তাঁর ধর্মের বাহ্য ঘনঘটা থাকলেও তিনিও তাঁর বাপের মতো লম্পট ছিলেন। হরেক প্রমোদভবনে তাঁর পনেরো শত প্রমোদরমনী রক্ষিত ছিল। উপপত্নীর ব্যামো হলে তিনি উপবাস রোজা অবস্থায় মানত সহ মাথায় কোরাণ ধারণ করে রোদে দণ্ডায়মান রইতেন। ফলে, এমত যে মানুষের শ্রীহস্তে বাংলার মানুষের ভাগ্য সমর্পি্ত, সেখানে ভাল কি আশা করা যেতে পারে! তাই যা হওয়ার তাই হল। পাটনার নবাব বলে পরিচিত আলিবর্দী খাঁ অতি কৌশলে বাংলার নবাবীর দিকে ধাবিত হলেন। তাঁর পশ্চাতে জনবলও এসে দাঁড়াল। গিরিয়ার মাঠে জোড়া নবাবের যুদ্ধ ঘটল। সরফরাজ ধ্বংস হলেন। আলিবর্দী বাংলার সিংহাসনে উঠে পড়লেন।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও রামপ্রসাদের মধ্যে অঘোর রাত্রির এমত সব আলোচনার ফাঁকে রাজার গড়গড়ার তামাক-টিকা বারকয় পাল্টে দিয়ে গেল খাস চাকর কালীকুমার। কিন্তু প্রসাদের প্রিয়, একমাত্র দমদারী তরল বস্তু এখানে এই রাজসমীপে অচল। ফলে শুষ্ক কণ্ঠেই কথা চালাচালি। ইতিহাসের দরকচা রপটা রপটি।

কৃষ্ণচন্দ্র বলেন, প্রসাদ, মন ভার হচ্ছে ক্রমে। কিন্তু তোমার পানা বন্ধু স্বজন পেয়ে আমি নিজেকে কিঞ্চিৎ লঘু কর্বার চেষ্টা করছি।

প্রসাদ হেসে কন, আমার সৌভাগ্য মহারাজ।

—বেশ, মনোভাব যাতে করে খানিক লাঘব হয় এমন একখানি গান বল না। একটু কান পেতে শুনি।

—মহারাজ, কান পেতে না মন পেতে।

—কেন! এ বিষয়ে কি তোমার কোনও সংশয় আছে?

—তাই বা কি করে বলি! এ ভারী কঠিন প্রশ্ন করলেন যে।

মাঝরজনী পার এক প্রগাঢ় সময়ের আলোচনা আর প্রত্যালোচনার উপর বলতে গেলে দুই পায়ে দাঁড়িয়ে প্রসাদ-কৃষ্ণচন্দ্র একবার মৃদু দীপ আলোয় পরস্পরের মুখাবলোকন করেন। দুই সুজটিল মনুষ্য চরিত্র সংসারের তথাকথিত স্বাভাবিকতার বহু উর্ধ্বে এই শান্ত রজনীর নক্ষত্র তারকা নিন্দিত অঘোর শূন্যমণ্ডলে এক জোড়া রহস্যময় ছায়া মূর্তি যেন বা।

রাজা কন, তুমি যে কবি প্রসাদ। তোমার হৃদয়, চক্ষু যে আর পাঁচজনার চেয়ে

আলাদা। এ ভূ-মণ্ডলে তো চিরকালই কবিদের হাতে ভুবনের বোঝা। তোমায় আমি আর কি খোলসা করে বলব বলো।

প্রসাদ গবাক্ষ পথে বাইরের আঁধারে তাকান। চেয়ে দেখেন রাত পাহারা তারাদল। অগণ্য মিট মিট, আলোকময় দীপমালা। গ্রহ-নক্ষত্রাবলি—কোনও দূর অন্তর্জগতের ভাষাহীন শব্দতরঙ্গ, যার অন্দরের কথা বোঝা সহজ নয়। সেই অপার জটিলতার দিকে চোখ রেখে রামপ্রসাদ বলে ওঠেন, মহারাজ, তাহলে বলি, আমার যে প্রতি পদে সংশয়।

রাজা বলেন, কিন্তু কবি কালিদাস যে বলছেন, অসংশয়বিনাশাৎ সংশয়-বিনাশঃ শ্রেয়ান্।

—আজ্ঞা তিনি তাঁর মতো বলেছেন, অসংশয় বিনাশের চেয়ে সংশয়ের বিনাশ হওয়া ভাল। কিন্তু আমার যে এ জন্মে সংশয় কাটবে না তা আমি ভাল করেই জানি।

—ভাল বলেছ। কালিদাসের সঙ্গে তোমার এখানেই তফাৎ। ফলে তুমি হলে গিয়ে সংশয়ের কবি।

—কে জানে, হয়তো সংশয় ঘুচে গেলে আমার কবিতাও ঘুচে যাবে।

—বেশ, তাহলে একখানি কবিতাই বল সুরে সুরে।

প্রসাদ মাথা হেঁট করে নিজের বুকের পানে দেখেন। এই জটিল দীপের আলোয় সেখানকার রক্তাভা দিব্য প্রকট হচ্ছে। প্রকাশ হচ্ছে ওই স্থানের থেকে থেকে কম্পমানতা।

প্রসাদ বলেন, যদিও এখন মুলতান রাগিনীর সময় নয়, তবুও মুলতানেই বলি।

—বলো প্রসাদ। তোমার ইচ্ছাতেই রাগ-রাগিনীরা খেলাধুলো করুক।

রামপ্রসাদ দু'চোখ মোদেন। তারপর প্রথমে সামান্য গুনগুনিয়ে নিজের ভিতরে মুলতানকে আবাহন করে সুরে বলে ওঠেন,

কাল মেঘ উদয় হল অন্তর অম্বরে।
নৃত্যতি মানস-শিখী কৌতুকে বিহরে॥
মা শব্দে ঘন ঘন গর্জে ধরাধরে।
তাহে প্রেমানন্দ মন্দ হাসি,
তড়িৎ শোভা করে॥
নিরবধি অবিশ্রান্ত নেত্রে বারি ঝরে।
তাহে প্রাণ চাতকের তৃষা ভয় ঘুচিল সত্বরে॥
ইহ জন্ম, পরজন্ম, বহুজন্ম পরে।
রামপ্রসাদ বলে আমার জন্ম,
হবে না জঠরে॥

কৃষ্ণচন্দ্র অবাক স্বরে বলে ওঠেন, এ গান এমন করে রচলে কেন প্রসাদ! কোথায় যেন যুদ্ধের আভাস টের পাওয়া যাচ্ছে তোমার এ গানের ফাঁক ফোকরে!

—তা তো জানিনে মহারাজ।

—গান, কোথা থেকে, কেমন করে হয় তুমি জানো না প্রসাদ!

—তাহলে তো সকল সংশয়ের অবসান হয়ে যেত।

কৃষ্ণচন্দ্র আনমনে বলে যান, কাল মেঘ উদয় হল অন্তর অম্বরে। নৃত্যতি মানস-শিখী কৌতুকে বিহরে॥ কাল মেঘ না কৃষ্ণবর্ণ মেঘ! কোনটা সত্যি?

—জানিনে মহারাজ। তবে আপনার মহাকবি কালিদাসই বলে বসে আছেন, দুবস্থমপি চারচক্ষুঃ পশ্যতি রাজা। রাজা চার-রূপ চক্ষু দিয়ে দুরের সব বিষয় দেখতে পান।

রাজা এবার পরিপূর্ণ চোখ রাখেন রামপ্রসাদের প্রতি। তারপর একটি লম্বা শ্বাস ফেলে বলে ওঠেন, আলিবর্দী খাঁ সিংহাসনে বসলেন প্রভূত ভাগ্য সহকারে। নবাব মুর্শিদকুলীর সময় থেকে সঞ্চয় করে রাখা অগাধ ধনরত্নের মালিক হয়ে তিনি বাংলার অধীশ্বর হলেন বলতে গেল যেন এই তো সেদিন—অর্থাৎ ১৭৪১ সনে।

রাত্রির সময় তাড়নার সঙ্গে সঙ্গে রাজার স্মৃতি কথায় বাংলার এখনকার নবাবীপর্ব বয়ে চলে। কথা হয়, এই নবাব আলিবর্দী হিন্দু, মুসলমান দুটি সম্প্রদায়েরই প্রিয়জন। তিনি পবিত্র, শান্ত, উৎসাহী, ন্যায়ধর্মী আর ধর্মভীরু নরপতি। তিনি হিন্দুদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল। কথিত আছে, যখন তিনি পাটনার নবাব সে সময় এক হিন্দু সাধু নাকি তাঁর সিংহাসন লাভের কথা গণনা করে বলে দিয়েছিলেন। সেই হিসেবে, সিংহাসনে বসে রাজস্ব বিভাগের পুরোদস্তুর ভার তিনি ডাকসাইটে নায়েব চিন্ময় রায়ের হস্তে তুলে দেন। এই রায় মহাশয়টি মুর্শিদকুলীর জায়গিরে সামান্য মোহরের কাজ থেকে শুরু করে নিজের বুদ্ধিবলে পূর্বের দেওয়ান আলমচাঁদের সহকারী হন।

এই নবাব আলিবর্দীর তিনটি মাত্র কন্যে। কোনও পুত্র নেই। নবাব যেকালে পাটনার শাসনভার পান সেই মহাক্ষণে তাঁর এক মেয়ে আমিনা বেগমের গর্ভে মিরজা মোম্মদ নামে এক দৌহিত্র জন্মায়। নবাব সেই শুভদিনে সেই নবজাতককে পোষ্যপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। সেই স্নেহপুত্তলির নামই তো সিরাজ। এই বালকই যে একদিন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার মসনদে বসতে পারে এ কথাই এখন জনগণের মুখে ফিরছে। আর সেই বালক তখনই ঘোষণা দিয়ে বসে আছে যে সে এক ক্ষুদ্র নবাব।

যেহেতু এই সিরাজ মাতামহ আলিবর্দীর স্নেহ পুত্তলিকা, তাই নিয়ম-বেনিয়মের ঘুর পথে, পুত্র সন্তান না থাকার সুবাদটিও কম নয়, নাতিটি একপ্রকার চাঁদ চাওয়া ছেলে হয়ে বিরাজ করতে লাগল। সে যা চায়, তাই পায়। কোনও কিছুই তার কাছে অকুলান নয়। এমনকী, এই বালক অতি সুবুদ্ধিধর, প্রায় বন্য শার্দুলের। বাইরের অনিন্দ্য মুখখানি, জল ঢালা কিছু বুঝি না, কিছু জানি না বালক, কিন্তু অন্দরে শার্দুলবৃত্তিধর।

কিন্তু বাংলার বর্তমান বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দীর কোনও তুলনাই হয় না। তাঁর স্বভাবে ভারতীয় প্রাচীন ঋষিকুল। মৌলভী-পণ্ডিতে যার যার আচারধর্ম পালনে কোনও বিসম্বাদ নেই। নবাবী বিচার কার্যে অকৃত্রিম সাম্য। তবে রাজসভায় নৃত্যগীতের তেমন অবসর নেই। বারাঙ্গনারা নবাবের সিংহদ্বার পার হতে পারে না।

এমত শান্ত পরিবেশে একজন বৃদ্ধের দিন অক্লেশে কেটে যেতে পারে। কিন্তু যুবা সিরাজের কাছে এই বদ্ধ গৃহকোটর সত্যিই অসহ। তাছাড়া এই সিরাজ কেবলই বিলাসমুখী আ বেআক্কেলে নয়। তিনি কুশলী যোদ্ধাও বটেন।

মাতামহের সঙ্গে বহু রণক্ষেত্রে তিনি ছায়ার মতো থেকে থেকে অস্ত্রবিদ্যাটিও দিব্য কবজা করেছেন। ছেলেকাল হতে সিরাজ মাতামহের সঙ্গে প্রায় প্রতিটি যুদ্ধ শিবিরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাছাড়া বছর বছর বর্গীর হাঙ্গামার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাঁর হাতে কলমে রণশিক্ষা ঘটেছে। কখনও আলিবর্দী, কভু রাজার আজ্ঞায় স্বয়ং সৈন্য চালনা করেছেন। দৌহিত্রটিকে এক কথায় রণপণ্ডিত করবেন বলে আলিবর্দীর তীক্ষ্ণ নজর ছিল।

কিন্তু এ সত্ত্বেও, নাগাড়ে দাদুর শীতল সঙ্গ সিরাজের কাছে দিন দিন দুঃসহ হয়ে উঠছিল। বুদ্ধিমান কিশোর অতএব তার জাল বিস্তার করল কৌশলে। সে একদিন সুযোগ বুঝে তার স্নেহান্ধ দাদুকে গিয়ে বলল, এক টুকরো জীর্ণ কম্বলে দশজন ফকির বছরের পর বছর বসে কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু একটিমাত্র প্রাচীন প্রাসাদে একজন বৃদ্ধ, আর একজন নবীন নৃপতি একত্রে বাস করলে ক্রমে পাঁচজনার কাছে বিষয়টি তামাশার হয়ে দাঁড়ায়। সিধামতি নবাব তৎক্ষণাৎ রাজধানীর কাছাকাছি প্রমোদকুঠি তৈরি করার আদেশ দিলেন। বাংলার সুরম্য প্রাসাদেতিহাসে এই হীরাঝিল কুঠি সত্যিই অনন্য। এই নিভৃত বিলাস ভবনে সিরাজ ডানা মেলে দিলেন বিলাস আর যাবতীয় প্রমোদে। অজস্র কুসঙ্গী জুটে গেল। ভবনের ঘরে ঘরে, ঝিলের জলে, বৃক্ষতলে, সবখানে তীব্র প্রমোদের ছররা উড়তে লাগল। কিন্তু বিলাস সাধন করতে গেলে অপরিমিত অর্থ প্রয়োজন। দাদুর কাছে বারে বারে চেয়ে চেয়ে যা মেলে সে ভারী কম না হলেও, কত আর ভিক্ষা চাওয়া যায়। ফলে এক ফন্দী করতে হল সিরাজকে। মাতামহকে পাত্রমিত্র সহকারে হীরাঝিল প্রাসাদে পদধূলি দেওয়ার নিমন্ত্রণ জানিয়ে পত্র লিখলেন। সে খৎ পেয়ে বৃদ্ধ নবাব তো আনন্দে তুড়িলম্ফ।

নবাব জানতেন না, ওই হীরাঝিল প্রাসাদে তাঁর জন্য কি কূট সর্প মুখ লুকিয়ে আছে। জানা ছিল না স্নেহান্ধতার ফল। সে সময় মুর্শিদাবাদে অনেকানেক রাজা-রাজড়া মজুদ ছিল। আলিবর্দী সকলকে ডেকে নিয়ে নাতি দর্শনে হীরাঝিলে উপনীত হলেন। আগমনমাত্র সমাদরের বন্যা। প্রমোদভবনের বাগানে কারুকাজ খচিত সোপানে, লাতপাতার নিকুঞ্জে, স্নিগ্ধ পাথরের বেদীতে সম্মানীয় অতিথিগণ-বিশ্রাম করতে লাগলেন। কেউ বা ঘুরে ঘুরে বহির্বাটির সুদৃশ্য সাজপত্তন দেখতে লাগলেন। অপরদিকে সিরাজ মাতামহকে একাকি প্রাসাদ দেখাতে নিয়ে গেলেন। আহ্লাদিত নবাব মহানন্দে আদরের নাতির নূতন আবাস ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন। নাতি সিরাজ এমনই সুযোগে, নবাব যখন একটি কক্ষে ঢুকেছেন, তখনই বাহির হতে দরজা বন্ধ করে কুলুপ এঁটে দিল। বৃদ্ধ নবাব প্রথমে এ কৌতুকের মানে বুঝতে পারেননি। তিনি তখন ওই বদ্ধ ঘরের এ দ্বার থেকে সে দ্বার —বাইরে বার হওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন। আদরের ধন দৌহিত্র তখন দ্বারের বাইরে দাঁড়িয়ে করতালি বাজিয়ে হা হা প্রতিধ্বনি তুলতে লাগল। সেই সঙ্গে হো হো অট্টহাস্য। নবাব বন্দী অবস্থায় ভিতর থেকে বারংবার দ্বার খুলে দিতে অনুরোধ করে যেতে থাকলেন। তার জবাবে বাহির হতে কেবলই হো হো হো হো...।

গঙ্গা স্নান সেরে বাড়ি ফেরার পথে রামপ্রসাদের ভিটে দেখবার কথা বলে রিকশাচালক অনিলকাকা। কেন না, সে জানে, আমাদের বাড়িতে নতুন অতিথি এলেই তাঁকে রামপ্রসাদে নিয়ে যাওয়া হয়। রামপ্রসাদের ভিটেতে—এত বড়ো কথাটা এখানকার কেউ বলে না। তার বদলে সংক্ষেপে 'রামপ্রসাদে'।

প্রস্তাব শুনে আমাদের নবদ্বীপি পণ্ডিত বড়মা কীরকম গম্ভীর হয়ে যান। তারপর বলে ওঠেন, না না, ও সব বীরাচারীর ভিটেটিটে দেখে আমি কি করব!

কামিখ্যকাকা ফুট দেয়, কেন খাকমা. ছাস্ত্রে বলেছে, যে কালী ছেই কেষ্ট।

—কোন শাস্তরের কতা কইচিস রে পাষণ্ড! তুই আমায় শাস্তর শেখাচ্ছিস!

—না না, ছে কি কতা। ছে কি কতা।

—তাড়াতাড়ি বাড়ি চল দিকি। আমার এখনও জপ আহ্নিক বাকি।

রামশরণ কাকা কেন জানি অকারণে গেয়ে ওঠে, যো হি আল্লা সোহি রাম, পতিতপাবন সীতারাম—

বড়মা জোরে জোরে উচ্চারণ করেন. হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ।

বাড়ি ফিরেই বড়মা আমাদের ভেতর রোয়াকে বাঁধানো তুলসী মঞ্চের সামনে বসে বেশ যত্ন সহকারে শিখাবন্ধন করেন। সঙ্গে কি সব বিড় বিড় মন্ত্রপাঠ। অদূরে উঠোনের বেলগাছ তলায় বসে সেই ট্যারা গেরুয়াধারী কুশাসন পেতে এক তামার ঘটি গঙ্গাজল নিয়ে তার ক্রিয়া করে চলেন। একই ভেতর রোয়াকের একধারে বাবার সূর্যকুমার দাদু কাঁপা হস্তে চায়ের গ্লাস পাকড়ে লম্বা লম্বা হুস্‌স্‌ হাসস্‌ চা পান করেন। রামশরণ কাকা উঠোনের কাঁঠাল তলায় উবু হয়ে বসে বাঁ হাতে ছোট আয়না মুখে ধরে, ডান হাতে কাঁচি দিয়ে তার প্রকাণ্ড পালোয়ানি গোঁফ অতি যত্নে কুচ কুচ করে। ওধারে—এই একই রোয়াকের ওখানে বাবার মানিনী বৃদ্ধা পিসীমা, আমাদের ভাইটি, একটি ছোট কাঁসার হাতঘটি একবার ডান নাক, একবার বাঁ নাকের সামনে ধরে ঢক ঢক করে নাসাপান করে চলেছেন। কি আশ্চর্য, জল খাচ্ছেন নাক বরাবর, ঠোঁট বন্ধ, কিন্তু গলায় ঘটাংঘট শান্টিং হচ্ছে। দাদু আমাদের ইঁদারাতলায় উবু হয়ে বসে, তিনদিকে তিনটি বড় বালতি সাজিয়ে চানে বসেছেন। জল ফুরোলেই রামশরণ কাকা কাঁঠালতলা থেকে দৌড়ে এসে আবার বালতি ভরে দেবে। আমার কানুবাবা এবার অফিস যাবে। বাথরুমে ঝপাংঝপাং জল চমকানোর তালে বেতালে বাবা সুরেলা আউড়ে চলেছে, ওঁ ভূর্ভুবস্য তৎসবিত্যুর্বরেণ্যং। চূড়ান্ত নাস্তিক বাবার চান করার সময় একটা রব চাই। ফলে, গরমকালে গায়ত্রীমন্ত্র, আর প্রবল শীতে কনকনে বাসী চৌবাচ্চার জল মাথায় উপুড় করতে করতে, রঘুপতি রাঘব রাজা রাম। আমি ভেবে দেখেছি, দুটি ঋতুর জল ঢালার সঙ্গে এই জোড়া সুর বা ছন্দ একেবারে ঠিকঠাক মিলে যায়। আমার তিন ভাইবোন দোতলার বারান্দায় মাদুর পেতে পড়তে বসেছি। ছোট বোনের এখনও পড়ার বয়েস হয়নি বলে ওর রেহাই। নিচে রান্না ঘরে আমাদের মিলা মা দশভুজা হয়ে এতগুলো প্রাণীর এক এক কিসিমের জল খাবার সামলাচ্ছে। বাবা চান করতে করতেই থেকে থেকে হুঙ্কার ছাড়ছে, ভাত বাড়ো, ভাত বাড়ো। সাতটা পঁচিশ-এর কল্যাণী লোকাল।

আমাদের বাড়ি জুড়োয় না কখনও। সকাল থেকে গভীর রাত অবধি হুটোপাটা ব্যস্ততা। এসো লোক, বোসো লোক। দাদুর দাতব্য হোমিও চিকিৎসা, বিনে পয়সায় বি. এ, এম. এ ক্লাসের দামড়া দামড়া ছাত্র পড়ানো, বহু পরিচিত মানুষের দেখা করতে আসা। এরই মধ্যে বাবার টেলিফোন দপ্তরে চাকরি হেতু আমাদের বাইরের ঘরে ঢ্যাবা আকৃতির বিকট কালো এক টেলিফোন যন্ত্র বসেছে। রাস্তার মাটি খুঁড়ে কি সব হেস্ত নেস্ত কেবল্‌ না কি বলে, টানা হয়েছে। রাস্তার ইলেকট্রিক তারের তল বরাবর একজোড়া তার আমাদের বাড়ির দেওয়ালে এসে থমকেছে। এখনও কানেকশন ঘটেনি। শোনা যাচ্ছে, হালিসহরে আমাদের বাড়িতেই প্রথম টেলিফোন এল। কবে ওটা বাজবে, কবে কথা বলবে কে জানে।

রাতে নিচের বারান্দায় পাশাপাশি দু'খানি কম্বলের আসন। পাশাপাশি দুই বোন, জোড়া বড়মা, শৈলনন্দিনী আর গিরিনন্দিনী। আমাদের বড়মা খই, দুধ। আর নবদ্বীপ বড়মার সুমুখে শ্বেত পাথরের থালা। আমাদের মা, অতি যত্ন করে থালায় সাজিয়ে দিয়েছে ঘন ক্ষীরের বাটি, এক জোড়া বাগানের মর্তমান কলা, মণিমান্নার দোকানের বড়কা বড়কা দুটি সন্দেশ, আর থালার ওপর চুড়ো করা কনকচুড় ধানের খৈ।

শৈলনন্দিনী আসনে বসে থালার দিকে তাকিয়ে যেন সর্প দংশনে পড়েন। মোটা শরীর নিয়ে কোমর মচকে উঠে দাঁড়ান চোখ ছানাবড়া অবস্থায়। তারপর মাথার গোছা শিখা ঝাপটিয়ে বলে ওঠেন, বলি অ দিদি, আজ তো আমার সেবা হবে না।

বড়মা, সবে দুধ খৈ মুখে তুলেছে এ অবস্থায় চমকে ওঠে, কেন কেন! কি হল! কি হল!

—তোর নাত বউ কি চাঁড়ালের কন্যে! সে কি বামুনের বিধবা দ্যাখেনি!

—কেন ভাই! কি হল বলবি তো।

—কি আবার হবে। ক্ষীর, কলা, মিষ্টির সঙ্গে খৈ দিলে ফলার হয় এটা কি তোমরা জানো না। ছি ছি ছি।

পঁচিশ

নবদ্বীপবাসিনী আমাদের শৈলনন্দিনী বড়মার রাতে আর পাতে বসা হল না। মা তো লজ্জায়, অপ্রস্তুতে একশেষ। সারাদিন এ সংসারটা বুক দিয়ে সামলায়। প্রশংসা তো কপালে নেই। তার বদলে তটস্থ হয়ে থাকতে হয় সর্বদাই।

আমার বড়মা গিরিনন্দিনী বিস্তর বোঝালেন ছোট ভগ্নীকে। বললেন, সেরকম হলে প্রায়শ্চিত্তটিত্তির কথাও ভাবা যেতে পারে। কিন্তু বৃদ্ধা অনড়। রাতে বলতে গেলে সকলকে ছোটখাটো জানান দিয়ে মস্ত এক কাঁসার ঘটি জলপান করার উদ্‌যোগ করছেন। এমন সময় মা এসে তাঁর সামনে মাথা হেঁট করে দাঁড়াল।

বড়মা চোখ তুলে গম্ভীর গলায় বললেন, কি চাই!

মা নিচু গলায় বলে, ঠাকুমা, আমি না বুঝে অপরাধ করলেও এতখানি সাজা আমায় দেবেন না।

—অপরাধ তোমার হবে কেন? আসলে আমার এখানে আসাটাই অপরাধ হয়েছে।

--না না। সে কি কথা। আমাদের কত ভাগ্য, আপনি এসেছেন।

—থাক্ থাক্। ঢের হয়েছে। যা বলবার বলে এখন এখান থেকে এস তো বাছা। আমি এখন শোবো।

মা সেই নতমস্তক অবস্থাতেই বলে. বাবার এক বন্ধু দেওঘর গিয়েছিলেন। কটা পেঁড়া পাঠিয়েছেন। যদি সেটুকু মুখে দিয়ে জল খান।

আমার নিজের বড়মা পাশ থেকে বলে ওঠে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, চ্যাঙাড়িটা কোথায়?

মা বলে, ঠাকুরের সিংহাসনের মাথার কুলুঙ্গিতে রাখা আছে।

—নিয়ে আয়, নিয়ে আয়। একে বদ্যিনাথধামের পেঁড়া, তার ওপর ঠাকুরের মাথার গোড়ায় রাখা। এর চেয়ে পবিত্তির জিনিস আব কি থাকতে পারে।

পণ্ডিত বড়মা কোনও কথা বলেন না আর। বোঝা গেল, তাঁর এ বিষয়ে কোনও আপত্তি নেই।

অতঃপর একহাতে পেঁড়ার মস্ত চ্যাঙারি আর অন্য হাতে পাথরের রেকাবি নিয়ে মায়ের প্রবেশ। বিছানার বাইরে মেঝেয় আবার কম্বলাসন পড়ল। মস্ত এক কাঁসার ঘটি জল রাখা হল। পণ্ডিত বড়মা আসনস্থ হলেন। মা চ্যাঙারির মোড়ক খুলে, পরিষ্কার ছোট ছোট বিচুলি দিয়ে প্যাক করা বাঁধন মুক্ত করে একটি একটি করে বৃহৎ সাইজের পেঁড়া বড়মার পাতে দিতে লাগল। তিনি গ্যাঁট হয়ে আসনে বসে লক্ষ করে যেতে লাগলেন। আমার বড়মা পাশে বসে চুপটি করে নজর করে যেতে লাগল, মার হাত থেকে পাহাড়ি পেঁড়াগণের ভূতলে অবতরণ। পণ্ডিত বড়মার কূট নিরীক্ষণ। এই করতে করতে গোটা চ্যাঙারি ফাঁকা। অন্তত গোটা পঁচিশেক সুবৃহৎ ক্ষীরের কড়া পাক। একটি একটি করে বৃদ্ধার বড় হাঁগালধারী মুখগহ্বরে উধাও হতে থাকে। পরিশেষে একঘটি বৃহৎ জলপান। তারপর লম্বা টানা উদ্‌গার সহ, নারায়ণ, নারায়ণ।

এই পেঁড়া আমরা ভাই-বোনেরাও প্রায় কাড়াকাড়ি করে খাই। দাদুর দেওঘর বান্ধবগণ প্রায়ই যোগান দেন। কিন্তু হায়, আজ একটি মাত্র দীর্ঘ ঢেঁকুরের সঙ্কেতে সব ভ্যানিশ। আমার জগদ্ধাত্রী মায়ের বুদ্ধি ক্রীড়ায় কি আশ্চর্যভাবে সংসারে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকে। কিন্তু আমরা প্রিয় পেঁড়া থেকে বঞ্চিত হই।

দাদু মা'র মুখে সব বৃত্তান্ত শুনে চোখ ছানাবড়া করে বলে, নির্ঘাৎ ওনার ব্লাড সুগার। এই বয়েসে এত ক্ষিদে! তারওপর এতগুলো কড়া পাকের মিষ্টি! মাই গুডনেস।

কামিখ্যে কাকা মন্তব্য করে, জাতামছাই অপরাধ নেবেন না। আপনার মাছিমা মানুছ নয়, রাক্কুসি।

দাদু হাত তুলে বলেন, চুপ চুপ।

রামশরণকাকা আর থাকতে না পেরে বলে ওঠে, বাবু, আপনার মাসিমার উপর হনুমানজির কিরপা আছে। যেমন ভোজন তেমন পহেলবানী।

—তুই থাম্‌বি। আমাদের গুরুজন উনি।

কামাক্ষ্যাকাকা বলে, এ বয়েসে এতগুলো পেঁড়া খেয়ে হজম করা। ওনার ওপর মা চামুণ্ডার কৃপা আছে।

রামশরণকাকা চাপা গলায় হাঁক ছাড়ে, জয় বজরঙ্গবলী। জয় হনুমান।

সূর্যকুমার বাথরুমে যেতে যেতে বলে যান, নিঘ্‌ঘাৎ ওঁকে পেঁচোয় পেয়েছে।

পরদিন সকালে যেহেতু রবিবার, তাই আজ আমাদের বাড়িতে জলখাবারের একটু এদিক-ওদিক। নিত্যকার রুটি-তরকারির বদলে আজ ভিন্ন কিছু। সেই নিয়মেই মা আজ আলুর পরটা বানাচ্ছে।

রান্নাঘরের দরজার বাইরে পণ্ডিত বড়মা দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ান। তারপর মিহিদানা গলায় ঢেলে দিয়ে বলে ওঠেন, কি বানাচ্ছিস্ ভাই? দিব্যি বাস ছেড়েছে।

মা হেসে বলে, আপনি তো এসব খাবেন না ঠাকুমা। আঁশের উনুন। তবে গোবর দিয়ে পেড়ে নিই। বাবা-ঠাকুমা নিরিমিষ খান তো।

—কি বানাচ্ছিস বল্ না শুনি।

—আলুর পরটা।

—বাঃ বাঃ। তা আমায় ক'খানা দিবি না?

মা কতক চমকে ওঠে, কি জানি আপনি খাবেন কি না। বাবা-ঠাকুমা তো উনুন গোবর দিয়ে পাড়লে খান।

—তুই হাতে করে দিলে কেন খাব না। বামুনের মেয়ে বলে কথা। তারপর বামুনের বউও।

আমি জানি, মা মনে মনে নির্ঘাৎ বলছে, গতকাল আপনি যে বলেছিলেন চাঁড়ালের কন্যা! সে তো অনেকটাই সত্যি। কারণ, আমার স্বামী, আপনার নাতি তো গলায় পৈতে পরে না। আর পুজো-আচ্চা দূরের কথা, ঠাকুরের প্রসাদ অবধি মুখে দেয় না।

একটু পরে গোটা আটেক গরম গরম আলুর পরটা আমাদের পণ্ডিত বড়মা উদরস্থ করেন। তাঁর এই হঠাৎ ভাব বদলানোর কারণ আমি ধরতে পারি না। তারপর সেই বাড়ি কাঁপানো উদ্‌গার।

সন্ধ্যেবেলা জোড়া বড়মার ঘরে গল্পের আসর বসে। কেন না আজ এসেছেন আমাদের হালিসহরেরই এক পাড়াতুতো দাদু—পশুপতি চক্রবর্তী। আমার ঠাকুর্দার চেয়েও বয়েসে বড় বলে তিনিও পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল একেবারে বুরুশ ছাঁট। দিব্যি গোলগাল চেহারা। ঢোলা হাতা পাঞ্জাবি আর ধুতি। হাতে চার ব্যাটারি টর্চ আর লম্বা ছাতা। চোখ জোড়া সামান্য লক্ষ্মী টেরা। আমার বড়মাকে মা বলেন। বড়মার কাছ থেকে টুকটাক টাকা, সন্দেশ খেতে নেন। তার বদলে বড়মাকে রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের গল্প শোনান। আমিও সে সব গল্পের ভাগ পাই।

কিন্তু আজ হল উল্টো। পণ্ডিত বড়মাকে দেখে দাদুর ভক্তি একেবারে উপচে পড়ল। মাসিমা মাসিমা করে অস্থির। কিন্তু তেমন আমল পেলেন না। পণ্ডিত বড়মা বলে উঠলেন, আমার দিদিকে মা বলে ডাকা হচ্ছে। তোমার কি জানা আছে বাপু আমার দিদির দাদামশাই নবদ্বীপের ডাকসাইটে পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন। তাঁর সঙ্গে বিদ্যেসাগর মশাইয়ের বিধবাবিবাহ নিয়ে তর্কযুদ্ধ হয়েছিল। নবদ্বীপ হরিসভায় আমাদের দা-মশাইয়ের একটি মূর্তি রাখা আছে। দেখলে মনে হয় জ্যান্ত।

বড়মা অমনি বলে ওঠে, হুঁ, কেষ্টনগরের পোটোদের তৈরি। নাকের ফুটোয় নস্যি লেগে আছে। এমনি জ্যান্ত।

পণ্ডিত বড়মা বলেন, বলো না দিদি, তোমার বিদ্যেসাগর দেখাব কাণ্ডটা।

আমি গল্পের গন্ধ পেয়ে নড়েচড়ে বসি। বড়মা বলে, হুঁ, সেকি আজগের কতা। আমি তখন মার সঙ্গে নবদ্বীপে গেচি দা-মশাইয়ের বাড়ি বেড়াতে। তখন কতই বা বয়েস। বছর দশ-বারো। একদিন সকালবেলা উঠোনে বসে একলা একলা কি যেন খেলা করছি। দা-মশাই উঁচু দাওয়ায় বসে পুঁথি-পাতড়া নিয়ে কাজ করচেন। ঠিক তখুনি একজন অচেনা লোক এসে গলায় গামছা দিয়ে দা-মশাইকে পেন্নাম করলে। তারপর দু'জনাতে কিসব কতাবার্তা হল।

দা-মশাই উঠে ঘর থেকে চাদরখানা কাঁধে ফেলে আমায় হাঁক দিয়ে বল্লেন—ইদিকে আয় গিরি। আমার সঙ্গে চল। তোকে বিদ্যেসাগর দেখিয়ে আনি।

আমি অবাক হয়ে বলি, গঙ্গাসাগর তো শুনেচি দা-মশাই। বিদ্যেসাগর কি?

দা-মশাই বলেন, মানে একখানা সাগরের মতো বিদ্যে।

হা হা হা হা। হো হো হো হো।

বিজাতীয় অট্টহাস্য করে চলেছে আলিবর্দীর যোগ্য উত্তরাধিকারী সিরাজ. বৃদ্ধ নবাবকে হরেক আর বিচিত্র দুয়ারী এই হীরাঝিল প্রাসাদের গোলকধাঁধা কক্ষে হঠাৎ বন্দী কিংবা বন্ধ করে। স্নেহভারাতুর নবাব বুঝি ভাবছেন, আহা বালকের রঙ্গ তো এমনই সাজে। তার জন্য এখন শুধুই আমাদের খয়রাতি বরাদ্দ। সেখানে হরেক ওজর, বিচিত্র অভিমানী প্রতিবাদাবলী। তার সুমুখে কোনও প্রকারের প্রতিবন্ধ চলে না। কোনও প্রতিঘাত মানায় না। ফলে আপাত এই বন্দী নবাব একবার এ দুয়ার আর একবার সে দুয়ার। বন্ধ দরজায় শীর্ণ বার্ধক্যতাড়িত হাতের চাপড়। হায়, যে হাতে নরবধী তরবারি আজও খেলে চমৎকার সে হাতের তাড়না যে কি নির্লজ্জ হয়ে দাঁড়ায় তার হিসেব কে করে। আদপে বালকই তো স্বয়ং খোদাতাল্লা। সংসারের যাবতীয় অন্ধকারে একমাত্র নূর।

নবাব বন্ধ দুয়ারের এপার হতে চাপা আর্তকণ্ঠে বিনতি করেন, খুলে দে রে। দোর খুলে দে।

ওপারে হাসির ঝোড়ো তাণ্ডব ওঠে, হা হা হা হা .

—ওরে এমন করলে বাইরে যে সব রাজাগণ বাগানে অপেক্ষা করছেন তাঁরা শুনতে পাবেন যে।

—তাই তো চাই জাঁহাপনা। কমবখ্তগুলো সমঝে নিক বাংলার নবাব কি চান। তাঁর মন মর্জি কেমন।

—নবাব। এখনও তো আমি তখততাউসে বসে আছি রে পাগল। আর এ কথাও তো কবুল হয়ে আছে, যে এরপর তুই তো হকদার বেটা।

—ওসব খিলাড়ি বাতে আমি ভুলছিনা জাঁহাপনা। নবাব যে আমি প্রায় হয়ে বসে আছি এ কথা দেশ বরাবর মানুষ জানে।

—তাহলে! তাহলে তুই কি চাস বল তো পাগল।

—কি আবার! রুপিয়া। নগদ হাতে গরম টাকা। এই হীরাঝিলে আমার কি খটমল মেরে দিন চলবে। ও সব বুঢ্ঢাদের কাজ। আমার বলে খুন এখন ফুটছে। কত খরচ আমার।

—বেশ কথা। আমি তো খাজাঞ্চিখানা সঙ্গে নিয়ে আসিনি। তুই আমায় খালাস কর, তারপর দেখা যাবে।

—দেখা যাবে। বেশ, তাহলে ওখানেই থাকুন খুদাবন্দ্। এক ফোঁটা পানিও আপনাকে দেওয়া যাবে না।

—কি বলছিস্ রে উন্মাদ।

—সহি বাত বলছি জনাব। আপনি তো জানেন, আপনার নাতি যদি আশমানের চান্দ চায় তো তখনই সেটা আদায় হয়।

—আরে বচ্চা, তুই তো খুদ আমার আশমানি চান্দ। এ কথা কি তুই জানিস না।

—ওসব আনাড়ি বাত ছাড়ুন খুদাবন্দ। আসলি কথা বলুন।

—কি বলব বল।

—বললাম তো, রুপিয়া। পহিলে রুপিয়া, বাদমে আপনার খালাস।

—রুপিয়া এখন আমি কোথা পাবো রে বচ্চা!

—কেন, আপনার সাথী যত সব রাজারা এসেছে ওদের ডাকুন। ওদের কাছ কর্জ করে আমায় খুশ করুন। না হলে, বিনা পানি যে মরতে হবে, সেটা কি নবাবকে মানাবে!

—ওরে পাগল আমি যে নবাব। নবাবের কি রাজাদের কাছে কর্জ করা মানায়!

—জাঁহাপনা, আপনার মতো বৃদ্ধ নবাবের মাথায় পাকা চুল যদি মহারাজদের কাছে এত দামী হয়, তাহলে তাঁরাই এখন গুনাহগারির টাকা দিয়ে আপনাকে খালাস করুন না কেন। হা, হা, হা, হা।

নাগাড় কথোপকথনে ক্লান্ত নবাব বুঝলেন দৌহিত্রের এই জিদ আর আবদারের হাত থেকে তাঁর রেহাই নেই। যতসময় না তিনি অর্থ কবুল করছেন ততক্ষণ তাঁর বন্দীদশা ঘুচবে না। সত্যি, নাতিটার আদর আবদারের রকমফের আছে বটে। আর পাঁচটি সাধারণ মানুষের দৌহিত্র আর খোদ নবাবের দৌহিত্র কি এক!

নবাব মনে মনে আদর সম্ভাষণ করলেও কোথায় একটুখানি যেন ত্রাসের ছটা দেখতে পেলেন। বুঝলেন বচ্চাটার জিদ বড়ই প্রবল। জিদ না থাকলে কি আর এতবড় রাজত্বের নবাবী করা যায়। তা বাদে ছেলেটাকে নিয়ে এতকাল বহু সমরক্ষেত্রে ঘুরে ঘুরে তার বীরপনাতেও আলিবর্দী মুগ্ধ। ভয়ডর বলতে সে কিছু জানে না। এমত যে বালক, তার অসাধ্য কিছুই নেই।

নবাব মনে মনে এবংবিধ প্রমাদাবস্থায় কতক বাধ্য হয়েই বলে উঠলেন, বেশ। তাহলে রাজাদের তলব কর। দেখি ওদের কাছে এখনকার মতো হাত পেতে।

দরজার ওপার আবার অট্টহাস্য করে উঠল, হো হো হো হো। এই তো ইমানদারী বাংলার নবাবের মতো কথা। নবাব যদি আমার মতো নওজওয়ান হতেন তাহলে বলতাম, মরদকা বাত, হাতি কা দাঁত।

অভিমানী বৃদ্ধ মনে মনে তড়পান, ওরে বোকা, আমি বৃদ্ধ হলেও দন্ত একটিও খসেনি এখনও।

বয়স্য বরাবর নিচের বাগিচায় তলব যায় রাজাগণের কাছে। নিবিড় বৃক্ষতলে সুন্দর মার্বেল পাথরের আসনে বিশ্রামভোগী নৃপতিগণ বয়স্যের মুখে সব বৃত্তান্ত শুনে চমকে ওঠেন। তাঁরা একত্রে গোল হয়ে পরামর্শ করেন, এমত উন্মাদ আর পাষণ্ড যদি বাংলা মসনদে চড়ে তাহলে দুর্গতির সীমা রইবে কি!

অবশেষে এই কতিপয় রাজাদের প্রায় ঝুলি ঝাড়া গতিকে কিছু অর্থ একলপ্তী করা হল। সব টাকা যোগ করে দেখা গেল নগদ ৫,০১,৪৯৭ টাকা মজুদ আছে। অতঃপর এই সমুদয় টাকাই সিরাজের হাতে তুলে দেওয়া হল। নবাব আলিবর্দীর জয়ধ্বনি করে সিরাজ দরজা খুলে দিলেন। নবাব অর্গলমুক্ত হয়ে উপস্থিত রাজনগণের কাছে প্রথমেই সহাস্য মন্তব্য করলেন, এই বালকের কি বুদ্ধিকৌশল। এমন দুলালের কাছে হেরেও সুখ।

এখানেই ক্ষান্ত হলেন না নবাব। তিনি দৌহিত্র তথা পালিতপুত্র সিরাজের এই হীরাঝিল প্রমোদ ভবনের নামকরণ করলেন 'মনসুরগদী'। ঘোষণা দিলেন, এই প্রাসাদ ও তার অধিকারীর খরচপত্র ইত্যাদির জন্য এখানে 'মনসুরগঞ্জ' নামে একটি বাজার চালু

হবে। সরকারি তহশীল আদায়ের উদ্দেশে 'নজরানা মনসুরগঞ্জ' নামে নতুন এক আবওয়াব বা কর জারি হবে। আর তা মেটাতে হবে প্রজাদেরই।

আদপে নবাব না হয়েও অনেকখানিই নবাব হয়ে উঠলেন সিরাজ। কিন্তু এদিকে এই বাংলা যখন বর্গীর দাপটে ত্রস্ত ব্যস্ত তখন দিল্লির বাদশাহ একেবারেই গতশক্তি। এদিকে, এখানে এই বাংলায় নবাব আলিবর্দী বালক নাতি সিরাজকে মনসবী বা সেনানায়কের পদ দিয়ে তাঁর অধীনে একদল সৈন্য গঠন করে আগেভাগেই কাজ এগিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য একটিই। সিরাজকে অতি উত্তমরূপে যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ করে গড়ে তোলা। শৃঙ্খলাহীন জীবনযাপন থেকে নাতিকে রাজতন্ত্রের মূল স্রোতে চালিত করাই নবাবের মনোবাসনা। কিন্তু রাজশোণিতকে বিষাক্ত করার মানুষের অভাব হয় না সংসারে। সেই হিসেবে সিরাজের কিছু চাটুকার তথা ছদ্মবেশী বান্ধব—যথা মেহেদীনিসার ইত্যাদি কতিপয় স্বার্থবাদী মানুষ সিরাজকে কুমন্ত্রণা দিয়ে বোঝাতে চাইল, তাঁর প্রতি নবাবের স্নেহভালবাসা এ সবই মৌখিক। পাটনায় তাঁর নামে সিংহাসন পুষে রাখার বিষয়টিও গূঢ় ছল। ওখানে নবাবের প্রিয়পাত্র নায়েব নাজিম রাজা জানকীরাম আদপে নবাবের বকলমে সিরাজের জন্য কিছুই করেন না। অস্থিরমতি সিরাজ কুমন্ত্রণার ফাঁদে পা দিলেন। তিনি স্থির করলেন রাজা জানকীরামের হাত থেকে রাজদণ্ড কেড়ে নিয়ে নিজ হস্তে শাসনভার নেবেন। যেমন ভাবনা তেমনই কাজ। সেদিন গভীর নিশীথে সিরাজ তাঁর প্রণয়িনী লুৎফুন্নেসা বেগমকে সঙ্গে নিয়ে এক অতি দ্রুতগামী গো-শকটে পাটনা রওয়ানা হলেন।

আলিবর্দী এ সময়ে মেদিনীপুরে ছিলেন। সিরাজের পাটনা গমনের সমাচার পেয়ে তিনি বিচলিত হয়ে পড়লেন। ফিরে এলেন মুর্শিদাবাদে। এবং পরদিনই মহিষীকে সঙ্গে নিয়ে পাটনা রওয়ানা হলেন। মনে ভাবনা, বেচারি নাতিটির না জানি কি বিপদ ঘটে। নবাব পাটনা যেতে যেতে অতি দ্রুতগামী এক দূতের হাতে সিরাজকে পত্র লিখে অনুনয় বিনয় করে জানালেন, ওহে আমার প্রাণপ্রিয় কলিজা, তুমিই আমার প্রকৃত উত্তরাধিকারী। তুমি ফিরে এসে আমার জান রক্ষা কর।

কিন্তু সিরাজ পাটনায় এসে চণ্ডরূপ ধারণ করলেন। তিনি জানকীরামকে বলে পাঠালেন, তিনিই পাটনার আসল নবাব, জানকীরাম নন। এতকাল নবাব নিজ মহালের কোনও খবর নিতে পারেননি। এবার তিনি স্বয়ং সিংহদ্বারে উপস্থিত। জানকীরাম খুবই বিচলিত হয়ে পড়লেন। নবাবের বিনা অনুমতিতে তিনি কেমন করে দ্বার খুলে দেন। জানকীরাম রাজদ্বার বন্ধ করে রাখলেন।

সিরাজের অপমানিত রোষানল জ্বলে উঠল। জানকীরাম তো নবাবের ভৃত্য ছাড়া আর কেউ নয়। তার এমন স্পর্ধা কেমন করে হয়। সিরাজ আর বিলম্ব না করে বন্ধ দুর্গদ্বারে গোলাবর্ষণ আরম্ভ করলেন। একে জানকীরামের ঔদ্ধত্য, দ্বিতীয়ে নবাব মাতামহের ওই পত্রপীড়ন।

ইত্যবসরে সিরাজও দ্রুতগামী দূত মারফৎ নবাবকে একখানি দীর্ঘ পত্র লিখলেন। এ পত্রের বয়ান পাঠ করলে যে কোনও সাধারণ সুবুদ্ধিধর মানুষের খুন গরম হয়ে উঠবে।

পত্রের অন্তিমে লেখা হচ্ছে, 'মেরে হাল পর বজুজ এনায়াৎ জোবানিকে কোই সোফাকাৎ ও নাওয়াজেস্ জো এজ্‌দিরাদ মান্‌সাব আওর একতেদার্ কে লায়েক হো না

হুহ; হালা হারগেজ তাস্‌রিফ নালাহয়েগা ওয়ারনা আপকা শের মেরে দামান্‌মে হয়াকে মেরা শের্‌ আপকে জের্‌ পায় ফিল হোগা।'

সংক্ষেপে অস্যার্থ হল, 'আপনি পিতৃব্যগণকে রাজপদ দিয়া সন্মানিত করিয়াছেন, কেবল আমার সময়েই স্তোকবাক্যমাত্র ও কল্পিত আদর। বালকের ন্যায় আর আমি ইহাতে ভুলিব না। নিজের ন্যায্য দাবী বলপূর্বক অধিকার করিব; আপনি বাধা দেওয়ার আয়োজন করিবেন না। আর যদি নিতান্ত বিবাদই উপস্থিত করেন, তবে হয় আপনার মস্তক আমার কক্ষদেশে বা আমার মস্তক আপনার পাদদেশে পতিত হইলে ইহার মীমাংসা হইবে।'

মূঢ় অবোধ সিরাজের এই ক্রোধান্ধ পত্র পেয়ে তিলমাত্র বিচলিত হলেন না আলিবর্দী। তিনি যৎপরোনাস্তি বিনয় সহকারে জবাব দিলেন, 'নির্বোধ, তুমি ভুল বুঝিয়াছ। বিহারের কি, ভারতের রাজপদ দেওয়ার ক্ষমতা থাকিলে তোমাকে তাহাও আমার অদেয় নহে।'

পত্রের শেষে এক পারসি কবির বয়েদ উদ্ধার করে বাংলার নবাব লিখে দিলেন,

'গাজি কে পায়ে সাহাদাৎ আন্দার্‌ তাগো পোস্ত।
গাফেল কে শাহীদে এস্‌ক্‌ ফাজেল্‌ তার্‌ আজ দোস্ত।
ফারদায় কেয়ামাৎ হঁবা আঁ কায়মানাদ।
ই কোস্তা দুষমানাস্ত্‌ ওঁয়া কোস্তায়ে দোস্ত।'

গাজিরা, অর্থাৎ ধর্মের জন্য যুদ্ধ করে যাঁরা প্রাণদান করেন, তাঁরা জানেন না সংসার সংগ্রামে স্নেহের সহিত যাঁরা প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করেন, তাঁরাই শ্রেষ্ঠ বীর। শেষ বিচারের দিনে এঁদের দু'জনার মধ্যে কোনও তুলনাই হয় না। কেন না একজনা শত্রুহস্তে নিহত। অপরজনা প্রাণসম বন্ধু হস্তে।'

গভীরতর রাত্রির চরণে চরণ রেখে নবাবী বৃত্তান্ত যখন এ পর্যন্ত ঘনিয়ে ওঠে রামপ্রসাদ তখন কতক দম নিতে গুঞ্জরণ তোলেন,

ভাই বন্ধু, দারাসুত, কেবলমাত্র মায়ার গোড়া
মোলে সঙ্গে দিবে মেটে কলসী, কড়ি দিবে অষ্টকড়া...

ছাব্বিশ

খোলা জানালার ওপারে কৃষ্ণনগরের আর একটি রাতের অবসান ঘটে। চৌপর নিশি জাগরণের শরিক নদীয়াশ্বর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও সেনজ রামপ্রসাদ। এ ঘরে গোটা রাত পার করা এবং দেশকাল সম্বন্ধীয় গূঢ় আলোচনার যেন সমাপতন ঘটে না। কিন্তু যেকালে একসময় থামতেই হয়, তাই দু'জনই ক্ষান্ত হন। কিঞ্চিৎ পরিশ্রান্তও।

খোলা জানালার ওপার নদীয়া আর একখানি প্রাতঃ এনে দেয়। পুবাকাশ শ্রাবণি মেঘে খানিক ভারগ্রস্ত হলেও এখন আলো আলো। দিন আসছে নদীয়ার আকাশে আরও একবার। সেই দিনখানি বাংলার আকাশের একটি টুকরোও বটে। সেখানে এখন কি এক অজানা ভার জমে আছে। দেশের সাধারণ খেটে খাওয়া দিনাতিপাত মানুষ এত সব রাজারাজড়ার বৃত্তান্তের সমাচার রাখে না। কিন্তু সেই রাজাপালগণ কি জানেন, যাদের ধারণ করে এই রাজকীয়তা, তাদের অবস্থান ভঙ্গীর কি গল্প হতে পারে রাজা শাসনে তরঙ্গ উঠলে।

কৃষ্ণচন্দ্র বলেন, প্রল্হাদ, আমার যাগ দেখতে এসে তোমার একি বিড়ম্বনা। আমার যাবতীয় চিন্তার দায়ভাগ তোমার মতো একজন কবির ওপর কেমন নিশ্চিন্তে সঁপে দিলাম। আসলে আমি বিশ্বাস করি, কবিই একমাত্র পারেন মহাকালের ভার বহন করতে।

—রাজার ভার বইবে কবি! এটা কি আমার প্রতি সুবিচার হল মহারাজ!

—বিচার করার আমি কে। চিরকালই তো এমনটা হয়ে আসছে।

প্রসাদ কি বলবেন বুঝতে পারেন না। রাজা আবার বলেন,

মনীষীণঃ সন্তি নতে হিতৈষিণো।

হিতৈষিণঃ সন্তি নতে মনীষিণঃ।

সুহৃচ্চ বিদ্বানপি দুর্লভো নৃণাং

যথৌষধং স্বাদু হিতঞ্চ দুর্লভম্॥

প্রসাদ মুখ নিচু করে সংকোচে হাসেন। রাজা আবার বলে ওঠেন, পণ্ডিত ব্যক্তি হয়তো অনেকেই আছেন। কিন্তু তাঁদের অপরের মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা নেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মিষ্ট ঔষধের চেয়ে তিক্ত ঔষধই হিতকারী।

প্রসাদ সহাস্য তাকান রাজার প্রতি, তাহলে মহারাজ আমার কবিত্ব তিক্ত। মুখে দিলে বমন আসে।

—তোমার ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম আছে প্রসাদ। তোমার গোটাটাই মিঠে। অথচ তুমি বুদ্ধিমন্ত।

—কোথায় যেন কি মিলে গেল মহারাজ। একখানা গানে আমি বলেছিলাম, এখন মিঠার লোভে তিত মুখে সারা দিনটা গেল।

—সে আবার কি কথা।

—আজ্ঞে যথার্থই মহারাজ। আপনি আপনার গুণে শুনছেন মিঠা। কিন্তু আমি আসলে বলছি তিক্ত।

—হুঁ, কিন্তু অতিরিক্ত তিত এক সময় মিঠে মনে হয়।

প্রসাদ উঠে দাঁড়ান, এখন তবে বিদায় হই মহারাজ। আমার দুই সঙ্গী হয়তো আমায় না দেখে গোল পাকাতে আরম্ভ করে দেবে।

রাজা চোখ তুলে সিধে চোখ রাখেন প্রসাদের চোখে, কিন্তু এখনও যে বিস্তর কথা বাকি রয়ে গেল।

—বেশ তো। তলব করবেন।

রাজার আলয় থেকে বার হওয়ার মুখে জোড়া প্রহরী হঠাৎ জোড় হস্তে প্রসাদকে নমস্কার জানায়। তিনিও জবাব দেন।

প্রভাতী বাতাসে আজ সেরকম কোনও বাদলের সমাচার নেই। পুব আকাশের রক্ত এখন গোটা আকাশে চারিযে যেতে বসেছে। দিকে দিকে পাখি ডাকছে। গাছে গাছে স্নিগ্ধ বাতাসের তাড়না বাজছে। সেই তাড়না বয়ে আসছে কতদূর দেশ হতে। আহা, ওই হাওয়ার শরীরে কুমারহট্ট হালিসহরের ছোঁয়াচ কি মিশে নেই। কেমন আছে সেই বুনো-জাঙালে মেটে ঘরের সংস্কারটি। বুড়ি মা জননী। ছেলে-মেয়েরা! আর শেষতঃ গর্ভিনী সর্বাণী। মাঝখানে এই কটি দিন, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন কতকাল। কতদিন যেন ওই

বুনো জঙ্গলগড় আর আলো আবছায়া দেশটির দেখা নেই। খপর নেই সেখানকার সুরধুনি গঙ্গার, প্রাচীন মন্দিরগণ, মানুষজনের, পাখ পাখাল, নিঝুম দ্বিপ্রহর কিংবা অচেতন নিশীথিনীর। আঃ!, এই বিশ্বসংসারে আর কোথাও বুঝি এমন দেশ নেই।

পায়ে পায়ে এমনই আনমনা অবস্থায় মূল দেউড়ি ও রাজদ্বার পার হয়ে, প্রভাতী পাখির কলগান আর গোলা পায়রার বকবকম-এর মাঝখান দিয়ে রামপ্রসাদ এসে পড়েন রাজ অতিথিশালার সুমুখে, যেখানে এখনও জাঁক করে দিন জাগেনি। অতিথিশালের মাথায় প্রবীণ বটগাছটির টঙে সদ্য দিন এসে ছুঁয়ে দিয়েছে। এইবার আস্তে আস্তে দিনমণি উঠবেন। আলো গড়িয়ে নামবে টঙ হতে, ডাল পাতাপত্র বরাবর, যথাসম্ভব।

কিন্তু অতিথিভবনের যে ঘরে থাকার ব্যবস্থা তার দুয়ার যে হাট করে খোলা। এমন তো থাকার কথা নয়। কেন না গেল রাতে বার হওয়ার সময় প্রসাদ বাহির থেকে দুয়ার টেনে দিয়েছিলেন। তাহলে হলটা কি!

রামপ্রসাদ ক'ধাপ সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় ওঠেন। তারপর খোলা দরজার এক পাশ থেকে মাথাটি অতি সন্তর্পণে বাড়িয়ে, দরজার একটি পাল্লার পাশ দিয়ে ভিতরে উঁকি দেন। আর তখনই দেখতে পান দু'খানি মুখোমুখি চৌকির মাঝখানে দুই মুরুব্বি কতক কাঠ হয়ে বসে আছে। একেবারে ছানাবড়া চক্ষু। আর দেহ ভঙ্গীতে কাষ্ঠবৎ বিপর্যয়।

প্রসাদ ঘরে পা রাখেন। আর সঙ্গে সঙ্গে ভজহরি—রামতনু অতর্কিত ঝোড়ো কাঁপনে নড়ে ওঠে। ভজহরি বলে ওঠে, ও মা! ও মা! রামতনু, কী কাণ্ড! কী কাণ্ড!

প্রসাদ ওধারে রাখা নিজের চৌকিতে বসে পড়ে উত্তরিয়খানা গা থেকে তুলে পাশে নামিয়ে রাখেন। তারপর কোনও কথা না বলে রহস্য বহাল রাখার জন্য তাঁর স্বভাব মতো মিটি মিটি হেসে চলেন।

ভজহরি প্রায় লম্ফ দিয়ে তার বিছানা থেকে নেমে এসে প্রসাদের পায়ের সামনে মেঝেয় উবু হয়ে বসে। দাদা গো, বিদেশ বিভুঁইয়ে এসে, আমাদের ঘরে অনাথ করে ফেলে রেখে এ তুমি কি আরম্ভ করলে বলদিকি!

প্রসাদ কেবলই হেসে যান। ভজহরির ত্রস্ত আর বিস্ফারিত চক্ষু দেখে তাঁর মনে মনে দ্বিগুণ কৌতুক তুড়িলম্ফ দেয়।

ভজহরি এবার গলায় যৎপরোনাস্তি কাতরতা ঢেলে বলে, বলি হাসছ যে বড়। আমাদের আতান্তরে ফেলে তোমার মজা হচ্ছে!

রামতনু এবার কথা বলেন, রাখ ভজা রাখ। বিদেশ হোক আর আপনার দেশ। তোর দাঠাকুর এখানে রাতে ভিতে নির্ঘাৎ কোনও মজার তালাশ পেয়েছে। কেমন মিচকে মিচকে হাসছে দেখছিস না।

ভজহরি বলে, তোমার খালি এঁকা বেঁকা কথা। আমি তো জানতুম তুমি বারিন্দির বামুন নয়।

—তোর তো আস্পদ্দা কম নয়। তুই চাঁড়াল। তোর এই দাদাটি চাঁড়ালস্য চাঁড়াল। তা তুই আমার বামুনত্বর গাঁত গুঁই বিচার কচ্চিস বাবা!

রামপ্রসাদ বুঝতে পারেন এমন প্রভাতকালটি এই দুই বোকার হাঁক ডাকে তছনছ হল বলে। তাই এবার তিনি দায়ে পড়ে দু'জনার মাঝখানে পড়ে কথা বলে ওঠেন, রোসো রোসো। তোমরা দু'জনাতেই ক্ষান্ত দাও। সাতসকালে এমন ডাকাত পড়া চিৎকার কল্লে

রাজার সেপাইরা ছুটে আসবে যে। অবিশ্যি চোখে দেখলে বুঝতে পারবে এমন পান্তা খাওয়া বাঙালি সন্তানরা ডাকাতি কেন, একটি পিঁপড়েও টিপে মারতে পারবে না। কিন্তু সেপাই এলে আমার তো লজ্জা করবে।

ভজহরি বলে, লজ্জা করলেও, আমাদের ভিন্ন গতি নেই তোমার।

প্রসাদ হাসেন, তা অবিশ্যি মন্দ বলিসনি। এই বিদেশে তোর ছাড়া আর কে ভরসা।

রামতনু ঝেঁঝে ওঠেন, রাখো, রাখো। তোমার সব রাজা বাদশার সঙ্গে মিতে পাতানো। আমরা হচ্ছি ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো।

প্রসাদ এবার গাঢ় স্বরে বলে ওঠেন, রাজা রাজড়া আমার মতো দীন মানুষের মিতে হয় না কখনও দাদা। যাই, এবার গোশল করে আসি। তবে এ দেশে চান করে জুত পাচ্ছিনে।

ভজহরি অবাক, সে আবার কি কথা!

—ওরে, আমরা গঙ্গার দেশে বসত করি। রোজ এই অ্যাত্তোখানি গঙ্গায় নাওয়া যাদের অভ্যেস তাদের কি এই এক ফোঁটা জলঙ্গিতে সুখ হয়।

রামপ্রসাদ পাত্রে রাখা সর্ষের তৈল বাম হাতের তালুতে ঢেলে ডান হাতের তর্জনী দিয়ে দুই নাসারন্ধ্রে দিব্য করে টেনে নিলেন। ঝাঁঝের প্রকোপে তাঁর দু চক্ষু রক্ত উছল আর ঝরঝর অশ্রুপাত। ভাল করে গায়ে, হাতে এবং পায়ে যাকে বলে দাবড়িয়ে তৈল মালিশ করতে দেখে রামতনু বলে ওঠেন, আহা, কি চমৎকার দৃশ্য। বিনি মদ্যপানেই যা চোখের ছিরি।

প্রসাদ তেল থাবড়াতে থাবড়াতে বলেন, হুঁ, সেই সঙ্গে চৌপর রাত জেগে বসে থাকতে হয়েছে। ফলে চোখের আর দোষ কি।

রামতনু যেন এবার মোক্ষম সুযোগটি পেয়ে যান। —বটেই তো। বটেই তো। তা, রাতভর কোতায় পড়ে থাকা হয়েছিল শুনি? কার গোয়ালে বসে ধোঁয়া দিচ্ছিলে?

রামপ্রসাদ শুধু বলেন, রাজার।

রামতনু চৌকি থেকে নেমে দাঁড়ান। তারপর সর্ষের তৈলের পাত্রটি হাতে তুলে নিয়ে বলে ওঠেন, চল ভজহরি চল। আমরাও গোশলপত্তর সেরে আসি। কোনও বিশ্বেস নেই।

ভজহরি চোখ তুলে বলে, কাকে?

—কাকে আবার, তোমার মণিবটিকে। চান করতে যেযে আবার কোথাও সটকে পড়তে পারে।

প্রসাদ হাসেন, হ্যাঁ, আমার ওপর রাজার আদর বেড়েছে বৈ কমেনি। ফলে আপনাদের আতঙ্ক তরাস তো হতেই পারে।

ভজহরি চমকে ওঠে, বটে। আতঙ্ক আর তরাস মানে তো ভয়। সব্বোনাশ, থালে রাজার বাড়ি তোমার সঙ্গে বেড়াতে এসে তোমায় ভয় করে চলতে হবে দাঠাকুর!

—তুই তো আগে এমন আড়বুঝো ছিলি না। দু'দিন রাজভোগ পেটে পড়ে কি তোরও দশা পালটে গেল!

এই কাক ভোরে জলঙ্গির স্নান ঘাটে জনপ্রাণী নেই। নদীধারের ঘন জমাট গাছপালার ডালে কিচিমিচির ছানা পাখির দল ডাকাডাকি করছে। বড়রা এখনও জাগেনি। নিঝুম নদীর উপর ধোঁয়ার চাদর ঝুলছে যথাতথা। কোথাকার গ্রাম দেশে কে বা কারা এই

সাতসকালে উনুনে কাঠ গুঁজেছে। একখানি একা মেছো ডিঙা নদীর আঘাটে খোঁটাগাড়ি থমকে আছে। নাওয়ের মাঝি নেই। নাওয়ের আগায় একটি নিঃসঙ্গ বাজপক্ষী চুপটি করে বসে আছে। তার নজর দেখে বোঝা মুশকিল সে কোন দিকে চেয়ে আছে।

রামপ্রসাদ সারা শরীরে তৈল থাবড়াতে ব্যস্ত রামতনুর দিকে চেয়ে বলেন, চরিতে যোষিতাং পূর্ণে সরিত্তোয়ে নৃপাদরে, সর্বত্রৈব বণিকস্নেহে ন কুরু প্রত্যয়ং ক্বচিৎ।

রামতনু চোখ বৃহৎ অবস্থায় বলে ওঠেন, হঠাৎ এমন শোলোক কপচাও কেন ভায়া। এতো নিশ্চিত চানের মন্তর নয়।

রামপ্রসাদ বলে ওঠেন, কথাটা মনে পড়ে গেল ভজহরির সেই আতঙ্ক তরাস-এর কথা শুনে। এর মানে হল, নারী চরিত্র, জলপূর্ণ নদী, রাজার আদর আর বানিয়ার স্নেহ, এর কোনওটিতেই বিশ্বাস রাখতে নেই।

ঠিক তখনই এই প্রাতঃকালীন অস্পষ্টতার মাঝখানে খানিক দূরের ঝোপঝাড়ের ওপাশ থেকে একটি কর্কশ আর তীক্ষ্ণ স্বর ভেসে আসে। —হ্যাঁ, আপনি কবি হতে পারেন, তবে সর্বত্র তো আর্যপ্রয়োগ চলে না।

তিনজনই চমকে তাকান ওইদিকে। আবার কথা হয়, সবই ঠিক আছে। তবে কিঞ্চিৎ ব্যাকরণে ভুল হল যে।

প্রসাদ শুধু বলেন, আপনি কে মহাশয়?

ঝোপেব ওপার কথা কয়, ওই যে বললেন বণিকস্নেহে ন কুরু, ওটি ব্যাকরণ সিদ্ধ নয়। ওটি হবে বণিকস্নেহে ন কুর্যাৎ। কুর্যাৎ, কুর্যাৎ, বোঝা গেল?

প্রসাদ আবার কন, আজ্ঞে কে আপনি?

এবার ঝোপের পরপার থেকে এক মনুষ্যমূর্তি উঠে দাঁড়ান। যাকে বলে সুগঠিত শরীর কাঠামা, প্রায় শ্যামবর্ণ এবং প্রিয়দর্শন। তাবাদে উন্নত ললাট, দীর্ঘ আজানুলম্বিত বাহু, প্রশস্ত আর উজ্জ্বল চক্ষু জোড়া। পরণে সামান্য থান। কিন্তু উন্মুক্ত দেহ। এর বাইরে ভারী ব্যতিক্রম হল, সারা শরীর বোঝাই লোমের জঙ্গল। একজন মনুষ্য শরীরে এমত লোম বা রোম সহজ দৃশ্য নয়।

নদীধারে দণ্ডায়মান ত্রিমূর্তির দিকে ওই পোক্ত কাঠামোর পুরুষ জ্বল জ্বলন্ত চক্ষু বরাবর তাকিয়ে গম্ভীর নাদি স্বরে বলে ওঠেন, আমার পরিচয় নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজে 'লোমশ মুনি'। আদপে আমার নাম জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। ত্রুটি গ্রহণ করবেন না। প্রাতঃকৃত্য সেরে সবে জলে নামব। কিন্তু আপনার ব্যাকরণে ত্রুটি আমায় বিচলিত করল। আমি আর থাকতে পারলুম না।

পরিচয় শুনে রামপ্রসাদ বলতে গেলে তটস্থ আর বিস্মিত। এই সেই ত্রিবেণীর ডাকসাইটে পণ্ডিত, যাঁকে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বাজপেয়ী যজ্ঞে নিমন্ত্রণ জানাননি। পণ্ডিত মহাশয়ের অপরাধ, তিনি সমাজ পতিত এক দরিদ্র ব্রাহ্মণকে শাস্ত্রীয় প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে সমাজে তুলেছেন, রাজার নিষেধ সত্ত্বেও। কিন্তু অনিমন্ত্রিত হয়েও তিনি এই কৃষ্ণনগরে কি প্রকারে?

আমাদের গিরিনন্দিনী বড়মা অপণ্ডিতি ভাষায় তাঁর বিদ্যাসাগর দেখার কথা বলতে আরম্ভ করলেন। তাঁর এক পাশে আমাদের পণ্ডিত বড়মা শৈলনন্দিনী। পৃথুলা কালো আড়ার টঙে বুরুশকুচি মাথার পেছনে প্রকাণ্ড পাকানো শিখা। আর ভাঁটা ভাঁটা চক্ষু।

বড়মা বলে যান, দা-মশাই বিদ্যেসাগর দেখতে নিয়ে চল্লেন আমায়। নবদ্বীপের গঙ্গার ঘাটের পথ বরাবর। আগে আগে সেই লোকটি, যে দা-মশাইকে খপর করতে এসেছিল। কিন্তু আমার মনে একটিই খটকা, এমন সাগরের নাম তো কখনও শুনিনি বাপু।

দা-মশাইয়ের চাদরের কোনটি ধরে আমি নাপাতে নাপাতে চলচি। দা-মশাই চলতে চলতেই বাঁ-হাতের টিপে ধরা নস্যি নাকে গুঁজচেন। বাতাসে নস্যি উড়ে আমার চোখ জ্বলচে। আমি হাতের পিঠ দিয়ে চোখ মুছচি। আর ছিঁক ছিঁক করে হাঁচছি। আগে আগে চলনদার লোকটি চলতে চলতে থাকে থাকে পেছু ফিরে আমাদের দেখচে। আবার চলচে।

যেতে যেতে, চলতে চলতে মনে ভাবচি, গঙ্গাসাগর তো এখেন থেকে বিস্তর দূর। তাহলে কি সাগর উবজিয়ে এল আমাদের নবদ্বীপের গাঙ বরাবর। কিন্তু দা-মশাইয়ের মুখে কুলুপ। আমারও। মনে মনে একটাই কতা, এ আবার কেমনধারা সাগর দেখাতে নিয়ে চল্লেন আমার মহাপণ্ডিত দা-মশাই ব্রজনাথ বিদ্যেরত্ন। কিন্তু শুনিচি অনেক রত্ন তো সাগরেই থাকে। দা-মশাই কি তার বাইরে!

চলতে চলতে আমরা নবদ্বীপের খেয়াঘাটে এসে পড়লুম। সঙ্গের চলনদার লোকটি ঘাটে নোঙর করা কয়েকখানা নৌকোর মধ্যে একটির সুমুখে যেয়ে গলা তুলে কি যেন বললে। অমনি সেই নৌকোর ছ-ইর তলা থেকে একজন মানুষ বেরিয়ে এসে সাততাড়াতাড়ি ডাঙায় নামলেন।

ভাল করে চেয়ে দেখি, বেশ মাথায় খাটো ওই ব্যক্তিটির মাথার সুমুখে পণ্ডিতদের মতো কামানো আর পেছনে চুল। ঠিক কতক উড়ে বামুনের মতো দেখতে। হাঁটু তককো মোটা থান। আর গায়ে একখানা এণ্ডির চাদর। পায়ে পা ঢাকা চটি।

তিনি এগিয়ে এসে পা থেকে চটি জুতো খুলে দা-মশায়ের পায়ে হাত দিয়ে পেন্নাম করলেন। দা-মশাই ডান হাতের আঙুলে পৈতে জড়িয়ে ওঁয়াকে আশীর্বাদ কল্লেন। তারপর আমার দিকে হেঁট হয়ে বল্লেন, বুঝলি গিরি, এই হল তোর বিদ্যেসাগর।

আমি হাঁ করে দেখি আর ভাবি এই একফোঁটা মানুষের মধ্যে সাগর কোতায় আচে।

তিনি দা-মশাইকে হেসে বল্লেন, তা ইটি কে পণ্ডিতমশাই।

—ইটি আমার সুদ।

বিদ্যেসাগর আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বল্লেন, বটে বটে। তাহলে তো ইটি ভারী গুরুতর সামগ্রী।

এই বলে আমার একটি হাত ধরে বল্লেন, এসো খুকী। আগে তোমায় নৌকোয় উঠিয়ে দি।

আমায় কোলে করে তিনি নৌকোয় উঠিয়ে দিলেন।

বড়মার কথা শুনতে শুনতে পণ্ডিত বড়মা বলে ওঠেন, কি ভাগ্যি তোর দিদি। বিদ্যেসাগরের কোলে চড়েছিস!

বড়মা এ কথার কোনও উত্তর না দিয়ে ডাবল একস্ নস্যির কৌটোয় গুঁড়ো করে রাখা

দোক্তা পাতা এক টিপ তুলে নিচেকার ঠোঁটের ভাঁজে গুঁজে দেন। তারপর পাশে রাখা ঠিক অমন একটি নস্যির কৌটোর ঢাকনা খুলে সেটি মুখের কাছে নিয়ে পিচিক্‌ করে থুথু ফেলেন। তারপর আবার ফেলে আসা কথায় চলে যান।

—নৌকোর পাটায় মুখোমুখি একজোড়া কুশাসন পাতা। তার ওপর পাতলা কম্বল বিছিয়ে দেওয়া। দু'জনাতে বসে পড়লেন মুখোমুখি। আমি আর কি করি, নৌকোর পাছায় বসে পড়ি। বসে বসে গঙ্গা দেখি। গাঙ দিয়ে নৌকো ভেসে যাওয়া দেখি। দেখি আমাদের নৌকোর পাশে রাখা একখানি নাওয়ে এই সাত সকালেই ভাত চড়িয়েছে। ওধারে বিদ্যেসাগর আর আমার দা-মশায়ের মিলে কতা শুরু করে। কি সব কতা হচ্ছে তার মাথামুণ্ডু বুঝতে পাচ্ছি না, তবে মাঝে মধ্যে বিধবা বিবাহ, বিধবা বিবাহ, এই কতা জোড়া কানে আসচে।

দু'জনার মধ্যে কতার ধরণধারণ, যত সময় বইচে, আমার কিন্তু ভাল ঠেকচে না। রাজ্যের বকবকানি, কখনও ধাত চড়চে, কখনও নামচে, দা-মশাই ঘন ঘন নস্যি নিচ্ছেন। গঙ্গার হাওয়ায় তাঁর শিখা উড়চে। যাকে বলে, সেয়ানে সেয়ানে বাক যুদ্ধু হচ্ছে।

এই করতে করতে এক সময় দু'জনার মুখ থেকে বাংলা কতা উপে গেল। এবার হুড়হুড়িয়ে সংস্কৃত কতার মহাযজ্ঞি। সে কি কাণ্ড! অং-বং-দুড়ুম-দাড়াম। এক্কেবারে তক্কের গোলা ছুটচে। এ বলে আমায় দ্যাখ, ও বলে-আমায় দ্যাখ। আমার একা একা বসে বসে ব্যাজার ধরে গেল। এ কি কাণ্ড। এধারে যত রোদ চড়চে, দু'জনার মুখের তুবড়িও তত ছুটচে। কেউ কম যান না। এই করতে করতে বেলা দুপুরে দু'জনাই ক্ষান্ত দিলেন। দু'জনারই মুখ গম্ভীর, থমথমে। দুজনেই আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। দা-মশাই বিদ্যেসাগরকে তাঁর বাড়ি এসে ভোজন করতে বল্লেন। বিদ্যেসাগর বললেন, বিস্তর বেলা গড়িয়েচে। তার চেযে আপনি বরং সামান্য সিধে পাঠিয়ে দিন। আমি দুটি ফুটিয়ে নেব।

আমরা বাড়িতে ফিরে এলাম। সঙ্গে বিদ্যেসাগরের সেই চাকরটি। দা-মশাই-এর বন্দোবস্তে একটি ধামায় চাল, ডাল, তেল, নুন, আনাজপাতি ইত্যাকার জিনিসপত্তর সেই ভৃত্যের মাথায় চড়িয়ে ঘাটে পাঠানো হল। সেই সঙ্গে একখানি ব্যাভার করা, মানে পোড়া মেটে হাঁড়ি, ভাত রাঁধার জন্যে।

খানিক পরে ঘাট থেকে সেই চাকরটি ফিরে এল, কেমনধারা ব্যাজার পানা মুখ করে। দা-মশাই তখন দাওয়ায় বসে তেল মাখছেন। সে এসে খুব বিনীতভাবে বললে, আজ্ঞে পণ্ডিতমশাই, বিদ্যেসাগর মশাই বললেন যে আপনি যে মেটে হাঁড়িটি পাঠিয়েচেন সেটি পোড়া। মানে ব্যাভার করা। তা ওতে কেমন করে ভাত রাঁধবেন।

শুনতে শুনতে দা-মশাই মিচকি মিচকি হাসছিলেন। সব শুনে এবার তার হাতে একটি নতুন মেটে হাঁড়ি তুলে দিয়ে বল্লেন, হুঁ, তোমাদের বিদ্যোসাগর মশাইকে বোলো, মেটে হাঁড়ি একবার ব্যাভার করলে সেটি যেমন উচ্ছিষ্ট হয়ে যায়, তেমনি নারী একবার বিধবা হলে দ্বিতীয়বার তার বিবাহ হয় না। সেও এঁটো মৃৎপাত্রবৎ।

লোকটি হাঁ করে দা-মশাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল। এমন ধাঁধায় বেচারি বুঝি জন্মে পড়েনি।

সাতাশ

বড়মার বিদ্যাসাগর দেখার কাহিনি ফুরোতে যতক্ষণ। আমাদের পণ্ডিত বড়মার যেন আর তর সইছিল না। তিনি এবার মুখ খোলেন।

—দিদি, তোমার ভাগ্যি কি অভাগ্যি কে জানে। কিন্তু তুমি দেকলে বিদ্যোসাগরকে দাদামশাইয়ের দৌলতে। আর আমি পোড়াকপালী এক বিধবা, তাঁর বাক্য মুখস্থ করে গেলুম। কিন্তু তাতে করে কি লাভ হল!

বড়মা, কি মুকস্ত কল্লি শুনি।

—আহা, বিদ্যোসাগর তো দেশের অকাল বিধবাদের বিয়ে দেওয়ার জন্যে যাকে বলে কোমর বেঁধে নামলেন। কিন্তু আমাদের পোড়াকপাল তো তাঁর নজর পড়ার উপায় হল না। ততদিনে তিনি কোতায়।

—কী মুকস্ত কল্লি সেটা আগে শুনি।

—লেখাপড়া না শিখলে পরের মুখে ঝাল খেতে হয় বৈকি। শোনো, বিদ্যেসাগর যেমন বিধবা বিবাহ নিয়ে কোমর বাঁধলেন, তেমনি অপর পক্ষও তো তাঁকে ছেড়ে কতা কইল না। আমাদের দাদামশাই, পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মশাই যশোর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভায় বিদ্যেসাগরের বিরোধীতা করে সংস্কৃতে একটি বক্তৃতা দিলেন। তার কিছুকাল পরেই বিদ্যেসাগর ওই সভার সম্পাদক মশাই শ্রীযুক্তবাবু তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মশাইকে উদ্দেশ্য করে বা শিখণ্ডি খাড়া করে একখানি কেতাব লিখে ফেললেন। তাতে দাদামশাইকে যা নয় তাই গালিগালাজ কল্লেন। সেই কেতাবখানার নাম ব্রজবিলাস।

—বিদ্যোসাগর শেষকালে দা-মশাইকে গাল দিলেন। কিন্তু আমি যে নিজের চোকে দেখিচি, ওঁয়াকে তিনি দুপায়ে হাত দিয়ে পেন্নাম কল্লেন। হুঁ, সেদিন সকালে, গঙ্গার ধারে।

—তাহলে শোনো দিদি। একটুখানি নমুনা দি।

—শুনি।

—ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন বেহুদা পণ্ডিত।
আপাদমস্তক গুণ রতনে মণ্ডিত॥
শুভক্ষণে তাঁরে মাতা ধরিলা উদরে।
নাহি দেখি সম তাঁর ভুবন ভিতরে॥
বুদ্ধির তুলনা নাই যেন বৃহস্পতি।
রূপের তুলনা নাই যেন রতিপতি॥

এখানে এসে পণ্ডিত বড়মা থামলেন। হুঁ, আরও খানিক আচে।

বড়মা অবাক হয়ে বলে ওঠে, ও মা, এতে গাল দেওয়ার কি হল! সবই তো গুণের কতা কইলেন।

পণ্ডিত বড়মা ভ্রূ কুঁচকে বলেন, বেশ, তাহলে পদ্য তোমার মগজে সেঁধোবে না। এবার একটু গদ্য শোনো। বিদ্যেসাগর লিখচেন, 'একসময়ে, চৈতন্যদেব নদীয়ার চাঁদ বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। বোধ হয়, তাঁর রংটা বেস ফরসা ছিল, তাই তাঁকে নদীয়ার চাঁদ বলিত। যথার্থ গুণপ্রকাশ অনুসারে বলিতে গেলে, বিদ্যারত্ন খুড়ই নদীয়ার প্রকৃত চাঁদ। নদীয়ার চাঁদ, অর্থাৎ নদীয়া উজ্জ্বল করিয়াছেন।'

বড়মা বাঃ বাঃ। কি খাসাই না বল্লেন।

পণ্ডিত বড়মা, তাহলে আর একটু শোনো, 'কলিকালে তো অভিসম্পাত ফলে না, যদি ফলিত, রক্ষা থাকিত না। বিদ্যাভুড়ভুড়ি বিদ্যাবাগীশ খুড় মহাশয়েরা, কথায় কথায় অভিসম্পাত দিয়া থাকেন। তাহাতে, এ পর্যন্ত, কার কি হয়েছে।'

—'হুঁ, এখেনে যেন একটু মন্দ-কতা হল।

—হল তো!

—হ্যাঁ, তবে খুড়মশাই বলে খাতির তো কল্লেন। এই বা কম কি।

—তোমার বয়েসের জল অনেক দূর গড়িয়েচে। চার চারটে ভীম জুড়লেও তোমার ভীমরতি মাপা যায় না।

বড়মা এবার খানিক গলা তোলে. তবে একটা সত্যি কতা তো'কে বলি শৈল। আমি বিদ্যাসাগরের কোলে চড়েচি। তুই তো নয়। আর তাতে করে, সেই ছেলেবেলাতেই আমি টের পেয়েছিলুম কি সুন্দর সেই মানুষটির ছোঁয়া। তিনি যে আমায় বুকে ধরেছিলেন ভাই। ভারী ঠাণ্ডা। পবিত্তির।

—বাঃ বাঃ। কি ব্যাখ্যাই না কল্লে দিদি।

—কিন্তু একটা কতা খোলসা করে বল দিকি।

—কি কতা!

—এই তো—খানিক আগেই তুই বললি, তোর পোড়াকপালে তাঁর নজর পড়ার উপায় হল না। আবার ইদিকে ওঁয়াকে কাঁটা বিধচিস।

পণ্ডিত বড়মা এবার যেন কতক আনমনা। সামান্য এক পলকা নিঃশ্বাস। তারপর অন্যদিকে চেয়ে একটু নিচু স্বরে বলেন, অপরাধ নিও না দিদি। আমি বালবিধবা না হলেও কম বয়েসে বিধবা। তারওপর কিঞ্চিৎ সংস্কৃতও পড়েচি, আর ওই সংস্কৃত পড়াই আমার কাল হল।

বড়মা অবাক নেত্রে বলেন, ওমা ই-কি কতা! নেকাপড়া শিখে কারুর কাল হয় বলে তো কখনও শুনিনি বাপু।

পণ্ডিত বড়মা মাথা হেঁট করে এবার যেন নিজের বুকের পানে চোখ রাখেন। সে বুকে এখন শিথিল আলগা একথাবা মাংসপিণ্ড। মাথার পিছনে নিষ্ঠাভরে গোট করে বাঁধা শিখাগুচ্ছ বিনি বাতাসে দুল দুল করে। বড়মা কতক যেন নিজেকে শোনানোর কায়দায় বলে যান,

মামাকাশপ্রণিহিতভুজং নির্দয়াশ্লেষহেতোঃ
লব্ধায়াস্তে কথমপি ময়া স্বপ্নসন্দর্শনেষু।
পশ্যন্তীনাং ন খলু বহুশো ন স্থলীদেবতানাং
মুক্তাস্থূলাস্তরুকিশলয়েষ্বশ্রুলেষাঃ পতন্তি॥

পণ্ডিত বড়মার গলায় অচেনা এক ভিন্ন সুর ভর করে। তাঁর গুমোর হাঁকড়ানো বাজের ধারা কণ্ঠ কোথায় যেন মুখ লুকোয়। তাঁর কণ্ঠস্বরে মেঘ ঘিরে আসে।

আমাদের বড়মাও যেন ছোট ভগ্নীর এমন হাবভাব দেখে কিছুটা থমকে যান। তাঁর মুখেও কোনও বাক্য সরে না। তিনি দোক্তার কৌটো খুলে তার ভেতরে আঙুল ডোবান।

পণ্ডিত বড়মা এবার মাথা তোলেন। কোথায় গেল সেই ভাঁটা ভাঁটা নেত্রপাত। এখন

সে চোখ কি করুণ আর টলটলে। চোখের ফাঁদেও বুঝি এই শ্রাবণী মেঘের সমাচার। বড়মা বলে ওঠেন, স্বপ্নদর্শনে কোনও মতে তোমায় পেলে গাঢ় আলিঙ্গনের জন্যে আমি শূন্যে হাত বাড়াই। আমায় এমন করতে দেখে বনদেবতাদের মুক্তোর মতো কঠিন চোখের জলের দানাগুলো তরুকিশলয়ে বারংবার পতিত হয়।

বড়মা প্রশ্ন করে, এটা কার কতা কইলি রে শৈল?

পণ্ডিত বড়মা ছলছলে চোখ দু'হাতে ছেলেমানুষের মতো মুছতে মুছতে বলেন, কালিদাসের মেঘদূত। আমি ভুল বলিনি দিদি। লেখাপড়া না শিখলে এমন কাল আমার হত না। এ আমি তোমায় কেমন করে বোঝাই বল দিকি।

এরপর হঠাৎ আমার দিকে ফিরে চোখ পাকিয়ে বলে ওঠেন, তোর এই পুতিটা ভারি পোঁদ পাকা। বসে বসে কেবল বড়দেব কতা গিলবে।

তারপর আমার গাল টিপে আদর করেন। নিচু হয়ে আমার ঠোঁটে চুমু খান। আমি সেই পলিত ঠোঁট থেকে আতপচাল আর গব্যঘৃতের গন্ধ পাই।

পরদিন ভোরেই আমাদের পণ্ডিত বড়মা নবদ্বীপ যাত্রা করেন। রামশবণকাকা তাঁকে ট্রেনে তুলে দিতে যায়। যাওয়ার সময় আমায় বলে যান, সামনের বার এসে তোর গলায় একখানা কেত্তন শুনবো, হুঁ।

আমি হাঁ করে চেয়ে থাকি। তিনি আমার মাথাভর এক ধামা কোঁকড়া চুল খামচে ধরে বলেন, চেহারা চরিত্তিরে তো কেষ্ট কেষ্ট ভাব। এমন মুখে কি শুকনো রামপেসাদী মানায়।

জলঙ্গির জলে এখন এই প্রাতঃস্নানে একধারে সহচর জোড়া সমেত রামপ্রসাদ। খানিক তফাতে পণ্ডিত জগন্নাথ। রামপ্রসাদ লক্ষ্য করেছেন জলে নামার আগে পণ্ডিত মহাশয় নদীধারের মাটি দিয়ে বেশ খাসা করে অঙ্গমর্দন করে নিয়েছেন। এবার সেই অঙ্গে দু হাত দিয়ে কযে দলন করছেন। সেই অবসরে তাঁব আবাঁধা শিখাগুচ্ছ দ্রুত আন্দোলন করছে। তাঁকে দেখে প্রসাদের মানস পটে চাণক্য পণ্ডিতের ছবি আঁকা হচ্ছে। আর আঁকা হচ্ছে রামপ্রসাদের পিতৃবয়সী, বৃদ্ধ এই মানুষটির এখনও কি আশ্চর্য দেহসৌষ্ঠব, কপাট রোমশ বক্ষদেশ, বলবন্ত দুই বাহু।

ভজহরি রামপ্রসাদের দিকে কিঞ্চিৎ টাল খেয়ে বলে, বলি হাঁ দাঠাকুর, এ জম্মদগ্নি মুনিটি কেটা?

ওপাশ থেকে রামতনু বলেন, আরে মুখ্যু, তোকে নিয়ে যে আর পারা গেল না।

—কেন কেন! কি অপরাধ কল্লুম খোলুনচি দাদা!

– কেন, খানিক আগেই উনি নিজের নাম বল্লেন তো।

—অ। তা নামটা আবার শুনি।

—পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। হুঁ হুঁ বাবা। এ নাম কি ভোলবার।

ভজহরি ভুসস্ করে একটি ডুব দিয়ে উঠে বলে, এই সব বামুন পণ্ডিতদেব নামগুলো সব ভজঘট। কিছুতেই মনে রয় না। তারচেয়ে দেখো দিকি আমাব দা-ঠাকুরের নাম। রামপেসাদ, কি চমৎকার খাসা।

রামপ্রসাদ হেসে কন, আর তোর নামটিই কি কম খাসা, ভজহরি।

রামতনু ছেলেমানুষী গলায় বলেন, আর আমার নামটি?

রামপ্রসাদের হাসি আর এক ধাপ চড়ে, রাম অবধি ঠিক আছে। কিন্তু ওই তনু থেকে যত গোল।

ভজহরি ফুট দেয়, যা বললে দাদা। ওখেন থেকেই যত ঝামেলির শুরু।

ওধার থেকে পণ্ডিত জগন্নাথ কথা কন, তাহলে তুমিই সেই হালিসহর কুমারহট্টের রামপ্রসাদ সেন। হুঁ, তোমার কবি খ্যাতির বৃত্তান্ত আমি শুনেছি বটে। তা হলেও তোমায় আর আপনি আজ্ঞে করা গেল না।

প্রসাদ করজোড়ে বলেন, আপনি অমন করে বল্লে আমার যে লজ্জার সীমা থাকে না।

জগন্নাথ চোখ বড় বড় করে ঘাড় ফেরান, কেন! এ কথা কেন!

—আজ্ঞে, আপনি হলেন সাক্ষাৎ সরস্বতীপুত্র। আপনাব জিহ্বাগ্রে স্বয়ং বাগদেবী বিরাজ করেন। আপনি হলেন নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক।

—কে বললে তোমায় এসব কথা!

—আজ্ঞে, লোকমুখে জীবৎকালেই আপনার নামে কবিতা ফেরে। এ ভাগ্য কি সবার হয়!

—কবিতা!

—যে আজ্ঞে। সাক্ষাৎ বরদাপুত্র নামে জগন্নাথ, তর্কপঞ্চাননরূপে ভুবন বিখ্যাত।

—বটে। কিন্তু তুমিও তো কম নও বাবা। আমার কথা পণ্ডিতজনে হয়তো জানে। কিন্তু তোমার সমাচার নিরন্ন ভিখারির মুখে মুখে ফেরে।

প্রসাদ চুপ করে চেয়ে রন এই জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতটির পানে। তাঁর মুখে এখন কোনও বাক্য সরে না।

জগন্নাথ আবার বলে ওঠেন, হ্যাঁ, আমি নিজ কর্ণে শুনেছি। দিস মা কালী ফলার খেতে। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ মেলে যাতে। গাও না। দু কলি গাও না হে।

রামপ্রসাদ আবক্ষ জলে দাঁড়িয়ে সহসাপ্রাপ্ত আবেগ অতি কষ্টে দমন করেন। একবার আড় নয়নে রামতনুর দিকে তাকান। তারপর এক হস্ত নদীর আকাশে তুলে ধরে গেয়ে ওঠেন,

ধর্মলাভ হয় নিমন্ত্রণে, বুঝে দেখ মনে মনে,
অর্থলাভ তার পরক্ষণে, দক্ষিণাটি হলে হাতে॥
কাম মোক্ষ নাই গো করে,
যখন এসে ঘুমাই ঘরে,
রামপ্রসাদ বলে ফলার পেলে,
ভয় থাকে না সংসারেতে।

সদ্য সূর্যের রক্তাভায় নদীর জল ঝলমল করে। স্রোতঃপুঞ্জে নবীন আলোর দিন নৃত্য করে ওঠে। এক আকাশ থেকে আকাশান্তরে যাত্রা করে প্রসাদী সুর বর্ণনার ছটাপটা। কবিতার সহজিয়া আর প্রাকৃতিক আলো নদীর জলে যাত্রা করে কোন অলীক দূর দেশে।

গান ফুরোয়। অনেকটা সময় কারও মুখে কোনও কথা থাকে না। পণ্ডিত জগন্নাথ একটি স্থলিত নিঃশ্বাস ফেলে বলে ওঠেন, আহা, আহা। এই জন্যেই আমি বুঝি পণ্ডিত। জন্মজন্মান্তরের সাধনাতেও তোমার মতো অমন করে কবিতা বলতে পারব না। সুরের কথা তো ছাড়ানই দাও।

রামতনু আর রইতে পারেন না। তিনি পর পর তিন তিনটি ডুব দিয়ে চক্ষু লাল অবস্থায় বলে ওঠেন, তাও তো ফাঁকা গান শুনলেন। সঙ্গত না হলে কি গান বাজনা হয়।

জগন্নাথ ভ্রূকুঁচকে তাকান রামতনুর দিকে। তারপর গম্ভীর সন্দেহ বিজড়িত গলায় বলে ওঠেন, তা ইটি কে!

রামতনু সোৎসাহে বলে ওঠেন, আজ্ঞা, আমি পেসাদের পাড়াঘোরো দাদা হলেও সে ভারী সম্মান করে আমায়। আমি ওর সঙ্গে শ্রী খোল বাজাই কি না। ও আবার আমার সঙ্গত ভিন্ন গান গাইতেই পারে না।

জগন্নাথের পক্ক ভ্রূ যুগল আরও কুঞ্চিত হয়। অ, তার মানে খোলুনচি। তা আমি তো গান-বাজনা সেরকম বুঝি না। তবে বিনি খোলেই যা শুনলুম, তাই তো অমৃত, অমৃত, অমৃত।

ভজহরিই বা কম কি সে। সে একটু ফাঁক পেয়ে মুখ সেঁধোয়, অপরাধ নেবেন না পণ্ডিতমশাই। আমার এই দাদাটি আমৃত্তির নয়, জিলাপি, জিলাপি। ওঁয়ার পা থেকে মাথা অবদি প্যাঁচ।

জগন্নাথের মুখে পলকা হাসির ছটা একবার পড়েই মিলিয়ে যায়। —রামপ্রসাদ, তোমার এই নন্দী-ভৃঙ্গি জোড়া দিব্যু কথা কয় তো।

প্রসাদ জলে দাঁড়িয়েই আরও একবার জোড় হস্তে নমস্কার রাখেন পণ্ডিত জগন্নাথের প্রতি। তারপর বলে ওঠেন, আমি শুনেছি এক সমাজ পতিত গরিব বামুনকে আপনি প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে সমাজে তুলেছেন, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুমোদন ছাড়া। ফলে রাজা নাকি কুপিত হয়ে আপনাকে তাঁর বাজপেয়ী যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করেননি।

জগন্নাথ গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, যথার্থই শুনেছ। আমি রাজার গুণগ্রাহী, কিন্তু ভৃত্য তো নই। তাহলে দেশে গণতন্ত্র বলে কোনও কথা থাকত না। সবটাই একনায়ক রাজতন্ত্র।

—তাহলে বিনি নিমন্ত্রণে আপনি কেমন করে এলেন।

—কেন বাপ। পদব্রজে।

—না, অথাৎ নিমন্ত্রণ বিনা—

—শোন হে কবিবর, একটি ঘটনা বলি। তোমাদের ওই কলকেতা নগরির এক রাজা তাঁর মাতৃশ্রাদ্ধে জনৈক পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করেননি। তা সেই পণ্ডিত যাতে করে রাজার বাড়ি একটি পত্র পাওয়া যায় এই উদ্দেশ্যে আমায় এসে ধরলেন। আমি তখন সেই পণ্ডিতকে সিধে পাঠিয়ে দিলাম রাজার সভাপণ্ডিত চর্তুভুজ ন্যায়রত্নর কাছে। ওঁর তদবিরে ওই পণ্ডিতমশাই একটি নিমন্ত্রণপত্র পেলেও পেতে পারেন। কিন্তু জানা গেল, এ বিষয়ে চতুর্ভুজের কোনও হাত নেই।

—তারপর!

—তারপর আর কি! আমি বল্লাম—চতুর্ভুজে ভুজো নাস্তি নির্ভুজঃ কিং করিষ্যতি।

রামতনু চক্ষু ছানাবড়া করে বলে ওঠে, আজ্ঞে অর্থটা যে বোঝা গেল না।

জগন্নাথ মৃদু হাসেন, বাপু হে, পুরীর জগন্নাথ দেবের কটি হাত আছে শুনি?

—আজ্ঞে একটিও নেই।

—চতুর্ভুজের যদি কোনও হাত না থাকে তাহলে আমার মতো নির্ভুজ কি করবে। বোঝা গেল তো।

ভজহরি করতালি বাজিয়ে বলে ওঠে, গেল মানে! একেবারে জলবৎ।

রামতনু বলেন, শ্রীক্ষেত্তর পুরীর জগন্নাথের হাত নেই। আপনারও নেই। বাঃ, বাঃ। একেই বলে পণ্ডিত।

জগন্নাথ হাসি দমন করে বলেন, বলে নাকি।

প্রসাদ মহা আতান্তরে পড়েন এই দুই সরল আর আকাট সহচর নিয়ে। কিন্তু কি আর করা। তিনি বলেন, কিন্তু বিনি নেমন্তন্নে আপনি কেন এলেন পণ্ডিতমশাই।

জগন্নাথ মন্দ্র স্বরে বলে যান. শোন রামপ্রসাদ, কেন এলাম তার জবাবটি তুমি নিজকর্ণেই শুনে যাবে, যজ্ঞের শেষ দিনে। অর্থাৎ পঞ্চম দিবসে। ওই দিন আমি রাজার যজ্ঞস্থলে রবাহুত অবস্থাতেই উপনীত হবো। আর আমার সঙ্গে থাকবে একশত ছাত্র। তারা সব যথাসময়ে রওয়ানা হয়ে কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হবে ওইদিন।

—তাহলে আপনি এখন একা এসেছেন।

—যথার্থই। আমি আমার এক ছাত্রের গৃহে উঠেছি। রাজার আতিথ্য তো এ অবস্থায় গ্রহণ করার প্রশ্নই ওঠে না।

প্রসাদ অবাক হয়ে এই চাণক্যসম পণ্ডিতকে শুধু নিরীক্ষণ করেন।

এ দেশে বাঙালির তেজ এখনও মরেনি। এই প্রায় বৃদ্ধই তার সেরা উদাহরণ। প্রসাদ স্নান অন্তে ঘাটে ওঠেন। উঠে পড়ে জোড়া সরচরও। জগন্নাথের স্নান তখনও সমাপন হয় না। তেজী চাণক্য মহাতেজে নিজের দুই রোমশ বাহু, জঙ্ঘা রগড়াতে থাকেন।

ঘাটে উঠে প্রসাদ বলেন, আচ্ছা পণ্ডিতমশাই, আমি শুনেছি, আপনার বাসভূমি ত্রিবেণীতে নাকি সরস্বতী দিনরাতের মধ্যে অন্তত একক্ষণের জন্যও অধিষ্ঠান করেন।

জগন্নাথ বলে ওঠেন, ত্রিবেণীতে সরস্বতী দিবারাত্র প্রত্যক্ষ।

প্রসাদ সহর্ষে বলে ওঠেন. বাঃ বাঃ। সরস্বতী তো ত্রিবেণীর এক নদী। কে বলে আপনি কবি নন! আপনি তো কবিচন্দ্র পণ্ডিতমশাই।

রাজ আবাসে ফিরতে ফিরতে, সকালবেলার রৌদ্র কলরবের মাঝখান দিয়ে চলতে চলতে রামপ্রসাদ সেদিন রাজার সুমুখে ব্যাজার মনে যে গীতখানির সূচনা করেছিলেন তার বাকিটুকু বেঁধে ফেলেন। রামতনু মুখে বিচিত্র শব্দ করে নকল খোলের বাদ্য বাজান। গীত হয় আড়াতালে, বসন্তবাহারে।

ত্যজ মন কুজন-ভুজঙ্গ সঙ্গ।
কাল-মত্ত মাতঙ্গেরে না কর আতঙ্ক॥
অনিত্য বিষয় ত্যজ, নিত্য নিত্যময়ে ভজ,
মকরন্দরসে মজ, ওরে মনোভৃঙ্গ।
স্বপ্নে রাজ্য লভ্য যেমন, নিদ্রাভঙ্গে ভাব কেমন,
বিষয় জানিবে তেমন হলে নিদ্রাভঙ্গ॥
অন্ধস্কন্ধে অন্ধ চড়ে, উভয়েতে কূপে পড়ে,
কর্মীকে কি কর্মে ছাড়ে, তার কি প্রসঙ্গ॥

এই যে তোমার ঘরে, ছয় চোরে চুরি করে,
তুমি যাও পরের ঘরে, এ ত বড় রঙ্গ।
প্রসাদ বলে কাব্য এটা, তোমাতে জন্মিল যেটা,
অঙ্গহীন হয়ে সেটা দগ্ধ করে অঙ্গ॥

আঠাশ

পণ্ডিতপ্রবর জগন্নাথ তর্ক পঞ্চাননের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা মন থেকে কিছুতেই নামানো যায় না। কেবলই ঘুরে ফিরে ঘিরে আসে আজকের প্রভাতী বিবরণ। বলতে গেলে অকস্মাৎই জলঙ্গির ধারে দেখা পাওয়া সেই ভুবনখ্যাত পণ্ডিতজনের। কিন্তু সেই মানুষটির সঙ্গে সামান্যক্ষণ মাত্র কথা কয়ে রামপ্রসাদের অন্তঃকরণ মানুষী কৃতকৃতার্থতায় ভরে গিয়েছে। পাণ্ডিত্যের পাথুরে খোলসের আবডালে কি আশ্চর্যই না দলদল করছে নিখাদ সরল আর একখণ্ড তরল মানুষের অবয়ব। সেই মানুষকে কে বলে শুষ্ক পণ্ডিত!

কিন্তু, রাজার বাজপেয়ী যজ্ঞ আরম্ভ হতে মাঝখানে মাত্র দুটি দিন। যজ্ঞ আরম্ভ দিবস থেকে চলবে পাঁচ-পাঁচটি দিবস। পণ্ডিত মহাশয় বলেছেন, ওই শেষ দিনে যজ্ঞস্থলে তাঁর আগমন ঘটবে, একশত শিষ্য সমেত। অনিমন্ত্রিত হয়েও তিনি ওখানে সদলবলে উপস্থিত হলে কি অর্থানার্থ ঘটবে তা কে জানে। এ নিয়ে রামপ্রসাদের বুকের ভিতরে চিন্তার কাঁটা খচখচ করে অবিবত। মনকে শান্ত করতে তিনি এটা ওটা ভাবতে চান। কেন না, একমাত্র তিনিই জানেন. রাজার মনে এখন কি পরিমাণই না ভার জমা পড়েছে। এ অবস্থায় পণ্ডিত প্রবরের তরফ হতে যদি কোনও আন্দোলন ঘটে তাহলে সে ভারী দুর্দৈব ছাড়া আর কি বা ভাবা যেতে পারে।

এছাড়া, মন বারে বারেই ঘুরে ফিরে চলে যাচ্ছে কুমারহট্ট হালিসহরে। কেমন আছে পরিবার পরিজন, কে জানে। কেমন আছে নিত্য ভোগ প্রার্থী সন্ধ্যার সেই শিবাদল। এই কটি দিন বেচারিদের বুঝি প্রায় নিরন্নই কাটছে। সর্বাণীকে বলে এলেও কোনও লাভ ছিল না। কারণ তারা প্রসাদ ভিন্ন আর কারও হাতের অন্নে অভ্যস্ত নয়।

হালিসহরের নিবিড় বুনো গাছস্থল আর অবারিত গঙ্গা ছাড়াও মনে পড়ছে সেই আমোদ খেপা গোস্বামী অযোধ্যানাথের প্রসঙ্গ। তার সঙ্গে কলহ-বিবাদের নাট্য না করলে যেন দিনগুলো একঘেয়ে হয়ে যায়। সেই বা কেমন আছে! কেমন আছে নিঝুম গঙ্গাতীর, প্রাচীন শিকড়বাকড়ধারী বনস্পতি, চড়কতলার বিস্তৃত মাঠ, এখানে সেখানে বুনো ফুলদল, অ-দখলি পঞ্চবটির গায়ে মাথায় বসতকারী পাখ-পাখালের রাজত্ব! রাজার যাগ এখনও আরম্ভ না হতেই মনের ভিতর থেকে মনখানি উড়ু উড়ু ডানা মেলছে।

ভজহরি-রামতনু দুজনাতে রাজার নগর দেখতে বেরিয়েছে। রামপ্রসাদ একা একা অতিথিনিবাসের বারান্দায় বসে দেখছেন রাজ যজ্ঞের আয়োজনে ভারে ভারে থরে থরে কত না সামগ্রী আসছে। বড় বড় বাঁশের ঝাঁকায় করে আসছে স্তূপীকৃত মেটে হাঁড়ি, মালসা। স্থানীয় গোপগণ বাঁকে বয়ে আনছে দিব্যগন্ধী গব্য ঘৃতের পাত্র। ভারে ভারে দুগ্ধ, দধি। অসংখ্য আর হরেক আকারি তাম্রপাত্র। গো-গাড়ি বোঝাই হয়ে আসছে রাশি রাশি বিল্বপত্র আর যজ্ঞের শমিধ। আনা হচ্ছে, মধুর ভাণ্ড, শর্করাপূর্ণ পাত্র, মধুপর্ক, জায়ফল,

লবঙ্গ, কক্কোলচুর্ণ, অজস্র স্বর্ণ আর রৌপ্যপাত্র, বিবিধ গন্ধ দ্রব্য, ধূপ, ধুনা, মেটে এবং ধাতুর প্রদীপ, রাশিকৃত বস্ত্র। বাহকরা বয়ে আনছে ধান্য, মাষকলাই, তিল, মুগ ও যব। অতি সাবধানে আনা হচ্ছে স্বর্ণ, হীরক, নীলমণি, পদ্মরাগ ও মুক্তাদি পঞ্চরত্ন। আসছে হীরকাদি নবরত্ন। আম, পাকুড়, বট, অশ্বত্থ ও যজ্ঞডুমুরের পত্র-ডাল-পল্লব। মুরামাংসী, জটামাংসী, বচ, কুড়, শৈলজা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শঠী, চম্পক, মুথা জাতীয় সর্বৌষধি। আনা হচ্ছে কুশের পাঁজা। চন্দন কাষ্ঠ। গোমূত্র ও গোময়। গঙ্গামৃত্তিকা। আসছে ভারীর মাথায় চড়ে মস্ত মস্ত মেটে জ্বালা বোঝাই গঙ্গাজল। সম্ভবত এই জল নিয়ে আসা হল ত্রিবেণী হতে। ত্রিবেণীর পণ্ডিত জগন্নাথ রবাহুত হলেও তত্রকার পবিত্র গঙ্গোদক এ যাগে যে অপরিহার্য।

এই যাগ আসন্নকালে, রাজার এই শুভ অনুধ্যান আয়োজনের প্রাক মুহূর্তে, তাঁর এখনকার মনোবিষাদ রামপ্রসাদকে মনে মনে ভারী ব্যাকুল করে রেখেছে। বাইরের এতসব আয়োজন—আড়ম্বরাদি তাঁকে মন সরিয়ে নিতে সহায় দেয় না। তিনি মনে মনে এর থেকে বাহির হওয়ার পথ খোঁজেন। সেই পন্থা বুঝি আপাতত দেবী চণ্ডিকার স্তুতিপথে এসে থামে।

হিত্বা চণ্ডি হিরণ্যদারণপটুপ্রোদ্দামহস্তাঙ্গুলিঃ
ক্ষায়ৎকদ্রু সুমেরুসোদর সটাটোপং নৃসিংহংসুরাঃ।
মাতস্তৎপশুপাশপেষণ পটু-শ্রীপাদসংসেবিনং
সেবন্তে করিবৈরিণং কিমারিভি-ভীর্তির্ভবৎসেবিনঃ॥

হে মাতঃ চণ্ডিকে। তুমি হিরণ্যকশিপুর বক্ষ বিদারণপটু হস্ত অঙ্গুলি বিশিষ্ট সুমেরুস্পর্শী জটাভার সম্পন্ন নৃসিংহভূর্তি ধারণ করেছিলে। সুরগণ ওই মূর্তির উপাসনা না করে তোমার পশুপাশ পেষণ পটু গজাসুর বিমর্দক মূর্তির সেবা করে থাকেন। হে জননী, যে জন যে কোনও আকারে তোমার সেবা করে, তাদের শত্রুভয় হতে পারে না।

হে চণ্ডি, তুমি পুরুষপ্রকৃতি স্বরূপিণী—এই কথা ব্রহ্মাদি সুরগণ কীর্তন করে থাকেন। আমি যেন নিখিলদেবগণ-সাগর শোভমান তোমার শ্রীপদ-কমল সমাশ্লেষে সক্ষম হই।

হে মাতঃ আমি তোমার পাদপদ্ম দুখানির ধ্যানে নিরত আছি। অতএব আমার সিদ্ধক্ষেত্রাদির প্রয়োজন কি। প্রার্থনা করি, তোমার পাদপদ্ম আমার মনে যেন সংস্থিত থাকে। মাতঃ ক্ষেমঙ্করি, আমার অপরাধ মার্জনা কর।

হে মাতঃ, তোমার পদকমলের অংশুজাল হতে নির্মল চিদানন্দমূর্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র আবির্ভূত হয়ে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করে থাকেন, সেই নীরদকান্তি চরণযুগল আমার চিত্তে নিরন্তর সংস্থিত হোক।

হে জননী, যারা শক্রাদিসম্পূজিতা তোমার এইরূপ বিমলা মূর্তির ধ্যান করে তারা পরের সংক্ষোভাদি করতে সক্ষম এবং রাজ্যলাভ ও শত্রুজয় করতে সমর্থ হয়। তাদের বুদ্ধি সদর্থে বিনির্গত হয়, তারা কাব্যামৃত পান করতে সক্ষম হয়।

এ পর্যন্ত দেবী চণ্ডিকার মানস স্তুতির পর রামপ্রসাদের মনোব্যাকুলতা খানিক বুঝি প্রশান্তি দেখে। এ ছাড়া তাঁর তরফ থেকে আর কি বা করার থাকতে পারে। রাজার মঙ্গলকামনার জন্য তাঁকে ঘিরে থাকা পণ্ডিত সভাজনের মন্ত্রশক্তি, হরেক মারণ, উচাটন, প্রক্রিয়া নিচয় মজুদ আছে। তাঁদের প্রার্থনা নিবেদনের চেয়ে বলদর্পীতা অধিক। প্রকৃতি

জননীর কোলে উঠে গলা জাপটিয়ে আবদার করার চেয়ে দেহি দেহি হুঙ্কার, সে ভারী ছিনিয়ে নেওয়ারই নামান্তর। প্রসাদ সে পথ জানেন না। ফলে এই সামান্য পুথি কপচানো অনুনয়। প্রার্থনা, এই রাজটির যেন কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি না ঘটে। কৃষ্ণচন্দ্রের বিষয়ে রাজা তত্ত্বটি সরিয়ে রেখে প্রসাদ শুধুমাত্র তাঁর ব্যক্তিমানুষী সমাচার নিয়ে বিচলিত। রাজা মানেই সিংহাসন অক্ষুণ্ণ রাখার নিয়মে বাঁধা। এই রাজাটিও তার বাইরের নন। তথাপি, আর পাঁচটি রাজার চেয়ে এই মানুষটি বিস্তর আলাদা। প্রসাদের সঙ্গে মানসিক অনুরণনে কোথায় যেন একটি বাঁধন রয়ে গিয়েছে। সেখানে রাজার তন্ত্র প্রিয়তা একটি নিছক হেতু মাত্র। পঞ্চজনে সে কথা বললেও প্রসাদ নিজের কাছে এ নিয়ে নিঃসংশয়।

পাশাপাশি আর এক প্রশ্নও তাঁর মনকে চাবুক হাঁকড়ায়। একজন অতি সাধারণ মানুষ তিনি, বাড়তি শুধু কাব্য গীত রচনা। আর আছে ভারী ব্যক্তিগত, কালীকায় সমর্পণ, এমন মানুষ সমাজে বিরল নয়। বিরল শুধু, এমন একটি নির্জন চিত্তের অধিকার থাকা সত্ত্বেও কেন যে তিনি মরতে রাজা-রাজড়ার ফাঁদে পা দিয়ে বসে আছেন! কেন দেশ সমাজের বিবিধ বিড়ম্বনা নিয়ে তাঁর চিত্ত ব্যাকুলতা। তবে এ নিয়ে চিন্তা করে দেখা গেছে, ঘুরপথে কোথা থেকে যেন কবিতা রচনার কালে এই যাবতীয় বাস্তবতা আশ্চর্য ইন্ধন যোগান দেয়। কবিতার কালী নামামৃত দেশ মায়ের মায়া প্রপঞ্চময়তায় ঘুরে দাঁড়ায়। সেইসব মায়ার পাকে পাকে অলীক ও কুট বাস্তবতার তপ্ত আভাস গন গন করে।

রামপ্রসাদ একাকী এই সকালবেলাকার রাজ আলয়ে বসে রইলেও মন ঘুরে বেড়াচ্ছে যথাতথা, আকাশ হতে মাটি, কৃষ্ণনগর থেকে হালিসহর। আহা মনেব কি বিচিত্র ভ্রমণ পরম্পরা।

ঠিক এমনই স্থলে, মনোভূমির এমত অবস্থার সুমুখে, অতিথিশালায় দিকে যে দীর্ঘাকৃতি মানুষ মূর্তিখানিকে এগিয়ে আসতে দেখা যায় সেটি ভারতচন্দ্রের। কবির সন্নিধানে আর এক কবির আগমন। ভারতচন্দ্রের সুচারু কাঠামোর পরণে জরিদার ধুতি। কবাট চওড়া বুকের উপর দুলন্ত পুরু জরির পাড়ধারী উত্তরিয়। কপালের মাঝখানে চন্দন তিলক। সেই সঙ্গে গলায় একখানি টাটকা ফুলমালাও।

প্রসাদ উঠে দাঁড়ান ভারতচন্দ্রকে দেখে। ভারতচন্দ্রের সুন্দর সহাস্য মুখ প্রসাদকে দেখে আরও অধিক হাস্য মধুর হয়। সেই মধুময় মুখ নিয়ে ভারতচন্দ্র এসে দাঁড়ান প্রসাদের সুমুখে। প্রসাদ দুই হাত দিয়ে ভারতচন্দ্রের হাত দুখানি জড়িয়ে ধরে নিজ বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলে ওঠেন, দাদা গো, আজ এই সকালে তোমার এই চাঁদপানা মুখখানি দেখে আমার মনে নূতন একখানি পদ উঠে পড়ল যে।

ভারত সহাস্যে কন, বেটামানুষের মুখ দেখলে যদি পদ উঠে দাঁড়ায়, তাহলে ডাগর কামিনীর মুখ দেখলে কি হবে কে জানে।

প্রসাদ, আমার আবার এক রমণীতেই সমর্পিত প্রাণ। তোমার ভ্রাতৃবধূটির রসরঙ্গ যে অনন্ত।

—বটে বটে। ভাগ্য আমার ভারী ঘরোয়া দেখছি। তা আমায় দেখে কি পদ মনে চাগাড় দিল শুনি দেখি।

প্রসাদ, বলি শোন।

ও নৌকা বেও রে মন কার নূতন কাণ্ডারী,

রঙ্গে ব্রজবধূর সঙ্গে॥
আতপ লাঘব হেতু, তরুণী ভরা তরণী।
চালন কর মনের সঙ্গে।
আপন করহে পণ, চাওহে যৌবন ধন,
হাসভাস প্রেম-তরঙ্গে॥

ভারত, বলিহারি। বলিহারি। তাহলে রাজসভায় তুমি আমার ভাগ্না, আর এমনিতে ভাই ভাই। কি বলো।

—যথার্থ কথা। পৃথিবীর সকল কবিকূলই তো ভাই-এর সুতোয় বাঁধা।

—তবু ভাল, ভায়রাভাই নয়। তাহলে সম্পর্কটা ভজঘট হয়ে যাবে ভায়া। ভায়রা একপ্রকার ভাই বটে, কিন্তু তার বউটির কথা মনে পড়লেই চিত্তচঞ্চল হয় যে, সেও তো এক নায়িকা বটে।

প্রসাদ, কিরকম শুনি।

—শুনবে। তাহলে বলি নায়িকার অবস্থাভেদ।

—বলো দাদা।

ভারত,

এসব নায়িকা পুনঃ অষ্টমত হয়।
বিপ্রলব্ধা সম্ভোগ তাহার পরিচয়॥
বাসসজ্জা উৎকণ্ঠিতা ও অভিসারিকা।
বিপ্রলব্ধা তারপর স্বাধীনভর্তৃকা॥
খণ্ডিতা তাহার পর কলহান্তরিতা।
প্রোষিতভর্তৃকা এই অষ্ট পরিমিতা॥

প্রসাদ দুই হাতে তালি বাজিয়ে বলে ওঠেন, বলিকালী, বলিকালী। দাদার রঙ্গরসের কোনও তুলনা নেই। রাজা কি এমনি এত রসেবশে আছেন।

ভারত, তাহলে রাজার রস তরঙ্গের একটি কাহিনি বলি তোমায়।

—বলো বলো।

—হয়েছিল কি, রাজা তো জানেন আমার পরিবার আমার কাছে থাকেন না। আমি ইষ্টনিষ্ঠ। সন্ধ্যাহ্নিক আর কবিতা রচনা করেই আমার দিন কাটে। তা একদিন এই সুযোগে রসরাজ কৃষ্ণচন্দ্র মধ্যরাতে আমার ঘরে এক যবনজাতীয়া, সুরূপা আর লোচনানন্দদায়িনী বারবনিতাকে যথাযথ শিখিয়ে পড়িয়ে পাঠালেন। তা সেই নিলাজ রমণীটি এসে কল্লে কি, আমার গলা গড়িয়ে ধরে সঘন আলিঙ্গন দিলে। আমি প্রথমত অপ্রস্তুত, দ্বিতীয়ে যারপরনাই বিরক্ত। আমি ঝটকা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম। সে তো ভারী অপমানিতা হয়ে রাজার কাছে যেয়ে বল্লে, মহারাজ, কি এক অসভ্য, অরসিক ব্যক্তির কাছে আমায় পাঠালেন। বৃত্তান্ত শুনে মহারাজ ভারী কুপিত হয়ে আমায় তলব কল্লেন এবং আমার এই মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অপমান করার হেতু জানতে চাইলেন।

—সর্বনাশ। তা তুমি কি বল্লে দাদা।

ভারত টিপি টিপি হাসেন, বল্লাম, মহারাজ, আপনার প্রেরিতা বারবণিতা যে ডাকছাড়া সুন্দরী সে বিষয়ে আমার কোনও সংশয় নেই। আর আপনার তরফ থেকে এমন উপহারকে অপমান করার মুরোদও আমার নেই। তবে কি না সেই রমণী তার পীনোন্নত পয়োধরযুগল দিয়ে যখন আমার বুকে আঘাত কল্লে, তখন সেই অতীব কঠিন স্তন পীড়নে আমার বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে গেল। মনে হল, বুঝি আমার বক্ষ ফুঁড়ে ওই কুচাগ্রভাগ বিনির্গত হয়েছে। সেই ভয়ে আমি মুখ ফিরিয়ে পৃষ্ঠদেশ নিরীক্ষণ করছিলাম মহারাজ।

রামপ্রসাদ দুহাতে ভারতচন্দ্রের হাত জোড়া আকর্ষণ করে সুরে বলে ওঠেন, ও নৌকা বাও হে ত্বরা করি নূতন কাণ্ডারী, রঙ্গে ব্রজবধূর সঙ্গে...

পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আমার মাতামহ। নিবাস কেন্দ্রীয় সরকারি বিশাল আবাসে, কাঁচরাপাড়া অফিসার্স কলোনি কোয়ার্টার্সে। তাঁদের জীবনধারার সঙ্গে হরেক কারণে আমাদের, মানে পিতৃপক্ষের দুস্তর বেমিল। আমাদের শেকড় পোঁতা খাস রাঢ় দেশের বর্ধমান জেলার একটি প্রাচীন শিথিল বসতি গ্রামদেশে। আমরা ঠাকুর্দা, সে দেশ ছাড়া পিতৃবিয়োগের কিছু পরেই। রাঁচি থেকে তাঁর এক অতি মাতাল তথা আনুষঙ্গিক গুণধারী অথচ দেদার প্রাণ খুড়ো এসে নিয়ে যান নিজের কাছে। খুড়োটির পরিবার স্বামীর গুণধামা বইতে না পেরে বাপের বাড়ি সেই যে গেলেন, আর ফেরা নাস্তি। সে কথা থাক। মাতামহদিগের পরিচয় বলার সময় এখন।

মাতামহের বংশের কেন যে 'প' বর্গের প্রতি এত পক্ষপাত তা কে জানে। আদপে যশোরের মানুষ এঁরা! তবে আমার দিদি বা দিদিমা হলেন কাষ্ঠ বাঙাল, মানে নিখাদ ফরিদপুর উৎপন্ন। এখানে বলা ভাল, ফরিদপুর-যশোরে মিলজুল হতেই পারে, কিন্তু পূর্ণচন্দ্র কি প্রকারে 'প' বর্গীয় পারুলবালা মুখোপাধ্যায়কে পেয়ে গেলেন সে নিয়ে ভারী রহস্য আমার মনে।

মাতামহকে আমি বলি কানুটি। এ নিয়ে আমার কানুবাবার মারণ-উচাটন প্রয়োগ কত ভাবে যে। তবু 'দাদু' মুখে ফোটে না। একেবারে শিশুকালে, মামার বাড়ি কাঁচরাপাড়া ফোরম্যানস কলোনির দরাজ বাগানবাড়ি সম একতলা কোয়ার্টারের মস্ত বারান্দায় মাতামহ-কানুটি অফিস ফেরত উপবিষ্ট। আমায় কাছে ডেকে গুরুতর গম্ভীর মানুষটি হঠাৎ বলে উঠলেন, কান্যাট দে, কান্যাট দে। অর্থাৎ, এখন আমায় দু-হাতে নিজ কান ধরতে হবে। তারপর তাঁর স্বরচিত কাব্য আওড়ানো, দাদা নাচে, কানুটি নাচে, বাঃ বাঃ নাচে, কানুটি নাচে, ইত্যাদি। রেল অপিসের তখনকার ফোরম্যান মানে বেশ গুরুতর। সেই ছন্দে বাঁধা কবিতার সঙ্গে আমি দু-কান পাকড়ে তালে তালে ওঠ বোস করে চলেছি। অদূরে বসে আমার কানুটির বুড়ি মা নলিনীসুন্দরী, তাঁর ফর্সা ছোট্টখাট্টো রোগা ধবধবে থান পরা আড়া ভেঙে মিটি মিটি হাসছেন। হাসির তালে তাঁর বাঁ গালে ভোমরা সদৃশ, টঙে এক জোড়া চুল বসানো, আঁচিল টুলটুল করছে।

পূর্ণচন্দ্ররা দু'ভাই। বড়জন, আমাদের বড়দাদু, প্রবোধচন্দ্র, যথেষ্ট উন্মাদ এবং রেলে বড়বাবু। এই দুই দাদুর বাবা ছিলেন প্রকাশচন্দ্র। তস্য পিতা, প্রবলচন্দ্র। প্রবলের বাবা প্রতাপচন্দ্র। এখানে বাপ-বেটার প্রবল-প্রতাপ নাম সম্মিলন লক্ষণীয়।

কে জানে, কারও নাম হয়তো ছিল পয়োধি। কাঁচরাপাড়ায় ভূষণচন্দ্রের দোকানে

নামকরা মিষ্টির পাশে দই-এর এই সংস্কৃত নামধরে ডাকা পয়োধি কি চমৎকার। তবে আমি এক ব্যক্তির নাম জানি। দধি। রোগা পাতলা ফর্সা আর অতি চিকন নাক-প্রধান মানুষটির ধারা আড়ার সঙ্গে দধি ছাড়া আর কোনও নামই যেন মানায় না।

আমার দাদু-কানুটির চেয়ে তাঁর প্রবোধচন্দ্র অগ্রজ পাঁচ বছরের বড়। একে অপরকে যথাক্রমে বড়বাবু আর পূর্ণবাবু বলে ডাকেন। বাড়ির চাকরদের মুখ থেকে এই ডাকাডাকি উঠে এসেছে। আগে কাঁচরাপাড়া বাবু ব্লকের রেল কোয়ার্টারে দাদা-ভাইয়ের এক হাঁড়ি ছিল। প্রবোধচন্দ্র শৈশবে সাময়িক পক্ষাঘাত জনিত রোগের কারণে, জীবনভর আধখানা জড়বুদ্ধি, পঁয়ত্রিশ ভাগ উন্মাদ আর বাকি পনের দফা স্বাভাবিক। কাঁচরাপাড়া হার্নেট স্কুলের দোতলা কোয়ার্টারের ছাদে দাঁড়িয়ে দেখতাম, রিকশায় চড়ে বড়দাদু সকালবেলা অফিসে যাচ্ছেন। মালকোঁচা ধুতির ভেতরে শাদা শার্ট গুঁজে পরা। মাথার মাঝখানে সিঁথি কাটা। কামানো মুখমণ্ডলে চুনের মতো লেপে দেওয়া ট্যালকম পাউডার। অনেকটা মুকাভিনয় মেকআপের গড়ন।

মার কাছে শুনেছি এই বড়দাদুটি ছেলেকাল থেকেই লেখাপড়ায় কমা ছিলেন। ওদিকে তাঁর অনুজ, আমার নিজ মাতামহ, তেমনি মেধাবী আর মিচকে স্বভাব। ক্লাসে তিনি ডবল প্রমোশন পেলে বাবা তাঁকে উঠতে দিতেন না। বড়ভাই পড়ে থাকবে, কনিষ্ঠ এগিয়ে যাবে, এ হয় নাকি। একদিনের ঘটনা বলি। দুই ভাই পুকুরধারে পেয়ারা পাড়তে গিয়েছেন। ছোটজন গাছে চড়ে ফল পাড়ছেন। বড় নিচ হতে কুড়োচ্ছেন। পরে পেয়ারা ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে দুজনার মধ্যে ঝগড়া লেগে গেল। তখন রাগের মাথায় শারীরিক দুর্বল প্রবোধচন্দ্র ছোটভাইয়ের গালে একটা থাপ্পড় কষিয়ে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণচন্দ্র গাছতলে পতিত ও মূর্ছিত। ভীত, ক্রন্দনরত প্রবোধ ছুটে গিয়ে বাবার কাছে কবুল করলেন, ও বাবা আমি পূর্ণবাবুকে মেরে ফেলেছি। বাবা বললেন, তাই নাকি। চল তো গিয়ে দেখি। মৃত বলে ঘোষিত ছেলের শয়ান অবস্থার পাশে এসে দাঁড়ালেন বাবা। হাতে একখণ্ড কঞ্চি। তার শপাং। একটিমাত্র ঘায়ে মৃত পূর্ণচন্দ্র তিড়িং লম্ফে পুনর্জীবন লাভ করলেন।

বড়বাবু মনে মনে গভীর ব্যক্তিত্বধারী পূর্ণবাবুকে সমীহ করে চলেন। দুজনাব সোজাসুজি বাক্য বিনিময় ক্বচিৎ। ঠিক এমনই সমীহ আমার মার সঙ্গেও। কেন না আমার মা তাঁর বাবার ব্যক্তিত্ব আর বুদ্ধি, বাড়তি স্বভাব ইনলেক্ট, একেবারে ছেঁকে পেয়েছে। বড়বাবু নিজের স্ত্রী অক্ষয়কুমারী ওবফে কুডুনি, পুত্র-কন্যাগণ কাউকেই রেয়াত করেন না।

রাতে দু'ভাই পাশাপাশি আসন পেতে খেতে বসেন। সে রাতে স্ত্রী সঙ্গে উনুনে পাখার বাতাস দেওয়া নিয়ে বিবোধ বাঁধায় নিজের ঘরে তক্তপোশে চাদর মুড়ি দিয়ে শয়ান। যথাসময়ে খেতে এসে পূর্ণবাবু একটি আসন দেখে প্রশ্ন করলেন, এ কি, বড়বাবুর কি হল? আমার মা হাসি চেপে বলে, জ্যাঠাবাবুর শরীর খারাপ। খাবে না বলছে। পূর্ণবাবু মুহূর্তে স্ব-স্বভাবী মেয়ের মুখ পড়ে ফেললেন। তারপর একবার শুধু গলা তুলে ডেকে উঠলেন, বড়বাবু—। বলামাত্র, যাকে বলে সুড় সুড় করে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বড়বাবু অকুস্থলে উপস্থিত। আমার মার দিকে মিটি মিটি চেয়ে, কৈ, আমার আসন কোথায়, আসন কোথায়?

বড়বাবু তোলা উনুনে পাখার বাতাস দেওয়া দেখলে সপ্তমে চড়ে যান। এ নিয়ে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে দিনরাত ঝগড়া-বিবাদ। শয়তান মেয়েছেলে। বারবার বারণ করেছি উনোনে হাওয়া দিতে। কথা কানেই যায় না। প্রায়ই ঝগড়ার ক্লাইম্যাক্সে দু'হাতে জ্বলন্ত উনুনটি তুলে উঠোনে আছাড়। ব্যতিক্রমি ব্যবহার আমার দিদিমা, তাঁর ভ্রাতৃবধূ পারুলবালার সঙ্গে। তাঁকে উনুনে হাওয়া দিতে দেখলে দু-হস্ত জোড় করে বিনতি, আপনার পায়ে পড়ছি বউমা। দয়া করে উনুনে হাওয়া দেবেন না। ওতে ওর কষ্ট হয়। দয়া করে হাওয়া বন্ধ করুন। নিজের স্ত্রীর ক্ষেত্রে উনুন আছড়ানোর পূর্ব মুহূর্তে হাত থেকে পাখাটি ছিনিয়ে নিয়ে সেটি দুমড়ে মুচড়ে দূরে নিক্ষেপ।

স্ত্রীর সঙ্গে বিসম্বাদ হলে হুঙ্কার শাসানি, আমি চৌবাচ্চায় ডুবে আত্মহত্যা করব।

একদিন দুপুরবেলা সারা মুখে ব্লিচিং পাউডার মেখে শুয়ে আছেন দেখে আমার মা গিয়ে বলে, কি করেছ জ্যাঠাবাবু! মুখে যে ঘা হয়ে যাবে।

তাঁর গম্ভীর জবাব, মুখে মেছেতা পড়েছে। তাই মেখেছি।

কিছু পরেই মুখ জ্বলে গেল অবস্থায় বালতি বালতি জলের ঝাপটা।

অফিস ফিরতি পথে ভূষণ-এর দোকান থেকে এক চ্যাঙাড়ি সন্দেশ কিনে খেতে খেতে বাড়ি ফিরছেন। বাড়ির সামনে ভাইপো-ভাইঝি আর নিজের ছেলেমেয়েরা দাও দাও করে লাফাচ্ছে তাঁকে ঘিরে। তিনি ঘুরে ঘুরে হাসছেন আর খাচ্ছেন। ভুক্ত অবশেষ যৎকিঞ্চিৎ এরা পায়।

ভূষণের দোকানে বড়বাবুর একটি ধার-বাকির খাতা খোলা আছে। মাসান্তে সে দায় শোধ করেন কনিষ্ঠ পূর্ণবাবু।

উনত্রিশ

পূর্ণবাবুদের দেশ যশোহর জেলার নড়াইল মহকুমার মাইঝপাড়া গ্রাম। তস্য পত্নী আমার পারুলবালা দিদির স্বধাম হল, জিলা ফরিদপুর, মহকুমা, মাদারিপুর, আর গ্রাম, মাওইসার।

পারুলবালার পিতৃমহাশয় তারিণী মুখোপাধ্যায় ছিলেন তদঞ্চলের পয়মন্ত উকিল। তারিণী পত্নী, আমার মা'র দিদিমা, কুসুমকুমারী, দেশগ্রামে সুন্দর বউ নামে রটিত। ভারী আমোদিনী এই কুসুমকুমারী। আমরা ভাইবোনেরা বাবা-মার দেখাদেখি তাঁকে দিদিমা ডাকলে মধুর ঝামটা সহ বলে ওঠেন। আরে থো। বাপেরও দিদিমা, পুতেরও দিদিমা। এই কুসুমকুমারী নাকি একদা সার্থকনামা সুন্দরী ছিলেন। এখনকার ভাঁটা নয়না, ভাঙাগাল আর রোগা ঢ্যাঙা বিবরণের সঙ্গে কোনও মিলই নেই। তবে সৌন্দর্যের নিখাদ আর সতেজ বেঁচে থাকা রয়েছে তাঁর রান্নায়। অমন ডাল, সুক্তো, খিচুড়ি বুঝি আর কারও হাতে মানায় না। কুসুমকুমারী পান মুখে। সর্বদাই মজা-মস্করা আর মহা আনন্দে থাকেন। সকলকে আনন্দে রাখেনও। আমার বড়মামা, যুবক বাবুয়া, ভালো নাম প্রণব, মাথায় রাজ্যের ঔদ্ধত্য সমেত ছিট ধারণ করে, দিদিমাকে সিগারেট ধরিয়ে দেয়। ঘরের বাইরে গুরুগম্ভীর জামাই আমার কানুটি দাদু পূর্ণচন্দ্র হয়তো ঘুরছেন ফিরছেন। লজ্জায় অপ্রস্তুত শাশুড়ি, নাতির অত্যাচারে দোর বন্ধ করে চোখ মুদে সিগারেটে টান দিচ্ছেন। নাক দিয়ে ফুর ফুর ধোঁয়া

নিক্ষেপের সে কী ধুম। কে বলে আনাড়ি। ঘরে উপস্থিত বড়মামার বন্ধুরা, আমরা, বুড়ি মানুষের এই সিগারেট টানার মহিমান্বিত বিরল দৃশ্য দেখছি। এই কুসুমকুমারী শ্রীমা সারদামণির কাছে মন্ত্র নিয়েছিলেন। সে সময় তাঁর সঙ্গে শিশু কন্যা পারুলও উপস্থিত ছিল।

গঙ্গা-পদ্মার এপার ওপার তত্ত্বের বাইরে, ঘটি বাঙাল কচালি এড়িয়ে রেখে, মানুষের সংসার বুঝি এমনি করেই বয়ে চলে। তা না হলে, তত্ত্ব অনুযায়ী আমার কানুবাবার ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ফুটবলার হওয়ার কথা নয়। কথা নয়, ঢাকা শহরে খেলতে গিয়ে, বল নিয়ে দ্রুতগতি ছোটার সময় দর্শক চিৎকার শোনার কথা। তারা সরবে বলছে, বাইঠ্যাটারে পারাইযা দে।

ওই ঢাকারই মাঠে প্র্যাকটিসের ঠিক আগে ক্লাবের এক ইংরেজ কর্তাব্যক্তি প্লেয়ার কানুবাবুকে বললেন, আগের দিন রাতে বৃষ্টি হয়েছে। মাঠের অবস্থা কেমন দেখে এস তো। কানু ইংরেজি বোঝেন, কিন্তু সেই কৈশোরে বলায় কওয়ায় সেরকম সড়গড় নয়। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি তো কম নয়। ফলে, মাঠ দেখে এসে তৎক্ষণাৎ সাহেবকে রাজভাষায় অবগতি, সার, ফিল্ড ইজ গুড। বাট, দেয়ার আর কেঁচমাটিস্। সাহেব-এর পুনঃ পুনঃ অবাক হোয়াট, হোয়াট। কানুবাবুর একই উত্তর, কেঁচমাটিস্। গূঢার্থ হল, মাঠ তো ভালোই দেখলাম। কিন্তু কেঁচোর মাটিবহুল।

এখানে বলে নেওয়া জরুরি যে, পূর্ণচন্দ্রেব সঙ্গে আমার পিতামহের তথাকথিত বৈবাহিক সম্পর্ক কদাপি ছিল না। কারণ নৈহাটি মহেন্দ্রস্কুলে শিক্ষকতার সূত্রপাত কালে আমার পিতামহ শিশিরকুমারের সাক্ষাৎ ছাত্র ছিলেন শ্রীমান পূর্ণচন্দ্র। ফলে সম্বোধনের সময়ে তিনি যথারীতি মাস্টারমশাই বলেন। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন। দাদুও তাঁকে—ওহে পূর্ণ—সম্বোধন। সব মিলিয়ে, সংসারের ধরাবাঁধা সম্পর্কাদির বাইরে এমন সব ব্যাপার ভাবলে, কেমনতর ঘুলিয়ে যায়। ছাত্র হচ্ছেন ভাইসম বেয়াই। আবার বেয়াই হয়ে দাঁড়াচ্ছেন প্রণম্য পিতৃতুল্য শিক্ষক। অনেকটা সেই আমাদের পাগলী সরস্বতী দিদির স্বরচিত গানের মতো, আমড়া গাছে উচ্ছে হলে, বেগুন গাছে পটল হলে, নন্দ এবার মরিবে বলে, আমার কথা যায় রে ভুলে। বোম্ যট্‌কে ওই নারকোল গাছের মগডালে গিয়ে আট্‌কে...। তবে কথিত আছে, স্কুলে, ক্লাসে পড়াতে পড়াতে, শিশিরকুমার টিচার্সরুমে নস্যির ডিবে ফেলে রেখে আসায়, ছাত্রদের কাছে সবিনয়ে প্রার্থী, ওহে, তোমাদের কারও ডিবেটা একটু দাও না!

প্রবোধচন্দ্রের মুখে সর্বদাই টিমি টিমি হাস্য। তবে যাবতীয় রাগ নিজের ধর্মস্ত্রীর ওপর। ফলে হাতপাখা নিধন। তোলা উনুন নিক্ষেপণ। ওঁর বড় পুত্র সঙ্গত কারণেই আমার মামা হওয়ার আইন। কিন্তু আমাদের পরিবারে যেমন উন্মাদ প্রবল তেমনই সামাজিক সম্পর্কগুলো কেমন গোলমেলে। যাঁর আমার পিসেমশাই হওয়ার কথা তিনি হয়ে যান দাদু। যাঁর আদপে মামিস্থান, তিনি হয়ে ওঠেন পিসিমা। অথবা পিসিমা বনে যান মামি। মামা যথারীতি পিসেমশাই। কে যে কখন কী ঘটিয়ে বসে আছেন, কোথায় তালা খুলছেন, কোনখানে তালা মারছেন, বলা মুশকিল। ছোটদের এ সব ব্যাপারে মাথা দিতে নেই। কিন্তু সেই ছোটরাও তো হঠাৎ প্রশ্ন সঙ্কটে পড়ে। পড়তেই পারে। আবার মাথা টাল কিংবা খুবই

সহজ সিধে বাবাকে নিয়ে ছেলে বিচলিত হয়। যেমন বড়দাদু আমার সেই মামা-পিসেমশাই, মানে তস্য পুত্র আমার পিসিমা-মামিমাকে যেদিন বিয়ে করতে যাবেন, সেই দুপুরে ঘরে বসে বেসুরো গুনগুন করছেন। এমতকালে তাঁর বাবা প্রবোধ দরজার পাশ থেকে স-উঁকি বলে ওঠেন, উউঃ, বিয়ে করতে যাবেন বলে বাবুর কী আনন্দ।

আমার কানুবাবা অবিশ্যি তাঁর মদ্যাসক্তির ঋণ স্বীকার যান তাঁর জ্যাঠাশ্বশুরের কাছে। কিন্তু ব্যাপারটা পুরোদস্তুর অলীক। নস্য ছাড়া, কালেভদ্রে একটি সিগারেট, আর কোনও বিষয় ছিল না। বাবার সঙ্গে মা'র প্রায় নিত্যকার হাঁকাহাঁকির নাট্যে কানুবাবু স্ত্রীকে বহু প্ররোচনা উপহার দেন, নিজের উত্তেজনা বাড়াবার জন্যে। ফলে এমন কিছু গপ্পো টেনে আনেন। ভাবেন, এটাই বুঝি ব্রহ্মাস্ত্র। কিন্তু আমার মা ওপথে যায় না। ফলে বিস্তর লড়াইয়ের মা, অনশনে আর ক্রন্দনে। বাবাও অনশন সহকারে পরিতৃপ্ত, পরবর্তী লড়াইয়ের লাটাই মনে মনে পাক মারছে। যেটা বেদনার, মা সকলের রান্না-বান্না করছে, বিনি ত্রুটি। সংসারে সবাই খাচ্ছে। শুধু দু'জন বাদ। তবে প্রবোধচন্দ্র তাঁর কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্র বাড়িতে না থাকলে ভাইয়ের বউ আমার দিদিমার কাছে বিনীত হয়ে নিবেদন করেন, দয়া করে আপনার বরের কৌটো থেকে একটা সিগারেট দেবেন কি? ভয় নেই, আমি বিকেলেই ফেরত দিয়ে যাব। বড়ভাই জানেন, ছোটজন দামি আর গোনাগুনতি সিগারেট খায় বলে হিসেব থাকে মনে।

এই বড়দাদু যে এমন কাব্য রচনা করতে পারেন সে তথ্য জানা গেল এই সেদিন। বলাবাহুল্য, সেখানে একটি বুদ্ধির খেলাও আছে।

আমার ভাই মলয় যেহেতু 'ল' বর্ণ বিদ্বেষী, নিজের নামটিও মড়য় কয়, 'ল' স্থানে 'র কিংবা 'ড়' জোগান দিয়ে, তাকে হঠাৎ এক নিরীক্ষায় ফেললেন সুমুখে দাঁড় করিয়ে।

—বল তো—হাল্লাগুল্লা রসগোল্লা নদীনালা ঝালাপালা—ভাই যথারীতি আউড়ে চলে, হাররাগুররা রসগোররা...

রেডিওয় পান্নালাল ভট্টাচার্য রেকর্ডে কী চমৎকারই গেয়ে চলেছেন এই 'ল' সাধনের নেপথ্যে,

সময় তো থাকবে না গো মা
কেবলমাত্র কথা রবে
কথা রবে, কথা রবে মা
জগতে কলঙ্ক রবে...

ভারতচন্দ্রের রসাল, মধুর কথালাপে রামপ্রসাদের মন এই শ্রাবণমাসি সকালবেলাটির পড়শি হয়ে দাঁড়ায়। মনে হয়, এই মানুষটির ভিতরে আর পাঁচটি মানুষের চেয়ে এক আনন্দ-বিষাদিনী প্রতিমা বিরাজ করছেন অহর্নিশি। সে কারণে তাঁর সঙ্গ করা মানে যথার্থই কবিতা প্রতিমার সঙ্গ করা, এ মনে হওয়ায় কোনও ভুল নেই, এমনই বিশ্বাস প্রসাদের। মানুষটি সত্যিই ভারী বিচিত্র মনের।

প্রসাদ কন, দাদা, এবার বলো তোমার সংসারের খপর। আমার বৌদিদিটির কী সমাচার। পুত্রাদিরই বা কী খপর?

ভারত হাসেন। সেই হাসির নেপথ্যে খানিক মন মরাও জুড়ে রয়। —কী বলি বল দিকিনি ভায়া। তোমার বউদিদি তো বাস করছেন তাঁর বাপের বাড়ি। আমার ভাইদিগের সঙ্গে সম্পর্ক মন্দ আমার।

প্রসাদ এমন আকাট প্রশ্নে নিজেই অস্বস্তিতে পড়েন। তিনি শুধু বলে ওঠেন, আহা, থাক্ থাক্।

ভারত হাসেন, থাকবে কেন ভাই। সবার কাছে তো পেট খোলসা কর্তে পারিনে। তোমার ঠাঁয়ে বলে খানিক লঘু হই।

—বলো দাদা। আমি তোমার গতিক খানিক সমঝতে পারছি। এই ক-দিনে তোমার ভাইয়ের বউয়ের মুখচন্দ্র না দেখে আমার ভেৎরটা উস্তমপুস্তম করছে।

—পরিবারের বিরহ একরকম, আবার সন্তানদের জন্য মন ভার—সেও তো কম নয়।

—তোমার তো এক জোড়া পুত্তুর দাদা।

—না হে। তৃতীয়জনাও আছে। জ্যেষ্ঠ, পরীক্ষিৎ, মধ্যম রামতনু আর কনিষ্ঠটি হল ভগবানচন্দ্র। এখানেই দাঁড়ি পড়েছে।

প্রসাদ মনে মনে চমক টের পান। বুকের তলে তলে মেঘ সঞ্চার হয়। সর্বাণী এখন পুর্নগর্ভের দিকে যাত্রা করে বসে আছে।

প্রসাদ বলে ওঠেন, তাহলে আমার বউদিদি এখন প্রোষিতভর্তৃকা।

ভারত মুখ চওড়া করে হাসেন, বেশ বল্লে ভায়া, বেশ বল্লে। এই বলে দেওয়ার ন্যাজ ধরে যে আমার মনে প্রোষিতভর্তৃকা নিয়ে একখণ্ড কবিতা চাগাড় দিল।

—বলো, বলো দাদা। কেমন চাগাড় হল একটু শুনি না।

—ভারতচন্দ্র এই সকালবেলার তাজা আলোর দিকে তাকান। তারপর আস্তে আস্তে, কেটে কেটে উচ্চারণ করেন,

পরবাসে পতি যার মলিনা বিরহে।
প্রোষিতভর্ত্তৃকা তারে কবিগণ কহে।।
অনল চন্দন চুয়া, গরল তাম্বুল গুয়া
কোকিল বিকল করে অতি।
বিধবার মতো বেশ, অস্থিচর্ম অবশেষ
তাপে কাম পোড়ায় বসতি।।
মনোজ-তনুজ মত, কোদণ্ড করিয়া হত
হাতে লয় পিণ্ডের পদ্ধতি।
সখী-মুখে মান শুনি, পতি এলো হেন গণি
দেখিতে শ্বাসের গতাগতি।

রামপ্রসাদ দুই হাতে করতালি বাজান যথাসম্ভব শব্দ দমন করে। সে শব্দে রাজার প্রাসাদের হরেক খোপ থেকে গোলা পায়রার দল শূন্যে ঝাঁপ দেয়। তারা এই নিঝুম সকালটির বুকে এমন চকিত উল্লাস শুনে হতচকিত। অবশেষে বিস্তৃত আর বাঁধানো আঙ্গিনার ঊর্ধ্ব শূন্যে তারা পাক দিতে থাকে চক্রাকারে। এইমাত্র রচিত কবিতার পটভূমির আবহে সেই পারাবতের দল হঠাৎই অভিনব এক দিগন্ত মেলে ধরে। এই সময়টির অনুভবের কথা মুখে বলে প্রকাশ করা যায় না। ফলে, যা হয়, সে সবই মনে মনে,

সঙ্গোপনে। প্রসাদ শুধু বলেন, সবই ভাল বললে। কিন্তু এই বিধবার মতো বেশ কথাটি মেনে নিতে পারছিনে যে।

ভারত চোখ তুলে ভালো করে তাকান প্রসাদের চোখে, কেন! বিধবা কি রমণী নয়!

—তা কে বললে। আসলে এই বিধবা বিষয়টি নিয়ে আমাদের সমাজে এখনও যে কী অছেদ্দা। অবহেলা।

ভারত কিঞ্চিৎ স্বর নিচু করে বলেন, আমি জানি না প্রসাদ, তুমি আমাদের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের একটি সাম্প্রতিক কাণ্ড জান কি না।

—আমি থাকি দূর অজগ্রামে। রাজরাজড়ার সব কাণ্ড আমি জানব কেমনে।

—তাহলে বলি শোন। তবে এ কথা যেন পাঁচকান না হয়।

—বলোই না দাদা।

ভারতচন্দ্র প্রসাদের পাশে বসে পড়েন। তারপর যথাসম্ভব ঘনিষ্ঠ হয়ে অতীব নিচু গলায় বলে ওঠেন, আমাদের এই রাজাটি যেমন বুদ্ধিধর, তেমনি বিচক্ষণ আর ডাকাবুকো। সেই সঙ্গে তেমনই পণ্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞ আর সুবিজ্ঞ। ফলে এখানকার তাবড় পণ্ডিতদের ওপর, আর হিন্দু সমাজের ওপর তাঁর ভারী দখলদারী।

প্রসাদ ভ্রূ কুঁচকে বলেন, জল কোন দিকপানে গড়াচ্ছে ধত্তে পারছিনে।

ভারত বলে যান, সেটাই কথা। যাকে বলে, জল উঁচু তো জল উঁচু। জল নিচু তো জল নিচু।

—তাহলে এত লেখাপড়া করে ফল কী হল দাদা! প্রকৃত পণ্ডিতের তো নিজের বোধ, বুদ্ধি আর বিচার থাকে।

—হুঁ, তবে সব পণ্ডিতই রাজা হন না। আবার সব রাজাও পণ্ডিত হন না।

—তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল দাদা।

—সেটাই বলি তোমায়। আদপে, রাজা যদি শুধুই রাজা হতেন, তাহলে গোল হত না। একই লপ্তে পণ্ডিত আর পণ্ডিত সমাজের কর্তাবেক্তি হয়েই যত খিটকেল হল।

—কীরকম?

—রকম একটাই। সেটা রাজার রকম। পণ্ডিতের নয়।

—একটু ভেঙে বলো দাদা!

—বলি। আসল কথা হল, আমাদের রাজা যদি সত্যি সত্যিই নীতি সচেতন হতেন তাহলে সমাজের অনেক বিগর্হিত প্রথা ঘুচে যেত। তা না করে, তিনি উল্টে, যাতে করে ওই যাবতীয় কুরীতি বলবতী থাকে তার প্রতি যত্ন করে চলেছেন।

—তাহলে ধরে নিতে, হবে দেশে প্রতিবাদ করার মতো দ্বিতীয় কোনও বেক্তি নেই।

—পণ্ডিত রাজার মুখের সুমুখে দাঁড়াবে কে ভায়া।

—কেন, তুমি তো আছো দাদা।

ভারতচন্দ্রের মুখমণ্ডলে এবার বাদুলে কালো মেঘের ছায়াপাত ঘটে। তিনি যেন অতি সন্তর্পণে নিজের মুখের আড়ালেই মুখ লুকানোর তোড়জোড় করেন। কী এক অস্বস্তি এসে ঘিরে ঘরে রাজকবির অস্তিত্বে। রাজালয়ে, রাজভোগে নিবাস করলে বুঝি কবিকে এমন পাতকী হয়েই থাকতে হয়। রাজা যা যা মধুর কথা শুনতে পছন্দ করেন, তিনি যা শুনলে মনে মনে সহমর্ম টের পান, ভারতকে সেইরকমই অনুশাসন পালন করতে হয়।

এমনকী দেশকালের সঙ্কট সময়েও কবির অবস্থান টলে না। হায়, এর চেয়ে আর পাঁচ সাধারণ মানুষ হওয়া ভালো। ভালো, নৈরাজ্যের নিগড় থেকে স্বাধীন দূরত্বে চলে যাওয়া।

কিন্তু রামপ্রসাদ আর ভারততন্দ্রে তফাৎ যে যোজন যোজন। রাজার কাছটিতে থেকেও তিনি দূর নিবাসী। আর প্রসাদ দূরত্বে বাস করেও কি আশ্চর্য নিকটবিহারী।

ভারত কথা বলেন এ পর্যন্ত খানিক বিরতি নিয়ে।

--এমনকী যদি কোনও ক্ষমতাবান বেক্তি রাজার সুমুখে রুখে দাঁড়ান, তিনি সঙ্গে সঙ্গে তা বিফল করে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

প্রসাদ ক্ষীণ হেসে কন, হুঁ, রাজা বলে কথা। কার সাধ্যি, সামনে দাঁড়ায়।

ভারত, আমাদের রাজা সত্যি সত্যিই পণ্ডিত কূলমার্তণ্ড। একাদশী তিথিতে দুখিনী আর বালিকা বিধবাদের নির্জলা উপবাসের অনুকল্প বিধান, তাদের বৈধব্য যাতনার অশেষ লাঞ্ছনা, সহমরণ, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ এই যাবতীয় অপশাস্ত্রেই রাজা সায় দিয়ে চলেছেন। তাঁর রাজকৃত্যের একটি গুরুতর অংশ হল—অমুক মাসে, অমুক তিথিতে কিংবা বারে তমুক দ্রব্য ভক্ষণ করতে নেই, ইত্যাদি। রাজা যদি এই সব অকিঞ্চিৎকর বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকেন তাহলে সে দেশের ভবিতব্য কি হতে পারে।

প্রসাদ, কিন্তু আমি যতটুকু জানি, মহারাজার আর কোনও কাজ নেই, এমনটি নয়। দেশকালের হাল হকিকত নিয়ে তাঁর সতত চিন্তা।

ভারত, সে তো রাজধর্ম। বাকিটুকু তো রাজার পোয্য পণ্ডিতরা কল্লেই হয়। কিন্তু সেখানেও রাজার হস্তক্ষেপ। রাজা অতিরিক্ত পণ্ডিত হলে যা হয় আর কী।

প্রসাদ, কিন্তু রাজার সাম্প্রতিক কাণ্ডটি কী তা যে এখনও জানা হল না দাদা।

ভারত, সেটি হল আব এক রাজার সঙ্গে বিমত বিবাদের কূটকৌশল।

—কে সেই রাজা?

—তিনি হলেন বিক্রমপুরবাসী রাজা রাজবল্লভ। তাঁর অভাগী অল্পবয়স্কা বেচারি কন্যাটি বিধবা। ফলে কন্যার যাতনা থেকে রাজার দিক হতে বিধবা বিবাহ প্রচলিত করার একটি চেষ্টা হল। এই তো, সেদিনেব ঘটনা।

—তারপর!

—রাজা রাজবল্লভ তখন বিধবা বিবাহ যে শাস্ত্র বিরুদ্ধ নয়—এই ব্যবস্থা সমুদয় পুব-পশ্চিম দেশের যাবতীয় পণ্ডিতদের কাছ থেকে নিলেন। তারপর নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজের বিধান পাওয়ার বাসনায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে কতিপয় পণ্ডিত পাঠালেন। রাজবল্লভ ঢাকার নবাব, যথেষ্ট ক্ষমতাবান বেক্তি। তিনি মনে করলেন, নবদ্বীপের পণ্ডিতরাও তাঁকে সায় দেবেন।

—বটেই তো।

—হ্যাঁ প্রসাদ, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, রাজবল্লভের পাঠানো পণ্ডিতদের মহা আপ্যায়ন করলেন। তাঁদের যাবতীয় কথা শুনে বললেন—আপনাদের প্রভুর অভীষ্ট সাধনে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। বিক্রমপুরের পণ্ডিতগণ সন্তুষ্ট হয়ে ভোজন বিশ্রামে গেলেন। এরপর রাজা, গোপনে তাঁর সভা পণ্ডিত আর নবদ্বীপের প্রধান প্রধান পণ্ডিতদের তলব করে রাজবল্লভের পাঠানো ব্যবস্থাপত্রটি দেখালেন। সেটি পাঠ করে তাঁরা সানন্দে বললেন—এ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ শাস্ত্রসম্মত।

—তারপর?

—শুনে রাজা খুবই কুপিত হলেন। তাঁর চিত্ত ঈর্ষাদগ্ধ হয়ে পড়ল। তিনি তাঁর পণ্ডিতদের বলে বসলেন—আপনারা শুনে রাখুন, এ ব্যবস্থা শাস্ত্রবিরুদ্ধ না হলেও ব্যবহার বিরুদ্ধ বলে রাজবল্লভকে নিরাশ করতে হবে। একজন বৈদ্য জাতীয় বেক্তি এই চিরকেলে অপ্রচলিত ব্যবহার প্রচলিত করে যাবেন, এ কাণ্ড সহনীয় নয়। কিন্তু এখানে রাজনীতি বলে একটি কথা আছে।

—রাজনীতি! বলো কী দাদা!

—হ্যাঁ, রাজার জন্যেই তো রাজনীতি। সেই অনুযায়ী কৃষ্ণচন্দ্র বল্লেন, এখন রাজা রাজবল্লভের যা প্রভাব-প্রতিপত্তি, তাতে আমি কোনওমতেই তাঁকে বিরক্ত করতে চাই না। অতএব তাঁকে তুষ্ট রাখতে আমি আপনাদের এই ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষরের জন্যে যৎপরোনাস্তি অনুরোধ করব। যদি আপনারা অসম্মত হন তাহলে আপনাদের তাড়নাও করব। কিন্তু আপনারা কইবেন যে মহারাজা বা কারও অনুরোধে আমরা এইরূপ ব্যবস্থা প্রদান করে পাপগ্রস্থ হতে পারব না।

—তারপর কি হল?

ভারত হেসে বলেন, তারপর কি হল শোনার আগে তোমার ঠাঁয়ে মৎ রচিত একখানি নারদের গীত শোনাই ভায়া।

প্রসাদ মিটি মিটি হাসেন, তা বটে। এ সময়ে নারদের গীতই একমাত্র অবলম্বন। তবে কি না গানটি চেপে নয়, গলা খুলে গাইতে হবে।

ভারতচন্দ্র আকাশ মুখে দু'হাত তুলে গেয়ে ওঠেন,

জয় দেবী জগন্ময়ী দীনদয়াময়ী
শৈলসুতে করুণানিকরে।
জয় চণ্ডবিনাশিনী মুণ্ডনিপাতিনী
দুর্গবিঘাতিনি মুখ্যতরে॥
জয় কালী কপালিনি মস্তকমালিনী
খর্পরধারিনি শূলধরে।
জয় চণ্ডী দিগম্বরি ঈশ্বরী শঙ্করী
কৌশিকি ভারত-ভীতি-হরে।।

ত্রিশ

ভারতচন্দ্রের এই নারদীয় গান শুনে রামপ্রসাদ চমৎকৃত শুধু নয় খুশিও। বিশেষ করে এত শত রাজ-সমালোচনার মধ্যবর্তী এই গীত বাঁকা পথে কিঞ্চিৎ কটাক্ষ হলেও পদলালিত্য আর পরিবেশন কী যে মধুর। সেই সঙ্গে ভারতের কণ্ঠস্বরটিও দিব্য খাসা। স্বয়ং বাগবাদিনী বুঝি তাঁর কণ্ঠে বসত করছেন।

গীত ফুরলে ভারতচন্দ্রই বলে ওঠেন, আমি তো এতকাল জানতাম না আমার গীত শুনলে মানুষ বোবা হয় যায়।

প্রসাদ ছোট একটি শ্বাস ফেলে বলেন, কী বলব দাদা। এমন একখানা গানের পর কী কথা মুখে আসতে চায়! কথায় তো সুর নেই।

ভারত কন, কে বললে তোমায় এ কথা! কোথায় সুর নেই বল তো! ওই যে গাছের পাতাটি নড়ছে, নির্ঘাৎ একটি শব্দ হচ্ছে, ছন্দ তৈরি হচ্ছে। এটিও সুরে বাঁধা।

প্রসাদ অমনি বলে ওঠেন, ভ্রম হয়েছে দাদা, মহাভ্রম। সত্যি কথাই তো। এই ত্রিজগৎ সর্বদাই টান টান সুরে বাঁধা। সুর বিনে ব্রহ্মাণ্ড হয় না।

ভারত, সুর বিনে পশু, কীট, মানুষের জন্ম হয় না। আকাশে চন্দ্র-সূয্যি উদয় হন না।

—তবে দাদা, তোমার একটি বাড়তি সুবিধে আছে।

—কী সুবিধে শুনি?

—তোমার কণ্ঠে মধুর পরিমাণ কিঞ্চিৎ বেশি।

ভারতচন্দ্র এক গাল হেসে বলেন, আসলে তুমি আমায় ভারী ভালোবেসে ফেলেছ তো। তাই অমন করে বলতে পারলে।

—তা হতেও পারে দাদা। তবে তোমার কাছে যে আমি টাকা ধারিনে, এ কথাটা সাত সত্যির এক সত্যি। সে না হয় হল দাদা, এখনও যে রাজা কেষ্টচন্দর আর বিক্রমপুরের রাজা রাজবল্লভের কাহিনিটা শেষ হল না।

ভারত যেন নড়ে বসেন। চারধার একবার দেখে নেন। তারপর আবার আগের কায়দায় গলা নামিয়ে কিছু ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেন। পিছনে ফেলে রেখে আসা কথা আবার আরম্ভ হয়। ভারত বলে চলেন, হ্যাঁ প্রসাদ, শুধু কবিগণই নন, মহা মহাপণ্ডিতরাও রাজার আজ্ঞাধর। তা না হলে উদরপূর্তি হবে কেমন করে। তা, সেই নিয়মেই, পরদিন যখন রাজসভা পরিপূর্ণ কী ঘটে দেখবার জন্যে, বহিরাগত পণ্ডিতদের পানে চেয়ে রাজা কতক আঁখিঠারের ভঙ্গীতে নিজ পণ্ডিতদের বলে উঠলেন—তাহলে আপনার এবার বিচার করুন, রাজা রাজবল্লভ যে ব্যবস্থাপত্রটি পাঠিয়েছেন সেটি অবশ্যই শাস্ত্র সম্মত হবে। সভায় যাকে বলে সুঁচ পতনের নীরবতা। এমনকী এক পণ্ডিত অপরজনের মুখপানে চাইছেন না। ধুরন্ধর রাজা তাঁর মনের চক্ষু বরাবর সভাস্থ বিদ্বজ্জনেব মনোভাব পাঠ করে চল্লেন। এবার রাজা বললেন, তাহলে রাজা রাজবল্লভ যখন এটি আমায় পাঠিয়েছেন, তিনি যখন অনুমোদনের জন্যে আমার মারফৎ আপনাদের কাছে হাজির করোছেন, তখন এটি আপনাদের স্বাক্ষর করতে হবে।

প্রসাদ মিচকি হেসে ফুট কাটেন, আহা, রাজার বিনয়ের কী নমুনা।

ভারত বলে চলেন, রাজা তো পণ্ডিতদের শিখিয়েই রেখেছেন। ফলে তাঁরা এবার একে অন্যের মুখাবলোকন করে গভীর নাট্য সহকারে রাজবল্লভের নিদানখানি পাঠ করলেন। এবং প্রায় তৎক্ষণাৎই সেটি বাতিল করে দিলেন। হতাশ রাজবল্লভী পণ্ডিতেরা নিরাশ হয়ে ফিরে গেলেন। ওদিকে রাজা রাজবল্লভ কৃষ্ণচন্দ্রীয় কূটনীতি বুঝতে না পেরে এই মহৎ কার্য সম্পন্ন করার থেকে ক্ষান্ত হলেন। বলাবাহুল্য তাঁর মনোদুখের মোচনটি ঘটল না।

রামপ্রসাদ, এখন ভাবছি, রাজা কেষ্টচন্দর তাঁর সভায় গান শোনাতে বল্লে কালীর গীতের বদলে একখানি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচে শোনাবো।

—বাঃ বাঃ। খাসা বলেছো। তা ছাড়া একজন শাক্ত কবি আর এক শক্তিমতে বিশ্বাসী রাজাকে শোনাচ্ছে বৈষ্ণতত্ত্বকথা। এ যে কী অভিনব ভাবসম্মিলন। এ দৃশ্য ভাবতেও আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে। কিন্তু এতক্ষণ যা বল্লাম তার নেপথ্যে আর একখণ্ড কাহিনি জড়িয়ে আছে। সেটি না বল্লে যে কথকতাটি সম্পূর্ণ হবে না।

প্রসাদ সোৎসাহে তাকান ভারতচন্দ্রের মুখপানে।

ভারত বলে যান, এটি হয়তো গপ্পো, কিংবা একদিন এক কাহিনি প্রবাদ হয়ে দাঁড়াবে। আমি তো আর নিজ চক্ষে দেখিনি। তবু যখন কানে এসেছে তখন বলি তোমায়। তা হল, রাজবল্লভের পাঠানো পণ্ডিতরা রাজবাটির যে স্থলে উঠেছিলেন, সেখানে রাজালয় থেকে খাবার-দাবার পাঠানোর ব্যবস্থা হল। তা হলটা কী, সমুদয় খাদ্য-খাবারের সঙ্গে প্রেরণ করা হল একটি মহিষ শাবক। পণ্ডিতগণ সেটি দেখে তো চক্ষু চড়কগাছ। এ কী প্রকারের রসিকতা। যে রাজকর্মচারী ভুজ্যি নিয়ে এসেছিলেন তাকে পণ্ডিতরা জিজ্ঞাসা করলেন, এই মহিষবৎস কী নিমিত্ত? কর্মচারীটিও শেখানো পড়ানো। সে জবাব দিলে, আজ্ঞা আপনাদের আহারের নিমিত্ত। পণ্ডিতরা বিচলিত হয়ে কইলেন, আমরা মহিষমাংস ভক্ষণ করি না। রাজার লোক বলে উঠলে, কেন? এটি ভোজন করতে শাস্ত্রে তো নিষেধ নেই।

পণ্ডিতেরা উত্তর করলেন, হ্যাঁ, শাস্ত্রে নিষেধ নেই বটে। কিন্তু এদেশে এ মাংস ভোজনের ব্যবহার নেই। তৎক্ষণাৎ রাজার লোক জিজ্ঞাসা করে বসলেন কতক নিদান হাঁকার ধারায়, যখন শাস্ত্রসিদ্ধ স্বীকার করেও ব্যবহার বিরুদ্ধ বলে এটি ভোজনে পরাঙমুখ হচ্ছেন, তখন চির অপ্রচলিত ও দেশাচারবিরুদ্ধ বিধবাবিবাহ আপনারা কী প্রকারে প্রতিপন্ন করবেন?

ভারতচন্দ্রের কথা জুড়লো কিংবা ফুরলো। রামপ্রসাদের মুখে এখন আর কোনও প্রশ্ন খেলছে না। ফলে এখন এই সকাল গড়িয়ে চলা দেদাব রাজনিবাস প্রাঙ্গনজোড়া শুধুই গোলা পায়রার বক্‌বকম কথালাপ। আকাশে হঠাৎ হঠাৎ উড়ো পাখিদের ছররা। দূরে—রাজার অতিথিদের জন্য আলাদা করে রাখা রন্ধনশালায় সবে উনুনের ধোঁয়া দর্শন। সেই সঙ্গে থেকে থেকে কাঠ চ্যালা করার ঠকাস্ ঠকাস্। বৃহৎ হামানদিস্তায় ঘটাং ঘটাং মশলা পেষার তাড়না। মস্ত মস্ত মেটে জালায় ভারিরা জল বয়ে এনে প্রকাণ্ড বাঁধানো জলাধারে ঢেলে দিচ্ছে ঝপাং ঝপাং। রাজফটকের তল বরাবর হৃষ্টপুষ্ট মেছুনিরা মাথায় চুবড়িপূর্ণ সদ্য ধরা মাছ নিয়ে আসছে। ঝুড়ির প্রান্তে হঠাৎ হঠাৎ প্রাণের নমুনাদারী মাছের লেজগুলো চিড়িক চিড়িক ঝাঁকুনি দিচ্ছে। দেবত্র ভূসম্পত্তিপ্রাপ্ত পুরোহিতরা নিত্যকর্ম সারছেন রাজার কতিপয় মন্দিরে, ফুল-গঙ্গোদকাদির পোঁটলা নিয়ে। রাজার ফুলমালিরা সাজি ভরে ফুল দিয়ে আসছে বাগিচা হাতে। সেই দলে আছে এক বালক। তার দু'হাতের ছোট ঘেরে দলঘাস দিয়ে বাঁধা আকন্দফুলে শোভা। ছেলেটি মহা আনন্দে এমনই লম্ফ দিতে দিতে চলেছে--যে মনে হয় আজই বুঝি সে তার অভিভাবকদের হাত থেকে এই নতুন কাজে নামার ছাড়পত্র পেল। আর সেই মোতাবেক বালকটি থেকে থেকে নেচে উঠছে। তার হাতে ধরা মালাগুলি সেই তালে দুলে দুলে উঠছে। সকাল গড়ানো আলো তাজা ফুলগুলিকে বৃন্তচ্যুতির কথা ভুলিয়ে দেওয়ার ছল করছে।

ভারতচন্দ্র এতক্ষণে কথা বলেন। বলেন কতক উদ্দেশ্যহীনতার মতো, আপনার মনে, যেন বা আত্মগত প্রায়। —আগেকার কালে গুরু, শুক্র, ভরদ্বাজ, মনু প্রভৃতি মহা মহামানুষগণ নীতিশাস্ত্র বর্ণনা করে গিয়েছেন। সেই বর্ণনা বা নির্দেশ অনুযায়ী সেকালে রাজকার্য চলত। তারপর মহামতি কৌটিল্য এইসব মহামানুষদের গ্রন্থ ঘেঁটে একখানি সারগ্রন্থ বা নীতিগ্রন্থ তোয়ের করলেন। এই নীতিশাস্ত্রই তো রাজ্যতন্ত্রের অধীন। রাজ্যতন্ত্র অনুযায়ী নীতিশাস্ত্রে বলে দেওয়া নিয়মগুলি রাজা মান্য করে চলবেন।

রামপ্রসাদ মুখে কুলুপ এঁটে বসে অগ্রজ ভারতকবির আত্মকথন শোনেন। তাঁর মনে এই সমাচার ঘটে যে, ভারত যা বলছেন, তার সঙ্গে এখনকার এই দেশকালের অবস্থা গতিকের কী আশ্চর্য মিল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আর হবু নবাব সিরাজউদ্‌দৌলা বিষয়ক বর্তমান পরিস্থিতির উপর ভারতের এই চিন্তনমালা কী সাযুজ্যবান।

ভারতচন্দ্র কথারম্ভ করেন, রাজা যদি দক্ষতার সঙ্গে রাজ্য পরিচালনা করতে চান, তাহলে তাঁকে নীতিশাস্ত্র মেনে চলতে হবে। নীতিজ্ঞ রাজন কখনও নিয়ম-নীতির বাইরে যান না। আমাদের দেশের রাজ ইতিহাস বলছে বহু নীতিশাস্ত্রজ্ঞানহীন রাজা বুদ্ধিভ্রংশতার কারণে বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছেন। মহারাজা ভোজদেব বলে গিয়েছেন, সযত্নে নৃপতিগণ নীতিশাস্ত্র শ্রবণ করবেন। এই নীতিশাস্ত্র নিয়ে প্রাচীন নীতিবিশারদদের মধ্য মতভেদ আছে।

রামপ্রসাদ এখানে আর প্রশ্ন না করে পারেন না বলেই বলে ওঠেন, কেমনধারা মতভেদ শুনি।

ভারত কন, হ্যাঁ, মতভেদ হল, বৃহস্পতি বলছেন, বার্তা অর্থাৎ কৃষি, গোরক্ষা আর বাণিজ্য এই তিন নিয়ে দণ্ডনীতি। মহর্ষি উশনার মতে, দণ্ডনীতিই হল এক বা মূল বিদ্যা। আর কৌটিল্যের অভিমতে, চারপ্রকার নীতি রাজার শিরোধার্য। যথা, আন্বীক্ষিকী—অর্থাৎ তর্কশাস্ত্র, ত্রয়ী, অর্থাৎ ঋক্, সাম ও যজুঃ, বার্তা আর দণ্ডনীতি।

প্রসাদ, এত ভজঘট্ট ব্যাপারের মধ্যে তাহলে আমাদের রাজা কোনটি মেনে চলেন দাদা?

ভারতচন্দ্রের মুখমণ্ডলে গম্ভীর শ্রাবণমাসী ছায়া ঘনায়। তিনি মন্দ্রস্বরে উচ্চাবণ করেন, রাজ্ঞঃ প্রতিকূলং নাচরেত্। অস্য অর্থ, কখনও রাজার প্রতিকূলতা আচরণ করবে না। আর একটু ভেঙে বলি ভায়া, সোমদেবসূরি বলে গিয়েছেন, রাজা সুরক্ষিত হলে সকল বিষয় সুরক্ষিত হয়। অতএব নিজে এবং অপরে মিলে সতত রাজাকে রক্ষা করে চলবে।

প্রসাদ বলে উঠেন,

রক্ষিতে ভূমিনাথেতু আত্মীয়েত্যঃ সদৈবহি।

পরেভ্যশ্চ যত স্তস্য রক্ষাদেশস্য জায়তে।।

সহর্ষে ভারত কন, নিজ ও অপর দ্বারা সর্বসময়ে রাজা রক্ষিত হলে সমগ্র দেশ রক্ষিত হয়। বড় ভালো বলেছ ভাই!

—আমি বলিনি দাদা। এটি নীতি বিশারদ রৈভ্য বলে গিয়েছেন।

ভারত আড়ামোড়া ভাঙেন, তা তো হল ভায়া। দুই মুখ্যু কবিতে মিলে মোটামুটি পণ্ডিতি তর্কসভা উপস্থিত করে ছাড়লুম আমরা। আসলে, এ তো আমাদের কর্ম নয়।

আমরা সৃষ্টিশীল কবি। এত কচকচানিতে কাজ কী।

—কবি তো কাণ্ডজ্ঞানহীন মানুষ নয় দাদা। কবি যদি দিবারাত্র উবুড় চুবড়ি ঘুমোয় তাহলে দেশে যে আচার বিচার বাড়ন্ত হবে।

ঠিক এমনই সময়ে রাজদ্বারে ভজহরি আর রামতনুর যুগলমূর্তি দেখা দেয়। তারা দুজনাতেই উত্তেজিত মুখ নিয়ে এই দিক পানে এগিয়ে আসছে। চলনেও বেশ হন্তদন্ত ভাব। রামপ্রসাদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে। কী আবার কাণ্ডাকাণ্ড ঘটিয়ে এল এই দুই কুমারহট্টি।

ভারতচন্দ্র বলেন, ভায়া তোমার বাহনজোড়ার হাবভাব ভালো ঠেকছে না যে। কী আবার কাণ্ড বাধিয়ে এল।

—তাই তো মনে হচ্ছে। দেখি, কী করে এল দুই পাষণ্ড।

রামতনু-ভজহরি লম্বা লম্বা দম টানে রামপ্রসাদ ভারতের সমীপে এসে থামে। ভজহরির ভাঁটা চক্ষু এখন প্রায় চাকা পরিমাণ। রামতনুর চক্ষু তাল গাছে। দুজনাতেই যে যার গামছা-উত্তরিয় দিয়ে কপাল মুছছে। মুখের সামনে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাতাস খাচ্ছে।

প্রসাদ আর থাকতে না পেরে বলে ওঠেন. বলি হলটা কী! দেখে মনে হচ্ছে পেছুতে বাঘে তাড়া করেছে।

ভজহরিই প্রথম মুখ খোলে, রক্ষে করো দাদা, বাঘ তো ঢের ভালো। কিন্তু শকুন, শকুন।

রামতনু সায় দেন মহা উৎসাহে, পালে পালে শকুন। ভাগ্যিস, আমরা জ্যান্ত মানুষ। মরা হলে এতক্ষণে ঠুকরে ঠাকরে সাবাড়।

ভজহরি মাথা ঝাঁকায়, কম্ম কাবার।

আজ সকালে আমার কানুটি-দাদু, অর্থাৎ আমাব কানুবাবার শ্বশুর মহাশয় পূর্ণচন্দ্র সস্ত্রীক ও সকন্যা—বুলু মাসি সমেত আমাদের বাড়িতে উপনীত। আমার পারুলবালা দিদি মোটসোটা গোলগাল লক্ষ্মী ঠাকুর-লক্ষ্মী ঠাকুর। মাথায় সিঁথেব ডগ দেখা যায় না। ঘোমটা টানা চওড়া লালপেড়ে শাড়ির বুকে জরির নকসা। আর কী আশ্চর্য তাঁর পাশের মানুষটি—অবশ্যই পতি পরমগুরুটি, আমার দাদু, যিনি কোট প্যান্ট সমেত সচরাচর সাহেব থাকেন এখন কী অবাক ধুতি-পাঞ্জাবি। কালোবর্ণ, পেশীদার সটান দীর্ঘ বেটাছেলে। মাথাব কালো চুল ব্যাক ব্রাশ আর যৎপরোনাস্তি ছোট করে ছাঁটা। দিদিমা আপাত শান্ত কিন্তু সদাই হাস্যমুখী। সেই উজ্জ্বল ফর্সা মুখময় পুরনো স্মল পক্সের অজস্র গভীর খন্দ। কপালের মধ্যিখানে এই অ্যাত্তোবড় সিঁদুরটিপ। হাতে পুরু বালার পাশে শাঁখা নোয়ার ঠোনাঠুনি। কানুটির মুখের গাম্ভীর্য ঠেলে পূর্ণিমা যাই যাই ফিকে ছানাকাটা হাসি হাসি।

কানুটি সন্দেশের প্যাকেটখানা বড়মাব কোলে রেখে পায়ে হাত রাখেন। বড়মা সঙ্গে সঙ্গে চিবুকে হাত ছুঁইয়ে মুখে চুকুস হামু। এসো পুণ্য, বলে কদ্দিন পবে এলে বাপ।

কানুটির সামান্য হাস্য। --এই তো এলাম।

—একা এয়েচো, না সঙ্গে আমার মা নক্কীটি আচেন।

দিদিও প্রণাম করে। —কেমন আছেন?

বড়মার চোখে ছানি। ফলে প্রথমে কিছুটা বেসড়গড়। তারপরেই, ওমা, আমার পেটের কন্যে পারুল। আহা মা, কদ্দিন পরে দেকা হল।

কানুবাবার এখন টিকির দেখাও মিলবে না। বাড়ির ভেতরকার বাগানে বিচিত্র ফুলবাগিচা। আর বাড়ির সামনেকার বৃহৎ ষোলকাঠা বাগানে যাকে বলে জগঝম্প কৃষিবিজ্ঞান। বাগানসেবা চলে ভোররাত থেকে কিছু বেলা, অফিস বেরনোর আগে পর্যন্ত। আবার সন্ধেয় ফিরে কখনও মাঝরাত, কভু শেষ রাত। সঙ্গে জোড়া শাগরেদ, রামশরণ কাকা আর হালিসহরেরই এক উড়িয়া মানুষ, নরহরি ভুঁইয়া, সংক্ষেপে আমাদের নরিকাকা। গরমদিনে বাবার বাগানি ইউনিফর্ম হল খাকি হাফপ্যান্ট, স্যান্ডো গেঞ্জি, পায়ে গামবুট। কেন না হোথায় প্রচুর জোঁক। বর্ষায় ওই একইভাব। শুধু শীতকালে গায়ে হাতকাটা সোয়েটার আর মাথায় কান-মস্তক পেঁচানো মাফলার। আমাদের বাড়িতে সারা বছরই বিচিত্র, বিবিধ সারের উগ্র বিটকেল গন্ধ ঘোরে। ঘুরে বেড়ায় খোলপচা, পাতানাতা ইত্যাদির পচনের ভয়ঙ্কর ঝাঁঝ। কত প্রকারের অস্ত্রশস্ত্র এই বাগান নিয়ে। কত কিসিমের কোদাল, খুরপি, নিড়েনি, গ্রাসকাটার। ফলে, ভেতর বাগানে দিশি বিদেশি ফুলের লীলাক্ষেত্র, মাটি বাদেও বিভিন্ন আকৃতি-প্রকৃতির টব। আর বার বাগানে কৃষিকাজ আনাজপাতির। এখানে আলু, ওখানে রাঙা আলু। হেথা ভুঁই কুমড়ো, হোথা লাউ। মুলো, পালং, নটে, পুদিনা। ওল কপিও আছে। আছে টম্যাটো, আদা, আমআদা, কাঁকরোল, উচ্ছে, পেঁয়াজ। শীতে এক একটি ধামা সদৃশ ফুল এবং বাঁধাকপি। অমন কপির আকার বাজারে সহজে মেলে না। বাড়িতে এ সময় ভিখিরি এলে বড়কা বড়কা কপি ভিক্ষে দেওয়ার চল আমাদের। তারা প্রায়ই ব্যাজার হয়ে বলে, কপির বদলে দু'টি চাল দাও বাবা। বাড়ি থেকে লম্বা তার টেনে বাগানে এক বাঁশের টঙে জোরালো ওয়াটের বাল্‌ব গাঁ গাঁ করছে। বড় বড় ড্রামে ইঁদারার জল ধরা। তাই দিয়ে সেচকার্য। কানুবাবা মহানন্দে বাগান সাধনা করতে করতে তাঁর ভারী সুরেলা আর কিঞ্চিৎ নাকপ্রধান গলায় গান ধরেন। গাওয়ার কথা রামপ্রসাদী কৃষি বিষয়ক গান। কিন্তু তার বদলে ঘটে, প্রেমের সমাধি তীরে নেমে এল, শুভ্র মেঘের দল...। এই গানটির যেখানে তাজমহ-অ-অ-অ ল বলে দীর্ঘ টান আছে, বাবা সত্যিই সেখানে লা-জবাব।

দোতলায় দাদুর ঘরে কানুটি, একাধারে তাঁর মাস্টারমশাই আর বিপরীতে তাঁর বেয়াইয়ের সামনে ফুলকাটা আসনে উপবিষ্ট। পাশে অতিথি স্বজনের জন্যে আলমারিতে তুলে রাখা দামি টি-সেটের একটি কাপ-ডিশ। চা এবং ব্রিটানিয়া বিস্কুট একজোড়া। সেই সঙ্গে তাঁর প্রিয় মিষ্টি—মণিমান্নার মাখা সন্দেশ বা কাঁচাগোল্লা এক থাবা।

নীচে, মার সঙ্গে রান্নাঘরে দিদি, কাপড় বদলে একটি ঘরকাপড় পরে আমার দাদুর জন্যে চাল দিয়ে মোচা আর ধোঁকার ডালনা রাঁধতে বসে পড়েছে। আমাদের বাগানে আজ একটি বৃহৎ গর্ভমোচা দেখা গিয়েছে। মা'র ফরমায়েশে বাবা সেটি কেটে পাঠিয়ে দিয়েছে। আমাদের ভাইটি আজ কাজ নেই বলে অভিমানিনী স্বভাবমতো আপন মনে একধারে। কখনও বার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, কভু ভেতর বারান্দায় তারে মেলে

দেওয়া কাপড়চোপড় উল্টেপাল্টে দিচ্ছেন। একবার, ওঘরে বৃদ্ধা মা'র কাছে যেয়ে বলতে শোনা গেল, আর কী মা, আজ তোমরা মায়ে-পোয়ে বাঙালদেশি রান্না খাও।

বড়মা বলে, রান্নার আবার দেশবিদেশ কী রে।

—আছে বৈকি। তরকারিতে এমন ফোড়ন দেয় যে চোখে জল ধরে রাখতে পারিনে। আমাদের একটু সর্ষে, গুড়চিনিই ভালো। অত ঝাঁঝঝাল সইতে পারিনে।

বড়মা টের পায় কন্যের কথা কোন খাতে বইছে। তাই একটু ভিন্ন ধারে বাতাস ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। —বলি হ্যাঁমা, তোর মা হল পণ্ডিতবংশের মেয়ে। একটা কথা আছে না, যস্মিন দেশে যদাচার, কাছা খুলে নদী পার হ।

দোতলায় মুখোমুখি শিক্ষক ছাত্র। সঙ্গে এসে এইমাত্র যোগ দিয়েছেন আমাদের পাড়ার শ্রীদেব বসু। সাদা কুচি কুচি চুল আর চমৎকার করে আঁচড়ানো বাহারে ধবধবে গোঁফদাড়ি। অনেকটা মাথার টুপি ছাড়া দাদাভাই নৌরাজি। রেলে কেরানির চাকরি প্রায় ফুরিয়ে এল। কিন্তু ইংরেজি ভাষাটি গুলে খেয়ে বসে আছেন। প্রায়ই অমৃতবাজার পত্রিকায় চিঠি লেখেন। আর সেটি বেরলেই আমার দাদুকে ছুটে দেখাতে আসেন। শ্রীদেব দাদুর তিন পুত্রেরা কেউ ফুটবলার, কেউ গোঁয়ার।

আর কী আশ্চর্য, আজই আমার দাদু একখানা সদ্য পড়া বই পড়ে আলোচনা পাড়ছেন, যেটির লেখক দাদাভাই নৌরজি।

দাদু বলছেন, বুঝলেন দেববাবু, বুঝলে হে পূর্ণ, অথর একজায়গায় বলেছেন, As much as our rulers swerve from "the path of duty that is plain before them, "so much do they depart from" the path of wisdom of national prosperity and national honour."

শ্রীদেব দাদু মুহুর্মুহু মাথা নেড়ে বলছেন, কী ইউনিক, কী ইউনিক ল্যাঙ্গোয়েজ আর এক্সপ্রেশন।

দাদু সোৎসাহে গলা তোলেন, আরে দাদা, একবার ভাবুন কথাটা। নাইনটিন হানড্রেড অ্যান্ড ওয়ান এ এই বইখানা লেখা। এখনও কী রেলেভেন্ট।

শ্রীদেব দাদুর প্রশ্ন, কী নাম বইখানার মাস্টারমশাই?

—ভেরি সিম্পল নাম। POVERTY AND UN-BRITISH RULE IN INDIA. বইটা বেরিয়েছিল London-এর Swan Sonnenschein & Co. থেকে 1901-এ। প্রকাশকের ঠিকানা হল Paternoster Square.

শ্রীদেব দাদু নিজের কপালে দু'হাত ছুঁইয়ে প্রণাম করেন—সম্ভবত বইটির লেখকের উদ্দেশে। তারপর বলে ওঠেন, এঁরাই তো প্রকৃত ঋষি মাস্টারমশাই।

দাদুর গলার স্বর ওঠে, তেমনই ঋষি কার্ল মার্কস মশাইও। মার্কসবাদীরা অবিশ্যি এই ঋষি কথাটিতে অ্যালার্জি বোধ করেন।

কানুটি এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। শুনছিলেন এই কথোপকথন। এমনিতে কম কথা বলা মানুষটি এবার অনুচ্চ কণ্ঠ তোলেন। —হ্যাঁ মাস্টার মশাই, লেখক লেখেন আর সমালোচকরা সমালোচনা করেন।

শ্রীদেবদাদু মাথা ঝাঁকান, সেটাই তো নিয়ম পূর্ণবাবু। হয়ে আসছে চিরকাল।

কানুটি ফিকে হাসেন। তারপর চমৎকার কেটে কেটে বলে ওঠেন, আসলে এই হয়ে আসা মুশকিলটার কথা হেমিংওয়ে ভারী সুন্দর বলেছেন।

দাদু সচকিত মুখ তোলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো বলো। বইখানার নাম কী হে?

পূর্ণচন্দ্র বলেন, হেমিংওয়ে বলছেন, The critics will dive in to their vocabularies and come up with articles on the death of Conrad. They are diving now, like prairie dogs. লেখক কনর‍্যাড যখন মারা যান, হেমিংওয়ে এই কলামটি লেখেন।

দাদুর গ্রন্থক্ষুধা তুড়িলাক দেয়, বইখানার নাম কী হে?

—BY LINE.

নিচে, ইঁদারাধারের কলতলায় আমাদের সরস্বতী দিদি স্বরচিত আর আত্মজীবনী ও বিলাপমূলক গান ধরে, নন্দ এবার মরিবে বলে, বেটাছেলে পোয়াতি হলে, চিংড়ি মাছের কাঁটা খেলে, বদহজমি হবে বলে। বোমম্ ষট্‌কে, ওই নন্দর মড়া চিলুতে গিয়ে আট্‌কে, হি হি, হি হি...।

একত্রিশ

নীচে ইঁদারাতলার ধারে কলতলায় পাগলি সরস্বতী দিদির উল্লসিত সুরে-বেসুরে গান আর মা'র রান্নাঘরে ছাঁক্ সম্বার ফোড়ন। আমার পারুলবালা দিদিমা রান্না-বান্নায় লেগে পড়েছেন। মা আজ দোয়ারকি দিচ্ছে।

বাবা-বার বাগানে হেস্তনেস্ত কৃষিকাজ নিয়ে। সঙ্গী নরহরি ও রামশরণ কাকাজোড়া মাঝে মাঝেই বাবার এক গেলাস চায়ের হুকুম সমেত যুগপৎ মা'র কাছে দাখিল হচ্ছে। ভাইটি আজ রান্নাঘর ছেড়ে বড়মার কাছে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত খুলে বসেছে।

'ঠাকুর নিজের চরিত্র, পূর্বকাহিনি বর্ণনা করিতেছেন।'

'শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—ও দেশে ছেলেবেলায় আমায় পুরুষ মেয়ে সকলে ভালোবাসত। আমার গান শুনত। আবার লোকদের নকল করতে পারতুম, সেই সব দেখত ও শুনত। তাদের বাড়ির বউরা আমার জন্য খাবার জিনিস রেখে দিত। কিন্তু কেউ অবিশ্বাস করত না। সকলে দেখত যেন বাড়ির ছেলে।'

'কিন্তু সুখের পায়রা ছিলুম। বেশ ভালো সংসার দেখলে আনাগোনা করতুম। যে বাড়িতে দুঃখ বিপদ দেখতুম সেখান থেকে পালাতুম।'

বড়মা বয়স পাওয়া গম্ভীর গলায় বলে, হরিবল। হরিবল।

বার-বাগানে বাবার সাধা গলায় হঙ্ক ডঙ্ক, রামশরণ, রামশরণ।

রামশরণ কাকার বদলে নরহরি অর্থাৎ নরিকাকা সাড়া দেয়, এই তো। আমি বেগুন ধারে আছি।

—কেন, বেগুনে কেন? তাহলে আলুতে জল দেবে কে?

নরিকাকা বলে ওঠে, বউদি ক'টা বেগুন চাইলেন যে।

—কেন, এখন বেগুন কী হবে?

রামশরণ কাকা বাড়ির দিক থেকে বাবার জন্যে চা আনতে আনতে বলে, বাইগন ভাজি হবে। আপনার সশুর পুরি দিয়ে খাবে দাদা।

আমার ছোট বোন সোমার হাত ধরে বুলু মাসি বেড়ার গেট খুলে বাগানে এসে ঢোকে।

—কী জামাইবাবু। কী করছেন?

বাবার কাজমনস্ক মুখে হাসির ঝলক, আরে বুলু! কখন এলে? জলখাবার টাবার খেয়েছো?

জোড়া প্রশ্নের জবাব হয় এক কথায়, অনেকক্ষণ।

মাসির হাত ছেড়ে ছোট্ট সোমা হঠাৎ করে সদ্য কী একটা বুনে দেওয়া জমিতে নেমে গটগটিয়ে হাঁটা ধরে। সেই দেখে বাবা চিৎকার করে ওঠে, সব্বোনাশ, সব্বোনাশ।

সোমা থমকে ঘাড় বাঁকায়।

—ছব্বোনাছ। ছব্বোনাছ।

দোতলায় তিন তিনটি দাদুর মধ্যে আলোচনা ক্রমে গভীর থেকে গম্ভীর হয়ে ওঠে। কলতলায় সরস্বতী দিদি গানের বাণী বদল করে, ইলিশ মাছের সুক্তো হলে, আতা গাছে মুলো হলে, মাসতুতো বোন পিসতুতো হলে, নন্দ ঘাটে যাবে বলে...

শ্রীদেবদাদু যেহেতু একটু গান্ধী-স্বভাবী, তাই কথায় কথায় গান্ধী-কথা।

—বুঝলেন দাদা, গাঁধীজির সেক্রেটারি প্যারেলাল বলছেন, আর কিছুদিন বেঁচে থাকলে, হাতের কাজ শেষ হওয়ামাত্র প্রথম সুযোগেই তিনি রাজনীতির শুদ্ধিকরণের কাজকে প্রায়োরিটি দিতেন।

—হুঁ। তাহলে দেশে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগল, তখনকার কথা একটু ভাবুন।

—ঠিক কথা দাদা। ওই কথাটাই তো বলবার। গাঁধী বললেন, দেশভাগের পর যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগল—মানে সেই অগ্নিপরীক্ষা থেকে যদি তিনি উত্তীর্ণ হন, তাহলে তাঁর প্রথম কর্তব্য হবে রাজনীতির সংস্কার সাধন করা।

—কিন্তু গাঁধী হাজারবার ভুল করেছেন, আবার হাজারবার তা স্বীকার করেছেন। এতে তাঁর সত্যবাদীত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু দেশটা যে গোল্লায় গেল। তার জীবনে সত্য ব্যাপারটা ছিল ঢালের মতো।

—দাদা, গাঁধী খুব সাধারণ পরিবারের ছেলে ছিলেন। তাঁকে অনেক পরিশ্রম করে তবে মহাত্মা হতে হয়। আসল কথা হল, মানুষটি বরাবরই ভারী নিঃসঙ্গ, একা। তাঁর সঙ্গীসাথী আর চেলাচামুণ্ডারা কেউই তাঁর মতো সত্যনিষ্ঠ ছিলেন না। দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় তাঁর মনোকষ্টের কোনও সীমা ছিল না। এই বুড়ো মানুষটির কথা কেউ শুনত না।

—হ্যাঁ, চেলারাও তো তাঁর ভুল নীতির জন্যে বরাবর মার খেয়ে এসেছে। তাদের হয়তো মনে করা উচিত ছিল, প্রহার যদি গায়ে পড়ে, তা হলে শরীর কিছুটা মজবুত করতে হবে। মার খেলে মনে করতে হবে, শরীরের ব্যায়াম হচ্ছে। এই তত্ত্বকথাটা আমার নয়, বিনোবা ভাবের।

শ্রীদেবদাদু একটুক্ষণ চুপ করে কী যেন ভাবেন। কপালের মাঝখানকার রগ টিপে ধরে থমকে থাকেন। তারপর মুখ তুলে বলে ওঠেন, নাইনটিন টোয়েন্টিওয়ানে অসহযোগ

আন্দোলনের সময় যখন বোম্বাইয়ে দাঙ্গা বাঁধল, তখন গাঁধী একদিকে নিজে অনশন আরম্ভ করলেন, অন্যধারে সব ধর্মের স্বেচ্ছাসেবকদের একত্র করে বিভিন্ন দলে দাঙ্গার জায়গায় পাঠালেন। তার নাম দিলেন 'শান্তি সেনা'। এই সেনাদলের জন্যে একটি নিয়মাবলি তৈরি হল। যেমন, এর সদস্যরা কোনও অস্ত্র রাখতে পারবেন না। কোনও বেতন পাবেন না। সকলে খদ্দর-এর উর্দি পরবেন, যাতে তাঁদের আলাদা করে চেনা যায়। তারপর, দলনেতার নির্দেশ পুরোপুরি মানতে হবে। তাঁদের মন, বচন আর কর্মে পুরোদস্তুর অহিংস হতে হবে। আর শেষকথা হল, এর সব সদস্য সকল ধর্মমতকে সমান মনে করবেন।

দাদু চোখ বুঁজে শ্রীদেবদাদুর কথাগুলো পরিপাক করবার ভঙ্গী করেন। আমার কানুটি দাদু তাঁর স্বভাব মতো চুপটি করে এই দুই গুরুজনের কথা শুনে যান বিনি মন্তব্যে।

পিতামহ এবার মুখ খোলেন, গাঁধীর অহিংস সৈনিকদের বলে দেওয়া হল, হাতে কোনও অস্ত্র থাকবে না। তলোয়ার-বন্দুককে লাঙল-কোদালে পরিণত করতে হবে। তাহলে আমাদের দেশের অ্যানারকিস্ট--মানে অস্ত্রবাদী বিপ্লবীরা কি গাঁজা খেতেন! অনুশীলন সমিতি, বিপ্লবী বারীন ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষ, সূর্য সেন—এঁরা তাহলে কী! বোমা-রিভলবার ইজ ইকুয়াল টু ফাঁসিকাঠ। এসবের কি কোনও মানে নেই। তাহলে লোক দেখানো স্বাধীনতা আর দেশভাগের অর্থ কী?

—হ্যাঁ দাদা, হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান গাঁধী করতে পারেননি। বরং তাকে আরও জটিল করে তুলেছিলেন। এমনকী দেশভাগের দায়িত্বও আংশিকভাবে মেনে নিয়ে বললেন, এটা তাঁর পরাজয়।

কানুটি দাদু এবার তাঁর স্বাভাবিক গম্ভীর স্বরে কথা বলেন, আমার তো মনে পড়ছে কার্ল মার্কসের কথা। তাঁর অর্থনীতির শেষ কথা তো রিজার্ভ আর্মি। তাই দিয়ে মানুষের মুক্তিচিন্তা করা।

শ্রীদেব দাদু ফিরে তাকান কানুটির দিকে। তারপর গলায় শ্লেষ ঢেলে বলে ওঠেন, পূর্ণবাবু, আপনি আবার মার্কসিস্ট হলেন কবে! আমাদেব এই ভেতো জল বাতাসে মার্কস সাহেব কী করবেন।

কানুটির স্বর এবার খানিক দৃঢ় হয়ে দাঁড়ায়, যাঁদের নাম এইমাত্র করা হল, সেই অরবিন্দ, সূর্য সেনরা কি ভেতো বাঙালি ছিলেন?

দাদু কানুটি দাদুর মুখের কথা না ফুরোতেই বলে ওঠেন, আজকের, আমাদের দেশের অনেক মার্কসপন্থীদের জীবনযাপন, চিন্তা ভাবনা দেখলে আসল মার্কসকে খুঁজে পাওয়া দুর্ঘট। বেশিরভাগই ধনী জোতদার, কিংবা বিলিতি ব্যারিস্টার। ঠিক যেমন গান্ধী। গান্ধীবাদ বললে মনে হয় গান্ধী বাদ। অর্থাৎ মাইনাস।

কানুটি তাকান তাঁর বেয়াই মাস্টারমশাইয়ের দিকে, কিন্তু মাস্টারমশাই, যে মানুষটা গোটা জীবন সাধারণ মানুষের জন্যে এত লড়লেন, এত বিড়ম্বনা পেলেন, তাঁর বুকের ভেতরকার আসল অবস্থান নিয়ে কেউ কোনওদিন ভাবল না। এমনকী প্রোলেতারিয়েতদের নেতারাও নয়। আসলে গোটা মার্কসীয় তত্ত্বটাই তো জার্মান ফিলসফিক্যাল থিওরির ওপর দাঁড়িয়ে। সোজা কথায় যেটা বলা হয় সেটা হল, Com

munism no longer meant imaginatively concocting an if-possible complete social ideal, but an understanding of the nature, conditions and consequent aims of the struggle of the proletariat. আসলে এটা কোনও doctrine শুধু ছিল না, এ এক জ্বলন্ত movement.

দাদু গম্ভীর বলেন, আমার তো মনে হয় মার্কসের সঙ্গে আমাদের দেশের অস্ত্রবাদীদের কোনও তফাৎ ছিল না। শুধু মার্কসীয় লড়াইয়ের উপকরণ ছিল জার্মান ফিলসফি। আর আমাদের অস্ত্রবাদীদের উপকরণ এসেছে ভারতীয় দর্শন, মহাভারত, বিশেষ করে গীতা থেকে। কিন্তু পূর্ণ, তুমি মার্কসের বুকের ভেতরকার কথা নিয়ে কী যেন বলছিলে!

—হ্যাঁ, মার্কস-এর মেয়ে জেনির যখন একটি ছেলে হল, সেই ১৮৮১ সালে মেয়েকে একটি চিঠি লিখেছিলেন তিনি। সেটা অনেকটা এইরকম, My 'women folk' hope that the 'newcomer' will increase the 'better half' of humanity; so far as I am concerned at this turning point in the history, I favour children of the masculine sex. They have before them the most revolutionary period mankind has ever known. It is bad to be an old man at this time, for an old man can only foresee instead of seeing.

—বাঃ, বাঃ। লাখ কথার এক কথা। আমি যেমন এ বয়েসে ভালো করে দেখতে পাই না বলে সবকিছুই foresee করছি।

রামপ্রসাদ-ভারতচন্দ্রের সুমুখে এই প্রভাতে একজোড়া উত্তেজিত, হতচকিত বোকা সিধে কুলমার্তণ্ড রামতনু আর ভজহরি। দু'জনার সঘন শ্বাসপতন আর কতক ছানাবড়া চক্ষু। পা থেকে মাথা তক্কো ঘর্মাক্ত, চমকিত কিংবা চমৎকৃত।

রামপ্রসাদ হাত ইশারায় দু'জনকে বসতে বলেন। দু'জনাতেই মুখের সামনে গামছা-উত্তরীয় ঘুরিয়ে বাতাস খেতে খেতে রাজ অতিথিশালার বারান্দায় বসে পড়ে। ঠিক তখনই দেউড়ির দিক থেকে আর একজোড়া অপরিচিত মানুষ এই দিকে এগিয়ে আসে। ভজহরি তাদের দেখে গলা তুলে বলে ওঠে, ওই যে। ওই যে। আসছে তারা দুই পাষণ্ড।

রামতনু বলে ওঠেন, পাষণ্ড বলে পাষণ্ড। একেবারে মানুষমারা পাষণ্ড।

প্রসাদ কুতূহলী তাকান ভারতের দিকে। ভারতচন্দ্র মিচকি হেসে বলেন, বুঝেছি। গোলটা কোথায় পাকল, এবার বুঝেছি।

সেই মানুষজোড়া এসে থামে চারজনের সুমুখে। তারপর ভুঁয়ে হেঁট হয়ে দণ্ডবৎ রাখে প্রসাদ আর ভারতের প্রতি।

ভারত হেসে কন, কী হল মহাদেব। সাত সকালে কী কাণ্ড ঘটালে বলো দিকি!

দু'জনার মধ্যে প্রৌঢ় যে জন, সেই যে মহাদেব, তা মুহূর্তেই বোঝা যায়। পাশের জনার দিকে হাত দেখিয়ে সে বলে, আজ্ঞা রায়মোশাই, ইটি আমার পুত্তুর। নাম গণেশ। ইটিও কারিগর পোটো। আসলে এঁয়ারা এমন যে ডরাবেন, তা ধত্তে পারিনি। তাই ফয়সালা কত্তে চলে এলাম।

ভারত হাসেন ঠোঁট টিপে, হুঁ, বাপ-পুত্তুর দু'জনাকেই তো আমি চিনি। দু'জনারই গুণপনা জানি।

প্রসাদ প্রশ্ন করেন, গুণপনা বলতে?

ভারত আড় চোখে একবার ভজহরি আর একবার রামতনুর দিকে তাকান। তারপর বলে ওঠেন, গুণপনা বলতে লোক ঠকানো বিদ্যে আর কী।

—লোক ঠকানো!

--তা ছাড়া আর কী।

মহাদেব জোড় হস্তে দাঁড়িয়ে। তার অবনত গোঁফজোড়া আর কাঁধ-ছোঁয়া বাবরির ঝাড়ে কোনওপ্রকার বদমানুষী বা লোক ঠকানো আঁকা থাকে না। পা থেকে মাথা অবধি অতীব নিপাট সরল ছবি। এরই মধ্যে বাহার খুলেছে তার মাথার চুলে—স্বাভাবিক নিয়মে চমৎকার কুঞ্চন। চোখজোড়া কিন্তু ক্ষুদ্রাকৃতি। রামপ্রসাদের চোখে মুহূর্তে এই মানুষটিকে আর পাঁচ সাধারণের বাইরে বলেই মনে হয়।

ভারতচন্দ্র বলে ওঠেন, নাও হে মহাদেব, তোমার পরিচয় একটুখানি না দিলে যে ওই বিদেশিদের ধাত রক্ষে হচ্ছে না।

মহাদেব জোড়হস্ত অবস্থাতেই বলে, আজ্ঞে আমি তো সামান্য পোটো। পাল আমাদের পদবি আর নামটি দেবাদিদেবকে উচ্ছুগ্গু করে মহাদেব।

ভারত এবার রামতনুর দিকে তাকান, তাহলে আপনিই বলুন, কী দেখে এমন হতভম্ব হলেন আপনারা।

রামতনু জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটেন। তারপর বলে ওঠেন, আজ্ঞে কী বলব মহাশয়। সাত সক্কালবেলা রাজসড়কের ওপরে একটি মরা গরু পড়ে আছে। অমনি তার গায়ে ঝাঁকে ঝাঁকে শকুন নামছে। সে কী কাণ্ড। মরা গরু কে ফেললে রাজপথে!

ভজহরি তড়পে বলে, কী বলব দাঠাকুর। রাস্তার মাঝখানে এমন গো-ভাগাড় তো জন্মে দেখিনি। তারপর আমরা ভাবলুম তাড়াই। তা হাত নাড়তেই তেড়ে এল আমাদের পানে। আর একটু হলে চোখ খুবলে নিত।

মহাদেব সেই হাতজোড় অবস্থাতেই করুণ ভঙ্গীতে বলে, মাজ্জনা করবেন আপনারা। অপরাধ যে আমারই।

প্রসাদ অবাক বলেন, সে আবার কী!

মহাদেব সাদা মুখে বলে, আজ্ঞে, ওই যে বল্লাম, অপরাধ আমারই। ওই মরা গরুটি আসলে আমিই গড়েছি। আর আমার পুত্তুর আর তার সাগরেদরা ওটি রাতের বেলা রাজসড়কে ফেলে রেখে এসেছে। ফন্দিটা অবিশ্যি আমারই ছিল।

---কীরকম ফন্দি?

--আজ্ঞে আমার তোয়ের করা কম্মটি কেমন সত্যি হল, সেটি যাচাই করতে হবে তো। সে জন্যে অবিশ্যি আপনাদের একটু হেনস্তা হল।

রামতনু গলা তুলে বলে ওঠেন, এ কী প্রাণঘাতি কাজ! তুমি পটুয়া না যমরাজার নাটুয়া তা জানিনে বাবা, তবে যদি আমাদের প্রাণ যেত তাহলে কী হত।

মহাদেব ঘাড় হেঁটে করে বলে, আমার অপরাধের কোনও মাপ থাকত না।

ভারতচন্দ্র হাসি দমন করে বলেন. শকুনগুলো কি মাটির তৈরি করা যায় না?

মহাদেব সামান্য মুখ তোলে, আজ্ঞে আপনারা আশীর্ব্বাদ করলে যায় বৈকী। তবে সে শকুন ওড়াবার ক্ষ্যামতা বিধেতাপুরুষ আমায় দেননি।

রামতনু ভজহরি যুগলে অবাকের চুড়োয় উঠে একত্রেই 'এ্যাঁ' শব্দ করে ওঠে। আর তারপরে পরেই ভজহরি বলে, হুঁ, সেটি হলে মরা মানুষও তোমরা বাঁচিয়ে দিতে পারতে।

মহাদেব চোখের কৌতুক দমন করে বলে, অতটা পারিনে মোশায়। তবে তুলি ধরলে আপনার দা'ঠাকুরের একখানি জ্যান্ত পট এঁকে দিতে পারি।

—বেশ তো। এঁকে দাও না একখানা।

মহাদেব হেসে বলে, এখেনে নয়, মনে সাধ আছে, হালিসহরে যেয়ে ওঁয়ার সুমুখে বসে আঁকব।

—সে আবার কবে হবে?

—আজ্ঞে, হালিসহরের কুমোর পাড়ায় খানিক জমি রাজা কেষ্টচন্দর আমায় চাকরান সম্পত্তি হিসেবে দান করেছেন। ওখানে একটি মেটে কুঁড়েও গড়েছি। ফি বছর ফাগুন মাসে বাপ বেটায় যাই। মাস দেড়-দুই বাস করি। আবার ফেরত আসি কেষ্টনগরে।

প্রসাদ সহর্ষে বলে ওঠেন, বটে, বটে। তাহলে তো তুমি আমার আধখানা দেশের লোক বট।

—আজ্ঞা, জেলা হিসেবে যদি ন'দে জেলা হয়, তা হলে খানাখন্দ সরিয়ে রেখে পুরোদস্তুর ষোলআনা।

প্রসাদ ঝিলিমিলি চোখে হাসেন, আমাদের এই পোটোর হাত যেমন চলে, বচনও তেমন। বাঃ, বাঃ।

ভারতচন্দ্র এবার সহর্ষে বলে ওঠেন, বেশ কথা, মহাদেব তোমার আজকের দিনটি ভারী সুকৃতির—এ কথা মনে রেখো। প্রথমত এই রামপ্রসাদ সাক্ষেৎ কালীর বেটা, আর দ্বিতীয়ে ইনি একজন পরম কবিও বটেন।

মহাদেব জোড় হস্তে বলে, আজ্ঞে মোশায়, আমি ওঁয়াকে বিলক্ষণ চিনি। উনি মনভুলো মানুষ। সাধন-ভজন আর গানপত্তর নিয়েই থাকেন। আমায় উনি চিনবেন কেন।

এই কথার শেষ আঁচড়ে একটুকুন ছড়ে যাওয়া বুঝি। প্রসাদ সেটি টের পান। আর টের পাওয়া মাত্র উঠে দাঁড়ান। দু'পা এগিয়ে যান। তারপর মহাদেবের দু'খানি হাত ধরে টেনে নেন নিজের বুকের পানে। পটুয়ার মাটিছানা অকরুণ হাত জোড়া নিজের বুকের মাঝখানে চেপে ধরেন রামপ্রসাদ।

এই অতর্কিত কাণ্ডের জন্য একেবারেই অপ্রস্তুত মহাদেব পাল প্রথম দফায় চমৎকৃত ও চমকিত। দ্বিতীয়, সে যখন দেখতে পায় তার কঠিন তাম্রাভ হাতযুগল যে স্থানটিতে এখন রাখা আছে, তার বর্ণ রক্ত ফুটে ওঠার অতীত। সে রং এসে ছুঁয়ে দিয়েছে প্রথম সূর্যের আলো আর সূর্য পাটে বসার একত্র মিলমিশ। অথচ এই বক্ষ নিরেট উন্নত পেশীপুঞ্জ সমেত। মহাদেব পটুয়া ভেবে পায় না এই হুবহু রংটি সে কী প্রকারে পটে কিংবা মেটে প্রতিমায় জোগান দেবে। কীভাবে ওই মানুষী বুকের ভেতরকার ধুকপুকানি আর আবেগটুকু তার হাতের কাজে মুক্ত করবে।

মহাদেব অনুভব করে, কোথায় সে অকারণ খোঁচাটি দিয়েছে। টের পায়, সে তার পটুয়া গুমোরের হুল এইমাত্র পরিচয় হওয়া মানুষটিকে দিলেও তার কী শান্ত আর উত্তেজনা পার উপহার। এমন মানুষের বুকের বর্ণ আর গঠন বুঝি এমনটাই মানানসই আর দুর্লভও বটে। এ মূর্তির পট অথবা মূর্তি নিখুঁত গড়া বুঝি বিশ্বকর্মারও কর্ম নয়।

ঠিক তার পরেপরেই মহাদেবের মনে আর একটি প্রশ্নের বিসম্বাদ পড়ে। এতকাল সে যা গড়েছে, বা এঁকেছে সে সবই কী হুবহু! লোক ঠকানো মরা ষাঁড় গড়ে যদিবা শকুন পক্ষীর কাছে পার পাওয়া যায়, মানুষের চোখে কি তিলমাত্র ফাঁকটুকুও এড়িয়ে যায়!

ভারতচন্দ্র বলে ওঠেন, মহাদেব ভায়ার এমন বিহ্বল মূর্তি দেখে আমার যে একটু পদ্য বলতে সাধ হচ্ছে।

রামপ্রসাদ আড়েআড়ে হাসেন ভারতের দিকে। ভারতও। এই হাসি পাল্টাপাল্টি ফাঁকটুকুর মাঝখানে ভারত বলে ওঠেন,

মহাদেব আঁখি ঢুল ঢুল।
সিদ্ধিতে মগন বুদ্ধি শুদ্ধি হৈল স্থূল।।
নয়নে ধরিলে রঙ্গ অলসে অবশ অঙ্গ
লটপট জটাজুট গঙ্গা থুলথুল।
খসিল বাঘের ছাড় আলুথালু হাড়মাল
ভুলিল ডমরু শিঙ্গা পিনাক ত্রিশূল।।
হাসি হাসি উতরোল আধ আধ আধ বোল
নন্ন নন্দী নন্দী আ আ নন্ন নকুল।
ভারতের অনুভবে ভাঙ্গে কি ভুলাবে ভবে
ভবানী ভাবেন ভব ভাবভরা কুল।।

বত্রিশ

ভারতচন্দ্রের মহাদেব বিবরণ জিরেন পায়। মনের আনন্দ আবেশে বুঝি কবির উপর কোনও ভর ঘটলে তা এমনই হয়। তখন কবির আর কিছু করার থাকে না। এ অবস্থাটির ব্যাখ্যা বুঝি তাঁর নিজেরও জানা থাকে না। জানা হয় না. আজীবন কবিতার ঘর করেও। সত্যই এ ভারি রহস্যময় গতিক।

মহাদেব-কবিতা আউড়ে ভারত তাকান রামপ্রসাদের চোখে। প্রসাদও তাকান খুশি হওয়ার আবেশে। তারপর মহাদেব পটুয়ার দিকে ফিরে বলেন, ধন্য তুমি পটুয়া। তোমার জনম সার্থক। তোমার মূর্তি তৈরি শুধু সাধারণ পাঁচটি মানুষকে অবাক করে না। একজন কবিকে দিয়েও কবিতা বলায়।

মহাদেব কতক আচ্ছন্ন আর শিথিল স্বরে বলে, এতকাল একজনা মাত্র কবির দর্শন পেতাম। এবার বুঝি আঠারো কলা পূণ হল। দ্বিতীয় মহাজনের সাক্ষেৎ পেলাম। ছোঁয়া পেলাম। আমার জীবন ধন্যি হল।

প্রসাদ হাসেন, অতখানি বলতে নেই ভায়া। বল্লে শিল্পের মান রয় না। শিল্প হল সাগর সমান। আমরা কোন ছার, সামান্য মানুষ।

বসে বসে এতসব কচকচানি শুনে শুনে আলা রামতনু ভজহরি। তারা নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় কিছু পরামর্শ সেরে নেয়। চোখে চোখে ইঙ্গিত করে নেয়। তারপর রামতনু বলে ওঠেন, আমার কিন্তু একটি সিধে প্রশ্ন ছিল।

প্রসাদ শুধু তাকান রামতনুর দিকে। ভারতচন্দ্রও।

রামতনু বলেন, মানুষ, দেব-দেবী এসব গড়া তো ভারি সিধে কাজ। আমি যদি বলি ভূত গড়তে। পারবে ভূত তোয়ের করতে?

সঙ্গে সঙ্গে ভজহরিও দোহার দেয়, হ্যাঁ, পারবে? ভূত? পারবে?

মহাদেব কতক মজা কতক অবাক চক্ষু তুলে বলে, আজ্ঞে সে কেমনধারা বস্তু?

রামতনু, সেকী, তুমি ভূত দেখোনি!

মহাদেব মাথা নাড়ে। ভজহরি বলে, আমার এই দা'ঠাকুরটি শ্মশানে মশানে ফেরেন। যাকে বলে, দিনরাত তেনাদের সঙ্গ করেন।

রামতনু, হুঁ, যথার্থ কথা বলেছি ভজহরি। ও তো পেসাদের সব্বক্ষণের সঙ্গী। আমি অবিশ্যি শুনিছি। নিজ চক্ষে এ অবধি দেখা হয়নি।

মহাদেব বলে, আজ্ঞে আমি সামান্য মানুষ। যা নিজ চক্ষে দেখিনি, সেটি গড়তে গেলে আর পাঁচজনের কাছে শুনতে হয়। তারপর চেষ্টা চরিত্তির করা যায়।

ভারত বলেন, কী জানি বাপু, ভূত বলতে তো পাঁচটি। পঞ্চভূত। মাটি, জল, বাতাস, আকাশ আর আলো।

রামতনু মনে মনে ভারী চটে যান। কিন্তু গলায় সেটি দমন করে অতিকষ্টে বলেন, আপনার ওই সমস্ত অং বং শাস্ত্রীয় ভূতের কথা আমরা কইছি না মোশায়। ও সব আপনাদের তোয়ের কথা বানানো ভূত। আমরা বলছি শাঁখচুন্নি, কন্ধকাটা, ঘোড়াভূত—তারপরে পেঁচো—এমনি সব ভূতেদের বৃত্তান্ত।

রামপ্রসাদ হাত তুলে রামতনুকে নিবৃত্ত করেন। কেননা, তিনি ধরে ফেলেছেন রামতনুর চটিতং অবস্থা।—বুঝেছি দাদা, আপনাব কাছে ভূতেদের ফর্দ আছে, কিন্তু আপনি ভূত কখনও চোখে দেখেননি। তবে আমি একখান পরমবৈষ্ণব ভূতের কিচ্ছে বলি। এটি চৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ মশাই লিখে রেখে গিয়েছেন।

ভজহরি সোৎসাহে বলে ওঠে, চৈতন্য মহাপ্রভুও থালে ভূত দশ্শন করেছিলেন?

রামপ্রসাদ, শ্রীক্ষেত্রধামে মহাপ্রভুর এক অনুচর ছিল। তার নাম হরিদাস। এই হরিদাস কিন্তু আমাদের সেই যবন হরিদাস নন। এই ব্যক্তি ব্রাহ্মণ আর ভারি সুকণ্ঠ গায়ক। মহাপ্রভুকে তিনি গান গেয়ে শোনাতেন। চৈতন্য খুবই পরিতৃপ্ত হতেন তাঁর গীত শুনে। একবার হল কী—চৈতন্য তাঁকে একটি আজ্ঞা করেছিলেন। সে কেন জানি সেটি পালন করলে না। তখন প্রভু তাঁর প্রতি রুষ্ট হলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ত্যাগ করলেন। তাতে করে হরিদাসের ভারী অভিমান হল। মনের দুঃখে তিনি গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে যেয়ে আত্মহত্যা করলেন। কিন্তু এ কাজটি হরিদাস এত গোপনে করেছিলেন যে, কেউ তাঁর মরণের কথা জানতে পারেনি। কিন্তু শ্রীক্ষেত্রে মহাপ্রভুর সঙ্গী অনেকেই সময়ে অসময়ে তাঁর গান শুনতে পেতেন। গান শুনতেন, কিন্তু চোখে মানুষটিকে দেখতে পেতেন না।

তখন সবাই মিলে বিশেষ যত্ন করে হরিদাসের তত্ত্বতালাশ করলেন। জানা গেল হরিদাসের মরণ বৃত্তান্ত।

ভারত বলেন, চমৎকার। কী রহস্য এই বিবরণে। তবে মুকুন্দরামের চণ্ডী কাব্যে কী চমৎকার পিশাচ-পিশাচীদের বাজার বসানোর কিচ্ছে আছে।

রামতনু গলা তুলে বলেন, শুনি শুনি।

ভারতচন্দ্র, সাধু ধনপতির পুত্র শ্রীপতি দত্ত তার বাপকে খুঁজে না পেয়ে সিংহলে এসে দৈবদুর্বিপাকে রাজার কোপে পতিত হলেন। তার ফল হল প্রাণদণ্ড ঘোষণা। তখন দেবী চণ্ডী শ্রীপতির বুড়ি ঠাক্‌মা সেজে কোটালের কাছে তার প্রাণভিক্ষা করলে। তাতে ফল হল না। তখন দেবী চণ্ডীকে তাঁর দস্যি দানবদের পাঠালেন রাজার সেনাবাহিনীর দিকে। সেই যুদ্ধে রাজার বিস্তর ক্ষতি হল। অনেক সৈন্য-সামন্ত, হাতি ঘোড়া ধ্বংস হল। তারপর হল কী, ওই রণক্ষেত্রে পিশাচ দানবরা যাবতীয় মৃতদেহ নিয়ে বাজারের আয়োজন করল।

রামপ্রসাদ, হ্যাঁ, কিন্তু রাজার সঙ্গে যখন প্রেতেদের যুদ্ধ বেধেছিল, সেখানে বিচিত্র সব দানব প্রেতের কথা বলা আছে।

ভারতচন্দ্র, হ্যাঁ, নামগুলি বলি। ধূম্রনাস, অর্থাৎ যারা নাসা হাতে ধুম বার হয়। কালু, মানে কৃষ্ণবর্ণ। খাঁটু, বেঁটেখাটো। তালজঙ্ঘ, তালবৃক্ষ সম পদযুগল। আচাভুয়া, কিম্ভূতকিমাকার। মহানাল, মানে লম্বাপানা নলগাছ সদৃশ। আউট বেতাল, আড়াইহস্ত প্রমাণ বামন। আর শেষটি হল সিংহমুড়া, সিংহসম মুখাকৃতি। এই হল প্রেতগণের নাম বৃত্তান্ত। এবার সেই বাজারটির বর্ণনা বলি।

রামপ্রসাদ, ভারি চমৎকার। বলো দাদা।

ভারত,

জুড়িয়া কোশেক বাট বসিল প্রেতের হাট
মুনাসীব সর্বমঙ্গলা
অপরূপ প্রেতের বাজার
কেহ কাটে কেহ কোটে কেহ জুখ্যা ভাগ বাঁটে
কেহ করে মাংসের বেপার
মাংস বেচে কাঁচারান্ধা কেহ কিনে দিয়ে বান্ধা
নরমাথা ঝুনা নারিকল
পিচাশ-পিচাশীগুলা গজদন্ত বেচে মূলা
কুড়ি মূলে নখ পানিফল।

রামতনু প্রেত বর্ণন শুনে এতই বিহ্বল যে, তিনি দু'হাতে তালি বাজিয়ে ওঠেন। মাথা নাড়ে ঘন ঘন ভজহরিও। শুধু মহাদেব পোটো মুখে কুলুপ এঁটে থাকে। তার পুত্রটি তো বরাবরই কোনও কথা বলেনি। এমনতর পরিবেশে, এই সাত সকালবেলায় অনর্গল প্রেতচর্চা পরিবেশটিকে কেমন বিপরীতমুখী ঘোরালো করে তোলে। সেই অবস্থার ভিতর থেকে রামতনু বলে ওঠেন, কী হে পোটো। এই তো শুনলে এত সব ভূতের কিচ্ছে। এবার একখানা গড়ে দাও দিকি।

ভজহরি বলে, আমি বেশ ক'টা ভূতের নাম দিতে পারি দাদা।

রামতনু সায় দেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো দিকি। বলে ফেলো।

ভজহরি বলে, রাত হলে ওঁয়াদের নাম কত্তুম না। এখন বল্লে ভয় নেই।

রামতনু তাড়া দেন, তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি।

ভজহরি সামান্য গলা খাঁকরি দেয়। তারপরে বলে ওঠে, আমাদের দেশ হালিসহরে যে কত রকমের, কত থাকের ভূত আছে। এক একজনার এক এক ধারা। গরু মরে গো-ভূত, তারপরে পেঁচো, আঁশটে পেত্নী, গেছো পেত্নী, গুয়ে পেত্নী. কানি, পোঁটাচুন্নি, একানড়ে, জটাধারী—

রামপ্রসাদ হাত তুলে বলে ওঠেন, এখানেই ক্ষান্ত দে।

ভজহরি একটু থামে বটে। কিন্তু সে আবার বলে, দা'ঠাকুর, গোভূত থাকে গো ভাগাড়ে, গেছো পেত্নী রয় গাছে—

ভারতচন্দ্র, বেশ বেশ। মানুষের যদি নিবাসস্থল থাকে তাহলে প্রেতেদেরও অবিশ্যি আছে। কিন্তু এইসব ভূতেদের কী খাসা জাদুকরি ক্ষমতা ছিল। তা দেখে স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র অবধি যৎপরোনাস্তি চিন্তিত। এই সব প্রেতেরা ওই জাদুকরি বিদ্যাবলে বিভিন্ন পশুপক্ষী, জন্তু-জানোয়ারের রূপ ধারণ করে সবাইকে ভয় দেখাত। এমনকী কারও কারও ক্ষতি করে বসত। এদের বলা হত যাতুধান। দেবরাজ ইন্দ্র ছিলেন এঁয়াদের বৈরী।

রামপ্রসাদ, বলো কী দাদা! যিনি দেবতাদের রাজা, তিনি তো এক অথে ভূতেদেরও রাজা। তাহলে ভূতনাথ শিব কোথায় যাবেন!

—সে আর এক তর্কের কথা। তবে ঋক্‌বেদে বলা হচ্ছে এই সব ভূত প্রেতদের হাত থেকে রক্ষে পেতে দেবতারা ইন্দ্রের সাহায্য চাইছেন।

—প্রসাদ, কীরকম?

ভারত,

উলূকযাতুং শুশুলূকযাতুং
জহি শ্বযাতুম্ উত কোকযাতুম্।
সুপর্ণযাতুমুত গৃধ্রযাতুং
দৃষদেব প্র মৃণ রক্ষ ইন্দ্র।।

প্রসাদ, অস্যার্থটি কী?

ভারত, এর মানে খুব মস্করার। বলা হচ্ছে, পেঁচাভূত, শুশুলূক ভূত, কুকুর ভূত আর নেকড়ে ভূতদের মেরে ফেলো। পক্ষীভূত আর শকুনি ভূতগণকে হে ইন্দ্র, তুমি পাথরে পিষে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দাও।

ভজহরি চাগাড় দিয়ে বলে ওঠে বেশ তো পোটো দাদা। তুমি একটি পেঁচাভূতই গড়ে দেখাও দিকি।

রামতনু মাথা নেড়ে বলে ওঠেন, না না, ওসব পেঁচা কুকুর ধারার ভূত হল ধাপ্পাবাজি। ও সব চলবে না। মানুষের কাছাকাছি চেহারার ভূত চাই।

ভারতচন্দ্র আড়ে আড়ে চক্ষু টিপে কন, হুঁ, বুঝিচি. তার মানে নর-নারীর মধ্যে নারী ভূতই বেশি প্রয়োজন। যাকে আমাদের শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হল নাড়পিতী।

প্রসাদ. আমি তো শুনেছিলাম স্বর্গের অপ্সরা উর্বশীও এক ধাঁচের প্রেতিনী।

—হ্যাঁ, এই অপ্সরাগণ তাজ্জব সব ভেল্কি দেখাতে পারতেন। তাছাড়া অপরূপ রূপ ধারণ করে কত মুনি ঋষিদের ধ্যান ভাঙিয়েছেন। সে নিয়ে কত সব কেচ্ছা কাণ্ড।

প্রসাদ, একটি প্রাচীন শাস্ত্রীয় কাহিনি মনে পড়ল দাদা এই উর্বশীকে নিয়ে।

ভারত, বলো বলো।

প্রসাদ, কাহিনিটি হল, পুরূরবস্ বলে মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর এক বেটাছেলে উর্বশীর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু উর্বশী কি আর অমনি সহজে কাউকে বিয়ে করতে চায়। তা অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর উর্বশী তাকে একটি শর্তে বিবাহ করতে চাইলে। সেটি হল, সে যেন কখনও দিবালোকে তার পতিদেবকে উলঙ্গ না দেখে। বিয়ে হল। আনন্দে দু'জনায় ঘর করতে লাগল। এই দেখে গন্ধর্বরা দেখলে যে, একজন মানুষের কলে পড়ে কেমন দিব্যি গেরস্থালি করছে এই কিন্নরী। তখন তারা একটি বুদ্ধি আঁটলে। উর্বশীর একটি পোষ্য মেষশাবক ছিল। একদিন দুপুরবেলা পুরূরবস্ দেহের বস্ত্রপাতি খুলে শয্যায় শুয়ে বিশ্রাম করছে। অমন সময়ে ওই গন্ধর্বরা সেই মেষশাবটিকে আড়াল থেকে প্রহার করতে আরম্ভ করলে। তাই শুনে পুরূরবস্ তাড়াহুড়ো করে উঠে বিনি পোশাকেই দিগম্বর অবস্থায় শাবকটিকে রক্ষে করতে ধেয়ে গেল অস্ত্র নিয়ে। উর্বশী দেখে ফেললে তার স্বামী দিবসেতে উলঙ্গ। অমনি সে স্বামীকে ত্যাগ করে চলে গেল।

ভারত একটি শ্বাস ফেলে বলেন,

হয় জায়ে মনসা তিষ্ঠ ঘোরে,

বচাংসি মিশ্রা কৃণবাবহৈ নু।

ওগো আমার মনের সঙ্গিনী। একটুখানি দাঁড়াও। আমরা দু-চার কথা কই। হুঁ, এই হল বেচারি সোয়ামির আর্তনাদ! কিন্তু এই নিয়ে আমাদের গ্রাম দেশের একটি তুক আমার মনে পড়ছে।

—কীরকম?

—রাতেভিতে কোনও পুরুষের যদি পথ হারিয়ে ভুলো লাগে, তা হলে পরণের কাপড়টি খুলে ফেলে সেটি উল্টে পরলে ভূত পালায়, আর সেও পথ পেয়ে যায়। কাপড় খুলে উল্টে পরা মানে তো লিঙ্গ প্রদর্শন।

মহাদেব এবার ষাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে বলে, এবাব আমি আসি মোশায়রা। তবে মনে হচ্ছে, এবার আমি কবি রামপেসাদের একখানি পট বুঝি আঁকতে পারব। তবে কি না দিগম্বর অবস্থায় নয়।

সবাই উচ্চৈঃস্বরে হেসে ওঠে। সে হাসির দাপটে সকালবেলা গড়ানো আকাশ দুলে ওঠে।

তিনজনের এই বই কচকচানি আলোচনার মাঝখানে হঠাৎ মা এসে কোনওমতে মাথা গলায় চা নিয়ে। দু'জনার জন্যে দু'টি কাপ আর দাদুর জন্যে কাচের গ্লাস। সঙ্গে দু'টি আলাদা প্লেটে সদ্য ভাজা গরমাগরম কুচো নিমকি। দাদু এ সময়ে কিছু খান না বলে বাদ।

মাকে দেখে পিতামহ বলে ওঠেন, হ্যাঁ মা, সেদিন কী বলছিলি একটু বল না।

মা তো অবাক, কী বললাম বাবা!

—কেন, সেদিন বললি না দেশভাগের কথা।

মা মুখ নিচু করে। তারপর আস্তে আস্তে বলে, হ্যাঁ, বাবা, আমি কি আর অত বুঝি। আমি বলছিলাম, দেশভাগ করে নেহেরু-জিন্নারা কীরকম নিজের ঘর গোছালেন। হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বাঁধালেন। দাঙ্গায় সাধারণ মানুষ মরে। কিন্তু নেতাদের কেউ নাগাল পায় না।

—আর। আর কী বললি?

—বলছিলাম, হিন্দু মুসলমানে বিবাদ জিইয়ে রাখলে জিন্না-নেহেরুদেরই তো লাভ। রাজত্ব, সিংহাসন সব দিব্যি থাকবে।

দাদু, দেখলে, দেখলে পূর্ণ, তোমার মেয়ের রাজনীতির চিন্তাধারাটা দেখলে!

মাতামহ কানুটি এ কথার কোনও জবাব দেন না। শ্রীদেব দাদু বলে ওঠেন, দাদা, আপনার পুত্রবধূ দেখছি পাক্কা কমিউনিস্ট। তা হ্যাঁ মা, তোমার টান কোনদিকে, জোড়াবলদে না হেঁসোর দিকে।

মা সামান্য গম্ভীর হয়ে যায়। তারপর নিরেট মুখে বলে, কাকাবাবু, রাগ করবেন না। জোড়াবলদটা দিব্যি বললেন, আর কাস্তে ধানের শীষটাকে বললেন হেঁসো।

পিতামহ ঘরের ছাদ প্রায় বিদীর্ণ করে অট্টহাস্য করে ওঠেন, দেখলে, দেখলে পূর্ণ তোমার মেয়ের কথা। কমুনিস্টি একেবারে রক্তে বইছে যে।

মা আমার মাতামহের ব্যক্তিত্ব ছেঁকে পাওয়া মোতাবেকই কথা বলে, না বাবা, আমি অত কিছু বুঝি না। যা মনে হয়। তাই বলি। আর তা ছাড়া, আপনার মতো পণ্ডিত মানুষের সঙ্গ করছি তো।

পিতামহ তাঁর ছাত্র—আমার মাতামহের দিকে সিধে তাকান, কে বলে তোমার এই বড় কন্যাটি ক্লাস টেন অবধি পড়া। আসলে জানবার আগ্রহটাই তো আসল।

কানুটি দাদু এবারেও স্বভাবমতো কোনও কথা বলেন না। নির্বিকার মুখে মেয়ের গুণপনা শোনেন। পিতামহ আবার বলেন, আর কী খাসা গানের গলা। ছেলেবেলা থেকে ক্ল্যাসিক্যাল শিখেছে তো। আহা, রেয়াজপত্তর ঠিকমতন করলে—

মা এবার ঘুরে দাঁড়ায়, আমি যাই বাবা। উনুনে চচ্চড়ি বসিয়ে এসেছি।

মা চলে যায় এইসব অস্বস্তির কথা ছেড়ে। বিশেষ করে গান, যা মা'র নিঃশ্বাস ছাড়া নেয়ার মতো, তা ছেড়ে এখন এই হাঁড়ি-কড়া-গোয়ালময় সংসার। যেতে যেতে, সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে মা গুন গুন করে, সূর্য অস্ত হো গয়া, গগন মস্ত হো গয়া, লাল্লা লা লা লাল্লা লালা...

আমার প্রখর কান পিতামহ বাকিদের দিকে চোখ মটকে বলে ওঠেন, হুঁ বাবা, হারীন চাটুজ্যের গান। আমাদের সরোজিনী নাইডুর সোদর ভাই। যেমন পণ্ডিত, তেমন গায়ক কবি, আবার তেমনি কমিউনিস্ট।

শ্রীদেব দাদু বলেন, সে যাই হোক, নাইনটিন ফরটি সেভেনের দোসরা অক্টোবর তাঁর শেষ জন্মদিবসের সংবর্ধনার জবাবে গাঁধী বলেছিলেন, অভিনন্দনের কথা কোথা থেকে উঠছে। একে বরং শোকের সান্ত্বনাবাক্য বললেই ভালো। আমার অন্তরে এখন অসহ্য যাতনা ছাড়া আর কিছুই নেই।

পিতামহ বলে ওঠেন, আমার মনে আছে বিবেকানন্দের অ্যানারকিস্ট আর কমিউনিস্ট সোদর ভূপেন্দ্র দত্ত একটা লেখায় লিখেছিলেন, শ্রীঅরবিন্দ তখন পণ্ডিচেরির আশ্রমে নির্জনে চলে গিয়েছেন সব আন্দোলন ত্যাগ করে। সে সময় দত্তমশাই সবে গাঁধীজির সঙ্গে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে আলোচনাপত্তর সেরে গেছেন পণ্ডিচেরিতে। তখন অরবিন্দ নিজের ঘরে সারাদিন আবদ্ধ থাকতেন। বিকেলে—ঠিক সাড়ে তিনটের সময় বারান্দায় বেরিয়ে বসতেন বড় একটি টেবিলের পাশে, দেয়ালের কাছে রাখা একটি নির্দিষ্ট চেয়ারে। ওধারে একজোড়া চেয়ার, আর সামনে একখানা লম্বা বেঞ্চি। সে যাই হোক, ভূপেন দত্তর মুখে গাঁধীর আন্দোলনের সব বৃত্তান্ত শুনে তিনি বললেন, carry the message of revolt to the people, কিন্তু নিজেদের ভাসিয়ে দিও না। Don't make a fetish of non-violence, a religion of non-violence. গাঁধী এসেছেন অনেক শক্তি নিয়ে, দেশকে বহুদূরে এগিয়ে নিয়ে যাবেন, but I don't believe, he can bring independence.

সদর দরজায় শীতের ভোরে নিত্যি আসা সেই পাতলা পাতলা চুল-দাড়ি-গেরুয়া বৈরাগী এখন সাপ্তাহিক মাধুকরি করতে এসে তার হাতে ধরা বেশ ক'টি তারওয়ালা আর বুকের সঙ্গে আড় করে ঝোলানো যন্ত্রখানি বাজিয়ে এই হঠাৎ অবেলায় গেয়ে ওঠে, বাসুদেব হরেকৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ বলরাম, যাদব মাধব গুরু নবদূর্বাদলশ্যাম। ভারী মিঠে আর চিকনস্বরী এই বোস্টমটি।

বাবা বাগান থেকে উচ্চ গলায় হাঁকে, রামশরণ, রামশরণ। চা আন, চা আন।

বড়মা, কন্যা যোগেশ্বরীর মুখে কথামৃত পাঠ শুনতে শুনতে চমকে বলে ওঠে, ওরে বাবা। ওরে বাবা। আমার মাত্তিহীন নাতিটা যে একসঙ্গে মাতাল আর চাতাল। ঘড়ি ঘড়ি চা।

ভাইটি যোগেশ্বরী নাকে চশমা এঁটে হেঁটমুখে পড়ে যায়, 'রাত একটা হইবে। আজ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথি। চর্তুদিকে নিবিড় অন্ধকার। দু'একটি ভক্ত গঙ্গার পোস্তার উপর একাকী বেড়াইতেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একবার উঠিয়াছেন। তিনিও বাহিরে আসিলেন ও ভক্তদের বলিতেছেন, ন্যাংটা বলত, এই সময়ে—এই গভীর রাত্রে—অনাহত শব্দ শোনা যায়।'

কলতলায় সরস্বতী দিদি, লোকের কথা বলিবে বলে, ইলিশ মাছের কানকো খেলে, নন্দর মড়া শকুন খেলে, কুমড়ো গাছে পেয়ারা হলে—বোম ঘটকে—ওই ও পাড়ার তালগাছে গিয়ে আটকে—

আমার কানুটি দাদু এবার, এতক্ষণ পর কথা বলেন, সব বড় মানুষেরই আর পাঁচজন মানুষের মতো মৃত্যু হয়। তখন বুঝি সবাই সমান। মার্কসের মেয়ে তাঁর বাবার মৃত্যুর পর লিখছেন, তাঁর breast pocket-এ সবসময় তাঁর বাবা Heinrich Marx-এর একটি বিবর্ণ ছবি, নিজের মৃতা স্ত্রী আর মেয়ে জেনির ছবি থাকত। সে কথা কেউ জানত না। মার্কস মারা যাওয়ার পর তাঁর পকেট থেকে এগুলো পাওয়া যায়। এনজেলস্ সাহেব এগুলো তাঁর কফিনেই রেখে দিলেন। এই ব্যাপারটা বোধহয় মার্কসিয়ান ফিলসফির সঙ্গে মানায় না।

দুপুরে, নীচে, আমাদের টানা দালানে পাশাপাশি একজোড়া আসন পড়ে। আমার পিতামহ, মাতামহ। দুই বেয়াই আর মাস্টারমশাই-ছাত্র। একজন নিরামিষ। অন্যজন পূর্ণ আমিষ। আমার ঠাকুর্দার জন্যে দিদির রাঁধা সুক্তো, ধোঁকার ডালনা, চালতেব অম্বল ইত্যাদি। কানুটির পাতে এ সব বাদে রুই-এর বৃহৎ মুড়ো আর মুড়মুড়ে করে মৌরলা মাছ ভাজা।

আমার দিদি পারুলবালা আর মিলা মা পরিবেশন করছে। সামনে তালপাতার পাখা হাতে গিরিনন্দিনী বড়মা। অভিমানিনী যোগেশ্বরী ভাইটির আজ কোনও কাজ নেই বলে দূরে দূরে, এড়িয়ে এড়িয়ে রয়েছে।

তেত্রিশ

যে দিন আমাদের বাড়িতে দাদু-দিদিরা আসে, সে রাতেই আমাদের সংসারে মেঘ করে। আরও বেশি করে রাত ঘনালে সে মেঘের ফল, তুমুল ঝড়-বৃষ্টি। সেই সঙ্গে মুহুর্মুহু বজ্রপাত। বাড়ি কাঁপানো বাজ হাঁকড়ানি। কেন না, ততক্ষণে কানু বাবা বেশ কয়েক প্রস্থ তোয়ের।

সে রাতে পিতামহ আর বড়মার ঘরে জবরদস্ত খিল আঁটা। ওঁরা নিয়মাফিক খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়েছেন। বাবার যোগেশ্বরী পিসিমা, আমাদের ভাইটি, আমাদের নিয়ে একতলার ভাঁড়ার ঘরে তক্তপোশে। হরেক গল্প শোনাচ্ছেন। বেশিরভাগই রাজা-রাজকন্যের। তবে তার সঙ্গে তাঁর প্রিয় বিষয় কথামৃত আর বিবেকানন্দের জীবন কথাও আছে।

বাড়িতে এই তুলকালামের দিনে আমার স্বভাবমতো একরকম স্বরচিত কালীপুজো করেছি দিনের বেলায়। এ বিষয়ে সাগরেদ আমার বোন সেবা আর ভাই মলয়। কনিষ্ঠা সোমা এতই ছোট যে, তার প্রসাদ খাওয়া ছাড়া আর কোনও ভূমিকা নেই। তবে এ কথাটা সত্যি যে, এই কালীপুজোয় পূজোআচ্চার নাট্যাভিনয়ের চেয়ে আনুষঙ্গিক ব্যাপারগুলো অনেক জরুরি। নিজের হাতে বাখারি চিরে একটি যেমন হোক-তেমন হোক কাঠামো গড়েছি। এবার প্রতিমা নির্মাণ। বাড়িতে রাখা, মেলা থেকে কেনা নানা মূর্তি বা পুতুলের মুখে এঁটেল মাটি টিপে ধরে ছাঁচ তুলে নেওয়া হল প্রথম কাজ। সেগুলো রোদে শুকিয়ে, উনুনে বেশ লালচে করে পুড়িয়ে একেবারে পোক্ত ছাঁচ। আমার দাদুর বাতিল করা একখানা কাঠের হাতবাক্সে এই সব ছাঁচ-কোঁচ রাখা থাকে গোয়াল ঘরে অথবা নীচের বারান্দার কোণে। তারই মধ্যে আছে রঙ-তুলি, আলতা, ভুষোকালি, চুন ইত্যাদি। এই সব সরঞ্জাম আর কালীর ক্যালেন্ডারি ছবি ভরসা করে মোটামুটি তিন দিনে কালীমূর্তি গড়া শেষ। পদতলে বৃহৎ ভুঁড়ি মহাদেব, যাঁর জটাপত্র নারকোল ছোবড়া ছেনে বানানো। একেবারে সত্যি সত্যি। কালীর মাথার কোঁচকানো লম্বা চুল কিন্তু পাড়ার পোটো কুঞ্জ পালের বাড়ি থেকে হাত সাফাই করে আনা। সেখান থেকেই প্রতিমা গড়ার নানা আকারের বাঁশচেরা কোঁচগুলো জোগাড় করা। পাশের বাড়ির রায়চৌধুরীদের ছেলে সুবল আমার পরম সখা। সেও এ সমস্ত কিছু কিছু জোগান দেয়। মূর্তির গড়নকালে বহু পরামর্শ

দেয়। যেমন, আমায় একবারই বলেছিল, সবচেয়ে কঠিন হল প্রতিমার চোখ আঁকা। কথাটা যে কতখানি ঠিক, সেটা আমি হাতে কলমে বুঝেছি। সাদা চোখের ফাঁদে মণি জোড়া ঠিক একবারেই টক্ করে বসিয়ে দিতে হবে। ওখানেই হাত আর চোখের আন্দাজি খেলা। একটু তাক্ নড়ে গেলেই ঠাকুর লক্ষ্মী টেরা। তখন নতুন করে চুন দিয়ে চোখ মোছো রে। আবার আন্দাজে টান দাও রে। কিন্তু কিছুতেই প্রতিমার নজর সিধে হতে চায় না।

আমাদের এই কালীপুজোয় চণ্ডীপাঠ থেকে বলিদান সবই ঘটে। এই সব ভূমিকাই আমার। বাকিরা দোয়ারকি। কী কারণে জানা নেই, একেবারে শিশুকাল থেকেই আমার জিভের আড় ভেঙে বসে আছে বলে আমি হুড়হুড়িয়ে সংস্কৃত শ্লোক পড়ে যেতে পারি। এটা কোনও প্রতিভা-টতিভা নয়, অভ্যাস। এর মূলে আমার পিতামহ। তিনি প্রধানত ইংরেজির পণ্ডিত হলেও সংস্কৃতে তাঁর ঘুরে বেড়ানো জলবৎ। সেই কোন কাল, সবে জ্ঞান পাওয়া সময় থেকে বলে আসছেন, ভাই, রোজ এক অধ্যায় করে গীতা পাঠ করবে। এতে শরীর ভালো থাকে। আমি বিনি তর্কে, রোজ না হলেও, সেটি চেষ্টা করি দাদুর সুমুখে বসে। তিনি চোখ মুদে শোনেন। শুনতে শুনতে আমার উচ্চারণ, ছন্দ মেরামত করে দেন। তাঁর এই মিস্তিরিপনা শুনতে শুনতে আমার মনে ধর্মভাবের বদলে না বোঝা অথচ সুললিত সংস্কৃত কবিতার সুন্দর রহস্য টলমল করে। কেবলই মনে হয়, দাদুর এই শরীর ভালো থাকার তত্ত্বটি আসলে রহস্য। দাদু আমায় কেন যে বেশিরভাগই একাদশ অধ্যায় আর অষ্টাদশ অধ্যায় পাঠ করতে বলেন! আমি যখন পড়ি, এবমুক্তা হৃষীকেশ গুড়াকেশ পরন্তপঃ, আমার মনে মনে, চোর কুঠুরি ঘরে বাবার মজুত করে রাখা গরুর খাদ্য ছোলার খোল আর ঝোলা গুড়ের কথা ঘুরপাক খায়। আসলে দু'টো বস্তু একসঙ্গে চটকে যখন রামশরনকাকা মাখে, তখন তার তরিবতি ঝাঁ ঝাঁ সুগন্ধে আমার ভারি খেতে সাধ হয়। আমি অবাক হয়ে দেখি, আমাদের কালো গাই লক্ষ্মী কী আবেশে দু' চক্ষু বুঁজে বেশ তারিয়ে তারিয়ে খোল-গুড় মাখা চিবোচ্ছে।

সংস্কৃত শ্রীশ্রীচণ্ডীও আমাদের বাড়িতে আছে। মহালয়ার ভোর রাতে রেডিওয় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর চণ্ডীপাঠ শুনে শুনে ওই কায়দাটা ভেতরে ভেতরে কতকটা কব্জা করা আছে। সঙ্গে ব্যবহার করি আমার মা'র সাত বছর বয়েসের এক পাট বেলোর হারমোনিয়াম। বাজাতে পারি না। শুধু তিনটে রিড কানে শুনে টিপে সুর করে চণ্ডীপাঠ। তবে আজ কালীপুজোর সময় হারমোনিয়াম পাড়িনি।

বাড়ির ভেতরে দাদু-দিদিমাদের খাওয়া-দাওয়া, গল্পগাছা। আর এধারে ভেতরে উঠোনের নিরিবিলি কাঁঠাল তলে আমার কালী উৎসব। ভেতর থেকে বুলু মাসী এসে বারকতক দেখে গেছে দু'খানা ইটের ওপর একটা বাটিতে করে প্রতিমার ভোগ--খিচুড়ি রান্না হচ্ছে। সেটির দায়িত্ব আমার ভগ্নী সেবার। ভোগের মধ্যে আলু, সিম, পটল, এমনকী বাগানের সজনে ডাঁটাও দিয়েছে। গাছ থেকে জোগাড় হয়েছে পঞ্চমুখী টকটকে জবা নিচয়। বেলপাতা আর দুর্বো। বাটা হয়েছে রক্ত চন্দন। খানিক আতপ চালও রাখা আছে থালায়। ইটের ওপর মাটি লেপে বেদী গড়ে তার ওপর প্রতিমা দাঁড় করানো। সুবল কুঞ্জ পোটোর চালা থেকে ছোট্ট একটি চাঁদমালা হরণ করে এনেছে। মা কালীর জিভে ঘামতেলের পরিমাণ কিঞ্চিৎ বেশি হওয়ায় মনে হচ্ছে তাঁর ভারি খিদে পেয়েছে।

এদিকে ভাই মলয় কাঁসর পেটাচ্ছে, ট্যাং, ট্যাং, ট্যাং, ট্যাং, কাঁই না না, কাঁই না না। সেবা ফ্রক সামলে খিচুড়িতে হাতা নাড়ছে। দিব্য সুগন্ধ ছেড়েছে কাঁঠালতলার উশৃঙ্খল হাওয়ায়। ছি ছি, ভোগের গন্ধ নাকে নিতে নেই। আধখানা উচ্ছিষ্ট হয়ে যায়।

একটি ইঁদুর শাবক অতি কষ্টে ধরে রেখেছিলাম গতকাল থেকে। রাখা ছিল লম্বা এক কৌটোর মাথায় ছিদ্র করে। মহিষের বদলে আজ সেটির বলিদান ঘটবে। ফলে, বাবার বাগানি একখানা হেঁসোও মজুত আছে। কালীর সুমুখে—একটু তফাতে দু'খানা সমান আকৃতির কাঠ পাশাপাশি মাটিতে গেড়ে হাড়িকাঠ প্রস্তুত। মাঝখানে মাটির নিচু ঢিবির গায়ে টানা টানা সিঁদুর টিপ। ওখানেই বলিপ্রদত্ত প্রাণীটি মাথা রাখবে। একটি লংকা জবার মাথা সেই নিধন বেদীতে লটকানো আছে। ফলে দৃশ্যটি যথাসম্ভব ভয়ঙ্কর প্রতিপন্ন করা গেছে।

গুপ্ত প্রেস পঞ্জিকা দেখে পুজো শেষ। এবার বলিদান পর্ব। ইঁদুরটিকে কৌটো থেকে বার করে তার ঘাড়ে বেশ করে ঘৃত মাখানো হল মহিষবলির অনুকৃতিতে। ফাঁসির আসামীর ধারায় সে বেচারি অর্ধমৃত, নেতিয়ে পড়ল খানিক পরেই। এবার তাকে শোয়ানো হল হাড়িকাঠের ফাঁদে। আমার নির্দেশ মলয় বেশ জোরে জোরে কাঁসি পেটাতে লাগল কতক উত্তেজিত অবস্থায়, ছানাবড়া চক্ষে। মেটে প্রদীপের গর্ভ পুড়ে চড়চড় করতে লাগল। আমার পরনে হাফ প্যান্ট। খালি গা। কপালে লম্বা সিঁদুর টিপ। উপস্থিত ভক্তগণ এবার সমস্বরে হু দিয়ে উঠল। সঙ্গে কাঁসরের তীব্র ঝনঝনাৎকার। খিচুড়ি ভোগ রাঁধুনি সেবা ভীরু স্বভাবিনী বলে দু'চোখে আর দু'কানে আঙুল চাপা দিল। মূর্খ জানে না, পাঁঠা আর ইঁদুর এক নয়। এবার আমার খড়্গরূপী হেঁসো আকাশে উঠল। মা-আ-আ-আ-ঘ্যাচাং। ছিটকে পড়ল ইঁদুর মুণ্ড দেহের প্রায় পিঠ অবধি নিয়ে।

রাতে দোতলার সিঁড়ির দরজায় খিল তোলা। ওপারে, কখনও ঘরে, কভু দালানে দুপ দাপ্, ধুম্ ধাম্। ওটা বাবার নৃত্য তাড়না। মা'র কান্না। প্রতিবাদ। সঙ্গে কানু বাবার অট্ট অট্ট হুঙ্কার, তোমার বাবা একটা চোর, ডাকাত। রেলের স্লিপার চুরি করে বেচে বেচে ভূষিনাশ করে দিল। মেনিমুখো বেটাছেলে। মিন মিন করে কথা ... । লজ্জা করে না এ বাড়ি ঢুকতে। এবার এলে পোঁদে লাথি মেরে বার করে দেবো।

মা'র হাহাকার, তোমার মুখে গলিত কুষ্ঠ হবে—

বাবা, চোর চোর, ডাকাত ডাকাত—

ভাইটি আমাদের গল্প শোনায়। আটানিবাবুর গল্প। কেউ তাঁকে একটা কথা বলালেই নগদ আট আনা পয়সা হাতে দিতে হত।

বড়মা গিরিনন্দিনী দোর বন্ধ ঘরের অন্ধকারে টেনে টেনে হাই তোলে, অ্যা অ্যা অ্যা—হরিবল, হরিবল—

বেলা গড়ায় সকালের পাট তুলে। ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদের আলাপন বুঝি সমাপন জানে না। এ অবস্থায় রামতনু ও ভজহরির উদর জ্বলন আরম্ভ হতে আর বিলম্ব নেই। সকাল থেকে মহাদেব পটুয়াকে নিয়ে বহুতর রঙ্গরস তো হল। কিন্তু রঙ্গে তো পেট ভরে

না। অতএব বাধ্য হয়েই ভজহরি এবার মূল বিষয়ে প্রবেশ করে। করে প্রসাদের ছুটো ধরেই।

—বলি দাদাগো, তোমাদের পানা পদ্য কপচে তো আমাদের পেট ভরে না। ওই দ্যাখো রাজার সিধে আসছে। এবার রাঁধনবাড়নের তো গতি করতে হবে।

দূরে, রাজ সিং দুয়ারের তল বরাবর এক জোড়া মানুষ এই দিকেই এগিয়ে আসছে। একজন নাদাপেটা। অপরজনা গোলগাল। চেহারা চিত্রেই বোঝা যায়, এরা রাজ রন্ধনশালার কর্মী। মালকোঁচা এঁটে মোটা ধুতি পরা। ঘৃত তৈল রসাল দেহ। গলায় তেলচিটে রজ্জু সম ময়লা উপবিত। কাঁধে গামছা। দু'জনার মাথাতেই দু'খানি বৃহৎ ধামা। তাতে রাঁধনের সিধা সাজানো। এই জোড়া ভৃঙ্গী প্রসাদদিগরের পরিচিত হয়ে গিয়েছে এই ক'দিনেই।

রামতনু চাপা খুশির স্বরে বলেন, নিত্যি পাকা মাছ খেয়ে খেয়ে অরুচ ধরে গিয়েছে। জলঙ্গির খয়রা, খলসে, পুঁটিগুলো গেল কোথায়।

ভজহরি এক হাত তুলে বলে, আরে দাদা থাম দিকি। যত হাবিজাবি মাছের দিকে নজর। ঘরে যেন রোজদিন পাকা মাছের কালিয়া খাও।

—না না, সে কথা হচ্ছে না। খড়ে নদীর কুচো ছ্যানা মাছের সোয়াদই আলাদা।

—ওরে দাদা, রাজার বাড়িতে কী খেলে, লোকে যখন জিগ্যেস করবে, তখন কী বলবে পুঁটি মাছের দমপোক্ত আর গুলে বেলের কালিয়া!

—ঘরের কথা ঘরেই ভাবা যাবে।

—হুঁ, কোতায় কপচায় রামরাজা, কোতায় কপচায় ফিঙে। আর সোনা বাঁধা নৌকা ফেলে, কেবল তালের ডিঙে।

রামতনুর মানে লাগে। তিনিও কম যান না। বলে ওঠেন, অবাক কলি বাক সরে না। গুড় দিয়ে মুড়ি ভাল্লাগে না। তোর হয়েছে এই দশা। হাঘরের মরণ, আর কী!

প্রসাদ বলে ওঠেন, দেশে যুদ্ধ বাঁধার আগেই খাওয়া নিয়ে সমর! বলি, লোকে শুনলে বলবে কী।

ভারত হাসেন। হাসতে হাসতেই বলে ওঠেন,

ঝাল ঝোল ভাজা রান্ধে চিতল ফলই।
কই মাগুরের ঝোল ভিন্ন ভাজে কই।।
মায়া সোনাখডকির ঝোল ভাজা সার।
চিংড়ির ঝাল বাগা অমৃতের তার।।
কণ্ঠা রান্ধি রান্ধে কই কাতলার মুডা।
তিতা দিয়া পচা মাছে রান্ধিলেক গুঁড়া।।
আম্র দিয়া শোল মাছে ঝোল চড়চড়ী।
আর রান্ধে আদা-রসে দিয়া ফুলবড়ি।।
রুই কাতলার তৈলে রান্ধে তৈল-শাক।
মাছের ডিমের বড়া মৃতে দেয় ডাক।।

বাটার করিলা ঝোল খয়রার ভাজা।
অমৃত অধিক বলে অমৃতের রাজা।।

উল্লসিত রামতনু গলা তুলে বলে ওঠেন, ওরে মুখ্যু ভজা, দেখ দেখ। পাকা মাছ আর ছোট মাছের তত্ত্ব কাকে বলে। আহা, কী বর্ণনা!

ভজহরি কতক এঁটোপানা মুখে বলে, কী করব দাদা। তোমার যজমানরা তোমায় নিত্যি রুইয়ের মুড়ো খাওয়ায় বলে অরুচ ধরে গিয়েছে। তাই আমার হয়েছে হাঘরের দশা।

রাজার হেঁসেল ঘরের বাহক জোড়া এসে থামে। বোঝার গতিকে তাদের ধবো ধরো, থর থর ভাব। ভজহরি তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে তাদের ধামা ধরে।

ধামা যুগলে থরে বিথরে সাজানো উৎকৃষ্ট বালাম চাউল, সুদৃশ্য মুগ ডাইল, সর্ষপতৈল, গব্যঘৃত, হরেক মবিচ মশলা, বাছাই আলু, পটল, বেগুন, তিন প্রস্থ সুচারু শাক, নধর লাউ, স্নিগ্ধ ভুঁইকুমড়া, অনিন্দ্যকান্তি মূলা, রাঙা আলু, জলপাই ইত্যাদি। পৃথক ধামায় সুপক্ক রোহিত মৎস, দিব্যকান্তি মাগুর ও কতিপয় জল পাকা ডাগব কই। দু'খানি মেটে সরায় গাঢ় জমাট ক্ষীর। বেশ কয়েক প্রস্থ কৃষ্ণনাগরি মণ্ডা-মেঠাই। মোটামুটি এই মূল সামগ্রীগুলি চোখে দেখা যায়। এ বাদে আরও কত কী যে আছে, তৈজসের আঁকে ফাঁকে।

মাথার বোঝা খালাস করে লোকজোড়া হাত জোড় করে নমস্কার সেরে দ্রুত বিদায় হয়। এই দ্রুততার কারণ ভজহরি জানে। কেন না, গতকালই সে এদের দিয়ে রান্নার কাঠ চ্যালা করিয়েছে।

রামতনু-ভজহরি—দু'জনাতেই এবার ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সেই ফাঁকে রামপ্রসাদ ভারতকে সবিনয়ে বলে ওঠেন, একটি নিবেদন ছিল দাদা, যদি অভয় দাও—

ভারত হাসিমুখে তাকান প্রসাদের দিকে। ভ্রূ মধ্যে প্রশ্ন।

প্রসাদ কন, আজ দুপুরের সেবাটি যদি আমাদের এখেনে একত্রে করা যেত। অবিশ্যি তুমি কিনা একটি সৎ ব্রাহ্মণ—

কথা ফুরোতে দেন না ভারত। বলে ওঠেন, তুমি আমায় সৎ বামুন বলে ভারি অমান্যি কল্লে প্রসাদ। কবিদের আবার বাউন কায়েত কী। আমরা তো চাঁড়ালস্য চাঁড়াল ভায়া।

পাশ থেকে রামতনু এ কথা শুনে উল্লসিত হয়ে বলে ওঠেন, বেশ কথা! খাসা কথা। কী ভাগ্যি আমাদের! স্বয়ং রাজাব কবি আমাদের সঙ্গে দু'টি আহার করবেন।

রামপ্রসাদ সাজা গম্ভীর মুখে রামতনুকে বলেন, হুঁ, ইনি কিন্তু একেবারে ফুলের মুখুটি। মানে সাক্ষাৎ ভরদ্বাজ গোত্র, মুখোপাধ্যায় মহাশয়।

রামতনু আর কথার মধ্যে না গিয়ে রাঁধনবাড়ন জোগাড়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাঁর দোয়ারকি ভজহরি আরও অধিক ব্যস্ত ও সমস্ত।

প্রসাদ-ভারত পাশাপাশি রাজ অতিথিশালের বারান্ডায় বসে। সকালের আলো অনেক পূর্বেই বেলার দিকে যাত্রা করেছে। ভারতচন্দ্র বলে ওঠেন, কিন্তু ভায়া, আমরা এই কবিরা এক রীতির আর একলপ্তি চাঁড়াল জাতীয় হলেও তোমার আমার জীবনধারা তো এক নয়।

প্রসাদ চোখ তুলে তাকান ভারতের দিকে।

ভারত আবার বলেন, হুঁ, তোমার যেমন এক স্থানে থিতু জীবন, আমার ঠিক উল্টো।

—কেমনতর?

—বড় ভীষণতর। আমার জীবনভর—বলতে গেলে এ পর্যন্ত কোথাও একটানা রইতে নারি। বারংবার ঠাঁইনাড়া আর ঠাঁইনাড়া। আমার নিয়তি যেন আমায় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় হেথা থেকে সেথা।

—কেমনতর দাদা?

—বলি শোনো। আমার পিতা ঠাকুর নরেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয়, তাঁর আদি নিবাস ছিল বর্ধমান জিলার অন্তঃপাতি ভুরসুট পরগণার পেঁড়ো গ্রামে। তিনি বিস্তর জোত-জমার মালিক ছিলেন বলে তাঁকে সবাই রাজা বলে ডাকতেন। তিনি আদপে কুলীন মুখোপাধ্যায় হলেও এত ভূ-বিভবের জন্যে রায় নামেই বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর চারি পুত্র। চতুর্ভুজ অর্জুন, দয়ারাম আর এই আমি অধম ভারতচন্দ্র।

রামপ্রসাদ মিচকি হেসে কন, তাহলে উত্তমটি কী প্রকার।

—উত্তম শুধু নয়, মহা উত্তম আমার চরে বেড়ানো জীবনচরিত।

—বটে!

—হ্যাঁ, বটেই তো। তা না হলে কেনই বা আমার পিতৃদেব নরেন্দ্রনারায়ণ ভূমি সম্পত্তির বিবাদে জড়িয়ে পড়বেন বর্ধমানাধিপতি মহারাজা কীর্তিচন্দ্র রায় বাহাদুরের মাতৃদেব্যা মহারাণি বিষ্ণুকুমারীর সঙ্গে। ওই সময় মহারাজা কীর্তিচন্দ্র নেহাৎই শিশু। তা মহারানি কী কল্লেন, না আলমচন্দ্র আর ক্ষেমচন্দ্র নামে তাঁর দুই রাজপুত সেনাপতিকে হুকুম কল্লেন, হয় তোমরা এই কোলের শিশুটিকে এখনি খতম করো, নয় এই রাতের মধ্যেই ভুরসুট পরগণা দখল করে আমার হাতে তুলে দাও। তা না হলে, আমি জলগ্রহণ করব না। হুকুম শোনা মাত্র ওই সেনাপতিজোড়া দশ সহস্র সৈন্য সমেত সে রাত্রেই ভবানীপুরের গড় আর পেঁড়োর গড় অধিকার করে ফেলল। পরদিন প্রাতঃকালে রানিমাতা পেঁড়োর গড়ে প্রবেশ করে দেখলেন রাজা নরেন্দ্র রায়, তাঁর ছেলেরা এবং বেটাছেলে কর্মচারীগণ সকলেই পলায়ন করেছে। শুধু পড়ে পড়ে কাঁদছে কতগুলি স্ত্রীলোক। মহারানি সেই ভীতা রমণীদের অভয় দিয়ে বল্লেন, তোমাদের কোনও ভয় নেই। গতকল্য আমার একাদশী গিয়েছে বলে আমি উপবাসী আছি। আমায় শালগ্রামের চরণামৃত এনে দাও, তবে আমি জলগ্রহণ করতে পারি।

প্রসাদ, কী প্রচণ্ডা এই মাতাঠাকুরানি!

—এ কথা শোনা মাত্র পূজারি বামুন তাঁর সুমুখে লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা এনে স্নান করিয়ে চরণামৃত তোয়ের কল্লেন। রানি সেটি পান করে তারপর জলগ্রহণ কল্লেন। তারপর শালগ্রাম আর অন্যান্য ঠাকুরের নামে কিছু ভূ-সম্পত্তি প্রদান কল্লেন। আর ভবানীপুরের কালীঠাকুরানির ভোগরাগের জন্যে দিন প্রতি একটাকা করে বেঁধে দিলেন। কিন্তু এখান থেকে যে সমস্ত অর্থ ও তৈজসপত্র হরণ করেছিলেন, সে সব কিছুই ফেরত দিলেন না। শুধুমাত্র গড়, গৃহাদি, পুস্করিণী আর বাগ বাগিচা ফেরৎ দিয়ে বর্ধমানে ফিরে গেলেন। এ অবস্থায় নরেন্দ্রনারায়ণ একেবারেই নিঃস্ব হয়ে পড়লেন। আর পিতৃদেবকে এ অবস্থায় ফেলে রেখে আমি—এই ভারতচন্দ্র পলায়ন করলাম। চলে গেলাম মণ্ডলঘাট পরগণার অধীনস্থ গাজিপুরের কাছে নওয়াপাড়ায়। সেটি হল আমার মাতুলালয়।

—অর্থাৎ বাপের শ্বশুরবাড়ি। তাই তো?

—যথার্থ কথা। আর মাতুলালয়ে বাস করতে করতে তাজপুর গ্রামে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ আর অভিধান পাঠ করতে লাগলাম। যখন আমার চতুর্দশবর্ষ হল, আমি নিজ গৃহে ফিরে এলাম। তারপর মণ্ডলঘাট পরগণার তাজপুর-এর কাছাকাছি সারদা গ্রামের কেশরকুনি আচার্যদিগরের ঘরে একটি কন্যেকে বিবাহ করলাম। এখানে ভারি মুশকিল ঘটল। বিবাহের পরে আমার অগ্রজ সহোদরেরা আমায় যৎপরোনাস্তি র্ভৎসনা করে বল্লেন, 'ভারত, তুমি আমাদিগের সকলের কনিষ্ঠ হয়ে কেন এমন অনিষ্টকর কর্ম কল্লে। সংস্কৃত পড়ে এই ফলোদয় হল। তোমার এ বিদ্যার গৌরব কে কর্বে! তোমার শিষ্য নেই, যজমান নেই। এখন সংসার প্রতিপালন কর্বে কী প্রকারে?'

চৌত্রিশ

ভারতচন্দ্র তাঁর বিচিত্র এবং বিচলিত জীবন কথা সেনজ রামপ্রসাদের কাছে বলে চলেন। প্রসাদ অবাক হয়ে শোনেন, তাঁর চেয়ে বয়সে কিছু বড়, অথচ সমকালীন আর এক কবির আত্মকথন। আহা, একজন কবির জীবনপ্রহার তো এমনই অভিরাম জটিল হওয়ারই কথা। জীবনের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে কবি তাঁর সৃষ্টির রহস্য যাতনা উপভোগ করেন। সে জীবনচরিতের কথা পঞ্চজনে প্রকটিত হয় না। সেই অপ্রকাশের নেপথ্যে কত না দুঃখানুভব, মনোবেদনা, মানস অতুষ্টি আর কাতরতা মুখ লুকিয়ে রয়। পাঠক দূর হতে কবির কবিতাসুধা পান করে রসস্রাব আস্বাদন করেন। তাঁরা জানতেও পারেন না এক এক বিন্দু রসপুঞ্জের আবডালে, প্রসারিত নভোনীল আকাশের অন্তঃপুরে, কবি কদম্বের ভক্তিরস, শান্তি, করুণা, হাস্য, ভয়ানক, অদ্ভুত, বীর প্রভৃতি রসঘটিত লিখনের তলদেশে কী অপরিসীম বেদনার বিরামসমুদ্র বিছিয়ে রয়েছে।

ভারত বলেন, ভায়া, এক কথায় বলতে গেলে, তোমার হল ঘরো জীবন আর আমার ঘুরো জীবন।

প্রসাদ কন, বটেই তো। বটেই তো। কিন্তু সে তো বাইরের কথা। ভিত্রি ভিত্রি কিন্তু আমার দু'জনাতেই ঘুরে বেড়ানো স্বভাবী।

—ঠিক কথা। যথার্থ কথা। তা না হলে আমরা আর কবি কীসে। তবে তোমার সঙ্গে আমার যে মস্ত একটি প্রভেদ আছে।

—কী প্রকারে?

—আমি হিসেবি, আর তুমি উদাসীন বেহিসেবি।

—যথা?

—আমি যা রচনা করি, সে সবই লিপিবদ্ধ করে রাখি। আর তুমি সাধারণত দৎকলম নিয়ে বসো না। তুমি চক্ষে যখন যা দেখো, তোমার অন্তঃকরণে যখন যা উদয় হয়—তাই তুমি উচ্চারণ করো। আর সেটিই কবিতা হয়ে যায়।

প্রসাদ লজ্জিত চোখ নত করেন।

ভারত বলেন, আমি যখন রাজসভায় গীত গাই, তখন সাথ সঙ্গতি বাদ্যযন্ত্র থাকে।

আর তোমার গীতের কোনও সঙ্গী বাদ্য উপসর্গ নেই। সে গীত তোমার কণ্ঠ নির্গত হয়ে আকাশের তল বরাবর জন মানুষের সংসারে চারিয়ে যায়। সে সুর মানুষের মুখে মুখে ফেরে। সে মানুষ কভু নাওয়ের মাঝি, হেলে চাষি আবার দীনভিখারিও বটে। সবচেয়ে বড় কথা, তোমার গীত ভরসা করে কত দীনাতিদীনের যে অন্ন জোটে, তার হিসেব কে করে। একখানি গীত, মানে একটি নিরন্ন পরিবারের অন্ন, বিশ্বসংসারে এমন ঘটনা কেউ কখনও শুনেছে কি!

প্রসাদ নত মুখেই কন, কী জানি দাদা। আমি তো মনের আনন্দে গান গাই। সে গান যদি এতসব পঞ্চজনার মুখে ওঠে, তাতে করে আমার কৃতার্থ হওয়ারই কথা।

ভারত, তুমি তো নিজ মনে গাছতলে বসে গীত গাও প্রসাদ।

প্রসাদ সামান্য আনমনা হয়ে যান। তারপর কতক আচ্ছন্ন স্বরে বলে ওঠেন, তোমার এই গাছতলে কথাটি শুনে মনে মনে একখানা গান চাগাড় দিচ্ছে যে। বলব দাদা?

ভারত সহর্ষে বলে ওঠেন, বলো বলো। তবে রাগরাগিনী নয়, প্রসাদী সুরেই বলো।

রামপ্রসাদ দু'চক্ষু মোদেন। তারপর দখিন হস্তটি সামনে মেলে দিয়ে গান ধরেন।

আছি তেঁই তরুতলে ব'সে।
মনের আনন্দে আর হরষে।।
আগে ভাঙ্গাব গাছের পাতা
ডাঁটিফল ধরিবে শেষে।।
রাগ দ্বেষ লোভ আদি,
পাঠাব সব বনবাসে।
র'ব রসাভাষে হা প্রত্যাশে ফলিতার্থ সেই রসে।।
ফলে ফলে সুফল লয়ে,
যাইব আপন নিবাসে।
আমার বিফলকে ফল দিয়ে,
ফলাফল ভাষাও নৈরাশে।।
মন কর কি লওরে সুধা,
দু'জনাতে মিলে মিশে।
খাবে একই নিশ্বাসে যেন,
সূর্য-তেজে সকল শোষে।।
রামপ্রসাদ বলে আমার কোষ্ঠি শুদ্ধ তারাবেশে।
মাগী জানে না যে মন কপাটে,
খিল দিয়েছি বড় কষে।।

গীত কিংবা গান ফুরোয়। প্রসাদ চোখ খোলেন। দেখেন অপরপক্ষ, অর্থাৎ ভারতচন্দ্রের এখন মুদিত চক্ষু। তাঁর কণ্ঠনালির কাছটি কেবলই ফুলে ফুলে উঠছে। তিনি প্রাণপণ আবেগ দমন করার চেষ্টা করছেন।

এ দিকে ঘরের মধ্যে একধারে ছোট পাকশালে ভজহরি-বামতনুর রাঁধনপর্ব ঘটাং ঘট, ঠং ঠকাং শোর তোলে। ওখানে এখন মহা উৎসাহে দ্বিপ্রাহরিক আহারের সশব্দ দুর্মর আয়োজন। দু'জনায় মিলে ভোজনের উত্তমতা নিয়ে রীতিমতো ব্যস্ত সমস্ত। এ সবের থেকে সামান্য এড়িয়ে, এই রাজ অতিথিশালেব বারান্ডায়, ভারত-প্রসাদ নিভৃত আলাপনে মগ্ন।

ভারত বলেন, এমন একখানি গীতের পর কোন পাষণ্ডর আর কথা কইতে ইচ্ছে যায়। মনে হয়, চুপ করে বসে রই।

প্রসাদ, কবি মুখে কুলুপ দিলে কী করে সংসার চলবে দাদা।

ভারত, কবি তো সংসারেই দান। সংসারের এত কলরবের মধ্যে সে যত কম কথা কয়, ততই মঙ্গল।

প্রসাদ, বেশ বেশ। তবে আমার জন্যে যেন মুখে কুলুপের নিদান জারি না হয়। তা না হলে তোমার ঘুরো জীবনের কথা শুনব কেমন করে।

ভারতচন্দ্র নড়েচড়ে বসেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমাব কাছে সেটি ব্যক্ত না কল্লে আমার পরকালে শান্তি হবে না ভায়া।

—বেশ, এখন তাহলে ইহকাল চর্চাই হোক।

ভারত একটি টানা নিঃশ্বাস নেন। তারপর বলে ওঠেন, হ্যাঁ, কেশরকুনি আচার্য ঘরের সুন্দরী কন্যেটিকে চতুর্দশবর্ষে বিবাহ করা আমার কাল হল সংসারে। তুমি তো জান প্রসাদ, পুরুষের পক্ষে এ বয়েসে বিবাহ করা মহাভাগ্যের ফল। কেন না, তখন তো নবীন যৌবন, সদাই বসন্তকাল আর বীর্য কুসুম সদ্য বোল ধরিয়েছে দেহভাণ্ডে। এ সময়ের রমনসুখের কোনও সীমা নেই। তা আমাব এ সুখ বুঝি সইতে পারলেন না পূজাপাদ অগ্রজেরা। তৎ শ্রবণে অতিশয় অভিমানপরবশ হয়ে আমি হুগলির অন্তঃপাতি বাঁশবেড়িয়ার পশ্চিম-দেবানন্দপুর গ্রাম নিবাসী কায়স্থকুলোদ্ভব মান্যবর শ্রীযুক্ত বামচন্দ্র মুন্সী মহাশয়ের ভবনে গিয়ে পারস্য ভাষা অধ্যযন করতে আরম্ভ করলাম। সহৃদয় মুন্সীবাবুরা আমায় বিশেষ স্নেহ করে একটি থাকবার বাসা দিলেন। প্রতিদিন সিধা পাঠিয়ে আমার আহারাদির নিত্য ব্যবস্থা করলেন। আমি দিবসে মাত্র একবার রন্ধন করি। সেই অন্ন দু'বেলা আহার করি। একটি বেগুন পোড়ার আধখানা এ বেলা, আধখানা ও বেলা—এই হল ব্যাঞ্জন। তাতে আমার সময় বাঁচে। আমি দিবারাত্র অধ্যয়ন করি। কিন্তু ভায়া, তোমায় বলে দিই, এই সময়ে আমি সংস্কৃত আর বঙ্গভাষায় কবিতা রচনা করি গোপনে গোপনে।

প্রসাদ, হুঁ দাদা, তার অর্থ, তুমি চোরা কবি। কিংবা, বালক বয়েসে এঁচোড়ে পাকা গুপ্ত কবি।

ভারত, সে যা বলবার তুমি বলো। তবে ভাই, এক দিবস একটি এমন ঘটনা ঘটল যে, নিজেকে আর চেপে রাখা গেল না।

—কীরকম!

—সেদিন মুন্সীবাবুদের বাড়িতে সত্যনারায়ণ পূজার এবং কথার আয়োজন করা হয়েছে। তা কর্তাটি হঠাৎ আমায় তলব করে বললেন, ভারত, তোমার সংস্কৃত বোধ আছে, বাকপটুতা উত্তম। অতএব তোমাকেই সত্যনারায়ণের পুঁতি পাঠ করতে হবে। এই

বলে রায় মহাশয় একজনকে পুঁতি আনতে আদেশ কল্লেন। তাই শুনে আমি হঠাৎ বলে ফেল্লাম, মহাশয়, পুঁতি আনাবার আবশ্যক নেই। আমার কাছেই পুস্তক আছে। পূজা আরম্ভ হোক, আমি বাসা থেকে পুঁতি এনে এখনই পাঠ করব। তা তদ্দণ্ডেই আমি বাসায় এসে অতি সরল সাধুভাষায় আমার সাধ্যমতো অতি উৎকৃষ্ট আর সরল কবিতায় পুঁতি রচে ফেল্লাম। তারপর অতি দ্রুত সভাস্থ হলাম। এবং সেখানেই মল্লিখিত সত্যনারায়ণ পুঁতি অথবা কবিতা এই প্রথম প্রকাশ্যে পাঠ কল্লাম। পঞ্চজনায় জানল, আমি একজন তরুণ ও নবীন কবি বটি।

প্রসাদ, সেটি কেমন করে ঘটল? মানে, লোকে বুঝলে কী প্রকারে?

ভারত, কেন ভাই, এ তো সিধে হিসেব। কবিতার শেষ দিকে রীতি অনুযায়ী আমার ভারত নামের ভণিতা এবং সবিশেষ পরিচয় বর্ণনা করা ছিল। এই শুনে সকলে আরও অধিক আশ্চর্য জ্ঞান কল্লেন। সকলেই মুক্ত কণ্ঠে কইলে লাগলেন—ভারত তুমিই সাধু। স্বয়ং সরস্বতী তোমার জিহ্বাগ্রে নৃত্য করছেন। তুমি তো সামান্য মনুষ্য নও। তোমার অসাধারণ ক্ষমতা ও অলৌকিক সাধ্য দেখে আমরা চমৎকৃত হয়েছি।

প্রসাদ, তা হলে দাদা, তোমার ছেলেমানুষ বয়েসি কবিতা রচনার নমুনা একটুখানি শুনি না। একটু অন্তত চমৎকৃত হওয়া যাক।

ভারত, এই বুড়ো মুখে ছেলেকাল শুনবে!

—শুনব বৈকি। আমার দাদাটি কতখানি এঁচোড়পক্ক ছিল, তা দেখতে হবে না।

—বেশ বেশ। তাহলে খাজা কাঁটালের মুখে ফুলকচি ইঁচোড় শুনবে! তাই হোক।

ভারতচন্দ্র একটুক্ষণ চুপ করে র'ন। তারপর বলেন, আসলে রচনা ছিল দু'খানি। একটি ত্রিপদী আর একটি চৌপদী ছন্দে। তবে এখন মনে হয়, সে রচনায় কিছু গোলমাল আছে।

—বেশ তো। একটু স্মৃতি রোমন্থন তো হবে দাদা।

ভারত, তবে বলি শোন। কিন্তু সবটুকু নয়। সামান্য খানিক নমুনা।

—তাই হোক।

—গণেশাদি রূপ ধর, বন্দ প্রভু স্মরহর,
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষদাতা।
কলিযুগে অবতরি, সত্যপীর নাম ধরি,
প্রণমহ বিধির বিধাতা।।
দ্বিজ, ক্ষত্রি, বৈশ্য, শূদ্র, কলিযুগে ক্রমে ক্ষুদ্র,
যবনে করিতে বলবান!
ফাকির শরীর ধরি, হরি হৈল অবতরি,
এক বৃক্ষতলে কৈলা স্থান।।
নম্রমাণ্ দাড়ি গোঁপ, গায় কাঁথা, শিরে টোপ
হাতে আসা কাঁধে ঝোলে ঝুলি
তেজঃপুঞ্জ যেন রবি, মুখে বাক্য পীর নবি
নমাজে দর্গার চুমে ধূলি।।

জাহির কীরূপে হব, কারে বা কীরূপ কব,
ভাবেন বৃক্ষের তলে বসি।
ঈশ্বর ইচ্ছায় ক্ষিপ্র, বিষ্ণু নামে এক বিপ্র,
সেইখানে উত্তরিল আসি।।
দীন দেখে দ্বিজবরে, সত্যপীর কন তারে
প্রকাশ করিতে অবতার।
বে সত্য জনারগির, সির্ণি বেদে দরপীর,
পুলকে প্রসাদ খাও তার।।

প্রসাদ, এটি হল তাহলে ত্রিপদীর নমুনা। এবার খানিক চৌপদী শুনি।

ভারত হেসে বলেন, তুমি কি আমার কাব্য ব্যবচ্ছেদ করতে বসেছ ভায়া!

প্রসাদও সমুচিত হাস্য করেন, ব্যবচ্ছেদ নয় দাদা, পরিচ্ছেদ। মানে সন্দর্ভবিভাগ।

ভারত, হ্যাঁ ভাই, আমার জীবনের প্রথম পরিচ্ছেদ। অর্থাৎ বালককাল। তুমি যথার্থই কয়েছ।

প্রসাদ, তবে দাদা একটি আবদার আছে।

—কী আবদার শুনি।

—সামান্য। সেটি হল শেষের দিকে—যেখানে তোমার আত্মপরিচয় কয়েছ। অর্থাৎ ওই ভণিতা অংশটুকু শুনলেই কৃতার্থ হব।

ভারতচন্দ্র সামান্য গলা খাঁকরি দেন। তারপর বলে ওঠেন,

সবে কৈল অনুমতি, সংক্ষেপে করিতে পুঁতি, তেমনি
করিয়া গতি, না করিও দূষণা।।
গোষ্ঠির সহিত তায় হরি হোন্ বরদায়, ব্রতকথা সাঙ্গ
পায়, সনে রুদ্র চৌগুণা।।

প্রসাদ, বাঃ বাঃ। চমৎকার। অতি চমৎকার। তবে ভাবলে অবাক বনি, তুমি কী প্রকারে ওই পহেলা পদটিতে পারসির সঙ্গে অক্লেশে সংস্কৃত, বাঙ্গলা মিশেল দিলে। অর্থাৎ এত অল্প বয়সে।

ভারত, যথার্থই কয়েছ। ফলে, বিষয়টি হয়ে দাঁড়িয়েছে, সাত নকলে আসল খাস্ত। কিন্তু ভায়া আমার ঘুরো জীবনকথা যে এখনও ফুরলো না।

প্রসাদ, এই যে সমস্ত পদ্যপুঞ্জ বলছ, এ সব বাদ দিয়ে তো তোমার জীবন নয় দাদা। তোমার কবিতাই তোমার জীবন। আবার জীবনই কবিতা।

—কবি না হলে এমন হক কথাটি কি কেউ বলতে পারে। তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক ভায়া।

—ভালো কথা। এবার তা হলে তোমার জীবনের ফুলগুলো দেখাও দাদা।

—ফুলের চেয়ে কাঁটাই বেশি ভাই।

—তা-ই শুনি না!

ভারত একবার অধোমুখে নিজ বক্ষ দেখেন। একটি ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস মোচন করেন। তারপর বলে ওঠেন, মুন্সী মহাশয়দের ঘর ছাড়লাম বেশ ক'টি বছর পার করে। ওখানে

পারসি ভাষাটি শিক্ষা করা হল। আমি যখন ঘরে ফিরলাম, তখন আমার বয়েস এক কুড়ি। পিতৃদেব, মাতৃদেব্যা আর ভাই—সকলের সঙ্গে মোলাকাত কল্লাম। অগ্রজেরা আমার বিদ্যেবুদ্ধি দেখে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। এবং বলা যায়, তাঁদের কৃপাতেই আমার জীবনে আর একটি মোচড় পড়ল। বিধাতাপুরুষ আমায় কৃপা কল্লেন। আমায় আবার এক অভিনব ঘ্যুরো জীবন পথে নেমে পড়তে হল।

আমাদের বাড়ির খিলবন্ধ দোতলায় এই রাতের বেলা কুরুক্ষেত্র বাবা মায়ে। আমরা ভাই বোনেরা নীচে ভাইটির আছে আটানিবাবু থেকে ধরে কথামৃতের টুকরো টাকরা কাহিনি হাঁ করে গিলি। সেই ফাঁকে দোতলার টানা বারান্দার এক ধারে বন্ধ দরজার ওধারে ঘুম ঘরে দাদু আর আমাদের বড়মা। দুজনাতেই নিত্যি সন্ধেবেলা আফিং খান, তাই এত সব শব্দকাণ্ডে তাঁদের ঘুম টলে না। তবে বড়মা বয়সের জন্যে আর চৌপর দিন বিশ্রামের কারণে ঘুম পাতলা স্বভাব, আফিং সত্ত্বেও। ফলে থেকে থেকে তিনি হঠাৎ হঠাৎ ভয়ঙ্কর আওয়াজি হাই তুলছেন। সেই সঙ্গে—'গুরো গুরো' রব। আবার মাঝে মধ্যে বিচিত্র সব গান। যেমন এইমাত্র তাঁর বেটাছেলে ধারার গম্ভীর গলায় গান হচ্ছে, 'রাম রহিম জুদা করো মন দিলকো সচ্চা রাখনা জি'।

তা হলে বাবা-মা'র এই ভয়াবহ বিবাদকালে কে রাম, আর কেই বা রহিম। যদিও এই গানটির স্পিরিট মতে .য রাম, সেই রহিম। কিন্তু ভারতবর্ষের নেতাদের রাজনীতি আর রাষ্ট্রনীতির প্যাঁচে এই দু'টি শব্দ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ্য, নেতাকূলের কাছে মাঝে মাঝে এমন মনে হতে দোষ কী যে, এই জাতিভাগ তত্ত্বটি যতদিন টাটকা থাকে, ততদিনই সেই করে খাওয়া মাতব্বরদের লাভ। বস্তুত, সত্যি সত্যি রাম রহিমে কোনও বিসম্বাদ নেই। সাধারণ হিন্দু-মুসলমানে ভালোবাসার দুয়ার হাট করে খোলা। হিন্দুস্থান-পাকিস্তান, হিন্দু-পাকিস্তানি—এ সব যে কী ভজঘট কথা। একটা দেশ বা জাতি নিয়ে কেমন করে এমন সব ছিনিমিনি খেলা হয়!

এদিকে দোতলায় বাবা-মায়ে প্রচণ্ড তাণ্ডব কলহ। নীচের থেকে দুপদাপ, ধুমধাম শব্দ দাপট শোনা যায়। কী হচ্ছে ওপরে, কে জানে। আর কেউ না জানুক, যা হচ্ছে, তা মারপিট কখনওই নয়। সোজা কথায়, হাঁক-ডাক, চেয়ার টুল আছড়ানি, ফুটবলার বাবার তেজী পদক্ষেপ, আর সেই সবের পাশাপাশি মা'র কাতর আর্তনাদ। কখনও তীব্র হাহাকারি চিৎকার, মরো, তুমি মরলে আমরা বাঁচি। একটা আস্ত রাহু। আমাদের সকলকে খেয়ে তবে শান্তি। আমি চুপ করে ভাবি. আমার বাবার দাপুটে গলায় আবৃত্তি, 'আমি দ্বাদশ রবির রাহুগ্রাস..'। কাজি নজরুলের 'বিদ্রোহী' কানু বাবার গলায় কী যে প্রাণ পায়! পাশাপাশি মনে করি, আমার মা'র ছেলেবেলা থেকে ওস্তাদের কাছে ক্লাসিকাল গান শেখা গলায়, পায়লিয়া কে রুমক ঝুমক ঝুম...ঝনক ঝনক পায়ল বাজে...। বলা বাহুল্য, রেডিওয় রবিবার রাতে 'ছায়াছবির গান' অনুষ্ঠানে বাজানো রেকর্ডে ওস্তাদ আমির খাঁর গান, মা শত কাজ থাকলেও শোনে। যেমন শোনা চাই রেডিও সিলোনে আমিন সায়ানির অনবদ্য পরিচালনায় প্রতি বুধবার রাতে 'বিনাকা গীতমালা'। এ নিয়েও বাবার রূঢ় বচন এই বিবাদকালে, বাড়িতে দিনরাত রিডিওয়ালাদের দোকানের মতো হিন্দি গান। বাচ্ছা বাচ্ছা

ছেলেমেয়েগুলো কী শিখবে। ঠিক তখনই আমি ভেতরে ভেতরে চমকাই, বাবা তো হরবখত তার অসাধারণ ন্যাজাল সুরেলা গলায় সায়গল ধরে, 'বালম আয়ো বসো মেরে মনমে...' আর ঠিক তারপরে পরেই বাবা হুঙ্কার দিয়ে বলছে, তোমরা হলে ভণ্ড, ভণ্ড। এবার ওই লক্ষ্মীর ঝাঁপি, ঠাকুর দেবতার ছবি, সব দূর করে ফেলে দেব। ধম্ম হচ্ছে। ধম্ম হচ্ছে। যত সব বুজরুকি...। হিন্দি ফিলমি গান শোনা, আবার ঠাকুর পুজো। নিকুচি করেছে ধম্মের।

মা, তোমার মুখে গলিত কুষ্ঠ হবে। কুষ্ঠ হবে।

—আমার কিস্যু হবে না। আমার তোমাদের মতো বুজরুকি ঠাকুরও নেই, কুকুরও নেই। আমি কাছাখোলা। তোমার বাবা রেলের স্টোরে চুরি করে ফাঁক করে দিচ্ছেন। উনি আবার রামকেষ্ট ভজেন। ঘরে ওঁয়ার ফটো টাঙিয়ে রাখেন।

—তোমার মুখ খসে যাবে।

—যাক যাক। আমার সংসারে তোমার বাপ-মা এখনও হাত জারি রেখেছেন। আমার গুহ্যদ্বারে সমানে কাঠি দিয়ে চলেছেন। আমার সংসার নেই। কেউ নেই। আমি ছন্ন, মাতাল, বৈরাগী, হাঃ হাঃ হাঃ।

নীচের বারান্দায় ভাইটি চার ভাইভাগ্নীকে কথামৃতের গল্প শোনায়। কনিষ্ঠ মলয় আর একেবারে কচি সোমা কী বোঝে, কে জানে। তবে আমার আর সেবার মতো হাঁ করে গল্প গেলে।

তীব্র বৈরাগ্য কাকে বলে...। এক দেশে অনাবৃষ্টি হয়েছে। চাষিরা সব খানা কেটে দূর থেকে জল আনছে। একজন চাষার খুব রোক আছে, সে একদিন প্রতিজ্ঞা করলে যতক্ষণ না জল আসে, খানার সঙ্গে আর নদীর সঙ্গে এক হয়, ততক্ষণ খানা খুঁড়ে যাবে। এদিকে স্নান করার বেলা হল। গৃহিণী মেয়ের হাতে তেল পাঠিয়ে দিল। মেয়ে বলল, বাবা, বেলা হয়েছে, তেল মেখে নেয়ে ফেল। সে বললে, তুই যা, আমার এখন কাজ আছে। বেলা দু'প্রহর একটা হল, তখনও চাষা মাঠে কাজ করছে। স্নান করার নামটি নেই। তার স্ত্রী তখন মাঠে উবজিয়ে এসে বললে, এখনও নাওনি কেন? ভাত যে জুড়িয়ে গেল। তোমার যে সবই বাড়াবাড়ি। না হয় কাল করবে, কী খেয়েদেয়েই করবে। গালাগালি দিয়ে চাষা কোদাল হাতে তাড়া করলে আর বললে, তোর আক্কেল নেই। বৃষ্টি হয়নি। চাষবাস কিছুই হল না, এবার ছেলেপুলে কী খাবে? না খেয়ে সব মারা যাবি। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, মাঠে আজ জল আনব, তবে নাওয়া-খাওয়ার কথা কবো। স্ত্রী গতিক দেখে দৌড়ে পালিয়ে গেল। চাষা সমস্ত দিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে সন্ধের সময় খানার সঙ্গে নদীর যোগ করে দিলে। তখন একধারে বসে দেখতে লাগল যে, নদীর জল মাঠে কুলকুল করে আসছে। তার মন তখন শান্ত আর আনন্দে পূর্ণ হল। বাড়ি গিয়ে স্ত্রীকে ডেকে বললে, নে, এখন তেল দে আর একটু তামাক সাজ। তারপর নিশ্চিন্দি হয়ে নেয়ে-খেয়ে সুখে ভোঁস ভোঁস করে নিদ্রা যেতে লাগল। এই রোক্ তীব্র বৈরাগ্যের উপমা।

রাতে আমরা ভাইটির সৌজন্যে ভাত খেলাম। শুয়েও পড়লাম বুড়ি মানুষটিকে ঘিরে। ওপরে দুমদাম শব্দকম্প। হুঙ্কার। হাহাকার। বিলাপ। কান্না। তড়পানি। কাচের গ্লাস

আছড়ানি। জানলা দিয়ে ক্ষিতীশ দাদুদের বাগানে বাবার শূন্য বোতল উড়ে যাওয়া। বড়মার উচ্চকিত আয়েসি হাই। 'গুরো গুরো' হুঙ্কার।

ছেলেমানুষ ভাইবোনেরা সব ঘুমে কাদা। কেবল খরপক্ক আমার পোড়া চোখে ঘুম নেই। শুয়ে শুয়ে চুপটি করে শুনি দোতলার রণদামামা। টের পাই, কানু বাবা আজ তুরীয়। ফলে, এবার আর একটি বোতল খোলা হচ্ছে। বন্ধ দোর দোতলার বারান্দা থেকে সিঁড়ি গড়িয়ে থ্রি এক্স রামের ঝাঁঝালো থাবা এখানে—এই একতলার ভাঁড়ার ঘরে এসে হামা দেয়। বাবা, দৈত্যরাজা সেজে অট্ট অট্ট হাসে, মা, জনম দুখিনীর জ্যান্ত প্রতিমা হয়ে হাহাকার করে, মরো, তুমি মরো। নইলে আমি মরব। কিন্তু আমি মরলে, আমার ছেলেপুলেগুলোর কী হবে।

কানুবাবা রাম-এর দ্বিতীয় চ্যাপ্টারে নিবিষ্ট হতে হতে গলা ছাড়ে, আত্মহত্যা মহাপাপ। মহাপাপ।

পরদিন, আপনি আপনিই হয়। ভোরবেলা দরজায় কড়া নাড়া। এদিকে সারা বাড়ি নিঝ্‌ঝুম। দোতলায়, বাবা-মা'র তরফে একেবারে ঠান্ডা জুড়নো। আমি তড়াক করে উঠে পড়ে দোর খুলতে গিয়ে দেখি, আমাদের মা হেঁট হয়ে উঠোনের রক্তকরবি গাছের নিচে বসে খুরপি হাতে মাটি খুঁড়ছে। আমায় দেখে মা রক্তাভ ফুলো ফুলো চোখে একবার তাকায়। আমি দেখতে পাই মা'র কোঁকড়ানো এলোচুলের ভাঁজে ভাঁজে ঝুরো রক্তকরবির পাপড়ি।

দোর খুলতেই একজোড়া গেরুয়া সাধু। আর তাঁদের পেছনে ধুলুক গ্রামের নিতাইকাকা, যে কি না কাকা কামাখ্যাচরণের সৎ ভাই। তার সঙ্গে, জাঁদরেল গালে টোপলা পান, ঘনঘোর বিধবা আর ডাঁটো গড়নি, সেই ধুলুকেরই গৌর পিসিমা। নিতাইকাকা যুবক, চুলে অ্যালবার্ট। গৌর পিসিমার নাকে রসকলি। গলায় কণ্ঠি। আর ঝুলন্ত কুঁড়োজালি, মাঝবয়সি বলবতী বুকের ওপর।

পঁয়ত্রিশ

হাটখোলা প্রভাতী সদর দুয়ারের ওধারে দণ্ডায়মান ধুলুক গ্রাম নিবাসী দাদুর অকালমৃত ভাইয়ের কনিষ্ঠ পুত্র নিতাইচরণ মুখোপাধ্যায় আর ওই গ্রামেরই বোষ্টুমি গৌর পিসিমা। দু'জনারই হাতে বোঁচকা। কেবল নিতাইচরণের হাতে বাড়তি সুটকেস।

নিতাইচরণের বুদ্ধিমান চোখ-মুখ। পরণে মালকোঁচা ধুতি। গায়ে নীলবর্ণ হাতা গোটানো শার্ট। তারই মাঝে, মাথায় অ্যালবার্ট আর ভাসা ভাসা চোখ। আমাদের এখানে এমন পোশাক, এমন একজন যুবকের পরণে কী যে বেমানান!

আর গৌর পিসিমা, মাথায় কাঁচা পাকা কুচো কুচো চুল, খর কালো বর্ণ, ঘুরন্ত ভাঁটা নেত্র আর দিব্য স্বাস্থ্যবতী। নাক জোড়া রসকলি, গলে কণ্ঠি এবং বুকে সাঁটা কুঁড়োজালির মধ্যে একটি হাত ভরে দেওয়া। গালে-ঠাসা পান পোক্ত দম। অসম্ভব বলবতী মূর্তি।

এঁদের পশ্চাতে একজন মোটাপানা আর এক রোগা শুঁটকো গেরুয়া সন্ন্যাসী। কী আশ্চর্য এপার ওপার চেহারা চরিত্র। এই জোড়া সাধুকে এর আগেও এ বাড়িতে দেখা

গিয়েছে। একজন কৃষ্ণপন্থী, অন্যজনা কী, তা জানা যায় না। তবে দু'জনেই বেশ ভোজনবিলাসী, যথাক্রমে নিরামিষ ও আমিষ। এই চারজনকে প্রাতঃকালে দেখে আমার মনে হল, মায়ের প্রাণ বেরনো পরিশ্রমের আরও চারধাপ চড়ল।

কিন্তু মা যে এদিকে রক্তকরবি গাছতলে খুরপি হাতে অসময়ে! সারারাত ধরে প্রবল ঝড় চলে গিয়েছে সারা শরীরের ওপর দিয়ে। এই অসময়ে, ওই ফুলতলায় মাকে কেমন যেন নিঃসহায় আর উদাস বলে মনে হয়। কেউ নেই, কিছু নেই, এমন চাউনি। কী করছে মা?

আমার দোর খোলার আওয়াজ পেয়ে ভাইটি তাড়াতাড়ি ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। পাকা চুলো ফোলা ফোলা শীর্ণ মুখে রাত জাগা আঁকা। টুকটুকে ফর্সা আড়ায় সবে সকালের আলো।

ভাইটি বলে ওঠে, ও মা, এ কী কথা! তোমরা বাইরে দাঁড়িয়ে যে!

গৌরপিসিমা বাজখাঁই জবাব দেয়, তা কী করব বল। কানুর বড় পুত্তুর যে এ বাড়ির দারোয়ানি করছে, তা তো আগে জানতুম না।

আমি কী বলব এ কথায়, বুঝতে না পেরে পেছু হটে দাঁড়াই। ভাইটি এগিয়ে, সকলকে, যাকে বলে, সাদরে ভেতরে ডেকে নিয়ে যায়। আমার চোখ উদাসী মা'র দিকে। এত সব অতিথি দেখেও মা'র কোনও হেলদোল নেই। মা'র এমন আনমনা ভাব এর আগে কখনও দেখিনি।

ভোরবেলাকার ভেতর দালানে সাত সকালে প্রায় হাঁক ডাক পড়ে যায়। সেই হঙ্কডঙ্কর একাই একশো গৌরপিসিমা। অনর্গল বকবকম আর দাপাদাপি। তাকে সামলাতে ভাইটি বেশ হিমসিম। ভাবখানা এমন, যেন কোনও গুরুঠাকরানি এলেন আমাদের বাড়ি। এই গৌর বোষ্টুমি আসলে ধুলুক গ্রামের এক ব্রাহ্মণ বিধবা। তার সঙ্গে আমাদের পরিবারের যোগাযোগ কতক আমার পিতামহ আর কতক বড়মার সৌজন্যে। কথিত আছে, আমার ঠাকুমার অকাল চলে যাওয়া খাঁ খাঁ সংসারে এই রমণী এসে হাল ধরেন। সেই থেকেই তাঁর মহা দাপট বহুকাল বহাল ছিল। এখন আমাদের সংসার বিস্তর গড়িয়েছে। তৎকালের মা-হারা এঁড়ে, আমাদের কানু বাবা আজ ছেলেপুলের বাপ : কথায় কথায় ছেলেপুলেদের মায়ের বাপকে ধরে ঝাঁকুনি দেন। ফলে, এখন গৌরপিসিমার এখানে আসা কমেছে। কিন্তু একবার এলে সংসারের নৈবিদ্যির চুড়ো হয়ে বসেন। আমার দাদু কী কারণে যে তাকে দেখলে এমন মিইয়ে যান, কে জানে। এমনকী, আমাদের চণ্ড বাবাও তার সামনে হেঁট মস্তক! বাবার ফণায় যেন সাপুড়ের শেকড় পড়ে। এ সব রহস্য আমার মাথায় বড় একটা ঢোকে না।

জোড়া সাধু যে যার নিজের মতো বারান্দার দু'কোণে কম্বল, চাটাই পেতে নেয় ঝপাঝপ। কাঁধের ঝোলাপত্তর নামিয়ে নেয়। বে-খেয়ালে একজনার ঝোলা থেকে টকাং করে গাঁজার কলকে খসে পড়ে। সাধু তাড়াতাড়ি সেটি তুলে ঝোলায় গোঁজে। বারান্দার ও কোণ থেকে দ্বিতীয় সাধু তার দিকে কটমটে চায়। নিতাইকাকা হাতের বোঝাপত্র ভাঁড়ার ঘরে রেখে দেওয়াল ঘেঁসে দণ্ডায়মান বহু পুরনো সাহেবি আলনা কাম আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথার অ্যালবার্ট ঠিক করে। ঘাড় এদিক ওদিক করে চুলের গতিপ্রকৃতি মেপে

নেয়। এদিকে বিছানায় ঘুম চটকে উঠে বসা আমার পরের বোন সেবা আর ভাই মলয় হাঁ করে এতসব অকাল অতিথিসমাগম দেখে। টরটরে বাক্যধারিণী, অতীব রোগাপট্‌কা আর বেড়াবিনুনি সেবা ভাই মলয়কে বলে, কী অসব্য রে এরা।

কথা আড়ষ্ট, ড্যাবা চক্ষু আর সর্বদাই ভ্যাবাচ্যাকা মলয় নিচু সুরে বলে, চুপ কর দিদি।

—কেন রে। চুপ করব কেন?

মলয় ভীত গলায় বলে, এলা দু'জন কে লে দিদি?

এরা মানে, জোড়া সাধু ছাড়া নিতাইকাকা আর গৌর পিসিমা। সেবা তার পাকাটে অথচ ভিতু স্বভাবের মাঝখান থেকে বলে ওঠে, একটা কাকা আর একটা পিসিমা।

মলয়, পিছিমাটা খুব আগি।

সেবা কিছু বলার আগেই বাইরের ঘর থেকে রামশরণ কাকা ঘুম-চটা বাজখাঁই গলায় বলে উঠে, লাও বাবা, সকাল বেলা এ ঝী হাল্লা! এটা বাড়ি না মুসাফির খানা!

গৌর পিসিমা এবার গলা ছাড়ে, রামশরণ। বলি আর কত ঘুমবি?

রামশরণ কাকা দুদ্দাড় উঠে পড়ে।—আরে, কী সরবোনাস। সুভে হোতে না হোতে দিদির দরশন।

গৌরপিসিমার গলা আর এক ধাপ চড়ে, আরে মড়া মেড়ো ভূত। কাকে কী বলতে হয় সবৎ শেখেনি। বাড়ির চাকরকে মাতায় তুললে এমনই হয়। নিতাইকাকা আয়নায় দাঁড়িয়ে মিহি সুরে গান গায়, 'আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল, সকলি ফুরায়ে যায় মা...'

গৌরপিসিমা ভাইটিকে বলে ওঠে, কিছু মনে কোরো না। তুমি আমার বয়েসে বড়ো, কিন্তু সম্পর্কে ছোট তো!

ভাইটি তৎক্ষণাৎ জবাব দেয়, সে আবার কী কথা। কানু তোমায় দিদি বলে। আর আমি হলুম কানুর পিসিমা। থালে সম্পক্কটা কী দাঁড়াল!

গৌর জিভ কাটে, আসলে তুমি থাকো ওতোরপাড়া, আর আমি তোমাদের আদি ঘর ধুলুক। এখেনে কানুর বাবা, মানে আমার সাক্ষেৎ বাপ রয়েছেন। আচেন আমার বাপের মা জননী। ফলে যে টুকুন যোগাযোগ, এখেনকার সঙ্গে। বাপের বাড়ি বলে কতা। ফলে, সব গোলমাল হয়ে যায়।

ভাইটি মিচকে হেসে নিজের মধ্যেই মুখ লুকোয়। ফর্সা টুকটুকে মুখে, কালো ফ্রেমের চশমার ওধারে সেই মস্করাটুকু একবার চলকে উঠেই লুকিয়ে পড়ে। মুখে কথা ফোটে, তা তো বটেই, তা তো বটেই। মেঘে মেঘে বয়েস তো হল।

গৌর, পিসিমা ফুটন্ত তেলে এক তিল জল পড়নে ছ্যাঁক করে ওঠে, বয়েস আবার কী কথা পিসি। বয়েস তো মানুষের মনে।

ভাইটি, তা তো বটেই। তা তো বটেই।

গৌর, আমি বাপু এখনও দেঁড়ে মুসে খাটতে পারি। ধান ভাঙি। মুড়ি ভাজি। ঘরে চার চারটি গাই আছে। তাদের জাব দিই। এখনও, বলতে নেই, ডেড় পোয়া আতপ চালের ভাত খাই। তবে কি না, বোষ্টম তো, তাই নিরিমিষ্যি। সেই সঙ্গে আবার একাদশী-অমাবস্যেও আছে।

ভাইটি, ভালো ভালো। উপবাস করলে দেহ ধোলাই হয়। শরীর ভালো থাকে।

নিতাইকাকা আয়না ছেড়ে বারান্দায় যেতে যেতে আমার দিকে তাকায়। তারপর বলে, রামপেসাদের দেশ। শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী মাতাঠাকুরাণীর ধারা। কিন্তু বাড়িতে কোথাও কালী ঠাকুরের ফটো নেই!

কথাটা কানে নিয়ে গৌর বলে ওঠে, কী করে থাকবে। এখেনে যে দাদার গুরু অনুকূল ঠাকুর। সৎসঙ্গীদের উনি ভিন্ন আর কোনও ঠাকুর নেই।

বোন সেবা ওধার থেকে বলে, বা রে, দাদা তো সেদিন নিজের হাতে মূর্তি গড়ে কালীপুজো করল।

মলয় দোহার দেয়, বরি দিল। ইঁদুর বরি।

গৌর শুধু একবার ভুরু কুঁচকে বোঝবার চেষ্টা করে ব্যাপারটা কী বলতে চাইছে ভ্রাতা। একসময় বোধ হয় ধরতে পারে ল আর র-এর গণ্ডগোলটা। সেই ফাঁকে নিতাইকাকা মিঠে গলায় গান গাইতে গাইতে বার বারান্দায় যায়। গান হয়, 'জনমের শোধ ডাকি গো মা তোরে, কোলে তুলে নিতে আয় মা। সকলি ফুরায়ে যায় মা...'

আমি দেখি, মা রক্তকরবি তলার মাটি খুঁড়ে কী একটা টেনে তুলল।

রাজ অতিথি শালের ভেতরে তুমুল শব্দে ও গন্ধে দ্বিপ্রাহরিক ভোজনের রন্ধন আয়োজনে প্রমত্ত ভজহরি রামতনু। যদিও দ্বিতীয় প্রহর আসতে এখনও বিলম্ব আছে, তবু ক্ষুধার আগুনে প্রপঞ্চময় তাড়না পড়বার আগেই যাবতীয় ব্যবস্থা পাকা করে রাখা চাই। অতএব—বাটো হে, কোটো হে, কাটো হে।

আপাতত ওখান হতে মাঝে মধ্যেই বর্ষা বাতাসে ভেসে আসছে মশলার ঝাঁঝ ও হরেক শব্দবৃন্দ। সেই সঙ্গে ভজহরি-রামতনুর যুগপৎ হ্যাঁচ্চো, হ্যাঁচ্চো। বাইরে কভু রোদেলা কভু মেঘলা বারান্দায় পাশাপাশি উপবিষ্ট দুই সমকালীন কবির মধ্যে বোনা হচ্ছে আটপৌরে গদ্যে কিছু অন্দরের কথামালা। ভারতচন্দ্র বলছেন ' রামপ্রসাদ শুনে চলেছেন।

—তা বেশ হল। পারসি ভাষাটি শিক্ষা করার ফল হাতে নাতে ফলল। আমার অগ্রজরা বললেন, ভাই হে, সংপ্রতি পিতাঠাকুর বর্ধমানেশ্বরের কাছ থেকে কিঞ্চিৎ ভূমি ইজারা নিয়েছেন। তা জগদীশ্বরের কৃপায় এবং কর্তার আশীর্বাদে তুমি সর্বতোভাবে যোগ্য এবং কৃতী হযেছ। অতএব এই সময়ে তুমি আমাদিগের মোক্তার স্বরূপ হয়ে বর্ধমানে যাও। রাজাকে রাজস্ব দিতে যেন বিলম্ব না হয় এবং রাজদ্বারে যেন কোনও গোলযোগ উপস্থিত না হয। তুমি উপস্থিত মতে যখন যেরূপ পত্র লিখবে, আমরা তদনুরূপ কার্য করব ভাই। আর তা হলেই আমারদিগের আর অন্ন বস্ত্রের কোনওপ্রকার ক্লেশ রইবে না।

প্রসাদ, এ তো ভ্যালা দায়। তুমি কবিতা রচবে, না অগ্রজদের ভাত কাপড় সামলাবে দাদা।

ভাবত, ভায়া, মহামতি কালিদাস বলছেন, স্বশক্তিংজ্ঞাত্বা কার্যমারম্ভেত।

প্রসাদ, অর্থাৎ, নিজের সামর্থ্য জেনে বুঝে, তারপর কার্য আরম্ভ করবে।

ভারত, তা সেটি না মেনে কাজে ঝম্প দিলে যা হয়, আমারও হল সেই দশা।

—কেমনতর?

—অগ্রজদের হুকুমে আমি বর্ধমানে উপনীত হলাম। সেখানে যেয়ে নিয়ম মোতাবেক রাজার কাছ থেকে ইজারাপ্রাপ্ত ভূ-সম্পত্তি সামলাতে লাগলাম। সব কার্য পরিচালনা করতে লাগলাম। এভাবে কিছুকাল গত হল, এমনি সময়ে আমার অগ্রজরা করলেন কী, নিয়মানুযায়ী যথাকালে কর প্রেরণে অক্ষম হয়ে পড়লেন। আমি তাঁদের ক্রমাগত পত্র লিখে চল্লাম। কিন্তু কোনও লাভ হল না। ইজারাপ্রাপ্ত সম্পত্তি নিয়ে প্রবল গোলযোগ আরম্ভ হল। মহারাজা কুপিত হলেন। তাঁর কান ভারী করল কিছু চক্রান্তকারী রাজকর্মচারী। ফলে রাজা একদিন সেই সম্পত্তিটি নিজের খাসে নিয়ে নিলেন, আর আমায় কারাগারে নিক্ষেপ করলেন।

প্রসাদ, দাদা, আমার মনে হয় তৎকালের বর্ধমানেশ্বর পণ্ডিত, কবিদের গৌরবের সমাদর বুঝতেন না। অথবা তোমার যথার্থ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রাপ্ত হননি।

ভারত, সে আমার মন্দ বরাত। তবে সংসারে মহৎ মানুষও আছেন বলেই এটি সংসার। সে সময় যিনি কারারক্ষক ছিলেন, সেই বেক্তিটি ভারি ভালো মানুষ আর রসজ্ঞ। তাঁকে মাঝে মধ্যে আমার কবিতা শোনাতাম। তাতে তিনি আনন্দ পেতেন। কের'মে কের'মে তাঁর সঙ্গে আমার সখ্যতা জন্মে গেল। আর সেই সুযোগে আমি তাঁকে বল্লাম, বলি ও মহাশয়! অমুক অমুক স্থানে খাজনা বাকি আছে, তা সে সব স্থানে আপনার লোক পাঠিয়ে আদায় করে নিন না কেন। আমাদের এরূপে বদ্ধ করে রেখে ব্রহ্মহত্যা করলে কি ফলোদয় হবে।

—হক কথা। আমার মতো বদ্যি হলে না হয় কথা ছিল। শাস্ত্রে বৈদ্য হতব্য।

—কিন্তু ভায়া তুমি বৈদ্য হয়েও বৈদ্য নও।

—কেন দাদা?

—বৈদ্য মানে তো, আজন্ম খচড়া বৈদ্যাঃ। বৈদ্য জন্ম ইস্তক খচ্চর বা কূট প্রজাতীয়। যা আদপে আমি। ফলে, সেটি উল্টে এসে আমাতে বর্তেছে।

—তার কারণ কী?

—কারণ ভারি সিধে। আমার জীবন ঘুরো। আর তুমি ঘরো। ফলে সংসারের প্যাঁচ-পয়জার তোমার অন্তরে তেমন করে গেড়ে বসেনি।

—এটি বোধহয় আমার সম্পর্কে যথার্থ বিচার হল না। আমি বাইরে গৃহগত প্রাণী হলেও ভিতরি ভিতরি তো সদাই ঠাঁইনাড়া।

ভারত হাসেন, হুঁ, কবি মাত্রেই স্পর্শকাতর। তবে প্রসাদ, আমি তোমার বার মহলের কথা বলেছি। ভেতরে হাত দেবো, সাধ্যি কী আমার।

—ছিঃ দাদা, ছিঃ। এ কথা বললে কেমন করে। চোরে চোরে তো মাসতুতো ভাই নয়। আমার কালীমাতা ঠাকুরাণী যে তোমার মাসি।

—বটেই তো, বটেই তো। তা বাদে মা'র চেয়ে মাসির দরদ—সে বড় কম কথা নয়।

প্রসাদ, তা হলে দাদা যেখেনে এসে থেমেছিলে, সেখেন থেকে গপ্পোটা ধরো এবার।

ভারতচন্দ্র ভেতরে ভেতরে যেন নড়ে বসেন।—হ্যাঁ হ্যাঁ, বলি। তা আমার এই প্রস্তাব শুনে সেই ভালো মানুষ কারাধ্যক্ষ বেক্তিটি আমায় বল্লেন, আমি এই দণ্ডেই তোমাকে গোপনে গোপনে খালাস দিতে পারি। কিন্তু তুমি কোন কোন ভাবে, কোন কোন স্থানে

প্রস্থান করে নিস্তার পাবে, সে বিষয়ের কিছু উপায় স্থির করেছ কি? এই রাজার অধিকার অনেকদূর পর্যন্ত। এর মধ্যে তুমি যেখানে থাকবে, সেইখানেই বিপদ ঘটতে পারে। রাজা আর রাজকর্মচারীরা জানতে পারলে ভবিষ্যতে বিস্তর দুরবস্থা করবেন। সব শুনে আমি বল্লাম, আমাকে এই যাতনামুক্ত কারাভুক্ত দায় হতে মুক্ত করলে আমি আর ক্ষণকালের জন্য এ অধিকারের ত্রিসীমানায় বাস করব না। জলেশ্বর পার হয়ে 'মারহাট্টার' অধিকারে গিয়ে নিশ্বাস ফেলব। তা আমার এ কথা শুনে কারাপালক অতিশয় দয়ার্দ্রচিত্তে রাত্রিকালে অতি প্রচ্ছন্নভাবে আমাকে নিষ্কৃতি দিলেন।

প্রসাদ, তার অর্থ, তোমায় ছদ্মবেশ ধারণ করতে হল। তাই তো?

ভারত, যথার্থ কথা। এমনিতে এত সব ঝড় ঝাপটায় আমি ক্ষৌরি হতে পারিনি। সাফসুরত হওয়ার অবকাশ মেলেনি। তখন আমার মুখময় গোঁফ দাড়ির জাঙাল। ফলে আমার আসল মুখ মেঘান্তরালে গিয়েছে।

প্রসাদ, এই এখনকার বর্ষাকালীন মেঘের মতো?

—হ্যাঁ, ভায়া। তার উপর কারাপালক আমার কিছু সাজপত্তনের ব্যবস্থা করলেন। ধুতি, উত্তরিয় তো ছিলই। সেই সঙ্গে অতিরিক্ত হল, নাকে শ্রীকৃষ্ণরসবিলাসী রসকলি।

প্রসাদ, আহা মরি, মরি, তোমার এমন দিব্যকান্তির সঙ্গে সেই বোষ্টম রূপটির কথা মনে মনে আঁচ করে আমার পদকর্তা দ্বিজ ভীমের একটি কীর্তন মনে পড়ছে গো দাদা। একটুকুন বলব?

—এ আর বলতে। বলো বলো ভাই। তবে সুরে বলো, অংসুরে নয়।

রামপ্রসাদ মৃদু হেসে গান ধরেন,

কি রূপ দেখিলুঁ মধুর মুরতি
পিরীতিরসের সার।
হেন লয় মনে এ তিন ভুবনে
তুলনা নাহিক আর।
বড় বিনোদিয়া চূড়ার টালনি
কপালে চন্দনচাঁদ।
জিনি বিধুবর বদন সুন্দর
ভুবনমোহন ফাঁদ।।
নব জলধর রসে ঢরঢর
বরণ চিকণকালা।
অঙ্গের ভূষণ রজত কাঞ্চন
মণি-মুকুতার মালা।।
জোড়া ভুরু যেন কামের কামান
কেনা কৈল নিরমাণ।
তরল নয়নে তেরছ চাহনি
বিষম কুসুমবাণ।।
সুন্দর অধরে মধুর মুরলী

হাসিয়া কথাটি কয়।
দ্বিজ ভীমে কহে ও রূপ-নাগর
দেখিলে পরায় রয়।।

ভারতচন্দ্র উল্লসিত বলে ওঠেন, বাঃ ভায়া বাঃ! তুমি শুধু নিজ ফুলের মধু পান করো না। অপরেরটিও সময়ে সময়ে গ্রহণ করো।

প্রসাদ, কী করব দাদা, ভালো জিনিস পেলে কে না মুখের সোয়াদ পাল্টায়। তা এবার বলো তোমার ঘুরো জীবন কাহিনি। কোত্থেকে কোথায় চলেছ, শুনি।

ভারত, হ্যাঁ, সেই কথাই কই। তা, কয়েদ হতে মুক্ত হয়ে পথে নামলাম। সঙ্গে এক ভৃত্যকে নিলাম। তার নাম বটে রঘুনাথ। তারপর পথ চলতে চলতে কত না দিনরাত একাকার করতে করতে উপনীত হলাম মহারাষ্ট্র অধিকারের প্রধান রাজধানী কটক নগরে। সেখানে এসে ঘুরতে ঘুরতে একটি আশ্রয়ের সন্ধান পাওয়া গেল। তিনি হলেন এক দয়াশীল সুবাদার। নাম শিবভট্ট। তাঁর কাছে যেয়ে গলবস্ত্র হয়ে একটু ঠাঁই প্রার্থনা কল্লাম। বল্লাম, আমায় শ্রী শ্রী পুরুষোত্তমধামে কিছুকাল বাস করণের অনুমতি দিন। আমার অনুনয়ে সহজেই চিঁড়া ভিজল। সুবেদার প্রীত চিত্তে কর্মচারী, মঠধারী ও পাণ্ডাদের প্রতি আজ্ঞা ঘোষণা করে বল্লেন, ভারতচন্দ্র রায় ও তাঁর ভৃত্য যে পর্যন্ত শ্রীক্ষেত্রে অধিবাস করবেন, সে পর্যন্ত যেন কেহ তার নিকট কোনও প্রকার কর না গ্রহণ করে। ইনি বিনি করে তীর্থবাসী হবেন। যখন যে মঠে থাকতে ইচ্ছা করবেন, তখন সেই মঠে মানপূর্বক স্থান পাবেন। এবং এঁদের আহারের নিমিত্ত প্রতিদিন এক একটি বলরামী আটকে পাবেন। সকলেই এঁদের বিশেষ রূপে সম্মান করবে।

প্রসাদ, বাঃ! কী দিব্য জীবন। অন্ন-বাসস্থানের কোনও ভাবনা নেই। আসলে, যে খায় চিনি, তাকে জোগান চিন্তামণি।

—হ্যাঁ ভাই। কিন্তু আমি, এই ভারত, পুরুষোত্তমে যেয়ে, রাজপ্রাসাদে নিত্যি প্রসাদ পেয়ে, শঙ্করাচার্যের মঠে বসবাস করতে লাগলাম। সেখানে আমার কাজ হল শ্রীমদ্ভাগবত এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়েব গ্রন্থাদি পাঠ। সদাই বৈষ্ণব সঙ্গ করা। আমার পরিবর্তিত বেশ হল উদাসীনের পারা। গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করেছি আমি ও আমার খাস চাকর রঘুনাথ। সেও উদাস বোষ্টম সেজে সেই প্রকার ভাবভঙ্গি ধারণ করল। আমাদের নামও বদলে নিলাম। আমি হলাম 'মুনি গোঁসাই', আর সে হল 'বাসুদেব'।

ভিতর মহলে রান্নায় ভারি সুবাস ছেড়েছে। সম্বার সহ মশলার উগ্র ঝাঁঝ বাতাসে গোঁত্তা দিচ্ছে। বর্ষাকালীন মোহ, যা বাতাসে এমনিতেই গাঢ়তর মিশে আছে, তার সঙ্গে রাজার ফুলবাগানি কদম্ব ও চাঁপার মিশেল পড়ছে। কোথায় বুঝি মত্ত সুবাসিনী কামিনী ফুটেছে। সেও এখন যথেষ্ট আস্কারা পাচ্ছে। আস্কারার সঙ্গে একরকমের প্রতিযোগিতা ঘটে চলেছে গন্ধ সাম্রাজ্যে। এই বুঝি ভাজা মাছগুলি কড়াইয়ে ফেলে আচ্ছা করে গরম মশলা আর পেঁয়াজ রসুন কষা হচ্ছে। একধারে মৃগনাভি ফুলের বাস, অপর পক্ষে আমোদিনী মাছের পাক। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ।

প্রসাদ আত্মমগ্ন বিমুগ্ধ স্বরে বলেন, বলো দাদা, বলো। বলি, থামলে কেন।

ভারত কন, একদিন হল কী, সেই মঠের অন্যান্য বৈষ্ণবরা বৃন্দাবনধাম দর্শনের ইচ্ছে প্রকাশ কল্লেন আমার কাছে। তাঁদের অনুরোধ, আমরা দু'টিতেও যেন তাঁদের সঙ্গে যাই। আমারও মন বলল, চল হে বোষ্টম। একবার বৃন্দাবন না দর্শন করলে কুঁড়োজালি যে শূন্য থেকে যাবে। অতএব যাত্রা শুরু হল আবার। আবার ঠাঁই নাড়া। আর এখেনেই আর এক মহা গোলে পতিত হলাম।

—আবার গোল! তোমার নামটি দেখছি ভারত না হয়ে ভূমণ্ডল হলেই ভালো ছিল।

—কেন ভায়া!

—মানচিত্রে মেলে না যে। ভারতের মানচিত্র কীরকম ধারা এঁকাবেঁকা। আর তোমার গিয়ে পৃথিবীটি তো গোলাকৃতি। তোমার ওই গোলের মতো।

—তা যা বলেছ। তা, আমরা বৈষ্ণবেরা, দল বেঁধে চলতে চলতে এক দিবস এসে উপস্থিত হলাম হুগলির অন্তঃপাতি খানাকুল কৃষ্ণনগরে। সেটি ছিল সন্ধ্যাকাল। কালটিও ছিল বসন্ত।

প্রসাদ গান গেয়ে ওঠেন,

অতি শীতল মলয়ানিল মন্দমধুর বহনা।
হরি-বৈমুখ হামারি অঙ্গ মদনানলে দহনা।।
কোকিলকুল কুহু কুহরই অলি ঝঙ্করু কুসুমে।
হরি-লালসে তনু তেজব পাওব আন জনমে।।

ভারত, ভায়া, কারও পৌষ মাস, কারও সর্বনাশ, আমার বিপৎকাল ঘনাচ্ছে। আর তোমার মনে বসন্ত কেত্তন পাক দিচ্ছে।

প্রসাদ, তা সর্বনাশটির বিবরণ খানিক শুনি।

ছত্রিশ

ভারত, হ্যাঁ, যে গানটি বললে, সেটি না হলেও কতক তার কাছাকাছি একখানি গান হচ্ছিল সেদিন সন্ধ্যেবেলাতে শ্রীশ্রীগোপীনাথজীউর শ্রীমন্দিরের নাটদালানে। খানাকুল কৃষ্ণনগরের সেই সন্ধ্যাকালটি যে কী মনোহারি, তা ভাবলে আজও চিত্ত চঞ্চল হয়। ভাবি, সেদিন দীর্ঘপথ বয়ে এসে, সেই শ্রীক্ষেত্র থেকে এতখানি পথ, বৈষ্ণব সেজে আর বৈষ্ণবদের সঙ্গে এসে কীর্তন শুনে শরীরের অবসাদ বুঝি জুড়িয়ে গেল। কীর্তনকারীর দল সেদিন ওখানে আসর পেড়ে মনোহরসায়ি কীর্তন পরিবেশন করছিল।

প্রসাদ, আহা কী মধুর গাঁত গুঁই কীর্তনের। মনোহরসায়ি। বুঝি মনোহরন করে বসে থাকে।

ভারত, তোমার মনোহরণ করছে ভাই। আর তার পুচ্ছ ধরে যে আমায় হরণ করা হল।

প্রসাদ, মনোহারি হরণ!

—বলিহারিও বলতে পারো। আসলে এ আমার হেরে যাওয়া, না হরণ হওয়া— তার নিষ্পত্তি যে এখনও করে উঠতে পারি।

—রহস্য না করে ভেঙে বলো দিকিনি দাদা।

ভারতচন্দ্র ফিকে হেসে বলেন, আমি তো ভেঙে বসে আছি ভাই। তবে কাহিনিটা বলি তোমায়। শুনলে মনে হবে বানানো পৌরাণিক কাহিনি। তাও বলি। সেদিন সাঁঝবেলা বৈষ্ণব বান্ধবদের সঙ্গে একত্রে প্রসাদ পেলাম আমি, অর্থাৎ, ছদ্মনামী 'মুনি গোঁসাই' আর আমার খাস চাকর রঘুনাথ, এখন 'বাসুদেব'। অমৃতবৎ সেই উচ্ছুণ্ণ করা মহাপ্রসাদ পেয়ে এতখানি পথ হন্টনে নিদারুণ ক্ষুধায় যেন জল পড়ল। তারপর আমরা সদলবলে আসরে যেয়ে বসলাম। সেখানে তখন গান হচ্ছে। বিষয়, মাথুর-সখীসংবাদ।

প্রসাদ, গানখানি মনে আছে কি?

ভারত, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ।

—একটু বলো না দাদা।

ভারত উদাস হাসেন। তারপর নিচু গলায় সুর ধরেন।

ধৈর্যং রহু ধৈর্যং রহু গচ্ছং মথুরায়ে।
ঢুঁড়ব পুরী পতি-প্রতীক্ষে যাঁহা দরশন পাওয়ে।
অতি ভদ্রং অতি ভদ্রং শীঘ্রং কুরু গমনা।
অবিলম্বে মথুরাপুরী প্রবেশ করিল ললনা॥
এক রমণী অল্পবয়সী নিজপ্রয়োজন পুছে।
নন্দ-জাত কৃষ্ণ খ্যাত কাহার ভবনে আছে॥
শুনি সে ধনী কহই বাণী সো কাঁহা ইঁহা আঅব।
বসুদৈবকী-সুত কৃষ্ণ খ্যাত কংস-রিপু মাধব॥
সোই সোই কোই কোই দরশনে মঝু আসা।
গোকুলচন্দ্র কহে যাও যাও ওই যে উচ্চবাসা॥

রামপ্রসাদ যে কখন এই গীতটির সমে ফাঁকে মৃদু চাপড়ে করতালি বাজিয়ে চলেছেন, সে খেয়াল ভারতচন্দ্র করেননি। গীত ফুরোলে তিনি হেসে তাকান প্রসাদের দিকে। প্রসাদও পুলকিত বয়ানে সে হাসির জবাব দেন। তারপর সামনে ঝুঁকে বলেন, কালীর বেটার দেখছি বৈষ্ণব তত্ত্বরসে মন উচাটন হয়েছে। এতো ভাল লক্ষণ নয়।

প্রসাদও মিটি মিটি হাসতে হাসতে কন, কী করব দাদা। তোমার বৌমাটি যে বহুদিন আমার সংস্পর্শে বাইরে।

ভারত, বাঃ বাঃ। কী বেমিলের অনুষঙ্গ উপস্থিত হল।

প্রসাদ, বেমিল!

ভারত, হ্যাঁ ভায়া। এই মাত্তর তুমি তোমার প্রিয়তমার থেকে দূরে গেলে, আর ঠিক এই মাত্তরই আমি তোমার বৌঠাকুরানীর ফাঁদে পড়তে চল্লাম।

প্রসাদ, বটে বটে। শুনি শুনি।

ভারত, ভাই, ওই আসরে বসে পরমানন্দে কৃষ্ণ লীলারসামৃত পান করছি আর আর্দ্র অবস্থায় প্রেমাশ্রু পাতন করে চলেছি। আমার প্রায় বিমোহিত অবস্থা। কিন্তু আমার অনুচরটির যে পেটে পেটে এত শয়তানি, তা তো জানতাম না। সেই রঘুনাথ, অর্থাৎ এখনকার সাজা বোষ্টম বাসুদেব আমার যাবতীয় খাস সমাচার রাখত। ফলে, সেই ষড়যন্ত্রী

আর নেমকহারামটি কল্লে কী—ওই খানাকুল গাঁয়ের মধ্যে প্রবেশ করে স্থানীয় ভট্টাচার্য বাড়িতে যেয়ে উপনীত হলে, আমার মোহিত অবস্থার সুযোগ নিয়ে। শালা বেইমান, নরাধম, কালামুখো।

প্রসাদ, কী মধুর গাল!

ভারত, হুঁ, তা ওই ভট্টাচার্যরা যে আমার শ্যালিকার বাড়ি, সে কথা ওই পাষণ্ডটি জানত। সে আমার শ্যালিকা আর ভায়রাকে গিয়ে খপর কল্লে। জানিয়ে দিলে আমার গতিপ্রকৃতি। খপর পেয়ে আমার শালীপতি তো তেড়ে ফুঁড়ে উঠল। তারা ওই ষড়যন্ত্রে উসকানি পেয়ে দল বাঁধলে। অর্থাৎ বাড়ির সমুদয় ভট্টাচার্যরা একত্র হল। তারপর দলবল নিয়ে ওই কীর্তনের আসরের বাইরে, অন্ধকারে ঘাপটি দিয়ে অপেক্ষা করে রইল। আর ওই নরাধম রঘুনাথ এসে আমার কানে কানে ফিসফিস করে বল্লে, প্রভু, একটিবার বাইরে চলুন। ভারি দরকারি কথা আছে। তা আমার তো সাদা মনে কাদা নেই। বলামাত্র কীর্তন ছেড়ে তফাতে এলুম। অমনি কারা যেন আমায় ঘিরে ধরল। তারপর কে একজন মহাপাষণ্ড আমায় কাঁধে তুলে নিলে। চেঁচাবো সে উপায় কী। তার আগে আমার মুখ বন্ধন হয়েছে। তারা দৌড়চ্ছে অন্ধকার আগান-বাগান বাঁশবন বরাবর। আমি বুঝতে পারছি না, আমার মতো বোষ্টম ভিখিরিকে লুট করে তাদের কী লাভ। ধত্তে পারছি না কোথা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমায়!

প্রসাদ, আহা, কী মধুর লুণ্ঠন!

ভারত, তারা যখন বাড়িতে নিয়ে ফেল্লে, তখন আমি বুঝতে পারলাম কোথায় এসেছি। হারামজাদা রঘুনাথকে একটি লাথি কষাব বলে চারধারে চেয়ে খুঁজি। দেখি, সে গুয়োর বেটা তফাতে দাঁড়িয়ে দন্ত বার করে হাসছে আর বলছে, নিত্যি নিরিমিষ্যি আর পচা আতপের হবিষ্যি খেয়ে খেয়ে জিভে মরচে ধরে গেল। এবার একটু মুখ ফেরাবো। নুচি, মাংস, তারপর রুই মাছের মাথা দিয়ে নিয়মভঙ্গ করব। আহা, কতকাল এসব জোটে না। হরিবোল, হরিবোল। সবই শ্রীকেষ্টর ইচ্ছে। আমি দন্ত কিড়মিড়িয়ে বল্লাম, নিমকহালাল, এহেশান ফরামোশ...।

প্রসাদ, বাঃ বাঃ। তোমার এই খাসা লবজের তারিফ করার মতো সেখানে তো কেউ হাজির ছিল না।

ভারত, তারপর কুটুম্বরা আমার সংস্কারের ব্যবস্থা কল্লে। আমার এতদিনের লালিত গোঁপ-দাড়ির নিপাত হল নাপিত ডেকে। আমার সাধের গেরুয়াবাস ফেলে উত্তম ধুতি-চাদর পরতে হল। 'মুনি গোঁসাই' থেকে খানিকপরেই আমি আবার ভারতচন্দ্রে নিপতিত হলাম।

প্রসাদ, সেই রূপেই তোমায় এখন দেখছি দাদা। তবে গোঁপ-দাড়িময় মূর্তিটি কেমন ছিল, তা খানিক আন্দাজ করতে পারি।

ভারত, হ্যাঁ তবে তোমার মতো এমন বাহার করে ছাঁটা গোঁপ-দাড়ির ব্যঞ্জনা নয়। সে ছিল পুরোদস্তুর জাঙাল মূর্তি। সে অবস্থার একখানা পট যদি আঁকিয়ে রাখা যেত, তাহলে অবস্থাটি বোঝা যেত।

প্রসাদ, তারপর কী হল?

ভারত, তারপর সে মহা হ্যাপা। তেনারা, মানে আমার কুটুম্বেরা আমায় নানাভাবে ও বাক্যে মস্তক ধৌতি করার ব্যবস্থা কল্লেন। তাঁরা বারংবার আমায় বলতে লাগলেন, চলো ভাই, পিতা-ভ্রাতাদের কাছে চলো। মনোভাব বদলে আবার সংসার-ধর্মে স্থিতু হও। কিন্তু আমার মন পুরোদস্তুর সায় দিল না। সংসার না হয় করা যেতে পারে, কিন্তু যে পিতা আর ভাইগণের জন্যে আমার এই বিড়ম্বনার জীবন তাঁদের কাছে যাওয়ার কোনও বাসনাই আমার হল না।

প্রসাদ, তাহলে তুমি ওঁয়াদের কী বললে দাদা?

ভারত, আমি সোজা-সাপটা বলে দিলাম, ভাল কথা। আপনাদের বিশেষ অনুরোধে আমি না হয় যোগসাধন ধর্মাচরণ ইত্যাদি পরিত্যাগ কল্লাম। কিন্তু যে পর্যন্ত বিষয়কর্ম দ্বারা অর্থ উপার্জন না করতে পারব, সে পর্যন্ত কোনওমতেই বাপ-ভাইয়েদের ঘরে যাব না।

প্রসাদ, ভাল কথা। ভাল সিদ্ধান্ত।

ভারত, তা ভায়রাভাইদের ঘরে বেশ কিছুকাল কতক শুয়ে বসে কাটানো গেল। নাম-কেত্তন আর নাগাড়ে আতপ অন্ন ভোগে জীবন পাত করা শুকনো দেহে নতুন পত্রোদ্‌গম হল। যাকে বলে শরীবের গত্তি লাগল। আর অমনি দিন দিন আমার মন হু হু করতে লাগল সংসারের মূল গোড়ায় যাওয়ার জন্যে। তোমার বউদিদির চাঁদ মুখখানি দেখার জন্যে আমি ভেতরে ভেতরে ভারি উচাটন হয়ে পড়লাম। তাকে সেই প্রথম আর শেষ দেখেছিলাম বিবাহ বাসরে। জানি না এতদিনে সেই আধো চাঁদ মুখখানি পূর্ণচন্দ্র হয়েছে কি না।

রামপ্রসাদ মিচকে মিচকে হাসি মুখে নিচু স্বরে গুন গুন করেন, ধৈর্য রহু ধৈর্যং রহু গচ্ছং মথুরায়ে...

ভারত আনমনা হাসি মুখে বলেন, কয়েকদিন পর, ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর ভায়রাভাই—অর্থাৎ আমাকে নিয়ে চল্লেন তাজপুরের পাশের গ্রাম সারদা গ্রামে। সেখানেই আমার শ্বশুর নরোত্তম আচার্যের বাড়ি। সেই ভবনের আবডালে রয়েছে আমার প্রাণপুত্তলি।

প্রসাদ, ধৈর্যং রহু ধৈর্যং রহু...

ভারত, আচার্য শ্বশুর মহাশয় বহুকাল পর তাঁর হারানিধি জামাতাকে পেয়ে আনন্দে বত্রিশখানা হয়ে পড়লেন। তিনি বলতে গেলে, আহ্লাদসাগরে নিমজ্জিত হলেন। এবং স্নেহের ভাঁড়ার খুলে দিলেন। অন্তঃপুরে আনন্দ কোলাহল উত্থিত হল। প্রতিবাসী প্রতিবাসিনীরা সকলে দলে দলে আমায় দেখতে এলেন। আচার্য ভবনে, যাকে বলে, চাঁদের হাট বসে গেল।

প্রসাদ, তা চাঁদে চাঁদে চন্দ্রগ্রহণটি কখন হল?

ভারত, সে বর্ণন সবটুকু তো তোমায় বলা যাবে না!

প্রসাদ, বেশ তো! কিঞ্চিৎ আড়াল দিয়েই বলো দাদা।

ভারত, বেশ কথা! তবে যতটুকু আড়াল না দিলে নয় ততটুকু। তাহলে পদে বলি না আপদে?

প্রসাদ, পদ ভিন্ন এমত বর্ণন কি মানায়।

ভারত, বেশ, তাহলে কিঞ্চিৎ বলি শোনো।

প্রসাদ কতক তটস্থ আর ভ্রূ কুঞ্চিত চেয়ে থাকেন ভারতচন্দ্রের প্রতি। ভারত ললিত কণ্ঠে বলে ওঠেন,

নৃপনন্দনে কামরসে রসিয়া।
পরিধান ধুতি পড়িছে খসিয়া॥
তরুণী ধরিয়া হৃদয়ে লইল।
নলিনী যেন মত্ত করী ধরিল॥
মুখ চুম্বই চাঁদ চকোর হয়ে।
ধনী বারই অঞ্চল ঝাঁপি লয়ে॥
কুচপদ্মকলি কবিরাজ করে।
ধরিতে তরুণী পুলকে শিহরে॥
নৃপনন্দন পিন্ধন-বাস হরে।
রমণী অমনি প্রিয় হাত ধরে॥
বিনয়ে করপদ্ম করে ধরিয়া।
কহিছে তরুণী করুণা করিয়া॥
ক্ষম হে পতি হে বঁধূ প্রিয় হে।
নবযৌবন জোরের যোগ্য নহে॥
রতি এমন কেমনে জানি কবে।
প্রভু আজি কর ক্ষমা কালি হবে॥
তুমি কারণে রণ-পণ্ডিত হে।
করুণা কর না কর পীড়িত হে॥

রামপ্রসাদ বিহ্বল স্বরে বলে ওঠেন, তুমি কামরণে কতখানি পণ্ডিত তা তো জানিনে। তবে কাব্য রসে যে পরমরসিক, তার ছিটেফোঁটা নমুনা পাওয়া যায়।

ভারত, মরে গেলেও আমি সে রজনীর কথা ভুলতে পা [illegible] না ভাই। আরও বলি, এই মুহূর্তে কবিতায় ধরি সাধ্য কী আমার।

প্রসাদ, তাও যা বল্লে, তার রসসম্ভোগ আর পাঁচজনার কাছে যে অক্ষয় হয়ে রইবে। কিন্তু তারপর? তারপরেতে হল শুনি।

ভারত টেনে একটি দীর্ঘ দম নেন। তারপর বলে ওঠেন, তারপর, তারপর কয়েক দিবস রভসরঙ্গে আর অশেষবিধ আমোদ প্রমোদে শ্বশুর সদনে কেটে গেল আমার। কোথা ছিলাম, কীভাবে ছিলাম এতকাল, সে সবই বিস্তৃত হয়ে গেলাম আমি। মনে হল, এ সংসারে বুঝি নিরলস আনন্দ সম্ভোগ ছাড়া আর কোনও কাজ নেই আমার। তারপর একদিন সে মত্ততা খানিক প্রশমিত হল। আমি আকাশ থেকে মাটিতে নেমে দাঁড়ালাম। আমার প্রিয়তম স্ত্রীকে বললাম, যদি আমার বাবা কিংবা দাদারা তোমাকে নিতে আসেন, তবে তুমি কোনওমতেই সেখানে যেও না।

প্রসাদ, তারপর?

ভারত, আর শ্বশুর মহাশয়কে বল্লাম, মহাশয়, আপনার কন্যাকে কখনওই আমাদের

বাড়িতে পাঠাবেন না। যদবধি আমি অর্থ আয় করে এনে আলাদাভাবে আলাদা একটি বাড়ি তোয়ের না করতে পারি, তদবধি এখানেই তাকে রাখবেন।

যে মাকে সাতসকালে একেবারে উদাস মূর্তিতে রক্তকরবী গাছতলের মাটি খুঁড়ে কী যেন তুলতে দেখেছিলাম সেই মা-ই কেমন বদলে গেল, না নিজেকে বদলে নিল, বাড়িতে এতসব লোকসমাগম দেখে, অতর্কিতে। গতরাতের ভয়ঙ্কর রাতজাগা তাণ্ডবের নমুনা—শুকিয়ে পাথরদানা চোখের জল আর থমথমে মুখময় বিরাজ করা কালসিটে, এ সবই মা মুছে ফেলল বাড়িতে এত মানুষ দেখে। ভাইটির নজর ভারি প্রখর। তাই সকলের জন্যে চা করে সবাইকে হাতে হাতে তুলে দিল। সঙ্গে ব্রিটানিয়া বিস্কুট। আমাদের মা লেড়ো বিস্কুট পছন্দ করে বলে তার জন্যে চায়ের সঙ্গে সেই ব্যবস্থা । মা বিস্কুট কৌটোয় তুলে রেখে শুধু চা নিল। কানুবাবার চা দোতলায় গেল দাদুর কাচের গেলাসি চায়ের সঙ্গে, রামশরণ কাকা মারফত!

ঠিক এমন কালে সদর দরজা দিয়ে এসে ঢুকলেন দাদুর পাড়াতুতো বন্ধু শৈলদাদু। এলাকার পুরনো মানুষ শৈলকুমার মুখোপাধ্যায়। টুকটুকে গায়ের রং। লুঙ্গি, গেঞ্জি পরা। টাকের এপাশ থেকে একগাছি লম্বা কাঁচা-পাকা চুল নিয়ে যত্ন করে মাথার ওপারে নামিয়ে দেওয়া। হাতে নস্যির ডিবে। ট্যাঁকে ময়লা রুমাল। আর হাতে একখানা পাতলা বই। শৈলদাদুর বুদ্ধিমানী গোল গোল চক্ষু চারদিকে ঘুর ঘুর করে। পরিবেশ পরিস্থিতি জরিপ করতে করতে, বাড়িতে নতুন লোকসমাগম দেখতে দেখতে তিনি সোজা দোতলায় দাদুর ঘরে উপনীত হন।

দাদু সবে চা খেয়ে গেলাসটি নামিয়ে রেখে নস্যির ডিবেয় দু'আঙুল ডুবিয়েছেন। শৈলদাদুকে দেখে স্বভাব মতো, আসতে আজ্ঞা হোক, আজ্ঞা হোক।

আমি জানি দাদুর সামনে এখুনি আসন পেতে দিতে হবে। আমি ঘরের আলনা থেকে একখানা আসন মেঝেয় পেতে দিই। শৈলকুমার গোল চক্ষু ঘুরিয়ে বলেন, হুঁ। পড়তে বসোনি। আর পড়বেই বা কী করে। এটা সংসার না হাট।

আমি কটাক্ষটির মানে ধরতে পারিনি। শৈলকুমার বসে পড়েন। দাদু শূন্যে গলা তুলে আমার মা'র উদ্দেশ্যে বলে ওঠেন, ওরে মিলা। তোদের কাকাবাবুর জন্যে চা।

শৈলকুমার গোল চক্ষু ঘোরাতে ঘোরাতে বলেন, মাস্টারমশাই, আপনি-আমিও মুখুজ্যে, আবার কমিউনিস্ট নেতা হীরেন মুখুজ্যেও তো তাই।

দাদু হেসে বলেন, কী হল দাদা? সক্কালবেলা হীরেনবাবুকে নিয়ে পড়লেন কেন?

—না পড়ে উপায় নেই। উনি একটি কাগজে ওনার জীবনী লিখছেন। আমি জানতুম ওঁদের পূর্বপুরুষ এই হালিসহরেরই লোক।

—কীরকম?

—এঁদের হালিসহরের মাটিতে নাড়ি পোঁতা প্রায় আড়াইশো বছর। অনাদিরাম মুখুজ্যে নামে এক ভদ্রলোক এঁয়াদের পূর্বপুরুষ। এই অনাদিরামের নাতি হলেন জানকিনাথ। তিনি খুব প্রতিষ্ঠিত আর নামজাদা ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর নামে এখানে একটা রাস্তাও আছে। তাঁর পুত্র হলেন তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়। এই পুরনো বারুইপাড়ার বাড়িতেই তাঁর জন্ম।

দাদু অবাক গলায় বলেন, তার মানে সাংবাদিক-সাহিত্যিক তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়!

—যথার্থ বলেছেন। ইনি বসুমতী-সাহিত্য মন্দিরেরর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। হালিসহরে জন্মালেও, একেবারে বালক বয়েসে কাকা সারদাপ্রসাদের সঙ্গে কলকাতায় চলে যান। পরে সেখানে বাড়ি করে বাস করতে থাকেন। সাংবাদিক, সাহিত্যিক হিসেবে বিস্তর নাম করেন।

দাদু মহা উৎসাহে বলে ওঠেন, আরে মশাই বসুমতী সাহিত্য মন্দির-এর গ্রন্থাবলী সিরিজের 'রামপ্রসাদ সেনের গ্রন্থাবলী' বইখানা আমার কাছে আছে। ওতে তিনকড়িবাবুর ভারী চমৎকার একটি ভূমিকা বা রামপ্রসাদের জীবনী দেওয়া আছে। শেষে নাম দেওয়া আছে, তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যনিধি।

—হ্যাঁ। এই সাহিত্যনিধি আর প্রসাদভক্ত তিনকড়ির একমাত্র পুত্র হলেন শচীন্দ্রনাথ। তিনি সেকালে বহু ইংরেজি খবরের কাগজের এডিটর, সাব-এডিটর ছিলেন। এই শচীনের ছিল সাতটি ছেলে। তাঁদেরই একজন হলেন এই হীরেন মুখুজ্যে। ডাকসাইটে কমিউনিস্ট নেতা। বাগ্মী। তারপব মাননীয় এম. পি. সায়েব।

—তাই তো। তাই তো।

শৈলকুমার গলা খাঁকারি দিয়ে বলেন, শুধু তাই তো বললে তো হবে না দাদা। এত বড় একজন মানিগন্যি মানুষ, কিন্তু নিজের দেশ নিয়ে কী অছেদ্দা। ইলেকশান-এর আগে হালিসহরের ক্রেগ পার্কে কতবার যে মিটিং করতে আসেন। বংশধরেরা কেউ কেরানি, কেউ মাস্টার। তারা গিয়ে গায়ে পড়ে দেখা করে। পূর্বপুরুষের ভিটেয় একটিবার যেতে বলে। তিনি এত ব্যস্ত যে, একবার বারুইপাড়া যাওয়ার সময় হয় না।

দাদু শুধু অবাক তাই তো, তাই তো বলেন। শৈলকুমার এবার হাতে ধরা পাতলা বই না পত্রিকাটির একটি পৃষ্ঠা খুলে পড়তে থাকেন, 'আমাদের দেশ হালিসহরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল নামমাত্র। চোখে দেখে এসেছি, গোটা পরিবারের সম্পত্তি নেহাৎ ফেলনা ছিল না। দুটো কচুরিপানায় ভরা পুকুর, অনেকটা জায়গা জুড়ে জঙ্গল (যার নাম ছিল বাগান), ছোট একটা দোতলা বাড়ি, বড় রোয়াক, একটা পাতকুয়ো ইত্যাদি। ইলেকশানের বক্তৃতা করতে হালিসহর গিয়েছি, সময় হয়নি, দুশ্চিন্তাও হয়নি বারুইপাড়ায় আমাদের পুরনো অবস্থানের খোঁজ নেওয়া সম্বন্ধে।'

দাদু চোখ বুজে শৈলকুমারের পড়ে যাওয়া শোনেন আ: : 'বটে, বটে' করেন।

শৈলদাদু আবার পড়তে থাকেন, 'আমার দাদু (তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়) ঢের বেশি মনের আবেগ নিয়ে প্রায় একই সময়ে বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের পক্ষ থেকে সম্পাদনা করেছেন রামপ্রসাদ সেনের রচনাবলী, হয়তো-বা-রামপ্রসাদ স্বগ্রাম হালিসহরের পরম গৌরব বলে শান্ত উদ্দীপনা নিয়েই করেছিলেন।'

শৈলকুমার পত্রিকাটি বন্ধ করে দাদুর দিকে বাড়িয়ে দেন। তারপর কষে এক টিপ নস্যি নিয়ে বলে ওঠেন, মাস্টারমশাই, যেটুকু পড়লাম, তার মধ্যে 'হয়তো-বা-রামপ্রসাদ স্বগ্রাম হালিসহরের পরম গৌরব বলে শান্ত উদ্দীপনা নিয়েই করেছিলেন' এই কথাটুকুর তলায় দাগ দিন।

দাদু চোখ খুলে বলেন, দিলাম।

শৈলকুমার চোখ কুঁচকে বলেন, রামপ্রসাদ সেন শুধুই হালিসহরের গৌরব! আবার সেখানেও হয়তো...। আর একটা কথা দাদা, আমি আপনার মতো পণ্ডিত নই বলে ভুল বললে মাপ করবেন।

—না না। আসল কথাটা বলুন দিকি।

—'শান্ত উদ্দীপনা' কথাটা দেখলেন! এ যেন সোনার পাথরবাটি।

দাদু হেসে বলেন, আসলে এই সব মহাপণ্ডিত আর বিলিতি কমিউনিস্টরা নিজের দেশ সম্পর্কে চিরকালই অছেদ্দা পোষণ করে আসছেন। এঁরা ভুল করে এই পোড়া দেশে জন্মেছেন। বাংলা না বললে কেউ এঁয়াদের বক্তৃতা শুনবে না, তাই কপচান। কিন্তু দিবারাত্র রাশিয়া আর ইউরোপের চোঁয়া ঢেকুর তোলেন। এঁদের ধরে ধরে এক্ষুনি এক ডোজ করে নেট্রাম ফস্ সিক্স এক্স খাইয়ে দেওয়া দরকার।

শৈলদাদু হেসে ফেলেন, তাহলে সবার আগে আমাদের পণ্ডিত নেহরুকে খাওয়ানো দরকার। উনি বড় দামি কমিউনিস্ট। মানুষ, মানে জনসমুদ্র দেখলে ভারী আবেগ উপস্থিত হয় ওঁয়ার। মঞ্চ থেকে ঝাঁপ দেন মানুষের মধ্যে।

দাদু গলা তোলেন, হুঁ, যথার্থ কথা বলেছেন! এই সেদিন অমৃতবাজারে শ্রী প্রকাশের একটি পোস্ট এডিটোরিয়াল পড়ছিলাম। বিষয়টা ছিল ভারতের প্রাইমিনিস্টারের সঙ্গে একটি দিন—বা ওইরকম কিছু। সেখানে এক জায়গায় লেখা হচ্ছে সকালবেলাকার ব্রেকফাস্ট টেবিলের বর্ণনা। নেহেরু টেবিলে বসেছেন। একটি গোটা মুরগির পেটের ভেতরকার নাড়িভুঁড়ি সব বার করে সেখানে মশলাপাত্র ভরে রোস্ট করে দেওয়া হয়েছে। ওদিকে বাবুর্চি কিচেন থেকে একটি একটি করে গরম গরম রুটি নিয়ে আসছে দৌড়ে দৌড়ে। ভয়ে তার বুক হিম। কেন না, সে জানে, একটি রুটি যদি কম গরম থাকে, তাহলে নেহরু গোটা প্লেট তুলে নিয়ে তার মুখে ছুঁড়ে মারবেন। এটাই নাকি আমাদের প্রধানমন্ত্রীর তরিকা।

বারান্দা বরাবর কানু বাবার দুপ্দাপ্ পদশব্দ। বাবা সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে দমাস করে বাথরুমের দরজা দেয়। ভাইটি মা'র কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে, অফিস যাবে খেয়ে, না না-খেয়ে?

মা কোনও উত্তর করে না। বারান্দা থেকে গৌর পিসিমা গলা তুলে বলে, আজ আবার আমাবস্যে। দুপুরে একটু নুচি খাবো। সঙ্গে একফোঁটা মিষ্টি হলেই হবে।

নিতাই কাকা গলা ছাড়ে, এ সংসার ধোঁকার টাটি, ও ভাই আনন্দ বাজারে লুটি...

ভাই মলয় ড্যাবা চক্ষে বলে, আনন্দবাজার নয়। অমরিতো বাজার। দাদু পড়ে।

সাঁইত্রিশ

সকালবেলা অকস্মাৎ একরাশ অতিথি চল্‌কানো আমাদের সংসারে যথারীতি হুড়োতাড়া, ডামাডোল। এক এক মানুষ এক এক রকমের। তার ওপর খাওয়াদাওয়ার রীতি প্রকৃতিও গোলমেলে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার, নিরিমিষ-আমিষ দুটি ভাগ। তার মধ্যে অমাবস্যা। সেখানেও ভোজনের গোঁত গুই পৃথক।

আগের রাতে বাবা-মায়ের তাণ্ডব সমাচার এখনও আমার মন থেকে গা তোলেনি। আমি কেবলই মা'র দিকে তাকাই। লক্ষ্য করি, মা কী অভিনয় পটু। ফোলা ফোলা দু'চোখ মুছে, মুখের কালসিটেয় চান করার সময় সাবান দিয়ে অনেকটাই পদস্থ হয়েছে।

ওদিকে কানুবাবা এক কাপ চাপ খেয়ে, চান করে, সাত সকালে ট্রেন ধরতে সাইকেলে রওনা হয়েছে স্টেশনে। বাড়িতে কারও হিম্মৎ হয়নি, খাওয়ার কথা ডেকে বলতে। শুধু নবাগতা গৌরপিসি একবার বলেছে, কী রে কেনো, না খেয়েই কাজে বেরুচ্ছিস যে!

বাবা জবরদস্ত কোঁকড়া ভিজে চুলে হাঁচড় পাঁচড় চিরুনি হাঁচড়াতে হাঁচড়াতে শুধু বলেছে, কেব্‌ল ফল্ট। কেব্‌ল ফল্ট।

এ কথাটির মানে হল, মাটির নিচে বয়ে যাওয়া টেলিফোনের তার বিগড়েছে। সেই অকুস্থলটি মাটির ওপর থেকে খুঁজে বার করতে হবে। তারপর মাটি খুঁড়ে মেরামত করবে বাবার অধস্তন লোকলস্কর। এই পুরো ব্যাপারটা সারতে বহু সময় নেয়। প্রায়ই কাজ চলে রাতভর। কখনও টানা ক'দিন।

আমি ধরে ফেলেছি, বাবা আজ বাড়ি ফিরবে হয় মাঝ কিংবা শেষরাতে। সেই দৃশ্যটার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। বিশেষ করে, বাবার টলমল টলমল রাতচরা মূর্তি। তাছাড়া, বাড়িতে যেদিন এরকম তুলকালাম ঘটে, বাবা সেদিন অফিস বেরোয় প্যান্টের পকেটে দ্রব্য নিয়েই। ফলে, সারাদিনমান অভুক্ত অবস্থায় প্রচণ্ড পরিশ্রমের দোয়ারকি নিট আগুন। কানুবাবার শরীরটা কী দিয়ে তৈরি?

বাড়িতে এত লোক সমাগম। অথচ আমি কেমন মনে মনে নিঝ্‌ঝুম একলা একলা ঘুরে বেড়াই। একধারে মা'র জন্যে, অন্যদিকে বাবা, এই দু'জন নিয়ে, এমনকী এর বাইরেও কী এক বাড়তি না-বুঝতে পারা মন খারাপ করা আমায় কী যে উচাটন করে। পাশের বাড়ির বন্ধু সুবলদের উঠোনে গিয়ে দাঁড়াই।

সুবল—আমার চেয়ে দু-আড়াই বছরের বড় হলেও কিছু যায় আসে না। দিব্যি বন্ধু আমরা। সুবলের মা, উন্মাদ দেবেন রায়চৌধুরীর তিন নম্বর স্ত্রী, আমাদের সম্পর্কে ঠাকুমা হলেও তাঁর ছেলে পরিতোষ ইত্যাদিদের আমরা কেন জানি কাকার বদলে দাদা বলি। কারণ, হয়তো তাহলে বন্ধু সুবলকেও কাকা বলতে হয়।

উঠোনের পাশে লালরঙা ডাব গাছে চড়েছে সুবলের মেজদা সন্তোষ বা সন্তুদা। নীচে জোড়া বলদ ভাই বিলু-গোপাল। তারা কাটারি হাতে ডাব-নারকোল ছাড়াচ্ছে জবরজং কাঁদির জটপালা থেকে। সেই সঙ্গে ছোট্ট ছোট্ট কচি মুচিগুলো কীরকম নির্মমভাবে ছিঁড়ে কুটে তছনছ করছে। বেচারিরা ডাব হতে পারল না। সুবলের বিরাট বপু মা, বৃদ্ধ বাবার তুলনায় প্রায় মেয়ের বয়সি, বার বারান্দায় সুমুখে দুটি গোদা পা মেলে দিয়ে নারকোল নাড়ু পাকাচ্ছে। এ বাড়ির হিসেব মোতাবেক আর সবার মতো ওনারও কথা আড়ষ্ট। তাছাড়া, কথা কইতে গেলে মুখ দিয়ে খপাত খপাত করে লালা পড়ে। পাড়ায় রটনা আছে, উনি ডাল, মাছের ঝোল ইত্যাদি রাঁধতে বসলে কেবলই ঝোল বেড়ে যায়।

এই ঠাকুমার নামটি ভবানী। কী অবাক মানানসই নাম, চেহারা চিত্তিরের সঙ্গে ভার ভারন্ত সয়ে। আমায় দেখে নাড়ু পাকানো কালো চুলো আর অতিকায় ঝকঝকে দন্তময়ী ঠাকুমা অকারণ উল্লাসে প্রায় কান অবধি হাসেন, এসো ভাই। এসো ভাই। ক'টা লাড্ডু খাও।

এই বলে দখিন হাতটি গড়ে রাখা নাড়ুর গামলায় খপাৎ করে ভরে দেন। তারপরেই সেই বহু পরিচিত মুদ্রায় হাতখানি কাঁপাতে কাঁপাতে ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে থাকেন। সেই

তুলন্ত অবস্থার ফাঁকে হাতের ফাঁদবন্দি বহু নাড়ু টুপ টাপ ঝরে পড়তে থাকে গামলায়। একটিও মাটিতে পতিত হয় না। হাতখানা যথাসম্ভব উচ্চে উঠে একসময় থমকায়। আর বহুবার দেখা, কী অবাক সেই থাবা করপদ্মে একটি, বড়জোর দুটি নাড়ু, তাও কাঁপো কাঁপো, পড়ি পড়ি।

আমার প্রতি ভারী হাতখানি প্রসারিত হয়, লাও ভাই লাও। লাড়ু খাও।

আমি হাত পাতি। লক্ষ্য করি, ওঁর ভিজে পুরু ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ঝুলঝুলুনি জিভ বেয়ে কতখানি খপাত হল। আসলে, এ স্থলে জল মিশলে ধরা একটু কঠিন। নাড়ু হল গদ্যজাতীয়। সেখানে মাছের ঝোল কিংবা পায়েসটায়েস হল নির্জলা কবিতা।

বাড়ির ভেতর বারান্দা থেকে সুবল বেরিয়ে এল। তার হাতে ইলেকট্রিক জাতীয় কাজ করার কিছু সরঞ্জাম। এখন মাটির মূর্তি গড়ার চর্চার ছেড়ে সে আধুনিক বিদ্যুৎ-এ। আমায় দেখে সদাই ছানাবড়া চক্ষে বলে উঠল, কী রে।

আমি দেরি না করে বলি, চল।

সুবল বারান্দা থেকে লম্ফ দেয়, কোতায়?

আমি কি ছাই জানি—কোথায়। তবে পথে বেরিয়ে, বাড়ির বন্ধ গুমোট মনটা হঠাৎ করে খানিক যেন খোলবার ছিদ্র পায়। বাইরে এতখানি আকাশ, হিজিবিজি থিকথিকে বুনো ঝোপ জাঙাল, প্রাচীন প্রাচীন অট্টালিকা, ভাঙাচোরা ফেলনা ভিটে, ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা তালগাছ, নারকোল, দাঁত খিঁচিয়ে থাকা ঝুমরো খেজুর সার, যত্রতত্র ভাঁট বন আর আমতলির নিঝুমত্ব এড়িয়ে, ডগডগে সটান মানকচুর ডগে রোদ ঝিমঝিম। ওই এক টুকরো রোদই আমায় তাড়িয়ে নিয়ে চলে এই সব বেশিরভাগ স্যাঁতসেঁতে ছায়া ছায়া আওতা এড়িয়ে।

দত্তপুকুরের পাড় কামড়ানো সরু চিঁড়ে মেটে পথ হয়ে, আদপে ময়মনসিংহি কবিরাজ মশাইদের প্রকাণ্ড চাতাল আর উঁচু নড়বড়ে পাঁচিলধারী অনেকখানি এলাকা নেওয়া অট্টালিকা। বাড়িটার গায়ে-মাথায় কত সব পরগাছা আর বট, অশ্বত্থ। ওঁরা এ বাড়িতে ভাড়া থাকেন। মালিক কে, জানি না। এখন ওখানে, সদর দরজার ওধারে মস্ত বাঁধানো উঠোনে প্রকাণ্ড এক ইটের উনুন বানিয়ে তার ওপর দশাসই বৃহৎ লোহার কড়াই চড়ানো। রমেশচন্দ্র কাব্যতীর্থ ভেষজরত্নর ডান হাতে খানদানি লৌহ খুন্তি। মাথায় ভিজে গামছা। বিদ্যেসাগরী টাকের পশ্চাতে অতিবৃহৎ শিখা পাকানো। নীচে গনগনে আম কাঠের আগুন। ওপরে, কড়াইয়ে বজবজ করে ফুটছে ঘোরালো কালোবরণ চ্যবনপ্রাশ। দত্তপুকুর থেকে ধেয়ে আসা দেদার হাওয়ায় কী চমৎকার আচার আচার কড়া গন্ধ খেলছে। আমাদের দেখে কবিরাজের বুড়ি মা, যিনি একটু তফাতে উবু হয়ে বসে ছেলের কার্যকলাপ দেখছিলেন, মুখ ভেঙে মধুর হাসেন। তাঁর কোঁচকানো চামড়া আর ছোট্টখাট্টো বিধবা আড়ার টঙে ফটফটে সাদা থান ঘোমটা। আর হাসির নেপথ্যে এখনও কী সজীব কিড়িমিড়ি দুধসাধা দন্তপাতি।

—কেডা রে? কানুর পোলা না! আর ওইড়া তো—

সুবল বলে ওঠে, আমি শ্রীসুবল রায়চৌধুরী। ভাল নাম সুশান্তোষ।

আমি কনুইয়ে ঠেলা মারি, সুশান্তোষ আবার কী!

সুবল বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ, সুশান্তোষ।

আমি মনে মনে অঙ্ক কষি, তাই তো, পরিতোষ, সন্তোষ, মহীতোষ ইত্যাদি খাস ভাইগণের নাম যাই হোক না কেন, শেষে একটি 'তোষ' অবধারিত। কিন্তু পিতামহতুল্য পিতা, একে উন্মাদ, দু'য়ে দেবেন্দ্রনাথ। জনসমাজে দেবনা পাগলা। আর মাতৃপক্ষে ভবানী।

বৃদ্ধা আবার কথা কন, যাস কই তরা?

আমি বলি, এমনি। এমনি।

এই বার দুই 'এমনি' বলায় ময়মনসিংহীর কোনও হেলদোল ঘটে না। তিনি তাঁর হাসি হাসি চক্ষু কটকটিয়ে বলেন, হেই দিন যে কালীমূর্তিটা গড়লি, সেইডা কী করলি?

হঠাৎ এ প্রসঙ্গাবতরণে আমি সামান্য নড়ে উঠি। সেই অবস্থাতেই বলি, বিসর্জন করে দিয়েছি। ক্ষিতীশ দাদুদের ডোবায়।

—বিসর্জন! বেশ, এইবার আমার জন্য একডা মনসা মূর্তি গইরা দিবি?

আমি মনে ভাবি, মনসা? সে আবার কেমন মূর্তি! কেমন ধারা দেখতে তাঁকে? আমার দ্বিধা বুঝি তাঁর চোখে ধরা পড়ে। ফলে তিনি দখিন হাতখানি কোলের কাছে তুলে আর আঙুলগুলো ভাঁজ করে একটি ফণা দেখান। আমি অবাক হয়ে দেখি, একজন বুড়ি মানুষের নিষ্কম্প হাতে কালনাগিনীর কী আশ্চর্য ফণা। অমনি মনেব ভেতরে তীব্র বিদ্যুৎ চিড়িক দেয়। সাত সকালে রক্তকরবীর শেকড় তুলন্ত মা'র বিষাদ মূর্তিখানা চোখে চাগাড় দেয়। রক্তকরবীর শেকড় আসলে সাপের আগল। ও গাছের কাছেও সাপ ঘেঁসে না।

ও বাড়ি ছেড়ে ডান হাতে দত্তবাড়ি। মুকুলদা'দেব মাঠ। ডাইনে ধীরেন বাঁড়ুজ্যে দাদুর ছড়ানো বাগান আর লম্বা ধাঁচের দোতলা অট্টালিকা। তারপর জঙ্গল, বাগান। বাগান আর জঙ্গলের রাজ্যপাট। বাঁয়ে চৌকোনা পুকুরের ওধারে ভয়ঙ্কর জঙ্গলগড়। তার মধ্যে অতি সাবধানে ডিঙিপাড়া কেস্ট কাকাদের পড়ো পড়ো কোঠা। কাঠের বেচা-কেনা করার কারণে তিনি এ তল্লাটে কাঠকেষ্ট নামে রটিত। আমাদের হালিসহরের এই এক আশ্চর্য রীতি। বেশ কিছু মানুষের নামের সঙ্গে এক এক রকমের উপাদান জুড়ে আড়াল থেকে তাঁকে খেপানো হয়। যেমন, সাইকেলে ঘণ্টার বদলি রিকশোর পঁক পঁক ব্যবহারী এক হরি দাদুর নাম 'হরিপঁক'। পূর্ববঙ্গী বৃদ্ধ মতিলাল মুখোপাধ্যায়ের খান্ডারনী স্ত্রীর নাম কেন যে 'মতিবাবুর ব্যায়লা' বা বেহালা, তা জানি না। তিনি কি সর্বদাই চেঁচিয়ে কথা বলেন বলে এমন পরিচিতি! দত্তপাড়ার কানে খাটো সনৎ মুখুজ্যে জ্যাঠামশাইয়ের বাঁ কানের ওপর মহলে মাথার সঙ্গে সাঁটানো বৃহৎ আব একটি। তিনি সদাই সাইকেলধারী। তাঁর নাম আবগাড়ি। বোধহয় আবগারি-র সঙ্গে কোনও সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে। আবার ভারী রহস্যময় 'কেলেজিরে বঁটির বাঁট' নামধারী অতি বৃদ্ধ, দশাসই কালো, খটমট ইংরেজি বাক্য তুবড়ি, সেই কবেকার সাবর্ণ চৌধুরী দিগরের বংশ লতাপাতার একজনা, হর রায়চৌধুরী। কেউ জিজ্যেস করল, কেমন আছেন জ্যাঠামশাই? ঘন গম্ভীর জবাব হয়, অ্যানিওয়ে ড্র্যাগিং।

দোলতলা, কাঁসারিপাড়া, বাজারপাড়া, বকুলতলা ইত্যাদি পেরিয়ে সদররাস্তা। ঠিক ওপারের চড়ওা মেটে পথের ওধারে নিগমানন্দ আশ্রম-এর চুড়ো। ওখানে মস্ত

শ্বেতপাথরের বেদীর ওপর ভারী চমৎকার শ্বেতপাথরেরই সুপুরুষ মূর্তি তাঁর। বামাক্ষ্যাপার সাক্ষাৎ শিষ্য তিনি। সংসারী নাম নলিনীকান্ত। হালিসহরেরই সন্তান। ওই জালিকাটা বেদীর নীচে তাঁর সমাধি আছে। সন্ধ্যা আরতির সময় ওপরে যখন প্রদীপ-ধূপ ঘোরে, নীচে জালিকাটার ওপারে আর একজন ব্যক্তির হাতেও সমান তালে আরতি ঘোরে। আশ্রমচত্বরে একখানা ঘরে চমৎকার বাহারি খাটের ওপর গদিয়ান বিছানা, বালিশ, তাকিয়া। ওপারে সটান দণ্ডায়মান রূপোর গড়গড়া। বিছানায় আলগোছে ফেলে রাখা গড়গড়ার নল। গভীর রাতে নাকি বাতাসে অম্বুরি তামাকের গন্ধ ভাসে। আর ও ঘর থেকে ভেসে আসে ভুড়ুক-ভুড়ুক-ভুড়ুক।

আর একটু এগিয়েই গঙ্গার ধারে হালিসহরের শ্মশান। প্রথমে বেড়াঘেরা কাঠঘর। তার পাশ দিয়ে সিধে পথ চলে গিয়েছে। ডান দিকে কানাই মান্নার মাইকের দোকান। গলি রাস্তার বাঁয়ে পুরনো এক কালীবাড়ি। সামনে চওড়া চওড়া বাঁধানো সিঁড়ি। নেমে গিয়েছে বেশ খানিক নীচে—ছড়ানো এলাকায়, একেবারে গঙ্গার কোলে। ওই হল শ্মশান।

নীচে চার খুপরি ভাগ করা চিলু। মাঝখানে বাঁধানো উঠোনে তুলসীমঞ্চ। এপাশে টানা সিমেন্টের বেঞ্চি। আর পুবধারে বারান্দাসহ মুড়িকোঠা বা শ্মশানযাত্রীদের প্রতীক্ষালয়।

এইমাত্র হরিণঘাটা থেকে একটি মড়া এল, বলহরি হরিবোল সহকারে। শ্মশান পুরুত আমাদের ফিঙে কাকা গাঁজায় দম দিয়ে লঘু পায়ে সিঁড়ি টপকায়। আধা সংসারী আধা শ্মশানী এই কাকা। শীর্ণ পাটকাঠি আড়ায় হেঁটো ধুতি আর গায়ে 'কালী কালী' নামাবলি। গলায় মোটা পৈতে। মুখময় গোঁফদাড়ি। মাথার দু'ধারে দুল দুলন্ত জটা। কথা প্রায় বলেনই না। দুপুরে আর রাতে কালকেতলা ফাঁড়ি লাগোয়া ভাইয়েদের ঘরে দু'টি খেতে যান মাত্র।

আমি দেখি আর ভাবি, সর্বদা এত শোকের মধ্যে বাস করার ফলে হয়তো তাঁর মুখে দুঃখ শোক আনন্দ—কিচ্ছুটি লেখা নেই। কীরকম একমেটে মুখাবয়ব।

বারান্দার বেলা গড়ানো কথোপকথনের নেপথ্যে ওই অন্দরের হেঁশেলঘরে আপাতত জোড়া মর্দর শ্রম বিড়ম্বিত রন্ধনকর্ম আর সুগন্ধ—দুটিই প্রবাহী। বাইরে সেই প্রাতঃকাল হতে বারান্দা বিহারী জোড়া পুরুষ রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র। হরিষ বিষাদময় ভারত জীবন তরঙ্গ এখানে গুঞ্জরিত হচ্ছে নিভৃতে কিংবা পাঁচজনার অলখে। আসলে বুঝি কথা বুননে আর রন্ধনে একই তরিকার গন্ধ থাকে। এ কথা এইমাত্র সেনজ রামপ্রসাদের মনে হল। মনে হল, তাঁর কাছটিতে বসে থাকা ওই কবি ভারত কী আশ্চর্য গন্ধবাহী এক কথা কুসুম বুঝি। এমন কারিগর তাঁর যাবতীয় কারিগরী বিদ্যা সরিয়ে রেখে একসময় নিজেই আস্ত একখণ্ড কথা হয়ে দাঁড়ান। সেই বিমূর্ততার কোনও অবয়ব থাকে না। যা থাকে, তার অপর নাম বুঝি শুধুই সুগন্ধ।

রামপ্রসাদ অন্যমনস্ক বলে ওঠেন, তারপর?

ভারতচন্দ্র একটি শ্বাস মোচন করে কথা আরম্ভ করেন, শ্বশুর মহাশয়কে, সত্যি বলতে কী, বিদায় নেওয়ার সময় চ্যাটাংচ্যাটাং কথা বলে আসবার কালে আমার একটুকুনও খারাপ লাগেনি মনে। কেন না, আমার মন জুড়ে তখন বিরাজ করছিল, বহুকাল পরে

নাগাড়ে এই ক'টি দিন নিমজ্জিত ছিলাম যাতে, সেই আমার রমণী-সখী। আমার সাক্ষাৎ ধর্মপত্নী হলেও তার অতীত সে আমার একমাত্র সখী সহচরি। তোমায় বলতে শরম হলেও বলি, এ এক আশ্চর্য রমণী, যাকে নাগাড়ে চুম্বন করে গেলেও মুখ হতে নিঃসৃত লালায় কোনও বদগন্ধ হয় না। বরং, যত মুখপদ্ম পান করি, ততই পদ্মগন্ধ উলসে ওঠে। সেই গন্ধের ঘোর আমায় তাড়িয়ে নিয়ে চলল। আমার চিরকেলে ঘর উদাসী চরিত্র সেই মাতনে পড়ে এগিয়ে গেল।

প্রসাদ একটি ভারী শ্বাস ফেলে বলে ওঠেন, হরি হে মাধব, চান করব না গা ধোবো।

ভারত হেসে ফেলেন, বুঝতে পারছি ভায়া। ঘরে রেখে আসা রমণীরতনটির জন্যে তোমার কতখানি উচাটন হল। সে জন্যে বুঝি আমিই দায়ী।

প্রসাদ, তাহলে আমার গৃহিণীটি তো এখন প্রোষিতভর্তৃকা।

ভারত, কুতশ্চিৎ কারণাদ্‌যস্যা বিদুরস্থো ভবেৎ পতিঃ। তদসঙ্গম দুঃখার্তা ভবেৎ প্রোষিতভতৃকা॥

প্রসাদ, অস্য অর্থ, কোনও কারণ বশতঃ যে রমণীর স্বামী দূর দেশবাসী হয়, তার অসঙ্গম কারণে দুঃখেতে কাতরা যে নারী, তার নাম প্রোষিতভর্তৃকা। তাই তো দাদা।

ভারত. আঠারো আনা ঠিক ভাই। তোমার অবস্থাটি এখন তদ্রূপ। ঠিক আমার তখনকার হালতের মতো।

প্রসাদ, তবে দাদা, অপরাধ না নিলে বলি, এ বিষয়ে তোমাতে আমাতে কিঞ্চিৎ তফাৎ আছে।

—কীরকম, শুনি।

— তুমি দাদা বাস করো রাজার কোলের কাছটিতে। আর আমি সদাই রাজ হতে শত হস্ত দূরে, গ্রামদেশে, নিজ ঘরে।

ভারত হাসেন, হয়তো সে কারণেই তোমার-আমার বিরহবাস কিঞ্চিৎ তফাত। কে জানে, হয়তো বা ঠিক।

প্রসাদও হাসেন, আসলে দাদা. যে যেমন পোড়ে, সে তেমন বোঝে।

ভারত, এ নিয়ে তর্ক সভা বসালে আমার জীবনের গপ্পোটা যে ফুরোবে না।

প্রসাদ এবার জিভ কাটেন সামান্য, ঠিক দাদা, ঠিক। তুমি বলো। আমি শুনি।

ভারত বলা আরম্ভ করেন, তা, ওখান হতে বিদায় নিয়ে আমি চলে এলাম সিধে ফরাসডাঙায়। আমার কাছে খপর ছিল, ওখানকার ফরাসি সরকারের দেওয়ান শ্রীল শ্রীযুত ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয় ভারী সদাশয় ব্যক্তি।

প্রসাদ, হ্যাঁ দাদা, আমি শুনেছি এই মহাশয়টি বিখ্যাত ধণাঢ্য আর শ্রোত্রিয় পালধি বংশজ।

ভারত, যথার্থ শুনেছ। তা আমি তাঁর কাছে উপনীত হয়ে নিজ পরিচয় প্রদান কল্লাম। তারপর অতিশয় কাতরতা সহকারে সবিনয়ে নিবেদন কল্লাম, মহাশয়, আমি আপনার আশ্রয় নিলাম। শরণাগত হলাম। এখন যে প্রকারেই হোক, সদয় হয়ে আশ্রয় দিয়ে আমাকে প্রতিপালন করতে হবে। চৌধুরী মহাশয় আমার বিদ্যেবুদ্ধির পরিচয় পেয়ে, আমার পুরাতন ও বর্তমান অবস্থার সমুদয় বিষয় জানতে পেরে এবং আমার স্তবে

অতিশয় সন্তুষ্ট হয়ে আমায় আশ্বস্ত করলেন। বললেন, তুমি অতি যোগ্য এবং প্রধান বংশের মানুষ। অতএব তোমার উপকার করা আমার অবশ্য কর্তব্য। তা, ভাল কথা, তুমি এখানে থেকে কিছুদিন অপেক্ষা করো। আমি কিছু একটা বিহিতের চেষ্টায় রইলাম। এখন সুযোগ যুক্ত সময় পেলে ও কোনও বিষয় উপস্থিত হলে তোমার মঙ্গল সাধনে কখনই সাধ্যের ক্রটি করব না। এ প্রকার করুণাকর অনুকূল বচনে আমার মানস মুকুল, যাকে বলে, আনন্দমকরন্দভরে প্রফুল্ল হল।

প্রসাদ, দাদা গো, একেই বলে মিষ্টি কথায় চিঁড়ে ভেজানো। তোমার অমন মিঠে বদনে মিঠে কথা শুনলে মহা পাষণ্ডেরও প্রাণ গলে যাবে। তাছাড়া কথার কী বাঁধুনি! পদে আপদে কী অলঙ্কার!

ভারত, যতই ঠেস মারো আর আড়ে আড়ে কথা কও, যা সত্যি, তা তো আমায় বলতেই হবে।

প্রসাদ, আসলে দাদা, গুরু মোতে দাঁড়িয়ে আর শিষ্য মোতে পাক দিয়ে।

ভারত, আমার তো তেমন কোনও গুরু নেই ভায়া।

প্রসাদ, তোমার গুরু তোমার নিয়তি দাদা। কে খণ্ডাবে তাকে। এখন যদি শিরে সর্পাঘাত হয়, তাহলে তাগা বাঁধবে কোথা!

ভারত, বেশ কথা। তাহলে এবার সেই সর্পাঘাতের বিবরণ শোনো, বলি।

প্রসাদ, বলো বলো। বিষের ঝাঁঝ কেমন একটু দেখি।

ভারত, সে সময় চৌধুরী মহাশয়ের জাতি সম্বন্ধীয় কোনওপ্রকার অপবাদ ছিল। সে কারণে আমি তাঁর বাসায় না থেকে ওলন্দাজ সরকারের দেওয়ান, গোন্দলপাড়া নিবাসী রামেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে যেয়ে উঠলাম চৌধুরী মহাশয়েরই বন্দোবস্তে। সেখানেই আমার ঠাঁই হল। আহারাদিরও ব্যবস্থা হল।

প্রসাদ, মুখুজ্যে মুখুজ্যেতে মিলল ভাল। একেবারে কাঠে কাঠ পড়ল।

ভারত, তা সেখানে বাস করে দিব্য সুখেই রইলাম। কিন্তু বিনি কর্মে এমনি এমনি বসে থাকার বান্দা তো আমি নই ভায়া।

প্রসাদ, হুঁ, মুকুটি কুটিল অতি, বন্দ্যোবাটি সাদা, সবার মাঝে বসে আছেন চট্টো হারামজাদা।

ভারত, না না, একটু সেরেসুরে নিতে হবে যে।

প্রসাদ, কীরকম?

ভারত, ওই বন্দ্যোবাটি সাদার স্থলে হবে গাধা, আর হারামজাদার ক্ষেত্রে মহারাজা।

রামপ্রসাদ করতালি দিয়ে বলে ওঠেন, যত লড়াই যুদ্ধ বামুনে বামুনে। আমাদের অবামুনের মধ্যে বাপু এমন খেয়োখেয়ি নেইকো।

ভারত বলে যান, আমার নিত্যকর্ম আমি নিজেই স্থির করে নিলাম। প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় চৌধুরীবাবুর কাছে যেয়ে উমেদারি করতে লাগলাম।

প্রসাদ, উমেদারি না বলে উপাসনা বল্লেই ভালো।

ভারত, তা তুমি তোমার পছন্দ মতো সাজিয়ে নাও না। এইপ্রকার নিত্যি উপাসনায় তোমার কথা অনুযায়ী চিঁড়ে আরও ভিজল। আমার প্রতি আশ্রয়দাতার স্নেহের আধিক্য

বাড়তে লাগল। একদিন বুঝি সুযোগ বুঝি উপস্থিত হল। এ কথা-সে কথার পর চৌধুরী মহাশয় আমায় বল্লেন, ভারত, আমি তোমাকে ফরাসির ঘরে এখনি একটা কর্ম করে দিতে পারি। কিন্তু তাতে করে তোমার কিছুমাত্র সুখোদয় হবে না। কারণ, তোমার গুণের গৌরব গোপন রইবে। আমি তোমার জন্যে একটা প্রধান উপায় স্থির করেছি। নবদ্বীপের অধিরাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সঙ্গে আমার বিশেষ সখ্যতা আছে। তিনি দুই চার লক্ষ টাকা কর্জ করার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে আমার নিকট এসে থাকেন। এবারে তিনি যখন আসবেন, তখন আমি তোমায় তাঁর হস্তে সমর্পণ করে দেবো। তুমি যেমন গুণী ব্যক্তি, তিনি সেইরূপ গুণগ্রাহক। সেই স্থান তোমার পক্ষে যথার্থরূপ উপযুক্ত বটে।

প্রসাদ, কবি কালিদাস বলছেন, যত্র সুখেন বর্ততে তদেবস্থানম্। যে স্থান সুখে বাসের যোগ্য, সেখানেই বাস করবে।

ভারত, কিন্তু আমার হল উল্টো ব্যাপার।

—কী ব্যাপার?

ভারত, ঘুঁটে কুড়ুনির বেটা মোড়ল হয়েছে। হাঁটতে না পেরে পালকি চেয়েছে।

আটত্রিশ

প্রসাদ, না দাদা। এটা যথার্থ বিচার হল না। তুমি তো আর যেচে মোড়ল হওনি, আবার পালকিও চাওনি। তোমার ঠাঁয়ে সবই উবজিয়ে এল।

ভারত, তা যা হোক, চৌধুরী মহাশয়ের এই বচনে আমি বারিদ-বদন-বিনির্গত-বারিবিন্দু-পতন প্রত্যাশী চাতকের পানা মহারাজের আগমনের প্রতি প্রতিক্ষণ করতে লাগলাম। একদিন প্রাতে চৌধুরী সভায় বুঝি সত্যি সত্যিই দিবসেতে চন্দ্রোদয় হল। আমি তখন সেখানে বসেছিলাম। এমতো সময়ে, বলতে গেলে দৈবাৎ, প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় সেখানে শুভাগমন করলেন। চৌধুরী মহাশয় গাত্রোত্থান করে যথাযোগ্য সম্মান সহযোগে রাজাকে আসনারূঢ় কল্লেন। তারপর দু'জনায় কথা চলাচালি, বহু বাক্য বিনিময় চলতে লাগল। আমি অদূরে বসে বসে সে সকল শুনে ধন্য হতে লাগলাম। এক সময় হঠাৎ মহারাজার নজর পড়ল আমার প্রতি। তিনি আমায় কিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণ করে চৌধুরী মহাশয়কে বল্লেন, ইটি কে? একে তো আগে আপনার এখানে দেখেছি বলে মনে করতে পারছি না।

প্রসাদ, কালিদাস বলছেন, সৎসঙ্গঃ স্বর্গবাসাঃ। সাধুসঙ্গ স্বর্গবাস তুল্য। সবই চৌধুরী মহাশয়ের মহিমা।

ভারত, চৌধুরী মহাশয় তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, মহারাজ, আমার একটি নিবেদন আছে। এই ভারতচন্দ্র আমার অতি আত্মীয় ব্যক্তি। ইনি অমুক অমুকের সন্তান। ইনি সংস্কৃত জানেন, পারস্য জানেন, কবিতা শক্তিও ভাল আছে। অধুনা দীনাবস্থায় অতিশয় ক্লেশ ভোগ করছেন। যাতে করে প্রতিপালিত হন, এমতো অনুগ্রহ বিতরণ করতে আজ্ঞা হোক।

প্রসাদ, কালিদাস উবাচ, সানুক্রোশং ভর্তারমাজীবেৎ। দয়াবান প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করে জীবিকা অর্জন করা উচিত।

ভারত, মহারাজ বল্লেন, তথাস্তু। তবে আমি এইক্ষণে কলিকাতা যাব। সেখানে কালীঘাটে কালী দর্শন করে তৎপরে কৃষ্ণনগরে প্রত্যাগত হব। ইনি যেন তথায় গিয়ে আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

রামপ্রসাদ তাকান ভারতের মুখ পানে। সে মুখভাব এখন পরিতৃপ্ত অথচ কোথায় যেন মেঘের আভাসটুকু জেগে আছে। প্রসাদ বলেন, কী ভাবছ দাদা?

ভারত আনমনে বলেন, কী জানি।

প্রসাদ হেসে কন, তাহলে আমি বলি।

ভারত, বলো। তবে সুরে বলো।

প্রসাদ, মন হারালি কাজের গোড়া।
তুমি দিবানিশি ভাবছ বসি কোথায় পাবে টাকার তোড়া॥
চাকি কেবল ফাঁকি মাত্র শ্যামা মা মোর হেমের ঘড়া।
তুই কাঁচ-মুলে কাঞ্চন বিকালি ছি ছি মন তোর কপাল পোড়া॥
কর্মসূত্রে যা আছে মন কেবা পাবে তার বাড়া।
মিছে এদেশ-সেদেশ করে বেড়াও বিধির লিপি কপালজোড়া॥
কাল করছে হৃদয়ে বাস বাড়ছে যেন শালের কোঁড়া।
ওরে সেই কালের করো বিনাশ ন্যাস ধরো রে মন্ত্র সোঁঢ়া॥
প্রসাদ বলে ভাবিছ কি মন পাঁচ সওয়ারের তুমি ঘোড়া।
সেই পাঁচের আছে পাঁচ পাঁচি তোমায় করবে তোলাপাড়া।

প্রসাদী গীত শুনে ভারতচন্দ্রের মুখের মেঘ ছটা আস্তে আস্তে প্রশমিত হয়। সে মুখমণ্ডলে এখন আশ্চর্য স্নিগ্ধ প্রশান্তি আর জটিলতা।

প্রশান্তির সহবাসী জটিলত্ব, সে ভারি আজব তত্ত্ব। আসলে শ্রীরামপ্রসাদ গীত এইমাত্র গানখানি কোথাও কোথাও ভারি অগম রহস্যধারী ইশারা সঙ্কুল। যেন বা গূঢ় কোনও অন্ধকারের এপার ওপার নিথর। তবু মনে হয়, এই দুই তমসার মধ্যবর্তী অঞ্চলে কিঞ্চিৎ আলো থাকলেও থাকতে পারে। সে আলো এমনই ভারি আর পুরু ঘষা কাঁচ যে, কোনও প্রাণীর চক্ষু তাকে বিঁধতে পারে না। সহজে কোনও সিদ্ধান্তে আসা যায় না। অথচ অস্বীকারও করা যায় না।

গর্ভান্তর্জ্ঞানসম্পন্নং প্রেরিতং সুতিমারুতৈঃ।
উৎপন্নং জ্ঞানরহিতং কুরুতে যা নিরন্তরম্॥...

মাতৃগর্ভ মধ্যে অবস্থিত সজ্ঞান শিশু প্রসূতিবায়ু দ্বারা প্রেরিত হয়ে ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র যিনি তাকে নিরন্তর জ্ঞানরহিত করেন, যিনি পূর্বাপর জন্মের যাবতীয় সংস্কাররাশি দ্বারা জীবনের প্রথম দিনেই মানুষকে আবদ্ধ করে জ্ঞাননাশক মোহ আর মমত্ব দ্বারা আচ্ছন্ন করেন, যিনি জীবকে ক্রোধ, উপরোধ ও লোভে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ পূর্বক পশ্চাৎ কামাসক্ত করে অহর্নিশি চিন্তাযুক্ত, আমোদনিরত ও বাসনাসক্ত করেন, সেই জগদীশ্বরীই এই কারণে মহামায়া নামে অভিহিতা।

এ পর্যন্ত মনে হলেও ভারতের মনে প্রসাদী এই গীতখানিব রহস্য সন্দর্ভের কোনও সিধে বিমোচন হয় না। কেন না দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী ইত্যাদি যত নামই রটিত হোক না

কেন, প্রসাদী তত্ত্ব মোতাবেক তা যে আসলে নিরাকারা এক কবিতা, এ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে মনে। এই কবিতা দেব্যা বস্তুত আখরময়ী হলেও তা আদপে বুঝি অঘটন-ঘটন-পটীয়সী নিরাকারা ব্রহ্মাত্মিকা শক্তি। সেই শক্তি একাধারে সৃষ্টি ও সংহার করেন। তিনি সাঙ্খ্যভাষার মতো নির্গুণা। কবিতা শুধু পাঠ করার নয়, চোখের ভিতরকার চক্ষু দিয়ে আপন মনে দেখবার বিষয়। সত্যি সত্যিই সে রামপ্রসাদী বচনে, হেমের ঘড়া।

ভারত মনে মনে উচ্চারণ করেন এইমাত্র গীত গানখানির অংশ, চাকি কেবল ফাঁকি মাত্র শ্যামা মা মোর হেমের ঘড়া। তুই কাঁচ মূলে কাঞ্চন বিকালি ছি ছি মন তোর কপাল পোড়া॥

তার পাশাপাশি, এই কবিতা ও কালিকের সঙ্গে সঙ্গে ভারতচন্দ্রর মন চলে যায় প্রাচীন মহাকবি জয়দেবের শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম-এ। সেখানে রাধা-কৃষ্ণের লীলাবর্ণনে পুরুষ ও প্রকৃতির স্বাভাবিক জীবন-গাথা। কিন্তু তবু এই কৃষ্ণ পুরুষোত্তম ও বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধা সতীর গুপ্ত কেলি কেমন করে যে ভগবদ্‌ভক্তিপরায়ণ মহাত্মাগণের হৃদি মন্দিরে কুঁড়োজালির মালা জপের ভঙ্গ-বিহঙ্গে বিশুদ্ধ দৈব ভাবানুরাগ প্রস্ফুরিত করে, সেইটিই ভাবনার বিষয়। যেখানে দেহ এক বিষম ব্যাপার, সেখানে দেহাতীত শুদ্ধা-ভক্তি বস কেমনে প্রগাঢ় হয়! ভারত তাঁর সহধর্মিনীর সঙ্গে এই সেদিন রমণীয় নিশিযাপনের কোনও তফাৎ খুঁজে পান না। তাহলে দেবতা আর দেবী কাকে বলে? তবে কি সাধকের বচন কামজয়, এও কি এক ছলকারী চোখ ঠারা? জীবনের বাস্তবে কি তা সম্ভব?

অতএব জয়দেব উবাচ,

বসন্তে বাসন্তীকুসুমসুকুমারৈরবয়বৈ—
র্ভ্রমন্তিং কান্তারে বহুবিহিতকৃষ্ণানুসরণাম্।
অমন্দং কন্দর্পজ্বরজনিতচিন্তাকুলতয়া
বলদ্বাধাং রাধাং সরসমিদমুচে সহচরী।।

একদা বসন্ত ঋতুতে রাধারাণী শ্রীহরির অনুসরণ করতে করতে, বসন্তকুসুমবৎ তাঁর কোমল দেহলতিকা পথচযায় ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তিনি মদনযাতনাজনিত চিন্তায় ভারি কাতর হওনে তাঁর প্রেমজ্বালা দ্বিগুণতর বেড়ে উঠল। সেই কালে কোনও এক সখী রাধার হাল দেখে তাঁকে মধুর মধুর কথা কইতে বসলেন।

প্রসাদ কন, কী হল দাদা। মুখে কথা নেই কেন!

ভারত, তোমার গান শুনে।

প্রসাদ, কী এমন গান, যা তোমার বাক্যি হরণ করে বসল!

ভারত, শুধু হরণ করল না। মনে মনে বিস্তর প্যাঁচ খেলাল।

প্রসাদ অবাক স্বরে বলেন, প্যাঁচ!

ভারত গম্ভীর বদনে বলেন, হ্যাঁ, তোমার কালীঠাকবানি থেকে একেবারে শ্রীকৃষ্ণ-রাধাসতীতে।

প্রসাদ কুতুহলী হয়ে বলেন, বলো বলো। একটুখানি শুনি।

ভারত একটি হাত সুমুখে তুলে বলে ওঠেন,

জলদপটলদিন্দুবিনিন্দকচন্দনতিলকললাটম্।

পীনপয়োধরপরিসরমর্দননির্দয়হৃদয়কবাটম্॥

প্রসাদ সোল্লাসে বলে, শ্রীজয়দেব যে!

ভারত মিটি মিটি হাসতে হাসতে কন, রাধাসতী বলছেন, তিনি যে সময়ে নিষ্ঠুর হৃদয়ে পীন কুচ মর্দন করতেন, হায় সখী! সে সময়ের সেই মধুরভাব এখনও আমার হৃদিমন্দিরে স্মরণ হচ্ছে।

প্রসাদ, আর একটি বলো দাদা। খিদেটা দিব্য চনমনাচ্ছে।

ভারত বলেন,

কিশলয়শয়ননিবোশিতয়া চিরমূরসি মমৈব শয়ানম্।

কৃতপরিরম্ভন চুম্বনয়া পরিরভ্য কৃতাধরপানম্॥

প্রসাদ, অর্থটা আমি কই। প্রিয়সখা আমাকে বনপল্লবশয্যার ওপর শয়ন করিয়ে আমার বিশাল বক্ষে বহুক্ষণ পর্যন্ত শুয়ে রইবেন। আমি আলিঙ্গন সহ চুম্বন করলে তিনিও আমার অধরামৃতপানে প্রবৃত্ত হবেন।

ভারত, আবার শোনো,

কোকিলকলরবকূজিতয়া জিতমনসিজতন্ত্রবিচারম্।

শ্লথকুসুমাকুলকুন্তলয়া নখলিখিতঘনস্তনতারম্॥

প্রসাদ, আমি কোকিলের মতো কুহুরবে ধ্বনি দিলেই অমনি প্রাণনাথ আমায় কামশাস্ত্রবিচারে পরাভূত করবেন। আমি কেশপাশ এলিয়ে দেওয়া মাত্র কেশরাজি থেকে ফুলের গহনা চারিদিকে বিকীর্ণ হয়ে পড়বে। এধারে সখাও আমার পীনোন্নত স্তনযুগে নখরাঘাত করবেন। দাদা গো, আর সইতে পারা যাচ্ছে না। জয়দেব কবির বর্ণনায় রাধারানীর কৃষ্ণ ছিলেন। তিনি গোপীজন বল্লভ। কিন্তু আমার তো সবেধন একমাত্র সর্বাণী। কতকাল যেন তার ছায়া মাড়াইনে।

ভারত, ও কথা বলতে নেই ভায়া। শ্রীকৃষ্ণ সব বেটাছেলের সেরা বেটাছেলে। অর্থাৎ পুরুষোত্তম।

—তাঁর খিদে থাকতে পারে, আমাদের থাকা অপরাধ!

—ওটি ক্ষুধা নয়, লীলা। তোমার-আমার হলে প্রকাশ্যে কী লজ্জা, কী লজ্জা।

প্রসাদ, তবে আমাদের দেশের পোড়াকপালী বেচারি বালিকা কিংবা যুবতী বিধবাদের জন্যে ওই পুরুষোত্তমটি পরোক্ষে মহা উপকার করেছেন। তা না হলে কী যে হত সংসারে। তবে কবি শ্রীজয়দেবকে শতকোটি দণ্ডবৎ। কী অনবদ্য রচনা। তেমনি সুরারোপ আর তাল বিক্ষেপ।

—হুঁ, সমাজে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই হতভাগিনীদের কাছে প্রিয়তম পুরুষ। যাঁরা তাঁকে গ্রহণ করতে পারেন না তাঁরা ভ্রষ্টা কুলটা হন। এ বড় কঠিন পরীক্ষা ভায়া।

প্রসাদ, হ্যাঁ, পরীক্ষাই তো। তবে প্রতীকী। বাচস্পতি মশাইয়ের বালবিধবা পুত্রবধূটি নেলো বাগদীর সঙ্গে লুকিয়ে বাঁশবনে মিলিত হলে তাকে পতিতা বলে ভূষণ দেয় সমাজ। আসলে পুরুষ হল সোনার আংটি। সে যত বেঁকাই হোক না কেন।

ভারত, শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় পবিত্র তুলসীপত্রে ভাই। তুলসীতে পোকা লাগে না।

প্রসাদ, দাদা, এবার ফেরো তো দিকি। রাধা-কেষ্ট ছেড়ে তোমাতে এসে। তোমার

জীবলীলাটি ভারি কম নয়কো। রাজা কেষ্টচন্দ্রের সঙ্গে কবে সাক্ষাৎ হল এই কেষ্টনগরে, সেই বৃত্তান্তটি বলো।

ভারতচন্দ্র মলিন হাসেন। তারপর বলে চলেন, রাজা আদপে কলকেতায় গেছিলেন নেহাৎ কালীদর্শনে নয়। মুরশিদাবাদের নবাব, ফরাসি, ইংরেজ কুঠিয়াল, কৃষ্ণনগরের রাজাসন, ঋণভার, বর্গী, নানা বিষয় নিয়ে ওখানে কিছু বাঘা মানুষদিগের সঙ্গে তাঁর কিছু আলাপ-আলোচনা ছিল।

প্রসাদ, হ্যাঁ দাদা, কথায় বলে—কলকেতার মাটি কথা কয়। হোক না বুনো জাঙালপূর্ণ।

ভারত, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কলকেতা হতে ফেরবার ক'দিন আগে থেকেই আমি সেথায় গিয়ে অপেক্ষা করছিলাম। তারপর একদিবস তিনি রাজধানী এলেন। আমি যেয়ে দেখা করা মাত্র তিনি আমায় রাজসভায় নিযুক্ত কল্লেন।

প্রসাদ, মহারাজের ক্ষিপ্রবুদ্ধির কোনও তুলনা নেই।

ভারত, আমার বেতন ধার্য হল মাসে চল্লিশ টাকা। একটি বাসা দিলেন থাকার জন্যে। আর আমায় বল্লেন, তুমি প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় এসে আমার সহিত সাক্ষাৎ করবে। তা আমি সেই আদেশ মোতাবেক নিয়মিত রাজসভায় হাজির হই। মধ্যে মধ্যে দুই এক কবিতা রচনা করে রাজাকে শোনাই। এই করতে করতে দিন যায়। দিন কাটে। একদিবস রাজা আমার কবিতা শুনে ভারী প্রফুল্লিত হয়ে আমায় 'গুণাকর' উপাধি প্রদান কল্লেন।

প্রসাদ, বাঃ। কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। বলিহারি।

ভারত, রাজা বল্লেন, ভারত, তোমার প্রণীত কবিতায় আমার অত্যন্ত প্রীতি জন্মেছে। কিন্তু আমি এবম্প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ্য শুনতে ইচ্ছা করি না।

প্রসাদ, তা তুমি কী বল্লে?

ভারত, বল্লাম, মহারাজ, কীরূপ রচনা করতে অনুমতি করেন? আর এইবারেই আমার জীবনের কঠিনতম পরীক্ষা আরম্ভ হল। রাজা বল্লেন, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী যে প্রণালিক্রমে ভাষা কবিতায় 'চণ্ডী' রচেছিলেন, তুমি সেই পদ্ধতিক্রমে 'অন্নদামঙ্গল' পুস্তক প্রস্তুত করো। আমি মনে মনে প্রাতঃস্মরণীয় চক্রবর্তী মহাশয়ের পাদোদক প্রার্থনা কল্লাম।

প্রসাদ, কবেকার সেই কবি মানুষটি আজও কী বিস্ময় আমাদের ঠাঁয়ে। সে সময়ে এ বঙ্গদেশটির হাল হকিকত কী যে বিচিত্র। এ দেশটি বুনো জাঙালে ভরা ছিল। বেশিরভাগ বুনো মানুষদের জন্তু-জানোয়ারদের সঙ্গে যুদ্ধু করে বাস করতে হত। এধারে দেশে তখন মোগল-পাঠানে যুদ্ধু। তাঁরা বাংলার সিংহাসন নিয়ে ব্যস্তসমস্ত। ওধারে শ্রীচৈতন্যের বোষ্টম দল পাষণ্ড দলন করচেন। দেশময় রাধাভাব প্রচার করতে তৎপর। সে কারণে এ দেশের উপকথাদি সব বৈষ্ণব রসে মাখো মাখো অবস্থা, কোথায় গেল আমাদের আঁকাড়া বুনো বাদলা কথা নিচয়। এই সময়টিতেই তো চণ্ডীকাব্য রচিত হল।

ভারত, সে সময়কার অবস্থা, সাধারণ মানুষের বিপন্নতার কথাটি ভারি সুন্দর পটুয়ার মতো কবি অঙ্কন কল্লেন।

বড় নাম বড় গ্রাম বড় কলেবর। লুকাইতে নাহি ঠাঁই বীরের গোচর॥
কি করিব কোথা যাব, কোথা গেলে তরি। আপনার দন্ত দুটা আপনার বৈরি॥

প্রসাদ, হ্যাঁ দাদা, সেকালে রাজাদের চেয়ে সমাজে বণিকগণের দাপট বেশি ছিল। তার

কারণ অবিশ্যি মুসলমানি আধিপত্যে রাজাদের ক্ষ্যামতার কমতি, আর যবনদিগের উৎসাহে বানিয়াদের সর্দারি। এদিকে সংস্কৃত শাস্ত্রটাস্ত্র সমাজের নিচু মহলে নেমে দাঁড়াল। এমনকী মেয়ে মহলেও।

ভারত, আর তখনকার ভাষার অবস্থাটা একবার ভাবো। বাদশা আকবর আর তোডরমলের অনুগ্রহে বাংলায় পারসি ভাষার ছড়াছড়ি। সে নমুনা মুকুন্দরামে পদে পদে আছে।

সহর সেলিমাবাজ, তাহাতে সুজন রাজ, নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ।
তাঁহার তালুকে বসি, দামুন্যায় চাষ চসি, নিবাস পুরুষ ছয়সাত॥
ধর্মরাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপদাম্বুজ-ভৃঙ্গ, গৌড়বঙ্গ উৎকল অধিপ।
সে মানসিংহের কালে, প্রজার পাপের ফলে, ডিহিদার মামুদ সরিপ॥

প্রসাদ, এই কবি মানুষটির জীবনখানি যেমন রচনাও তেমন। নিজে ছিলেন সুদরিদ্র, আর রচেছেনও সেই গরিবানার কিচ্ছে। তবে অবিশ্যি তার মধ্যে বেনে, রাজা মিশেলও আছে।

লক্ষ্মী থাকিলে মান সকল সংসারে। লক্ষ্মী বাম হইলে ভাই কেহ না আদরে॥

ভারত, ভারি অর্থ সংস্থান দুখি এই কবি। যবন ডিহিদারের অত্যাচারে জিলা বর্ধমানের দামুন্যা গ্রামের পিতৃস্থান ছেড়ে, জন্ম বাস্তু ত্যাগ করে, সঙ্গে মস্ত পরিবার-পরিজন নিয়ে নিঃসম্বল গতিকে পথে নামলেন তিনি। পথ চলতি সে কী দুরবস্থা। তৈল বিনা করি স্নান, শিশু কাঁদে ওদনের তরে।

প্রসাদ, এই অবস্থায় মা চণ্ডী তাঁকে স্বপনে দর্শন দিলেন। তাঁর আদেশে তিনি কাব্য লিখতে আরম্ভ করলেন। বাংলাভাষায় তাঁর লেখা চণ্ডী একখানি সর্বোত্তম কাব্য। আমাদের বাঙালির জীবন আর স্বভাব বর্ণনায় তাঁর পানা কারিগর আর কেউ নেই।

ভারত, করে লয়ে পত্র মসী, আপনি কমলে বসি, নানা ছন্দে লিখিলা কবিত্ব। কিন্তু ভায়া, আমি তো কোনও দৈবী আদেশ পাইনি চক্রবর্তী কবির মতো। আমার মাথায় ছিল রাজাদেশ। তাই নিয়ে আমি ‘অন্নদামঙ্গল’ রচলেম। চক্রবর্তী কবির ধারে পাড়েও সে রচনা আসে না।

প্রসাদ, একটুখানি বলবে নাকি দাদা অন্নদামঙ্গল কথা।

ভারতচন্দ্র একটি দীর্ঘশ্বাস রেখে বলেন. এতক্ষণ যা টুকটাক কবিকঙ্কন হল তার পরেতে আমার অন্নদামঙ্গল একেবারেই পানসে ঠেকবে।

প্রসাদ নাছোড়, তাহলে কিছু একটা বলো।

ভারত হো হো অট্টহাস্য করে ওঠেন। মাথা ঝাঁকুনি দেন চাঁচর কেশ দুলিয়ে। তারপর বলে ওঠেন, বেশ তাহলে একখানি কর্দোরফ্‌থ শোন। এটি একটি পারস্য শব্দ। অর্থাৎ হল, কে এ কর্ম করে প্রস্থান কল্লে।

প্রসাদ, তার মানে আবার সেই আকবরি গুঁতো।

ভারত বলে চলেন,

কামিনী মানিনী মুখে, নিদ্রাগতা শুয়ে সুখে,
ধীর শঠ তার মুখে, চুম্বিতে চুম্বন সুখে,
ধীরে ধীরে কর্দোরফ্‌থ॥

নিদ্রা হতে উঠে নারী, অলসে অবশ ভারি,
আরসিতে মুখ হেরি, চুম্ব চিহ্ন দৃষ্টি করি,
ভাবে ভাল কর্দোরফ্‌থ॥

শ্মশান পুরোহিত ফিঙেকাকার সঙ্গে সদ্য হরিণঘাটা হতে বয়ে নিয়ে আসা মৃতদেহের কোথায় যেন বেশ খানিক মিল আছে। সেটা প্রধানত পাটকাঠি গড়নের জন্যে। তাছাড়া, ফিঙে কাকার মাথায় শীর্ণ দুলদুল জটা আর মুখে কপচানো অপুষ্ট গোঁপ দাড়ি। ওই মরা মানুষটির মুখেও অমনি বেআক্কেলে গোঁপ আর যৎপরোনাস্তি দাড়ি। তবে মাথায় জটা ফটা নেই। কাকার সদাই গাঁজা ঢুল ঢুল চোখের মতো তেনারও আধখুলন্ত চাউনি। শুয়ে আছেন বাঁশের আড়ায়, মলিন চাদর টানা, সরু জিরজিরে পাঁজরার ওপর একখানি পাটকিলে রঙা গীতা রাখা। আর আছে মাজার গোড়ায় একটি শুকনো তুলসি গাছ আর একটি বেঁটেখাটো দা। পায়ের গোড়ায় ওঁয়ার পরিবার ঘোমটা টেনে বসে। একটি কিশোর পুত্তুর বাপের মড়া ছুঁয়ে উবু হয়ে।

সুবল আমার কানে কানে বলে, যা রোগা বডি। পুড়তে বড়জোর দু-ঘণ্টা।

ওধারে, মুড়িঘরের বারান্দায় ধূম গাঁজা উড়ছে। উড়ছে বিড়ি-সিগারেট। রাস্তার চা দোকানির ছেলেটা ডাবা কেটলি ভরে হাতে হাতে খুরিতে চা বিতরণ করছে। সঙ্গে একটা করে নিমকি বিস্কুট।

একজন মাতব্বর টাইপের মোটাসোটা লোক এসে তিন-চার বাণ্ডিল বিড়ি ছুঁড়ে দিল বন্ধুগণের সামনে। তারপর, 'কাঠ কাঠ' করে হুঙ্কার দিল। ওপরে ওঠার লম্বা সিঁড়ি বরাবর দু'জন পাষণ্ড কাঠের ওপর কাঠ, তস্য আড়াআড়ি কাঠ বয়ে দুদ্দাড়িয়ে নামতে লাগল। ঠিক যেন আমাদের ধুমো কার্তিকের কাঠামো বয়ে আনছে।

আমি সুবলকে বলি, ধুমো কাত্তিক পুজো কবে রে?

সুবল যথেষ্ট অভিজ্ঞ। কবে আবার, কাত্তিক পুজোর দিন। কাত্তিক মাসের সংকান্তির দিন।

ধুমো কার্তিক সত্যিই ধুমো কিংবা ধুম্র। মাটি থেকে কমপক্ষে আমাদের তিনতলা বাড়ি সমান ঢ্যাঙা। বসে আছেন নীলরঙা ময়ূরের পিঠে। বৃহৎ পাখিটির গলার কাছে সোনালি চিত্রবিচিত্র। শালপ্রাংশু খালি গা। বুকে রোম-এর কুচি আর দু'ধারে ঠেলা মাসকেল। টানা টানা চক্ষু। বাহারে গোঁফ। থাক থাক কোঁকড়ানো চুলে ঘামতেল চকচক করে। পরণে, একটার সঙ্গে আর একখানা জুড়ে সত্যিকারের মস্ত ধুতি। তাতে পুরু নীল পাড়। গলায় জরিপেড়ে উত্তরিয় বুকের দু'ধারে। কে একবার মানত করে কার্তিককে শাল পরিয়েছিল। শোনা যায়, গোটা দশেক শাল জুড়ে তবে ওনার কাঁধ ঢাকা পড়েছিল।

শ্মশানে কার্তিকের কথা মনে হচ্ছে। অথচ আমাদের সুমুখে ওই মর্কটমার্কা মৃতদেহ। ফিঙেকাকা তার চাপা সরু গলা সামান্য তুলে বলে, ঘাটের ধারে নিয়ে চলো। চান করাতে হবে।

ওধারে একটি খুপরিতে কাঠ সাজানো হচ্ছে আকাশতলে। গঙ্গায় দুপুর বেলাকার জোয়ারি আলো ঝিকমিক করছে। ডানলপ পারাপারি খেয়া আসছে যাচ্ছে। ওপারের

কারখানা জেটিতে ক্রেন দিয়ে মস্ত মস্ত কাঠের পেটি তোলা হচ্ছে। ক্রেনের বাঁকা চাঁদির ডগা কীরকম ভালমানুষের মতো ওপর থেকে নেমে আসছে। তারপর অতর্কিতে এক হেঁচকা টান। ওই রোগা পটকা লোকটি কি মরার আগে জানত, ওপর থেকে অমনি একটা ক্রেন গুটিসুটি নেমে এসে মারবে এক হ্যাচাং।

ওপাশে বেশ খানিক ফাঁকা মাঠ মতন পরিষ্কার জায়গা। ছোট ছোট ঢিবির ওপর কচি ঘাস গজিয়েছে। ওখানে সব দু-বছরের এধারের শিশুদের পোঁতা আছে।

চালি শুদ্ধ মৃতদেহ গঙ্গার ধারে বাঁধানো সিঁড়ির চাতালে শোয়ানো হয়। মৃতের ঘোমটা পরিবার এবার ডুকরে ওঠে, ওরে কালী, তোর বাপকে ভাল করে চান করিয়ে দে।

ফিঙে কাকার নির্দেশে কালী ছোঁড়া নতুন মেটে কলসি করে জল আনতে নেমে যায় সিঁড়ি টপকে নীচে—গঙ্গার কাছে। একখানা মেছো নৌকো জল ছপছপিয়ে ঘাট কামড়ে বয়ে যেতে যেতে ঘাড় ঘুরিয়ে কান্নিক মারে এদিকে। একজন লোক দাঁড় বাইছে। আর একজন ছোঁড়া বসে বসে জাল-এর শেকড়-বাকড় ছাড়াচ্ছে। কালী থকথকে গভীর কাদা খামচে জলে নামে। পরণে হাফপ্যান্ট। কোমরে গামছা। জলের স্রোতের ধমক ভেঙে নতুন কলসি চেপে ধরে। বগ, বগ, বগ বগ জল টেনে নেয় কলসি। ওপরে মুড়ি ঘরে চা-বিড়ি অন্তে গুব গুব খোলে থাপ্পড় হয়। 'নাগিন' সিনেমার 'মন ডোলে, মেরা তন ডোলে'র সুরে প্রখর গলায় একজন, হরে কিস্‌নো হরে কিসনো, কিস্‌নো কিস্‌নো হরে হরে...ধরে। তারপরেই মহা উল্লাসে দোয়ারকি পড়ে সমবেত কণ্ঠে। কলসি ভরে গুব গুব, গুব গুব। খোল গর্জায় গাব গুব, গাব গুব।

কলসিখানা বুকের সঙ্গে সাপটিয়ে কালী জল নিয়ে আসে ওপরে। একজন এসে এক গোছা চামড়া পোড়া গন্ধধারী ধূপ গুঁজে দেয় মড়ার মাথার কাছে, বাঁশের চালিতে। ফিঙেকাকা এসে ততক্ষণে উবু হয়ে বসে পড়েছে মৃতের পাশে। তারই মৃদু নির্দেশে পা থেকে মাথা বরাবর শিশি খুলে ঘৃত মাখায় কালী বাপের দেহে। কে একজন বলে ওঠে, বুকের কাছটা ভাল করে মাখা রে বাপ। কালী ডান হাত দিয়ে ঘসে ঘসে ফর্দর ঘি মাখায় বাপের পাঁজরময়, বুকের খাঁচায়। কপালে দে, মুখে দে—আবার নির্দেশ। ধূপ পোড়ে মাথার কাছে। ডানলপ ফ্যাক্টরিতে ভোঁ পড়ে। ফিঙে কাকা বলে, এবার বাপকে চান করাও ছেলে। মাথার দিক থেকে জল বইয়ে আনো পায়ের দিকে। ছেলে তাই করে কীরকম ভ্যাবাচ্যাকা অবস্থায়। কাকা মন্ত্র আওড়ায়, ওঁ গয়াদীনি চ তীর্থানি যে চ পুণ্যাঃ শিলোচ্চয়াঃ। কুরুক্ষেত্রঞ্চ গঙ্গাঞ্চ যমুনাঞ্চ সরিদ্বরাম্। কৌশিকীং চন্দ্রভাগাঞ্চ, সর্বপাপপ্রণাশিনীমম্। ভদ্রাবকাশাং গণ্ডকীং সরযূং পনসন্তথা। বৈণবঞ্চ বরাহঞ্চ তীর্থাং পিন্ডারকস্তথা। পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সরিতঃ সাগরাংস্তথা।

চান হল কালীর বাপের। ওধারে চিতা তৈরি। এবার পিণ্ডদান। দু'খানা ইটের খোপে পাটকাঠির আগুন জ্বেলে ওপরে ছোট্ট মেটে সরায় বাপের ভাত চড়াল ছেলে। আতপ চালে গঙ্গা জল ঢালা দ্রব্য ফুটতেই চায় না। গঙ্গার হু হু হাওয়ায় ছোট্ট উনুন দাউ দাউ। একটু পরে চালে বুজ বুজ বুজগুড়ি দেখা দেয়। কোনওমতে ফুট কাটলে অন্ন মাটিতে নামে। ফিঙে কাকার নির্দেশে মৃতকে নতুন কোরা বস্ত্রের এক ফালি বুক থেকে মালাইচাকি তক চাপা দেওয়া হল। বুকের খাঁচায় এক চিলতে চন্দন না বেল কাঠ---বাখা হল।

চক্ষুদ্বয়ে, নাকের ছিদ্রে আর মুখে সপ্তখণ্ড সুবর্ণ, অভাবে কাংস্যখণ্ড দেয়া হল। দেহের অধম অঙ্গে রজত কুচি। এবার রাঁধা অন্ন থেকে অর্ধেক মাটিতে ফেলে দিয়ে বাকিটা পাকাকলা, তিল, ঘৃত সহকারে মাখা হল। মাটিতে কুশ বিছিয়ে হাতে পিণ্ড নিল ছেলে। ফিঙেকাকা আকাশে মুখ তুলে মন্ত্র ছাড়ল, এহি প্রেত সৌম্য গম্ভীর্বেভিঃ পথিভিঃ পুর্বিনেভি...

সাজানো কুশের গায়ে পিণ্ড নামল ছেলের হাতে। আমি ভাবি, এমন সিকি সেদ্ধ ভাত কি কেউ খেতে পারে। খানিক অন্ন তুলে দেওয়া হল মৃতের মুখ নেই মুখে। এদিকে বাপের কুটুরে চোখের খোঁড়লে জমা জলে মাছি ঠোনা দিচ্ছে। কে একজন মেছো নৌকোকে হেঁকে বলল, হল? কিছু হল? নৌকো মাথা নাড়ল। ভাগ্যিস মাছ হল বলেনি। তাহলে ওর গুষ্টির তুষ্টি হত। এটা হল মাছধরিয়েদের সংস্কার। সুবল বলল, প্রেত মানে ভূত।

আমি বলি, হ্যাঁ, মরলে সবাই প্রেত হয়। কেউ রেহাই পাবে না।

সুবল গম্ভীর, মেয়েছেলে মরলে পেত্নি।

এধারে উত্তর-দক্ষিণে চিতা প্রস্তুত। ফিঙেকাকা বলল, এবার শবকে নিয়ে চল।

কাকা এগিয়ে গেল চিতার দিকে। চারজন মিলে চালি শুদ্ধ শবকে তুলে নিল। তারই মধ্যে একজন মাঝবয়সি হঠাৎ গেয়ে উঠল, নদীর কুলে হবে রে শেষ বিয়ে...

ওধার থেকে শবের পরিবার ডুকরে উঠল, না না না। আমার আংটি আমি খুলব না কো। এটা তুমি ফুলশয্যের রাতে দিয়েছিলে গোওওও—

সুবল বলল, কী মড়মাত্তিক।

আমি বুঝলাম ঠিক সময়ে ঠিক শব্দটা ও বলে দিল। মড়ার সঙ্গে ব্যাপারটার কী আশ্চর্য যোগ আছে। সবাই চিৎকার করে উঠল, বলহরিইইই—। নামকেত্তনের দল গর্জে উঠল নাগিন-এর সুরে, হ-অ-অ রে কিস্‌নো—হরে কিস্‌নো—। ফিঙেকাকা তার ভেতর থেকেই তীক্ষ্ণ বলে উঠল, শবকে এবার চিতায় উবুড় করে শুইয়ে দাও।

তাই হল। কালীর বাপের শবকে চিতার বুকে উপুড় করে ঢেলে দেওয়া হল। দু'হাত দু'পাশে হত্যে দেওয়ার ভঙ্গিতে। সদ্য চান করানো ভিজে পসপসে মুণ্ডটা পিণ্ড মুখে করে মাটির দিকে নুয়ে আছে।

ফিঙেকাকা মন্ত্র ছাড়ল, ওঁ কৃত্বা তু দুষ্কৃতং কর্ম জানতা বাপ্যজানতা। মৃত্যুকালবশং প্রাপ্য নরং পঞ্চত্বমাগতম্—

সুবল বলল, দেখলি তো, বাপ মরলে এক আর মা মরলে অন্য মন্তর।

আমি অবাক বলি, কী?

সুবল বলে, ওই যে, মন্তরে বাপ বলল।

ফিঙেকাকা গলা তোলে, পাট কাঠি জ্বালো। জ্বালো। সাতবার শবকে প্রদক্ষিণ করে মুখে আগুন ছোঁয়াও তিনবার। তিনবার। ...দহেয়ং সর্বগাত্রানি দিব্যান লোকান স গচ্ছতু...

হুঙ্কার ওঠে, বল্‌লো হরি...। কীর্তন গর্জায়, হ অ অ রে কিস্‌নো। গান হয়, নদীর কুলে হবে রে...।

শবের ছেলে কালী জ্বলন্ত পাটকাঠি মৃতের মুখ গহ্বরে ছোঁয়ায় কিংবা আছড়ায়। মুহূর্তে পিণ্ডিধারী মুখখানা পুড়ে কালসিটে হয়ে যায়।

উনচল্লিশ

জ্বলন্ত চিতার খানিক দূরে দাঁড়িয়ে আমি আর সুবল এইমাত্র চিলুতে চড়ানো শবের সৎকার কাণ্ড প্রত্যক্ষ করি। অবিশ্যি এটা আমার কাছে নতুন নয়। ঘুরে ফিরে একলা একলা এই শ্মশানে যে কতবার আসি, তার হিসেব নেই। কেন জানি না, এখানটিতে আসতে আমার খুব ভাল লাগে।

এই ভাল লাগার ব্যাপারটার মধ্যে অনেকখানি রক্তগত বিষয় আছে। কানুবাবা বলে, সে নাকি বাল্যকাল থেকে শ্মশান চাটা। আসলে, বাবার জীবনটা তো জন্মকাল থেকেই অদ্ভুত। স্কুল মাস্টার আর সাধুসন্ত নিয়ে মশগুল তাঁর পিতা। একে পত্নীহারা, তার ওপর সর্বদাই বাইরে বাইরে মন। সংসার চলছে মিতৃদেব্যা, গৌর শিরোমণি ইত্যাদিদের দৌলতে। বাড়ি তো নয়, হাট। কানুবাবা, একে স্কুলের পড়া পড়তে বসলে বইয়ের পৃষ্ঠায় ফুটবল লাফায়, দ্বিতীয়ে প্রায় গার্জেনহীন। ফলে, বেশিরভাগ সময়ই পথে পথে কাটে। বাপ-ছেলের কদাচিৎ দেখা হয়। তা ছাড়া, দু'জনে দু'জনকে কেমন যেন এড়িয়ে এড়িয়ে চলেন।

এমন ছন্ন জীবনধারী বাবা ছেলেকাল থেকে শরৎবাবুর ভক্ত। 'শ্রীকান্ত' থেকে পছন্দ মতো টুকে টুকে ছোট ডায়াবি ভর্তি করে রাখে। এক এক রাতে কাঁচরাপাড়ার বাবুব্লক কোয়ার্টারে এমনই জনসমাগম যে, বাবার বাড়িতে শোয়ার জায়গা হয় না। ফলে বেশিরভাগই অন্যের বারান্দায় বা রোয়াকে খবরেব কাগজ পেতে নিদ্রা। শীতকালে কম্বল মুড়ি। আর সারাদিন চরেবরে শোওয়া মাত্র তেড়ে ঘুম। রাতে গায়ের ওপর দিয়ে দু-এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেলেও ঘুম টোটে না।

কানুবাবার বিচিত্র জনা কয় বন্ধু জানে, কোথায় কখন তাকে পাওয়া যায়। ফলে, রাত বিরেতে কেউ অসুস্থ হলে অথবা মারা গেলে—ডাক কানুকে। তখনকার শর্টকাট পথ, কাঁচরাপাড়া থেকে ডাঙাপাড়ার ভেতর দিয়ে হালিসহর শ্মশান ঘাট। সেকেন্ড ওয়ারের দরুণ বানানো কংক্রিটের টানা রাস্তা। দু'ধারে ঘর-বাড়ি নেই। নিবিড় জঙ্গল। ডোবা, পুকুর, বাঁশঝাড়। দিনমানেও খাঁ খাঁ নিঝ্‌ঝুম। এমন ঘোরতর পরিবেশপত্র সত্ত্বেও, এত মড়া কাঁধে বওয়ার পরেও, কানুবাবা কোনওদিন ভূত দর্শন করেনি। ভূতও নাকি তাকে ভয় পায়।

তা এমনি এক রাত্রিকালে, কলেরায় মরা এক কিশোরীর দেহ নিয়ে বাবুব্লক থেকে সিধে হালিসহর শ্মশানে বাবা, সঙ্গে আর তিনজন বন্ধু। কলেরা বলে বাড়তি লোক পাওয়া যায়নি। সে ছিল শীতের মাঝরাত। তা, শ্মশানে বডি এনে রেখে তিনজন ওপরে উঠে গেল কাঠ আনতে। কানু রইল মড়া পাহারায়। তখনকার সেই শ্মশান অতি ভয়সঙ্কুল। চারধারে ঠাসা জঙ্গল। বাবলা, গাব, বেল আর কন্টিকারির জাঙাল। রাতের বেলা এই ঠাণ্ডায় স্থানটি মৃত্যুর বড়ো কাছাকাছি। কানু মড়া আগলে বসে আছে বাঁশের চালির একটি ডগে। কঠিন ঠাণ্ডার মাঝখানে ছানাকাটা চাঁদনি। গঙ্গায় টুকটাক মেছো নৌকোয় লণ্ঠন মিট মিট। ওধারে শিশু পুঁতে দেওয়া ঝুপসি এলাকায় গাব গাছের আড়ালে বসে শকুন কাঁদছে

ইনিয়ে বিনিয়ে। কেঁদো কেঁদো শ্মশান কুকুরগণ ধমকাচ্ছে সেই ছিঁচকাঁদুনেদের। কানু গঙ্গার দিকে আনমনা চেয়ে চেয়ে উদাস গান ধরেছে, পাগলা, মনটারে তুই বাঁধ—

তখনই, ঠিক তখনই মৃতদেহ রাখা বাঁশের চালিখানায় প্রচণ্ড ঝাঁকুনি। এমনই প্রবল সেই হ্যাঁচকানি যে, কানু বাঁশের ডগ থেকে প্রায় ছিটকে পড়ে আর কী। মুহূর্তে মনের মধ্যে ভয়, কী হল, কী হল হঠাৎ! শীতের ঠাণ্ডার সঙ্গে উদ্বেগের হিম এসে ঘা দেয় বুকের ভেতরে। আরও একবার হ্যাঁচকানির সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় ঘোরায় দ্রুত কানু। দেখে সেই কলেরায় গত ছেলেমানুষ মেয়েটির হাঁটুর কাছে কামড়ে ধরেছে একজন ডাকাবুকো শ্মশান কুকুর। দাঁত বসিয়ে ঠাণ্ডা দেহে ঝাঁকুনি দিচ্ছে প্রাণপণ। কানু তড়াক উঠে দাঁড়ানো মাত্র সে ওখান থেকে এক কামড় মাংস নিয়ে দৌড়। কানু ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়। ফুটবলি দম ধরে ধাওয়া করে তাকে। হাতে পড়ে থাকা একখণ্ড কাঁচা বাঁশ। ওপরে ওঠা সিঁড়ির মুখে কুকুরটি হাল ছাড়ে পিঠে বাঁশ পড়ার ধাক্কায়। দন্তে কামড়ানো নরমাংস খণ্ডটি ফেলে সে পালিয়ে বাঁচে। কানু হেঁট হয়ে দেহচ্যুত মাংসখণ্ডটি তুলে নিয়ে দৌড়ে, সেন্টার লাইন বরবার ফিরে যায়। তারপর সেই খণ্ডটি হাতে করে থাবড়ে থুবড়ে কোনওপ্রকারে সেঁটে দেয় মৃতদেহের যথাস্থানে।

কিন্তু আমার চোখের সামনে এ কী কাণ্ড! এমন তো কখনও ঘটেনি। জ্বলন্ত চিতার মাঝখানে হঠাৎ তেড়েফুঁড়ে উঠে বসেন সেই শীর্ণকায়, উল্টো মুখে। সুবল আমার হাত চেপে ধরে। অমনি দু'জন লোক দৌড়ে যায় ওধারে কী হল, কী হল রবে। শান্ত, সুশীল ফিঙে কাকা কোনও কথা না বলে পড়ে থাকা একখণ্ড বাঁশ তুলে নিয়ে উঠে বসা মৃতের গায়ে পরপর বাড়ি মারতে থাকেন। একসময় ঢেউ থমকায়। সাপের ফণা গোটানোর ধাঁচে দেহটা আস্তে আস্তে যথাপূর্বং হয়ে যায়। ফিঙে কাকা ঘুরে দাঁড়িয়ে হাত থেকে বাঁশখানা ফেলে দেন। তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলে ওঠেন, নার্ভে টান পড়েছিল যে।

তবে, আমার পিতামহ শিশিরকুমার বিয়ের কিছুকাল পরেই ভাটপাড়ার ভাড়া বাড়িতে একদিন প্রেত টের পেয়েছিলেন। সেই বাড়িটা ছিল মস্ত।

একতলা—অনেকগুলো ঘরওয়ালা। জনশ্রুতি, ও বাড়িতে নাকি ভূত বর্তমান। শিশির মাস্টার ও সব বিশ্বাস করতেন না। আমার বড়মা—যার নাকি ভূত দেখার রাশ আছে, ও বাড়িতে অপরিচিত লোকজন দেখেছে। তারা হঠাৎ এল আবার হঠাৎ করে মিলিয়ে গেল। এ ঘটনা ভর দুপুরেও। বড়মা উঠে গিয়ে দেখে বাইরের সব দোর যথারীতি বন্ধ। ইস্কুল ফেরত দাদুকে সব কাণ্ড বলতে, ছেলে উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, আরে মা, এ বাড়িতে তুমি-আমি এত ঠাকুরের নাম করি, ওসব থাকলেও ধারেকাছে ঘেঁষবে না। আর একদিন দুপুরে কোথা থেকে এক দাড়িওয়ালা বুড়ো বড়মাকে ঘুম থেকে তুলে বলে, বড় তেষ্টা পেয়েছে। বড়মা উঠে জালা থেকে ঘটিতে করে জল আর রেকাবিতে একটু এখোগুড় এনে দেখে বুড়ো হাওয়া। ওধারে দুয়ারে দুয়ারে দিব্যি ভেতর থেকে কুলুপ আঁটা।

শিশিরকুমারের কাছে এমনই বহু ঘটনা দাখিল হয়। তিনি ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেন। একদিন গরমদিনের মাঝরাতে তাঁর গোসলে যাওয়ার দরকার পড়ল। ধর্ম পত্নী তখন ক'দিনের জন্যে ওপাড়ায় বাপের বাড়ি গিয়েছেন। ওঠার সামান্য শব্দে বড়মার ঘুম ভেঙে গেল।

—কী হল বাপ?

—কিছু না। একটু বাহ্যে যাব মা।

—ডাঁড়া, হারিকেনটা উশকে দি।

এই বলে বড়মা লণ্ঠনটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে ছেলের পেছু পেছু বারান্দায় এল। ছেলে বুঝল, মা কেন উঠে এল। মুখে কিছু না বলে মস্ত উঠোনের কোণে পরপর অনেকগুলো সিঁড়িধারী উঁচু পায়খানার দিকে এগোতে এগোতে দেখল, মা ঠোঁটে দোক্তা টিপছে বারান্দায় উবু হয়ে বসে। শিশিরকুমারের হঠাৎ কী মনে হল, এই নিশীথ রাতের মাঝখানে উঁচু সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে। মনে মনে বলা হল, ঠিক আছে, সত্যি যদি কেউ থাকো এ বাড়িতে, আমি যখন গোসল করে বেরব তখন আমায় ওপর থেকে ধাক্কা দিও দিকি।

বড়মা লণ্ঠন জ্বেলে বারান্দায় ছেলে পাহারা দিচ্ছে। হাই তুলছে শব্দ করে। খাঁ খাঁ উঠোন। পাঁচিলের এপার ওপার ঝিরকুটে অন্ধকার। রাস্তায় দাগি ষাঁড় ঘুরছে আর ভোঁস ভোঁস নিঃশ্বাস ছাড়ছে। পাড়াচড়া কুকুরগণ থাকে থাকে দাঁত খিঁচুনি দিচ্ছে। রাস্তার ওপার থেকে গঙ্গার বাতাস ঘুরতে ঘুরতে পাঁচিলপারের অন্ধকারে এসে লাট খাচ্ছে, ঘোঁট পাকাচ্ছে। মা লণ্ঠনপারে বসে ছেলের মনে ভরসা জোগাচ্ছে আর হাই তুলছে। জল শৌচ অন্তে ছেলে গাড়ু হস্তে সিঁড়ির টঙে এসে দাঁড়াল। মনে মনে বলে উঠল, যদি কেউ সত্যি সত্যিই থেকে থাকো এ বাড়িতে, আমায় দাও দিকিনি পেছন থেকে একটি ধাক্কা। কথা ক'টি মনে মনে বলতে যতক্ষণ। পেছন থেকে বলবান এক হাওয়ার হাতে মোক্ষম একটি ঠেলা পড়ল। ছেলে খানিক উচ্চ শূন্যে উঠে দড়াম করে উঠোনের মধ্যিখানে পপাত হল। এবং হওয়া মাত্র চিৎকার করে বলে উঠল, আছ বাবা আছ। আছ বাবা, আছো হে এ এ এ। হাই আটকে বড়মা চমকে বলে, কী হল রে? কী হল বাপ? ছেলে মাজায় হাত বুলোতে বুলোতে শুধু বলল, একটা হাওয়া।

দু'দিন পরেই জগদ্দল বাজারের এক ওঝাকে খবর করিয়ে ডেকে আনা হল। সে এসে বাড়ির সবক'টি কোণের মাটি তুলে তুলে শুঁকে দেখলে। তারপর প্রকাণ্ড একটি মালসায় ঘুঁটের আগুন করে তাতে মুঠো মুঠো ধুনো নিক্ষেপ করতে লাগল ওঝা। অমনি কী কাণ্ড! কোথায় ধুনোর সুবাস। তার বদলে উৎকট মড়াপোড়া গন্ধ দাপিয়ে উঠল বাড়িময়। সেই চামড়া পোড়া দুর্গন্ধে সবার নাকে কাপড়। ওঝা বলল, এ বাড়িখানা একটি প্রাচীন গোরস্তানের ওপর দাঁড়িয়ে। এখানে যাঁরা এখন বর্তমান রয়েছেন, তেনারা সবাই কাঁচাখেগো মামদো। ওঁয়ারা আবার কচি নারী মাস পছন্দ করেন।

আমার কণা ঠাকুরমার তখন ঘুসঘুসে জ্বরের বনেদ সবে ধরেছে। এদিকে জঠরে তিলে বাড়ছেন আমার কানুবাবা। আর কচি কণার কোমরে ভিত গেড়ে বসছে বোন টিবি। আমার সরলমতি, বই উন্মাদ, ইস্কুল মাস্টার যুবক পিতামহর ভবিতব্যে কী এক ঝোড়ো হাওয়ার ভবিতব্য লেখা হচ্ছে। রচিত হচ্ছে কানুবাবার চরে বেড়ানো আর বিচিত্র অভিমানী অন্তঃকরণ ও তার পাণ্ডুলিপি।

শ্মশানে দাঁড়িয়ে ভর দুপুরের মাঝখানে এমনি এমনি ওই মড়া পোড়ানো দেখতে দেখতে চোখ যায় অগুণতিবার দেখা শ্মশানের মুড়ি কোঠা কিংবা চিলু কামড়ানো

দেওয়ালে দা দিয়ে কেটে কেটে লিখে রাখা, বাপ্পা, চিন্তামণি, সুধীর দাস, আলপনা, তৃপ্তি...।

মানুষগুলো এখানে কবে কে জানে পুড়ে ছাইভস্ম হয়েছে। কিন্তু তাদের নামগুলো দিব্যি জেগে আছে, একজনের ঘাড়ে আর একজনা। তাও কোনও ঝগড়া বিবাদ নেই। দাঙ্গা নেই। দেশভাগ নেই। কুর্সি টানাটানি নেই।

ঠিক এইখানটিতে আমার মনে একটি তত্ত্ব হু হু করে ওঠে গঙ্গার বাতাসে ছেঁড়া কোটা চিতার আগুন লকলকে শিখা হয়ে। কথাগুলো আমার পিতামহর। মানুষের দেহটা আসলে খোল। ভেতরে যে থাকে, তার নাম আত্মা। দেহ মরলেও সে মরে না। দেহ ফেলে রেখে আত্মাটি বাইরে বেরিয়ে পড়ে, ছেঁড়া কাপড়ের মতো খোল ত্যাগ করে। সে সময় সেই আত্মাটিকে কেউ দেখতে না পেলেও সে সবাইকে দেখে। তার তখন একটি আকার হয়। তার উচ্চতা আর আড়া ঠিক হাতের বুড়ো আঙুলবৎ।

প্রসাদ হাসিমুখে ঘন ঘন মাথা আন্দোলিত করতে করতে বলে ওঠেন, কিন্তু তুমি এ কর্মটি করে প্রস্থান কল্লে তো হবে না।

—কী? কী কর্ম ভায়া?

—ওই যে, কর্দোরফ্‌থ—মানে, কে এ কর্মটি করে প্রস্থান কল্লে। কিন্তু তুমি এখন অমনি হঠাৎ করে পলায়ন কল্লে কি হয়। এখনও যে ভাত চড়েনি।

ভারত, বোঝা গেল তোর বাক্ চাতুরি। তারমানে, অন্নদামঙ্গল। সেই অকিঞ্চিৎকর বিষয়ে তাহলে বলি তোমায়। বিষয়টা হল, রাজা বল্লেন, কবিকঙ্কণ যে কায়দায় চণ্ডীমঙ্গল রচেছিলেন, আমায় সে গড়নটি বজায় রেখে অন্নদা রচতে হবে। রাজা তো বলে খালাস। এখন আমার হল মহা বিপদ। কী করি, কী না করি. এই নিয়ে মনে মনে মহা দ্বন্দ্ব। ওধারে মাথার ওপর বসে আছেন বুড়ো মুকুন্দ। তাঁর চণ্ডীকাব্য তো পড়ে পড়ে মুখস্থ হয়ে গেল আমার। ফলে তাঁর ঘের থেকে বার হওয়া—সে বড় খিটকেল। তখন নিজ হস্তে লেখনি তুলে না নিয়ে একজন ব্রাহ্মণকে লেখক রূপে নিযুক্ত কল্লেম। নিত্যি সকালে সেই বামুনটি আমার বাসায় আসেন। দৎ কলম আর পাতড়া পেড়ে বসেন। আমি মহাশক্তিকে মনে মনে স্মরণ করে মুখে মুখে রচনা করে বলে যাই। বামুন লেখেন। আর প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলা, যেটুকু লেখা হয়, নীলমণি সমাদার নামে একজন গায়ক সেই সদ্য রচিত পালা ভুক্ত গীতের সুর, রাগ আর পাঁচালি আমার ঠেঙে শিক্ষা করে প্রতিদিন রাজসভায় গান করতে লাগলেন। রাজসভা প্রতি সন্ধ্যেবেলা বেশ জম জম করতে লাগল। তবে একটি কথা, এই অন্নদামঙ্গলে আমি মানুষ থেকে ধরে দেবতা পর্যন্ত তুলে ধরলাম। মানুষ রাজা-গজা থেকে একেবারে শিব-মহামায়া অন্নপূর্ণাদি।

প্রসাদ, ভালো তত্ত্ব দাদা। মানুষই তো শিব পঞ্চানন, মহামায়া জগদম্বা। যাকে বলে আমাদের ঘরের মানুষ। তাহলে এবার একটু নমুনা বলো দাদা। মানে পহেলা দফেতে রাজা কেষ্টচন্দর।

ভারত, বেশ। তাহলে রাজার সভা বর্ণন হতেই একটু কপচাই।

প্রসাদ, ভাল কথা।

ভারত,
নিবেদন অবধান কর সভাজন।
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভার বিবরণ।
চন্দ্রে সবে যোলো কলা হ্রাস বৃদ্ধি তায়।
কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়॥
পদ্মিনী মুদয়ে আঁখি চন্দ্রেরে দেখিলে।
কৃষ্ণচন্দ্রে দেখিতে পদ্মিনী আঁখি মেলে॥
চন্দ্রের হৃদয়ে কালী কলঙ্ক কেবল।
কৃষ্ণচন্দ্র হৃদে কালী সর্বদা উজ্জ্বল।
দুই পক্ষ চন্দ্রের অসিত সিত হয়।
কৃষ্ণচন্দ্রে দুই পক্ষ সদা জ্যোৎস্নাময়॥

নমুনা এই পর্যন্তই থাক। আসলে ভায়া, সত্যি কথা বলতে কী, তোমার মতো আগলছাড়া কবি হলে আপন মনে কাব্য রচতে পারতাম। কিন্তু যে কালে আমি রাজার নিগড়ে বাঁধা তাই তিনি ভিন্ন গতি কী আমার। তিনিই তো আমার অন্নদাতা ভগবান।

প্রসাদ, অন্ন যিনি জোগান, তিনিও তো কিঞ্চিৎ আশা ভরসা করেন। সব রাজাই বাসনা করেন কবির কলমে অক্ষয় হয়ে রইতে। তা না হলে সুমুখের কাল তাঁকে জানবে কেমন করে।

ভারত, কিন্তু ভাই, সব কবি লেখকই তো রাজাদের গুণ বন্দনা করেন। তাঁর যাবতীয় দোষ, কুমতি সব তুলে রেখে, কেবল ভাল ভাল কথাই বলা হয়ে থাকে। তা না হলে, রাজা কুপিত হবেন। কবির পেটে পদাঘাত পড়বে। এও তো এক রাজনীতি।

প্রসাদ, ঠিক কথা। রাজনীতি মানেই শুধু সিংহাসন নিয়ে, ভূ-সম্পত্তি নিয়ে যুদ্ধ বিগ্রহ নয়। নিজেকে অবতার জগদীশ্বর করে রাখা।

ভারত, হুঁ, দিল্লীশ্বরো বা, জগদীশ্বরো বা। এ তো আমাদের কবিদেরই রচনা।

প্রসাদ, কিন্তু দাদা, কালিদাস তো কয়েইছেন, পুষ্পহীনং সহকারমপি নোপাসতে ভ্রমরাঃ। সৌরভময় আমগাছ যদি পুষ্পহীন হয়, তা হলে ভ্রমরকুল তার কাছে যায় না।

ভারত, যথার্থ কথা। আমাদের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অবিশ্যি গুণহীন নন। মানুষটি কৃতবিদ্য, পণ্ডিত আর রসিক। সে কারণেই তো আমি লিখে দিলাম,

দেবীপুত্র নামে রাজা বিদিত সংসারে।
ধর্মচন্দ্র নাম দিলা নবাব যাহারে॥
সেই রাজা এই অন্নপূর্ণার প্রতিমা।
প্রকাশিয়া পূজা কৈলা অনন্ত মহিমা॥
কবি রায়গুণাকর খ্যাতি নাম দিয়া।
ভারতেরে আজ্ঞা দিলা গীতের লাগিয়া॥

প্রসাদ, রাজা শক্তিমন্ত্রী হলেও বোষ্টমে অছেদ্দা নেই।

ভারত, হুঁ, সে বিষয়ে রাজা ভারী সচেতন, চতুর। কিন্তু অন্নদামঙ্গলে তাঁর মন ভরল না। তিনি আমায় একটু রসের কথা রচনা করতে বল্লেন। মনে মনে আমিও যেন তোয়ের ছিলাম। অমনি বিলম্ব না করে বিদ্যাসুন্দর-এ হাত দিলাম।

প্রসাদ, তোমার যে কৃষ্ণে অছেদ্দা নেই, তা নিয়ে একখানি নমুনা দাও দিকি। অর্থাৎ, রাজার শক্তিমন্ত্র রইলেও তিনি তো আচরণে বোষ্টম চূড়ামণি।

ভারত অমনি মহা উৎসাহে বলে ওঠেন,

একসম বৃকভানু কুমারী।
মাত পিত সন, বৈঠ নেহারী।
হয়ে লগ্ আউসর, দূতী জো আয়ি।
ভেট্ চল, নন্দলাল, বোলায়ি॥
দেখ্ নাহি আঁখ্, শুন নাহি কান্।
কা কুছ্ আয়ি হো, আওল খায়ি॥
কাঁহাকে কানায়া লাল কাঁহা সো পছান্ জান্
কাঁহা সো তু, আয়ি হ্যায়, খাক্পর তেরে ব্রজ্কি বস্নে॥
পাণি মে আগ্ লাগাওনে আয়ি।
কুছ্ বাৎ এভোৎ কো, কুছ বাৎ ও তোৎ কো, বাতোন্ শুন্
বাৎ হামারি সাৎ, লাগাযি হ্যায়॥

প্রসাদ অবাক নেত্রে তাকিয়ে রন ভারতচন্দ্রের প্রতি। তারপর বলে ওঠেন, দাদাগো, তোমার নীলে বোঝা দায়। এ যে খাসা হিন্দি আর যবন ভাষার কবিতা। এখন বুঝতে পাচ্ছি, রাজা কেন তোমায় একেবারে কোলের কাছটিতে বসিয়ে রাখেন।

ভারত মৃদু হেসে বলেন, সেটাই তো বিপদের ভায়া। কবিতায় যথেচ্ছাচার করা যায় না। রাজা যাতে তুষ্ট হন, তাই করতে হয়!

প্রসাদ, একে কি রাজাচার বলা যেতে পাবে!

ভারত, তা বলতে পারো ভায়া। তবে উল্টে যেন আমার কার্যকলাপকে পশ্বাচার বোলো না।

প্রসাদ, বীরাচারী, পশ্বাচারী, এমনকী বামাচারী—এইসব কথাবার্তাগুলো সমাজে আমার জন্যেই তোলা আছে দাদা। ওইগুলোই ভারি মুখরোচক; কিন্তু আমার ছিটেফোঁটা কবিতা-গীতকে এই সমাজেরই এঁটোকাঁটা দীন ভিখিরি আর মাঝি মাল্লারা বুঝি কদর দিল। সে জন্যেই মনে হয় বেঁচে আছি। তাই তো, শুধু ওইটুকুর জন্যেই বুঝি আমার মনে হয়, মানুষ হিসেবে বেঁচে আছি।

ভারত, ওইখানেই যে তোমার সার্থকতা ভায়া। তুমি সুপণ্ডিত হয়েও পণ্ডিতি ভুলে আকাট সাধারণ সেজে বসে আছো। ফলে পঞ্চজন সাধারণ মানুষ এক বাক্যেই তোমার মিতে হয়ে বসে। এ কপাল সকলের হয় না ভাই।

—কপাল!

—হ্যাঁ প্রসাদ। তুমি শুধু কালীর বেটা নও, সাক্ষাৎ কালের বেটা। তুমি অতি সহজ মতে কালাকাল হরণ করে বসে আছো। এ কি কম ভাগ্যি।

প্রসাদ, হয়েছে, হয়েছে। বিস্তর হয়েছে। এবার আগে বাড়ো দাদা। বিদ্যেসুন্দরের কিচ্ছে কও।

ভারত, হ্যাঁ, একে রসের হদ্দমুদ্দ কিচ্ছে ভায়া। রাজার বাসনা বলে কথা। দিলাম একেবারে আগুন জ্বেলে।

প্রসাদ, বটে।

ভারত, তবে একদিন দিব্যি মস্করা হল। একদিন সন্ধ্যেবেলা রাজসভায় যেয়ে সদ্য রচিত বিদ্যাসুন্দরের পুঁতিখানি রাজাকে দণ্ডবৎ করে তাঁর শ্রীহস্তে অর্পণ কল্লাম। রাজা সে সময় মন্ত্রীগণের সঙ্গে কিছু গুরুতর বিষয়ঘটিত কথোপকথনে ব্যস্ত ছিলেন। এ জন্যে বুঝি ওই পুঁতির প্রতি বিশেষ গৌরব না করে শিরোধানের উপর সেটি রক্ষিত কল্লেন। তারপর আবার মন্ত্রণায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তা আমি আর কি করি। চুপটি করে বসে রইলেম। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজা কিঞ্চিৎ অবসরপ্রাপ্ত হলে আমি উঠে দাঁড়িয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে বল্লাম, মহারাজ, অপরাধ গ্রহণ করবেন না, মদ্ররচিত পুঁতিখানা এভাবে শিরোধানের উপর হেলিয়ে রাখা উচিত নয়। ও অবস্থায় অধিকক্ষণ রইলে কাব্যের রসাভাব হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

প্রসাদ, বটে বটে।

ভারত, তা, সুচতুর রাজা আমার ইঙ্গিতটি বুঝে নিবিষ্ট হলেন পুঁতিপাঠে। রাজা পুঁতি পড়েন। আমি চুপটি করে অপিক্ষে করি। রাজা হেঁটমুণ্ড। আমি স্থির নেত্র। তা একসময় রাজা মুখ তুল্লেন। আমার পানে চাইলেন। আমি কিছু বলবার আগেই রাজা বলে উঠলেন, ভারত, তুমি যথার্থই কয়েছো। এই কাব্য মধ্যে রস একেবারে ঢলঢল করছে। অতএব এটি হেলিয়ে রাখলে রস গড়িয়ে পড়ার সম্যক সম্ভাবনা। ভারত, তুমি যথার্থই কবি। তোমার পরিশ্রম সার্থক।

প্রসাদ, নমুনা শোনার লোভ সামলাতে পাচ্ছিনে দাদা। কিন্তু বলতে গেলে, একেবারে খালি পেটে বদহজমি হবে না তো।

ভারত, লোভ যেকালে হয়েছে, তখন একটু বাঁচিয়ে বুঁচিয়ে সামান্য আওড়াই।

প্রসাদ এবার টানটান হয়ে বসেন।

ভারত,

খেলে রে সুন্দর সুন্দরী রঙ্গে
বিষম কুসুম শর খর শর জর জর
তর তর থর থর অঙ্গে॥
রতিন-সাগর নাগরী নাগর
সুন্দর-সুন্দরী কোলে।
চুম্বন-বদন মদন-রস-মোহিত
লোহিত কুচনেত বোলে।।
রতিমদ পাগর নাগরী-নাগর
নিরখি নিরখি দুই ঠাটে।
বাখিতে নিজ ঘর রতি রতিনায়ক
কুলপিল কুলুপ কপাটে॥

ঝম্পই সঘন নিভঙ্গ ধরাধর
অধর ধরাধরি দন্তে।
জঘন জঘনপর হৃদয় হৃদয় মিলি
মাতিল সমর দুরন্তে॥

প্রসাদ দু'হাত তুলে বলে ওঠেন, খ্যামা দাও দাদা, খ্যামা দাও। তুমি ঠিকই বলেছো। এবার বুঝি সত্যি সত্যিই রসোচ্ছ্বাস ঘটবে। একে পেটের ক্ষুধা প্রবল। তারওপর তোমার ভাদ্দর বউ অনুপস্থিত।

ভারত, হুঁ, রাজাও আমার মনোবেদনা সমঝালেন। তিনি বল্লেন, তোমার গৃহিণী আর সংসারাদির খপর বলো। আমি বল্লেম, আজ্ঞা, আমার স্ত্রী আমার শ্বশুরালয়ে আছেন। ভ্রাতাগণের সঙ্গে আমার যথাযথ সদ্ভাব নেই। এই জন্য বাটিতে যাওয়ার অভিলাষ হয় না।

প্রসাদ, তখন রাজা নির্ঘাৎ একটি বিধেন দিলেন।

ভারত, আমিই বল্লাম, গঙ্গাতীরে কিঞ্চিৎ স্থান পেলে পরিবার নিয়ে বাস করতে পারি।

প্রসাদ, একেই বলে আদিরসের গুঁতো। রাজা কেমন ঢলে পড়ছেন দেখছি।

ভারত, রাজা আমায় মূলাযোড়ে বাস করার আদেশ কল্লেন। আর বাটীর নিমিত্ত একশত টাকা দিলেন। আর বার্ষিক ছয়শত টাকা রাজস্ব নির্দিষ্ট করে গোটা মূলাযোড় গ্রামখানি ইজারা দিলেন। আদপে আমার মনোবাসনা ছিল. যে ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের কৃপায় আমি এমন কল্পতরুর আশ্রয় পেয়েছি, তাঁর বাটির কাছাকাছি থাকার। তাহলে সর্বদাই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারি। আসলে বুদ্ধিমান রাজা আমার মনোবাসনা আঁচ করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি আমায় মূলাযোড়ে গিয়ে বাস করতে বল্লেন।

প্রসাদ.

ভবেদ্বাসকসজ্জাসৌ সজ্জিতাঙ্গরতালয়া।
নিশ্চিত্যাগমনং ভর্ত্তুর্দ্বারেক্ষণপরায়ণা।।

ভারত হেসে কন, স্বামীর আগমন নিশ্চয় করে যে নারী আপনার অঙ্গ আর রতিগৃহ সুসজ্জ করে দ্বারের পানে চেয়ে থাকে তার নাম বাসসজ্জা।

চল্লিশ

বাসনা করয়ে মন, পাই কুবেরের ধন,
সদা করি বিতরণ, তুমি যত আশনা।
আশ্ নাই, আরো চাই, ইন্দ্রের ঐশ্বর্য পাই,
ক্ষুধামাত্র সুধা খাই, যমে করি ফাঁসনা॥
ফাঁসনা কেবল রৈল, বাসনা পূরণ নৈল,
লাভে হোতে লাভ হৈল, লোকে মিথ্যা ভাসনা।
ভাস্নাই কারে বলে, ভারত সন্তাপে জ্বলে,
কলার বাসনা হোলে, আ আঁরে বাসনা॥

এ পর্যন্ত বলে ভারতচন্দ্র ফিকে হাসেন রামপ্রসাদের প্রতি। প্রসাদও তাকান। এই দৃষ্টি ফেরাফিরির মাঝখানকার ভেতর ঘরে সুবাসিত চালের মাড় গালার গন্ধ, শীতল নালার জলে উষ্ণতা পতনের উল্লাস, আর বেলা গড়ানোর ঝাঁঝ এই পরিবেশটিকে পরিচয়-অপরিচয়ের থেকে বহুদূরে নিক্ষেপ করে। যেন বা এমন, কোনও গাছ গাছালময় ডোবার জল বাইরে ফুটন্ত তাতাল, গরমদিনে ডুব দিতে ডর, কিন্তু একখানে কভু আলো স্পর্শাতে পারে না—এমন জলদেশে ডুব দেওয়া মাত্র বুকের ভিতর অবধি স্নিগ্ধ হিম হয়ে যায়। সেই প্রসন্নতার কী নাম দেওয়া যেতে পারে, কে বলতে পারে। আহা, এই জীবসংসারে শতকোটি নামধারী প্রাণ-অপ্রাণের বার মহলে এমন কিছু অপরিচয় বুঝি কাল কালান্তরের নাছ দুয়ারে বেমক্কা পড়ে থাকে। কেউ তাদের খপর রাখে না। তারাও কারও সমাচারের তোয়াক্কা করে না। এরই নাম কি অপার্থিবতা?

ভারতচন্দ্র এবার নিঃশ্বাস মোচন করেন বুকের গভীরে। এইসব সরল জটিলতা যদি কবিতায় বলা যেত। যদি বলা যেত দুর্বা ঘাসের উপর তল আর নীচতলের ভাগ বাটোয়ারা, একখানে একটুকুন সাদাটে অংশবৎ ওই কী যেন বর্ণচ্ছটার কাহিনি। তার রং থেকেও রং নেই। আভাস দিয়ে আভাসটুকু হারিয়ে বসে রয়। দিনের আলো আর সন্ধ্যা পিদিমের মধ্যখানে সে আড়ে আড়ে চলে, অক্রবক্র দেখে আর অলীক ইশারাতে কথা কয়েও কইতে পারে না।

ভেতর হতে ভজহরি হাঁক পাড়ে, ভাত নাবানো হল। এবার গরম গরম বেগুনি ভাজা হবে।

রামতনু ঠুসে নস্য কষা কিঞ্চিৎ ভাঙা গলায় রা দেন, ভাজা হলেই ভাত বাড়া হবে। এই বলে দিলুম আমি।

প্রসাদ কথা বলেন, দাদা গো, বাসনা পূর্ণ তো দিব্য হল। আদপে তোমার রচনায় এটি প্রকটিত হল যে, বাসনার আসল রূপ হল কলার বাস্না।

ভারত, হ্যাঁ ভাই। এই তো জীবনের সার কথা।

প্রসাদ, এবার তাহলে ফেলে আসা অসার কথাটিও কও দাদা।

ভারত, হ্যাঁ, সেই অসারেই তো আছি এখন। তা, হলটা কী, রাজার অনুমোদন পেয়ে আমি সিধে মুলাযোড়ে চলে এলাম। সঙ্গে বহন করে নিয়ে এলাম মহারাজার দেওয়া টাকা আর ইজারার সনন্দ। সেখানে উপনীত হোয়ে পহেলা দফায় তোমার বৌঠাকুরানির শ্রীমুখারবিন্দ দর্শন কল্লেম। কতকাল পরে যে দেখা। ফলে যা হয় আর কি।

প্রসাদ, তা তো বটেই দাদা। তবে আমি বলি, ঘরণী, পরিবার যাই বলো না কেন, আদপে তো সবাই মাতৃরূপ। এ সংসারে স্ত্রীলোক তো মা বৈ আর কিছু নয়। মা হতে সৃষ্টি আর মা দিয়েই লয়।

ভারত, পরস্ত্রীকে মা বলে ভাবনা করাই ভাল লক্ষণ প্রসাদ। তারওপর তোমার পূজনীয়া বউঠাকুরানি। কিন্তু সে তো আমার তরফে ঠাকুরানিটুকু বাদ রেখে। ফলে যা হওয়ার তাই হল। কতকাল পর যেন পরিবারটিকে নিকটে পেয়ে আমি বলতে গেলে তার অন্দরে ডুব দিলাম।

প্রসাদ, ঘড়ি ঘড়ি ডুব দিও না দাদা। দম আটকে যেতে পারে।

ভারত, দম আটকানোর আগেই আমি সুস্থির হলাম। মুলাযোড়ের শ্বশুরঘর ত্যাগ করে ঘোষাল মশাইদের ভবনে একখানি ঘর নিয়ে সেখানেই বাস কর্তে লাগলাম ব্রাহ্মণীকে নিয়ে। আর এদিকে রাজার দেওয়া জমিতে নতুন ঘর তোয়ের কর্তে আরম্ভ কল্লাম। ওধারে আমার পিতৃদেব নরেন্দ্রনারায়ণ দূর হতে, অগ্রজদের আবাস থেকে খপর কর্তে লাগলেন। তাঁর বাসনা আমার নিকটে এসে বাস করেন। আমি খপর করি, আগে নতুন ঘর তোয়ের সারা হোক্। তারপর আপনাকে নিজের কাছে লয়ে আসবো।

প্রসাদ, পিতা বলে কথা। তিনি তো মাতৃ জঠরে সন্তানের বীজ বপন করেন। তবে দাদা আমার কেন জানি মনে হয় মা বস্তুটি আদপে মহাবীজ। তাহলে মহাবীজের অভ্যন্তরে পিতা বা পুরুষের দ্বারা বীজবপন। কাণ্ডটা তাহলে কী দাঁড়াল, ভাবো দাদা।

ভারত, এই জন্যেই তোমার কবিতায় জীবলোকের ধাত অনুভব করা যায়। হাত ধরলে টকাটক নাড়ির চলন টের পাওয়া যায়।

প্রসাদ, ও সব ছাড়ান দাও! এবারে আত্মকথা বলো।

ভারত, এভাবেই দিন যায়। ঘোষাল ভবনে বাস করে নিজ নিকেতন নির্মাণের তদবির করি। ঝোপ জাঙাল সাফা করিয়ে ভিত গেড়ে গঙ্গা মৃত্তিকা দিয়ে ভবনের গাঁথনি তোয়ের হয়। আমি বসে বসে দেখি আর ভাবি, মা গঙ্গার কী কৃপা। কতভাবে কত মানুষকে যে তিনি অনাদিকাল থেকে ঠাঁই দিয়ে চলেছেন। এর কোনও কামাই নেই।

প্রসাদ, মাটি তো মা-টি দাদা।

ভারত, এধারে আমার বাটি তোয়ের হয় ওধারে দেশে বর্গীয় হেঙ্গামা শোর তোলে। সে এক মহা আতান্তুরে হকিকত। আমার মন বারে বারে ধেয়ে যায় কৃষ্ণনগরে। আমি ভাবতে থাকি মহারাজা কী ফয়জতেই পড়েছেন। একে তাঁর নিজ সিংহাসন, দ্বিতীয়ে দেশকালের অস্থির পাঁচ পরিস্থিতি।

ভারত, একদিন, শুভকালে মূলাযোড়ে আমার কোঠা নির্মাণ সম্পূর্ণ হল। প্রথমে সেখানে আমার ঘরণীকে এনে তুললেম। তারপর একদিন আমার বৃদ্ধ পিতা নরেন্দ্রনারায়ণকে তথায় নিয়ে এলাম। পিতৃদেব তাতে করে বড়ই আমোদিত হয়ে বল্লেন, আমার প্রাচীন শরীর, এই বৃদ্ধ বয়সে গঙ্গাহীন দেশে বাস করা কর্তব্য হয় না। তোমার ঠাঁয়ে এসে আমি গঙ্গা প্রাপ্ত হলাম। পিতার বাক্য সত্য হল। তিনি আমার গৃহে বাস করে নিত্যি গঙ্গাস্নান করতে লাগলেন। এবং একদিন এই গঙ্গাতীরেই তাঁকে অন্তর্জলি যাত্রা করানো হল। তিনি বিষ্ণু নাম করতে করতে স্বর্গে গেলেন। পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ করলাম। এভাবেই আমার দিনগত হতে লাগল। পিতা লোকান্তরে গত হওয়ার পর থেকে মনে হতে লাগল আমার মাথার ওপর থেকে ছাদ খসে পড়েছে গুরু নিপাতের কারণে। মনে একরকমের উদাসভাব এসে ঘা দিতে লাগল। মনে হল, কতকাল কৃষ্ণনগরে যাই না।

প্রসাদ, হুঁ, রাজার ডাক বলে কথা।

ভারত, তা সেই ডাকেই আমি রাজনিবাসে গেলাম। ব্রাহ্মণীকে বলে গেলাম, চিন্তা কোরো না। আমি শীঘ্রই ফিরে আসব।

প্রসাদ, তোমার মতিগতিতে বিশ্বেস নেই দাদা। মনে যে সদাই উড়ো বাতাসের জমজমা।

ভারত, উড়ো বাতাস তো দখিনা বাতাসও বটে। তা এবার কৃষ্ণনগরে গিয়ে সেই চপল দখিনা আর বর্ষা বাতাস—দু'টিই বইল। তাতে করে রাজা ও তাঁর সভা উভয়েই প্রীত হল।

প্রসাদ সহর্ষে বলে ওঠেন, তাহলে দাদা, এই বর্ষায় কিঞ্চিৎ বসন্তবর্ণনাই হোক না কেন।

ভারত, হুঁ, বসন্ত বললেই তোমার বৌঠানের কথা মনে পড়ে যায় ভায়া। তাহলে সেই কথাই কই।

ভাল ছিল শীতকাল, সে তো কামানল জাল,
হৃদয় সহিত শাল, এবে হোলো দুরন্ত।
না ছিল কোকিল শব্দ, ভ্রমর আছিল জব্দ,
উত্তরে বাতাসে স্তব্ধ, বৃক্ষ ছিল জীবন্ত॥
এবে বায়ু সাপে খেকো, ভুবন করিল ভেকো,
কেবল কামের ডেকো, সঙ্গে লোয়ে সামন্ত।
অনঙ্গেরে অঙ্গ দিলি, শুষ্ক কাষ্ঠ মুঞ্জরিলি,
ভারতেরে ভুলাইলি, আ আরে বসন্ত॥

প্রসাদ স্নিগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকেন ভারতের প্রতি। তাঁর মনের অকাল বসন্ত বিলাপ চোখে মুখে প্রস্ফুটিত হয়। তাঁর বুক হু হু করে ফেলে আসা সর্বাণীর জন্য। মনে মনে কথা হয়, এমন রমণীরতন বুঝি এ বুনো সংসারে তাঁর জন্যই জন্ম নিয়েছে।

কিন্তু এ রমণী কি যথাউক্ত অষ্টনায়িকার অতীত? মঙ্গলা বিজয়া ভদ্রা জয়ন্তী চাপরাজিতা। নন্দিনী নারসিংহী চ বৈষ্ণবীত্যষ্ট নায়িকাঃ॥

মঙ্গলা, বিজয়া, ভদ্রা, জয়ন্তী, অপরাজিতা, নন্দিনী, নারসিংহী ও বৈষ্ণবী এই অষ্টপ্রকার নায়িকার ধরা বাঁধা নিগড়ের বাইরে কোথায় সর্বাণী! কোনওখানটিতে আর কী প্রকারে অবস্থান করে সে তার ভৈরব এই প্রসাদকে অভয় প্রদান করে।

অসিতাঙ্গো রুরুশ্চণ্ডঃ ক্রোধোন্মত্তো ভয়ঙ্করঃ। কপালী ভীষণশ্চৈব সংহারীতাষ্ট ভৈরবাঃ। অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রোধোন্মত্ত, ভয়ঙ্কর, কপালী, ভীষণ ও সংহারী এই আটজন ভৈরবের মধ্যে প্রসাদের স্থান কী প্রকার?

রামপ্রসাদ মনে মনে মাথা ঝাঁকুনি দেন। প্রায় এই অবেলায় এমন সব ভাবনা চিত্ত চঞ্চল করে সব কিছু গোলমাল পাকিয়ে দেবে। আর তার দায়ভাগ বর্তাবে ওই কবি ভারতের। এই ক্ষুধার কালে এ যে কী অনাসৃষ্টি।

প্রসাদ শুধু বলেন, আরও কিছু বাকি রইল বুঝি দাদা।

ভারত কন, হ্যাঁ, তা তো রইবেই। যে জীবনে বিধাতা পুরুষ চঞ্চল হস্তে তার ললাট লিখন সেরে বসে আছেন তার আর কী বা করার থাকতে পারে। ফলে কখনও কৃষ্ণনগরে থাকি, কখনও বাড়িতে আসি, আবার কভু ফরাসডাঙ্গায় যেয়ে ইন্দ্রনারায়ণ মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসি। এমতো কালে রাঢ় দেশে বর্গির হেঙ্গামা অতিশয় প্রবল হল। ওধারে বর্ধমানের অধীশ্বর মহারাজ তিলকচন্দ্র রায়বাহাদুরের গর্ভধারিণী তাঁর পুত্রটিকে সঙ্গে লয়ে বর্ধমান থেকে পলায়ন করে এসে উপনীত হলেন মূলাযোড়ের পূব-দক্ষিণে কাউগাছি গ্রামে। ওখানে তিনি দোহারা গড়বন্দী বাটি নির্মাণ করে সেখানে বাস কর্তে লাগলেন।

ভিতর ঘর থেকে ভজহরির হাঁক পড়ে, দাদা গো, এবার থালে আসন করি?

প্রসাদ জবাব দেন, হুঁ, তবে ধীরে সুস্থে জোগাড় করো। মনে রাখবে, বামুন ভোজন বলে কথা।

ভারত বলে যান, হ্যাঁ, এই কাউগাছির রাজভবনেই মহারাজা তিলকচন্দ্র রায়বাহাদুরের শুভ বিবাহকার্য সম্পন্ন হল। সে এক অতি সমারোহ। ফরাসি সরকারের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরি মশাই সেই মাঙ্গলিক কর্মের অধ্যক্ষ হয়ে বিশেষরূপে নৃত্যগীতের সভায় শোভাবর্ধন কল্লেন। এবং তাঁর অনুরোধে ফরাসডাঙ্গা হতে পাঁচশত সৈন্য এসে কয়েক দিবস রাজপুর আর দুর্গ রক্ষে করেছিল।

প্রসাদ, তারা কি তোমায় রক্ষে কর্বার কোনও ব্যবস্থা কল্লে? মানে একেবারে ঘাড়ের ওপর এসে বসেছে তো।

ভারত, ঠিকই বুঝেছো। মহারানি যেহেতু দেখলেন আমি মূলাযোড়ে ইজারা পেয়েছি, তার ওপর আমি যেকালে ব্রাহ্মণ, রানির ঘোড়া হাতি, গরু ইত্যাদি গ্রামের ভিত্‌রি গিয়ে গাছপালা নষ্ট করলে ব্রহ্মস্ব হরণ করা হবে, অতএব মূলাজোড় গ্রামখানি তিনি পত্তনি নেবার ইচ্ছে করে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে পত্র লিখলেন। নবদ্বীপনাথ সেটি প্রদানে রাজি হলে রানি নিজের কর্মচারী রামদেব নাগের নামে পত্তনি নিলেন।

প্রসাদ, অর্থাৎ নাগবংশ এসে ঘাড়ে ফণা ধরল।

ভারত, আমি এ কথা শুনে স্বয়ং রাজার ঠাঁয়ে বিস্তর আপত্তি দাখিল করলাম। শুনে রাজা বল্লেন, বর্ধমানেশ্বর যখন আমার অধিকারে বাস করতে চান তখন আমার কত আহ্লাদ বিবেচনা কর। তাছাড়া পত্তনির নিমিত্ত স্বয়ং রানি যেকালে পত্র লিখেছেন, তখন তাঁর সন্মান ও অনুরোধ রক্ষে করা আমার কর্তব্য। তখন আমি বলি, তাহলে আমার কী দশা হবে মহারাজ? রাজা কইলেন, তুমি বরং মূলাযোড়ের বদলে আনরপুরের গুস্তে গ্রামে গিয়ে বসত করো।

প্রসাদ, চক্রবৎ পরিবর্তন বা পরিভ্রমণ।

ভারত, রাজা আমার সন্তোষের জন্যে আনরপুরের গুস্তেবাসী মুখোপাধ্যায় দিগরের বাড়ির নিকটে একশো পাঁচ বিঘে আর মুলাযোড়ে যোলো বিঘে ভূ-সম্পত্তি এককালে স্বত্ত্ব পরিত্যাগ করে ব্রহ্মত্র হিসেবে দান কল্লেন। কিন্তু সেখানে এক সঙ্কট উপস্থিত হল। সঙ্কট না অনুরোধ না উপরোধ কিংবা অনুনয়, কী বলব ভায়া।

শ্মশানের দেওয়ালে কাটারি দিয়ে কেটে আর কাঠকয়লার লেখা কত না নামের বেমক্কা মালা। তারাচরণ, শিবানী, অমিতাভ, খেপা, নন্দরানী, কমলা, চন্দ্রাবলী, হীরালাল, রজত—এমনি সব কিসিম। কতগুলো নামের শরীরে পুরনো শ্যাওলা গেড়ে বসেছে। কিন্তু মানুষগুলো হাওয়া। আশ্চর্য! জ্বলজ্যান্ত দেহখানা পুড়ে ছাই। নাইকুণ্ডল গঙ্গায় বিসর্জন। তারপর যারা চালিতে করে বয়ে এনেছিল, তারা সব দুদ্দাড়িয়ে বলহরি হরিবোল, বিদায় নিল। পুড়ে খাক আত্মার হাওয়াটি দাদুর বলে দেওয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠবৎ অশরীর হয়ে এই নিঝুম শ্মশানে একলা একলা দাঁড়িয়ে রইল। কেউ তাকে ডাকল না, বাড়িতে ফেরার জন্যে। অথচ সেই বাড়িতেই তো তার থাকার কথা। সেখানেই তো তার নিজের লোকজন, খাট,

আলমারি, স্যুটকেস, হিসেবের খাতা, মানিব্যাগ, জামাটামা, গামছা-তোয়ালে, শেভিং ব্রাশ, রেজার চিরুনি...। সব পড়ে রইল ওখানে। কেউ একবার ভুল করেও এসে বলল না, কী, বাড়ি যাবে না?

দাদুর হিসেব তো মরে যাওয়ার পর আত্মাটি দেহের খোল ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়লেও, প্রথম প্রথম সে ধরতে পারে না ব্যাপারটা কী হল।

দেহটা পড়ে আছে। সবাই কাঁদছে। কোথায় গেলে গো। কী হয়ে গেল গো। তাকে ঘিরে কতসব কান্না, হাহাকার। বুকের ওপর ফুলের মালা পড়ছে। তেড়ে ধূপ জ্বালানো হয়েছে গোছা গোছা। বনবনিয়ে ফ্যান ঘুরছে। মৃতের সামান্য হাঁ মুখের কানাচে মাছি বসছে। কে একজনা হাত নেড়ে উড়িয়ে দিচ্ছে। নাকের ছিদ্রে তুলো গুঁজে দেওয়া হল। সেন্টের লম্বা শিশি খুলে পুচ পুচ গন্ধ নিক্ষেপ হল। আর সে ঠিক তার পড়ে থাকা নিঝুম দেহটির পাশ কামড়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, এ সব হচ্ছেটা কী!

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়...। জীর্ণ কাপড় ফেলে নতুন বসন পরো হে বাছা। পরো পরো। পরে নাও চটপটাপট।

তা তো পরলাম, কেনই বা পরলাম, তা ভগা জানে। কিন্তু ওইসব মূঢ় বোকার দল কাঁদে কেন। আমার পরিবারটিই বা কেন ঘন ঘন মুচ্ছো যায়। এই প্রৌঢ় বয়েসে, মাত্তর দু'বছর ওর ইউটারাস অপারেশন করানো হল। ভারী জিনিস টানা কিংবা মাটিতে পতন নিষিদ্ধ।

আমি বর্তমান আছি। আমার শরীরটা নিয়ে সবাই টানপাড়াপাড়ি করছে। আমায় নিয়ে সকলে পাস্ট টেনসে খেলছে। এর নাম কি ঘটমান অতীত!

আমি আমার আশে পাশে ঘুরঘুর করছি। আমাকে ঘিরেই ঘুরছি। ঘিরে বসে থাকা আপনার জন, পরের জনের অলিগলি দিয়ে নিজেকে টপকাচ্ছি। প্রদক্ষিণ করছি। ছুঁয়ে দেখছি। কিন্তু ঠিকঠাক ছোঁয়া যাচ্ছে না। হাতটা কেবলই দেহ ছেড়ে এধার ওধার ফসকে যাচ্ছে। গলে যাচ্ছে। খেই হারাচ্ছে।

...তস্মাদপরিহার্যেহর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ বলা যত সহজ, লিখে পড়ে কপচানো যত সরল, ব্যাপারটা ঠিক ততটা জলবৎ নয়। খানিক পরে কোথা থেকে সুবলকে ধরে আনা হল। সঙ্গে পাড়ার পান-বরোজ মালিক শীর্ণ পটকা গলে কণ্ঠিধারী আর সদাই চোখ পিট পিট সুরেন পাল। তাঁর হস্তে খঞ্জনী। সঙ্গে সুরেন বাবুর ছেলে অজামিল। তার গলায় ঝুলন্ত আশ্চর্যমলম হারমোনিয়াম। ওটা বাজিয়েই ছেলে লোকাল ট্রেনে মলম, বাম, ব্যাতারি বটি আর গ্যাসকিওর বেচে। তাদের পেছনে উঁকি দিল লালমোহন রেল খালাসি। রোগা খ্যাংরা। চোয়াড়ে বদন। কুলো চ্যাটানো কানময় খোঁচা খোঁচা লোম। আর সর্বদাই চার্মিনারের ঝাঁঝ ওর আওতা ঘিরে। ওই ময়ূর ছাড়া খয়া কাত্তিকেটির সঙ্গে সুরেন পালের বড় কন্যে, ভারি লাবণ্য সুন্দরী শোভারানির প্রেম আছে। সুরেন সে কথা জানে। কিন্তু দজ্জাল মেয়ের ভয়ে মিনমিনও করতে পারে না।

আমাকে শেতলপাটি আর তোষক হলহলিয়ে তুলে ধরল জনা পাঁচ-ছয় পাষণ্ড। আমি বলি, রাখ্ রাখ্। নামা নামা। শরীরটার ভেতরে ঢুকতে, যাকে বলে, জেরবার হই। নাকে না হয় তুলো. কান দুটো তো খোলা। মুখখানা সামান্য হাঁ। যেখান দিয়েই ভেতর ঘরে

প্রবেশ করতে চাই সুমুখে নিরেট বরফের চাঙড়। আমার সাধ্যি কী, ওটি ভেদ করি। এমনকী গৃহদ্বারেও সেই একই আটকা।

বাইরে রাখা একখানা, মনে হয় কতক পেঁপে কাঠের খাটিয়ার ওপর আমায় ঝপাত করে ঢেলে দেওয়া হল। আমার মুণ্ডটা রবারের মতো নড়লচড়ল। ঠিক তখনই সুবল একটা লাফ দিয়ে বিকট সুরে তেড়ে গান ধরল, ভাইরে গুরুর নাম করো সসাধোনা, সা আ আ ধোনা। যে নামেতে পাপো হরে, ঘোচে ভব যন্তোনা—। সুরেন পাল খঞ্জনী ঠোকেন। তস্য ছেলে হারমোনিয়ামের রিডে প্রায় নাক ঘসে মর্মান্তিক দোহার ছাড়ে। লালমোহন খ্যাকর খ্যাক কাসতে কাসতে আর্তনাদ করে, ঘোচে ভব যন্ত্রণা—

আমার চলনের গতি কী আশ্চর্য বেড়ে গিয়েছে। কতখানি, তার হিসেব করার সময় নেই আমার। ওদের হাবভাবে বুঝতে পারি, এরা কোথায় যাবে। আর মনে করা মাত্র, চোখের পাতা পড়বার আগেই এক্কেবারে গঙ্গার তীরে, শ্মশানে উপনীত আমি। ওখানেই এই মাত্তর একটি দেহ পুড়িয়ে দাহকারীর দল ফিরতি পথে।

ওরা এসে পড়ল হইহই করতে করতে। সঙ্গে খোল-কত্তালময় ভয়ঙ্কর গুরুর নাম। আমি তখনও যারপরনাই ভেতরে সেঁধোতে চেষ্টা কল্লুম, নারকোল দড়ি দিয়ে আচ্ছা করে এসপার ওসপার বাঁধা আমারই। হল না। হল না। আমি রাগে ফুঁসতে লাগলাম। কখনও ভেউ ভেউ কাঁদন। কিছুতেই কিচ্ছু হওয়ার নয়।

গুব গুবাগুব খোলে থাপ্পড় গুরুর নাম। চানটান করিয়ে এক চিলতে জ্যালজেলে থানে আধখানা অঙ্গ ঢেকে আমার শয়ান হয় মোটা মোটা আমকাঠের বিছানায়। বল হরি, হরিইইই বোল ল ল। ঘোচে ভব যন্ত্রণা। গাব গুবাগুব. গাবগুবাগুব। দেবাশ্চাগ্নিমুখাঃ, সর্বে হুতাশনং গৃহীত্বা এনং দহন্তু... দহেয়ং সর্বগাত্রানি দিব্যান লোকান্ স গচ্ছতু। মন্তরটা কিন্তু মন্দ লাগছে না।

কিন্তু এর নাম কি দিব্যালোক! আমি তো কোনও তফাৎ বুঝতে পারছি না। কিন্তু যেই না আমার বড়পুত্র আমার মুখে আগুন রাখে, অমনি মনে হয় ওকে আঁচড়ে কামড়ে পিষ্ট করি!

রাত নিঝুমে একেবারে একলাটি। ঘুর ঘুর করি বাড়ির দুয়ারে। ভেতরে প্রবেশ করি। সবাই বেঘোর ঘুমে। মুখে আগুন ছেলের কাছা ধড়ার সঙ্গে পগেয়া একখানা লোহার চাবি লটকানো। পরিবার ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে নাক ডাকাচ্ছে।

সুবল বলল, সাথ্থোকপর জগৎ।

আমি বলি, তাই তো।

সুবল গম্ভীর থেকে আরও গম্ভীর। বুঝলি, বিয়ে থা করিস না।

আমি সায় রাখি, মাথা খারাপ!

—তাহলে কী করবি?

চকিতে আমার চোখে বাড়িতে সদাই দেখা অনেকগুলো গেরুয়া হানা দেয়। তার মধ্যে কিছু লাল-সাদাও আছে। বলে উঠি, সন্নিসী হবো। সংসার ত্যাগ করব।

—কোতায় যাবি বাড়ি ছেড়ে?

—কেন, হিমালয়ে।

—কী করবি? কোথায় থাকবি?

খানিক চুপ করে একফোঁটা ভাবি। তারপর বলে উঠি, গুহায় বসে ধ্যান করব।

—খাবি কী?

—জানি না?

—কী ধ্যান করবি।

—জানি না।

—দূর শালা। আমার দ্বারা ওসব হবে না। আমি একটা ইলেকট্রিকের দোকান দেব। রোজ সন্ধেবেলা দোকানের সামনে লাল নীল টুনির মালা জ্বালাবো।

—তাহলে তোর মূর্তি গড়ার ছাঁচকোঁচগুলো আমায় দিয়ে দিবি? আমি একটা দুগ্গাঠাকুর বানাব।

—হিমালয়ের গুহায় বসে দুগ্গাঠাকুর বানাবি!

দাদুর বইয়ের আলমারিতে আত্মাটাত্মা নিয়ে অনেক বই আছে। বেশিরভাগই ইংরেজি। তার মধ্যে দু-পাঁচটি বাংলায়। একখানা বইয়ের মলাট আমার চোখে করকরায়। একখানা রহস্য রহস্য আর তেরঙ্গা হাতের চার আঙুলে কীরকম গোল গোল হলুদ রঙা আঙটি পরানো। হাতের তালুতে লকলকে লাল আগুনের শিখা। শিখার গায়ে কালো কালো ঘোর প্যাঁচ। হাতের তলদেশটি পুড়ে কাঠকয়লা। ঠিক তার নীচে কী সুন্দর আর বুক ছমছম নিচু নিচু আগুনের শিখা ওপর পানে মাথা চাগাড় দিয়ে নৃত্য করছে।

'মরণের পারে এক রহস্যময় দেশ—যে দেশে সূর্য নাই, চন্দ্র নাই, নক্ষত্র নাই, যে দেশে স্থূল নাই, কেবলই সূক্ষ্ম ভাবনা ও সূক্ষ্ম চিন্তার রাজ্য। এই চিন্তার রাজ্যকেই মনোরাজ্য বা স্বপ্নরাজ্য বলে।'

সুবলকে বলি, তুই বাড়ি যা। আমি আর একটু পরে যাব।

সুবল ড্যাবা ড্যাবা চক্ষু তুলে বলে, থালে ক্ষুদিরামের দোকানে আজ আর ঘুগনি খাবি না!

—সে আর একদিন হবে। তুই এখন যা।

সুবল উঠে দাঁড়ায়, হিমালয়ে পালাবি নাকি?

একচল্লিশ

কতক্ষণ একলা একলা বসে আছি এ নিঝ্‌ঝুম শ্মশানে তা কে জানে। সুবলকে তো প্রায় জোর করেই বিদেয় করলাম। ওদিকে সামনের চিলুতে শবদেহ যে কখন পুড়ে খাক, আমার চোখের সামনে। সেই সঙ্গে বেলা গড়াতে গড়াতে দুপুর থেকে বিকেলের দিকে টাল খাচ্ছে। মোটামুটি তিন-চার হস্ত উঁচু কাঠের বান্ডিলে শয়ান বেটামানুষটির শরীর কোথায় যে ফুসস্ হয়ে গেল। একসময় নজর করা গেল পুড়ন্ত কালো কাঠের মাঝখানে মানুষটাকে আর তেমন আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না। একটু আগে অব্দি দগ্ধ কালো কালো হাত, পা, ধড় সবই বহাল ছিল। এখন জ্বলন্ত কাঠের মাচাটা যথেষ্ট নেমে দাঁড়িয়েছে চিলুর মাটির কাছাকাছি। তার মধ্যিখানে একস্থানে লোকটির মুণ্ডের আদল

একটা ছোট্ট নারকোল পোড়া সম কীরকম ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে আছে। কোথায় চোখ আর কোথায়ই বা মুখের ফাঁদ, নাক ইত্যাদি। সব তালগোল পাকিয়ে আস্ত দরকচা হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্কুলের ইতিহাস বইতে দেখা মিশরের প্রাচীন মমির মুখের ছবির চেয়েও ভজকট।

এধারে শ্মশানযাত্রীগণ খোল দাবড়ে কেত্তন করে করে আলা। এমনকী চা-বিড়িতেও তাদের অরুচ বুঝি। দু'জন লোক ফিঙে কাকার সঙ্গে একটু তফাতে ঝোপের ধারে ঝাঁকড়া বাবলা তলে বসে ধুম গাঁজা টানছে। তাদের মাথার একধারে গঙ্গার ওপারে থরথর মস্ত টকটকে মহাগোল সূর্য। ডানলপ কারখানার জেটির কোনাকুনি ত্রিবেণীর দিকে কান্নিক মেরে সেই মহা ব্যাপারটা প্রকাণ্ড জগন্নাথি এক চক্ষু হয়ে ধক্ ধক্ করছে। কার অদৃশ্য হাতের তালুর ওপরে কাণ্ডটা কাঁপছে। ঠিক দাদুর আলমারিতে রাখা সেই আত্মা নিয়ে বইটার মলাটের ছবির মতো। রহস্য রহস্য আর অদ্ভুত আঙটি পরা তেরঙা সেই হাতের তালুতে আগুন জ্বলন্ত, শিখার গায়ে কালো কালো প্যাঁচ। হাতের তলটি পুড়ে কাঠকয়লা। তার নীচে বুক ছমছমে নিচু নিচু আগুনের অনেক শিখা গঙ্গার ঢেউয়ের মাথায় মাথায় সাপের ছানাপোনা হয়ে কিলবিলিয়ে নাচছে। হাতটা সরিয়ে নিলেই অমনি টুক করে প্রকাণ্ড অগ্নিগোলাটি গঙ্গায় নেমে পড়বে। তেড়ে গর্জন হবে ছ্যাঁক্ কা স স্ স্। তারপর শান্ত নদী স্রোত। এক দঙ্গল কচুরিপানা এসে ঘাই দিচ্ছে।

কে একজনা হাঁক দিল, নাও নাও সব লাইন দাও। চিতা ফিনিশ হয়ে এল। বলার একটু পরেই আগুনের মাচাটা আরও নেমে দাঁড়ায়। আস্ত নারকোল মুণ্ডটা হাওয়া। সব পুড়ে চটকে একেবারে একসা। গঙ্গার দিককার বাঁধানো সিঁড়ির ধাপে শ্মশানবন্ধুদের লাইন পড়ে। একেবারে নীচে, জলের কোল কামড়ে একজনা। তার হস্তের মেটে কলসী টকটকে সূর্য এসে পড়া ঘোলা জলের স্রোতে বগবগিয়ে ডোবে। এক হাত থেকে কলসী প্রায় লম্ফ দিতে দিতে অন্যদের হাত হয়ে ওপরে একেবারে ধিকি ধিকি পোড়া চিলুর নিকটে। প্রথম ব্যক্তি জল ঢালে ঢেইয়ে দেওয়ার কায়দায়। ভসসস্, ভস স্ স্ উল্লাস হয়। ফিঙে কাকা অদূরে লাল চোখো দণ্ডায়মান গতিকে বলে ওঠে, পেত্তোকে তিন কলসী করে।

তার আগে অবিশ্যি মৃতের মুখে আগুন ছেলে এব· িঘ্দা পরিমাণ সাত টুকরো পাট কাঠি নিয়ে সাতবার চিতা পাক দিতে দিতে এক একটি কাঠি আগুনে দেয়। সবাই হু দেয় বলহরি, হরিবোল। আমি কেবল ধাঁধাঁয় পড়ে ভাবি শ্মশানে চিরকাল কেন হরিধ্বনি। আর কোনও ঠাকুর-দেবতার নাম, মানে কালীর নাম কি মানায় না। তা বাদে আমার মন বলে, এমন পরিবেশে আর কালে এত চিৎকার চেঁচামেচি না করে সবাই চুপ করে থাকলেই তো ভাল হয়।

আমার মনে মনে প্রত্যক্ষদর্শীর মতো দাদুকে প্রায়ই শোনাতে বসা সেই রামপ্রসাদী গানের টুকরোটা ঘোঁট পাকায়। মায়ে যত ভালবাসে, বুঝা যাবে মৃত্যু শেষে, মোলে দণ্ড দু-চার কান্নাকাটি, শেষে দিবে গোবর ছড়া। ভাই বন্ধু দারা সুত, কেবলমাত্র মায়ার গোড়া। মোলে সঙ্গে দিবে মেটে কলসী, কড়ি দিবে অষ্ট কড়া। অঙ্গেতে যত আভরণ, সকলই করিবে হরণ, দোসর বস্ত্র গায় দিবে চার কোণা, মাঝখানে ফাড়া॥

আমাদের হালিসহরের রামপ্রসাদ নির্ঘাৎ বিস্তর মড়া পুড়িয়েছেন। তা না হলে এমন

হুবহু ছবি কী করে তৈরি হয়। তবে শুধু একটাই রহস্য। আমার দাদু কেন গানটার এই বিশেষ জায়গাটা শুনে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন! পুরো গানটা বেশিরভাগ দিনই গাওয়া হয় না। তাহলে কি দাদুর মনে মৃত্যুভয় ঘাই দিচ্ছে। এদিকে মাথার ওপর বুড়ি মা। মায়ের তুলনায় বেটার রুগ্ন শরীর। মায়ের আগে পুত্র গেলে সে ভারী গোলমেলে অবস্থা। কে জানে, দাদুর মনে ভয় এই গানখানার উল্টোবাগেও হতে পারে।

শ্মশানযাত্রীগণ এবার দল বেঁধে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যেতে লাগল। এ ঘাটে কেউ চান করে না মড়া পুড়িয়ে। আসলে মিউনিসিপ্যালিটির নজর নেই এখানকার পরিচ্ছন্নতার দিকে। ভাঙা হাঁড়ি-কলসী, মড়ার ছেঁড়া খোঁড়া লেপ-তোষক-মাদুর ইত্যাদি মিলিয়ে বিচ্ছিরি অবস্থা। সেই জন্যেই ওরা এখব চান করতে যাবে রামপ্রসাদের ঘাটে, যার ডাক নাম ফাঁড়ির ঘাট। কারণ ওখানে একটি পুলিশ ফাঁড়ি আছে। এই ফাঁড়ির টানা বারান্দায় একজন না একজন গুরুগম্ভীর পুলিশ খাকি ড্রেস পরে ধুমসো বন্দুক হাতে আর পায়ে হাওয়াই চপ্পল পরে পায়চারি করে। বাদবাকি বন্ধুগণ ভেতরে লম্বা ঘরে খাটিয়ায় বসে হয় খায় নয় নাক ডাকায়, চুল আঁচড়ায়। আর একটা ছোট ঘরে সদাই ওয়ারলেসে ভূতের গলায় টানা বকবকম হয়, হ্যাঁ, মাইকেল, মাইকেল, মাইকেল... অ্যাপলো এখন বরানগর—বরানগর ছাড়ল, ওভার, ওভার। কে জানে, ভূত, মানে আত্মাদের কি কোনও আলাদা গলা আছে? তারা কেমন করে কথা কয়? তাহল ভূতের গল্পের বইয়ে এমন ওয়ারলেস নাকি কণ্ঠির কথা লেখে কেন? ব্যাপারগুলো দাদুর কাছ থেকে জেনে নিতে হবে।

'আর একটি বৈঠকে যোগেনকে সশরীরে দেখতে চেয়েছিলাম। সে তাতে অসম্মতি প্রকাশ করেছিল। তবে লিলি-ভেলে মিসেস্ মস্-এর এক উপবেশনে আমি ৫৭, রামকান্ত বসু স্ট্রিটের বলরাম বসুকে দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। জীবিত অবস্থার মতোই তিনি ঠিক তাঁর সেই সাদা পাগড়িটি পরেছিলেন। তবে তাঁর পাগড়িটি আরো উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল যেন তার মধ্যে ছোট ছোট ইলেকট্রিক বাল্ব জ্বলছে। শ্মশ্রুগুম্ফিত গম্ভীর বদন আর জ্যোতির্ময় চেহারা দেখে আমার চোখ ঝল্সে গিয়েছিল। তিনি অবশ্য কোন কথা বলেননি; তবে মাথা নেড়ে আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন।...'

'আমি প্রথমে বুঝতে না পেবে আশ্চর্য হয়েছিলাম যে, কেন তিনি কথা বলেননি। পরে জিজ্ঞাসা করে জানলাম ইহজীবন ত্যাগ করার ঠিক আগেই তাঁর কথা বন্ধ হয়ে যায়।... বলরাম বসু ডবল নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ায় এক সপ্তাহের বেশি কারুর সঙ্গে কথা কইতে পারেননি।'

দাদুর আলমারির সেই অদ্ভুত বইয়ে এমনটি লেখা আছে। এটা মনে পড়ায় আমার আর ভূত বলতে ইচ্ছে করে না। তার চেয়ে, এই বইয়ের খাতিরে আত্মা বলাই ভাল। বিশেষ করে শ্মশানে তো বটেই।

আর এক জায়গায় লেখা হচ্ছে, 'নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্রের বিদেহী আত্মাকে দেখেছিলেন স্বামী অভেদানন্দ। আমেরিকায় থাকাকালে বিশ্রাম করছেন, এমন সময় হঠাৎ বাতাসে গিরিশবাবুর মুখ দেখতে পেলেন। গিরিশবাবু চারদিকে 'থু থু' শব্দ করতে লাগলেন ও তৎক্ষণাৎ আবার বাতাসে মিলিয়ে গেলেন।'

সূর্য গঙ্গার জলে ডুব দেওয়ার পর বেশ খানিক সময় যে আলো আলো ভাব বজায় ছিল, সেটি মুছে গিয়েছে কখন খেয়াল নেই। দু'টি একটি করে শেয়াল ফুকরোতে আরম্ভ করল। সেই সঙ্গে অনেক ঝিঁঝির ঝাঁক। কী একটা পাখি ক্যাট ক্যাট ডাকে তো ডাকেই। গঙ্গার ওপারে সার সার আলার মধ্যে ডানলপ জেটির গনগনে সাদা আলো চারপাশের অন্ধকারকে আরও জাতিচ্যুত করে। নদীতে নৌকো চরে। কে এক মাঝি হিন্দি ফিল্মের গীত গায় তেড়ে। পারাপারি নৌকো দিব্যি যাতায়াত করে। নৌকোর পাল কীরকম তেরছা হয়ে শূন্যে ঠেস দিয়ে রয়। এধারে বাস রাস্তার দিক থেকে গড়গড়ানো শব্দ হয়। ধাওয়া দেয় রিকশার পঁক পঁক। শ্মশানের প্রাচীন গাছেদের মাথা টপকে হুহু হাওয়া হয়। ওপর রাস্তার ধারে মিউনিসিপ্যালিটির মেথর পট্টিতে একটি শুয়োর বিকট আর্তনাদ ছাড়ে। পা বাঁধা অবস্থায় লোহার শিক গরম করে ওর মলদ্বারে ভরে দিয়ে হত্যার বন্দোবস্ত হচ্ছে। রাত হলে আজ মহাভোজ। সঙ্গে স্বদেশী তাড়ি।

আমায় ঘিরে অন্ধকার গুমরোচ্ছে। ঝিঁঝিঁ ডাকছে গলা ছেড়ে। শ্মশানবাসী শিবা আর কুকুর দলে লড়াই ঝগড়া হচ্ছে খানা-পিনা বিষয়ে। বিকট খ্যা খ্যা, গোঁ গরর্ ধ্বনি উঠছে বুনো বাদাড়ের দিকে। বাবলা গাছেদের দঙ্গলে জোনাকি চোখ মটকাচ্ছে। সবুজ আলোর ঝাঁক ঘুরছে গাছ থেকে গাছান্তরে। ওদিকে, মাঝখানের বুনো বাগানটা পেরিয়ে নিগমানন্দ আশ্রমে সশব্দে বেজে উঠল সন্ধ্যা আরতির ঝাঁঝর ঘণ্টা, ভেবি। সঙ্গে একটানা সিলিঙে টাঙানো ঘণ্টা ঢং ঢং ঢং ঢং।

—কী রে খোকা, একলা একলা কী কচ্চিস্?

চমকে তাকাই এতক্ষণকার ঘোর ছিঁড়ে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি, ছানাকাটা অন্ধকারে আমার পেছনে এসে দণ্ডায়মান শ্মশানচারী ফিঙে কাকা। শীর্ণ আড়ার মাথা থেকে লিকলিকে জটার ক'টি ছন্ন টুকরো। পাতলা পাতলা কপচানো দাড়ি। মালকোঁচা হাঁটু জাগানো ময়লা খেঁটে ধুতির ট্যাঁকে ডবকা হয়ে আছে বিড়ির কোটো। হাড়গিলে ছোট্ট বুকের ওপর রুদ্রাক্ষের মালা দুলদুল করছে। দু-হাতের মাজায় ওইরকম রুদ্রাক্ষের বেড়। কাকা হাতের মুঠোর ফাঁকে সিগারেট গুঁজে চোয়াড়ে গাল সিঁটিয়ে টান দিচ্ছে।

আমার হতভম্ব মুখ দেখে এই বেপট গম্ভীর মানুষটি মিনমিনিয়ে হাসে। কি হল, কথা কচ্চিস্ না যে।

আমি বলি, না, এমনি।

কাকা ভ্রূ তোলে, নামায়। এমনি। তুই চৌধুরিপাড়ার কানু মুখুজ্যের ছেলে না?

— হ্যাঁ।

— হুঁ। তা লেখাপড়া করা হয় না?

হয়। হালিসহর ইস্কুলে।

এবার ফিঙে কাকা আমার দিকে ঝুঁকে বলে, বিস্কুট খাবি?

আমি কিছু বলবার আগেই সে পেছনে উঁচু তুলসী মঞ্চের গা থেকে একটি ঠোঙা তুলে নেয়। তারপর সেটি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, নে, ধর্।

ফিঙে কাকা আনমনা পেছু ফিরতে ফিরতে আপন মনেই বলে, ছেলেমানুষ। এ বয়েসে এমন বিবাগী মন। ভাল ভাল।

কীসের ভাল, কেন ভাল, এ সব বোঝার আগেই আমি তড়াক উঠে দাঁড়াই। দেখি কাকা লম্বা লম্বা সিঁড়ি টপকে ওপরে উঠে যাচ্ছে।

আমি আর দেরি না করে গঙ্গার দিকে সিঁড়ি বরাবর টকাটক্ নেমে যাই নীচে। আমার খালি পায়ের একেবারে কানাচে গঙ্গার স্রোত কুলকুল, কুলকুল। থেকে থেকে পাড়ের খোঁদলে বগ বগ, বগ বগ। কুচো কুচো কাঁকড়ার পাল জলের ধারে ঘুর ঘুর করছে। শ্মশানের সিঁড়িতে নতুন করে বলহরিইইই...। তার মানে আবার নতুন মড়া আসছে। আর বিলম্ব করা যাবে না। এখুনি সংসার ত্যাগ করতে হবে।

একেবারে সিধে হিমালয়।

বারান্ডায় যথারীতি রামপ্রসাদ-ভারতচন্দ্র আলাপনে নিমগণ। ভিতরে অতিথিভবনের একান্তে দ্বিপ্রহবের রাঁধন বুঝি শেষ, রামতনু-ভজহরির হাতে। এখন বুঝি গরম গরম বেগুনি ভাজন আর তৎপরেই ভাত বাড়ন।

এ কথা মনে পড়তে ভারতচন্দ্র এতক্ষণের কথা সূত্র ছেড়ে একটু আনপথে চলে যান হঠাৎই। তিনি প্রসাদকে বলেন, বলি ভায়া। এই এতক্ষণ আমার ঘুরো জীবনের আঁচড়-পাঁচড় দেখতে দেখতে আর হরেক কিসিমের ভাষার কথা কইতে কইতে আমার কিছু সংস্কৃত সুরসিক বেক্তির কথা মনে পড়ে গেল। সেটি বলব কি?

প্রসাদ সহর্ষে বলেন, বলো দাদা বলো। অপগণ্ড কথা শুনলে কয়েক গণ্ডা বেশি ভাত খাওয়া যাবে।

ভারত, ভাত আবার গণ্ডা হল কবে! সে তো নুচিকেই মানায় বলে জানি।

প্রসাদ, ওটাও ধরে নাও আর্যপ্রয়োগ দাদা। তাহলেও এমন কিছু কও, যা শুনলে ক্ষুধার উদ্দীপন হয়।

ভারতচন্দ্র কূট চোখ তুলে রামপ্রসাদের দিকে একবার দেখেন। তাঁর ঠোঁটের কানাচে দুষ্ট হাসির তরঙ্গ ঘোরাফেরা করে। তিনি গলা নিচু করে বলেন, বেশ, তাহলে একটু উদ্দীপনার কথাই কই।

প্রসাদ স-উৎসাহে বলেন, বলো দাদা, বলো।

ভারত,

দন্তে গৌড়াঙ্গনানাং সুললিতজঘনে চোৎকল প্রেয়সীনাং
তৈলঙ্গিনাং নিতম্বে সুঘনঘনরুচৌ কেরলীকেশপাশে।
বাচি শ্রীমাথুরীণাং জনকজনপদস্থায়িনীনাং কটাক্ষে
কর্ণাটীনাং কটৌ চ স্ফুরতি রতিপতি গুর্জরীণাং স্তনেহসৌ॥

প্রসাদ স্থির চক্ষে বলেন, তার মানে কোন অঞ্চলের রমণীদের দেহের কোন অংশ সুন্দর।

ভারত মিচকি মিচকি হাসতে হাসতে বলে যান, গৌড়দেশের নারীরা দন্তপাতিতে, উড়িষ্যার নারীগণের সুললিত জঘনদেশে, তৈলঙ্গ রমণীদের নিতম্বে, কেরল নারীদের ঘনকৃষ্ণ কেশ কলাপে, মথুরার নারীদের বাক্যে, মিথিলা রমণীদের সুন্দর কটাক্ষে, কর্ণাট নারীদের কটিদেশে এবং গুর্জর নারীদের উন্নত স্তনদেশে রতিপতি কামদেব পরমানন্দে বাস করেন।

প্রসাদ সামান্য হেসে বলে ওঠেন, সে যাই বলো দাদা, প্রিয়তমার সর্বাঙ্গই সুন্দর। হৃদয়ে হৃদয় মিলনই প্রকৃত প্রেম। শরীরের সঙ্গে শরীরর মিলন ব্যতিরেকেও। ন তনুসঙ্গম এব সুসঙ্গমো, হৃদয়সঙ্গম এব সুসঙ্গমঃ।

ভারত, বেশ, তাহলে পুরুষ প্রধান শ্রীকৃষ্ণের কথাই একটু বলি।

প্রসাদ, শুনি।

ভারত,

যো লীলয়া গোকুলগোপনায়
গোবর্ধনং ভূধরমুদ্‌ধার।
স্বিন্নঃ স্বকম্পঃ সব বভূব রাধা-
পয়োধর-ক্ষ্মাধর-দর্শনেন ॥

প্রসাদ, অর্থটি তোমার শ্রীমুখেই শুনি দাদা।

ভারত, যে কৃষ্ণ গোকুলকে রক্ষে করার জন্যে গোবর্ধন পর্বতকে অনায়াসে ধারণ করেছিলেন, সেই কৃষ্ণই শ্রীরাধিকার পয়োধর রূপ পর্বত দেখে উত্তেজনায় ঘর্মাক্ত ও কম্পিত কলেবর হয়েছিলেন।

রামপ্রসাদ চুপ করে থাকেন কিছুক্ষণ। ভারত তাঁর মুখভাব লক্ষ করে যান। তারপর এক সময় বলে ওঠেন, কিছু বলবে মনে হচ্ছে ভায়া।

রামপ্রসাদ হেসে ওঠেন নিচু শব্দে। তারপর বলেন, হ্যাঁ দাদা। এটি বলেই আমরা মধ্যাহ্ন ভোজনে যাবো। তা, যেটি বলব সেটি খানিক নাট্য আকারে।

ভারত, বাঃ বাঃ। এ তো অভিনব।

প্রসাদ, পথিক বলছে, কস্ত্বং ভোঃ। তুমি কে?

কবি, আমি এক কবি।

পথিক, তুমি যদি কবি হবে, তাহলে এমন ক্ষীণকায় কেন?

কবি, প্রত্যহ অনাহারের জন্য আমার দেহ ক্ষীণ হয়েছে।

পথিক, ধিক্ এ পোড়া দেশকে! যে দেশে তোমার মতো গুণীজনেরও এমন দুর্গতি উপস্থিত!

কবি, ধিক্ দেশকে নয়, আমার মতো এই অভাগাকে ধিক্। কারণ, আমি যখন ক্ষুধায় কাতর হয়ে পাক করার উদ্‌যোগ নিই, তখন এমনই পোড়া কপাল যে গোটা বিন্ধ্যারণ্য ঘুরেও জ্বালানি কাঠ পাই না, সমুদ্রেও জল পাই না এবং সমস্ত পৃথিবীতেও রান্নার উপযুক্ত চাল পাই না। তাই তো আমার মতো কবির কপালে অন্নভোজন হয়ে ওঠে না।

ভারতচন্দ্র অট্টহাস্য করে ওঠেন বেলা দুপুর কাঁপিয়ে। তাঁর হাসিতে রাজ অতিথিশালের লাগোয়া প্রাচীন বৃক্ষবর্গ হতে অতর্কিত পাতা খসে পড়ে। হাসির গমকে তাঁর সুগৌর মুখমণ্ডলে রক্তাভ পুলক সঞ্চারিত হয়। তাঁর আস্কন্ধ কেশরাশ দুলে দুলে ওঠে! তিনি ঘনঘন মাথা দোলাতে দোলাতে কেবলই বলেন, নাকে ঝামা ঘসে দিলে ভায়া, ঝামা ঘসে দিলে।

প্রসাদ বলেন, কিন্তু যেখানে কথা ছেড়ে এসেছিলে সেটির কী সমাচার হল? অর্থাৎ মূলাযোড় ছেড়ে নতুন ঠাঁই গুস্তে যাওয়ার কী হল?

ভারত, রসের কথা কইতে কইতে অরসের কথা বিলকুল ভুলে গিয়েছি ভায়া। এবার

সেটি বলি। সেটি হল, নিষ্কর ভূমি পেয়ে মূলাযোড় ছেড়ে গুস্তে যাওয়ার জন্যে আমি যেই না গাঁঠরি বোঁচকা বাঁধতে বসেছি অমনি মূলাযোড়ের তাবৎ মানুষ যেন কী করে সেই খপরটি জেনে ফেললে। একদিন তারা সব দল বেঁধে এসে উপনীত হলে আমার ঠাঁয়ে। সবাই মিলে ঘিরে ধরে বলে উঠল, মহাশয়, কোনও মতেই আমারদিগগে ত্যাগ করে যেতে পারবেন না।। আপনি চলে গেলে মূলাযোড় অন্ধকার হয়ে পড়বে। ফলে, এক কথায়, আমার ও স্থান ত্যাগ করে চলে যাওয়া হল না।

প্রসাদ, আর একটি কথা শোনা ছিল খাপছাড়া ভাবে। সেটি হল পত্তনিদার রামদেব নাগের কাহিনি। তুমি কী খাসা পত্র লিখেছিলে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বরাবর। আর রচেছিলে নাগাষ্টকং।

ভারত, সে সময়ে রামদেব নাগ পত্তনিদার হয়ে শুধু আমার প্রতিই নয়, আরও অনেক লোকের উপর দৌরাত্ম্য করছিল। কবির যেহেতু অসির বদলি মসী আছে, তাই আমায় সেই পথই নিতে হল। আমি সংস্কৃত কবিতার সাহায্যে রাজাকে এক পত্র লিখে পাঠালাম। আর রচলাম নাগাষ্টকং। গুহগ্রাহী রাজা সেটি পড়ে সাতিশয় সন্তুষ্ট হলেন। আর অনুরোধ দ্বারা নাগের দৌরাত্ম্য নিবারণ করে দিলেন।

প্রসাদ, পত্রখানা একটুকুন শুনি।

ভারত,

অবশ্য প্রতিপালস্য। শ্রীভারতচন্দ্র শর্মণঃ।
নমস্কৃতিনামানন্ত্যং সবিশেষ নিবেদনং॥
মহারাজ রাজাধিরাজ প্রতাপ, স্ফুরদ্বীর্য্য সূর্যোল্লসৎ কীর্তিপদ্মে।
স্থিরা রাজপমালয়া স্তাং চিরস্থা, যতোহস্মাকমাস্তে সমস্তং পুরস্তাৎ॥

আরও কিছু বাকি রইল।

প্রসাদ, আর নাগাষ্টকং?

ভারত, বেশ, তবে শেষটুকু বলি।

প্রসাদ, তাই হোক্।

ভারত,

জগৎপ্রাণগ্রাসী বিরলবিলবাসী নতমুখঃ,
কুবর্ণো গোকর্ণঃ সবিষবদনো বক্রগমনঃ।
তদাস্যো কিং রাজন্ ক্ষিপসি নিজপোষ্য দ্বিজমিতঃ,
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরিহরি॥
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রনৃপপারিসদঃ সুকর্মা,
নাগাষ্টকং ভণতি ভারতচন্দ্র শর্মা।
এভির্জনো ভবতি যো মণিমন্ত্রবর্মা।
তত্তারয়েৎ সপদি নাগভয়াৎ সুধর্মা॥

ভিতর ঘরে পাশাপাশি দু'খানি ফুলকাটা আসন পড়েছে। সুমুখে সদ্য ধোয়া এবং উল্টে পাতা পদ্মপত্র। তার দক্ষিণ কোণে তুষারবৎ লবণ। একজোড়া কাগজি নেবু। এবং একজোড়া করে নধর কাঁচা লঙ্কা। রামপ্রসাদ-ভারতচন্দ্র পাশাপাশি উপবেশন করেন। পাতের পাশে রাখা পিতলের ঘটিতে রাখা জলে দু'জনাতে হাত ধুয়ে নেন।

সুমুখে ভোজ্য নিয়ে বসে ভজহরি-রামতনু। তারা পরিবেশন করতে তোয়ের আছে।

প্রসাদ বলেন, এ আবার কী। বলি একত্রে বসলে কী ক্ষেতি হত? অন্যদিন তো আমরা একত্রেই খাই।

রামতনু জব দেন, আজ আমাদের ঘরে একজন অতিথি আছেন। ফলে নিয়মভঙ্গ।

ভারত হাসি মুখে রামতনুকে দেখেন। তারপর বলে ওঠেন, বেলা হৈল অন্নপূর্ণা রান্ধবাড় গিয়া। বলিহারি ভাইগণ। ধন্য তোমাদের আতিথেয়তা।

রামতনু বলেন, থালে ভাত দি। আমি দেবো না ভজা?

ভারত বুঝতে পারেন দ্বিধার কারণ ঘিরে পৈতে-অপৈতের কটাক্ষ। প্রসাদও একবার আড়ে তাকান ভারতের দিকে। ভারত কথা কন, অন্ন মানে তো লক্ষ্মীদেব্যা। আবার এই দেবী লক্ষ্মীটি আবার বামুন সংসর্গ সবসময় এড়িয়ে চলেন। তার প্রথম কারণটি হল ব্রাহ্মণ ভৃগুমুনি লক্ষ্মীর পতিদেব নারায়ণের বুকে একবার পদাঘাত করেছিলেন। একবার ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের মধ্যে কোনও দেবতাটি শ্রেষ্ঠ যাচাই করতে মুণিরা ভৃগুকে দেবলোকে পাঠালেন। ব্রহ্মা ও শিব মুনিকে তেমন আমল না দিয়ে বরং ক্রুদ্ধ হলেন। মুনি নাকি তাঁদের যথেষ্ট সম্মান দেখাননি। ভৃগু তাঁদের কাছে মার্জনা চেয়ে উঠলেন গোলোকে বিষ্ণুর ঠাঁয়ে। পরিবার লক্ষ্মীকে নিয়ে বিষ্ণু তখন সুখে নিদ্রা যাচ্ছেন। ভৃগু মুনি অমনি বিষ্ণুর বুকে একটি কষে পদাঘাত করলেন। বিষ্ণু নিদ্রা হতে উঠে পড়ে ভৃগুর শ্রীচরণে আঘাত লেগেছে মনে করে ভারী কুণ্ঠিত হয়ে তাঁর পদসেবা করতে লাগলেন। ভৃগু সিদ্ধান্ত দিলেন শ্রেষ্ঠ দেবতা হলেন বিষ্ণু।

ভজহরি বলে ওঠেন, বাঃ বাঃ।

ভারত বলে চলেন, অগস্ত্যঋষিও তো বামুন ছিলেন। তিনি লক্ষ্মীর সাক্ষাৎ জন্মদাতা বাপ সমুদ্রকে মন্থনের সময় পান করছিলেন। ইদিকে বাগ্‌দেবী সরস্বতী হলেন লক্ষ্মীর সপত্নী। এনাকে ব্রাহ্মণরা সেবা করেন। বামুনদের এইসব দোষ দেখে লক্ষ্মীদেবী কোনও বামুনের ঘরে পদার্পণ করেন না।

রামতনু গলা তুলে বলে ওঠেন, ঠিক কথা। হক কথা। আমার সংসারে হাঁড়ি চড়া যে কী ঝকমারি। নিত্যি এই নিয়ে বাম্‌নির সঙ্গে কাজিয়া।

রামপ্রসাদ দু-হাত উর্ধ্বে তুলে বলে ওঠেন, ভাত দাও। পাতে ভাত তোলো ভজহরি।

বিয়াল্লিশ

দ্বিপ্রাহরিক ভোজন সময় পেরিয়ে এখন আদপে অপরাহ্ন পত্তনের চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়েছে। তার আগে রামপ্রসাদ-ভারতচন্দ্রের নাগাড়ে আলাপন, বিবিধ কূট ও কচালময় ভাবাদি বিনিময়, ঘরো আর ঘুরো জীবনাখ্যানের আকাট বর্ণন, এই প্রকৃতির মেঘাবলম্বি রহস্যের গূঢ় জলরাশি ফুঁড়ে চকিত আলোক ছটা, বুঝি বা তার তলদেশী শ্যাওলা লতাগুল্মের শরীরি জটিলতার নির্লজ্জ বিচ্ছুরণ।

ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদের পাশাপাশি উপবেশনের সুমুখে পিতলের গামলা আর থাল জামবাটি পূর্ণ গুচ্ছের ব্যন্নন। রাজার পাঠানো সিধার সুব্যবহার করা সম্ভব নয় বেটা

মানুষের হাতে, এমত স্বীকার সংসারে স্বাভাবিক। তবু এই দুইজনাতে যতখানি সাধ্য, সে সমুদয় ব্যবহার করেছে। আনাজপাতি, মৎস ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছে মাত্র চারজন মানুষের আহারের কেতায়, কিন্তু কী আমাপা অপচয় এই রাজার দেওয়া সিধায়। প্রসাদের একবার মনে হয়েছে, এ সংসারে কত না মানুষ আছে, যারা অন্ন খুঁটে খায় কাকের পারা। এ তো অছেদ্দায় কুঁচকি-কণ্ঠা খাওয়ার নিদান। বাকি ভাগ ফেলে দাও। ছিটিয়ে ফেলো। পদ্মপাতায় জল দিয়ে ধুলেও তাকে আর্দ্র করতে না পারা জাগতিক নিয়মে পাতার উঁচু নিচু এলাকায় জলবিন্দু টলটল করছে। বুঝি বা অবেলার ক্ষুধার প্রতীক এই কভু চঞ্চল কভু সুস্থির দানাগুলি।

পাতে হাতায় করে অন্ন পড়ে ভজহরির হাতে। দিনমানে চাঁদিনী রাতের জুঁইফুল শোভা এই ঝরঝরে তরতরে ভাত। তস্য অগ্রে গব্যঘৃত মুঠি পরিমাণ। ভাতের সুমুখ এলাকায় মাছের মাথা ভাঙা দাইল নেমে দাঁড়ায়। ডান হস্তের দিকে উচ্ছেভাজা, লম্বাকৃতি বেগুন ভাজা, শাক ভাজা, পটল ভাজা, মুড়মুড়ে করে মৌরলা মাছ ভাজা। প্রসাদ-ভারত দু'জনেই অন্নস্পর্শ করেন। তবে কিনা ব্রাহ্মণত্ব কতখানি আছে বা নেই, এ হিসেবের বাইরে গিয়ে ভারত অভ্যাস মোতাবেক পাতের দখিনে ভূমিতে শতান্ন রাখেন পঞ্চভাগে। ওঁ, প্রাণায় স্বাহা, অপানায়...। গণ্ডুষপূর্ণ জল লয়ে অন্নচূড়ায় রাখেন। তারপর জল শোষণান্তে, ওঁ অমৃতোহপি স্তন্যময়ী স্বাহা...।

প্রসাদ আড়ে চেয়ে এই উপক্রমণিকাটুকু লক্ষ করেন। তারপর মৃদু কণ্ঠে উচ্চারণ করেন বারত্রয়, কালী, কালী, কালী। আর এই উচ্চারণের পথ বেয়ে তাঁর মন চলে যায় পশ্চাৎ সেই কুমারহট্টের বুনো ছন্ন আর সদাই শিথিল মৌনী গ্রাম দেশে। বুড়ি মা জননী আর ছেলেপুলেদের নিয়ে বুঝি দুপুরের আহার সমাপন হয়েছে কিছু আগে। রন্ধন হয়েছে ভাতের সঙ্গে গোটা গোটা সীম আলু ভাতে। কলাইয়ের দাইল। বেগুন দিয়ে সজিনা ডাঁটার চচ্চড়ি। সরিষা মাখো মাখো পুঁটিমাছের তরিবৎ। আর সর্ষে ফোড়ন সমেত কাঁচা তেঁতুলের অম্বল। আহা, এমন স্বর্গ ছেঁচা ভোগের বদলি এই রাজভোগ। কার অন্ন কখন যে কোথায় মাপা রয়!

পদ্মপাতার পাশে এবার হানা দেয় গুটিকয় পিতলের বাটি। সেখানে আলু-পটলের ডালনা, কুমড়োর ছক্কা, লাউ দিয়ে বড়ি, রুইমাছের পোস্তা, মাগুর মাছ-কালো জিরে পথ্যিবৎ বেমানান, ডগমগে কই সর্ষের থিকথিকে কাদা মাখামাখি।

ভারত চোখ বড় বড় করে বলে ওঠেন, সমূহ বিপদ। এরা যে মহিলা সমাজকেও হারিয়ে দিলে!

প্রসাদ হেসে কন, এরা কিন্তু আকাট পুরুষ দাদা। অর্ধনারীশ্বরও নয়।

ভারত, তা তো বটেই। তবে রাজালয়ে বাস করেও এমন রাজভোগ নিত্যি আমার কপালে জোটে না ভায়া। তাছাড়া এমনিতে মধুমেহ রোগের সূত্রপাত হয়েছে। কবিরাজী বটি নিত্যি বাঁধা।

প্রসাদ চোখ তুলে আড়ে ভারতকে দেখেন। তারপর হেসে বলেন, তাই তো তোমার বাক্যে এত মধু।

ভারত, রক্তে শর্করা বহাল থাকলে জিহ্বা তাকে এড়ায় কেমন করে।

প্রসাদ, কবিত্বের সঙ্গে শর্করার যে এত মধুর সম্পর্ক, তা তোমায় না দেখলে মালুম হত না দাদা।

ভারত দখিন হস্ত তুলে বলেন, আগে আমার পাত থেকে ভাত তোলো হে।

ভজহরি তৎক্ষণাৎ বলে, যা পারেন সেবা করুন আজ্ঞে। আমি না হয় আপনার পাতে দুটি পেসাদ পাব।

প্রসাদ, মধুমেহ তো ছোঁয়াচ ব্যামো নয়। পেসাদ পেতে দোষ নেই।

রামতনু বলে ওঠেন, প্রথমে ঘি দিয়ে খান। সঙ্গে উচ্ছে ভাজা তো আছেই।

প্রসাদ-ভারত দু'জনেই ভাত ভাঙেন। ধীর লয়ে ভোজন এগোয়। সামান্য সপাত সপ শব্দও ওঠে। রামতনু বলেন, বেটাছেলের রান্না তো। কী যে কেমন রাঁধা হল, কে জানে।

প্রসাদ কন, দিব্য হয়েছে। আমাদের বউঠাকুরানি তালিমটি ভালোই দিয়েছেন।

রামতনু গরগরিয়ে ওঠেন, শোনো পেসাদ, বামুনের সন্তান আমি। কিছু না হোক দু'টি চালে-ডালে ফুটিয়ে নিতে জানি। পৈতে হওয়ার সময় সেই বাল্যকালে যজ্ঞের চড়ু রন্ধন দিয়ে হাতে খড়ি, বুঝলে।

প্রসাদ মুখ নিচু করে হাসেন, হুঁ, দাদা তার মানে নিজ সংসারে রাঁধুনি বাউন।

রামতনু, কোন দুঃখে!

প্রসাদ, পরম সুখে।

ভোজন দ্বিপ্রাহরিক হলেও তার সমাপন হয় বেলা অবেলায়। রাজমহল বরাবর এখন আসন্ন অপরাহ্ণের আলো পট বদলাচ্ছে। চরাবরা পাখিরা ক্যাট ক্যাট, কিচ কিচ আলাপনে ব্যস্ত। রাজপাকশালার বাহিরে, কিঞ্চিৎ দূরে একটি বৃহৎ পুষ্করিণীতে জনা দশেক বাসন মাজুনি দাঁতে মিশি টিপে তুমুল দর্পে বাসন মেজে চলেছে। বাসন ধৌতির সরঞ্জাম বাগান থেকে পেড়ে রোদে শুকানো ধুন্ধুল ফলের ছোবড়া আর রন্ধনশালার এঁটোকাঁটা পোড়া কাঠের ছাই। আর আছে একতাল পাকা তেঁতুল। রমণীরা বাসন-কোশন মাজনের ফাঁক ফোকরে হরেক গল্প কথা এ ওর কানে গুঁজে দিচ্ছে। আলোচনা করছে রাজার বাড়ি যাগ কাণ্ডকারখানা।

একজন নধরা ঝি বলছে, আমার হয়েছে ভাই, উলু দেওয়ার সময় গালে ঘা।

যাকে বলা সে চোখ তোলে, ও মা ই কী কতা!

গালে ঘা মন্তব্যায়, বুঝলি না, বাসন মাজবো কী, হাতে যে আঙুলহারা।

এই বলে সে তার লাল টকটকে আর শিরোদেশ পেকে আসা বুড়ো আঙুলটি দেখায়। তা দেখে সেই দেখুনি অপরজন বলে, কী করবি ভাই। রাজার বাড়ি চাকরি না কল্লে ভাতও যাবে, ভাতারও যাবে। এখন তোর হয়েছে—গুঁতোয় পড়লে আমন ধানেরও খৈ ফোটে।

এই সব বাসন মাজুনি কথাবার্তা আর অবেলার আলো পাশ কাটিয়ে ভারত ও রামপ্রসাদ একে অন্যের কাছ থেকে আপাতত বিদায় নেন মূল রাজফটকের তল থেকে। এক কবি আর একজনের হাত ধরে বেশ খানিক সময় মলিন দাঁড়িয়ে থাকেন। দু'জনারই মুখে অপরাহ্ণমুখী আলো থর থর করে।

অতিথিশালায় ফেরামাত্র রামতনু গলা তুলে বলে ওঠেন, ভায়া, রাজার এত্তেলা পড়েছে।

প্রসাদ ভ্রূ কুঁচকে বলেন, মানে।

—লোক এসেছিল রাজার কাছ ঠেঙে।

রাজ-কিছু বলে পাঠিয়েছেন কি?

—তা তো কিছু বললে না।

প্রসাদ আপন মনে বলেন, তার মানে, রাজার না হলেও তেনার লোকেদের গোঁসা হয়েছে। এত বড় যজ্ঞি বলে কথা। অথচ আমাদের কোনও তাপ-উত্তাপ নেই।

রামতনু অবাক স্বরে কপচান, তা তো বটেই। তা তো বটেই। রাজা বলে কতা। তারপর এ কতা তো জানাই যে হাকিমের চেয়ে প্যাদা দড়।

রামপ্রসাদ হেসে কন, আমরা তো রাজার প্যাদা নই আবার দাসখতি মানুষও নই।

রামতনু, তা না হলেও। রাজা তো।

ভজহরি, বটেই তো দাদা। রাজা তো ইচ্ছে কল্লেই আমাদের মস্তক নিতে পারেন।

রামতনু, হুঁ, বিনি অপরাধেও।

প্রসাদ, তা যদি হয় তাহলে সংসারে আইন বলে কি কিছু নেই!

রামতনু নিপাট মুখে বলেন, অতশত জানিনে বাপু। তবে এই ফাঁকে একটি সত্যি কতা বলব কি?

প্রসাদ চোখ কুঁচকে তাকান রামতনুর প্রতি, তুমি মিছে কথা কও নাকি!

রামতনু খানিক থতমত, খানিক সরলধরল মুখে আধখানা হাসি আর আধখানা সন্দেহ মাখানো ভঙ্গী নিয়ে বলে ওঠেন, তোমরা যা খুশি ভাবো ভাই, আমার কিন্তু বাড়ির জন্যে পিছুটান ধরেছে। কেবলই মনে বলছে, কবে ফিরব-কবে ফিরব।

প্রসাদ মুখ নিচু করেন। নিজের কবাট বুক দেখেন। তারপর আস্তে আস্তে কেটে কেটে বলেন, আমারও সেই একই দশা। ঘরকুনো মানুষের যা হয় আর কী।

ভজহরি গলা তুলে বলে, দূর দূর। আমি বেশ দিব্যি আছি। কোনও ভাবনা চিন্তা নেই। তারওপর নিত্যি এমন বাজভোগ। দেশে ফিরে তো সেই ডালের বড়া, ডাল আর ভাগ্যে হলে গুলে বেলে মাছ।

রামতনু ঝাঁঝিয়ে ওঠেন, গুলে হোক, বেলে হোক দেশের বস্তু। দেশ-এর আমানিও ভালো। তোর রাজভোগ গোল্লায় যাক।

প্রসাদ এক হাত সামান্য তুলে দু'জনকে ক্ষান্ত করেন।

রাজদ্বারের মাথার গম্বুজ ছুঁয়ে কখন যে বেলা সমাপন এসে দাঁড়িয়েছে, টের পাওয়া যায়নি। খর দিনের আলো পলকা হতে বসেছে। সারাদিনের হুটোপাটি দাপাদাপি থিতু হয়ে বসতে চাইছে। পাখির ঝাঁক সুর পাল্টে দিন শেষের ধ্বনির দিকে টলে যায়। বউ ঝিউড়িগণ পথ দিয়ে ঘোমটাবতী, বেড়াবিনুনি কিংবা এমনি এমনি চুল দুলুনি, কেউ বা কলসি ভরে জল আনে, কেউ গা ধোয়া সেরে ঘরে ফেরে। কতিপয় গো-গাড়ি ক্লান্ত ক্যাঁচর কঁ্যাচর রপটানি টেনে চলে যায়। রাজফটকের উঁচু গম্বুজে সানাই ফুকরে ওঠে। সঙ্গে গুব গুব ডাবর ন্বেল। কারা যেন দূর পুকুরধারে ধোঁয়া দেয়। ধোঁয়া ওড়ে আকাশ মুখে তার স্বভাব মতো গুমরে গুমরে। কোথা হতে এক পাল শিয়াল ডাক পাড়ে সন্ধ্যাকালীন আবুল্লি ভেঙে। তারই ফাঁক দিয়ে দেবমন্দিরে সন্ধ্যা আরতির উদ্‌যোগ শোনা

যায়। আর ঠিক অমনি কোনখান দিয়ে আগামী রাত্রির পুচ্ছ ধরে সন্ধ্যা নিবিড় নিঝুম হয়ে পড়ে। দূর গাছপালার মাথায় জোনাক ঝাঁক ছররা ফোটায়। প্রসাদ গাঢ় স্বরে বলে ওঠেন, রামতনু দাদা। ঢোলকখানা একবার পাড়বেন নাকি। একখানা বিনি ফরমায়েসি গান বলতে ইচ্ছে যাচ্ছে।

রামতনু প্রায় এক লম্ফে ঘর থেকে ঢোলকখানা পেড়ে এনে পা মুড়ে গুছিয়ে বসে পড়েন। প্রসাদ ডান হাত সুমুখে তুলে গান ধরেন।

কালীপদ আকাশেতে
মন ঘুড়িখান উড়তেছিল,
কলুষ কুবাতাস পেয়ে ঘুড়ি,
গোপ্তা খেয়ে পড়ে গেল।
মায়া কান্না হল ভারী,
ঘুড়ি আর রাখিতে নারি,
দারাপত্য মায়াদড়ি,
এরা দুজন জয়ী হল।

হিমালয়ের দিকে যাত্রা করেছি আমি এই বালক বয়েসে, হাফ প্যান্ট, শার্ট অবস্থায়। পায়ের হাওয়াই চটিখানা শ্মশানেই ছেড়ে এসেছি। তার মানে—দাদুর কাছে শোনা এক বস্ত্রে সংসার ত্যাগ ব্যাপারটা পোক্ত হল। বস্ত্রের সঙ্গে জুতা উল্লেখ নেই।

গঙ্গার একেবারে কোল ধরে টকাটক লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছি। পায়ের নীচে গঙ্গার থিকথিকে পলিকাদার ফাঁক দিয়ে খোলামকুচি, শামুক, গুগলি, ছেঁড়া ন্যাকড়া, ভাঙা মেটে ধুনুচির অংশ, প্রতিমার কানের দুল, মুকুটের খোঁচা, অসুর কিংবা কার্তিকের থিকথিকে শ্যাওলা চুল এমনি কত কী আমার পায়ের তলায় উশখুশ করছে। ঘুর ঘুর কির কির ঘুরছে কাঁকড়াদের বাচ্ছাকাচ্ছারা। হুগলি ইমামবাড়ার আকাশে এক দঙ্গল ধোঁয়া পাক দিচ্ছে তো দিচ্ছেই। ওপারে ডানলপ জেটির মাথায় গনগনে আলোর হাঁগাল গঙ্গার জলে কটাক্ষ ছুঁড়ছে। ওখানে ক্রেন উঠছে নামছে একনাগাড়ে দণ্ডবৎ করার কায়দায়। নীচেকার বোট থেকে মাল উঠছে ওপরে। ওখান থেকে ট্রাকে করে গড়গড়িয়ে সামগ্রী চলে যাচ্ছে কারখানার অন্তঃপুরে। গঙ্গার স্রোতে ঝিকিমিকি আকাশের আর ওপারের আলো সকল খেলাধুলো সারছে। কে একজন বুড়ো মানুষ রামপেসাদের ঘাটে উৎকট শব্দে কুলকুচো করছে। সেই মড়াপোড়ানি দঙ্গলটি এখন ঘাট নাওয়া প্রায় সেরে এনেছে। কয়েকজন যুবক তেড়ে লাইফবয় সাবান ডলছে হো হো, হি হি।

আমায় জল কামড়ে যেতে দেখে ওদেরই মধ্যে একজনা বলে ওঠে, অ্যাই খোকা, তুই না একটু আগে শ্মশানে বসে ছিলি!

পাশ থেকে আর এক সাবান ডলন্ত সায় দেয়, হ্যাঁ হ্যাঁ। ওর সঙ্গে আর একটা ছিল।

আমি কোনও জবাব না দিয়ে আস্তে করে পাশ কাটাই ওদের। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি বাঁ হাতে, একটু উঁচুতে মস্ত অশ্বত্থ গাছের ঝুরি ধরে কুচো বাচ্চাগুলো দোল খাচ্ছে। দুলতে দুলতে হু দিচ্ছে চিড়িয়াখানায় দেখা উল্লুকের মতো। তার পাশে অন্ধকারে আবছায়

পরিত্যক্ত গঙ্গাযাত্রার কোঠা। ওখানে ঘাটের মেয়ে বউরা কাপড় পাল্টায়। বাচ্চারা ময়লা করে রাখে। তার পেছনে কুণ্ডুদের গোলা, বালির পাহাড়। তার মস্ত উঁচু টঙে কারা যেন অন্ধকারে পুক পুক বিড়ি না অন্যকিছু টানছে। আমি দেখি উঁচু আর খাড়াই পথ বেয়ে গুড়গুড়িয়ে নীচে নামছেন আমাদের পাড়ার দুর্গা ঘোষের গেঁড়াপানা শুচিবাই গিন্নি। এতখানি রাস্তা টপকে দিনে তিনবার গঙ্গা চান করেন। আমি লম্বা করে একটা ছুট্ ধরি।

এসে পড়ি এর পরের ঘাট বুনোঘাটা বাঁধাঘাটে। কর্নেল কে পি গুপ্তর মায়ের স্মৃতিতে তৈরি বহু পুরনো ঘাট। নীচের থেকে ওপরে উঠে গিয়েছে চওড়া চওড়া প্রকাণ্ড সিঁড়ি নিয়ে। ইটরঙা সিঁড়ির গায়ে লালচে খোপ আর ডোরা কাটা। ঠিক যেন মাপা আলপনা দেওয়া। এ ঘাটে এমন সময়ে চান করার ভিড় থাকে না। আমি দিব্যি নিশ্চিন্দি হয়ে যেতে যেতে দেখি পাড়ুই বাড়ির একজন বুড়ো মানুষ মস্ত একখানা ছিপ হাঁকিয়ে জলের কানাচে বসে আছে।

আমি খানিক এগোতে সেই বুড়ো মানুষ বলে ওঠে, মাস্টারমশাইয়ের নাতিটা এমন বুনো হল কেমন করে!

সর্বনাশ! এও যে চিনে ফেলেছে আমায়!

কিন্তু বুনো বলল কেন! গঙ্গার ধারে বন কোথায় পেল!

সে আবার বলে, হুঁ, ভারী সন্দেহজনক। চেহারাখানি তো কেষ্ট কেষ্ট। মাথায় শিখিপাখা দিলেই হল।

আমি ঘাড় ঘোরাই চোখ পাকিয়ে। সে কিন্তু অন্ধকারেও আমার চোখের ভাব ধরতে পারে। আর অমনি বলে ওঠে, উ উ উঃ, এখনও তো কচি ঝিঙেটি। পোঁদে ফুল লেগে আছে। এত সত্ত্বর রাধারানি জুটবে কোত্থেকে।

আমি বেশ খানিক এগিয়ে যাওয়া দূর থেকে গলা তুলি, বাড়ি যাও তো। অন্ধকারে মাছ পাবে না হাতি।

সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁঝালো জবাব ফেরে, তুই এই অন্ধকারে একলা একলা কোথা চল্লি বল দিকিনি?

আমি পা লম্বা করি, এমনি।

—এমনি! এ ছোঁড়া বলে কী র‍্যা! মাস্টারমশাইয়ের নাতিটি দেখছি আদাড়ে—

আরও কী কী বলে বৃদ্ধ, আমার কানে পৌঁছয় না। আমার সামনে লম্বা লম্বা দল ঘাসের ব্যবস্থা। ওখানে, ঠিক আঘাটার গায়ে ভাঁটা টানায়, একটি শিশুর মড়া আটকে আছে। কাটা কাটা চাঁদের আলোয় দেখি বাচ্চাটার ঘুম নিঝুম একটি চোখের ওপর কেঁদো এক গলদা চিংড়ি দিব্যি বসে আছে। বসে আছে আর থেকে থেকে লম্বা লম্বা দাঁড়া নাড়ছে। এই দাঁড়া নৃত্যে আমাদের বাড়ির পাগলি সরস্বতী দিদির গানের মতো হুবহু সুর-তাল আছে। চিংড়ি বলছে, ইলিশ মাছের সুক্তো হলে, কুমড়ো গাছে তেঁতুল হলে, নন্দ এবার মরিবে বলে, ঘাটের মড়া পচবে বলে...।

আসলে, এই যে ব্যক্তি আমার সঙ্গে এত কথা বললেন, তাঁকে পেরিয়ে আসতেই আমি চিনতে পারি খানিক লতায় পাতায়। গঙ্গার ওপরে ওখানে কুমোরপাড়া আর পাড়ুই

পরিবারের বাস। এঁরা আদপে গঙ্গায় মাছ ধরিয়ে পেশাধারী। নিজেদের খানকয় মেছো নাও আছে। মাটির ঘর। টালির চাল। ছড়ানো উঠোনে তুলসীমঞ্চ। আর আছেন বেশ মোটামোটা কাঁচাপাকা চুলো আর গালে পান সর্বদাই, কটি ছেলে মেয়ের আধ বয়সিনী বিধবা মা জননী। সারাদিন গরিব সংসারের খাটনি খাটেন। গোবর হাঁটকে ঘুঁটে দেন। মস্ত হাঁ-ওয়ালা উনুনে কাঠ ঠুসে ঠুসে ভাত রাঁধেন। এই মানুষটির জীবনে একটি ভারী দুঃখু আছে। নাওয়ে মাছ ধরতে গিয়েছিল বড় পুত্তুর আর মেজো। সে এক ঘোর বর্ষার রাত। জাল আর নাও বাইতে বাইতে ধুম বৃষ্টিতে খই চড়বড় গাঙে দিক নেই, দিশা নেই। তারই মধ্যে ইলিশ শিকারের পার্বণ। এমনি সময়ে হঠাৎ আকাশে বাজ কড়কাল। জালের খুঁটো ধরে বসে থাকা বড়পুত্র অমনি নীল হয়ে গেল। ঢলে পড়ল জলে। ছোটজন দেখল ফুটন্ত গাঙে জালের কাঠি ভাসছে বহু দূর দিয়ে ঘেরবন্দি করে, ঘুরে ঘুরে। তার দাদাটি সেই ঘেরের মধ্যে মাছেদের দেশে উধাও হয়ে গেল চোখের সুমুখে।

এই কথাটা সে কাউকে বলতে পারেনি। ঘটনাটা দেখেছিল খানিক দূরের এক ভিন্ন নাওয়ের মাঝি। সে কথা পাঁচজনে রটনা হলেও ছেলের মা জেনেছিল বড়পুত্তুর নদীতে হারিয়ে গিয়েছে। আর সেই ছোটজন সেই থেকে কীরকম চুপটি করে গিয়েছে। ইশকুলে পড়ে, মাঠে খেলে, কিন্তু কোথায় যে একলা একলা। মনের দুয়োরে বাজ পড়েছে বুঝি।

আসলে হারিয়ে যাওয়া কথাটির আগে পিছে আর কোনও বড়সড় কথা তো আর হয় না। কিন্তু যে নিজের চোখে দেখেছে, সে তো একেবারে চুপ মেরে গিয়েছে। তাকে বেশি জেরা করতে মায়েরও মন চায়নি।

ঠিক এমনি করেই আমি যে এখন হারিয়ে যেতে বসেছি হিমালয়ের পথে। কোথায় হিমালয়, কতদূরে তার অধিষ্ঠান, কেমন দেখতে তাকে, কিছুই জানি না যে। হিমালয় নামটা শুনলে একজন মস্ত সমস্ত গুমড়ো গম্ভীর মানুষ মনে হয়। অনেকটা ওই পাড়ুইদের চুপচাপ সেই ছেলেটির মতোই।

বাঁধাঘাট ছেড়ে যেতে যেতে দেখি বাঁ হাতি অন্ধকারে বিপ্লবী বিপিন গাঙ্গুলির মস্ত হলুদ রঙা দোতলা আখাম্বা বাড়ি। ছাদের তারে এখনও কাপড় শুকোতে দেওয়া। বাড়িতে রেডিও বাজছে। উনি বেঁচে নেই। ভাইপো আছেন পরিবার নিয়ে। মার কাছে শোনা আর আবছা মনে পড়া, একবার কাঁচড়াপাড়ায় দাদুর ইশকুল কোয়ার্টারে এক সকালের দিকে উনি অনেক লোকজন নিয়ে ভোট প্রচারে এসেছিলেন। সবাই অনেক কথা বলছিল। আমি সকলের তল দিয়ে গুঁড়ি মেরে ওঁকে দেখছিলাম। স্বভাবী কৌতুহলে মানুষটার কথা শুনছিলাম। শুধু এটুকু মনে আছে, কেউ বসেননি। সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিঁড়ির মুখে ঘেরা বারান্দায় কথা বলছিলেন। সবাই বিপিনদা, বিপিনদা করছিল। চলে যাওয়ার সময় আমি গুঁড়ি মেরে বলি, বিপিনদা, আবার এসো। উনি অবাক নেত্রে আমায় দেখে হেঁট হয়ে কোলে তুলে নিয়েছিলেন। আর আমি কেবলই ওঁর পুরু চশমার ডাঁটি খামচে ধরছিলাম। আমি কি ছাই জানি, তিনি কত বড় অস্ত্রবাদী বিপ্লবী। আমার জানার কথা কি, লেখক শরৎচন্দ্রের তিনি কীরকম মামা, মামা ভাগ্নের চেয়ে বয়েসে ছোট। আমি কী করে বলি 'পথের দাবী' আসলে তাঁর আদলেই লেখা। তবে এ কথা জানি, এখানেই তিনি শেষ জীবনটা ছিলেন। আর মারা যান ট্রেনের মধ্যে, কলকাতায় যাওয়ার পথে।

দূর থেকে গঙ্গার উড়ুক্কু হাওয়ায়, বোধহয় ওপার থেকে মাইকে গান উড়ে আসে, গানে মোর, কোন ইন্দ্রধনু, আজ স্বপ্ন ঝরাতে চায়, হৃদয় ভরাতে চায়—। বাঃ, এ তো আমার চেনা গান। রেডিওয় রবিবারের রাত্রিবেলা ছায়াছবির গান-এ এই গানটা প্রায়ই শেষের দিকে দেয়। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গলায় এই গানটা শুনলে কীরকম বুক হু হু করা অবস্থা হয়। কেন, জানি না। এখন এই গানখানি রাতের গঙ্গার ঢেউ কলকলানির ওপর দিয়ে আলগোছে টপকে টপকে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। কীসের ইন্দ্রধনু, কেন ইন্দ্রধনু, কোথাকার স্বপ্ন— কিচ্ছু ধরতে পারি না। শুধু বুকটা হুহু বাতাসে, কিংবা শ্মশান চিতার হাওয়া থাপ্পড়ে লকলকে বেঁকে বেঁকে যাওয়ার অবস্থায় কী যে করে। ওই যে, ওইখানটায় একটা টান পড়ছে, ইন্দ্রধনু-উ-উ-উ, ওলটপালট হাওয়ার মাঝখান দিয়ে লাট খেতে খেতে, টুঁ দিয়ে কীরকম লাউডগা সাপ হয়ে এঁকে বেঁকে চলে আসছে আমার দিকে। এপার ওপারের আলো অন্ধকার ছমছমে জলের সঙ্গে জড়িয়ে মড়িয়ে একসা হয়ে একজন কোঁকড়ানো এলোচুলো মূর্তি হয়ে এসে আছড়ে পড়ছে গঙ্গার আঘাটায়। ঠিক আমার মায়ের মতো। সকালবেলা খুরপি হাতে রক্তকরবির শেকড় তুলুনি আমার মিলা মা। ক্ষিপ্ত, ছন্ন আর গলা ছেড়ে দেদার গান গাওয়া আমার কানু বাবার বউ।

আর কী আশ্চর্য, ঠিক এখনটি গঙ্গার ধার বরাবর ঠিক যেখানটি দিয়ে আমি হিমালয় চলেছি তার বাঁয়েই হালিসহরের প্রাচীন গুপ্ত পরিবারদের বাড়ি-ঘর। আর ওখানেই তো সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের স্বামী শ্যামাচাঁদ বা শ্যামল গুপ্তদের পিতৃভূমি। এ কথা আমি আমাদের হালিসহরের খুঁটিনাটি ইতিহাস উন্মাদ হীরেন জ্যাঠামশাইয়ের কাছে শুনেছি, আমার গান পাগল দাদুকে বলতে।

বুড়োদের আসরের এক কানাচে বসে গপ্পো শোনার পাওনা এসব। পেছন পাকা বলে কটাক্ষ শুনলেও কী এমন এল গেল।

তেতাল্লিশ

সন্ধে পেরিয়ে রাত ঝিম ঝিম করছে গঙ্গার মধ্যিখানে। কোথাও আলো আলো, কোথাও অন্ধকারের ছানাকাটা কীরকম আধখামচা ভাব। এরই মধ্যে রাতের গঙ্গা, কলাত্ কল্, কল্ কলাত্। থেকে থেকে ঢেউয়েব ঠোনা এসে ঘা দিচ্ছে পাড়ের গায়ে কাঁকড়াদের খুঁড়ে রাখা গর্তে বগ বগ, বগ বগ। কখনও আবার বুড়ো মানুষের শ্লেষ্মা বোঝাই গলায় কাসির খাক্কার মতো।

যেতে যেতে বাঁ হাতে সবই পড়ছে। ডাইনে শুধু জল আর কলকলানি। তাই এখন বাঁয়ে বলদেঘাটা যার নাম ভালো কথায় বলিদাঘাটা। কেন এমন নাম, কী বা এর মানে? তবে সেদিন, হালিসহরের একমাত্র ইতিহাসী পোকাবাছা মানুষ হীরেন জ্যাঠামশাই দাদুকে যা বলেছিলেন আমার খানিক মনে আছে। এই জায়গাটা এককালে ব্যবসায় ডাকছাড়া ছিল। গোলদারি কারবার, আড়তদারি ব্যবসা, সবজিবাজার--এই সবের জন্যে এখানে বিস্তর গরুর গাড়ি এসে জমত। বলদদের ঘাড়ে জোয়াল পড়ত। সেই থেকে এই স্থানের নাম বলদঘাটা বা বলিদাঘাটা। সেকালে হালিসহরের ইংরেজি জানা লোকজন এই পল্লিটিকে বলতেন Oxford of Halisahar।

কিন্তু রাত কত হল কে জানে। এখন ক'টা বাজে, সে ঘড়ি ঘণ্টার হিসেব কে করবে। কোথাকার জল কোথায় যে গড়াচ্ছে। কতখানি পথ চলে এলাম! তবে বাস-লরির আওয়াজে এটা মালুম যে হিমালয় এখন বহুদিনের ব্যাপার। আমাদের ক্রেগ পার্কের থেকে দেখতে পাওয়া হুগলি ইমামবাড়ার লালচে আভা এখন কালো হয়ে গিয়েছে। টানা উঁচু পাঁচিলের টঙে অনেকগুলো চমৎকার গম্বুজ কীরকম গম্ভীর হয়ে আছে।

এদিকে হাফ প্যান্ট শার্ট আমার পায়ের নীচে গঙ্গার কাদাখোঁচা পাড়। হাওয়াই চটিখানা ভাগ্যিস পরে আসিনি। কী একখানা বইতে, বোধহয় বঙ্কিমচন্দ্রের, পদচিহ্ন বলে একটা গ্রামের নাম পড়েছিলাম, আর পড়েছিলাম নগ্নপদ বা ওই ধারার কোনও শব্দ। না না, ভুল হল। কথাটা হল পদব্রজে। তা হলে পদব্রজ ব্যাপারটার মানে তো নির্ঘাৎ জুতো ছাড়া পা। এই সব কথাবার্তা কি জুতো আবিষ্কারের আগেকার! রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জুতা আবিষ্কার পদ্যটার কথা মনে পড়ল। সেই লোকটি এসে রাজার পায়ের ধুলো মুছে কেমন করে পা জোড়া মোড়কে ঢেকে দিল। ওনার পদ্য পড়তে মন্দ লাগে না। বেশি করে ভালো লাগে গল্পওয়ালা পদ্যগুলো পড়তে। তবে কেন জানি না ওঁয়ার গান আমার কেমন যেন একঘেয়ে লাগে। কীরকম যেন চাপা চাপা মিনমিনে করে গাওয়া হয়। গাক দেখি আমার কানুবাবার মতো তেড়ে গলা ছেড়ে, কোথায় গেলি মা গো আমার খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রেখে...।

এইখানটায় এসে পায়ের নীচে ভাঙা খোলামকুচির খোঁচা খেয়ে আমার মন কর কর করে বাবার মনে না পড়া মায়ের জন্যে। বাবার মাত্র দেড়বছর বয়েসে আমার ঠাকুমা সুবোধশশী, অথচ কী সুন্দর ডাক নাম কণা, কোমরের হাড়ে টিবি রোগে একুশ বছর বয়েসে চলে যান। বাবার মানিব্যাগে দু'খানা ছবি আছে কণার। একখানা হল মাটিতে আসন পিঁড়ি, কপালের ওপরে সাদামাঠা ঘোমটা টেনে কোলের সামনে হাত দু'খানা গোট করে বসে আছেন। ঘোমটা ফসকে কী চমৎকার কোঁকড়া চুল, টানা টানা ঢুলু ঢুলু চোখ আর টিকোল নাক। শুনেছি চলে যাওয়ার ক'দিন আগে উঠোনের তুলসীমঞ্চে সামনে পিঠের কাছে বালিশ দিয়ে ফটোখানা তোলা হয়েছিল। আর একখানা ছবিতে আমার ক'মাসের ছোট্ট কানুবাবাকে দু'হাতের পাটায় শুইয়ে সামনে খানিক ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছেন। নিজের ছেলেকে আর বইতে পারি না—এমন ভাব রুগ্ণ মুখে।

বাবার মুখখানা একেবারে ওই ছবির মতো। টিকোল খাড়া নাক, টানা টানা চক্ষু দ্রব্য পড়লে এমনিতেই ঢুলু ঢুলু। মাথা ঠাসা কোঁকড়ানো থাক থাক চুলে কী বাহার। খুঁতের মধ্যে আড়ায় ছোটখাটো। ফলে ফুটবল কিংবা বিনি ফুটবলেও তিড়িং তিড়িং লম্ফ। সমাজসংসারে হই হই রই রই, টেনে কর্নার কিক।

আমার কিন্তু বাড়িতে মা আছে বাবার সংসারে। তাই বুঝি মা'র জন্যে এক ফোঁটাও মন টলে না। তবে কেন জানি উত্তম মধ্যম ঘুঁষি আর লাথি কষানো আমার বাবার জন্যে মনটা এক ফোঁটা হলেও টাল খায়। বাবার চোর ঠ্যাঙানো আসলে সারা গায়ে মাথায় এমনি গেড়ে বসেছে যে, সংসার ত্যাগ করলেও তাকে এড়ানো মুশকিল।

কাঁচরাপাড়ায় দাদুর হেডমাস্টারি কোয়ার্টারের কত যে ঘটনা। অঙ্কে বরাবর ও কম্মো। সেটা সেই ক্লাস ওয়ান-টু। প্রথমে এক মাসকেলধারী দিদিমণি ঘন কালো ঘুরঘুট্টে।

দু-চারটে কষা চিমটি। কিন্তু ফল হল না। তখন একজন নিপাট তাল ঢ্যাঙা, ধবধবে ফর্সা, নীল পুরোহাতা শার্ট, ধুতির কোঁচা পকেটে, নাম নংকু মাস্টারমশাই। আমি বলি নুংকু মাস্টারমশাই। সারা বাড়ি মাস্টার আমার পেছনে শ্লেট হস্তে পাক মারছেন। একটা অঙ্ক করো বাবা, একটা। আমার প্রস্তাব, আর একটা গল্প বলুন। ঘণ্টা দুই রপটানির পর বিষণ্ণ মাস্টার আমার মাকে বলে যান, একটাও অঙ্ক করাতে পারলাম না বউদি। পরদিন আবার এক ঠোঙা ব্রিটানিয়া, লজেন্স। জানলার ধার থেকে ডেকে নেওয়া আইসক্রিমওয়ালা, ভুতের গল্প। সবই বিফল।

ফলে এবার বাবার হস্তে। বাবাই পড়ানোর দায় তুলে নিল। এমনিতে কখনও সিধে হাঁটা ধাতে নেই। মুখে বিচিত্র একটা তালবাদ্য টাপ্পু টাপু, টাপ্পু টাপু। সেই তালে তালে নাচ তিড়িং তিড়িং ত্রিং। কানুবাবার হাতে চড়াং করে গায়ে চাঁটি, আবার, আবার বিচ্ছিরি নাচ! নাচের আবার সুচ্ছিরি বিচ্ছিরি কী তা বাবাই জানে। তবে লোভ শুধু বিয়ে করায়। আর গলায় মালা পরায়। মাসকাবারি কনকচূড় ধানের খই-এর ঠোঙা মাথায় পরে ছাতের তুলসীমঞ্চে বসে মিটিমিটি হাসি। তনি মাসির বর, গনেশকাকা, বিনোদকাকা সব বরকে অমন লুকোছাপা হাসতে দেখেছি। দাদু প্রায়ই সভা সমিতিতে যান। গেলেই জানি আমার জন্যে গোড়ে মালা আসবে। ফলে অনেক রাত অবধি বসে রই। দাদু এলে আগে মালাটা গলায় পুরে পাঁচ পাক লম্ফ। তারপর ওটা পরেই বিছানায়।

ক্লাস টু থেকে থ্রি—কী করে যেন ফার্স্ট হলাম। বাবা বলল, কী প্রাইজ নেবে? ফুলের মালা। কিন্তু মালা আর আসে না। বাবা রোজই ভোলে। রোজই অন্ধকার খোলা ছাতে অপেক্ষা করি আলসেয় গুঁড়ি দিয়ে, কখন বাবার সাইকেলে দেখা দেবে আমাদের ইশকুল বাড়ির দরজার সামনে। এমনি করতে করতে একদিন বাবা একটু সকাল সকাল এল, সন্ধের খানিক আগে। হাতে খবরের কাগজে মোড়া একটি হলুদ গাঁদার ছোটখাটো মালা। সেটি পেয়ে কী আনন্দ আমার। প্রথমেই লম্ফ। তারপরে মালা গলায় একবার ছাত, আর একবার বারান্দা। গোটা বাড়ি তুড়ি লম্ফ দিয়ে বেড়াই। কেউ আমায় মানা করে না।

একটু পরেই শাঁখে ফুঁ, টেনে টেনে, বড়মার তরফে। বারান্দায়, ঘরে লণ্ঠন পড়ে। একটেরে ওদিককার লম্বা ঘর থেকে দাদু গলা তোলেন, ওহে রামশরণ, এ ঘরে মাদুর দাও। ঠাকুর মাস্টারমশাই এলেন বলে।

ঠাকুর মাস্টারমশাই আসলে নলীনাক্ষ ঠাকুর। দাদুর ইশকুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার। ঢোলা হাতা পাঞ্জাবি, ধুতি। মাথার তেলোয় পেতে রাখা কতিপয় চুলের আলপনা। চশমার ওধারে গোল গোল চোখ।

বাবা বারান্দায় এসে ডাক ছাড়ে, হয়েছে হয়েছে। এবার পড়তে বোসো দিকি।

আমি তৎক্ষণাৎ ঘরে। মাঝখানে লণ্ঠন। ওপারে বাবা। এ পারে মাল্য ভূষিত আমি। আমার মন কেবলই বাংলা পড়ার দিকে। সে সব সরিয়ে বাবা অঙ্ক টেনে নেয়। আমার কাণ্ডজ্ঞানের সিধে পরীক্ষা।

একের পর এক অঙ্ক পাতে পড়ে। একে একে সবগুলোতেই গোল্লা। প্রথমে কানমলা। তারপর একে একে মাথার চুলে মুঠি পাকড়ানোর সঙ্গে পিঠে গদাম গুম কামান দাগা। যত অঙ্কে হারি তত বাবার হাত ঝাড়ি। গলার গাঁদার মালা তালে তালে দোলে, টাল খায়।

একসময় সে ছিঁড়ে কুটে আমার কোলে, মাটিতে ছত্রাকার। সেই সঙ্গে বাবার হাত আমার কানের গোড়ায়। একটি মোক্ষম মোচড়। অমনি কানের পাশ দিয়ে গাল বেয়ে, চিবুক টপকে টপ টপ রক্ত কোলের ওপর ছেঁড়াকোটা ফুলমালায়।

এই প্রথম আমার চোখের জল বিনি ডুকরে ওঠা। সেটা রক্ত দেখার চমকানিতে।

দরজার ওপার থেকে মা ককিয়ে ওঠে। বড়মা ও ঘর থেকে 'গুরো গুরো'। ওদিককার ঘর থেকে লম্বা বারান্দা খড়ম খটমটিয়ে আর লুঙি সামলাতে সামলাতে খালি গা দাদুর দুদ্দাড়িয়ে এ ঘরে প্রবেশ, ও হে, ওই মারগুলো সব আমার পিঠে পড়ছে।

এবার আমায় থমকাতেই হয়। সামনে একটা সরু খাল। গঙ্গার থেকে বেরিয়ে আচমকা চলে এসেছে। সেঁধিয়ে গিয়েছে বাঁয়ে—আমার সামনে হঠাৎ বাধা হয়ে।

ওই খালের ওপর একটা মস্ত উঁচু লোহার জেটি অন্ধকারে যমদূত হয়ে ওপরে উঠে গিয়েছে। ওঃ কত উঁচু রে! হুঁ, বেশ খানিক। তবে একটা সুবিধেও আছে। জেটিখানা টপকে ওপারে নামতে পারলেই রাস্তা পরিষ্কার।

নির্ঘাৎ ওখানে একটা কারখানা। তারই জেটি এটা। বেশ, তাহলে এটা বেয়ে ওপরে উঠি। খালের জলে নামতে ভয়। জামা-প্যান্ট ভিজে গেলে মুশকিল।

দু'হাতে লোহার জেটির খাম্বা চেপে ধরি। তারপর খাঁজে খাঁজে পা রেখে আস্তে আস্তে ওপরে বাই। উঠি, উঠি। নীচে খালের জল ছলাৎছল। ডান হাতে দেদার গঙ্গার কিলবিলে স্রোত। কালো কালো নৌকো। ওপারের টুকটাক আলো। যত ওপরে উঠি ততই এতবড় গঙ্গাখানা কীরকম ছোট হতে হতে মিইয়ে যায়।

হঠাৎ, হঠাৎ জেটির ওধার থেকে বুট গটমটিয়ে কে যেন এগিয়ে এল। খাকি ড্রেস। মাথায় টুপি। হাতে লাঠি। আর গুমড়ো গম্ভীর আওয়াজ।

—কে কে? কৌন হ্যায় রে? কৌন-কৌন—

এই রাজসভা আজ এই প্রভাতে কেবলমাত্র বাঁধা পরিসরে আবদ্ধ নয়। তার বাইরে প্রশস্ত আর প্রসারিত এলাকা জুড়ে যজ্ঞস্থল রচিত হয়েছে। চতুর্ধারে সুরম্য আম্রপল্লব, ফুল সম্ভার, কদলি কাণ্ড আর তাদের পদপ্রান্তেও পূর্ণকুম্ভ সকল। সেই তাম্রকলসির গর্ভে আম্রপল্লব, গাত্রে ত্রিপুণ্ডক আঁকা সিন্দুর। পাত্রগুলি কলাগাছের পায়ের কাছে আলপনার সুচারু চিত্রের মাঝখানে স্থাপিত। তিল, আতপ, তণ্ডুল, হরিদ্রা, হরিতকি প্রভৃতি নয়ন শোভা হয়ে প্রাণবন্ত সাজানো। কলসগুলির ঘেরবন্দী গঙ্গামৃত্তিকার গোলাকৃতি গড়। সেখানে দধি, ঘৃত আর মধু ঢালা আছে। মাঝখানে মাটির তৈরি আয়তক্ষেত্র যজ্ঞস্থল, একটি প্রকাণ্ড বেদী। বেদীর নীচে সারিবদ্ধ তাম্র কলসি অগণ্য। সেগুলি ঘৃতপূর্ণ। তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাজানো গঙ্গাজলপূর্ণ মেটে কলসিকল। বেদীর প্রান্তে থরে থরে সাজানো বিল্বকাষ্ঠ। আর আছে শমিধের স্তুপ ও চন্দনকাষ্ঠ।

প্রসাদ তাঁর সাঙ্গ দুই—ভজহরি আর রামতনু সমেত একধারে বসে দেখছেন রাজার অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী যজ্ঞের শুভায়োজন। মাঝখানে ক'টি দিবস পার হয়ে গিয়েছে। রামপ্রসাদ কেন জানি, ইচ্ছে করেই বা, এই রাজকীয়তার থেকে কিঞ্চিৎ দূরে থেকেছেন। আজ বুঝি না এলেই নয়। নিষ্কারণে পায়ে পা বাঁধিয়ে বিবাদ করা রাজার সঙ্গে মানায় না। তদুপরি রাজা তো তাঁর গুণগ্রাহী ও স্নেহবদ্ধ।

রামপ্রসাদের মনে মনে হিসেব কষা আছে, আজ নিয়ে যজ্ঞের পঞ্চম দিবস। এ ক্রিয়াকাণ্ড চলবে আরও দশটি দিন। কিন্তু টানা এতদিন ঘর ছেড়ে থাকতে আর মন চাইছে না। শুধু মনের মধ্যে দু'টি কাঁটা খচখচ করছে। একটি হল পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। রবাহূত পণ্ডিত এ নগরে যে এসেছেন তা প্রসাদের জানা। রাজযজ্ঞের বাবদ তাঁর কী বিপরীত লীলা, সেটিই এখন দেখবার। দ্বিতীয় কাঁটা, মুরসিদাবাদ। সেইখানকার হাল হকিকত নিয়ে এবং দেশকাল নিয়ে কৃষ্ণনগর ত্যাগ করবার আগে রাজার সঙ্গে একবার মোলাকাত। আলিবর্দি-সিরাজ বিজড়িত এ বাংলার ভূত-ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছু মত বিনিময়।

এই রাজসিক যজ্ঞসভার একপাশে বসে প্রসাদের মনে মনে বুঝি পাখ গজায়। তাঁর মতো একজন আটপৌরে কবি মানুষের এ কী ঘোড়া ব্যামো। দেশের রাজার তত্ত্ব-তালাশে তাঁর কী কাম! কিন্তু বিপরীতে যেয়ে এ কথাও মনে মনে বিদ্যমান যে, কবিতা ও কালিকার সন্তান পঞ্চেন্দ্রিয় বেমালুম উড়িয়ে দিয়ে কেমন করে বেভ্‌ভুলো চক্করে ডুবে বসে রয়। তাহলে আর মানুষ কথাটি বলেছে কেন। এই তিন আখরি শব্দটির সঙ্গে কবিতা ও কালিকার কী অনবদ্য যোগ সম্মিলন।

বেদীর একধারে রাজা বসেছেন কুশাসনে। পরিধানে পট্টবস্ত্র। ভ্রূ মধ্যে হোমের তিলক গভীর করে টানা। দু'হাতের আঙুলে কুশাঙ্গুরিয়। দুই বাহুমূলে হোম তিলক। গলে শুভ্র উপবীত আর শাক্ত বংশীয় রুদ্রাক্ষ মালা। দু'ধারে দুই মার্তণ্ড পুরোহিত প্রখ্যাত শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিত হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত আর প্রাণনাথ ন্যায়পঞ্চানন। বেদীর অপর ধারে, রাজার আড়ে বসে আছেন বিবিধ বিদ্যাবিশারদগণ। ধর্মশাস্ত্র ব্যবসায়ী গোপাল ন্যায়ালঙ্কার, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি, রামগোপাল সার্বভৌম, রামানন্দ বাচস্পতি, বীরেশ্বর ন্যায়পঞ্চানন। আছেন ষড়দর্শন বেত্তা শিবরাম বাচস্পতি, রমাবল্লভ বিদ্যাবাগীশ। উপবিষ্ট, গুপ্তিপাড়ার প্রসিদ্ধ কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, শান্তিপুরের রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য। আরও অনেক, অনেকানেক পণ্ডিত সকল, এ মুহূর্তে এই সভা হরেক সুগন্ধি শোভন কুসুম শোভিত উদ্যানের মতো, বিবিধ গুণ সম্পন্ন বুধগণে শোভমানা।

গৌরবর্ণ রাজার আনন ক্রমাগত হোম অনল তাপে রক্তাভ। চক্ষু দু'টিও। রাজা তদগত ভাবে অগ্নিতে আহুতি দিচ্ছেন। খানিক উন্মুক্ত থাকার কারণে তাঁর সুগঠিত দেহ খাঁচা প্রকটিত হচ্ছে। প্রাচীন আর্য পুরুষের নবীন উদাহরণ ওইখানে প্রমাণিত হয়েছে। আর এই বৃহদ্‌যজ্ঞে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, রাঢ়, গৌড়, কাশী, দ্রাবিড়, উৎকল, কাশ্মীর প্রভৃতি দেশস্থ যাবতীয় পণ্ডিতেরা নিমন্ত্রিত হয়েছেন। রামপ্রসাদ জেনেছেন, রাজা যখন এই যজ্ঞ করার বাসনা পণ্ডিতদের কাছে প্রকাশ করেন এবং প্রার্থনা করেন কত তঙ্কা হলে যজ্ঞ সাঙ্গ হবে, তখন পণ্ডিতরা তার যায় বা ফর্দ কষে দিলেন। সেই সামুদায়িক বরাদ্দ হয়ে দাঁড়াল বিংশতি লক্ষ তঙ্কা। যায় শুনে রাজা হাস্য করে শুধু বললেন, আয়োজন করো।

কিন্তু একটি বিষয় এতক্ষণ রামপ্রসাদের নজর এড়িয়ে ছিল। তা হল ওই যজ্ঞ বেদীতে যে অগ্নিপ্রতিষ্ঠাকর্ম বা অগ্ন্যাধান সহকারে আহিতাগ্নি প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, তা প্রকৃতপক্ষে তিন প্রকার। ওই অগ্নিশালার চারকোনা বেদীর তিনদিকে তিনটি অগ্নিপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। পশ্চিমে গার্হপত্য, পুবে আহবণীয় আর দক্ষিণে দক্ষিণাগ্নি। এই আহবণীয় অগ্নি কুণ্ডটির সুমুখে এখন রাজার আসন। ওই অগ্নি মধ্যে দেবতাদের উদ্দেশ্যে আহুতি ঘটে।

দক্ষিণাগ্নিতে পরলোকগত পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে। আর ওই গার্হপত্যাগ্নি কখনওই নির্বাপণ দেখবে না। আদপে এখানে মূল ওই আহবনীয় অগ্নি। এই শিখায় অগ্নিরক্ষা হয়। এবং বিধি বশে ভবিষ্যতে এই অগ্নিতেই যাগকর্তার মৃতদেহ দগ্ধ করতে হবে!

এখানে বসে রামপ্রসাদের মনে এক কূট প্রশ্ন হানা দেয়। এই নৃপবর এই বিপুল অর্থ ব্যয় করে, এত আড়ম্বরাদি ঘটিয়ে এই যে যাগ করছেন, তাঁকেও তো মাঝেমধ্যেই ভিন্ন রাজা বা জমিদারের কাছে টাকা কর্জ করতে হয়। তাহলে এই ঋণ কৃত অর্থ আগুনে পরোক্ষ আহুতি দিয়ে, ঘড়া ঘড়া ঘৃত আগুনকে পান করিয়ে রাজা অবশেষে হয়ে উঠবেন বাজপেয়ী। অর্থ অনুযায়ী বাজ বা ঘৃত পেয় যাহাতে। তাহলে কি রাজাই স্বয়ং আগুন আর ঘৃতপায়ী! কেন না এই যজ্ঞে ঘৃত বা পৈষ্টীসুরা পেয়। এ যাগ আদপে শ্রৌত যজ্ঞ বিশেষ।

অতএব দধি, দুগ্ধ, যবাগু ইত্যাকার দশবিধ দ্রব্য সহ হোম। এবং এই হোমকর্তা বহু ক্লেশকর ঋণ করেও অবশেষে অগ্নিহোত্রী। কিন্তু যে দেশের ললাটে এখন ওই গভীর কালো হোমতিলক, মুর্শিদাবাদী আকাশে গভীর কালো মেঘের উদ্ভাস, সে দেশের ভবিতব্য কী? কী আছে দেশ জননীর মনে?

সময় গড়িয়ে বেলা দ্বিপ্রহর। বেলা হতে বেলান্তর। যজ্ঞস্থল ঘিরে পণ্ডিতদের গম্ভীর সুরেলা শ্লোকোচ্চারণ এক এক সময় ঝোড়ো ঝাপটাবৎ সভার এ মাথা হতে সে মাথা বিপুল উদ্দীপন ঘটিয়ে চলেছে। সেই সঙ্গে মুহুর্মুহু অগ্নির উল্লম্ফন ঘৃত নিক্ষেপের কারণে। অনেকেই সভার এক প্রান্তে বসে উত্তরিয় ঘুরিয়ে বাতাস খেয়ে চলেছেন। থাকে থাকে মেটে কলসিতে রাখা জল পান করছেন। চতুর্ধার হবি, তিল, তণ্ডুলাদির নিবিড় গন্ধে আমোদিত হচ্ছে। প্রসাদের মনে অতীব প্রিয় ভিন্ন এক সুগন্ধ পাক দিচ্ছে। আহা, কতকাল যেন সে দ্রব্য পানের কুটম্বিতা ঘুচে গিয়েছে।

ঠিক এমনই সময়ে সভার খোলা পথ দিয়ে একটি নীরব গম্ভীর জন সমাগম ঘটে। প্রায় শতাধিক শিখাধারী আর ধুতি উত্তরিয় বিন্যস্ত একদল নবীন ও কিঞ্চিৎ প্রবীণ পণ্ডিত এসে থামেন যজ্ঞস্থলে অদূরে। তাঁদের সর্বাগ্রে দলপতি, সেই পরিচিত তেজি আর বলিষ্ঠ প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ, পণ্ডিতপ্রবর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, লোমশ মুনি। দেখলে হঠাৎ মনে হয়, দূর ইতিহাসের পলিত পুথি হতে উঠে এসেছেন সাক্ষাৎ চাণক্য পণ্ডিত। কৃষ্ণবর্ণ কাঠামোয় উত্তেজিত রোম রাজি, গোলাকৃতি উজ্জ্বল চক্ষু আর খড়গ নাসা। বাইরের উড়ুক্কু বাতাসে তাঁর কষে বাঁধা শিখাগুচ্ছ মৃদু মৃদু আন্দোলন করছে।

রবাহুত পণ্ডিতবর তাঁর শিষ্যবর্গ সমেত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকেন। অন্যেরা বারংবার বলা সত্ত্বেও আসন গ্রহণ করেন না; যজ্ঞ তার নিয়ম মোতাবেক গড়িয়ে চলে।

বিপুল শ্লোকধ্বনি আর শঙ্খনিনাদের সঙ্গে আজকের যজ্ঞ সমাপ্ত হয়। মহারাজা গণ্ডুষ সেরে উঠে দাঁড়ান। পণ্ডিত মহাশয়ের দিকে চোখ পড়তে দ্রুত আসন ছেড়ে সুমুখে এসে দাঁড়ান গলবস্ত্রে, জোড় হস্তে। তারপর সবিনয়ে প্রশ্ন করেন, পণ্ডিত মহাশয়, যজ্ঞ কীরূপ হল?

লোমশ মুনি মৃদু হাস্য করে বলেন, যেখানে জগন্নাথ রবাহূত, সে যজ্ঞের মহিমার সীমা কী?

চোখের পলকে রাজ যজ্ঞের মহিমা এই রুদ্র ব্রাহ্মণের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমন্ত অথচ সংক্ষিপ্ত

বাক্য তাড়নায় ভিন্ন সূত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। রাজার সভায় সূচ পতনের নীরবতা সুস্থিত হয়। রামপ্রসাদ তাঁর সঙ্গীদের কানের কাছে বলেন, আর নয়। কাল ভোরেই আমরা দেশে ফিরব। তবে তার আগে আজই রাজাকে একবার বলে যাব।

সেই বলে যাওয়ার সংক্ষিপ্ত আকার ঘটে রাত্রির ঘোরালো প্রহরে।

রাজা আজ যজ্ঞক্লান্ত হলেও এখনও শুতে যাননি। তাঁর প্রাসাদের সেই নিভৃতে মন্ত্রণা কক্ষে তিনি কাঠের কেদারায় গা এলিয়ে দিয়েছেন। কেদারার হাতলে ফরসির নলটি এলিয়ে রয়েছে। রাজার অঙ্গ থেকে সারাদিন যজ্ঞের স্মৃতি তীব্র হবির গন্ধ ম ম করছে। তাঁর কপাল জোড়া হোম তিলক দৃপ্ত হয়ে আছে।

প্রসাদ অভিবাদন করে দ্বিতীয় আসনটিতে বসেন। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর দিকে চেয়ে গভীর স্বরে কেটে কেটে উচ্চারণ করেন, মনসুরোল মোলক্—সিরাজদ্দৌলা, শাহকুলি খাঁ, মিরজা মাহম্মদ হায়বৎজঙ্গ বাহাদুর।

প্রসাদ মৃদু হাসেন, হ্যাঁ মহারাজ, আপনার কথা অনুযায়ী এখন এই নামটির আগে শুধু নবাব কথাটি দেগে দেওযার কথা।

কৃষ্ণচন্দ্র গভীর চিন্তিত মুখে তাকান। তাঁর ভ্রূ মধ্যে দিঘল ভাঁজ পড়ে। হ্যাঁ প্রসাদ, নবাব আলিবর্দি বৃদ্ধ আর দৌহিত্রের প্রতি একচক্ষু। দেশের নসিবে যে কী লেখা আছে, তা কে জানে।

প্রসাদ চোখ রাখেন বাইরে, গবাক্ষ পারে অথৈ অন্ধকার। বিস্তীর্ণ কালো আকাশ। থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ঠান্ডা বাতাস টেনে আসছে অদূর জলঙ্গির দিক থেকে। দূরে কোথায় কারা যেন খোল করতাল পিটিয়ে গান করছে। গানের বাণী বোঝা না গেলেও আঁচ শুনে মনে হচ্ছে পদাবলি কীর্তন। আহা, দেশকালের বিড়ম্বনার আগামী সমাচার বুঝি এই সাধারণ নিপাট জনগণ জানে না। তাই তারা আনন্দে গান করছে। সারাদিনের হতক্লান্ত পরিশ্রমের পর একমাত্র গানই মানুষকে শান্তি দিতে পারে।

প্রসাদ কন, মহারাজ, আমায় মার্জনা করবেন। আপনার কাছে আমি বিদায় নিতে এসেছি।

মহারাজা চমকে ওঠেন, বিদায়!

—হ্যাঁ মহারাজ। মনটা ভারী ব্যাকুল হচ্ছে সংসারের জন্যে। তারা যে কী করছে, কে জানে।

রাজা সিধে হয়ে বসেন, তুমি না কালীর বেটা! তোমার এত মন উচাটন!

—মহারাজ, আমি তো আর পাঁচটি মানুষের বাইরে নই।

—বুঝেছি প্রসাদ। তোমার নিভৃত গৃহকোণ তোমায় টানছে। বেশ, তবে আর তোমায় বেঁধে রাখব না। কবে রওয়ানা হবে?

—আজ্ঞে কালই। সূর্যোদয়ের আগে।

কৃষ্ণচন্দ্র আত্মগত স্বরে বলেন, কারও সূর্যোদয়, কারও বা সূর্যাস্ত। এ দেশে যে-কোনওটি ঘটবে।

—চিন্তা করবেন না মহারাজ। মহানিশার পরেই তো দিনমান ঘটে।

কৃষ্ণচন্দ্র নিঃশ্বাস মোচন করেন, হবেও বা।

চুয়াল্লিশ

রাজার কাছ হতে রাজধানী কৃষ্ণনগর থেকে বিদায় নেওয়ার সেই সময়টি ছিল নিশাকাল। সেদিন রাজার বাজপেয়ী যজ্ঞের পঞ্চম দিন। সেদিনই মহাপণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের সঙ্গে রাজার বিচিত্র মোকাবিলা ঘটল।

সে রাতে রাজা রামপ্রসাদ সমীপে দেশ জোড়া আসন্ন সূর্যাস্তের কথা ঘোষণা দিয়েছিলেন। তাঁর কুঞ্চিত ললাটে হোমের তিলকশোভা ছাপিয়ে অকিঞ্চিৎকর দুর্ভাবনার ছটা জেগেছিল। প্রসাদ বুঝি তাঁকে খানিক প্রবোধই দিয়েছিলেন। আসলে রাজধানী মুরসিদাবাদের গঙ্গায় ঘোলা স্রোতের হাঙ্গামা ইদানীং বুঝি প্রবল।

জলঙ্গি ছেড়ে গঙ্গায় এসে পড়তে মনের সুর পর্দা পাল্টে নেয়। এই জলরাশি তো তাঁর কুমারহট্ট হালিসহরের কানাচ ছুঁয়ে বয়ে আসছে। এই জলের বুকে ভাসতে ভাসতে কেবলই মনটা ঘরের কোণ দেখে। সেই বুনো জাঙাল বোঝাই, দিবসেতেও কৃপণ সূর্য, লম্বা লম্বা বটের ঝুরির দোলনে গঙ্গার বাতাসি হাত চাপড় আর অহর্নিশ পাতা ওড়া নিঝুম ঠাঁই। প্রসাদ নাও থেকে হেঁট হয়ে গঙ্গার জল স্পর্শ করেন। অঞ্জলি ভরে জল নিয়ে চোখে-মুখে দেন।

নৌকার ছই তলে ধুম গাঁজা উড়ছে ভজহরির তরফে। রামতনু বিরক্ত নেত্রে অন্যধারে মুখ ঘুরিয়ে বসে আছে। এমন সময় এক মাঝি হাঁক দিয়ে বলেন, কত্তা, কাটোয়া এল যে। এবার থালে নাও লাগাই। দুটি ভাত চড়াতে হবে তো।

নাও লাগে আঘাটার কানাতে। নোঙর হয় কাদা কাদা পাড়ে। মাঝি মাল্লারা নৌকা ছেড়ে ধুপ্ ধাপ্ মাটিতে নেমে পড়ে। নামানো হয় কাঠের বোঝা। হাঁড়িকুঁড়ি। চাল-ডাল। কাঁচা আনাজপাতি।

প্রসাদ পাড়ে নেমে চলে ফিরে বেড়াতে বেড়াতে এই কাটোয়া বা প্রাচীন কালের কাটদ্বীপ-এর কথা মনে করেন। মনে পড়ে যায় মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে আর ধর্মপুরাণে কাটোয়ার কথা বলা আছে। তাছাড়া শ্রীচৈতন্যের স্মৃতিপুষ্ট এই অঞ্চল মনে মনে ললিত চন্দনের সুগন্ধ এনে দেয়। চলে বেড়াতে বেড়াতে প্রসাদ দেখতে পান সেই পুরনো প্রহরী মন্দিরখানি। পথিকদের বিশ্রামের জন্যে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ এটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। সে কালে বর্গীর হাঙ্গামার কারণে এই স্থানটি এমনই শ্রীহীন হয়ে পড়েছিল যে, পথ চলতি মানুষ বাঘের হাতে পড়ে প্রাণ দেওয়ার ভয়ে এখানে শিঙ্গা বাজিয়ে পথ চলত।

কিন্তু এ দেশে বর্গীর তরাস-এর সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছুকাল যাবৎ ইংরাজ বানিয়াদের আস্তে আস্তে শিকড় গেড়ে বসার নমুনা প্রকট হয়ে উঠছে। তারা এ দেশে বাণিজ্য করার ফরমান আদায় করে নিয়েছে দিল্লিশ্বরের কাছ থেকে। কত দূর দেশ সেই কোথাকার ফিরিঙ্গি স্থানের মানুষ এই ইংরাজদের নাকি ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়া আর কোনও চলবার পথ নেই। তারা আস্তে সুস্থে এ দেশে বাণিজ্যের এক একটি খুঁটিগাড়ি সেরে চলেছে। ব্যবসা হচ্ছে প্রকাশ্যে ও গুপ্ত ভাবে।

ফলে এক হাতে দেশি শিল্প প্রহারিত হচ্ছে। স্বদেশির চড়া দামি পণ্য মানুষ আড়ে

দেখছে। আর এক হাতে এখানকার পুরনো বাস্তু আর এক দল বিদেশি বানিয়া, ফারসি, দিনামার, ওলন্দাজগণ ইংরাজদিগের সঙ্গে এঁটে উঠছে না। দিল্লির ফরমান বলে এই ইংরাজ বিনি শুল্কে বাণিজ্য করছে। এমনকী, খবর, তাদের জ্ঞাতি-কুটুমরাও ও দেশ থেকে হেথায় এসে গোপনে গোপনে স্বাধীন কারবার করছে। যতদিন এই ইংরাজ থাকবে, তারা এভাবেই বাণিজ্য করে যাবে। হবু নবাব সিরাজের দু'চোখের বিষ এই ইংরাজ। বালক বয়সে তিনি একবার নবাবের সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ মারফৎ দাদু আলিবর্দির কাছে দরবার করেছিলেন ইংরাজ খেদাবার। কিন্তু নবাব সে কথায় কান পাতেননি।

আলিবর্দি নাকি বলেছিলেন। মুস্তাফা হল যুদ্ধব্যবসায়ী। যুদ্ধ বাঁধলে তারই লাভ। তোমরা ওর কথায় কান দিও না। বৃদ্ধ নবাব তাঁর এই একবগ্গা নাতিটিকে কেবলই বলে আসছেন, ওদের সঙ্গে বিবাদে কাজ নেই। সে কথা শুনে সিরাজ দাদুকে ভীরু, কাপুরুষ পর্যন্ত বলেছে। তার কথায়, ইংরাজদের শাসন করার জন্যে আর কিছুরই প্রয়োজন নেই। শুধু একজোড়া চটিজুতা।

কিন্তু এই ইংরাজ অতি ধুরন্ধর। তারা এ দেশে বর্গীর হাঙ্গামার পয়লা বছরেই নবাবের অনুমোদন নিয়ে কলিকাতার দুর্গ সুদৃঢ় করে বসে আছে। স্থানে স্থানে তারা ব্যবসার নিরাপত্তা ওজরে তোপ আর গোলন্দাজের ব্যবস্থা করে ফেলেছে। নবাবের কৃপায় এই বিদেশি বানিয়ারা দিনে দিনে চন্দ্রকলার পারা বাড়ছে। কিন্তু বৃদ্ধ নবাবের সে নিয়ে কোনও তাপ-উত্তাপ নেই। সিরাজ একবার নবাবের কাছে স্বয়ং দরবার করলেন, আপনি হুকুম দিলে এদের আমি বিদেয় করতে পারি। মারাঠা হেঙ্গামায় বিপর্যস্ত নবাব জবাব দিলেন, মারাঠি সেনারা স্থলপথে যে যুদ্ধানল জ্বেলে দিয়েছে তাই নির্বাপিত করতে পারি না, এখন যদি ইংরেজ রণতরী সমুদ্রে আগুন বর্ষণ করে, তাহলে সেই বাড়বানল কেমন করে নেভাব।

আলিবর্দি কিন্তু জানেন, তাঁর এই নাতিটি সিংহাসনে বসলে ইংরাজদিগের মধ্যে যেমন ত্রাহি রব উঠবে, তেমনই বুঝি আপামরের প্রতি তার ভারসাম্যিক শাসন যন্ত্র যথাযথ থাকবে না। অথচ এই নবাবটি হরেক বিপদের মধ্যে বহু শ্রমে রাজপদ আর সম্মান আদায় করেছেন। কিন্তু তাঁর পরিবার পরিজন লাম্পট্য আর অনাচারে গা ঢেলে দিয়ে বসে আছে। তার মধ্যে সিরাজ হল কুলমার্তণ্ড। নবাবের এই আদুরে গোপালটি, যাকে বলে কামের কামান। এ বিষয়ে তার কাছে কোনও প্রভেদ নেই। এমনকী, শোনা যায়, কামবশে সে নিকট কুটুম্বকেও রেয়াত করে না। সিরাজ লোক চোখে মূর্তিমান ফেরোয়া হয়ে উঠেছে। এমনও শোনা যায় যে, হঠাৎ তার সুমুখে পড়লে লোকে, হরি রক্ষে করো—বলে ওঠে।

এই 'নাকি'. 'হয়তো' কথাগুলি প্রসাদের মনোকথার ফাঁকফোকরে দাখিল হয় নিজের অজান্তেই। সত্যিই তো, ঘটনা দূরে থাক, সিরাজ মানুষটিকে আজ অবদি চোখে দেখা হয়ে ওঠেনি।

প্রহরী মন্দির আর চারপাশের বুনো পরিবেশ হাঁটকে চলে বেড়াতে বেশ লাগে প্রসাদের। এভাবে এই দেশটি এর আগে কখনও ঘুরে দেখা হয়নি। সত্যি কথা বলতে কী সংসারের বহু দেশই দেখা হয়নি ভালো করে। এতটা কাল তক কেবলই নিজ ভিটে সংলগ্ন

গ্রাম দেশের আগ দুয়ার হতে নাছদুয়ার আর নাছদুয়ার হতে আগদুয়ার এই করেই কাল কেটেছে। মাঝে মধ্যে অন্ন চিন্তায়, জীবনের প্রথম ভাগে, একবার কলিকাতা নগর, সামান্য কিছু দিনের জন্য বাস। সেও বড় আজব বৃত্তান্ত। সেই অতীতের বিবরণখানি সেনজ রামপ্রসাদের মানসে আজও কী সজীব, ফেলে দেওয়া সুগন্ধি ফুলখানি। সে ফুল অবশ্যই বুনো। রামপ্রসাদের মতোই একটি আঁকাড়া বুনো ফুল—আকন্দ।

এ কথার পিছে বহুতর ঘটনা বিন্যাস আছে। কিন্তু সেই সব বিবরণ প্রসাদী অনুভবে যৎসামান্য।

কালীকিঙ্করের কাব্য কথা বোঝা ভার।
বোঝে কিন্তু সে কালী অক্ষর হৃদে যার।।

কিন্তু আরও এক সাঁচি কথা যা সংসারের দিনাতিপাত বিড়ম্বনার সুতোয় গাঁথা, সে ভারী অভিনব। বালককালেই বাঙ্গালা, সংস্কৃত, পারস্য আর হিন্দি—এই ভাষা চতুষ্টয় তাঁকে গুলে খেতে হয় পিতার উপরোধে। কেন না পিতৃদেবের জাতীয় চিকিৎসা ব্যবসা বা সেন বিজড়িত বৈদ্যগিরি কোনওমতে কায়ক্লেশে চলছিল। সেই ক্লেশ অবশ্যই সংসার প্রতিপালনে। ফলে দিন আর চলে না। তাই দৃঢ়দৃষ্টিধারী পিতৃদেব রামরাম সেন ছেলেকে লেখাপড়ার নিগড়েই বেঁধে দিয়েছিলেন। সেই বালক এখন পরিণত রামপ্রসাদ হলেও ভিতর থেকে উড়ু উড়ু চিরকেলে উদাসীন বালক স্বভাবটি গা তোলেনি। এই পিতা রামরাম শিকড়বাকড় ভেষজাদি চর্চিত মানুষ হলেও তাঁর কেন জানি মনে হয়েছিল তাঁর এই প্রসাদ পুত্রটি আর পাঁচজনের মতো সিধে হিসেবের আঁককাটা ঘরে চলে না। তার আনমনা স্বভাবের দরুণ চলনটি বেশ আড় আড়।

রামরামের যুগল সংসার, কাত্যায়নী আর সিদ্ধেশ্বরী। প্রথমা দ্বিতীয়ে ভারী সুখ সম্মিলন ছিল। কাত্যায়নীর ছেলে নিধিরাম। দ্বিতীয়া সিদ্ধেশ্বরীর তরফে সর্বাগ্রজা ভগ্নী অম্বিকা ও ভবানী আর ছেলের তরফে রামপ্রসাদ অনুজ বিশ্বনাথ।

রামরাম তাঁর এই প্রসাদ ছেলেটিকে সংসার প্রতিপালনী ভাষা পারস্যাদি শেখালেও মনে মনে জানতেন না, তাঁর এই বালক বুঝি একদিন ভাবরোগের চিকিৎসক হয়ে দাঁড়াবে। তার মধ্যে বুদ বুদ সম ভাবের স্রোত সদাই বয়ে চলে। বিধাতা পুরুষ তার কপালে কী যে লিখে রেখেছেন।

কিন্তু সংসারে যে কখন কালগ্রাস নেমে আসে, তা কে বলতে পারে। সেই নিয়ম কিংবা বেনিয়মেই রামরাম সেন পীড়ায় পড়লেন এবং ভরভরন্ত সংসার ফেলে রেখে জীবন পুইয়ে ফেললেন। সংসারে আঁধার নেমে এল অকস্মাৎ। সেই বিপদকালে নগর কলিকাতা হতে প্রসাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন ভগ্নীপতি লক্ষ্মীনারায়ণ দাশ। তিনি এই কুটুম্বটিকে তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন চাকরির উমেদারির জন্য। আর সেখানেই যোগাযোগ আর পদপ্রাপ্তি নবরঙ্গকুলাধিপতি দুর্গাচরণ মিত্র মহাশয়ের কাছারি ঘরে। বসবাসের ব্যবস্থাও হল মিত্তির মশাইয়ের আলয়ে। এখানে এক ধনরক্ষকের অধীনে তাঁর মুহুরি কর্মে গতি হল। এই গতিই হল কাল কিংবা মহাকাল। এখান থেকেই কবিতার জন্ম।

প্রতিদিন হিসাবের খেরোর খাতায় হিসাব মুসাবিদার বদলে আগাগোড়া শ্রীশ্রী দুর্গানাম লিখে যাওয়া। এমন করে একই নাম লিখে চলা বুঝি কবিতার পথ খুঁজে বেড়ানো। এই

কতিপয় অক্ষর বিন্দু দিয়েই আগামী কবিতার প্রহর গোনা। ভিতরে ভিতরে অথৈ, অপার, অগম সমুদ্রের ঢেউ গুঞ্জরণ।

কিন্তু মাঝখানে কিঞ্চিৎ পয়জার। হিসাবের খাতায় অকস্মাৎ একখানি কবিতার উদয়—কী যে বেমানান এ সংসারে। ফলে ধনরক্ষকের চোখে প্রসাদ পাগল, মাতাল। দুর্গাচরণ মিত্র মহাশয়ের কাছে বামাল সমেত দাখিল। আর তাঁর তরফ হতে আশ্চর্য নিদান, এ ব্যক্তি তো কাঁচা কর্ম করে পাকা খাতা নষ্ট করেনি, বরং পাকা খাতায় পাকা কর্মই করেছে।

তারপর তো সবই অনতি ইতিহাস। আজ এই নিভৃত হু হু গঙ্গা তীরে দাঁড়িয়ে প্রসাদ মনে মনে স্মরণ করেন সেই সলতে উসকে দেওয়া মিত্তির মহাশয়কে। স্মরণ এবং প্রণাম। তাঁর ব্যবহারিক অনুগ্রহে মাসিক তিরিশ টাকা বৃত্তিধাবী জীবন সংসার প্রতিপালন। আর এ পর্যন্ত চলে আসা।

কাটোয়ার নদী-তীরে একাকী ঘুরতে ঘুরতে, রাজ সন্নিধান থেকে আজ এই ঘরে ফেরার টানে টানে রামপ্রসাদের মনে মনে জীবনের পহেলা কবিতা ও গীতটি মুঞ্জরিয়া ওঠে। এ কি মুঞ্জরণ বা গুঞ্জরণ—সে কথার নিস্পত্তি কে করবে। এই সব কূট ও কচালে যেয়ে লাভ কী। তার চেয়ে এই উদার নিঝুম গঙ্গাতীরে প্রথম সন্তানটির জন্মকালীন কাঁদনের সুরটি যে মনে করতে সাধ হচ্ছে। প্রসাদ সেই অতীত আনন্দ কিংবা হরষের সূত্রে পিছু ফেরেন।

আমায় দেও মা তবিলদারী।
আমি নিমক্ হারাম নই শঙ্করী।।
পদরত্ন ভাণ্ডার সবাই লুটে,
ইহা আমি সইতে নারি,
ভাঁড়ার জিম্মা আছে যার
সে যে ভোলা ত্রিপুরারী।
শিব আশুতোষ স্বভাবদাতা,
তবু জিম্মা রাখো তাঁরি।।
অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গির,
তবু শিবের মাইনে ভারি।
আমি বিনা মাইনায় চাকর কেবল
চরণধূলার অধিকারী।।
যদি তোমার বাপের ধারা ধর,
তবে বটে আমি হারি।
যদি আমার বাপের ধারা ধর,
তবে তো মা পেতে পারি।।
প্রসাদ বলে এমন পদের
বালাই লোয়ে আমি মরি।

ও পদের মতো, পদ পাই তো,
সে পদ লোয়ে বিপদ সারি॥

জেটির মাথায় অন্ধকার। তার মাথায় খাকি ড্রেস। মাথায় টুপি। হাতে লাঠি। সেই সঙ্গে গুমড়ো গম্ভীর হিন্দি আওয়াজ, কৌন হ্যায় রে? কৌন! কৌন.

জেটির রেলিং বেয়ে প্রায় আধখানার বেশির উঠন্ত অবস্থায় আমি যাকে বলে ঝোঝুল্যমান অবস্থায়। আমার দেহের নীচে গঙ্গা থেকে বয়ে আসা খাল। আর ডাইনে মস্ত রাতের গঙ্গা ঝিকমিক, ঝিকমিক, ঝিমঝিম ঝিমঝিম। নদীর ওপারে অনেক আলোর দানা। ঠাসা গাছপালা। পেছনে ফেলে আসা ডানলপ ফ্যাকটরির ধোঁয়া ছাড়ন্ত তিনচার চোঙা আর ওখানকার জেটির মাথায় গনগনে হ্যালোজেন। আর আমার ডাইনে হুগলি ইমামবাড়া, এখন প্রায় হাতের নাগালে।

—কে কে? কে রে? কে রে?

একবার হিন্দি। তারপরেই বাংলা। লোকটিকে মুখ তুলে দেখি। সেও তার খাকি ড্রেস সমেত হেঁট হয়ে ঝুঁকে আমায় দেখে। এবার পরিষ্কার দেখতে পাই তার মুখে আমাদের রামশরণ কাকার মতো মস্ত পাকানো গোঁফ। আর চোখে আমার দাদুর মতো প্লাস-মাইনাস হদ্দ মুদ্দ করা পুরু কাচের চশমা।

—আরে। এ তো বাচ্ছা লেড়কা বা!

হাতে ধরা লাঠিখানা সে জেটির লোহায় বার দুই ঠক ঠকাস করল। বার তিন গলা খাঁকারি দিল। আমি তার দিকে ওই অবস্থায় তাকিয়েই রইলাম।

—কানে বয়রা নাকি রে!

আবার বাংলা। আবার লোহার পাটায় ঠকাস্ ঠক্ বাড়ি।

—নাম, নাম। না হলে আমি নামব। তোর মুণ্ডু ভাঙব। মজা টের পাবি।

তাতেও আমার নট নড়ন দেখে এবার সে যেন একটু থমকে যায়। সেই থমকানোর ফাঁক দিয়ে খালের ধারে কটকটে ব্যাঙ ডাক দেয়। একটা বাঘা ঝিঁ ঝিঁ ফুকরে ওঠে। নদীর পাড়ের খোঁড়লে ঢেউয়ের ঠেলা পড়ে বগবগ, বগ বগ হয়। নদী দিয়ে কারা যেন প্রকাণ্ড নৌকোয় চড়ে হো হো হল্লা জাগিয়ে চলে যেতে থাকে। খাকি, চশমা ওপর থেকে সেই ঝুঁকন্ত অবস্থাতেই বলে, ঘর থেকে পালাচ্ছিস, না চোরি করতে এসেছিস?

আমি এবার কথা বলি। বলি, হিমালয়।

ওপরের পুরু চশমায় ওপারের আকাশ থেকে চিড়িক আলো চমকে ওঠে। ঠিক তখনই মাথার ওপরকার আকাশের পাটায় কে যেন হঠাৎ আলকাতরার পোঁচ টেনে দেয়। চাঁদের লজেন্স টুকরো, তারাটারা সব কোথায় মিলিয়ে যায়। ওপার থেকে একটা দমকা আর ঠান্ডা হাওয়ার দঙ্গল ঘনিয়ে ওঠে। গঙ্গার পুরনো আর ঝুপসি চড়ায় গুম গুম মেঘ ডাকে। ওপারের জমাট গাছগুলো সব কীরকম আলগা আলগা, ছ্যাকড়া ছ্যাকড়া হাওয়ায় এ ওর গায়ে ধাক্কাতে থাকে। আর অমনি আমার মাথার ওপর টিপ টাপ টিপ টাপ।

চশমা আরও ঝুঁকে পড়ে আমার মাথা তাগ করে, হি-মা-ল-য়! চোরি নেহি, হিমালয়। হো হো হো হো হো—

আমার এবার একটু সাহস হয় এই হাসি শুনে। বলে উঠি, আমায় জেটিটা পার হতে দাও না ওস্তাদ। ওপারে নেমেই আমি চলে যাব।

আবার গঙ্গা ফাটানো হো হো হো। আর সেই সঙ্গে মাথার ওপর টিপ টিপ থেকে ঝম ঝম। তার সঙ্গে চড়র বড়র শিল পাত। এক একটা বড়কা বড়কা বরফ পড়ছে লোহার পাটে আর চুরমার ছত্রাকার হচ্ছে। লোকটা হই হই করে ওঠে, পালা পালা পাগলা। তুই জিগ্রাফি পড়িসনি ওস্তাদ।

আমি পাথরে জলে উস্তম পুস্তম হতে হতে ভাবি আমার বলা ওস্তাদ আমাতেই ফিরে এল। আর ভাবি এখন ভূগোল এল কোত্থেকে! আমার জামার বুক পকেটে একটা শিল চড়ুই ছানার মতো সেঁধিয়ে পড়ে। আমি সেটা বার করে অমনি মুখে দি। লোকটা হা হা হো হো নিয়ে বলে, আরে ইধার তো সিধা সমুন্দর। এটা দকসিন দিক। যাঃ, ভাগ উল্লু বদমাশ।

আমার মুখে চোষা ঠান্ডা পাথরটা গলে যায়। আমি হতাশ লজ্জায় পড়তে পড়তে ঝপাত করে নেমে পড়ি। তারপর যে পথে এসেছিলাম সেটা ধরেই দৌড় ধরি। বৃষ্টিতে, শিলায় আর কাদায় আমার পা আটকে ধরতে চায়। পেছনে কালো গুমসো জেটির মাথা থেকে কেবলই হো হো হো হো আমায় ধাওয়া করে।

বেশ খানিক এসে ডান হাতে বাঁধা ঘাট। ঘাটের সার সার সিঁড়ির টঙের বাঁয়ে বিপ্লবী বিপিন গাঙ্গুলীর হলুদ তেতালা বাড়ি। বৃষ্টি টপকাতে টপকাতে সিঁড়ি চড়তে থাকি। এই গরমেও হঠাৎ করে শীত শীত করে। জামা-হাফপ্যান্ট সব গায়ের সঙ্গে লেপটে গিয়েছে। আকাশের চড়াক চড়াক আলোয় নিজেকে কিম্ভূত মনে হচ্ছে।

সামনেই ঘোষপাড়া রোড। নিঝুম পিচ রাস্তা দিয়ে প্রাণপণ দৌড়োতে থাকি। কত রাত কে জানে। রাস্তায় জন-মনিষ্যি নেই। একটা বলবান ষাঁড় লাইটপোস্টের নীচে নিশ্চিন্দি ভিজছে। সামনে থেকে একটা লরি গাঁ গাঁ আলো জ্বেলে আমার চোখের দিকে তেড়ে আসে। তার পেছনেই ৮৫ নং রুটের বাস, কাঁচরাপাড়ার দিক থেকে আসছে। বৃষ্টিতে জানলার সব পাল্লা তুলে দেওয়া। বাঁয়ে রামপ্রসাদ লাইব্রেরি। ক্রেগপার্ক। প্রকাণ্ড সিমেন্টের তৈরি ছাতার নীচে কেউ নেই। ছাতাটা একা দাঁড়িয়ে খাঁ খাঁ পাহারা দিচ্ছে। তার পেছনে নেমে যাওয়া বাঁধানো রাস্তাটা গঙ্গার দিকে গোঁত্তা মেরে আবার ডাইনে বেঁকে উঠে গিয়েছে আরও ডাইনে পিচ রাস্তার দিকে, আধখানা চাঁদ হয়ে।

হালিসহর ফাঁড়ির বাস স্টপে একটাও রিকশা নেই। শুধু একজন পাগল পুলিশ ফাঁড়ির বাইরে গাছের নীচে বসে আপন মনে বকে যাচ্ছে। ডাইনে হালিসহর উচ্চবিদ্যালয়। বাঁয়ে গাঙ্গুলি বাড়ি। আর তার পরেই এস আই দাদুদের বাড়ি। মিউনিসিপ্যালিটির স্যানিটারি ইন্সপেক্টার। ভীষণ গম্ভীর, রক্তবর্ণ ভাঁটা চোখ, চৌকোনা কাঁচা-পাকা গোঁফ, হাফ প্যান্ট আর মাথায় শোলার হ্যাট পরা এই দাদু বাড়ি বাড়ি খাটা পায়খানা দেখে বেড়ান সাইকেল চড়ে। তাঁর এক ছেলে, আমাদেব লাড্ডুকাকা বাবার অধীনেই চাকরি করেন আর গালে পান ঠুসে বিয়ে শ্রাদ্ধ বাড়ির ভাঁড়ার, ভিয়েন সামলান। তাঁর আর এক ভাই কানে বদ্ধ কালা নসীকাকা। সদাই নস্যি নেন আর রোজ রাতে বাড়ির বারান্দায় বসে ব্যায়লা বাজান। আমি ভাবি, নস্যি থেকেই কি নসী!

বাঁয়ে জোড়া শিবমন্দিরের অন্ধকার খোঁড়লে দু'জন কালো মুষকো মস্ত শিবলিঙ্গ দু'টুকরো হয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছেন ছাগল নাদি খোবলানো মেঝেয়। অন্ধকারে কতিপয় বাড়ি ফিরতে না পারা ছাগল চোখে সবুজ টুনি জ্বেলে দাঁড়িয়ে আছে। উল্টোদিকে ইন্দুবাবুদের প্রকাণ্ড বাড়ি। সামনে বারান্দা। এখানে একবার ওঁদের গুরুদেব ওঙ্কারনাথ এসেছিলেন। রোগা সিড়িঙ্গে মাথায় আলুথালু জটা এই সাধুর বুকের মাঝখানে নিজ গুরুদেবের এক জোড়া খড়ম পোক্ত করে দড়ি দিয়ে বাঁধা। এঁরা ভারী গুরুভক্ত আর কঠিন বামুন। বাড়িতে প্রায়ই হরিনাম সংকীর্তন ঘটে দুদ্দাড় খোল কত্তাল পিটিয়ে। সেখানে আমাদের স্কুলের অঙ্কের টিচার গোবিন্দবাবু স্যারের প্রায়ই ভর হয়। তিনি এঁকে বেঁকে, বিচিত্র ভাবের ঘোরে খঞ্জনি বাজাতে বাজাতে এক এক সময় মাটিতে নাক ঠেকান, আবার এঁকতে বেঁকতে উঠে পেছনে প্রায় চিৎ হন। ভর হলে চোখ মুখ কুঁচকে কেমন কাঠ মেরে পড়ে থাকেন। ইন্দুবাবু মিহি স্বরে ওঁর কানে তারকব্রহ্ম নাম শোনান। ইন্দুবাবু ডানলপের ধুতি শার্ট পরা বাবু। মুখে বাক্য প্রায় নেই। রোগা শীর্ণ, এই মরে যাই—এই মরে যাই আড়া। অফিস ফেরতা প্রায়ই খামো খামো ইলিশ ঝুলিয়ে বাড়ি ফেরেন। আমি ভাবি, চৈতন্য ঠাকুরের দলের লোক বাবুটি কেন অবামুনের ঘরে জলস্পর্শ করেন না।

বৃষ্টিও ছাড়ে। আর আমিও সদর দোর দিয়ে গুটি গুটি বাড়ি ঢুকি।

পঁয়তাল্লিশ

আমি খেয়াল করেছি বৃষ্টি হলে বাড়ির ভেতরটা কেমন নিঝুম হয়ে যায়। সেইরকমই হয়েছে এখন আমাদের এই সাবেক অট্টালিকা। যেমন আসবার সময় দেখে এসেছি, রামপ্রসাদের ভিটের দিকটা আরও যেন বেশি শীতল। প্রকাণ্ড পঞ্চবটির গর্তে মেটে পিদিম টলটল করছে। অদূরে ভিটের লম্বা বারান্দায় এক জোড়া ষাঁড় বসে আছে। মূল ঘরের দোর দেওয়া। চারধারে কেউ নেই।

আমাদের বাড়িটাও সেইরকম। কী হল এখানে! উঠোনের ধারে মস্ত বারান্দার লাগোয়া ঝাঁকড়া গাছে ফটফট করছে কামিনী ফুল। সেই সঙ্গে লতিয়ে উঠেছে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ঝুমকো লতার বাহার। ভারী তীব্র গন্ধ এই ঘন নীল ফুলের। তাই এখন ম ম করছে। ইঁদারায় পা ধুয়ে বারান্দায় পা দিতেই প্রথমে গৌর শিরোমণির গলা। বুরুশকুচি পাকা চুল, নাকে তেলক আর পাকা পোক্ত জাঁহাবেজে কালো মূর্তি। বসে বসে কুঁড়োজালি জপছে। আমায় দেখেই গলা তোলে, এয়েচে, এয়েচে। কানুর সুপুত্তুরটি গরু চরিয়ে ফিরেছে।

মা রান্না ঘরের দিক থেকে একবার উঁকি দেয় শুধু। কিছু বলে না। অদূরে বসে বড়মা গিরিনন্দিনী চোখ বড় বড় করে তাকান, ও মা, কী ছেলে গা। সেই কখন বেরিয়েচে। কোতায় গেছলি রে?

আমার তিন ভাইবোন বারান্দার একধারে মাদুরে বসে পড়ছে। ছোট বোনটির এখনও পড়ার কাল আসেনি। তবু সেও এমনি এমনি বসে আছে। বাইরের ঘরে দাদু দু-চার জন রোগী দেখছেন। উঠোনে একটি গাবিন গরু বাঁধা। ওটির সময় পেরিয়েও বাচ্ছা হচ্ছে না বলে দাদুর কাছে হোমিও খাওয়াতে আনা হয়েছে।

দাদু ও ঘর থেকে গলা তুলে বলেন, এল বুঝি?

গৌর গলা তোলে, এল বলে এল। একেবারে ভিজে কাক হয়ে এল।

বাবার পিসিমা, যোগেশ্বরী ভাইটি এসে আমার হাত ধরে, আয় ভাই। জামা পেন্টুলুন ছেড়ে নে।

বারান্দার দু'কোণায় উপবিষ্ট দুই সাধু আমার দিকে অবাক হাসে। একজন বলে ওঠে, এ ছেলে সাধু হবেই। ওর চোখ বলে দিচ্ছে।

অপর সাধু মিট মিট হাসে, দল ভারী করছ বাবাজি।

ভাইটি এত সব মন্তব্যের মাঝখান থেকে আমায় উদ্ধার করে ভাঁড়ার ঘরে নিয়ে এল। আলনা থেকে গেঞ্জি, হাফ প্যান্ট পেড়ে হাতে দিয়ে ধরিয়ে গামছা দিয়ে আমার মাথা ঘষে ঘষে মোছাতে থাকে। এই ফাঁকে আমি জামা-প্যান্ট বদলে নিই। ভাইটি এবার একটি চিরুনি দিয়ে টেনে হিঁচড়ে আমার ঘন কোঁকড়ানো চুল আঁচড়ায় আর বলে, কালই পঞ্চাননকে ডেকে তোর মাথার বন পরিষ্কার করাবো।

দোতলার সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এল সদ্য আসা ধুলুক গ্রামের নিতাইকাকা। সব সময়েই চুলের অ্যালবার্ট নিয়ে ব্যস্ত। কাকার হাতে ছাতা। মনে হয় কোথাও বেরবে। আমায় একবার উঁকি দিয়ে দেখে বলে, কালকে তোতে আমাতে রামপেসাদে পান্নালালের গান শুনতে যাব। সকাল সকাল উনি এসে পড়বেন উমাবাবু মাস্টারদের বাড়ি।

ভাইটি বলে, আর আমি বুঝি যাব না। পান্না তো আমাদের ঘরের ছেলে। ওর বাড়ি বালি। আমরা উত্তরপাড়া। আহা কী মিঠে গলা। আমার বাপু ওর দাদা ধনঞ্জয়ের চেয়ে ওর গান বেশি ভালো লাগে। প্যাঁচঘোঁচ নেই। আর কী ভাব।

কাকা বলে, পিসিমা, পান্নালালের মেছো রাশ। খাসা মাছ ধরেন। মাস্টাররা তাড়ির গাদটাদ দিয়ে পুকুরে চার করে রাখবে আজ রাতে। উনি সকালে এসেই ছিপ ফেলবেন। তারপর বিকেলবেলা রামপেসাদে গান।

কাকা বার বারান্দা দিয়ে বেরিয়ে যায়। দাদু ঘর থেকে আমার মাকে ডাকেন, ওরে মিলা, একবারটি আয় না মা।

মা যেতে দাদু গলা নামিয়ে রোগীর সিম্পটম নিয়ে কী সব আলোচনা করেন। মা বাক্স খুলে পুরিয়ায় ওষুধ ঢালতে ঢালতে বলে, বাবা, সুগার অফ মিল্কটা কমে এসেছে।

আসলে, আমি জানি আমার মা হল দাদুর সব ব্যাপারেই অ্যাসিস্টান্ট। অনেক সময় মা'র সঙ্গে দাদু আলোচনা করেন। পুরিয়ায় বড়ি ঢালতে অসুবিধে নেই। চোখের জন্যে ফোঁটা ওষুধ ঢালতে সমস্যা। তখনই মা'র ডাক হয়। মা'র সঙ্গে রীতিমতো আলোচনা করে দাদু সিদ্ধান্ত নেন বেলেডোনা থার্টি না কস্টিকাম।

রেকাবিতে একটা গরম রুটি আর একটা বেগুন ভাজা এনে মা আমার হাতে দিয়ে শুধু বলে, নাও ধরো।

আমি জানি, মা রেগে থাকলে 'তুমি' বলে।

বারান্দায় ভাইবোনেদের পড়তে বসা মাদুরের একধারে বসে রুটি ছিঁড়ি। সেবা চোখ পাকিয়ে বলে, আমি, মলয় আর শরণকাকা সুবলদাকে নিয়ে কত খুঁজে এলাম সেই সন্ধেবেলা। সেই শ্মশান অবদি। কোথায় গেছলি বল তো।

আমি কোনও কথা বলি না। মলয় বলে ওঠে, হুঁ দাদা, শ্মশানে নাকি ভুতেরা থাকে। তোর ভয় করে না?

সেবা সঙ্গে সঙ্গে মলয়কে রাম চিমটি কষিয়ে বলে ওঠে, তিনবার বল। রাম, রাম, রাম।

মলয় র বর্গ তার নিয়মেই আওড়ায়, ড়াম ড়াম ড়াম।

ওধার থেকে গৌর বলে, কী উড়ুনচণ্ডে ছেলে বাবা।

ভাইটি অমনি বলে, আঃ থামো তো। ধুনোর গন্ধ দিও না। ওর বাপ জানতে পাল্লে রক্ষে রাখবে না।

বোঝা গেল বাবা এখনও অফিস থেকে ফেরেনি। ওদিকে দাদুর রোগী ফুরোয়। বাইরের দরজা দিয়ে তিনি এসে বারান্দায় দাঁড়ান। খালি গা, রোগা পাঁজরার নীচে সেই চিরকেলে গেরুয়া বা হলদেটে লুঙি। গলায় পৈতে। চোখে হাই পাওয়ার চশমা। আর দু' আঙুলের টিপে নস্যি।

আমার দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বলেন, আমার ঘরে এসো। কথা আছে। সিঁড়ি টপকে দাদু দোতলায় নিজের ঘরে চলে যান। গৌর শিরোমণি অমনি ফুট দেয়। আদরে বাঁদব। এমনটি কোতাও দেখিনি বাপু! আমার নাতি হলে আগে তো দু'ঘা দিতুম।

ভাইটি কটমটিয়ে তাকায়, মালা জপ করছ না পিণ্ডি।

গৌর গলা চড়ায়, কথা কইলে কেন, ঘুমোতে ঘুমোতেও জপ হয়। এটা অব্যেস, বুঝলে অব্যেস।

দাদু তাঁর সরু কাঠির মাদুরে পা মুড়ে বসে। সামনে মেঝেয় আমি। ঘরে ধূপ জ্বলছে। বেঁটে বেঁটে চন্দন ধূপ। পূব দিকের খোলা জানলার ওপারে বিষ্টুকাকাদের পুরনো বেল গাছ। তার ফাঁক দিয়ে মেঘ কাটা পলকা চাঁদের আলো। ওঁদের মস্ত পুরনো বাড়িটার খড়খড়ি জানলায় আলো আলো। ওই একেবারে পূব ঘেঁষা ঘরে রবীনদার যন্ত্রঘর। ঘড়ি থেকে ধরে রেডিও, গ্রামাফোন সবই সারে। ও ঘরে রেডিও সিলোনে মহম্মদ রফি গাইছেন।

দাদু কথা বলেন, কোথায় গিয়েছিলে শুনি?

আমি সামান্য চুপ। তারপরেই জবাব দিই, যেতে পারিনি তো।

দাদুর পাকা ভ্রূ ওঠে নামে, কোথায়?

—হিমালয়ে।

দাদুর মুখের দাগ কাটা খাঁজে অবাক নক্সা।—হিমালয়ে! কেন?

—সংসার ত্যাগ করব বলে।

—সংসার! তোমার এই এক ফোঁটা বয়েসে সংসার কী হে!

আমি চুপ। কী বলব এ কথার পিঠে, বুঝতে পারি না। দাদু আবার বলেন, তা হিমালয়ে গিয়ে কী করবে?

—সাধু হব।

—ঘরে থেকে বুঝি সাধু হওয়া যায় না।

—না তো।

—কে বললে তোমায়। সাধু হতে হলে হিমালয়ের দরকার নেই। তার চেয়ে তুমি এখন আমায় একখানা গান শোনাও দিকি। তাতেই তুমি সাধু হয়ে যাবে।

—কোন গানটা?

—তোমার যেটা এখন গাইতে ভালো লাগছে।

আমি একটু চুপ করে থাকি। মনে মনে গান ভাবি। তারপর রবীনদার মাইকে শোনা এই সেদিন তুলে নেওয়া গানটা ধরি।

শোনো বন্ধু শোনো, প্রাণহীন এই শহরের ইতিকথা
ইটের পাঁজরে লোহার খাঁচায় দারুণ মর্মব্যথা...

কাটোয়া থেকে হালিসহর কুমারহট্ট, এমন কিছু পথ না হলেও জোয়ার ভাটার আচরণের পাকে পড়ে জলপথ অকূল হয়ে যায়। এবং চোখের সামনে সূর্য অস্ত যায়। তারপরেও অনেকখানি পথ। অবশেষে রামপ্রসাদ তাঁর সঙ্গী দুই সমেত যখন দেশের ঘাটে এসে নামেন, তখন রাত্রি এসে বুকে হাঁটু গেড়ে বসেছে। নদীতীর ঘন জমাট অন্ধকার। চৌধারে জন মনিষ্যি নেই। একজন অথর্ব ষাঁড় গঙ্গাতীরের নিঝুম বটতলে অন্তর্জলি কোঠার সুমুখে একাকী বিশ্রাম করছে।

মাটিতে নেমে প্রসাদ মাঝিদের দিকে চেয়ে কৃতজ্ঞতার হাসি হাসেন। তাদের সঙ্গে পাওনা বিদায়ের কিছু নেই। যা করার রাজাই করেছেন। নিঝুম অন্ধকারে গঙ্গার বুকে আজ আর চাঁদের শোভা নেই। তার বদলে শুধুই অমাবস্যার গূঢ়তা। ওপারে বংশবাটির আওতা এখন গভীর ঘুমে। গ্রামদেশে নিদ্রার উৎসব জারি হয়ে বসে আছে। একটি রাতচরা পাখি গঙ্গার কৃষ্ণাভ আকাশ বরাবর ডানা ঝাপটিয়ে চলে যায় ত্রিবেণীর দিকে। হায় ওই পথেই তো বহুদূরের মুরশিদাবাদ। সেখানে নবাব আলিবর্দির আদরের দুলাল সিরাজের যুবাভিষেকের পাকা বন্দোবস্তে আরও কত না পোক্ত দখলদারী গাড়া হচ্ছে। এ বাংলার নসিবে কী লেখা আছে, তা বুঝি খোদ ভাগ্যবিধাতাও জানেন না।

ঘাটের খাড়াই উঁচু পথ বেয়ে তিনজন আঁধার মূর্তি উপর পানে এগিয়ে চলে। সবার আগে শীর্ণকায় রামতনু। মাঝখানে প্রসাদ। আর শেষে ভজহরি। তার মাথায়, হাতে বোঁচকাবুঁচকি। প্রাচীন বটগাছটির ঝুরিগুলি নদীর হাওয়ায় দুলন্ত অদ্ভুত, ওই নিদান কুঠি ঘিরে। প্রসাদের মনে হয়, যতবারই এই দৃশ্য দেখা যায় ততবারই মনে মনে নূতন ছবির অনুষঙ্গ আঁকা হয়। এই যেমন এখন ওখানে বাংলার আকাশের ঝোড়ো তাণ্ডবের চলমান চিত্র ঘটে চলেছে। ঝুরির দোলনে দরকষাকষি আর টানাটানির অলীক কথকতা আঁকা হচ্ছে। তারই মাঝে গাছের কোটর হতে বেরিয়ে এসে গম্ভীর পেঁচা কতিপয় গাছের ডালে বসে কর্কশ ডাক ছাড়ছে। এই প্রাণীরা বুঝি এমন আকাট রাত্রির উপযুক্ত সহচর। তারা না রইলে রাত্রি বেমানান হয়ে যায়।

উপরে উঠে ভজহরি বলে, বামুন তার বাড়ি যাক। আমি কিন্তু এত রাতে ঘরে ঢুকতে পারব না। আমি তোমার সঙ্গেই যাব দা'ঠাকুর।

রামতনু ক্লান্ত হলেও তেজে কমতি নেই। যেমন তোমার দা'ঠাকুর, তেমনি তুমি। আমার বাপু ঘর সংসার আছে। আমি বাড়ি ঢুকে যাব।

ভজহরি ঝামটে ওঠে, হ্যাঁ হ্যাঁ। ইদিকে আবার বামনির সঙ্গে নিত্যি চুলোচুলি। তেনার ডরে সদাই কাঠ।

রামতনু চোখ পাকান, ডর কী ভর তার তুই কী বুঝবিরে পাষণ্ড। এখন আমার শুধু একটিই ভাবনা।

ভজহরি, কী ভাবনা?

—দোর খুলবে তো!

—কেন কেন, হাঁকডাক দেবে গলা তুলে।

রামতনুর চিন্তিত মুখে আঁধার চমকায়, সে তো করবেই। তবে কি না যদি নিশির ডাক ভেবে দোর না খোলে। তাহলে তো সারা রাত্তির দুয়ারে বসে পার করতে হবে।

ভজহরি চোখ গোল গোলিয়ে বলে, হুঁ বাবা, নিশির ডাক। সে বড় ভয়ের জিনিস।

প্রসাদ এতক্ষণে কথা বলেন। সেটি কি বস্তু?

ভজহরি চোখ পাকিয়ে হাত নেড়ে নেড়ে বলে, যে কাপালিক তোমার নাম ধরে বাইরে থেকে গভীর রাতে ডাক দেবে তিন তিনবার, তার হাতে একখানি মুখ কাটা কচি ডাব। ডাবের মাঝখান থেকে দা দিয়ে গোল করে কেটে তুলে নেওয়া চাকাটি তার এক হাতে। সে ডাকবে—রামতনু, রামতনু, রামতনু। মাঝখানে অবিশ্যি বিরাম দিয়ে। যেই না তুমি ঘুম চমকে সাড়া দেবে—কে? ব্যস হয়ে গেল।

প্রসাদ, কী হল?

অমনি তোমার প্রাণপাখিটা খপাত করে ধরে ডাবের মধ্যে ভরে ফেলা হবে। তোমার রা দেওয়ার ন্যাজ ধরেই এটি হবে। সঙ্গে সঙ্গে ডাবের কাটা মুখ কপাত বন্ধ। তোমার প্রাণও তার মধ্যে। তুমি খাবি খেতে খেতে ও কম্মো হবে।

রামতনু, আর সেই ডাবে ভরা প্রাণটি? তাব কী হবে?

—সেটা নিয়ে কাপালিক শ্মশানে যেয়ে ভিন্ন মড়া বাঁচিয়ে তুলবে।

প্রসাদ অন্ধকার দুলিয়ে হাসেন, রামতনু দাদা, এ ভারী ভয়ের কথা।

রামতনু চোখ কুঁচকে তাকান, কী ব্যাপারে শুনি?

প্রসাদ ভজহরির পানে আড়ে তাকিয়ে বলেন, সংসারে তোমার পেছুতে লাগবার মানুষের অভাব কী দাদা। তোমার একে সরলমতি, তায় আমার মতো বদ্ধ মাতালের সঙ্গে খোল বাজাবার স্বেচ্ছা অনুমতি।

রামতনু বলেন, তাতে কী হল?

প্রসাদ, আমি নাকি দিবারাত্র ভূত পিশাচের সঙ্গ করি, লোকে বলে। আমার মতো ছন্ন বেক্তির সঙ্গে তোমার মেলামেশাই এ সমাজে দায়।

রামতনু লম্বা লম্বা চরণ ফেলতে ফেলতে বলেন, সমাজের ক্যাঁতায় আগুন।

দু'ধারের গাছপালার জঙ্গলগড় পার হয়ে সিধে পূব দিকে যেতে হবে। পথে খানিক এগিয়ে পড়বে রামতনুর আর ভজহরির ঘর। সব শেষে প্রসাদের সংসার। মেটে পথের গাছ তলে রাত্রির শৃগালদের আনাগোনা আর হুঙ্কার। এ অঞ্চলে কতিপয় নেকড়েও বিরাজ করে। তবে তারা সাধারণ মানুষকে খায় না। আর তাছাড়া প্রসাদের মতো নিশিচরা মানুষকে তারা বিলক্ষণ চেনে।

প্রসাদকে দেখে শিবাদল ভারী আহ্লাদিত হয়। না জানি কতদিন পরে বুঝি এই সদাই দেখতে পাওয়া মানুষটিকে আবার দেখা গেল। একটি নেকড়েও দূর হতে উঁকি দিয়ে চকিত সরে যায়। আঁধার ঝোপে কোনটি জোনাকি আর কোনটি তার চোখের আলো, মহাধন্দ তৈরি করে দেয়। রামতনু আকাশে তাকিয়ে বলেন, রাত এখন সবে আধখানা। ভোর হতে বিলম্ব আছে আরও আধখানা। এখন যেয়ে একটু গড়াতে পারলে বাঁচি!

ভজহরি খোঁচা দেয়, এতখানি পথ তো ক'দিন গড়িয়ে গড়িয়েই এলে। এখনও সাধ মিটল না।

প্রসাদ সে কটাক্ষে সায় দেয়, আহা, সে তুই বুঝবিনে। নৌকোয় গড়ানো আর বৌঠানের পাশে গড়ানো কি এক হল।

ভজহরি সহর্ষে মাথা নাড়ে, তা বটে। তা বটে।

রামতনু চটিতং হয়ে বলেন, ভায়া, তোমার এই চেলাটিকে আর মাথায় তুলো না। গুরুজনদের মান্যি করতে জানে না।

ভজহরি অন্ধকারে দন্ত বাহির করে হাসে, দাদা ভারী চটেছে। ভারী চটেছে।

রামতনু কড়কে বলেন, মারবো মাজায় এক লাথি।

ভজহরি, ছিচরণে আঘাত নাগবে দাদা। ও কম্মোটি ভুলেও করো না।

ডাইনের গলি পথের শেষে অযোধ্যানাথ বা আজু গোঁসাইয়ের কোঠা। নিঝুম লতাপাতা আর গাছগাছাল ঘেরা বাড়িটি অন্ধকারে একসা হয়ে আছে। ওই দিকটি তুলসীর বনময়। বৈষ্ণবের মনোমতো আয়োজন। ওই দিকটিতে অন্ধকারে অগণ্য জোনাকির মঞ্জরি ঘুরছে। ঠিক যেন গোসাঁইয়ের বাসনা সঞ্চারি বিন্দু বিন্দু আলোর মালা ঘুরছে হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ...।

এ কথা মনে হতে প্রসাদ মনে মনে চাপা হাসেন। আজুর সঙ্গেও বুঝি কতকাল সাক্ষেৎ নেই। কতদিন যেন তার সঙ্গে গীত সমরে মাতা হয়নি।

আসলে আঙুলের করে হিসেব করলে মাত্র ক'টি দিন গ্রামের তফাতে। কিন্তু এই সামান্য কিছু সময়ও যেন অযুত সময়ের পরমাদ রচনা করে বসে আছে মনে মনে। রাজার আশ্রয়ে গিয়েও মন কেবলি ঘুরে ফিরে চলে এসেছে এই বুনো বিভুঁই নিজভূমে। এ কি মায়া, না মায়ার ছলনা।

কিন্তু এ দেশে এখন যে মায়ার ছলনা চলছে, তার নিষ্পত্তি কবে কোন মুখে ঘটবে? যৌবরাজ্যে সিরাজ ইতিমধ্যেই অভিষিক্ত হয়ে বসেছেন। পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত হতে এখন শুধু বৃদ্ধ নবাবের মরণ অপেক্ষা। সুচতুর ইংরাজগণও বুঝে গিয়েছে সিরাজ তখ্‌তে বসলে তাদের দুর্দশার কোনও হিসেব রইবে না। এই বিদেশি বানিয়ারা অর্থবল প্রতাপী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নবাবের দরবারে কোনও পদগৌরবী নয়, বরং কৃপাপ্রার্থী।

এই ইংরাজদের শঠবুদ্ধির আর এক মহিমা হল তারা অতীব উৎকোচ দান নির্ভর। তারা জানে চাঁদির মহিমা কী। সে কারণেই তারা নবাবের দরবারি খাস চাকরদের সদাই তুষ্ট করে চলে। এমনকী অনেকানেক বেনিয়মি অর্থও ইংরেজদের দিতে হয়। হুগলির ফৌজদার তাদের কাছ হতে সম্বৎসরে ২৭০০ টাকা পার্বণী আদায় করে থাকেন। এই সেদিন ঢাকা নগরে রাজবল্লভ তাদের কুঠি বন্ধ করে, নৌকা আটক করে, কুঠিয়ালদিগে

ফাটক দিয়ে, এমনকী খাদ্যদ্রব্য বন্ধ করে যথেচ্ছ উৎকোচ আদায় করতেন। এ কারণে, এ কথা তো সত্য যে ইংরেজরা অন্তর বরাবর মুসলমান শাসকদের পছন্দ করে না।

অথচ এই আলিবর্দী ভারী নিরীহ স্বভাব, প্রজাবৎসল আর ধর্মশীল নরপতি। তথাপি কলিকাতার ইংরেজরা তাঁকে সেরকম প্রশংসা করেন না। আজ থেকে বহু বৎসর আগে কলকাতার সাহেবরা নবাবের দরবার থেকে একখানি পত্রাঘাত পান। তাতে বহু গুরুতর অভিযোগ ছিল। যেমন কি না, হুগলির সৈয়দ, আরমানি, মোগল ইত্যাদি বণিকগণ অভিযোগ করেছেন, ইংরেজরা তাদের লক্ষাধিক টাকার পণ্যদ্রব্য বোঝাই কতিপয় জাহাজ লুণ্ঠন করে নিয়েছে। অ্যান্টনি নামে এক মহাজন নবাবের জন্য বহু লক্ষ টাকার পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে একখানি মহার্ঘ উপঢৌকন এক জাহাজ নিয়ে আসছিল। সেটিও তারা কুক্ষিগত করেছে। পত্রে আরও লেখা হয় ইংরেজদের প্রতি, আমি তোমাদের বাণিজ্য করতে অধিকার দিয়েছি, দস্যুতা করতে নয়। এই রাজাদেশ পাওয়া মাত্র তোমরা যদি সহজে ক্ষতিপূরণ না করো তাহলে আমি বিশেষ দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করব।

এই খত পেয়ে কলিকাতার ইংরেজরা অনেক গোপন মন্ত্রণা করে প্রতিবাদ পত্র পাঠাল। নবাবী যাবতীয় অভিযোগ তারা খণ্ডন করলে। নবাব আর কালক্ষেপ না করে ইংরেজ বাণিজ্য বন্ধ করে দিলেন। ইংরাজরা দেখল ঘোর বিপদ। তখন তারা যেয়ে জগৎ শেঠকে ধরল। তাতে সিরাজের মহা আনন্দ উপস্থিত। ইংরেজ তাড়াবার এমন একটি সোনার সুযোগ পেয়ে সিরাজ মাতামহকে উৎসাহিত করতে লাগলেন। কিন্তু আড়কাঠি জগৎশেঠের করুণায় আনুমানিক বারো লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড দিয়ে ইংরেজ সে যাত্রা রক্ষে পেল।

সেই অর্থদণ্ডের খণ্ড হিসেবটি রামপ্রসাদ হালিসহরের সাবর্ণদের বাড়িতে একবার দেখেছিলেন। সেটি হল :

৩৫ থান মোহর ৫৭৭৲
নগদ টাকা ৫৫০০৲
মোমের বাতি ১১০০৲
ঘড়ি ৮৮০৲
২টি জোড়া আর্সি ৫৫০৲
২ খণ্ড শ্বেত প্রস্তর ২২০৲
একটি পিস্তল ১১০৲
১টি হীরার আংটি ১৪৩৬৲
আলিবর্দির বেগমের নজর বাবদ
২৬ থান মোহর ৪২৯৲
ফকির বিদায় ১৮৪৲
হুগলির সেখগণ ৭৫৬৲
হুগলির ফৌজদারের নজর ইত্যাদি ৭৭০৲

রাত্রির ঘোরতর অন্ধকারে রামপ্রসাদের মাথা ঘিরে নবাব মনসুরোল-মোলক্-সিরাজদ্দৌলা শাহকুলি খাঁ মিরজা মাহম্মদ হায়বৎজঙ্গ বাহাদুর এই দশ অধ্যায়ী শব্দ দ্রিমি দ্রিমি ঘুরে বেড়ায়।

বুড়ো শিব মন্দির ডাইনে রেখে তিনমূর্তি এগিয়ে চলে দ্রুতপদে। খানিক পরে বাঁ হাতি কিঞ্চিৎ গড়ানে পথে রামতনু নেমে যান, বাড়ির দিকে। এখন জোড়া আঁধার মূর্তি প্রসাদ ও ভজহরি।

পঞ্চবটির আওতায় কিছু শৃগাল চরছে। তারা প্রিয়সমাগম দেখে আনন্দে রব তোলে। আহা, কতকাল বুঝি শিবাভোগ বন্ধ ছিল। বটির ঝুলন্ত ঝুরি দু'হাতে সরাতে সরাতে দু'জনায় এসে থামে ভিটের উঠোনে। প্রসাদ কৌতুকে বলেন, আমি ডাকব না তুই?

ভজহরি মিটমিটে মুখে বলে, আমি। আমি।

ছেচল্লিশ

মাত্র এই ক'টি দিন ভিটেছাড়া গতিকে কী যে অদল বদলের নমুনা চোখের সামনে এই মধ্যরাতের আঁধারে। এই বাস্তুর সঙ্গে কাটান ছেঁড়ান সামান্য যে ক'টি দিনের তা যেন অগম বারিধি সম। এ কী ঘরকুনো বা ঘরো স্বভাবের নিদান! অথচ এই মানব জীবন তো চিরকেলে নয়। যে জীবন পথ চলতে আরম্ভ করেছে তা তো একদিন সমাপন দেখবেই। তবে কেন এত মায়া টান!

মনে মনে এমত কথার জবাব নিজের মনই দেয়। মন বলে, এরই নাম মানুষের সংসার। এমনকী পাখ-পাখাল আদি সব প্রাণীই এই মায়ার ঘেরে বাঁধা। এর হাত থেকে ছাড় পাবার জো কারও নেই। এই একই নিয়মে বিশ্বনিখিল বাঁধা। এই নিয়মেই সূর্য-চন্দ্র ওঠে এবং অস্ত যায়। আলো হয়, আঁধার গ্রাস রাখে। আকাশে গ্রহ তারকা ভাসে। আকাশ হতে উল্কা খসে। মানুষ জন্মায়। মরণ দেখে।

ভজহরি উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তার হেঁড়ো গলা তুলে হঠাৎ ডাক ছাড়ে, কই, বাড়ির লোকজন সব কোতায়। আমরা যে সেই কতক্ষণ দাঁইড়ে আছি।

এই হঠাৎ চিৎকারে এতক্ষণকার নিরাবয়ব রাত্রির গায়ে বুঝি চকিত ঘা পড়ে। সেই ঘা কিম্বা আঘাতের প্রহারে জুড়নো রাত্রি থর থর করে ওঠে। নিথর প্রাচীন পঞ্চবটির ডালে পত্রে ঘুমন্ত পাখিরা এই অতর্কিত তাড়নায় হতচকিত কিচমিচিয়ে ওঠে। তাদের ডানা ঝটপটিতে নিদারুণ বৃক্ষটি প্রকম্পিত হয়। কোথা থেকে এক ঝাঁক গভীর মেঘ এসে গাছেদের টঙে উপনীত হয়। হাওয়ার এক মুঠি ঝাপটা ওইখানে রচিত হওয়ার পাট রাখে। অপরাপর সাবেক গাছ থেকে গম্ভীর হুম হুম ভুতুম পেঁচারা সায় দেয়। ডালে ডালে ঊর্ধ্বপদী বাদুড় দল বার কয় লাট খায় শূন্যে। একজন একা কুবকুবো পাখি একালঘেঁড়ে ডেকে ওঠে। উঠোনের তুলসীমঞ্চে একলা বোষ্টম ছোট তুলসী গাছটি মুখ টিপে হাসে এই সব কাণ্ডাকাণ্ডের চমক দেখে।

ভজহরি দ্বিতীয়বার হাঁকে, কী গো, গেরস্তরা সব কানে বয়রা নাকি!

রামপ্রসাদও মুখ টিপে হাসেন। আর তখনই মেটে দাওয়ার মাঝের ঘরখানির বন্ধ দোর নড়ে ওঠে। খটাখট, নড়ানড় আওয়াজ। ভিতর থেকে ঘটাং ঘট্‌ খিল নামানো। আস্তে সুস্থে দুয়ার নড়ে।

প্রথমেই পিদিমের আলো। এইমাত্র সলিতা উস্‌কে দেওয়া হল। আর ওসকানো

দীপালোকের পশ্চাৎপটে নুড়ি ধুপগুড়ি এক ধামা পাকা-কাঁচা চুল ওথলানো গর্ভধারিণী সিদ্ধেশ্বরী। তাঁর হাতে ধরা আলো। প্রসাদ একটুখানি গলা তুলে বলে ওঠেন, আমরা এলুম গো মা।

সিদ্ধেশ্বরী বেপথু কাপড়চোপড় সাব্যস্ত করতে করতে দুয়ারের কানাচ ছেড়ে দাওয়ার ধারে এসে পড়েন। ঘুমচটা চোখে মুখে হতচকিত আনন্দ উল্লাস। ওমা কী কাণ্ড। ওমা কী কাণ্ড।

প্রসাদ এগিয়ে গিয়ে হেঁট হয়ে মায়ের পা ছোঁন। ভজহরিও।

সিদ্ধেশ্বরী প্রসাদের চিবুক ছুঁয়ে চুমো খান। ভজহরিরও। তারপর আহ্লাদ চলকানো স্বরে বলে ওঠেন, বাবারে, যেন কতকাল পরে তোর চাঁদ মুখখানি দেখলাম।

ভজহরি হাতের ঝোলা নামায় দাওয়ার উপর।—হুঁ হুঁ। এতখানি পথ গাঙ ভেঙে আসতে আসতে মুখের কী ছিরি হয়েছে মা।

সিদ্ধেশ্বরী গলা তুলে ডেকে ওঠেন, ওরে, তোরা ওঠ ওঠ। পেসাদ এয়েচে। আমার পেসাদ।

সেই ডাকা হাঁকায় বুনো শৃগালদল আবার হুক্কা ছাড়ে। আর অমনি পাশের ঘরের দোর খুলে যায়। সেই দুয়ারের চালচিত্রে অন্ধকারে হেলান দিয়ে সর্বাণী। পিঠময় এলো চুল, স্ফীত উদর আর ফোলা ফোলা ঘুম ভাঙা দু'চোখ। সে চোখে দাওয়ায় রাখা প্রদীপের উড়ু উড়ু আলোর ছটা। সর্বাণীর চোখে শান্ত প্রসন্নতা।

ভজহরি বলে, কী বৌঠান, বলি সব খপর পত্তর ভালো তো। ভা মাকে বলি, এত রেতে আর ভাত চড়িয়ে কাজ নেই। তার চেয়ে দিব্যু করে কাগজি নেবু টিপে এখোগুড় দিয়ে চাট্টি করে চিঁড়ে মাখো। ঘরে যদি কলা থাকে, থালে তো ফলার হয়ে যাবে। না থাকলে নেই নেই।

সর্বাণী বলে, বাগানের রামকানাই কলা আজই ভাঙা হয়েছে।

ভজহরি আনন্দে বলে, যেমন নাম তেমন কাম। সিঁদুরের পানা পাতলা খোসা আর মধু ছাঁচা ক্ষীর ক্ষীর সোয়াদ।

প্রসাদ কন, চল্, হাত মুখ ধুয়ে আসি।

সর্বাণী একটি গাড়ু এনে নামিয়ে রাখে। আর রাখে একজোড়া নতুন গামছা। এত রাতে আর পুষ্করিণীতে যেয়ে কাজ নেই।

প্রসাদ হাত মুখ ধুতে ধুতে প্রশ্ন করেন, মা গো, ঘরের ছেলে মেয়েরা সব ভালো আছে তো?

সব্বাই ভালো আছে। কেবল আমার বৌমার গতিকটি ভালো নয়। এ সোময়ে যা হয় আর কী।

প্রসাদ একবার আড়ে সর্বাণীর মুখ দেখেন। দেখেন আর চোখে মুখে জল থাবড়ান। ভজহরিও।

ভজহরি বলে, ভালো করে ডুবে গঙ্গা চান কল্লে শান্তি হত।

প্রসাদ হাসেন, কাল না হয় গুনে গুনে একশোআটটি ডুব দিস।

হাত মুখ ধুয়ে, তোলা কাপড় পরে, দু'জনাতে পাশাপাশি আসন পেড়ে বসা হয়। বড়

জামবাটিতে করে চিঁড়ে, আখের গুড়, কাগজি লেবু আর অনিন্দ্য দর্শন কলা গুটি কয়। সর্বাণী তালপাতার পাখা হাতে করে বাতাস করে। সিদ্ধেশ্বরী পিদিমের হাওয়া আগলে বসে থাকেন।

শান্ত রাত্রির বুকে দু'জন ক্ষুধার্ত মানুষের স্মিত হাপুস্ হুপুস্ চিড়িক্ চিড়িক্ দাগ রাখে। উঠোনের অন্ধকারে জোনাই ওড়ে। তার ওধারে ঘন নিবিড় বুনো আওতায় নিঝুম রাত থমকে রয়। ঝোপে ঝাড়ে হাওয়ার অস্থিরতা ঘোরে। সেই হাওয়ায় দাওয়ার প্রদীপটি কেবলই বক্র হয়ে যায়। মা জননী সিদ্ধেশ্বরী বলেন, বলি হ্যাঁ পেসাদ, রাজার অতিথ হয়ে গেলি। তা কিছু দিল থুলো না।

প্রসাদ খেতে খেতে মুখ তোলেন। হ্যাঁ মা, রাজা বহুত কিছু দিলেন। তবে কিনা তার নাম গুচ্ছের চিন্তা আর ভাবনা।

—রাজার কি চিন্তার ভাঁড়ার উবজে পড়েছে যে তোকে তার ঠেঙে দান কত্তে হল!

—হ্যাঁ মা, তাই খানিক বটে। তবে কিনা রাজা তাঁর চিন্তা তো সকলের সঙ্গে ভাগ জোত করে নিতে পারেন না। তাই বুঝি আমায় ভরসা কল্লেন।

—ভরসা না ভর কে জানে বাপু।

ভজহরি মাঝখান থেকে বলে ওঠে, রাজা ভারী কেপ্পন। নিদেনপক্ষে এক হাঁড়া সরপুরিয়া-সরভাজা তো দিতে পারতেন।

প্রসাদ অমনি বলে ওঠেন, ওরে মুখ্যু, আমরা যে রাজার যজ্ঞি শেষ হবার আগেই চলে এলাম। মাঝখানে এলে কিছু হয় নাকি।

ভজহরি তাকায় প্রসাদের দিকে, তোমার কতা আলাদা দাদা। এমন নিখাঁই মানুষ আমি জম্মে দেকিনি।

প্রসাদ বাইরের অন্ধকারে তাকান, কেন। নতুন দেশ দেখা হল। রাজার বাড়ি দেখা হল। আর রাজভোগ তো আছেই।

—পোড়াকপাল। ঘরবাড়ি দেখে কী হবে দাদা। তবে হ্যাঁ, খ্যাটনের ছব্বা, সে ভারী কম নয়। তবে দাদা, সত্যি কথা বলতে কি, এখন এই চিঁড়ের ফলার বুঝি অমর্ত্য, অমর্ত্য।

—ঠিক বলেছিস ভজা। মার ঘরের খাওয়া যেন কতকাল পরে খেলাম।

প্রসাদ লম্বা এক উদ্‌গার তোলেন। পাশে রাখা কাঁসার ঘটি মুখে উপুড় করে ঢকঢকিয়ে জল পান করেন।

হাত মুখ ধোয়ার পরেই ভজহরি ডাবা হুঁকোয় তামাক সেজে আনে। সেটি প্রসাদের হাতে তুলে দিয়ে সে দাওয়ার ও মাথায় গামছা বিছিয়ে শোয়ার উদ্‌যোগ করে। সিদ্ধেশ্বরী লম্বা লম্বা হাই তুলতে তুলতে বলেন, যা বাপ, একটু গড়িয়ে নে। রাত পোয়াতে বেশি দেরি নেইকো।

মা জননী ঘরে সেঁধোন। সর্বাণীও। প্রসাদ দাওয়ার মাঝখানে একা অন্ধকারে বসে তামাকু সেবা করেন। মা জননী পিদিমটি যাবার আগে নিবিয়ে দিয়ে যান।

প্রসাদ একা আঁধারে বসে বাইরের অথৈ রাত প্রত্যক্ষ করেন। ঘন গাছগাছালের আবছায়ায় এই রাত্রি যেন বা জ্বলছে। ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ হুতাশন। দাউ দাউ নয়, ধিকি ধিকি। বিছিয়ে রয়েছে আকাশ হতে অনন্ত মৃত্তিকা পাথার।

ওর্বপ্রা অমর্ত্যা নিবতো দেব্যুদ্বত।

জ্যোতিষা বাধতে তমঃ।।

অমরণধর্মা নিত্যা রাত্রি দেবী বিশ্বপ্রপঞ্চ ও প্রপঞ্চগত উচ্চ নীচ বৃক্ষলতাগুল্মাদি স্বীয় আত্মচৈতন্যে পরিব্যাপ্ত করলেন।

সা নো অদ্য যস্যা বয়ং নিতে যামন্নাবিক্ষ্মহি।

বৃক্ষেণ বসতিং বয়ঃ।।

নি গ্রামাসো অবিক্ষত নিপদ্বন্তো নিপক্ষিণঃ।

নি শ্যেনাসশ্চিদর্থিনঃ।।

সেই দেবী ভুবনেশ্বরী আমাদের প্রতি এই সময় প্রসন্না হোন। তাঁর প্রসাদে পক্ষিগণ যেমন বৃক্ষে নীড়াশ্রয়ে সুখে রাত্রিবাস করে, সেইরূপ আমরা আমাদের স্ব-স্বরূপে স্থিতি লাভ করতে পারব।

ওই কৃপাময়ী ভুবনেশ্বরী দেবীর করুণায় আপামর গ্রামবাসীগণ, গবাশ্বাদি পশু, পক্ষিগণ, কামার্থিগণ এবং শ্যেনাদিও সুখে শয়ন করে।

আহা, অনির্বচনীয় রাত্রির এই রূপ বিশ্বসংসারের যাবতীয় গূঢ়তার অতীত। সেই অবস্থানের ভিতর দিয়ে লেবু ফুলের তীব্র গন্ধ রোল তুলছে। বুনো অযুত ফুলের গর্ভকেশর সঞ্জাত সুগন্ধ মুখরিত হয়ে চলেছে অনবরত। বনভূমে শুকনো আর গড়ানে পাতার আনন্দ বাজছে। গাঢ় আকাশে এখনও সকাল জাগরণের আভাস আঁকা হয়নি। ভজহরি ও ধারে শোয়ামাত্র নাকবাদ্য ধরেছে। প্রসাদ তামাক টানতে টানতে মনে মনে মিটিমিটি ভাবছেন বেচারি সর্বাণী আর কতক্ষণই বা অপিক্ষে করবে।

দেখা হয় তক্তপোশের ধারে, বন্ধ দুয়ারের ওপারে, ক্ষীণ প্রদীপের আলোয়। আজ সর্বাণী আগে ভাগেই পান তোয়ের করে রেখেছে।

প্রসাদের কাছে এসে সর্বাণী বলে, হাঁ করো দিকি। প্রসাদ মিচকি হেঁসে হাঁ করেন। সর্বাণী দু'গাল এক হাতে টিপে ধরে সেই হাঁ মুখে এক জোড়া পানের খিলি গুঁজে দিয়ে বলে, তোমার বাঁ হাতখানি দেখি একবার। প্রসাদ চোখ তুলে হাসেন, কী ব্যাপার।

—ব্যাপাব ভারী গোলমেলে।

—বটে।

প্রসাদ কতক অসহায় মুখ নিয়ে বলেন, তাহলে সেটা তুমিই মেটাও সখী।

বাড়িয়ে দেওয়া বাম হাতখানি সর্বাণী তুলে নেয় নিজ হাতের ফাঁদে। তারপর প্রায় অতর্কিতে সামনে নুয়ে পড়ে হাতের কনিষ্ঠা বা কড়ে আঙুলটি কটাং আলগা কামড়ে দেয়। প্রসাদ মৃদু উঃ করে ওঠেন।

—কী হল। আঙুল কি দোষ কল্লে?

—আঙুলের দোষ আবার কী। সব দোষ গুণ তোমার।

—তার মানে!

—মানে! নিজের চেহারা তো নিজে দেখোনা।

প্রসাদ অবাক তাকান, সে আবার কী রকম!

রকম মোটেই ভালো নয়। এই ক'টি দিন রাজভোগ খেয়ে আর রাজার আওতায় বাস করে চেহারার যা জুলুস ধরেছে। এ যেন কোনও দেশের রাজপুত্তুরটি।

প্রসাদ হেসে ওঠেন দুলে দুলে। তারপর সামনে দাঁড়ানো সর্বাণীর কোমরে দু হাতে বেড় দিয়ে কাছে টেনে নেন। হেঁট হয়ে মুখ রাখেন ডালিম ফল দুই স্তনের মধ্যস্থানে। সেখানে নাক পেতে টেনে টেনে সুগভীর ঘ্রাণ নেন সর্বাণীর সুগন্ধী দেহের। এই গন্ধ নতুন নয়। তবে তার সঙ্গে আজ এসে হানা দিয়েছে কচি আর কাঁচা দুধের সুঘ্রাণ। মাতৃদুগ্ধের আগাম সমাচার। ঠিক যেন গাছটির ডালে নতুন পত্র উদ্‌গমের তোড়জোড়।

সর্বাণী হেঁট হয়ে প্রসাদের মাথাটি বুকের সঙ্গে এঁটে ধরে। মাথা বোঝাই কোঁকড়া চুলের গুছি এতোল বেতোল করে দেয়। পরিপাটি দাড়ি নিজের বুকে চেপে ধরে ঘর্ষণ তাপ নেয়। প্রসাদ উদগ্র ঠোঁট তুলে ধবেন সর্বাণীর দিকে। সেখানে তামাকুর উগ্র ঝাঁঝ খেলা করছে।

দুপুর থেকে আমি মনে মনে মহাব্যস্ত। আজ বিকেলেই পান্নালালের গান শুনতে যাবো নিতাইকাকার সঙ্গে রামপ্রসাদে। পান্নালাল, পান্নালাল। রেডিওয় ওঁর গান যখন হয় তখন বেশ লাগে। শুধু কালী সংগীত নয় আধুনিক, ভজন সবকিছু। এই সেদিন দু'টি আধুনিক গান শুনলাম। প্রথমটা হল 'তোমার মতো, আমিও যে কত সয়েছি।' তার পরেরটা হল, 'রূপালি চাঁদ যাদু জানে, সোনালি সাধ মনে আনে।' মুশকিলটা হল, এই আধুনিকের মধ্যেও কেমন করে যে মা কালীর ভিয়েন রস এসে গড়িয়ে পড়ে।

দুপুরের আগে হঠাৎ ওবাড়ি থেকে দুর্গাকাকা এসে উপস্থিত। রামপ্রসাদের ভিটের একেবারে গায়ে ওনাদের বাড়ি। প্রখর কালো আর স্কুল মাস্টার মানুষটির মুখশ্রীটি কী যে কোমল আর ঠান্ডা। দাদুর কাছে প্রায়ই আসেন। এলেই দাদুর ওঁর কাছে গান শোনা চাই। আমাদের বাড়ির বার বারান্দায় রাতের বেলা দুর্গাকাকা রামপ্রসাদী গাইছেন, মন তোমার এই ভ্রম গেল না, কালী কেমন তাই চেয়ে দেখলে না...। পাঁচিলের ওপারে ক্ষিতীশ দাদুর বাগানে সার সার নারকোল গাছ টলমল করছে। ঝাঁকড়া বোম্বাই আমগাছের বিশাল সাম্রাজ্যে ঘনঘোর পাতাপত্রের ফাঁকে ফোকরে ছিমছিমে জ্যোৎস্না জ্বলছে। ক্ষিতীশ দাদুর বাড়ি, মানে বঙ্কিমচন্দ্রের শ্বশুর বাড়ির দিকটা প্রকাণ্ড কালো। তারও গায়ে মরা মরা চাঁদ। দুর্গাকাকা গাইছেন, জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা, দিয়ে কত রত্ন সোনা...। কী চমৎকার চোখ বুঁজে দুলতে দুলতে তিনি গেয়ে চলেছেন। দাদু, মা—আমরা সবাই চুপটি করে শুনছি।

সেই দুর্গাকাকা সাক্ষাৎ পান্নালালের ছাত্র, শিষ্য, দাদুকে তাঁর গুরুর গান শোনাতে নেমন্তন্ন করতে এসেছেন। কিন্তু গেল রাত থেকে দাদুর হাঁপানির টান ওঠায় সেটি হবে না বলে দাদু বিস্তর দুঃখু করলেন।

দুঃখু করল বড়মাও। আহা, ছেলেটির কী মধুমাখা গলা। ওর নাম আমি দিলুম মধুলাল।

গৌর শিরোমণি ওধার থেকে নাকের রসকলি দুলিয়ে বলে, আমার বাপু কেষ্টই ভালো। কালীর গান শুনলে কেমন বুক ছম ছম করে।

দাদু শ্বাস নিতে নিতে চশমার আড়ে একবার শিরোমণির গুপ্তপ্রেসী বৃহৎ লাউ বুকের দিকে তাকান। গৌর ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসে।

বড়মা বলে, বলি হ্যাঁ দুগ্গা, এই পান্না ছেলেটির ভাই ভগ্নী ক'টি?

দুর্গাকাকা বলেন, বোনের খবর জানি না। তবে ওঁরা তিন ভাই। বড় ভাই প্রফুল্ল ভট্টাচার্য গান লেখেন। তারপরে হলেন গিয়ে গায়ক ধনঞ্জয়। আর ছোটজনা আমার মাস্টারমশাই।

—তা নিবাস কোথা?

—আসল বাড়ি তো বালিতে। তবে উনি কলকাতায় ভাড়া থাকেন। নেপাল ভট্টাচার্য ফার্স্ট লেন। ওখানেই আমি ক্লাস করতে যাই।

বড়মা চোখ কুঁচকে বলে, তা তুমি না আগে কেত্তন শিখতে?

—হ্যাঁ ঠাক্‌মা, কলকাতায় বিখ্যাত কীর্তনীয়া কুসুম গোস্বামীর কাছে। তবে একবার, আমাদের এই রামপ্রসাদে ওঁর বড়দা প্রফুল্ল বাবু রামপ্রসাদ পালা করিয়েছিলেন। ওঁয়ার নিজের যাত্রার দল ছিল তো।

বড়মা, সে যাই হোক, রেডিওতে ছেলেটি যখন গায়, চোখে জল এসে যায়। কী মধুর ভাব। মধু, মধু।

দাদু বলেন, মা মা, একটু চুপ করবে।

বড়মার মুখ তোলো হয়ে যায় অমনি। —আহা কী মা ডাকের ছিরি। হরিবল হরিবল।

দুর্গাকাকা মানুষটি ভারি গাপ্পিক। তিনি বলে চলেন, আমার মাস্টারমশাই মানুষটি বড় অভিমানী আবার রাগীও বটে।

দাদু বলেন, কী রকম?

—একবার কাঁচরাপাড়ায় ভারতী সঙ্ঘের ফাংশানে গাইতে এলেন। তা আমি আর গৌরীপদ দু'জনাতে গেলুম। আমাদের তো টিকিট নেই। গেটে ঢুকতে দেবে না। উঁকি দিয়ে দেখি মাস্টারমশাই গ্রিনরুমের বাইরে চেয়ারে বসে আছেন। ওখান থেকেই ব্যাপারটা লক্ষ করেছেন। অমনি সটান উঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন, আমার ছাত্র। ওদের ঢুকতে না দিলে আমি গান গাইব না। ব্যাস, অমনি হয়ে গেল। আমরা দু-ভাই মহা খাতিরে ভেতরে ঢুকে পড়লুম।

বড়মা আপন মনে বলে, আহা মধু মধু। ওর নাম মধুলাল।

বিকেলের একটু আগেই নিতাইকাকার সঙ্গে রামপ্রসাদের ভিটে বা রামপেসাদে পৌঁছে গেলাম। কাকা বলে, চল, একটু দুর্গাদার বাড়িতে যাই। ওখানে উনি রয়েছেন।

গেলাম। দেখি দুর্গাকাকাদের সন্ন্যাসী ঠাকুমা গুরুমা উঁচু মেটে দাওয়ার ঘরে গেরুয়া ধুতি কাছা দিয়ে পরা আর গায়ে ফতুয়া অবস্থায় গ্রন্থী দিচ্ছেন। উনি নিজে গলায় পৈতে পরেন। সঙ্গে মোটা মোটা রুদ্রাক্ষের মালা। কপালের মাঝখানে ধ্যাবড়ানো সিঁদুর। ভারী তেজি আমার বড়মার বয়েসি এই বৃদ্ধা। আমাদের দেখে বল্লেন, পেসাদ নিয়ে যা।

আমরা কাছে যেতে কৌটো খুলে দু-মুঠো গুড়ের বাতাসা হাতে তুলে দিলেন।

আমাকে বলে দিতে হল না উঁান পান্নালাল। 'বেতার জগৎ' পত্রিকায় ওঁর ছবি আমার মুখস্থ। দেখি চায়ের কাপ-ডিশ হাতে উঠোনে পায়চারি করছেন ভারী রোগা আর মাঝারি আড়ার মানুষটি। পবনে ধুতি, বেশ যত্ন করে পাট করে হাত গোটানো পুরো হাতা সাদা ফুলশার্ট। উল্টে আঁচড়ানো চুল আর অতীব টেরা চক্ষু। তা হলেও সেই চোখে কীরকম এক অচেনা উদাস আর সদাই আনমনা ভাব।

চায়ে চুমুক পায়চারি করতে করতে হঠাৎ গলা তুলে বলে উঠলেন, আচ্ছা দুর্গা, তোমাদের এখানে জার্মান পার্টি কীরকম আছে?

সবাই অবাক। আমরাও। এখানে—এই হালিসহরে জার্মান! মানে তো বিদেশি!

পান্নালাল এবার হাসলেন, আরে বুঝলে না। মানে তোমাদের এখানে কলোনি নেই?

দুর্গাকাকা হেসে বলেন, হ্যাঁ, তা আছে বৈকি কয়েকটা।

বিকেল ঠিক নয় সন্ধের আগে পঞ্চবটির সুমুখে একটি মামুলি তক্তপোশ পড়ল। তার ওপর ডোরাকাটা প্রসাদী কালীকীর্তন দলের বারোয়ারি শতরঞ্চি। সামনে একখানা লৌহ ডাণ্ডায় আড় করে খাটানো ঢ্যাবা মুখো মাইক। পঞ্চবটির জোড়া ডালে দু'টি চোঙা ইদিক উদিক। সামনে বসা আর দণ্ডায়মান মেরেকেটে জনা পঁচিশ-তিরিশ শ্রোতা। তার মধ্যে মহিলাই বেশি। আবার মহিলাগণের মধ্যে বিধবা অধিক। বিধবাদের মধ্যে বুড়িরাই প্রবল।

তক্তপোশে রাখা দুর্গাকাকার একপাট বেলোর হারমোনিয়াম, যার দু-চারটে দন্ত নড়বড়ে। পান্নালাল আসন পিঁড়ি হয়ে বসে হারমোনিয়াম টেনে নিলেন। সঙ্গে তবলচির উৎপাত নেই।

হারমোনিয়াম খুলে প্যাঁ পোঁ করতেই পড়ি পড়ি দন্তসম বসে পড়া রিড দু-চার প্রকার প্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ, পোঁওও জানান দিল। পান্নালাল ভুরু কুঁচকে এক দু-বার দেখলেন। তারপর যন্ত্রটার মাথার দু-ধারে দু-খানা কান কষে মলে দিয়ে তার চোয়াল ফাঁক করে টেনে তুলে ভেতরে নাক ডোবালেন। কী সব চড় থাপ্পড় হল। আচ্ছা করে চাপড় পড়ল। এবার পান্নালাল তাঁর টেরা আর সদাই ঢুলুঢুলু চক্ষুজোড়া আধখানা করে মুদলেন। এবং গলা ছাড়লেন। মাথার ওপর পঞ্চবটির ঝুরি দুলছে। গাছের কোটরে পিদিম জ্বলছে। সামনে হ্যাজাক। প্রথম গান, ওই শ্যামা বামা কে? তনু দলিতাঞ্জন, শরদ-সুধাকর-মণ্ডল বদনী রে—

গানটি শুনছি আর ভাবছি, কেমন যেন যুদ্ধু যুদ্ধু ব্যাপার। কুন্তল বিগলিত, শোণিত, শোভিত, তড়িত জড়িত নব ঘন ঝলকে॥ বিপরীত এ কী কাজ. লাজ ছেড়েছে দূরে, ওই রথ রথী গজ বাজি বয়ানে পুরে। মম দল প্রবল, সকল হত বল, চঞ্চল বিকল হৃদয় চমকে॥

সাতচল্লিশ

বড়মা ঘন দুধে খই ঢেলে দু'খানি কড়াপাকের সন্দেশ কপচিয়ে রাতের খাওয়া সারতে বসেছে। সামনে পেসাদ পাওনাদার ভাই মলয়। ছোট বোনের ও পাট এখনও হয়নি। আমার পরের বোন সেবার কপালে বড়মার উচ্ছিষ্ট জোটে না। কেন জানি রোগা খ্যাংরাকাঠি তার প্রতি বড়মার নেক নজরে ঘাটতি। তাঁর স্নেহের প্রায় সবটুকুই মলয়মুখী।

হয়তো বড়মার পিঠে হেলান দিয়েছে সেবা। তৎক্ষণাৎ তাঁর ঝেঁঝে ওঠা, সরে বোসো তো মা। এখানটি ভিন্ন কি আর জায়গা নেই! আর মেয়ের মাও বলিহারি। এদের আমার পেছুতে জুতে দিয়ে দিব্যি কাজ সারছে।

আবার মলয় গায়ে হেলান দিলে, কে বাবা, মলয়? আমার নাগে যে।

আসলে এ সংসারে বড়মার প্রিয় আমার ভাই। আর দাদুর পছন্দের প্রথমে আমি, দ্বিতীয় বোন সেবা। মাঝে মাঝেই মাকে বলেন, তোমার এই পুত্রকন্যা দু'টি আমায় সবচেয়ে জ্বালায়। কিন্তু কী আশ্চর্য, এরাই আমার বেশি প্রিয়।

বড়মা খই পাকলাতে পাকলাতে আমায় প্রশ্ন করে, তা বাবা, মধুলালের গান কেমন শুনলি শুনি।

আমি বলি, মধুলাল আবার কী। পান্নালাল তো।

—আমি ওর নাম মধুলাল দিয়েছি। অমন কণ্ঠ। তা ক'খানা গান গাইলে রে?

নিতাইকাকা দু'পা ছড়িয়ে পাখার বাঁট দিয়ে পিঠ চুলকোতে চুলকোতে বলে, অনেক। বিস্তর।

—আমার সাধ না মিটিল গাইলে?

—না না, ওটা তো রামপেসাদী নয়।

দাদু বারান্দা বরাবর কুয়োতলায় গা ধুতে যেতে যেতে আমার দিকে বলে যান, হ্যাঁ হে, বলি পান্নালালের গান ক'খানা তুললে?

আমি আনমনা বলি, মাত্র একখানা।

—কী গানটি?

—ওই যে, সেই গানটা, জগৎ জননী গো মা তারা—

—বাঃ। কাল সকালে কিন্তু শোনাতে হবে।

একটু পরে কুয়োতলায় ঝপাস ঝপাস বালতি উপুড়। সেই সঙ্গে লাইফবয় সাবান ডলা। রামশরণ কাকা বারান্দার ধারে কামিনী গাছতলায় বসে খৈনি ডলতে ডলতে বলে, বাবু, চার বালটি জল আছে। আউর লাগলে বলবেন।

দাদু সাবানের বুকে ছোবড়া রাখেন, আচ্ছা রামশরণ, তোমার ছেলেটির নাম যেন কী?

—জি রাজমোহন।

—বাঃ বাঃ। এই কথাটাই সেদিন ভাবছিলাম। তোমাদের মেড়োদের সক্কলকার নাম যেন তেন প্রকারেণ একটি রাম গুঁজে দিয়ে। যেমন রামকৃষ্ণ মিশনের সব সাধুদের নামের পেছুতে একটি করে আনন্দ। অমুকানন্দ, তমুকানন্দ।

শরণকাকা না বোঝা মুখে তাকায়, জি। জি।

দাদু মাথায় মগ উজোড় করতে করতে বলেন, হুঁ, রাজমোহনস্ ওয়াইফ। বঙ্কিমবাবুর ইংরিজি প্রথম ও একমাত্র নভেল। যদ্দুর মনে পড়ছে এটি INDIAN FIELD পত্রিকায় বেরিয়েছিল ১৮৬৪-তে। ১৮৩৮ এ জন্মে মাত্তর ছাব্বিশ বছর বয়সে লেখা। কাগজখানা এডিট করতেন কিশোরীচাঁদ মিত্তির। আমাদের ব্রজেন বাঁড়ুজ্যে মশাই এটি উদ্ধার করেন। অনেক পরে নভেলটি আবার ছাপা হল MODERN REVIEW কাগজে।

বড়মা খই দুধ খেতে খেতে বিষম খায়, খালি খালি অত ইংরিজি কপচাস কেন রে। আগ জন্মে কি তুই সায়েব ছিলি?

দাদু সে কথায় কান না দিয়ে আপনার মনেই বলে চলেন, ভাগ্যিস বঙ্কিমবাবু আর ইংরিজি নভেল লেখেননি। তা না হলে বাংলা ভাষার ধাত ছেড়ে যেত। উপন্যাস কাকে

বলে সেটা আজও সাব্যস্ত হত না। অবিশ্যি তিনজন বাঁড়ুজ্যের পরে বাংলা উপন্যাস তো ভাবনার বিষয়। কিন্তু হ্যাটস অফ টু বঙ্কিম। ওঁয়ার উঠোনখানা এক্কেবারে আলাদা।

শরণকাকা এবার মুখ পায়, জি আমাদের উঠোনের চেয়েও বড়া?

দাদু আউড়ে যান, One Chaitra afternoon the summer heat was gradually abating with weakening of the once keen rays of the sun...ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু ভাবো দিকি, '৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতে ছিলেন। দিনমণি অস্তাচলগমনোদ্যোগী দেখিয়া অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্বসঞ্চালন করিতে লাগিলেন।' বাপরে বাপ, ভাবো একবার তাঁর প্রথম বাংলা উপন্যাসের দাপট। বেরল তো ১৮৬৫-তে। লিখছিলেন ১৮৬২ থেকে ১৮৬৪।

বড়মা, ইংরিজি, সমস্কৃত সব একসঙ্গে ঝাড়চিস্ বাপ! নিঘ্ঘাৎ আজ আফিং বেশি হয়ে গেচে। গুরো, গুরো।

এই ফাঁকে আমি কথা পাড়ি, ওই যে, আমাদের ক্ষিতীশ দাদুদের বাড়িটা ওনার শ্বশুরবাড়ি। নীচে, একেবারে বাইরের দিকের একখানা ঘরে আর ভেতর দালানের আর একটা ঘরের মেঝেয় কীসের ছক কাটা আছে সিমেন্টের গায়ে।

দাদু গলা তোলেন, দাবা-পাশা খেলার ছক। ব্রেনি মানুষরা ওইসব খেলা খেলতে পছন্দ করেন। ওতে মস্তিষ্ক চালনা হয়।

—আচ্ছা দাদু, বঙ্কিমচন্দ্র কি সব সময় পাগড়ি পরে থাকতেন?

—ওটা তো তখনকার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদের পোশাক। ছবিপত্তর বেশিরভাগই ওই অবস্থায় তোলা। তবে বিনি পাগড়ির ছবিও আছে। আমি দেখেছি। মাথা বোঝাই কোঁকড়ানো চুলের কী বাহার। একটু পাশ করে আবার কখনও মাঝখানে সিঁথি কাটা।

বড়মা, আমি বিদ্যেসাগরকে দেখলুম। শুধু ওই মানুষটিকে দেখা হল না। তবে একখানা বায়স্কোপ দেখেছিলাম ওঁয়ার লেখা। কপালকুণ্ডলা।

দাদু, বাঃ, 'সেই অমাবস্যার ঘোরান্ধকার যামিনীতে দুই জনে ঊর্ধ্বশ্বাসে বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বন্যপথ নবকুমারের অপরিজ্ঞাত: কেবল সহচারিণী ষোড়শীকে লক্ষ্য করিয়া তদ্বর্ত্মসম্বর্ত্তী হওয়া ব্যতীত তাঁহার অন্য উপায় নাই। মনে মনে ভাবিলেন, 'এও কপালে ছিল।' নবকুমার জানিতেন না যে, বাঙ্গালি অবস্থার বশীভূত, অবস্থা বাঙ্গালির বশীভূত হয় না।'

বড়মা, হক কতার এক কতা বাবা। ঠিক এখনটি আমার যে অবস্থা। মানে তোর হাতে পড়ে।

—কেন মা! আমি তোমার কী পাকা ধানে মই দিয়েছি!

বড়মা গলায় ঘটি বরাবর ঢক ঢক জল উপুড় করে। তারপর একটি লম্বা ঢেঁকুর তুলে শুধু বলে গুরো, গুরো। এবার দু'টি খেয়ে আমায় উদ্ধার কর বাপ।

বাইরে থেকে চড়া ডাক আসে, রামশরণ, রামশরণ—

নড়ে বসি আমি। বাবা অফিস থেকে আজ বুঝি একটু তাড়াতাড়ি। শরণকাকা তড়াক লম্ফে উঠে গিয়ে দোর খোলে। সাইকেলের হ্যান্ডেল থেকে বাজারের থলি নামায়। বাবা

ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলে, ঠাক্‌মা, ঠাক্‌মা, কাল আমাদের বাড়ির টেলিফোনে ক্যানেকশন দেবে। নাম্বার হবে ভাটপাড়া ফাইভ।

আমি অবার বলে উঠি, কখন? কখন দেবে?

বাবা, রিং হলেই বুঝতে পারবে।

বড়মা, তার মানে যন্তরটা চালু হবে। ভালো কথা।

আমি মনে মনে চুপ করে যাই। আর মনে মনেই ঘোঁট পাকাই, মরণের পরে দেহ থেকে কীরকম এক সূক্ষ্ম বাষ্পীয় পদার্থ বেরিয়ে যায়। সেই পদার্থটির ছবিও তোলা হয়েছে ক্যামেরায়। এক ধরনের আলো আলো কুয়াশার মাঝখানে সেই শরীর ছাড়া শরীরটি ভেসে বেড়ায়। ঠিক যেন এক খণ্ড ছোট মেঘ।

কিন্তু সবই তো হল। দাদুর আলমারি বন্দি ওই বইখানা লুকিয়ে চুরিয়ে পড়ে যেটুকু বুঝেছি, তাতে করে মরণের পর আত্মার ছবি তোলা গিয়েছে। ওইরকম মেঘ ভাসা, কুয়াশা মোড়া আলো আলো অবয়ব। অনেকটা বাঁকাচোরা আয়নায় দেখা তেড়াবাঁকা মুখভঙ্গি। কিন্তু সেই আত্মার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলা যায় কি? তাঁদের কী সব আলাদা আলাদা ফোন নাম্বার, না একটাই নাম্বারে সকলে মিলে কথা কন!

বাবা আজ দিব্যি সুস্থির। বাইরে থেকে তৈরি হয়ে আসেনি। তার বদলে খাসির মাংস এনেছে। নিজে হাতে রাঁধবে। সে রান্নার ধক্‌ই আলাদা। সারা বাড়ি রান্নার গন্ধে থৈ থৈ করে। আর নিয়ম মোতাবেক আজ বাবার আহ্লাদপত্র বাড়িতেই সারা হবে।

বাবা হুঙ্কার দেয়, রামশরণ, ভালো করে পেঁয়াজ, রসুন, আদা আর শুকনো লঙ্কা বাট। কষে বাট।

মা রান্নাঘর থেকে নিচু গলায় বলে, এত রাতে! ছেলেমেয়েগুলো খাবে কখন।

—আরে বাবা এক-আধদিন একটু দেরি হলে কি পিত্তি পড়ে যাবে।

মলয় মিনমিনিয়ে বলে, কাল বাড়িতে ফোন আসবে তো। তাই আজ মাংস হবে।

সেবা অবাক হয়ে বলে, দূর বোকা, ফোন আসা আর মাংস আনা কি এক।

মলয়, কাল তো রোববারও নয় দিদি।

আমি উঠে যেতে যেতে বলি, ফোনবার।

প্রচণ্ড প্রতাপরাশি মৃত্যুরূপিণী,
ওই কামরিপু পদে এ কেমন কামিনী।
লঙ্ঘে গগন ধরণীধর সাগর,
ওই যুবতি চকিতে নয়ন পলকে।।
ভীম ভবার্ণব-তারণ হেতু,
ওই যুগল চরণ তব করিয়াছি সেতু,
কলয়তি কবি রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন,
কুরু কৃপালেশ জননী কালিকে।।
ওই শ্যামা বামা কে?
তনু দলিতাঞ্জন...

ভরা দুপুরে পঞ্চবটির ঊর্ধ্ব পটে মেঘান্ধ আকাশ। যে কোনও সময়ে বৃষ্টি আগমনি ভাবটি ধরা আছে ওইখানে। সেই সঙ্গে গুমসো গরম। হাওয়া বাতাসের খবর নেই। ভিটের আওতা ঘেরা জাঙাল পটে পাতা-পত্র অনড়। গঙ্গার দিকেও কি এমনই ধারা তত্ত্ব!

এই ছার দ্বিপ্রহরে রামপ্রসাদের কণ্ঠে অনেকদিন পরে বুঝি গান ও পান একই লপ্তে বিহার করছে। কিন্তু কী আশ্চর্য, এমনতর ছাঁদের গীত প্রসাদের হৃদিপটে আর কখনও খোদিত হয়নি। এই গীতের ভাবের সঙ্গে আজকের ওই আকাশের বুঝি কী আশ্চর্য কুটুম্বিতা। কেমন ধারা টান টান গুরুতর স্বভাব, ভাঁজে ভাঁজে লুকনো মণিরত্নের বিদ্যুৎ পুঞ্জ, মণ্ডলবদনী মেঘময়ী আর বুক চাপা প্রচণ্ড হুতাশনের গুমোর এই সময়ের কীরূপ যেন চাপা দোসর। এ গীতের প্রতিটি শব্দে বুঝি সমর তাণ্ডব আর শোণিত শোভার কল কল খল খল। তারও অতীত, গত রজনীতে গর্ভিনী সর্বাণীর আদর উত্তাপ, আর সত্যিই যেন তার পদতলে দমিত খোদ কামরিপু এই প্রসাদ। রণ না হয়েও পরাজয়ের আচ্ছাদন। সেই অবদমনের আশ্রয়তলে মূর্তিমান মহাকাল শয়ান, বিপরীতে বিগলিত কুন্তলা, চকিত নয়ন পলকে লাজ বিদারিণী যুবতি ওই সর্বাণী। আপাতত কাম প্রশমিতা কৃপাময়ী আস্ত আকাট মহাকালী।

তফাতে বসে ভজহরি ঝিমোচ্ছে। এইমাত্র ঘটে যাওয়া গানে তার কোনও ভাব বদল ঘটেনি। কেননা, প্রসাদী গীতের প্রতিবেশী সে প্রায় সদাই। জাগরণ কিংবা ঘুমের মতনই ব্যাপারটি তার ঠাঁয়ে সহজ আর সয়ে যাওয়া। কেবল এইটুকু তার সার জানা যে, পান করলে তার দা'ঠাকুরটি গানের জো পান। গঙ্গায় যেমন জোয়ার ঘটে, তেমনই ওই দ্রব্য ভর করলে তাঁর গানেও মাতন আসে। ফলে সে গাঁজা ভরসা করে ঝিমোয়। চোখ খুললে কভু কভু একটিকে বহু দেখে। কিন্তু একটি গান তো এক জোড়া হয় না।

প্রসাদ সামনে রাখা মেটে হাঁড়া থেকে চুমুকে চুমুকে আজ পান সমরে মেতে উঠেছেন, মাঝখানে ক'টি দিন বিরতির পর। ফলে আনন্দ এখন দেদার মাঠ। আর তৃষ্ণাও আমাপা। ভজহরিও শুকনো নেশার ঝোঁকে দিব্যি তোয়ের।

এমতো মেঘলা কালে বুনো পথে যে মূর্তিটি উদিত হয়, তার নাম অযোধ্যানাথ বা আজু গোঁসাই। নাসাগ্রে রসকলি। মুখে মিটি মিটি হাসি। বাঁ হাতে একখানি তালপাতার ছাতা।

গোঁসাই প্রসাদী তুরীয় অবস্থা মিটমিটে মুখে অবলোকন করেন। রামপ্রসাদ তাঁকে দেখে মহাউল্লাসে বলে ওঠেন, আরে আরে কী সাড়ে সব্বোনাশ! তাই তো বলি, আমার একই মাতৃ পেটের ভাইটির এখনও দর্শন নেই কেন।

আজু মুখ বেঁকান, আমার ভারী বয়ে গিয়েছে তোমার সোদর হতে। কালীর বেটাদিগের সঙ্গে আমার কোনও সম্পক্ক নেই।

ভজহরি ঝিমুনি ঠেলে আড় মারে, থালে এলে কেন বল দিকি?

আজু হাসতে হাসতেই কন, আরে বাপু কেন আসি তা তুই বুঝবি কেমনে। এখেনে এলে মামলাটি ভালো জমে যে।

—কীসের আবার মামলা!

—বেঁচে থাকার মামলা বাপু। বললাম তো, তুই বুঝবিনে। গাঁজা টেনে টেনে তোর মাথার শিরা শুকিয়ে গিয়েছে।

প্রসাদ মাঝে পড়ে বলে ওঠেন, ওরে মুখ্যু ভজা, সত্যিই এ তত্ত্ব তুই বুঝবিনে।

ভজহরি মুখ ঝামটায়, তত্ত্ব না কাঁটালের আমসত্ত্ব।

প্রসাদ চোখ কুঞ্চিত করেন, বাঃ, বড় ভালো বল্লি রে ভজা। এটি তোর ঠেঙে নিলুম। কোন গানে কখন যে সেঁধিয়ে যাবে।

আজু হাঁ হাঁ করে ওঠেন, না না, ওটি হওয়ার নয়। ও আমি আগেই নিয়ে বসে আছি।

প্রসাদ, কীরকম?

—কী আবার রকম। তোমার রচা কালীকেত্তনে একটি ছব্বা আছে। তাব নাম 'মায়ের গোষ্ঠগমন'। তা সে কথা তোমার কি এখন স্মরণে আছে প্রসাদ। যা নেশার ঢেলখেল। স্মৃতির আর দোষ কী।

প্রসাদ কতক ফাঁকা চোখে তাকান, তা হবে ভাই।

—কোনটি তা হবে, গোষ্ঠ না স্মৃতি নষ্ট।

ভজহরি এক হাত তুলে বলে, তোমার কি একটিই কম্ম। দিবারাত আমার দাদার পেছুতে কাটি দেওয়া।

প্রসাদ ভজহরিব দিকে তাকান, ওরে ভজা মুখ্যু, তোর ঘটে কী আছে বল দিকি। বোষ্টম না রইলে শক্তিরূপিণী যে একলাটি হয়ে পড়বেন। একা একা কি সাধন সমর জমে।

—ও সব কচকচানিতে আমি নেই দাদা। তবে কেউ এমনি এমনি কাটি দিলে আমার বেম্মাণ্ড গরম হয়ে যায়।

—ব্রম্মাণ্ড। ব্রম্মাণ্ড। ভারী খাস কথা কইলি ভজা।

ভজহরি অসহায় মুখে বলে, এ তো ভারি ঝকমারি। আমার দা'ঠাকুরটির আজ হল কী। এত ভালো ভালো কথা কচ্ছেন আমায় নিয়ে! অযোধ্যা ফুট দেন, কারণের মাত্রা ছাড়িয়েছে ভজহরি।

প্রসাদ দু'টি হাত সামনে মেলে দিয়ে বলেন, তা, না বল্লে কি বসতে আজ্ঞা হবে না।

অযোধ্যানাথ খানিক তফাত রেখে উত্তরীয় ঘুরিয়ে একটি স্থানের কাল্পনিক ধুলো ঝাড়েন। তারপর বসে পড়ে বলেন, আকাশে ভয়ঙ্কর মেঘ উঠেছে। কী জানি কী হয়।

প্রসাদ সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন, ঠিক কথাটি বলে দিয়েছ আজু। এখনকার আকাশ, আমার মন, আর গোটা দেশকাল সবই একাকার। মনটা ভালো বলছে না মোটে।

অযোধ্যা চক্ষু কপালে তোলেন, এখনও রাজভোগের উদগার উঠছে। তারই মাঝখানে মন খারাপের তত্ত্ব।

প্রসাদ, রাজার ভোগ, আমাদের দেশের রাজা-বাদশার এখন ভারি ভোগান্তি। কখন কী যে হয় তা কে বলতে পারে।

অযোধ্যানাথ, থালে শোনো বলি। তুমি রাজার খাস ঠাঁয়ে যেয়ে বিস্তর খপর পত্তর আনলে। আর আমি দেশ গাঁয়ে বসত করেও অমনি অমনি কিছু সমাচার প্রাপ্ত হলুম।

—একটুখানি বলো দিকি।

—বলি। আসলে মুরসিদাবাদেই যত গোল। বুড়ো নবাব আর গুঁড়ো নবাব। তবে শেষেরটি এখনও হবু। মানে হবো হবো করছেন।

—আর?

—আর সেই নিয়েই বিস্তর জলঘোলা।

—তা তুমি এতখানি তফাতে বসে এ সব তত্ত্ব কেমন করে জানলে?

—জলপথে।

—জলপথে। মানে!

—মানে সিধে। রাজধানী মুরশিদাবাদেও যে মা গঙ্গা এখেনেও তিনি। তাঁর বুক বয়ে সব খবরই প্রবাহিত হয় ভায়া। মা কখনও মিছে কতা কন না। যা দেখেন তাই বইয়ে দেন।

—বেশ বল্লে। ঠারে আড়ে খাসা বল্লে তো।

আজু হাসেন মিচকি মিচকি, তোমার কুসঙ্গ করে একটু আধটু আড় বুঝি পেসাদ। তা এক্ষেত্রে আমার আড়কাঠি অর্থাৎ খপরের সূত্র হল নদী পথে বয়ে আসা নাওয়ের মাঝি-মাল্লারা। তাদের মুখেই দেশ-বিদেশের তাবৎ খপর পাই। তারাই তাবৎ সু আর কু-সমাচার রটনা করে।

—যথার্থ কথা। খবর তোয়ের করেন রাজা-রাজড়ারা। আর তা পরিবেশন করে পঞ্চজনা সাধারণ মানুষ। তাই দিয়েই দেশ চলে। দেশের মঙ্গলামঙ্গল নির্মিত হয়।

—কিন্তু পুঁথি-পাতড়ায় রাজাদের কিচ্ছেই লেখা হয়। তাঁদের কথাগুলোই বেঁচে থাকে। হাভাতেদের নাম ধাম কেউ টেরও পায় না।

রামপ্রসাদ এই উক্তিটির দ্বারে এসে খানিক থমকে যান। পান পাত্র তুলে নিয়ে ঢকঢকিয়ে গলে ঢেলে নেন আসব। তার চকিত ঝাঁঝে এ বুনো ভূমির লতা-গুল্মের বিচিত্র মিশেলি উত্তেজক আর স্নিগ্ধ শিথিল গন্ধগুলো কিঞ্চিৎ নড়ে যায়। সে নড়ন কবির মস্তিষ্ক কোটরে গিয়েও হানা দেয়। প্রসাদ কন, ভারী হক কথা বললে আজু। আসলে তুমি তো রাজা নও। আর পাঁচটি হাভাতের সমগোত্রী। ফলে তোমার উপলব্ধি তো আপামরের সঙ্গে মিলে যাবে।

অযোধ্যা এবার নিবিষ্ট স্বরে বলেন, তাই কি?

—হ্যাঁ তাই। এ আঁকে কোনও ভ্রম নেই। একজন রাজা যাদের জন্যে রাজা তারা চিরকালই পাছ দুয়ারে পড়ে রয়। সংসার তাদের তত্ত্ব করে না। কিন্তু তারা যদি না রইত দেশ বলে কিছু থাকত না। রাজা-রাজড়ার হদিশ রইত না। তবু কালের অনিয়মে এই মহামহিম মানুষদিগের কথাই সংসার লিখে রাখে। ইতিহাসের মহাফেজখানায় তাদের কীর্তি লেখার জন্য সোনার জল মজুত থাকে।

অযোধ্যা বলেন, যাক, থালে একটা বিষয়ে অন্তত তোমার সঙ্গে আমার মিলমিলন্তি হল। তবে কি না তুমি কবি। সমাজের প্রচলিত ধারণায় তুমি কেবল হাতে লীলাকলম ধারণ করে কাব্য রচনা করে যাবে। চারধারে কী ঘটছে তা নিয়ে তোমার শিরঃপীড়ার দরকার নেই।

প্রসাদ, কবি বলেই আমার অন্তর্দাহ অধিক। বোধহয় কখনও কখনও রাজার চেয়েও বেশি। আর সে কারণেই আমি দূর থেকে যেন কী এক মহা শঙ্কার নাদ শুনতে পাচ্ছি।

—হুঁ, সেটা আমিও খানিক নমুনা হিসেবে পেলুম বৈকি।

—নমুনা!

—হ্যাঁ ভায়া নমুনা। আমি ওই বনের আড়ে দাঁড়িয়ে তোমার এইমাত্র ঘটে যাওয়া গানখানি শুনছিলাম। বিপরীত এ কী কাজ, লাজ ছেড়েছে দূরে।

ভজহরি পাশ থেকে নাক বাড়ায়, বাপরে, একেবারে মুকস্ত হয়ে গিয়েছে।

প্রসাদ, আমি কিছু জানিনে বুঝিনে, এ কথা তোমায় বোঝাই কেমনে! কবি তো কখনওই জানে না তার কলমে কোন ফুলটি কখন ফুটবে। সে শুধু একটি আঁক দেয় মাত্র। তারপর তার আর কিছু কর্বার থাকে না। সে তখন এক ত্রিগুণাতীত মহামায়ার দাস। জগৎ সংসারের যাবতীয়তা জড়িয়ে মড়িয়ে সেই মায়া প্রপঞ্চময়ী। তার দাসানুদাস তো কবি। সে আর কিছু করতে পারে না।

অযোধ্যা, কিন্তু তোমার এই নতুন ধারার গান শুনে আমার মনটা ভালো বলছে না। কোথায় যেন দুর্যোগের আভাস পাচ্ছি।

অমনি আকাশ মোচড়ায়। এতক্ষণকার থর বাঁধা মেঘে চিড় ধরে। আকাশ মুচড়িয়ে ধারা নেমে আসে অযুত মুখে। কড়াত কড়াত বিদ্যুৎ হাঁকড়ায়। অদূরে কোথায় বাজ পড়ে গুরুতর গর্জন বিভঙ্গে। অযোধ্যা কোনওমতে তালপাতি ছাতাটি মেলে ধরেন মাথার উপর।

ভজহরি চিৎকার করে ওঠে, দা'ঠাকুর। ঘরে চলো। বজ্জপাত হচ্ছে।

রামপ্রসাদ পান উন্মত্ত স্বরে গলা তুলে হেসে ওঠেন হা হা, হা হা...। সে হাস্যে বজ্রপতনের প্রতিযোগী আবহ। মুহূর্মুহু বাজ কড়কায়। বিদ্যুৎ ঝলসায় এই বুনো জাঙালি রহস্যতাড়িত পরিস্থিতি জুড়ে। বড় বড় গাছেরা উন্মত্ত মাথা নেড়ে সায় দিতে থাকে এই ঘোরা প্রকৃতির উল্লাসে,

রামপ্রসাদ পান উন্মাদনায় দাঁড়িয়ে ওঠেন। দু'হাত সামনে মেলে দেন সটান। তারপর প্রকৃতির এই অনিবর্চনীয় সুরালাপ আর তাল রচনার পাশাপাশি নিজের দেদার কণ্ঠ ছেড়ে দেন। বৃষ্টি ধারায় গীত হয় রাগিণী ঝিঁঝিটে। আকাশ জোড়া মেঘগর্জন তাল বাজে আড়া চৌতালে।

বিপরীত এ কি কাজ, লাজ ছেড়েছে দূরে,
ওই রথ রথী গজ বাজী বয়ানে পুরে।
মম দল প্রবল, সকল হত বল,
চঞ্চল বিকল হৃদয় চমকে।।
ওই শ্যামা বামা কে...

আটচল্লিশ

মাঝখানে এক জোড়া মাস এবং আরও ক'টি দিন পার হয়েছে। প্রসাদের দিন পারণ যথাপূর্বং বেহিসেবি, বে আক্কেলে। দিন রাত্রি অনর্গল অবিরল বিশ্বজননীর আঁচল ধরা আর সেই একই রীতিতে একে একে কাব্য-গীতের সৃজন প্রবাহ। আদপে এ সবই সেই জননী প্রকৃতিরই রচনা।

যেমন করে আকাশে আলো হয়, আঁধার উপগত হয়, ফুল ফোটে, পাখি ডাকে, সেই বিনি আঁক কষা আর বিনা ছকের অতীত এই সব কবিতা ও গীত-এর উৎপত্তি। এ পর্যন্ত এসে অবশ্যই থমকে যেতে হয়। তারপর আর কোনও জবাব ঘটে না—তিলমাত্র। এই

ফুল পাখির বিরচন নিয়মের সঙ্গে কবিতার উৎপত্তিরও কোনও তত্ত্ব হয় না। এ বিষয়টি মানুষের শ্বাস প্রশ্বাস টান রপটানির মতোই এক অভিরাম নিয়মের সুতোয় গাঁথা। এ মালা গাঁথার কোনও খেরোর খাতা হয় না। জমা-খরচের কোনও খতিয়ান লেখা থাকে না। জীব জগতের জন্ম-মৃত্যুর মতোনই এই সৃষ্টি লীলা। এর নেপথ্যে নিশ্চয়ই কোনও উন্মাদের যুক্তি বিন্যাস নেই। যা আছে তার যথার্থ যুক্তি এখনও খাড়া করা যায়নি। কে জানে. সেটি জানা গেলে, তার রহস্য ফাঁস হলে সংসারে বুঝি আর কবিতার কোনও প্রয়োজন রইবে না।

এইপ্রকার বেনিয়মেই আজ দ্বিপ্রহরের পর থেকে সর্বাণীর পূর্ণ জঠরে সামান্য সামান্য চাগাড় পড়েছে। গর্ভ যাতনার বাস্তু পত্তন হয়েছে। মা জননী তাকে নিয়ে ঘরের তফাতে গোয়াল ঘরে ঠাঁই নিয়েছে। দু'টি পোষ্য গাভির থেকে কিছু ফাবাকে তার জন্যে খড় বিচালির ওপর কাপড় বিছিয়ে খালাস শয্যা রচনা করা হয়েছে। এ যেন কবিতা রচনার উপকরণ--দৎ-খাগের কলম আর তালপত্র ও তুলট কাগজ। তবে কি না প্রসাদের গীত-কাব্য যা হয় তার বেশিরভাগই মুখে মুখে। কখনও সখনও কাগজ-কলম হয়। প্রসাদ যদি কলমধারী হন তাহলে সর্বাণী তাল কিংবা তুলট পাত!

এ পর্যন্ত এসে প্রসাদ গা ঝাড়া দেন। নিজের মাথার ভেতরকার অযথা জটিলতা নিয়ে নিজেই মাথা ঝাঁকুনি দেন। মাথার অন্দরেই তো এক আশ্চর্য ভুবনের জাল পাতা। কোন পথে, কোন মুখে যে চিন্তার ছটা ঠিকরে ওঠে, তা নিজেও জানতে পারা যায় না। আর সেই না জানা যাতনার উৎসমুখটি এই অলখ উধাও স্বভাবী হওয়ার কারণে অস্বস্তির কোনও নিবৃত্তি হয় না।

এমত অবস্থার দাস আপাতত সেনজ রামপ্রসাদ ভিটের তফাতে যথারীতি গাছতলে। তবে একাকী নয়। ভজহরি সেখানে বহাল। আরও হাজির রামতনু গঙ্গোপাধ্যায়। তনু আজ বাদ্যযন্ত্র বিনিই এখানে মজুত। আর এসেছেন কৃষ্ণনগরী গোমস্তা সুখময় বন্দ্যো। সুখময় রাজার এই দখিন রাজ্য এলাকার দেখভালকারী। কুমারহট্টের বারেন্দ্রগলির বাসিন্দে এই প্রৌঢ় গোমস্তা। তাঁর পোশাক আশাকে নবাবিয়ানার পারিপাট্য সদাই বহাল। চাপকান, চাপা পায়জামা আর গলে জরিদার উত্তরীয়। বিশেষ রাজ কাজে রইলে মাথায় পাগড়িটি পরেন। তাঁকে এলাকার মানুষজন খাতির তোয়াজ করে।

আপাতত সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত এসেছে। ভিটের তফাতে এই বুনো ঝুপসি আঁধার তলে প্রাচীন অশ্বত্থের কোটরে একটি নারকেল মালার ভেতরে রাখা মেটে পিদিমটি জ্বলছে। তার ঘোর ঘোর অপ্রতুল আলোর আওতায় এই চারজনা কেমন যেন ছমছম করছে। মনুষ্যমূর্তি কতক অশরীরি নৈর্ব্যক্তিকতায় ঠাঁই নিয়েছে। কারওর মুখেই এতক্ষণ খুচরো কথা ছাড়া আর কিছু ছিল না। কেন না সকলেই প্রসাদের গৃহিণীর আসন্ন অবস্থার খপর জানে। তবু ভজহরি, সে বেশিক্ষণ চুপ করে রইতে পাবে না, সেই কথা বলছে।

—তা রামতনু দাদা, তোমার কি রাজার ঢেঁকুর এখনও উঠছে?

রামতনু ভ্রূ কুঞ্চিতে বলেন. এ কথার অর্থ কী?

—মানে হল গিয়ে, এত সব ভালো মন্দ নাগাড়ে খাওয়া হল কিনা। রাজার অন্ন বলে কথা।

—তোর পানা হাঘরে এমন সব কথা কইবে। কার আর দায় পড়েছে ঢেঁকুর তুলতে।

সুখময় এবার মুখ খোলেন, রাজার ঠাঁয়ে এবার থেকে এই দু'জনাকে দাঁড় করিয়ে দিলে নতুন একটি ব্যাপার ঘটবে।

প্রসাদ শুধু প্রশ্নসূচক চোখে তাকান।

সুখময় মৃদু্য হাস্যে কন, প্রসাদ আর আজ্‌ গোঁসাইয়ের গীত যুদ্ধ রাজা ঢের শুনেছেন। এবার একটু এই জোড়ার কথকতার আয়োজন করতে হবে।

ভজহরি হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। তারপর বলে, যাই, একবার ওদিককার খপর নিয়ে আসি।

প্রসাদ আলো আঁধারেই সায় রাখেন ভজহরির কথায়। আর তখনই প্রায় চোখের পলকে ভজহরির গোলগাল ছায়ামূর্তিটি বুনো ঝুপসির আঁধারে হারিয়ে যায়। তখনই বুনো শৃগালের পাল দল বাঁধা স্বরে হুক্কা দিয়ে ওঠে। তাদের এই পরিচিত হাঁকে রাত্রির ঘড়ি ঘণ্টা বাঁধা পড়ে। সময়ের পল পলান্তরের হিসাব কষা খাতায় আর একটি ইলেক পড়ে।

সুখময়-রামতনু একবার মুখ তাকাতাকি সেরে নেন। আর এই ফাঁকে চারিধার মোড়া অন্ধকার চরাচর আপাদমস্তক জরিপ করে সদাই রাজা-রাজড়ার জমা-খরচের হিসাবদারী এই সুখময় বন্দ্যোকে। এই প্রৌঢ়ের মগজ সদাই কলবলাচ্ছে 'খলিসা জমি' বা খাসমহল আর জায়গির এলাকার তত্ত্ব তালাশে। বন্দ্যোর মাথার উপর দিয়ে সেকালের সম্রাট আওরঙ্গজেবের খেদ উক্তি 'ইয়েক আনার সদ্ বিমার', একটি বেদানা আর একশত অসুস্থ লোক পাক মারে। ঘুরপাক দেয় এই অবস্থার নেপথ্যে জায়গিরদার, মনসবদারের দ্বন্দ্ব পীড়িত অব্যবস্থার শিকার এই দেশকাল। সেখানে এসে নবাব মুরশিদকুলি কেমন করে বিচক্ষণতার হাল ধরলেন। আগেকার ৩৪টি সরকারের বদল ঘটিয়ে মাত্র ১৩টি প্রশাসনে গোটা মহালকে কষে বাঁধলেন।

এই ভিটে অদূরের জটিল বাতাস জানে এই নবাবটি ভারী বিচক্ষণ। তিনি কী অদ্ভুত ক্ষমতায় জায়গিরদারগণকে বেঁধে ফেলে তাদের এলাকাভুক্ত জমি সকল সিধে সরকারি আওতায় এনে তাকে চাকলায় বেঁধে ফেললেন। রাজস্ব আদায় আর প্রশাসনিক দায় দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন চাকলাদারদের হস্তে। আর এই রাজস্ব যথাযথভাবে আদায় হচ্ছে কি না, তা দেখতে গোটা এলাকাকে ২৫টি রাজস্ব বিভাগে ভাগ করে তার বর্ণন দিলেন 'ইহিতিমাম'।

এই বুনো দিগরের গাছগাছালের প্রাচীন পাতা-পত্র যাচাই করছে এ নবাবের অতীব বিচক্ষণতা। তার নমুনায় তাবৎ ছড়ানো ছেটানো খলিসা জমির রাজস্ব যথার্থভাবে আদায় হচ্ছে কি না, তা নজরদারির জন্য কী আশ্চর্য বিষয় বুদ্ধিমত্তা অপর এক প্রথা 'হস্তবুদ'। জমিদারি রাজস্ব আদায় আর তা বাদ দিয়ে রাষ্ট্রের খাতায় কতখানি জমা হয় সেই দেখভাল।

আঁধার আর সামান্য দীপালোকিত বাতাসের তাড়নার মাঝখান দিয়ে এই নিঝুম প্রকৃতি রাজার অনুগত সুখময় বন্দ্যোর কর্মক্রিয়ার মাপজোক যেমন সারে, তেমনই এই প্রসাদের সংসারে নবীন এক প্রাণ আগমন ঘটার প্রতীক্ষা করে। কী জানি, ভজহরি কী খপর আনবে।

সেই ফাঁকে বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ খোলেন, শোনো প্রসাদ, তোমার জন্যে একটি খপর আছে।

প্রসাদ নির্লিপ্ত তাকান। সেই দৃষ্টিপাতে রাত্রির নৈঃশব্দ্য ছাড়া আর কোনও কথা লেখা হয় না।

সুখময় কন, মহারাজ দিন কয়েক আগে কলকেতায় গিয়েছেন বিশেষ বিষয় কার্যে। যাওয়ার সময় আমায় সংবাদ পাঠিয়েছেন, কৃষ্ণনগর ফেরার পথে এখানে ক'দিন খানিক জিরিয়ে যাবেন। তাই আমি এখানকার বিশ্রাম নিবাসটি পয় পরিষ্কার করিয়ে রেখেছি।

প্রসাদ শুধু বলেন, বটে।

—হ্যাঁ, রাজা আরও বলেছেন এবার তাঁর দালানে তোমার আর আজু গোঁসাইয়ের গাওনা হবে। তোমরা যেন তোয়ের থেকো।

প্রসাদ ভ্রূ কুঞ্চিত করেন। মনে মনে বুদবুদ ওঠে, দেশের এই দোদুল অবস্থায় কি না রাজা গাওনা শুনবেন। তাহলে কি তিনি এখন থেকেই ভাবী অবস্থার মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত!

রামতনু মহা উৎসাহে বলে ওঠেন, তা, রাজা এখেনে উপনীত হবেন কবে নাগাদ?

সুখময় বলেন, হয় কাল নয় পরশু।

—বাঃ বাঃ। তাহলে আমি কাল সকালেই আমার ঢোলকখানা রোদে দেবো। তারপর টুকটাক গাব লাগানো, বাঁধন ছাঁদন এ সব তো আছেই।

প্রসাদ প্রশ্ন করেন, ওধারে মুরসিদাবাদের খপর কী?

সুখময় গম্ভীর জবাব দেন, নবাবের অবস্থা এখন তখন। শুনছি যে কোনও সময়েই দুঃসংবাদটি আসতে পারে।

প্রসাদ আপন মনে উচ্চারণ করেন, মুরসিদাবাদ বললে প্রথমে মনে হয় নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ। আচ্ছা সেই কোন দাক্ষিণাত্য নিবাসী এক সুদরিদ্র বামুনের সন্তান। প্রথম নামটি জানা যায় না। তারপর ইসপাহানি বণিকের কেনা সামগ্রী হয়ে নাম হল মহম্মদ হাদী। অতঃপর নিজের খ্যামতায় কারতলব খাঁ। আর শেষমেষ এই মুর্শিদকুলি। রাজধানীটির নাম মুখ্‌সুদাবাদ বদলে নিজ নামে মুর্শিদাবাদ।

আলো আঁধারি ছায়া পথে ভজহরির মূর্তি ঠেলে ওঠে বনবাদাড় সরিয়ে। তার চোখে মুখে কিঞ্চিৎ ব্যস্ততা আর উদ্বেগ।

—দা ঠাকুর, দা ঠাকুর, দাক্ষায়ণী দাই এয়েছে এইমাত্তর। প্রসাদ নিরুদ্বেগে বলেন, কী বললে দ্রাক্ষায়ণী?

—বললে সবে জল ভাঙতে নেগেছে। এখনও তেমন বেগ ধরেনি।

রামতনু কুপিত স্বরে কন, কথার কোনও মাথামুণ্ডু নেই। সবৎ জানে না।

ভজহরি ঝেঁঝে ওঠে, বেশ কথা। থালে তুমিই যাও না দাদা। আঁতুর ঘরের কানাচে বসে রও। আর খবর পত্তর নিয়ে এসো।

প্রসাদ বলে ওঠেন, না না, অত ঘড়ি ঘড়ি খপর করার কী আছে। হলে আপনিই আসবে।

ভজহরি গম্ভীর মুখে শুধু বলে। তোমার মতো আজব মানুষ আমি দু'টি দেখিনি!

বন্দ্যো এবার ভিন পথে কথা বাগান, সে না হয় হল। কিন্তু মহারাজ যে এসে পড়লেন বলে। হয় কাল, নয় পরশু।

প্রসাদ তাকান, তা আসবার সময়টি কখন আন্দাজ করা যায়?

—তা তোমার গিয়ে, সকাল বেলার দিকেই হবে। রাজা সাধারণত দূরে গেলে রাতেই ভ্রমণ করা পছন্দ করেন। বিশেষ করে জলপথে।

রামতনু কথা পাড়েন, থালে আজু গোঁসাইকে তো সংবাদ দিতে হবে। আমি বাপু কাল সকাল সকাল যেয়ে বলে আসব।

ঠিক এই সময়েই ভিটের বুনো পথে চপল পায়ের শব্দ ওঠে। সে শব্দে বুনো পাখিরা কলকলিয়ে সাড়া রাখে। ডোবার ধার হতে ব্যাঙেরা কটকটিয়ে ওঠে। ঝিঁঝির ঘূর্ণী আরও খরতর হয়। বুনো পথে এসে দাঁড়ায় প্রসাদের দুই সন্তান পরমেশ্বরী আর রামদুলাল। প্রসাদ ভজহরির পানে তাকিয়ে বলেন। এবার বুঝি খপর হল রে ভজা।

পরমেশ্বরী কলকলিয়ে বলে ওঠে, বোন হয়েছে বাবা, বোন।

প্রসাদ হেসে ওঠেন আনন্দিত মুখে, খাসা খপর, খাসা খপর। আবার একটি মাতৃজাতির অংশ ভূমিষ্ঠ হল।

ভজহরি কিঞ্চিৎ ব্যাজার মুখে বলে, আবার কন্যে।

প্রসাদ বলেন, কেন, তাতে কী ক্ষেতি হল?

—জোড়া কন্যে মানে জোড়া পাত্তর। এখন ঠেলা সামলাও।

পরমেশ্বরী কথা বলে, কাকা বুঝি মেয়ে পছন্দ করো না।

অপ্রস্তুত ভজহরি বলে ওঠে, না না, আমি তা বলিনি। তা বলিনি।

রামদুলাল কথা কয়, বাবা, ঘরে চলো। বোনের মুখ দেখতে হবে না!

প্রসাদ তাকান ভজহরির দিকে, যা দিকি। চট করে ডোবার ধার থেকে একটি জবা ফুল নিয়ে আয়।

ভজহরি অবাক তাকায়, এত রাতে জবা ফুল!

প্রসাদ, কন্যের মুখ দেখতে হবে না। মহামায়ার অংশকে এ ছাড়া আর কী বা দিতে পারি।

বন্দ্যো হেসে বলেন, সাধু সাধু, সাধু।

কালো রঙা টেলিফোন যন্ত্রটি যে কে সেই। বাইরে ঘরে একটা নিচু টেবিলের ওপরে রাখা। যতবারই তুলে কানে দিই নিথর নিঝুম। বাবা তো সেই সাতসকালে অফিসে বেরিয়ে গিয়েছে। বলে গিয়েছে ফোন বাজলে তুলে হ্যালো বলতে প্রথমেই।

বাইরের ঘরে দাদু যথারীতি মাদুরে বসে রোগী দেখছেন। ও ধারে বড়মা নিচু তক্তপোশে শাঁখ হাতে বসে। শৈলদাদু অদূরে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন। মা রান্নাঘর আর বাইরের ঘর করছে। গোয়ালে আমাদের কালো গাই হাম্বা করছে। পাশের বাড়ি রেডিওয় খবর পড়া হচ্ছে। আমরা আজ ভাইবোনেরা কেউ ইশকুলে যাব না। টেলিফোন বাজবে বলে কথা।

ঠিক এখানটিতে আমার মনে একটি খোঁচ পড়েছে। ফোন তুলে কানে দিয়ে প্রথমে

হ্যালো বলতে হবে কেন! এটা কি টেলিফোনের দস্তুর। না কি হয়তো সাহেবরা ব্যাপারটা প্রথম চালু করেছিল বলেই এমন ব্যবস্থা। আচ্ছা, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় যদি এটা আবিষ্কার করতেন তাহলে কী হত? বিজ্ঞান বইয়ে ওঁর যে ছবি দেখেছি, মানে কখনওই না আঁচড়ানো পাকা-কাঁচা চুলের আণ্ডিল আর বিতিকিচ্ছিরি কপচানো দাড়ি, তাহলে কি উনি হ্যালোতে সায় দিতেন?

একটু বেলার দিকে ফোন বাজল। ছুটে গিয়ে আমি কানে দিলাম। কিন্তু মুখে কোনও রা সরল না। অথচ ওদিক থেকে একজন হেঁড়ে গলা সমানে বলে চলেছে, টেস্টিং, লাইন টেস্টিং। আমার মনে হল দত্তপাড়ার মাঠে রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠানের আগে আমরা সব কখন থেকে গোঁফ টিকি লাগিয়ে বসে আছি। স্পিরিট দেওয়া আঠার গন্ধে নাক জ্বলছে। আমরা নাটক করব 'খ্যাতির বিড়ম্বনা'। ওদিকে মেয়েরা আমাদের পাড়ার ম্যাজিসিয়ান—মেক আপ ম্যান গুজা কাকার হাতে দারুণ সব সেজেছে। অন্নপিসির বোন কাবেরী, যার নাকের পাশে মস্ত কাটা দাগ বলে জনগণে নাককাটি, তাকে সহচরী সেজে কী খাসাই লাগছে। সমরু, ওরফে সমীর কাকার গিলে পাঞ্জাবি, পকেটে কোঁচা ঠোসা, আঙুলে চার্মিনার। সেই কখন থেকে তেরপলের ড্রেসিং রুমে তিনি মহা তাণ্ডবে হারমোনিয়াম রগড়ে নাগাড়ে, হাঁই মারো মারো টান, হাঁইও হাঁইও হাঁইও হেঁকে চলেছেন ঝিঁ ঝিঁ ধরা গলায়। মেয়েরা রিহার্সাল দিয়ে দিয়ে আলা। তখনও মাইকে মিনুদা চিকরে চলেছেন, হ্যালো টেস্টিং, ওয়ান, টু, থ্রি...। মাইক আর টেলিফোনে নির্ঘাৎ জ্ঞাতি সম্পর্কের আত্মীয়তা আছে। কোথাও ইংরেজি ছাড়া নিয়ম নেই।

আমি চুপ করে কানে ফোন সেঁটে। ওদিক থেকে সেই হেঁড়ে গলা টেস্টিং টেস্টিং আউড়ে চলেছে। ঘর শুদ্ধ সবাই তটস্থ। দাদুও রোগী ফেলে হোমিও পুরিয়া পাকানো বন্ধ অবস্থায়। ভাই-বোনেরা সব কাঠ। এমনি সময় বড়মা মুখে শাঁখ তুলে টেনে টেনে লম্বা করে তিনটে মোক্ষম ফুঁ দিল। দাদু মায়ের কাণ্ড দেখে ভ্যাবাচাকা। অ মা, শাঁখ বাজাচ্ছ কেন? কি হল? কি হল?

আমার কানের ভেতরকার কথা এবার নিবে যায়। ফোনটা আবার আগের মতো ঝিম মেরে যায়। বড়মা হাঁক ছাড়ে, গুরো, গুরো, গুরো।

আমি কান থেকে যন্ত্রটা নামিয়ে রাখি। বড়মাকে এই নিয়ে দুটি ব্যাপারে শাঁখ বাজাতে দেখলাম। প্রথমটা অবিশ্যি ভোর রাতে রেডিওয় 'মহালয়া' আরম্ভ হওয়ার ঠিক আগে।

খানিক পরেই আবার ফোন বেজে উঠল। তবে এবারকার ডাকটা আগের মতো একটানা নয়। কীরকম খাপছাড়া। এবার আমাদের মা গিয়ে ওটা ধরল। আমি জানি মা ভুল করবে না। কেন না দাদুর রেল অফিসার্স কলোনির কোয়ার্টারে এই বস্তুটি আছে।

মা তার সরু রিনরিনে সুরেলা গলায় বলল, হ্যালো।

ওধার থেকে এবার কীসব কথা হল। মা শুধু বলল, হ্যাঁ দিচ্ছি।

বড়মার দিকে তাকিয়ে মা বলল, আপনি কথা বলুন ঠাকুমা।

বড়মার চোখ ছানাবড়া, আমি! কী বলব ভাই। যন্তরে আবার মানুষ কতা কয় নাকি!

—বলুন না একটু।

বড়মা উঠে দাঁড়াল। তারপর আড়ষ্ট হেলতে দুলতে এগোতে এগোতে বলে, অ মা, ই কী কতা।

ফোনটা বড়মার কানে ধরল মা। বড়মা অমনি চোখ বুঁজে ফেলল। ওধার থেকে কে কি বলছে কে জানে। বড়মা কিন্তু চক্ষু বুঁজে পাথর। একটিও কথা সরল না মুখে।

এবার ডাক পড়ল দাদুর। লুঙি সামলে হাই পাওয়ারি দাদু কাঁপা কাঁপা নিজ হস্তেই ফোন তুলে কানে দিলেন। তবে ভুল করে মুখেরটা কানে আর কানেরটা মুখে অবস্থায় তিনি খাস সাহেবি ঢঙে বলে চলেছেন, হেলো হেলো, হেলো—

বড়মা বলে ওঠে, আর কত হেলবে বাবা। ও যে ভুঁয়ে শুয়ে পড়বে।

মা তাড়াতাড়ি দাদুর কান-মুখ সামলে ফোনটা ঠিক করে ধরিয়ে দেয়। দাদু এবার বলে, ইয়েস—

ওধার থেকে আগের নিয়মেই কে বা কারা কী বলে যায়। কী সব প্রশ্ন করে। দাদু কোনও জবাব না দিয়ে ঘাড় কাৎ করে সায় দেয়। সায় দিয়েই যায়। মা পাশ থেকে বলে, কথা বলুন, কথা বলুন।

—বলছি তো মা। দিব্যি ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছি।

এবার দাদু ফোন আমার দিকে বাড়িয়ে দেয়। দিয়ে বলে, হেলো বলো, হেলো বলো।

আমি মাইক টেস্টিং-এর গলায় চিকরে উঠি, হ্যালোওওও—

ওধার থেকে রেডিও নাটকে বসন্ত চৌধুরি স্টাইলের গলা বলে, আস্তে কথা বলতে হয়। টেলিফোনে চেঁচাতে নেই।

আমি চুপ। কে ওধারে। আবার কথা, কী হল, কথা বলছ না কেন?

এই পলকা ধমকের জায়গাটা আমার চেনা মনে হয়। আমি আবার বলি, হ্যালোও।

ওধার বলে, এবার মলয়কে দাও।

ভাই কিন্তু বেশ ধড়িবাজ। তার অতি বৃহৎ গোল গোল ভ্যালভেলে চক্ষু সমেত ফোন কানে দিয়েই সে বলে ওঠে, বাবা, আমি মড়য়।

এবার সব রহস্যের ফাঁস ফস্‌কে যায়। বাবা ওধার থেকে একে একে সব ভাইবোনের সঙ্গে কথা বলে। শুধু বাদ যায় বাবার পিসিমা, আমাদের ভাইটি আর গৌর শিরোমণি। কিন্তু আমার মন ধন্দ পাকায় বাবার যান্ত্রিক গলা নিয়ে। কেমন করে অমন উঁচুতে বাঁধা স্বর ওইরকম মিঠে মধুর হয়ে গেল। এটা কি টেলিফোনের নিয়ম! সে মানুষের গলা পাল্টিয়ে তাকে অন্যরকম বানিয়ে দেয়। মহিষাসুর যদি টেলিফোনে বাতচিত করত দুর্গার সঙ্গে তাহলে মা দুর্গা নিশ্চয়ই তাকে অমন করে ত্রিশূল ফুঁড়ে মারতেন না। তাহলে কী হত? বচ্ছরান্তে আমাদের দুর্গাপুজোটাই বুঝি হত না। দোলতলার পুজোতলায় আমার আর সুবলের ধুনুচি নাচ হত না। মুকুলদার নেতৃত্বে আমরা জঙ্গল সাফ করতাম না। মহাষ্টমীর ভোগ রান্নায় আমরা বুধো কাকার সাগরেদি করতাম না। আর নবমীর রাতে গুজা কাকা বহুরূপী ভিখিরি, পাগল, বেলুনওয়ালা সেজে পুজো তলায় হৈ হৈ ফেলে দিতেন না।

মা বলল, আমাদের ফোন নাম্বার হল ভাটপাড়া ফাইভ।

ঊনপঞ্চাশ

টেলিফোন আসার পরদিন বিকেল নাগাদ দত্তপাড়ার এবড়ো খেবড়ো রাস্তায় পর পর খানকতক লরির ঝড় উঠল। আমরা দৌড়ে দেখতে গেলাম। পুলিন দত্ত জ্যাঠামশাই দত্তপাড়ার মাঠে ঝিরকুটে কালো পেটাই চেহারার পেটের কাছে লুঙি কষে ঘন ঘন নস্যি নিচ্ছেন আর দোফলা আমতলায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে পাশের বাড়ির প্রকাণ্ড ঘোষ পরিবারের হারু কাকাকে ডেকে হেঁকে বলছেন, বাঙাল, শালা বাঙালে দখল করে নিলে আমাদের পাড়া।

ধুলো ওড়া লরিদের আওতায় দাঁড়িয়ে হারু কাকা চোখে হাত আড়াল দিয়ে বলে, কেন, কী হল?

পুলিন জ্যাঠামশাই পদে পদে খিস্তি দেন। সেই নিয়মেই তিনি গর্জে ওঠেন, ধুর মাকড়া গর্ভস্রাব। বাংলা কতা বুঝিসনে।

হারুকাকা, খিস্তিটা সমসকৃতে দিচ্ছেন কাকা।

—ওরে বানচোত, টাঁটু ডাক্তারদের জোড়া পুকুরধারের মাঠখানা ওই শালা রিফুজিরা চোখের সামনে দখল করে নিচ্ছে। কারও খ্যামতা নেই রোখে। এতকাল পরে ওরা এল কোত্থেকে! দেশভাগ তো সেই কবে—মানে এগারো-বারো বছর হয়ে গেল।

হারুকাকা মিটমিট হাসে, এরা এল রানাঘাট কুপার্স ক্যাম্প আর ধুবুলিয়া ক্যাম্প থেকে।

—তা ওখেনেই তো দিব্যি ছিল। এখানে মরতে এল কেন?

—মরতে নয়, বাঁচতে। মাঠখানা ওরা দখল করছে।

—কে পাঠালে ওদের? খবর দিল কে?

—আরে বাবা, ওই জমিটা সবে সরকারে খাস হল যে।

—খাস! কবে হল? আমরা তো কিছু জানি না।

—আপনি জানবেন কী করে। আপনার নিজের কি কম জমি! যাদের এক ফোঁটাও মাটি নেই তারা সব খবর রাখে।

পুলিন দত্ত গর্জে ওঠেন, তোর কাকা সুশীল ঘোষ এখনও খদ্দরধারী কংগ্রেস। আর তুই মদনা কমিউনিস্টের মতো কথা কচ্ছিস!

হারুকাকা ফিক ফিক হাসে, আমার কাকা খদ্দর পরলেও নেতাজির খাস লোক। একসময় ওনার সেক্রেটারি ছিলেন। হাঁপানিতেই ওঁকে কাবু করল। তারওপর ইংরেজ পুলিশ মেরে একটা পা নষ্ট করে দিল। আমার সাইকেলের পেছনে চড়েই তো ঘুরে বেড়ান।

পুলিন দত্ত গলা চড়ান, ওরে শালা। তুমি সুশীলবাবুর ভাইপো হয়ে কমুনিস্টি মারাচ্ছো!

হারুকাকা বাড়ির দিকে যেতে যেতে বলে, মুখ নয় তো, পাইখানা।

উড়ন্ত লরির গর্জনে পুলিন দত্ত সে কথা শুনতে পান না।

একটু পরেই আমরা প্রায় রোজকার দেখা দৃশ্যটা দেখতে পাই। হারুকাকার সাইকেল ছুটছে। ক্যারিয়ারে বসে আছেন সুশীল দাদু। ভয়ঙ্কর রোগা, মাথাটা কদম ছাঁট, পড়ো পড়ো চশমার ওধারে অতিরিক্ত বিস্ফারিত চোখ। হাতের লাঠিখানা বুকে সাপটানো।

গায়ে খদ্দরের ফতুয়া। পরণে খদ্দরের হাঁটু তক্‌কো লুঙি। আর কাঁধে খদ্দরের গেরুয়া পাড়ধারী চাদর ফেলা। বুকের আড়াআড়ি কাপড়ের ব্যাগ। সাইকেলের পশ্চাতে বসে সদাই ভয়ঙ্কর গম্ভীর মানুষটি হাঁপানির ফোঁকাকল টানছেন আর ফোকলা মুখ কপাত কপাত করছেন। ওটি মনে হয় হাওয়া টানার রকম। দেখলে কষ্ট হয়। এককালের স্বাধীনতা সংগ্রামী, নেতাজির মতো বলবান মানুষের সঙ্গীটি কী অসহায় পরনির্ভরী এখন।

আমরা সব দল বেঁধে জোড়া পুকুরের মাঠে যাই। কি অবাক ভোজবাজিতে এই বিকেলের ঝোঁকে গোটা মাঠখানা মানুষে মানুষে ছয়লাপ। ঘপাঘপ শাবল পড়ছে। কোদাল আপসাচ্ছে। বাঁশের খোঁটা পোঁতা হচ্ছে। পাটকাঠির বেড়া গড়া হচ্ছে। তেরপল চড়ছে মাথার ওপর। ছেলেপুলেগণ হুটোপাটা করছে। একজন এখনও কাঁচা চুলো বৃদ্ধ একধারে বসে নিজের বুটজুতোয় বুরুশ কালি করছেন। পরণে বাড়িতে কাঁচা ফটফটে শার্ট ধুতি। যাকে বলে আপাদমস্তক টিপটপ পরিষ্কার। অথচ চারদিকে কি লণ্ডভণ্ড অব্যবস্থা। তাঁকে ডেকে এক আধবুড়ো বলে, আরে খাসনবিশ বাবু, জুতা সাফ অখন রাখেন। ঘর গোছান। খাসনবিশ শান্ত গম্ভীর চক্ষু তুলে তাকে শুধু একবার দেখেন। তারপর আবার জুতো পালিশ। একজন মহিলা চিৎকার করে, বাঙ্গা, অরে বাঙ্গা, কুপিখান কই রাখলি?

আমি মনে মনে হাসি। আর সবার কাছে এসব শব্দ বিটকেল হলেও, আমি এর অনেকগুলো জানি। আমার মামার বাড়ির আদি দেশ তো পাকিস্তানের ফরিদপুর। মা বলে, গ্রামের নাম, মাওইসার। জিলা, মাদারিপুর। এখানে, এত সব হঠাৎ মানুষের মধ্যে মাদারিপুর কি নেই! আমার পারুলবালা দিদিমা, কিংবা তাঁর মা কুসুমকুমারীকে এখানে নিয়ে এলে ঠিক খুঁজে বার করত। আমার দিদিমা শুধু চন্দ্রবিন্দু বর্জিত হলেও তাঁর মা, যাঁকে আমরাও দিদিমা বলি বাবা-মা'র দেখাদেখি, প্রায় কপট রাগে বলে ওঠেন, আরে থো। বাপেরও দিদিমা, পুতেরও দিদিমা। কতবার বলি বাংলায় কথা বলো না দিদিমা। অমনি ঝটকা জবাব ফেরে, হালা, পুঙ্গির পুত।

এই গালাগালটার মানে না জানলেও বুঝি এটা খুব খারাপ কথা। যেমন তিনি মাঝে মাঝেই রেগে গেলে 'লোম' কথাটি ঝাঝান। তার মানে কি আরও খারাপ?

চোখের সামনে এফআরসিএস ডাক্তার শ্যামাচরণ চাটুজ্যে ওরফে টাঁটু ডাক্তারের মস্ত মাঠখানার চেহারা পাল্টে যেতে থাকে। আস্তে আস্তে মাঠের মাথায় দিনের আলো গোটাতে থাকে—ঠিক যেন প্রকাণ্ড পুকুরে টানা জাল দেওয়া হচ্ছে। গুমোট দিনের পাট তুলুনি মুখে, কোথা থেকে হাওয়া ছাড়ে ফিনফিনে। ওধারে জোড়া পুকুরের মাঝখানকার আলাদা করে দেওয়া বাঁধ ধরনের পথে এই নতুন কুচো-কাঁচাগণ হুটোপাটি তুলে খেলে বেড়ায়। কোথাকার শিশু কোথায় এসে হেসে কুটিপাটি। মাঠময় বাঁশগাড়ি আর পাটকাঠি পোঁতা দখলদারি পর্ব দুদ্দাড় চলে। কোনওমতে তৈরি করা ডেরায় ডেরায় বাতি জ্বলে ওঠে। কারা সব শাঁখে ফুঁ দিয়ে সন্ধেবাতি দেয়। জোকার পড়ে এন্তার।

এমনি সময়ে নরহরি ওরফে নরিকাকা, উড়িয়া মালিকে সঙ্গে নিয়ে মাঠের ধারে নিঃশব্দে এসে দাঁড়ান দাদু, টাঁটু ডাক্তার। টুকটুকে পাকা আম বৃদ্ধ। পরণে পাজামা, গায়ে টাওয়াল গেঞ্জি, আর কাঁধের ওপর পাট করে যত্নে ফেলে রাখা ফর্সা তোয়ালে। পাকা চুল সিঁথি কেটে আঁচড়ানো, চমৎকার ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। চোখে রিমলেস চশমা। ডাঃ শ্যামাপদ চাটুজ্যে, এফআরসিএস।

এই টাঁটু ডাক্তারের বাবা তারিণী চাটুজ্যে ছিলেন এ অঞ্চলের হেঁকোডেকো ব্যক্তি। ওঁদের অট্টালিকার নাম তারিণী ভবন। এই টাঁটু যৌবনে বিলেত গেলেন এফআরসিএস পড়তে। পাস করে ফেরার পরে ওঁদের পরিবারকে এক ঘরে করল এখানকার কঠিন বামুনরা। টাটুর বাপ ছেলেকে দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে দানাদি সেরে বামুন ভোজন আর বহু লোক খাওয়ালেন। পরবর্তীতে এফআরসিএস টাঁটু কলকাতায় চুটিয়ে প্র্যাকটিস করতে লাগলেন। তাঁর ছুরি কাঁচিতে মরো মরো প্রাণ চাগাড় দিতে লাগল। কিন্তু হালিসহরের লোক আহ্লাদ করে কলকাতায় দেখাতে গেলে পুরো ফিস নিতেন। একসময় বাংলা ছেড়ে চলে যান পাঞ্জাবের ঝিন্দ স্টেটে। সেখানে রাজার প্রধান ডাক্তার হয়ে চাকরি নেন। রিটায়ার করে ফিরে এলেন দেশ হালিসহরে। মিউনিসিপ্যালিটির দাতব্য হাসপাতালে তাঁর তাবৎ অপারেশন করার বিলিতি অস্ত্রশস্ত্র দান করেছেন। একটি বেড করে দিয়েছেন বাবার নামে। এখন চিকিৎসা ছেড়ে সকাল সন্ধে গোটা দু-তিন মস্ত বাগান সামলান। নরি কাকা, দ-হরিকাকা, নটহরি, পূর্ণ ঠাকুর ইত্যাকার জুটিয়ে আনা ওড়িয়ারা সেইসব বাগান চষে, সাজায়।

টাঁটু দাদু তাঁর হাতে ধরা বিলিতি ভাঁজ করা স্টিলের লাঠিখানার ভাঁজ খুলে মাটিতে পুঁতে দিতেই ওটা গোল টুল হয়ে গেল। তিনি নির্বিকার মুখে তার ওপর বসে বসে জমির ভোজবাজী দেখতে লাগলেন। দেখেন আর ফ্রেঞ্চকাট দাড়িতে আলগোছে হাত বোলান।

মাঠময় টিমি টিমি বাতির দেওয়ালি ঘটতে থাকে। সেই সঙ্গে হঠাৎ হাওয়ার তোড়ে আঁকা বাঁকা সাপ উলুধ্বনি। কী আশ্চর্য ভূমি দখলের উৎসব।

রাজার খাস অনুচর বন্দ্যো সুখময়ের তরফ থেকে যে কাঁচা খবরটি জারি ছিল, সেটি পাকাপোক্ত হল তাঁর আগমনে। কুমারহট্ট-হালিসহরে রাজার বজরা এসে ভিড়ল সকাল হওয়ার খানিক পরেই। প্রসাদ সে সময় গঙ্গার ঘাটে স্নানে ছিলেন। ফলে দর্শন হয়ে গেল ওখানেই।

প্রসাদ কোমরজলে দাঁড়িয়েই দেখতে পেলেন রাজার বাহারি বজরা। সুমুখে ময়ূর মুখপত্তন আর ভারী রংদার। কাঠের গায়ে খোদাই করা কারুকাজের চমৎকার চিত্রমালা, কোথাও যুদ্ধ আবার কোথাও গীতবাদ্য আয়োজন। এই অভিনব যোগ সম্মিলন, একই লপ্তে যুদ্ধ ও সঙ্গীত দেখে প্রসাদ মনে মনে চমৎকৃত হন। কখন কোন ছবি অথবা বিষয় কোন মুখে কার সঙ্গে এসে মিলে যায় তার কোনও আগাম হিসেব হয় না। সংসারটি সাজানো গোজানো দেখতে হলেও আদপে সে অতি অসংলগ্ন। আর এই এলোমেলো অবস্থানের ভিতর দিয়েই বহু ঘুর পথে একজন অপরের সঙ্গে কী অভিরাম লুকনো গাঁটছড়া বেঁধে বসে থাকে। সেই বাঁধাবাঁধির খপর সহজে জানা যায় না। তার হিসেবটি সংসারের অতীত, সদাই অধরা অলীক এই বিশ্বপ্রকৃতির মায়া রহস্যের লীলা ভাণ্ডার। অথচ এইরকমটাই হয়ে আসছে চিরকাল। এই পরিদ্যাবা পৃথিবীর জন্মকাল ইস্তক।

রংদার বজরায় মখমলি পর্দা খেলছে সকালবেলাকার হাওয়ায়। গোড়ার দিকে কাঠের পাটায় বসে এক বাজনদার শিঙ্গা ফুঁকে রাজ আগমন ঘোষণা কল্লে। বজরা এসে লাগল ঘাটের গায়ে। ঘাটে স্নানার্থীরা অবাক করজোড়ে তটস্থ হয়ে রইল। খালাসিরা দ্রুত জলের আড়াআড়ি একখানি পাটা ফেলে দিলে বজরার সঙ্গে যোগ করে। দু'জন একটি কাঠের

দণ্ড ধরে দাঁড়ালে ওপরে ও নীচে। মহারাজা সেটি বাঁ হাতে ধরে ধীরেসুস্থে নামতে লাগলেন মাটির দিকে। আর নামতে নামতেই জলে দাঁড়ানো রামপ্রসাদকে দেখে মৃদু হাস্য করলেন। প্রসাদ হাত জোড় অভিবাদন জানালেন।

রাজা চলে গেলেন রাজকীয় নিয়ম মোতাবেক ঘাটে রাখা পালকি চড়ে তাঁর বিরামকুঠির দিকে। ঘাট থেকে ওই ফাঁকটুকু একজন গালপাট্টা ছত্রধর তাঁর মাথায় ঝালর দুলন্ত মস্ত আর রঙিন ছাতাখানা বাগিয়ে ধরে রইল। ঘাটস্থ বেটামানুষগণ জোড় হাত করেই রইল।

ঘাটে আসা একমাত্র রমণী এক বুড়ি প্রসাদকে হেঁকে বলে, ধন্যি আমাদের দেশের ছেলে পেসাদ। দেশের রাজা তাকে দেখে খাতির কল্লে।

প্রসাদ হেসে কন, দয়াময়ী পিসিমা গো, সবই তোমার দয়া।

বুড়ি অবাক চোখ কপাল তোলে, ও মা কী ভাগ্যি আমার। আমার মতো গরিব বেধবাকে তুই পিসি বলে সম্মান কল্লি। তোর জগৎজোড়া নাম হোক বাপ।

প্রসাদ বলেন, ও মা সে কী কথা। পিসিকে মাসি বলি কেমন করে। তুমি যে আমার বাপের তরফে গো। তোমার পুত্তুর গদাধর যে আমার ছেলেবেলার ইয়ারদোস্ত পিসিমা।

বুড়ি মুখে চুক চুক শব্দ করে, আহা মরে যাই, মরে যাই। একই গাঁয়ে বাস করি। কিন্তু তোকে যে কদ্দিন পরে দেকলাম বাপ।

—তুমি খ্যাল না কল্লেও আমি কিন্তু হরবখতই তোমায় গঙ্গা নাইতে দেখি পিসিমা।

বুড়ি নিদন্ত মুখ পাকলে হাসে ভারী চমৎকার। একদিন মোদের ঘরে আসিস ছেলে। নারকোল নাড়ু, মোয়া খাওয়াবোখন।

পাশ থেকে আর এক স্নানার্থী ফুট দেন, কালীর বেটা হবে নাড়ুগোপাল।

প্রসাদ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেন লোকটিকে। কুমারহট্টর এক চতুষ্পাঠীর যুবা পণ্ডিত। স্নান সেরে জলে দাঁড়িয়েই কষে শিখা বাঁধছে।

প্রসাদ হেসে বলেন, কালী আর রাসবিহারি কি ভিন্ন. ন্যায়রত্নঠাকুর।

ন্যায়রত্ন বক্র হেসে কন, তোমার মতো খোয়ারিতে থাকলে তো সবই ঘণ্ট পাকানো। তবে কি না আমরা তো শাস্ত্র ব্যবসায়ী। সেখানে অনাচার করি কেমন করে বলো।

রামপ্রসাদ মৃদু হেসে মাথা নিচু করেন, তা বটে, তা বটে। আমার জাত ধর্ম, নিয়ম কানুন সব খেয়ে বসে আছি! তাই প্রভেদ পাইনে কোনও কিছুরই।

ন্যায়রত্ন লোকটি আরও কী যে বলে যায় অংবঙিয়ে, প্রসাদ কানে নেন না। তাঁর তাড়া আছে যে। ঘরে যাওয়ার পথে একবার রামতনুকে দেখে যেতে হবে। তত্ত্ব করতে হবে তার ঢোলকটি কী প্রকার আছে।

দুপুরের পর এক পশলা ঝেঁপে বৃষ্টি হয়ে সংসারটি ধুয়ে মুছে সাফ সুতরো হয়ে যায়। গরমদিনের তাপঝাল জুড়িয়ে মিঠে মিঠে বাতাস ছাড়ে। আর সেই বাতাসের মুখেই সুখময় বন্দ্যো এসে উপনীত হন প্রসাদের দুয়ারে। তাঁর কাছে কতিপয় খপর প্রসাদের জন্যে। সে সবই রাজ সম্পর্কিত। তার সঙ্গে দেশের অবস্থা ও অবস্থান জড়িয়ে আছে। আর আছে সিরাজ নবাবি কুরসিতে বসবার আগেই তাঁর সম্পর্কে বিবিধ আতঙ্ক প্রচার। তার কতক সত্য, কতক কু-প্রচার।

কিন্তু বন্দ্যোর খপর অনুযায়ী বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দী এখন শয্যাধীন গুরুতর অসুস্থ। সেই সঙ্গে প্রখর যুদ্ধব্যবসায়ী নোয়াজেস, রাজবল্লভ, হোসেন কুলি খাঁ ইত্যাকার ব্যক্তি অসুস্থ নবাবের প্রায় অচেতনতার সুযোগ নিতে ব্যস্ত ছিল। কিন্তু নবাবের বাসনা অনুযায়ী উদরি রোগগস্ত বৃদ্ধ নবাব হতাশা বশত বৈদ্যের চিকিৎসায় বিফল হয়ে ঔষধ সেবন বন্ধ করে দিন গুনছেন। সকলে বুঝতে পারল জীবন প্রদীপ নির্বাপণে যেতে বসেছে। এ দিকে সিরাজের ভবিষ্যদাকাশ ঘোরতর তমসা পীড়িত হয়ে উঠতে লাগল। কী আছে নসিবে, তার খপর কে রাখে।

এক দিবস বৃদ্ধ নবাব দৌহিত্রকে কাছে ডেকে সর্ব সমক্ষে কতিপয় সান্ত্বনাবাক্য শোনাতে লাগলেন।

আমি এই যে আজীবন অসি হস্তে জীবন যাপন করে সংসার হতে অবসর নিলাম, এত যুদ্ধ করে রাজ্য রক্ষা করলাম সে সবই তো তোমাব জন্য।

তোমার ভবিষ্যত দুর্গতির কথা ভেবে আমি রজনীতে বিনিদ্র। তোমার শত্রুদের আমি চিনি। তুমি তাদের জানো না।

হোসেল কুলি খাঁ তোমার পথের কন্টক ছিল। শওকত জঙ্গের অনুগত এই ব্যক্তি এখন মৃত।

দেওয়ান মানিকচাঁদ. যে তোমার প্রবল শত্রু, তাকে আমি একটি রাজপ্রাসাদ গড়ে দিয়ে ক্ষান্ত করেছি।

এখন তোমায় আর কী বলি। আমার শেষ উপদেশ হল, ইওরোপীয় বণিকদের উপর কঠিন নজরদারি জারি রেখো। তারাই তোমার প্রধান আশঙ্কার হেতু।

কিন্তু সমুদয় ইওরোপীয় বণিকদের এক লপ্তে পদানত করার চেষ্টা করো না। তোমার প্রধান দমনের বিষয় হল ইংরেজ। তাদের ক্ষমতা ইতিমধ্যে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই ইংরেজদের দমন করতে পারলে অন্যান্য ইওরোপীয় বণিকরা আর ফণা মেলতে পারবে না। তুমি কিছুতেই ইংরেজদের দুর্গ নির্মাণ বা সৈন্য সংগ্রহ করতে দিও না। যদি দাও তাহলে এ দেশ আর তোমার রইবে না।

বন্দ্যো এই বিবরণ শেষে আর একটি চমকপ্রদ কথা শোনালেন। কাশিমবাজারের ইংরাজ কুঠিতে ডাক্তার ফোর্থ নামে এক বিচিত্র ব্যক্তি থাকেন। তিনি একাধারে চিকিৎসক ও কোম্পানির কর্মচারী। মালগুদামে বসে যেমন দাদনের খাতাপত্র সারেন, তেমনই প্রয়োজনে বন্দুক ঘাড়ে যুদ্ধে যেতেও তোয়ের থাকেন। এই ডাক্তারটি ভারী ধুরন্ধর। যেহেতু বৃদ্ধ নবাবের শেষবেলার চিকিৎসক, তাই সেখানে তিনি অবারিত দুয়ার। আলিবর্দী রোগী, তিনি চিকিৎসক। যদিও নবাব এখন দাওয়াই বর্জন করেছেন।

এ দিকে রাজবল্লভের সঙ্গে কাশিমবাজারে ইংরেজদের ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। কৃষ্ণবল্লভ কলিকাতায় ঠাঁই নিয়েছেন। ওধারে ঘসেটি বেগম আঁক কষছেন নবাবি সিংহাসনের দিকে গুটি গুটি। এমতাবস্থায় ডাক্তার ফোর্থ এক সকালে নবাবের কাছে উপনীত। এমন কালে সিরাজ সেখানে যেয়ে নিবেদন করলেন যে, তিনি খপর পেয়েছেন—আমরা নাকি ঘসেটি বেগমকে সাহায্য করতে স্বীকার হয়েছি।

বৃদ্ধ নবাব তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের দিকে ফিরে তাকালেন, এ কথা কি সত্য?

ফোর্থ বলেন, এ কথা মিথ্যা। এ হল শত্রুর অপপ্রচার ও জনরব তৈরি করার কল।

ইংরাজ আদপে বণিক। তারা সৈনিক নয় যে রাষ্ট্রবিপ্লবে নেমে পড়বে। তারা বাণিজ্য করেই সন্তুষ্ট।

নবাব, তোমাদের কাশিমবাজারে কুঠি না কেল্লা? সেখানে কতজন সৈন্য থাকে?

ডাক্তার, কর্মচারী সমেত মোট ৪০ জন মাত্র।

নবাব, কখনও কি তার অধিক থাকত না?

ডাক্তার, থাকত জাঁহাপনা। তবে সে কেবল বর্গীর হেঙ্গামার সময়ে। বর্গীর ঝামেলা প্রশমিত হতেই তারা সব কলিকাতা চলে গিয়েছে।

—তোমাদের যুদ্ধজাহাজ কোথায় থাকে?

—বোম্বাই।

—সে সকল জাহাজ এ দেশে আসবে কি?

—তার কোনও কারণ তো দেখছি না।

নবাব, তিনমাস পূর্বে তোমাদের কতিপয় যুদ্ধ জাহাজ এখানে এসেছিল। তার হেতু কী?

ডাক্তার, যথার্থ। তবে এমন তো প্রতি বছরেই দুই একখানি জাহাজ এসে থাকে। উদ্দেশ্য হল রসদ সংগ্রহ করা।

নবাব, এ প্রদেশে যুদ্ধ জাহাজ আনবার প্রয়োজন কী?

ডাক্তার, কোম্পানির বাণিজ্য রক্ষা আর ফরাসি যুদ্ধের আশঙ্কা নিবারণ করা।

নবাব, ফরাসিদের সঙ্গে তোমাদের কি আবার যুদ্ধ বেধেছে?

ডাক্তার, এখনও বাধেনি। তবে আশঙ্কা আছে।

সুখময় বন্দ্যোর এতসব বিবরণ যে একেবারে ঘোড়ার মুখের, এ নিয়ে প্রসাদের কোনও সংশয় থাকে না। শুধু তাঁর বিস্ময়, একজন বুনো কবি কেমন করে আস্তে আস্তে রাষ্ট্রযন্ত্রের জালে জড়িয়ে পড়ছেন। দেশের তাবৎ কূটনীতির সমাচার তাঁর মতো সাধারণ জনের মস্তিষ্কে চালান করা হচ্ছে। রামপ্রসাদও কীরকম মোহগ্রস্তের পারা, এই সব রাজারাজড়ার বৃত্তান্তে তলিয়ে যাচ্ছেন।

বন্দ্যো আর বলেন, আজ সন্ধেয় রাজার আলয়ে তোমার আর আজুর গাওনা যুদ্ধু হবে। সব ব্যবস্থা পাকা করে রেখেছ তো?

প্রসাদ মৃদু হাসেন, হ্যাঁ, যুদ্ধের ব্যবস্থা পাকা বৈকি।

পঞ্চাশ

মরকতকুঞ্জ না হলেও এ কুমারহট্ট হালিসহরে নদীয়াধীপ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বিরাম কুঠিখানি সুশোভন। দ্বিতল দালান কোঠার সর্বাঙ্গে সুন্দর নকশা কাটা। এ নকশায় শাক্ত-বৈষ্ণব দু'টি ধারাই বিদ্যমান। মুরলি মাধবের কাছাকাছি নৃমুণ্ডমালিনী কালিকার অবস্থান অতি নিপুণ। রাজা স্বয়ং শাক্তধর্মী হলেও কলা শিল্পের জন্য তিনি সতত উদার। তাঁর কালীতারা আঁকা নামাবলির বদলি প্রয়োজনে কৃষ্ণ নামধারী উত্তরীয়ে অনাপত্তি আছে। আদপে ধর্মনীতির সঙ্গে রাজনীতির ভারি সূক্ষ্ম যোগাযোগ। ফলে এই বহুদর্শী রাজা দুই পথেই সহজ স্বাভাবিক।

বিরামকুঠির সুমুখে প্রশস্ত মাঠে একটি শামিয়ানা পড়েছে। মাটিতে পাতা হয়েছে গালিচা ও সতরঞ্চি। শামিয়ানা ঘিরে ঝাড়বাতি জ্বলছে। কুমারহট্টের গণ্য এবং মান্যেরা আসন গ্রহণ করেছেন। সুমুখে খানিক খালি রাখা জায়গা। ওখানেও রঙিন গালিচা বিছানো। ওখানেই রামপ্রসাদ-অযোধ্যানাথের গীত সমর অনুষ্ঠিত হবে। তার ওধারে একখানি নিচু চৌকির উপর দুধ সাদা জাজিম পাতা। তার উপর জোড়া তাকিয়া। অদূরেই সুবৃহৎ রূপার গড়গড়া। গায়ে সোনার জল আঁকা চিকনের কাজ। তার গা থেকে বার হয়ে সোনার পাতে মোড়া সটকাটি আসনের উপর অলস পড়ে আছে। প্রসাদ-অযোধ্যানাথ দু'জনাতে পাশাপাশি বসে আছেন সুমুখের দিকে। আজুর পরিধানে ধুতি-চাদর। নাকে দিঘল রসকলি। গলে কণ্ঠিমালা যথারীতি। তাঁর ক্ষৌরি করা মুখে ঘাম চকচক করছে। প্রসাদ ও ধুতি উত্তরীয়ধারী। কপালের মাঝখানে গোলাকৃতি সিঁদুর টিপ ঝকঝক করছে ধনুক ছিলা ভ্রূ মধ্যে। তাঁর গৌরবর্ণের সঙ্গে টিপখানি কি বিপরীত সাজে মানানসই। টানা টানা চোখ দু'খানি কিঞ্চিৎ রক্ত শোভায় সেজে আছে। যেহেতু এ সভা, তাই অযোধ্যার নাকে কাপড় দেওয়ার জো নেই।

একজনা এসে হেঁকে গেল, মহারাজ আগমন কচ্ছেন। আপনারা ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াবেন না। এটিই মহারাজের বাসনা।

সভাস্থ সকলে মুখ তাকাতাকি করে। গঙ্গার বাতাস এসে ঘা দিয়ে যায় চন্দ্রাতপের ঝালরে। ঝাড়বাতির ছটায় হাওয়ার উতরোল দোলা দিয়ে যায়। কাচের বেলোয়ারি দাঁড়াগুলো ঠুং ঠাং রোল তোলে। ঢোলক সুমুখ রামতনু কাঁধের চাদরে মুখ মুছে নেয়। বিনি ভূমিকার ভজহরি ঘন ঘন মুণ্ড ঘুরিয়ে একবার এধার আর একবার ওধার দেখে।

নেপথ্যে পেটা ঘণ্টায় ঘা পড়ে পরপর তিনবার।

দোতলার সিঁড়ি বেয়ে রাজা নেমে আসেন একাকী। এই বিরামকুঠিতে রাজকীয় নিশানদার, কোতোয়ালাদি গরহাজির।

পরিধানে ধুতি, পিরান, উত্তরীয়। কাঁধে একখানি জরিদার সাধারণ দোশালা। দেখে মনে হয় রাজা এইমাত্র সন্ধ্যাস্নান সেরে এলেন।

রাজা জোড় হাত করে সবাইকে অভিবাদন জানালেন। তারপর নিচু চৌকির মাঝখানে বসে পড়লেন। চারদিকে স্মিত প্রসন্ন মুখ তুলে দেখলেন। তারপর মৃদু স্বরে বলে উঠলেন, আজকের আসরের পর আপনারা অনুগ্রহ করে সামান্য জলপান করে যাবেন।

আসর চুপ। রাজার কথা শুনছে সবাই।

রাজা এবার বলেন, আব একটি নিবেদন। আগামীকল্য দ্বিপ্রহরে এখানে দরিদ্র-নারায়ণ সেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আপনারা দয়া করে নিজ নিজ এলাকায় মুখে মুখে প্রচার করে দেবেন।

সকলে মাথা হেলিয়ে সায় দিল। রাজা দখিন হাত উপরে তুলে বললেন, তা হলে আমরা যে জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি, সেটি এবার শুরু হোক। আপনারা এ প্রস্তাব অনুমোদন করলেন তো?

সকলে সাধু সাধু ধ্বনি দিয়ে উঠল। রাজা হাসি মুখে চাইলেন রামপ্রসাদ-অযোধ্যানাথের প্রতি।

দু'জনায় সভা এবং রাজার প্রতি করজোড়ে উঠে দাঁড়ান। আর তখনই রাজার

ফুলমালি এসে বিস্তর সহবত সহকারে দু'জনার গলায় দু'খানি বেল গোড়ের মালা পরিয়ে দিয়ে যায়। এবার বুঝি সভার সাজপত্তন সম্পূর্ণ হয়।

রামপ্রসাদ করজোড়ে দু'চোখ মুদিত করেন। তারপর অতি নিবিড় স্বরে মুখপাত করেন গণেশ বন্দনা দিয়ে।

পরম পুরুষ প্রহুঁ পুনঃ পুনঃ প্রণমহুঁ
পর্বতেশ-পুত্রী-প্রিয় সুত।
বিভু বেদবিদাম্বর বিনায়ক বিঘ্নহর
বারণ বদন গুণযুত।।

সন্ধ্যা পার আকাশ মণ্ডলে এই সুললিত পদ সঞ্চারি গণপতি স্মরণ গীতিমাল্য প্রসাদী কণ্ঠে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে থাকে। এই সভায় সে বন্দনা আদপে মানব বন্দনারই রূপান্তর দেখে। সেই মানুষ অশেষ গুণসমাহারি এক পুরুষ প্রধান। সাথ সঙ্গতে রামতনু মৃদু এবং ধীর লয়ে তাল কীর্তন রেখে চলে। মহারাজা পরম পরিতোষে দুই চক্ষু নিমীলিত করেন। তাঁর মুখমণ্ডলে তৃপ্ত প্রশান্তির আশ্চর্য বৈভব।

গণেশ বন্দনা এবার শেষ চরণে উপনীত হয়।

রামরাম সেন নাম মহাকবি গুণধাম
সদা যারে সদয়া অভয়া।
তৎসুত রামপ্রসাদে কহে কোকনদ-পদে
কিঞ্চিৎ কটাক্ষে কর দয়া।।

বন্দনা শেষ। এবার মূল বিষয়ে যেতে হবে। প্রসাদ আর আজু গোঁসাই দু'জনেই প্রস্তুত। সভাজনও। রাজা এবার চোখ খোলেন। তারপর তাকিয়ায় হেলান দিয়ে পাশে লতিয়ে থাকা গড়গড়ার সটকাটি আলগোছে তুলে নেন।

আজু গলা তুলে হেঁকে কন, বেশ। বন্দনার গাওনা তো হল। এবার আসলে এসো দিকি ভায়া। আর অধিক ভঙ্গিতে কাম নাই।

রামপ্রসাদ মৃদু মৃদু হাসেন।—বেশ, তাহলে একটু বোষ্টুমি ধারাতেই যাই। তাতে করে গোসাঁইদাদার প্রাণে পুলক হবে। তাঁর তুলসীপত্তরি ধাত রক্ষে হবে।

আজু কৌতুকি বদনে বলেন, হুঁ হুঁ। একবার দেখি তোমার এলেম। কালীর বেটা কেমন করে শ্রীকৃষ্ণের ন্যাজ ধরেন সেটি দেখি।

প্রসাদ, তাহলে শুনুন সভাজন, গুণীজন আর রসিকগণ। যেকালে আমি কালীর বেটা বলেই রটিত, কালী ছাড়া আমার জো নাই। তাই মনে মনে একখানি শ্রীশ্রীকালীকীর্তন রচনার বাসনা ছিল। তা সে তত্ত্ব ভাঁজতে ভাঁজতে এই এখন মনে হল শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম যদি গোষ্ঠে যেতে পারেন তাহলে জগজ্জননীর সেখানে যেতে কী বাধা!

অযোধ্যা মৃদু হুঙ্কার রাখেন, হুমম্।

প্রসাদ কন, হ্যাঁ, তাহলে মায়ের গোষ্ঠে গমনটিই বলি।

রাজা ওধার হতে তারিফ রাখেন, বলিহারি বলিহারি।

প্রসাদ সুমুখে দু'হাত মেলে দেন।

আজ্ঞা কর ত্রিনয়নে।
যাব হে একাম্রবনে।।

কাশী হৈতে হৈল কাশীনাথের আদেশ।
একাম্রকাননে মাতা করিল প্রবেশ।।
চরাইতে ধেনু বেণু দান দিল ভব।
অধরে সংযোগ করি ঊর্ধ্বমুখে রব।।
সুরভির পরিবার সহস্রেক ধেনু।
পাতাল হইতে উঠে শুনে মার বেণু।।

অযোধ্যা বিলম্ব করেন না তিলমাত্র। সঙ্গে সঙ্গে সুর ধরেন,

না জানে পরমতত্ত্ব, কাঁটালের আমস্বত্ত্ব,
মেয়ে হয়ে ধেনু কি চরায় রে।
তা যদি হইত, যশোদা যাইত,
গোপালে কি বনে পাঠায় রে।।

রাজা মুখ হতে সটকা সরিয়ে বলে ওঠেন, বোঝা গেল বিষয়টি। আর ঝামেলিতে কাজ নেই। যে যার ভাবে থাকো বাছা। প্রসাদ, তুমি কালীর কথাই কও।

রামপ্রসাদ মৃদু হাস্যে গান ধরেন,

ডুব দে রে মন কালী বলে
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।
রত্নাকর নয় শূন্য কখন,
দু-চার ডুবে ধন না পেলে,
তুমি দম-সামর্থ্যে এক ডুবে যাও
কুলকুণ্ডলিনীর কূলে।।

অযোধ্যা ঝটিতি জবাব রাখেন,

ডুবিস নে মন ঘড়ি ঘড়ি।
দম আটকে যাবে তাড়াতাড়ি।।
একে তোমার কফো নাড়ি,
ডুব দিও না বাড়াবাড়ি।
তোমার হলে পরে জ্বরজাড়ি মন,
যেতে হবে যমের বাড়ি।।
অতি লোভে তাঁতি নষ্ট,
মিছে কেন কষ্ট করি।
ও তুই ডুবিস নে মন
ধর্ গে ভেসে,
শ্যাম কি শ্যামার চরণতরী।।

রামপ্রসাদ হাসি মুখেই কন, বেশ কথা। তাহলে তুমি যখন আমার অতি লোভের কথাই কইলে তাহলে আমি কালী ভক্ষণের গানই গাই।

এবার কালী তোমায় খাব।
খাব খাব গো দীন দয়াময়ী

তারা গণ্ডযোগে জন্ম আমার।
গণ্ডযোগে জনমিলে,
সে হয় যে মা খেকো ছেলে,
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা,
দুইটার একটা করে যাব।।

অযোধ্যার মুখে মৃদু কটাক্ষ,

সাধ্য কি তোর কালী খাবি।
ও যে রক্তবীজের বংশ খেলে
তার মুণ্ডমালা কেড়ে নিবি।।
সর্বাঙ্গে নয় উভয় গালে, ভুষো কালি মেখে যাবি।
আবার কালে রে দেখাতে কলা
নিজে যে কলা দেখিবি।।

সভাময় সাধু সাধু রব ওঠে। সেই সঙ্গে করতালি। রাজা হেসে কন, খাওয়া খাওয়ি তো বিস্তর হল। এবার একটু তত্ত্ব কথা হোক না কেন।

প্রসাদ,

মন রে আমার এই মিনতি।
তুমি পড়া পাখি হও, কবি স্তুতি।।
যা পড়াই তাই পড় মন,
পড়লে শুনলে দুধিভাতি।
ওরে জান না কি ডাকের কথা,
না পড়িলে ঠেঙ্গার গুঁতি।।

অযোধ্যা জবাব দেন,

হয়ো না মন পড়া পাখি।
ওরে বন্দী হলে হয় না সুখী।।
পাখি হলে তত্ত্ব ভুলে
দিন যাবে পিঞ্জরে থাকি।
তুমি মুখে বলবে পরের বুলি,
পরম তত্ত্বের জানিবে কি।।
ভক্তি গাছে মুক্তি ফলে
সে ফল উড়ে খাও গে দেখি।
খেলে মায়ার ফাঁদে পড়বে না আর,
শমন ব্যাধে দিবে ফাঁকি।।

এই সঙ্গীত সমর সভায় যে বৈষ্ণবরা রীতিমতো দলে ভারী, তা বোঝা যায়। সভামধ্যে বিনি টিকি-তিলকসেবা ও সটিকি তিলকধারীগণ হু দিয়ে ওঠে। সে সমবেত উল্লাসে চন্দ্রাতপের সমীপস্থ বুনো বাদাড়ে শৃগালদলও রব দেয় ঘন ঘন। পেঁচাগণ সামাল দেয়

কর্কশা স্বরে। এমনকী একজন হনুমানও গম্ভীর হুম হুম ধরে। রাজা দু'হাত তুলে বলে ওঠেন, দিব্য জমেছে আসর।

কয়েকদিনের মধ্যেই আমাদের চৌধুরীপাড়ার বাড়িটার নাম হয়ে গেল 'টেলিফোন বাড়ি।' রাস্তার ধারের যে কোনও বাস স্টপে আমাদের বাড়িতে নতুন আসন্তি কোনও মানুষজন রিকশায় উঠে বসতেই চালক দু'কথায় বলে দেয়, টেলিফোন বাড়ি যাবেন তো? বাবা বাড়ি থেকে টেলিফোনে কাউকে এ বাড়ি আসার পথ নির্দেশ দিচ্ছে খাসা, 'বকুলতলা বাস স্টপে নেমে ইলেকট্রিক তারের নীচ দিয়ে একজোড়া তার বয়ে গিয়েছে। ওটার দিকে চোখ রেখে হাঁটুন। কোথাও এঁকবার বেঁকবার দরকার নেই। ওই তার দুটো যে বাড়িতে ঢুকেছে ওটাই আমাদের বাড়ি। হলুদ রঙা তেতলা বাড়ি।'

এই বিবরণ শুনে কত মানুষ যে আমাদের বাড়িতে আসে। কেন না এ বাড়িতে আমার দাদুর কারণে লোক আসার কামাই নেই। রাজ্যের ছাত্র আর পরিচিতজন। বিশেষ করে রোববার তো কথাই নেই।

এ বাদে নতুন ব্যাপার হল দিনরাত টেলিফোন করতে আসা মানুষজন। এ তল্লাটে এ বাড়ি ছাড়া কেবলমাত্র পোস্টাপিসে ফোন আছে। এখানে এলে বিনি পয়সায় ফোন। তার ওপর সময় আমাপা। পাড়ার ভীম দাদুর বেয়াই এক বৃদ্ধ একদিন ফোন করতে এসে বাজখাঁই গলায় সমানে চিৎকার করে যাচ্ছেন, হ্যালো, মায়ের খেলা? মায়ের খেলা?

অনেক পরে বোঝা গেল, ওটা হল বাড়িটার নাম। আমার মনে কূট প্রশ্ন হল, তাহলে কোনও বাড়ির নাম তো 'বাবার হাসি' হতেই পারে।

ও বাড়ির মহা কেপ্পন তুলসী জ্যাঠামশাই প্রায়ই বাইরের ঘরের জানলায় উঁকি দিয়ে একটি বাতাবি লেবু তুলে ধরেন। নারকোল নাড়ু মার্কা গোল গোল চক্ষু। মাথায় কদম ছাঁট চুল। চিটচিটে ময়লা একটি না ধুতি না লুঙি মালাইচাকি অবদি কোনওমতে পরা। শীর্ণ খালি গা। বুকের ওপর আড়াআড়ি কাছির দড়িবৎ ময়লা হাফ পৈতে। ভাটপাড়ার বামুনদের নাকি পৈতে অমন ছোট হয়। তুলসী জ্যাঠামশাইরা আদিতে ভাটপাড়ার বামুন। কলকাতা কর্পোরেশনে চাকরি করেন। ভারী বাতিক আছে। একমাত্র ঢ্যাঙাপানা ফর্সা চিকন ছেলেকে স্কুলে পড়তে দেননি। কারও সঙ্গে মিশতেও দেন না। ফণীদা বাল্যকাল হতে বাবার মতো হেঁটো ধুতি আর নীল শার্টধারী। ছেলেকে বগলদাবা করে পথে বেরলে, এ্যাঃ এখেনে গু, এ্যাঃ ওখেনে ময়লা—এই করে হনহনান টপকে টপকে। ফণীদা বাবার মতোই নাড়ু চোখো আর বুরুশ ছেঁটো। বাড়িতে মাস্টার পড়াতে এলে মা বাইরে বসে পাহারা দেন ঘড়ি ধরে। মাস্টার চা পায় না, চল নেই বলে। মা পাড়ায় বলে বেড়ান, ছেলের হাতের লেকা কী। একেবারে ছাবা।

বোঝা যায় প স্থানে ব। যেমন বোঝা যায় জ্যাঠামশাইয়ের হাতে জানলার ওপারে বাগানের বাতাবি প্রদর্শন মানে টেলিফোন করা। তাঁর পরের দু'ভাই পার্বতী জ্যাঠামশাই আর বিষ্টু কাকা এই বিশাল পৈত্রিক অট্টালিকায় আলাদা হাঁড়ি, আর এক এক রীতির। পার্বতী জ্যাঠা হুকুমচাঁদ জুট মিলে কাজ করেন মিস্তিরির। ওঁর হাতে নাকি মেশিনে ফুল ফোটে। মরা যন্ত্র কথা কয়। দোতলায় ওঁর প্রকাণ্ড ঘর এক আজব কারখানা। তার কারণ হল, ওঁর ঘড়ি বিদ্যা। ঘরময় রাজ্যের পুরনো আলমারি। আলমারি ঠাসা কত কিসিমের

ঘড়ি। তাছাড়া এ ঘরের চার দেওয়ালে যে কত ভঙ্গির কত প্রকারের ঘড়ি টাঙানো। উনি আসলে ঘড়ির জাদুকর। রোগা পাঁকাটি আড়া, খালি গায়ে বেঁটে পৈতে, কাঁচাপাকা খোঁচা চুল, নাকের নীচে চৌকোনা গোঁফ, আর সর্বদাই নস্যি নাকে উঠছে। ট্যাকে বিতিকিচ্ছিরি ময়লা নস্যি আঁকা কাপড়ের খণ্ড। দিনের বেলাতেও অন্ধকার ঘরে টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে এক চোখে লম্বা নল অবস্থায় হঠাৎ মুখ তুলে চাইলে পিলে চমকায়। চোখের ওপর এক চোখে নল চক্ষু চাউনি যে কী সাঙ্ঘাতিক।

সবার ছোট বিষ্ণুচরণ, আমাদের বিষ্টুকাকা ভারী প্রিয় আমাদের। স্কুলে ভালো ছাত্র ছিলেন। ম্যাট্রিকে দারুণ রেজাল্ট সহ ইতিহাস। কলকাতা কর্পোরেশনে চাকরি। আর গলা ছেড়ে রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করেন খোলা ছাদে দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্না রাতে, এ কথা জানিতে তুমি ভারত ঈশ্বর শাজাহান...। প্রায়ই অফিস ফেরতা আমাদের বাড়ি ঢুঁ দেন। মা অমনি চা দেয়। নিমকি বা বিস্কুট। বিষ্টুকাকাকে ঘিরে আমরা গল্প শুনতে বসি। বেশিরভাগই ভূতের গল্প। বাইরে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। নারকোল পাতাগুলো চকচকে দুলছে বাদুলে হাওয়ায়। বাড়ির আনাচে কানাচে ছ্যাঁক ছ্যাঁক অন্ধকার। গুবরে পোকার গোঁওওও—তারপর ঠকাস গোঁত্তা। বিষ্টুকাকা বলে চলেছেন, পোড়ো বাড়িটার দোতলার বারান্দায় ঝম ঝমাঝম ঘুঙুরের শব্দ হয় মাঝরাতে। হ্যাঁ, রোজ হয়। তবে সেই বাড়িটা তো এখন সারাই করিয়ে প্রায় নতুন। আসলে তোমাদের এই বাড়িটা তো অনেক পুরনো। এটা তো এককালে জমিদার বাড়ি ছিল। আর এ বাড়িতে তিন তিনটে অপঘাত আছে। একটা তোমাদের তেতলার চিলে কোঠায়। ওখানে এক বউ বিষ খেয়ে মরে। দ্বিতীয়টা হল দোতলায় তোমাদের দাদুর ঘরে। ওখানেও এক বউ কড়িকাঠে গলায় দড়ি দেয়। আর তিন নম্বরটা হল নীচেকার ভাঁড়ার ঘরে। তিনিও মহিলা। তবে কি না গায়ে আগুন দিয়ে। লোকে বলে--এ বাড়িতে নাকি অভিশাপ আছে।

আমি বলি, অভিশাপ কেন?

বিষ্টুকাকা ফুঁউউস করে নস্যি নেন। তারপর বলেন, তিন তিনটে অপঘাত তো। তাছাড়া, শোনা যায়, জমিদারি আমলে এ বাড়িতে কিছু গুম খুনও ঘটেছে। হুঁ, তোমাদের ওই তেতলায় আন্ডার গ্রাউন্ড কুঠুরিতে। কাকে যেন ওর মধ্যে পুরে নির্জলা ফেলে রেখে দেওয়া হয়েছিল। ফলে মৃত্যু। এইরকম বহু কাণ্ড এ বাড়িতে হয়েছে। কত জনার দীর্ঘশ্বাস যে বাড়ির ছত্রিশ ইঞ্চি দেওয়ালে লেগে আছে।

ভাই মলয় তো প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা। সেবার মুখে বাক্য নেই। ঘরের কোণ থেকে বড় মা গলা তুলে বলে, অ ভাই বিষ্টু, এ বাড়িতে ওনারা এখন আর কেউ নেই। কত ঠাকুরের নাম হচ্ছে যে।

'আমি অনেক মূর্ত প্রেতাত্মা দেখেছি এবং তাদের সঙ্গে কথাও বলেছি। এমন অনেক প্রেতাত্মার সঙ্গে আমাব দীর্ঘ কথোপকথন হয়েছিল যারা টিনের শিঙার মধ্য দিয়ে কথা বলেছিল, আর তাদের আমি প্রশ্নও করেছি।'

স্বামী অভেদানন্দর সেই লুকিয়ে পড়া বিচিত্র বইখানা আমার মনে চাগাড় দেয়। রহস্য ছমছমে করতলে ধরে রাখা আঁকা বাঁকা আগুনের শিখা আঁকা সেই বইয়ের মলাট। দেখলে মনের মধ্যে কি যে হয় তা জানি না। তবে ভয় করে না। তার বদলে কীরকম ধুপ ধুনোর গন্ধ আর সঙ্গে চন্দনও টের পাই।

চারধারে গাঢ় কুয়াশা। তার মধ্যে খাঁ খাঁ মাঠ ভেঙে একজন মানুষ সামনে একটুখানি ঝুঁকে হাঁটছে। হেঁটেই চলেছে। কিন্তু সে কিছুতেই মাঠখানা পেরতে পারছে না। পেরিয়ে সামনে পৌঁছতে পারছে না। দূর থেকে তার মুখখানা দেখা যায় না। শুধু আদলটি বোঝা যায়। থেকে থেকে তার মাথার পেছনে দপ করে একটা লাল টকটকে আলো ঝলসে উঠছে। আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। লোকটার হাতে একটা লাঠি। তাতে ভর দিয়েই সে হাঁটছে। অনেকটা কলকাতায় বাবার সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে দেখা গান্ধীর খর কালো রঙা স্ট্যাচুর মতো। গান্ধীও তো শুনেছি অপঘাতে মারা গিয়েছিলেন।

নিতাই কাকা যে এতক্ষণ চুপ করে ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে বিষ্টুকাকার গল্প শুনছিল তা আমরা কেউ খেয়াল করিনি।

সে হঠাৎ বলে ওঠে, আছেই। এ বাড়িতে আছে। আমি একদিন দেখেছি।

বিষ্টুকাকা চোখ ঘোরান, কী দেখলে শুনি।

নিতাই কাকা সামনে এগিয়ে আসে। তারপর কীরকম স্যাঁতসেঁতে গলায় বলে, সেদিন সন্ধেবেলা বারান্দায় ঢুকে দেখি বউদি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। আমার কী দরকার ছিল। ডাকলাম—বউদি, অ বউদি। কোনও সাড়া দিল না। আমি পেছু পেছু উঠছি আর ডাকছি—বউদি বউদি। বউদি দোতলা বেয়ে তেতলার সিঁড়িতে উঠলেন। আমিও। যত ডাকি, কোনও জবাব নেই। এবার বউদি তেতলার ঘরে যেয়ে ঢুকল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে পড়লাম। বউদি ছাদে চলে গেল। তারপর বাস, আর নেই। কোথায় হাওয়া হয়ে গেল।

টেলিফোনটা ঝনঝনিয়ে বেজে উঠল। মলয় আমার দিকে ঝুঁকে বলে, দাদা, তুই ধর। আমায় ভয় করছে।

আমি বলি, কেন?

—যদি ওদিক থেকে নাকি সুরে কেউ কথা বলে।

ধুম বৃষ্টিতে বাইরে কড়কড়াত বাজ পড়ে। আমি উঠে গিয়ে ফোন কানে দিয়ে বলি, হ্যালোও।

ওধার থেকে কেউ কোনও কথা বলে না। ফোনের মধ্যে একটা ঝোড়ো দীর্ঘ নিঃশ্বাস কেবল শুনতে পাই।

একান্ন

সারারাত বৃষ্টি তাণ্ডবের মাঝখান দিয়ে গত রাতের টেলিফোন বেয়ে আসা ঝোড়ো দীর্ঘশ্বাসটি আমাকে ছেড়ে যায়নি। ঘুম চমকে চমকে আমি টের পেয়েছি বাইরে প্রবল ঝড় বাদলের মধ্যে কে যেন আমার কানের ভেতর দিয়ে অমন টানা লম্বা শ্বাস বইয়ে চলেছে। তাকে চোখে না দেখলেও ধরতে পারি সে ভারী দুঃখী আর বেদনার পাহাড়।

সকাল হতেই ছাতা মাথায় জল ভেঙে নারায়ণ কাকা এসে উপস্থিত। মাথা বোঝাই এলোমেলো চুল। টানা চক্ষু। আর মুখময় ঘন কালো গোঁফ-দাড়ি। হঠাৎ দেখলে সাধুসন্ত মনে হতে পারে। পরণে যথারীতি ধুতি শার্ট। জল ভেঙে এসেছেন বলে বুঝি খালি পা। আর এক হাতে একটি জ্যান্ত কই মাছ। বানের জলে রাস্তায় উঠে পড়া মাছটি নিয়ে এসেছেন। নারায়ণ কাকার কি মধুর আর উদাত্ত গলা। গান গাইতে গাইতে আসেন।

আবার চলে যান গাইতে গাইতে। এখন গাইছেন, রজনী গো—যেও না চলে, এখনো যায়নি লগন—

কাকা আমার বাবার সঙ্গে টেলিফোন দপ্তরেই চাকরি করেন। বিয়ে-থা হয়নি। নবনগর কলোনিতে নিবাস। আর ভারী উদাস স্বভাব। আমার জানা ছিল উনি প্ল্যানচেট করেন। কাগজে কলমে প্রয়াত আত্মার সঙ্গে বাক্য চালাচালি করেন।

নারায়ণ কাকা যত না কথা বলেন তার চেয়ে বেশি হা হা করে হাসেন। এমন হাসিওয়ালা মানুষ আমি খুব কম দেখেছি। সর্বদাই আনন্দে আছেন। কোনও বিকার নেই। হাসেন আর দাড়িতে হাত বুলোন। গোঁফে আঙুল দিয়ে পাকান।

আমি একপাশে কাকাকে ডেকে নিয়ে গতরাতের ব্যাপারটা বলি। আর বলি, একদিন প্ল্যানচেট করবেন আমাদের বাড়িতে।

কাকা শুনে একটু গম্ভীর হয়ে যান। তারপর আবার যথাপূর্বং হেসে উঠে বলেন, সে হবে এখন।

একটু পরেই রিকশা করে ভিজে জাব অবস্থায় আমার মিলা মা'র বাবা-মা, দাদু পূর্ণচন্দ্র পারুলবালা এসে উপস্থিত। কানুটি দাদুর হাতে মণিমান্নার রসগোল্লার হাঁড়ি। এই হাঁড়ির তলাকার বিঁড়েটির প্রতি আমার অতি লোভ। আমার মূর্তি গড়ার বাক্সে রেখে দিই। কত কাজে লাগে যে। মা রেগে বলে, কি আদাড়ে স্বভাব। যত হাবিজাবি জিনিস নিয়ে টানাটানি।

কানুটি আমার বাঁ কান ধরে বলে, এবার তোমাব মাথা নেড়া আর কান ছিদ্র।

—কেন কেন!

—বাঃ, তোমার উপনয়নের ব্যবস্থা হচ্ছে যে।

—মানে পৈতে!

—হ্যাঁ। তুমি এবার দ্বিজ হবে। দ্বিতীয় জন্ম হবে তোমার। আমার মনে অমনি নারায়ণ কাকার প্ল্যানচেট চিড়িক্ দেয়। আত্মা, পুনর্জন্ম এই সব কত ঘোঁট পাকানো ব্যাপার সেই বইয়ে লেখা আছে। আমি বোকার মতো পড়ি। কিন্তু সবটা ধরতে পারি না। যেমন পড়ি দাদুর আলমারিতে রাখা সেই কবেকার পুরনো জাবদা বাঁধানো পত্রিকায় ধারাবাহিক উপন্যাস 'কালিন্দী'। লেখাটা সম্পূর্ণ নেই। শেষের অনেকগুলো কিস্তি কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। তবে লেখকের নাম যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, এটা মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। লেখার আমি কি বুঝি। তবে এটা বুঝি, পড়তে ভালো লাগে। বিশেষ করে কালিন্দীর বর্ণনা অংশগুলো। এমনই লুকিয়ে পড়ে ফেলি আলমারিতে রাখা বাবা-মা'র বিয়ের উপহার। কান্তিচন্দ্র ঘোষের 'ওমর খৈয়াম', প্রবোধকুমার সান্যালের 'প্রিয়বান্ধবী' ইত্যাদি। ওখানে একখানা বাৎসায়নেব কামশাস্ত্রও আছে। সে খুব ভজখট ব্যাপার। বই বোঝাই মন্দিরের গায়ে খোদাই করা কবেকার মানুষদের সব আহ্লাদি আর অচেনা চিত্র। তবে আর একখানা বই আমায় পাগল করে দেয়। বারবার পড়ি। যখন তখন পড়ি। বিশেষ করে বাড়িতে বাবা-মা'র ঝগড়া অশান্তি হলে। সেটা হল 'পথের পাঁচালি'। এই একমাত্র বই, যা পড়ে আমার লেখকের ছবি দেখতে ভারি সাধ হয়। মনে হয় বইখানার লেখক একেবারে আমার সমবয়সী। তবে দাদুর কাছে শুনেছি তিনি আর বেঁচে নেই। অকালে চলে

গিয়েছেন। প্ল্যানচেটে তাঁকে একবার ধরতে হবে। জিগ্যেস করব, সত্যিকারের অপু কে? সে কোথায় থাকে এখন?

কানুটি দাদু ভেজা প্যান্টশার্ট ছেড়ে একখানা ধুতি পরে আমার পিতামহর সঙ্গে গপ্পে বসে যান। বাবা কেবল্ ফল্ট থাকায় বাইরে। মা আর দিদিমা রান্নাঘরে। ভাইটি হেঁট মুখে কুটনো কাটছে।

এদিকে বৃষ্টি ছেড়ে যায়। হঠাৎ দিদি এসে বলে, চলো তো ভাই। তোমাদের পুকুরধারে আমায় একবার নিয়ে চলো।

আমি আর সেবা দু'জনে দিদিকে নিয়ে পুকুরে যাই খিড়কির দোর খুলে। পাশের বাড়ির উন্মাদ জমিদার, বন্ধু সুবলের বাবা দেবেন রায়চৌধুরী পাঁচিল ধারে সদম্ভ ঘোষণা দিয়ে যান, এখনও বুঝতে পারোনি। হবির ছেলে। লক্ষ্মীঠাকুর। সব নেমে আসছে আকাশ থেকে হুঁ হুঁ। সব্বাইকে শায়েস্তা করে ছাড়বে। যতসব গেঁড়ে বেটাচ্ছেলে।

ওদিকে কলতলায় বাসন মাজুনি সরস্বতী দিদি হেসে হেসে গান গায়, নন্দর মড়া পচিবে বলে, আম গাছে ক্যাটাল হলে, পুঁটি মাছের কালিয়া হলে, শিয়াল ছ্যানার মাংস হলে। বোম ষটকে। ওই ওপাড়ার আমগাছের মগডালে গিয়ে আটকে।

দিদি পুকুরধার থেকে বেছে বেছে যে ছোট ছোট পাতাগুলো ডাঁটি শুদ্ধু তোলে তাদের নাম খারকুন। শিলে বেটে কি সব দিয়ে মাখলে ওই দিয়েই ভাত খাওয়া হয়ে যায়। বাঙাল দেশের পদ তো। দিদিমা এলে এগুলো হয়। যেমন হয় কাঁকরোলের পুর। তারপর চাল দিয়ে মোচা। আমার খাস বদ্ধমেনে দাদু এ সব ভারী পছন্দ করেন। নিরামিষাসি তো।

আমার মা'র হাতে এই রান্নাগুলো চমৎকার খোলে। আমি ভাবি, আমার মিলা মা কোন পদ্মাপারের ফরিদপুর জেলার মাদারিপুর মহকুমার মাওইসার-এ জন্মে কোথা থেকে কোথায় এল। শোনা আছে, সেই নদী-নালা-খাল-বিলময় দেশটি একেবারে সাজানো সবুজ। সেই দেশে মা'র জন্মের খবর পেয়ে দাদু স্ত্রীকে পত্র লিখলেন ঘটি, বাটি, হাঁড়ি, লতা, পাতা সব দু-অক্ষরের ডাক নাম দিয়ে। তার মধ্যে মিলা নামটিও ছিল। এবার তোমার যেটি পছন্দ তুলে নাও। দিদি তুলে নিল 'মিলা' নামটি। অবিশ্যি মামার বাড়িতে এই মিলাকে সবাই মিলন বলে ডাকত।

এই মিলার গলায় প্রায় জন্ম ইস্তক গান। রিনরিনে সুরেলা কণ্ঠ! যে কোনও গান এক দেড় শুনলেই তুলে নেয়। কানুটি দাদু নিজে না গাইলেও গান পিপাসু। বিশেষ করে ক্ল্যাসিকাল সঙ্গীতের। বাবা মেয়ের গুণ দেখে একদিন কলকাতার সাহেব বাড়ি থেকে একখানা হারমোনিয়াম বানিয়ে আনলেন। তখন মেয়ের বয়েস সাত। কাঁচরাপাড়া বাবু ব্লক রেল কোয়ার্টারে গান শেখাতে আসতেন এক সুধীরবাবু। রোজ ভোর থেকে রেওয়াজ চলল বাবার নিয়মে।

বাবা বদলি হলেন এলাহাবাদে। সেটা বছর এগারো-বারো বয়েসের কথা। সেখানে যে গুরু মিলল তিনি জীবনধন মজুমদার। মস্ত বাড়ি। আর বাড়ি শুদ্ধু গাইয়ে-বাজিয়ে-নাচিয়ে। জীবনবাবুর বাড়ি যেতে হত রাত থাকতে। শীতের অন্ধকার কুয়াশার ভেতর দিয়ে সাঁতরে চলেছে আমার ছোট মা। সঙ্গে বাবা কিংবা জ্যাঠতুতোদাদা বকি। নিচের হলঘরে জাজিম পাতা। চারধারে সেতার, তানপুরো, সরোদ, বেহালা—কি

নেই। মিলা হারমোনিয়ামে রেওয়াজ করছে চোখ বুঁজে একা। মাস্টারজি একটু পরে নামবেন। হঠাৎ তবলা সঙ্গতের আওয়াজ। মিলা গাইতে গাইতে চোখ খুলে দেখে জীবনবাবুর জ্যেঠিমা এসে তবলা ধরেছেন গানের সঙ্গে। গাঁট্টাগোঁট্টা শালওয়ার কামিজ। জীবনবাবুর বুড়ো বাবা ভালো নৃত্য শিল্পী আর কচি কচি দেখতে। একদিন রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলেছেন আনমনা। অমনি এক টাঙাওয়ালা ধমকে বলে, এ লৌণ্ডে, হট যা। এই নৃত্যশিল্পী বাবার স্ত্রী, ওস্তাদের মা চমৎকার সেতার বাজান।

এই বালিকা ছাত্রীকে জীবনবাবু বাবার আপত্তি সত্ত্বেও জোর করে নাম দেওয়ালেন এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া মিউজিক কমপিটিশনে। সেই কঠিন শীতের সন্ধ্যায় মস্ত হলে কেবল মাথা আর মাথা, অন্ধকারে স্থির হয়ে আছে। মস্ত স্টেজের মাঝখানে হারমোনিয়াম পেড়ে মিলা বসে দেখে স্টেজটা কতক হলের মাঝখানে। তার চারপাশে চেয়ার পেতে বসে ডাক সাইটে বিচারকগণ। মেয়ে চোখ বুঁজে গান ধরল। খেয়াল। রাগ, আড়ানা। সঁইয়া, যা রে বালম পরদেশ। তবলায় মাস্টারমশাই। যেহেতু তার স্বভাবই চোখ মুদে গান করা তাই চারপাশে আর সামনে এত মানুষ রইলেও সে ভারী একা। অতএব ওইভাবেই একা একাই গান শেষ করল মেয়ে। শেষ হল তুমুল করতালিতে। মেয়ে তটস্থ। বিচারকদের দিকে না তাকিয়েই ছুট্টে উঠে গেল। তারপর বাবার হাত ধরে সিধে বাড়ি। পরদিন শহরময় মৃদুলার নাম। কি গেয়েছে বাচ্ছাটা! কিন্তু হারমোনিয়ামে গেয়ে প্রথমেই পঁয়তাল্লিশ নম্বর বাদ। সে আসরে প্রধান বিচারক ছিলেন ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেব।

যেহেতু রাজ ঘোষণায় দিব্য জমেছে বাদ প্রতিবাদী গানের আসর, এবং ইতিমধ্যেই বিস্তর প্যালা পড়েছে সামনে তাই প্রসাদ আজুর সহজে বিরাম হয় না। প্রসাদী গীতের ঘাত ফিরে আসে অযোধ্যার প্রতিঘাতে। সুর ও বাণীর মিঠা মন্দ সমরে এ সভা উতরোল হয়ে ওঠে। ভিতরে ভিতরে চাপা বিসম্বাদ বৈষ্ণব-শক্তি হয়ে চললেও কাব্য আর গীত সুধাই এখানে প্রবল হয়ে দাঁড়ায়।

ঢুলকি রামতনু চতুর্গুণ উৎসাহে তেড়ে ফুঁড়ে বসে। নিকাজি ভজহরি ঘন ঘন মাথা নাড়ে আর কাঁধের গামছা দিয়ে মুখ থেকে উত্তেজনা মুছতে থাকে।

রামপ্রসাদ তনুর দিকে ফিরে বলেন, কষে ধরুন দিকি একতালা।

রামতনু হেসে কন, একতালা থেকে তিনতালা, যা খুশি ধরো ভাই।

প্রসাদ দু-হাত উর্দ্ধে তুলে ধরেন।

—আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালীকল্পতরুতলে রে মন চারি ফল কুড়ায়ে খাবি।।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
ওর বিবেক্ নামে জ্যেষ্ঠপুত্র, তত্ত্ব কথা তায় শুধাবি।।
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর পিতা মাতায় তাড়য়ে দিবি।।
যদি মোহগর্তে টেনে লয়, ধৈর্য্য খোঁটা ধোরে রবি।
ধর্মাধর্ম দুটো অজা, তুচ্ছ হাড়ে বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ তবে, জ্ঞান খড়্গে বলি দিবি।।

এই গীতটির দুয়ারে এসে অযোধ্যানাথ কিঞ্চিৎ থমকে যান। শান্ত হয়ে পড়ে এতক্ষণের ব্যাকুলিত সভা। ঘন ঘন করতালির বদলে এখানে এই গীত সমাবেশ সকল শ্রোতার অস্তিত্বে স্নিগ্ধ উদাস বুলিয়ে দেয়। প্রকৃতার্থে কারও কোনও শরীরি উল্লাস ঘটে না। রাত্রির এই শিথিল অবসরে বাইরের বন্য রহস্যময়তার গায়ে লেশমাত্র আঁচড় পড়ে না। এমনকী প্রাহরিক শৃগালেরাও রব দিতে ভুলে যায়।

অযোধ্যানাথ শুধু নিজেকে শোনানোর কায়দায় বলেন, এর পরে আমি কি বলি। কি বা বলার থাকতে পারে। কিন্তু তবু তো বলতেই হবে।

কৃষ্ণচন্দ্র আজুকে বলেন, কি হল। বিবাদী গীত কোথায়?

আজু সপ্রতিভ স্বভাব মুখে টেনে নেন। তারপর মাথা দুলিয়ে গান ধরেন—

কেন মন বেড়াতে যাবি।
কারও কথায় কোথাও যাসনে রে তুই,
মাঠের মাঝে মারা যাবি।।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি রে মন নিজে কভু না চিনিবি।
ও তুই মদের ঝোঁকে কর্তে পারিস
মাঝ গাঙ্গেতে ভরা ডুবি।।
বাঁশবনে গিয়ে ডোম কানা হয়।
এ তত্ত্ব কবে বুঝিবি।
শেষে কলাতরুর তলায় গিয়ে
কি ফল নিতে কি ফল নিবি।।

কোথায় যেন সুর ও বাণীর বাঁধন ঘটল না। কেমন করে যেন কথা ও সুরের গাঁট নিছক ভক্তিরস, জ্ঞানভক্তি আর কৌতুক রসের উর্দ্ধে উঠে বিরাজ করে। সেই গীতাবলি প্রচ্ছন্ন নিরাকার অবয়ব ধারণ করে এই সভা শামিয়ানার বহু উচ্চে প্রসারিত আকাশকে ডাক পাঠায়। মেঘাবৃত আকাশের বাসিন্দা, আপাতত বিলীন, গ্রহ তারকা নিয়ে, চকিত বিস্ময়ে ভাবে এ সংসারের অতীত বুঝি আরও এক সংসার মণ্ডল আছে এ ত্রিলোকের কোনও একখানে।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মৃদু স্বরে কথা বলেন, বেশ হল। দিব্য হল। কিন্তু প্রসাদ, আর যুদ্ধ-বিবাদের নাট্য নয়। এ দেশ এখন সে কথা বলছে না। অতএব আমার অনুরোধ, এবার তুমি একখানি গীত দিয়ে আজকের আসরের দাঁড়ি টানো। তারপর আর কোনও গীত হবে না।

রামপ্রসাদ সিধে রাজার চোখের প্রতি চোখ রাখেন। কৃষ্ণচন্দ্র দেখেন কবির চোখের ভিতর কি এক নিদারুণ অথচ বিপন্ন আগুন ধক ধক করছে। কোথায় যেন খানিক সহায়হীনতাও। এর সঙ্গে রাজার পরিচয় নেই।

রাজা শুধু চেয়ে রন। কোনও কথা বলেন না। আসলে এ মুহূর্তে চরাচরে কোনও কথার অবকাশ নেই। এই বায়বিয় নিরবকাশের সর্বাঙ্গে কোথাকার কোনও অলীক উত্তাপ কঠিন হয়ে আছে। শীতলতার আকার যদি তুষার হয় তাহলে তাপের নিশ্চয়ই ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি। আগুনে শীতলে প্রত্যক্ষত কোনও নাদ না বইলেও রামপ্রসাদেব উচ্চগ্রামী

কণ্ঠে তো তার মূর্তি ফোটে। তাই হয়। প্রসাদ চোখে মুখে আপনার বুকের কন্দরে গান খোঁজেন।

ও কার রমণী
সমরে নাচিছে।
দিগম্বরী দিগম্বরোপরি
শোভিছে॥
তনু নব-ধারা-ধর
রুধির-ধারা নিকর,
কালিন্দীর জলে কিংশুক ভাসিছে॥
বদন বিমল শশী, কত সুধা ক্ষরে হাসি,
কালরূপে তমোরাশি রাশি নাশিছে।
কহে কবি রামপ্রসাদে, কালিকা-কমল-পদে,
মুক্তিপদ হেতু যোগী হৃদে ভাবিছে॥

গান ফুরোয়। যে গীতখানি মনের কন্দরে নির্বাপিত ছিল, এইমাত্র তা মোচনের পথ পেয়ে যায়। অনুভবের দুয়ারে যে কবিতাখানি মাথা হেঁট করে ছিল এখন তা অন্দরে ঢোকার মোক্ষ পেয়ে যায়। এমন ঘটনা কবির কাছে নতুন নয়। সেই পরিচিত স্বভাবের কথা রাজার কাছে এ মুহূর্তে প্রকটিত হয়ে যায়। গুণগ্রাহী রাজন সেই ভাবের সুগন্ধ বুঝে নেন মর্মে মর্মে। তিনি দু'হাত তুলে মন্দ্র কণ্ঠে বলে ওঠেন,

স্বানুভূতাববিশ্বাসে তর্কস্যাপ্যনবস্থিতঃ।
কথং বা তার্কিকমমন্যস্তত্বনিশ্চয়মাপ্নুয়াৎ।।

তর্কের উন্মাদনায় পড়ে অনুভূতিকে কখনও দূরে ফেলতে নেই। অনুভূতিকে ত্যাগ করলে কোনও তত্ত্বই ঠাওরানো যায় না। গানের প্রাণ হল অনুভূতি।

রামপ্রসাদ দু'হাত জোড়ে অভিবাদন জানান রাজাকে।

রাজা বলেন, রামপ্রসাদ, আমি তো তোমার মতো শিল্পী নই। আমার কোনও দৎ-কলম নেই। যা আছে তা হিসাবের আঁক কষে। তোমার পারা বেহিসেবি মানুষ সংসারে যে বিরল। তাই আমি তোমার ঠাঁয়ে অপরের রচা শ্লোক কপচাই। এ ভিন্ন আর কি বা করতে পারি।

লজ্জিত মুখ প্রসাদ শুধু বলেন, মহারাজ, আপনি যা বল্লেন, আমার সাধ্য কি তার মুখে কোনও কথা কই। আমি তো শুধু চিত্র আঁকি। কথার পরে কথা সাজিয়ে চিত্র রচি। আমি যে আর কিছুই পারিনে।

—তোমার আর কিছু পারার দরকার নেই তো। কিন্তু আমি ভাবছি একটি ভিন্ন কথা।

—আজ্ঞা করুন মহারাজ।

রাজা দু'হাত তুলে সভাস্থ সকলকে বলে ওঠেন, অদ্যকার গীতাসর তাহলে সমাপ্ত হল।

সবাই বুঝল এবার বিদায় হতে হবে। রাজা সে ইচ্ছাই প্রকাশ করছেন। সামান্য সময়ের মধ্যেই আসর ফাঁকা হয়ে যায়, রামপ্রসাদ আর সঙ্গী জোড়া ছাড়া।

রাজা হাত তুলে বলেন, প্রসাদ, নিকটে এসে বোসো দেখি।

প্রসাদ কন, রাজার ঠাঁয়ে একাসন! গোনাহ্ হবে যে মহারাজ।

—আমি তোমায় আদেশ করছি যে রামপ্রসাদ।

রামপ্রসাদ হেঁট লজ্জিত মুখে রাজার জাজিমের এক ধারে সঙ্কোচে বসেন। রাজা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে সটকা মুখে গোঁজেন। ভুড়ুক ভুড়ুক তামাক টানার শব্দে বিচিত্র মন্থরতা আর গতি একই লপ্তে রচিত হয়। আর সেই ফাঁকে রাজা বলে ওঠেন, প্রসাদ, তুমি আমার মন্ত্রীও নও শাস্ত্রীও নও। তুমি কেবলমাত্র আমার শুভকারী সখা।

প্রসাদ, আমি অতীব সম্মানিত মহারাজ।

—সখার মুখে এ কথা বেমানান প্রসাদ। আমি জানি তুমি হৃদয়বান মানুষ বলে আর পাঁচটি মানুষের চেয়ে অনেক উর্দ্ধে। আমার বর্তমান উদ্বেগ একমাত্র তুমিই বুঝতে পারবে। আমার চিন্তার ভাগীদার হতে পারবে।

প্রসাদ, কি যে বলি মহারাজ।

রাজা, তোমায় কিছু বলতে হবে না অধিক করে। এইমাত্র তুমি যে গীতখানি গাইলে তাতে করে দেশকালের বর্তমানাবস্থা খুব খাঁটিভাবে প্রকটিত হল। আমার মনে হল, এ সংসারে তোমার মতো কবিই একমাত্র বস্তুদর্শী।

প্রসাদ, মহারাজ, মিছে বলি কেমন করে। আমি কেমন যেন কতক কতক আঁচ করতে পারি। কেমন যেন হয়ে যায় এমনটি।

—হয়ে যায় মানে!

—আজ্ঞে মহারাজ, এটি আমি আপনার কাছে ব্যক্ত করে বোঝাতে পারব না। এটি একরকম প্রকৃতি দত্ত।

—প্রকৃতি দিয়েছেন!

—যথার্থ মহারাজ। যেমন করে সকাল হয়, রাত আসে, গাছে ফুল ফোটে, ফল ধরে। এই নিয়মের কোনও নিয়ম হয় কি মহারাজ?

রাজা একটি নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, তোমার অনেক গীতের মতোই তুমি ভারী আড়ে কথা কও। ধরি ধরি করেও ধরতে পারিনে।

প্রসাদ, আমি কি করব মহারাজ। আমার প্রকৃতিই যে এমন। আমাদের এই কুমারহট্ট হালিসহরের জল মাটি বাতাসের মতোই।

রাজা, তুমি তো জানো প্রসাদ, নবাব আলিবর্দী এখন শেষ শয্যে নিয়েছেন। যে কোনও সময়েই দুঃসংবাদ আসতে পারে।

—জানি মহারাজ।

—হবু নবাব—তাঁর নাতিটির কথাও তো সব জানো।

—সব জানি এ কথা বলি কি করে। তবে কি না আমার মনে হয় রাজা-বাদশা নিয়ে সংসারে বিস্তর রটনাও ঘটে। তার মধ্যে কতখানি সাচ্চা সেটি তো ভাবতে হবে।

রাজা, যথার্থ বললে। তবে কি না আমি সেই কিশোরটিকে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছি। তার সম্পর্কে বহু কিচ্ছা শুনেছি; কিন্তু কি আশ্চর্য, তার নবীন কোমল মুখখানি দেখলে সে সব কথা অতিরঞ্জন বলে মনে হয়।

প্রসাদ কন, কিন্তু মহারাজ, মানুষের মুখ দর্পণ ভাবা সহজ তত্ত্ব নয়।

রাজা, তা বটে। তবে এই কিশোরটি যে দুঃসাহসী ডাকাবুকো সে বিষয়ে আমার দ্বিতীয় মন নেই।

প্রসাদ, মহারাজ, সাহসী মানুষই তো দেশের হাল ধরতে পারে।

রাজা, অধিক সাহস চিন্তার বিষয়। কিন্তু এই সিরাজ যখন নবাবকে অভিযোগ করেছিলেন যে ঘসেটিবেগমের সঙ্গে ইংরাজদের যোগসাজোশ আছে তখন সাহেবরা তা অস্বীকার করেছিল। আসলে আমার বিশ্বাস, সিরাজ বহু আগে থেকেই ইংরেজদের পরিচয় জেনে বসে আছেন। কিন্তু বানিয়া থেকে ধরে সাধারণ মানুষ এই বানিয়াদের চিনতে পারেনি।

প্রসাদ গম্ভীর চিন্তিত মুখে বলেন, তাহলে একটি গান বলি মহারাজ। এ সময়ে এ ছাড়া আমি কি বা করতে পারি।

কৃষ্ণচন্দ্র সায় দেন, বেশ। মন যদি তাতে খানিক জুড়োয়।

প্রসাদ আবার দু'চোখ মোদেন। বুকের ভিতরে আসন্ন গীতের বুদ বুদ ধ্বনি বুজ বুজ করে। তিনি গান ধরেন।

এ সংসারে ডরি কারে
রাজা যার মা মহেশ্বরী
আনন্দে আনন্দময়ীর খাস তালুকে বসত করি।
নাইকো জরিপ জমাবন্দী,
তালুক হয় না লাটে বন্দী, মা,
আমি ভেবে কিছু পাইনে সন্ধি,
শিব হয়েছেন কর্মচারী।।
নাইকো কিছু অন্য লেঠা,
দিতে হয় না মাথট বাটা, মা,
জয় দুর্গা নামে আঁটা,
ঐ করি মালগুজারি।
বলে দ্বিজ রামপ্রসাদ, আছে এ মনেব সাধ, মা
আমি ভক্তির জোরে কিনতে পারি,
ব্রহ্মময়ীর জমিদারি।।

বাহান্ন

খোদাপাদারবিন্দভজনোপরো মাতৃতাতো মদীয়
আলীবর্দীনবাবো বিবিধগুণযুতোহল্লামুখঃ পশ্চিমাস্যঃ।
মর্ত্যং দেহং জ হৌ স্বং মুরসিদনিকটে সীরজদ্দৌলনামা
যাচেহহং মাং ভবন্তো গলধৃতবসনঃ শুদ্ধ তাং সং
নয়ন্তাম্।।

নানাবিধ গুণযুক্ত নবাব আলিবর্দী খাঁ—যিনি আমার মাতামহ—খোদার পাদপদ্মদুটিতে মন

সমর্পণ করে, পশ্চিমে মক্কার দিকে মুখ করে 'আল্লা আল্লা' এই পুণ্য নাম উচ্চারণ করতে করতে, মুরসিদের নিকটে নিজ মরদেহ ত্যাগ করেছেন। আমি সেই মহাত্মার দৌহিত্র। আমি গলবস্ত্র হয়ে আপনাদের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি—আপনারা সকলে আমার গৃহে উপস্থিত হয়ে এই শ্রাদ্ধের কাজটি যাতে শুদ্ধভাবে সম্পন্ন হয়, সে বিষয়ে আমাদের সাহায্য করুন।

দেবনাগরি হরফে রচিত শ্রাদ্ধের এই নিমন্ত্রণ পত্রখানি বয়ে এনেছে বন্দ্যো সুখময়—মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কুমারহট্ট-হালিসহরি খাস গোমস্তা। নিমন্ত্রণ পত্রের বাম কোণে সংস্কৃত ও উর্দুতে গঙ্গা কথাটি লেখা আছে। আছে আল্লাহর নাম। বন্দ্যোর খপর হল, পরলোকগত নবাবের দৌহিত্র সিরাজ কিছু নিমন্ত্রণ পত্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে পাঠিয়েছেন রাজার পসন্দ মোতাবেক বিলি-বিতরণ করতে। প্রসাদ গোড়াতেই ভাবছেন—কোথাকার পত্র কোথায় বয়ে এল।

বন্দ্যোর কথা অনুযায়ী বঙ্গেশ্বর আলিবর্দি শেষ নিঃশ্বাস রেখেছেন এই সদ্য—সালতামামি মতে ১১৬৯ হিঃ সালের ৯ই রজব, এপ্রিল, ১৭৫৬ ইং, প্রাতঃ ৫টার সময়।

এই আলিবর্দী অশীতিপর প্রায় অসাব্যস্ত শরীরে এতকাল মসনদ টেনে এসেছেন কেবলমাত্র তাঁর চরিত্র ও রাজোচিত সদগুণের মহিমায়। এই মানুষটির জীবনে রাজ্য শাসন বিষয়ে কিঞ্চিৎ ভ্রান্তির উদাহরণে সামান্য দুই এক নরহত্যা ছাড়া আর কোনও কালি নেই। ব্যক্তিগত জীবনখানিও আর পাঁচ সাত রাজা-বাদশার চেয়ে অমলিন। চিরকাল সামাজিক নিয়মে পরিণীতা ও পতিব্রতা একমাত্র ধর্মপত্নীতে অনুরক্ত থেকেছেন। এখানে তাঁর সঙ্গে নবাব মুর্শিদকুলির স্বভাবগত মিল প্রকটিত হয়। এই আলিবর্দি বস্তুত এক মনস্বী মানুষ আর তাঁর চরিত্রগুণ অপরাপর রাজ উদাহরণের পাশে মহা উচ্চ আসনি। এই নবাবের সারা জীবন ঝটিকাপূর্ণ। মারাঠা আক্রমণ, বর্গী দমন, বিদেশি বানিয়াদের কূটাঘাত আর সবশেষে আদরের নিধি সিরাজকে নিয়ে তাঁর মানসিক পীড়ন, বড় বিষবৎ অশান্ত জীবন যাপন করে গেলেন এই বৃদ্ধ।

আজ বুঝি মৃত নবাবের গুণকীর্তনের দিন। তাই গোমস্তা বন্দ্যো ক্রমাগত সেই কথাই বলে যায় নীরব শ্রোতা প্রসাদের কাছে। বলে, এই আলিবর্দী সিরাজের জন্মকাল থেকেই তার প্রতি এমন স্নেহান্ধ ছিলেন যে এক পলও তাকে কাছ ছাড়া করতেন না। সিরাজকে তিনি কাছে রেখে রাষ্ট্রনীতি, শাসনকার্য আর শাসক-অভিজাত জীবনের হরেক গুণাবলি শেখাতেন। কিন্তু ওই অন্ধ স্নেহের দৌরাত্ম্যে নাতির যাবতীয় অপকীর্তিকে তিনি যেন দেখেননি বা শোনেননি, এমন ভাব করতেন।

এখানে সামান্য এক নজির উল্লেখ্য। ১৭৪৯ সালের শীতকালে আলিবর্দী মারাঠাদের দমন করতে সিরাজকে বালেশ্বর পাঠান। সিরাজ কিন্তু নবাবের পরিত্যক্ত ও বিতাড়িত সেনাপতি মেহদি নিসারের প্ররোচনায় সজ্জন জানকীরামকে তাড়িয়ে বিহারের স্বাধীন নবাব হওয়ার চেষ্টা করেন। বাস্তবে তা অবশ্য ঘটেনি। কিন্তু এখানেও নবাব তাঁর দুর্বিনীত নাতিকে ক্ষমা করে দেন।

নবাব তাঁর এই নয়নের মণি নাতিটির বিবাহ দেন মহা জাঁক করে মির্জা ইরেজ খাঁর

কন্যার সঙ্গে ১৭৪৬ সালে। সিরাজের বাবা জৈনুদ্দিন আহমেদ নিহত হলে ১৭৪৮ এ তাকে বিহারের ছোটনবাব পদে বসান। সেখানে তাঁর সহকারী রইলেন সেই জানকীরাম। তিনিই শাসন কাজ চালাতেন সিরাজের বকলমে। এই সিরাজকে নবাব তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা দিয়ে রাখলেন ১৭৫২ সালের মে মাসে।

তবে একটি কথা সাব্যস্ত হয়ে দাঁড়ায় যে, নবীন সিরাজ রাজশাসন কার্যে একেবারেই অনভিজ্ঞ নন। দাদু তাঁকে যথাযথ তৈরি করেছেন। মাত্র ২৩ ২৪ বছরের ওই যুবক অবশ্যই বেপরোয়া আর লাগামহীন। তাঁর অনতি অতীত জীবনে তিনি মদ্যাসক্ত হলেও আলিবর্দীর মরণশয্যার পাশে বসে পবিত্র কোরাণ ছুঁয়ে শপথ করেছেন—জীবনে আর কোনওদিন মদ্য স্পর্শ করব না।

সমাজে প্রচারিত দাম্ভিক, শৃঙ্খলাহীন, নির্দয়, মতিচ্ছন্ন এই যুবক সিরাজ যে এক কথায় প্রিয় পানপাত্র বর্জন করতে পারেন, সে বা কম কথা কী। তাঁর একমাত্র দুর্বলতা কম বয়স আর অপরিণত বুদ্ধি। কথায় কথায় দিশেহারা হয়ে পড়া তাঁর স্বভাব। কে জানে, এই স্বভাবের ফল কী। কী আছে দেশের কপালে!

এখানে মনে রাখার কথা যে, আলিবর্দী ছিলেন হিন্দু প্রিয়। নিজে বিদেশি মুসলমান হলেও হিন্দুস্থানি স্বজাতিকে তিনি মনে মনে বিশ্বাস করতে পারতেন না। ফলে, অনেক হিন্দুকে তিনি গুরুতর সরকারি কাজের দায়িত্ব দিয়ে রেখেছেন। আবার অপরদিকে এই হিন্দুরা অনেকেই বেইমান। তারা তলে তলে ইংরাজ বন্দনা করে। তাদের সঙ্গে চোরাপথে যোগাযোগ রাখে।

আপাতত এই বৃদ্ধ নবাবের জরাজীর্ণ দেহ খুশবাগে তাঁর মায়ের গোরের পায়ের কাছে কবর পেয়েছে। নবাব চিরবিশ্রাম করছেন। সেই কবর ঘিরে মুরসিদাবাদের আমবাগিচা থেকে উড়ে আসা মৌমাছিরা নবাব রচিত বয়েৎ-এই তাঁর স্মৃতিগান করছে। মধুমাছিরা গাইছে, গাজিকে পায় সাহাদাৎ অন্দর তা গো পোস্ত। গাফেল্‌কে সহীদে এশক্ ফাজেল তার আজ্ দোস্ত...

গাজিরা, ধর্মের জন্য যুদ্ধ করে যাঁরা প্রাণদান করেন, তাঁরা জানেন না সংসার সমরে স্নেহের সহিত যাঁরা প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করেন, তাঁরাই শ্রেষ্ঠ বীর। শেষ বিচারের দিনে এঁদের উভয়ের মধ্যে কোনও তুলনাই হয় না। কারণ একজন শত্রু ' স্তে নিহত, অপরজন প্রাণসম বন্ধু হস্তে।

বন্দ্যো বলেন, সবই তো শুনলে প্রসাদ। এখন আমাদের ভয়ে তরাসে দিন পার করতে হবে।

প্রসাদ কন, আমার একটি শ্লোক মনে পড়ছে বাঁড়ুজ্যে মশাই।

—কী শুনি?

প্রসাদ,

রবেঃ কবেঃ কিং সমরস্য সারং
কৃষের্ভয়ং কিং কিমদন্তি ভৃঙ্গাঃ
সদা ভয়ঞ্চাপ্যভয়ঞ্চ কেষাং
ভাগীরথী তীরসমাশ্রিতানাম্।।

বন্দ্যো ভ্রূ কুঞ্চে বলেন, অর্থটা বলো দিকি। কতক কতক আঁচ করছি। পুরোপুরি ধর্তে পারছিনে।

প্রসাদ, প্রশ্ন হচ্ছে, সূর্য, কাব্যকর্তা এবং যুদ্ধের সারপদার্থ কোন কোনটি? যথাক্রমে জবাব হল, (শেষ পাদে) ভা অর্থাৎ সূর্যের তেজ, গী অর্থাৎ গদ্য পদ্য ময়াত্মক বাক্য এবং রথী অর্থাৎ যুদ্ধের সারথি।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, কৃষিকাজের পক্ষে ভয়ের ব্যাপার কোনটি?

উত্তর, ঈতি (রথী ও তীর এই দুয়ের মাঝখানের শব্দ) অর্থাৎ অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, পঙ্গপাল, মুষিক, শস্যের ক্ষতিকারী পাখি এবং যুদ্ধ করতে আসা শত্রুরাজা। এই ছয়টিকে 'ঈতি' বলা হয়।

এবার প্রশ্ন হল, ভৃঙ্গেরা কী খায়?

শেষপাদে উত্তর : রসম্, অর্থাৎ ফুলের মধু।

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তিদের সকল সময়েই ভয় হয়?

শেষপাদে উত্তর : আশ্রিতানাম, অর্থাৎ যারা অপরের আশ্রিত।

প্রশ্ন : অভয় কোন ব্যক্তিদের?

উত্তর : সম্পূর্ণ চতুর্থ পাদটি—'ভাগীরথীতীরসমাশ্রিতানাম্', অর্থাৎ পবিত্র ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত মানুষদেরই অভয়।

বন্দ্যো, খাসা ব্যাখ্যা করলে ভায়া।

প্রসাদ, তাহলে এটি প্রমাণ করা গেল যে, যেকালে আমরা গঙ্গার তীরে বাস করি, সেকালে আমাদের কোনও ভয় নেই। আমরা নিরাপদ।

বন্দ্যো সুখময় কথার মোড় ঘোরান, কিন্তু এই নতুন নবাব সিরাজ—যিনি বিনি বাধায় সিংহাসনে চড়ে বসলেন, তাঁকে নিয়ে যে দেশে কথার অন্ত নেই প্রসাদ।

প্রসাদ চোখ তুলে তাকান, শুনি। কথাগুলো দু-চার শুনি।

বন্দ্যো, এ কথা তো সবাই জানে যে আলিবর্দি খাঁর কোনও পুত্র সন্তান নেই। তাঁর তিন তিনটি কন্যে। সবার ছোট মেয়ে আমিনা বেগমের পুত্র এই সিরাজ।

দাদুর আদরে অতি অল্প বয়স হতেই যাবতীয় অপকর্মে পাকা পোক্ত। যথা কোনও রমণী হয়তো গঙ্গাস্নানে নেমেছেন। চরেরা সে খপর সিরাজকে দিল। তারপর অকস্মাৎ সেই অবলা নিখোঁজ।

সিরাজ একবার দাদু নবাবের কাছে আরজ পাঠালেন দেওয়ান মানিকচাঁদের গাড়িবারান্দা তাঁর বাড়ির সামনেই পড়ে। ফলে তাঁর বাড়ি যথাযথ খোলামেলা থাকছে না। তাই দেওয়ানজির গাড়িবারান্দা ভেঙে দেওয়া হোক। এ প্রস্তাব শুনে আলিবর্দী বলেন--তোমার বাড়ি তো মানিকচাঁদের বাড়ি থেকে চারগুণ বড। এমনিতেই তো দেওয়ানের বাড়ির আলো বাতাস বন্ধ। এমন একটি ছোট জিনিসের জন্যে বড় জিনিস ছাড়া কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

আর একদিন নাচওয়ালী ফৈজুবাই সিরাজের প্রাসাদে রাত্রি কাটিয়ে ভোররাতে নিজের কৌচে চেপে বাড়ি ফিরছে। এমন সময়ে শহরের কোতোয়াল গাড়িতে কে যায় না জেনেই বাঈজিকে গাড়িশুদ্ধ ধরে গারদে পুরে দিলেন। সকালবেলা এ সমাচার

সিরাজের কানে যেতে তিনি ক্রোধান্ধ হয়ে দাদামশাই-এর ঠাঁয়ে কোতোয়ালের নামে নালিশ করলেন। নবাব কইলেন বন্ধ গাড়িতে ফৈজু আছে না ভিন্ন কেউ সে কথা কোতোয়াল জানবেন কেমনে। কোতোয়াল যদি কাল ভোর রাতে ফৈজুবাঈকে খালাস দিতেন, তা হলে বুঝতাম তিনি চোর ডাকাতদেরও এমনি করে ছেড়ে দেন!

আসলে সিরাজকে নিয়ে রচিত কাহিনি কিচ্ছার অন্ত নেই। নবাব ঘরের ছেলে, তার উপর ভাবী নবাব বিধাতা। ফলে কাহিনি, সত্য ও মিথ্যা—দুই-ই গজায়। এই সবে যুবকটিকে নিয়ে স্বদেশি এবং বিদেশি—উভয়েরই কুতূহল অসীম। কে জানে, বুদ্ধিমান যুবা হয়তো এই সব প্রচার নিভৃতে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে। ইতিমধ্যেই তাঁকে নিয়ে দেশি আর বিদেশি পণ্ডিত গবেষকদের শিরঃপীড়া আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। ফলে, বিশেষত সম্ভ্রান্ত মানুষজন তাঁর নাম শোনামাত্র আতঙ্কে পতিত হন। কার মাথা যে কখন কাটা যায়, তা নিয়ে রজনী বিনিদ্র ঘটে।

দেশের মান্য মাতব্বরগণ ভেবেছিলেন, নাতির মতিগতি, চালচলন দেখে বৃদ্ধ নবাব নির্ঘাৎ তাঁকে সিংহাসনে বসাবেন না। কিন্তু প্রকৃতির কলকাঠি নড়েছিল নেপথ্যে। আলিবর্দির বড় কন্যে ঘসেটি বেগম নিজে নিঃসন্তান। তাই তিনি সিরাজেরই কনিষ্ঠ ভাই আক্রামউদ্দৌলাকে পোষ্য নেন। ঘসেটির বাসনা ছিল ভবিষ্যতে আক্রাম তখ্‌তে বসলে তিনি আড়াল থেকে তাকে চালনা করে রাজত্ব চালাবেন। কিন্তু ছেলেকালেই এই আক্রাম জলবসন্তে মারা গেলেন।

অপরদিকে আলিবর্দীর কনিষ্ঠ জামাই, সিরাজের বাবা জৈনুদ্দিন আহম্মদ মৃত। তাঁর শোকে ঘসেটির স্বামী নোয়াজিশ খাঁও মারা গেলেন। তার দু'মাস গতে আলিবর্দীর মেজ জামাতা সৈয়দ আহম্মদও গত হলেন। রইলেন শুধু আলিবর্দীর মেজো কন্যার ছেলে শৌকত জঙ। পিতা মৃত হওয়া মাত্র তাঁকে পূর্ণিয়ার নবাব হয়ে বসতে হল। ফলে সিরাজের সামনে আর কোনও কণ্টক রইল না। বাংলার মসনদ-এর একমাত্র ভাবী দখলদার তিনিই।

বন্দ্যো যখন এতসব রাজা কিচ্ছা করে বিদায় নিলেন তখন সন্ধ্যা ঘনাচ্ছে প্রসাদের নিঝুম ভিটে ঘরের মাথায়। ভজহরি ধারে কাছে নেই। প্রসাদ একা বসে নিঝুম পঞ্চবটির সুমুখে আর এক গাছতলে। ঝিঁঝি ফুকরোচ্ছে। বেলা ফুরনোর পরে পরেই এই দিগরে রাজ্যের গাছপালারা সচকিত হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণকলি, মাধবীলতা আর নাগকেশরের ধারালো সুগন্ধ বনে বনান্তরে ঘনিয়ে উঠেছে। গন্ধ ঢালছে হরেক নাম না-জানা বনৌষধি। ঘরে ঘরে শাঁখ বাজছে। দূর মেটে ঘরের দাওয়ায় পিদিম জ্বলছে। এখান থেকেই বোঝা যাচ্ছে সর্বাণী তার কোলের ছানাটিকে মাই দিতে বসেছে। বিশ্বজননী মহামায়ার আর খণ্ড এখন মহাসুখে তার উৎসমুখ থেকে অবিরল বয়ে আসা সুধা পান করছে। আর এখান হতে কত দূরে, মুরসিদাবাদের এক কবরস্থলে মায়ের পায়ের নীচে মাটি পেয়ে মহাসুখে স্নিগ্ধ বিশ্রামে রয়েছেন বাংলার নবাব আলিবর্দী। রাজসভায় গভীর অন্ধকারে তাঁর মহার্ঘ সিংহাসনটি অপেক্ষা করে রয়েছে তরুণ যুবা সিরাজের জন্য। প্রসাদ ভাবছেন, এবার বুঝি কারণের সময় হল। মায়ের স্তন দুধের অপর নাম তো এখন এই প্রসাদের কাছে অমৃতধারা, কারণ এর আর তৃতীয় বিকল্প হয় না।

আমাব মিলা মায়ের আর এক নাম মৃদুলা হওয়ার পেছনে ছোট্ট এক টুকরো কাহিনি আছে। তার পটভূমি হল কাঁচরাপাড়ার বাবু ব্লকের রেল কোয়ার্টার।

আমার ছা-পোষা রেলকর্মী দাদুর মস্ত পরিবার—দাদা, বউদি, তাদের সন্তানাদি, বোন, প্রায়ই অতিথ স্বজন—এই সমেত। দাদু পূর্ণচন্দ্র নিজে গান গাইতে না জানলেও গান শুনতে ভারী পছন্দ। প্রায়ই কাঁহা কাঁহা চলে যান ওস্তাদি গান শুনতে। আবার বাড়িতেও ছোটখাটো জলসা বসে।

এইরকমই এক বিচিত্র জলসা বসতে লাগল প্রায় ফি শনিবার। অফিস থেকে সেতার ঘাড়ে ফেলে বাবার সঙ্গে চলে আসেন অবিনাশ দাদু। পুরোদস্তুর নাম অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বাড়ি দখিনের ধামুয়ায়। সম্পর্কে মিলা মা'র মেজো পিসেমশাইয়ের মামা। বাবা পূর্ণচন্দ্রকে পুত্রা বলে ডাকেন। শনিবার রাতে খাওয়াদাওয়ার পর ভেতর বারান্দায় শতরঞ্চি পড়ে। অবিনাশচন্দ্র সেতার বেঁধে বাজাতে বসেন। শ্রোতা পূর্ণচন্দ্র আর তাঁর বালিকা কন্যা মিলা। আর শোনে বাইরের আকাশময় কখনও মেঘলা কখনও জ্যোৎস্না। ঝিমঝিমে পুরনো গাছপালা। বাবুব্লকের পেছনে উধাও বিছিয়ে থাকা প্রকাণ্ড মথুরার বিল। থেকে থেকে মাছেদের ঘাই দেওয়া। চবুতরা পাখিদের কিচিমিচি। এমনকী এ ধারে কালো হয়ে পড়ে থাকা পিচের রাস্তা—যা টেনে গিয়েছে কাঁপা নামে জায়গার দিকে, যেখানে প্রথম যুদ্ধের আমলে মিলিটারি এয়ারপোর্ট তৈরী হয়, সেও এই দূর শ্রোতার থেকে বাদ যায় না। গভীর রাতে রাস্তা বেয়ে মিলিটারি ট্রাক যায়। দূর আকাশ বরাবর গম্ভীর এরোপ্লেন গড়ায় লেজের আলো চোখ মিট মিট করতে করতে। অবিনাশ বন্দ্যো মগ্ন হয়ে সেতারে আঙুল টেপেন। আঙুল বেয়ে গলে পড়ে কখনও মালকোষ, কভু দরবারি, আড়ানা। আবার রাত ফুরোবার কালে আহির ভৈরব, তোড়ি। এই তোডি বা টোড়ি শুনলে বালিকা মিলারও বুকের কাছটা কেমন করে ওঠে। যেমনটি হয় দরবারির আলাপে। সেই কীরকম করার ব্যাপারটা খানিক কান্না খানিক মন কেমন উদাসেব মাঝামাঝি। মিলা দেখে বাবা সটান চোখ বুঁজে বসে আছেন। একটুও দুলছেন না। আর অবিনাশ দাদুর মাথাটা সেতারের ওপর দিককার মাথার দিকে বারবার আছড়ে আছড়ে পড়ছে কী অসহায়তায়। সেই অবস্থাটির নাম দুঃখ না আনন্দ, কে জানে।

মিলা চুপটি করে বসে বাবার পাশে বাজনা শোনে। মাঝে মাঝেই উঠে গিয়ে অবিনাশ দাদুর জন্যে পান সেজে নিয়ে আসে। বাজাতে বাজাতেই ডিবেয় রাখা পান তুলে মুখে দেন তিনি। বাজনায় ঝালার কাজ আরও প্রাণ পেয়ে যায় অমনি।

পরদিন সকাল বেলা হঠাৎ কাছে ডাকলেন, অবিনাশ দাদু, হ্যাঁরে মেয়ে, তুই তো অদ্ভুত। সারা রাত জেগে বাবার পাশে বসে আমার বাজনা শুনিস। তোর ভাল্লাগে?

কম ভাষী মিলা মাথা হেলায় শুধু।

এবার প্রশ্ন, বাঃ। এতটুকু মেয়ে! তা তোর নাম কী শুনি।

ছোট্ট জবাব, মিলা।

—কী বললি!

—মিলা।

—মিলা! এ আবার কী নাম। তা ভালো নাম কী রে।

মেয়ে ঘাড় তুলে বাবার দিকে চায়। বাবাও যথাস্বভাবে চুপ।

—আর কোনও নাম নেই তোর?

মিলা এবার মাথা নাড়ে।

অবিনাশ সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন, বেশ কথা। আজ থেকে তোর ভালো নাম হল মৃদুলা। বুঝলি—মৃ-দু-লা।

বাবা বলেন, চমৎকার। মেয়ে আর একবার বাপের চাপা খুশি মুখ দেখে। সেখানে সদ্য শেষ হওয়া সেতারের ভৈরবীর গুঁড়ো লেগে আছে।

আমার কম কথা-বলা মিলা মা মনে ভাবল, প্রথমে বাবার দেওয়া নাম মিলা, তারপরে মামার বাড়িতে আদুরে ডাক মিলন, আর শেষকালে অবিনাশ দাদুর তরফ থেকে মৃদুলা। এক মেয়ের তিন তিনটি নাম।

মিলা যেমন কম কথা কয়, তেমনি একটু বেছেবুছে পয়পরিষ্কার খায়। জলখাবারি সকালে আর সব নিজ আর তুতো ভাই বোনেদের সঙ্গে রুটি তরকারি মুখে ওঠে না। সামান্য ঘিয়ে ভাজা পরোটা হলেই হল। পূর্ণচন্দ্র সেটি লক্ষ করেছেন। একদিন হেঁসেলের দরজায় গিয়ে স্ত্রী আর বউদির দিকে শান্ত গলায় বল্লেন, ও যখন রুটি খেতে পারে না, ঘি দিয়ে একটু রং করে দিলেই তো মিটে যায়।

বাড়িতে আমের কালে বারোয়ারি আম কেনা। মিলা আঁশওযালা দিশি আম খেতে পারে না। এ নিয়ে কোনও আপত্তিও নেই। শুধু ওই আম না খাওয়াই হল স্বভাব। তখনও বাবার উক্তি, ও যখন আর সবার মতো দিনে পাঁচ ছটা আম খায় না, ওর জন্যে এক আধটা হিমসাগর—ল্যাংড়া কেটে দিলে কী হয়।

অমনি স্ত্রী পারুল বলে ওঠেন, পাঁচজনের সংসারে ওর জন্যে আলাদা ব্যবস্থা হবে কেন।

বাড়িতে হালুয়া হলে মেয়ে আঙুল দিয়ে দেখে ঘি হাতে লাগছে কি না।

এ বাড়ির আর এক নিয়ম। ছেলেপুলে অনেক, তা ছাড়া বড় পরিবার বলে বাবা, জ্যেঠাবাবুরা খেয়ে উঠে যাওয়ার পরে সেই থালাতেই ছোটদের ভাত বাড়া হয়। আর সবাই নিরাপত্তিতে খেয়ে নেয়। মিলার কিন্তু মুশকিল যে। এমনি এক রবিবারের দুপুরে বাবার এঁটো থালে ভাত পড়েছে মেয়ের। সে এদিক ওদিক দেখে নিয়ে পাশে রাখা গ্লাস থেকে থালায় একটু জল ঢেলে নেয়। তারপর আঙুল দিয়ে থালাটা চেঁছে পুছে পরিষ্কার করে অতি গোপনে। পূর্ণচন্দ্র যে পেছনে দাঁড়িয়ে দাঁত ব্রাশ করছেন, সে খেয়াল করেনি মিলা। ফলে ব্যাপারটা তাঁর সাক্ষাৎ নজগরগত। আর সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘরের দিকে মন্তব্য, ও যখন এঁটো থালায় খেতে পারে না, ওকে দেওয়া হয় কেন?

এ নিয়ে মা-জ্যেঠিমা'র গোপন আলাপন, বাবার আস্কারায় মেয়ে মাথায় উঠছে। এত জেদ ভালো হয়। ভবিষ্যতে স্বামীর ঘর করতে হবে। এটা তো মনে রাখতে হবে।

সে কথা বোধহয় আমার মা মনে রাখেনি। রাখলে, আমার একগুঁয়ে চণ্ড রাগী বাবার সঙ্গে এমন দা-কাটারি সম্পর্ক হত না। সংসারে প্রায় সর্বদাই ঝোড়ো হাওয়া বইত না। আর আমার মায়ের সংসার প্রায় বন্দিনী সীতার অশোককানন হয়ে উঠত না। আসলে

শ্বশুর বাড়ি সম্পর্কে আমাদের বাবা কেন যে এমন মারকাটারি, তা ভারী রহস্যের। অথচ ও বাড়ির লোকজন, বিশেষ করে শালা-শালী আমাদের বাড়ি এলে, বাবার আনন্দ দেখে কে।

দাদুর ঘরে আমার মাতামহ গুপ্ত প্রেস পঞ্জিকা পেড়ে যখন আমার উপনয়নের দিনক্ষণ ঠাওরাচ্ছেন, ঠিক তখনই কানু বাবা সেখানে উপনীত। বাগানে কাজ করছিল বলে হাতে পায়ে কাদা। ওই অবস্থায় বাবা মেঝেয় বসে পড়ে বলে, পৈতে দেবেন ভালো কথা, কিন্তু আচার্যগুরু হতে হবে বাবাকে।

মাতামহ উৎসাহ নিয়ে বলেন, তাই হবে।

বাবার দ্বিতীয় প্রস্তাব, আর পৈতে ওইসব মুড়ি পোড়া বামুন দিয়ে হবে না। বেহালার মেজো পিসেমশাইকে এনে পৈতে দেওয়াতে হবে। ওঁয়ার মতো পণ্ডিত সজ্জন মানুষ ছাড়া এ পৈতে হবে না।

এবার পিতামহ কথা কন, সে তো ভালো কথা। কিন্তু কালীচরণের সময় কোথায়। ওর সব মস্ত মস্ত জজ ব্যারিস্টার যজমান। আর তাছাড়া ওর যথাযথ দক্ষিণা কি আমরা দিতে পারব!

বাবা রণহুঙ্কার ছাড়ে, আমি গিয়ে দাঁড়ালে পিসেমশাই না বলতে পারবেন না।

পিতামহ কন, সে কি আর আমি জানিনে বাবা। তবেও কেজো মানুষ। ওকে ডিসটার্ব করবে না। ও না পারলে আমাদের হাইস্কুলের হর পণ্ডিতমশাই আছেন।

বাবা গলা তুলে বলে, আমার গলায় পৈতে নেই বলে কি আমি ফেলনা। আমার বাবা তো বামুন।

তিপ্পান্ন

আমার উপনয়ন নিয়ে বাবা ছেলেতে তর্ক অধিক গড়ায় না। আমি কেবল ধরতে পারি না, যে মানুষের গলায় পৈতে নেই, সে কেন ছেলের ব্যাপারে এমন উঠে পড়ে লেগেছে। বামুন হওয়া না হওয়া নিয়ে আমার তো কোনও ধারণা নেই। তার চেয়ে বেশি টান শ্মশানে মশানে, এমনকী না-যেতে পারা হিমালয়েও। হয়তো আর পাঁচজন ছেলেমানুষের মতোই অজানা রহস্যের দিকে আমার স্বভাব-ঝোঁক। সে জন্যেই ভূত-প্রেত, আত্মাটাত্মা বা ওইরকম কিছু তাজ্জব ব্যাপার নিয়ে আমার ভাবনা ঘুরে মরে। সেই ভাবনায় আরও উসকানি দিয়ে বসে আছে দাদুর আলমারির সেই বিচিত্র বইখানা।

'কিন্তু চোখের ওপর যখন দেখি কাউকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে, দেখি—যে ছিল পরমাত্মীয়, যে ছিল অতি নিকটের জন ও অতীব প্রিয়জন, সেও চলে যায় অজানার দেশে দেহটাকে ফেলে দিয়ে, তখন আমরা একটু থামি ও ভাবি...। কোথায় গেল সে? কী হল দেহের পরিণতি? আত্মার অভাবে দেহ আরম্ভ করে পচতে, আর তখনই আমাদের মনে জাগে যে, এর মধ্যে কী ছিল—যা বাঁচিয়ে রেখেছিল একে? কোথায়ই বা তা গেল?'

এইরকম সব জট পাকানো প্রশ্ন মনের মধ্যে লাট খায়। গোঁত্তা দেয় কাটা ঘুড়ির মতো। তাই নারায়ণ কাকাকে পেয়ে সত্যিকারের কূল পেয়ে গেলাম। এই মানুষটি যেমন হই হই

হাসেন, দেদার গলায় গান করেন, তেমনি আমার মতো ছেলে মানুষকেও খেদিয়ে দেন না। ফলে এক বর্ষার সন্ধেয় আমাদের দোতলার লম্বা বারান্দায় প্ল্যানচেটের আসর বসল।

মেঝেয় শতরঞ্চি পেতে তার ওপর একখানা পিজ বোর্ডের লম্বা খাতা রাখা। তার ওপর লম্বা সাদা কাগজ আর পেন্সিল। সব জানলা দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করা। ধূপদানে গুচ্ছের ধূপ জ্বলছে। মশার কারণে তেড়ে ধুনো দেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে নিঝুম ঘোরালো পরিবেশ।

পেন্সিলটা নারায়ণ কাকা আলগা করে ধরে রেখেছেন কাগজের ওপর—অনেকটা লেখার কায়দায়। কিন্তু ওভাবে লেখা যায় না, এমনই ভঙ্গি। ওই পেন্সিলটার এক কোণে আমি ছুঁয়ে রেখেছি আর একদিক মা। অদূরে বসে তটস্থ দর্শক বোন-ভাই-সেবা-মলয়। কাকা বললেন, কাকে আনতে চাও বলো।

আমি ঝট করে বলে দিই, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমরা তিনজনে চোখ বুঁজি। কাকা বলেন, ওঁর চেহারাটা মনে করে গভীরভাবে ওঁকে ডাকো। প্রার্থনা করো—আসুন, আপনি আসুন।

আর দু'জন কী করছে জানি না, তবে আমি প্রাণপণ ওঁকে মনে করার চেষ্টা করে চলি। আমাদের স্কুলে হেডস্যারের ঘরে ওঁর একটা মস্ত ছবি আছে। পেছনে দু'হাত গোট করে ঢ্যাঙাপানা জোব্বা পরা চেহারা। পাকা গোঁফ দাড়ির সুন্দর সাজুগুজু ব্যবস্থার মাঝখানে অতি চাপা মিচকে মিচকে হাসি, কিন্তু হাসি নয়!

মনে করতে করতে পাশ থেকে রাজ্যের কাণ্ড এসে ধাক্কা দেয়। হঠাৎ করে কেন জানি ভেতর বাগানের মস্ত মস্ত বেল গজানো গাছটা চোখের ভেতরে এসে যায়। এসে পড়েন কাঁচরাপাড়া পলিটেকনিক স্কুলের পাকা চুলো আর খয়েরি পাঞ্জাবি হেডমাস্টার মশাই, আমাদের বাড়িতে নিত্য দুধ দিতে আসা শিবদাসী পিসি ও তার জামাই দ-হরি, দাদুর বন্ধু কাঁপা-র ভূপেন দাদু, আমাদের এখনও না বিয়নো তাগড়াই বকনা। মনে মনে ঘোঁট পাকায় গঙ্গার ধারে পড়ে থাকা বিসর্জনের পর ঠাকুরের শোলার মুকুট ভাঙা, একটা চিমনি নেই লণ্ঠন, শৈল দাদুর টোল খাওয়া নস্যির ডিবে, বাগানে বুনো ঝোপের মাঝখানে হঠাৎ ঠেলে ওঠা লম্বা ডাঁটিওয়ালা লালরঙা অচেনা ফুল, স্কুলের পথে নিঝুম বাঁশতলায় একজন ডাগর কোলা ব্যাঙের ভ্যালভেলে চাউনি, রামপ্রসাদের চানের ঘাটের পথ পাশে প্রকাণ্ড ঝাঁকড়া আর ঝুরিওয়ালা বটগাছ তলে নামিয়ে রাখা গণ্ডা গণ্ডা মেটে মূর্তি। হরেক ঠাকুরের। ওদের কারও প্রাণ নেই। মুখগুলো বেশিরভাগই বৃষ্টিতে গলে ধসে গিয়েছে। অনেকেরই হাতখানা কাঁধ থেকে খসে পচা, কালো বিচুলি বেরিয়ে পড়েছে। ঠিক আমাদের বাড়িতে প্রায়ই এসে থাকা বাবা-মা'র সূর্যকুমার দাদু। গলিত কুষ্ঠে চোখ-নাক বেঁকে গলে গিয়েছে। হাতের আঙুল দুমড়ে মুচড়ে পশুর থাবা। এ সবের মধ্যে মুনিঋষি ধারার কী সুন্দর চন্দনের বাস সমেত রবীন্দ্রনাথের ধ্যান! মনে মনে হাঁক ডাক, আসুন, আপনি আসুন।

কতক্ষণ পরে জানি না, তবে টের পাই আমার হাতে ছোঁয়া পেনসিল টুকটুক করে কাঁপছে। নড়ছে পলকা পলকা। আমি আস্তে করে চোখ খুলি। দেখি মা আর নারায়ণ কাকাও কাগজের দিকে চেয়ে। সেবা-মলয় সাড় নেই, এমন মুখ নিয়ে।

নারায়ণ কাকা নিচু গলায় বলে ওঠেন, আপনি কি এসেছেন?

এবার পেনসিল সামান্য গতি পায়। একটা জায়গায় থরথর করতে করতে হঠাৎ সাঁ করে কাগজের একেবারে টঙে চলে যায়। রবীন্দ্রনাথের এখনও এত স্পিড!

কাকা বলেন আবার, কে এসেছেন বলবেন কি?

এবার কবিগুরুর আরও স্পিড। সেই সঙ্গে গোল পাকানো ঘূর্ণী। একটার পর আর একটা গোল্লা পাকিয়ে চলেছেন। সারাজীবন এত কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস আরও কত কী লিখে শেষকালে এই গোল্লা দেওয়ার মানে কী! তাহলে কি নিজের যাবতীয় লেখা-পত্র নিয়ে এই হতাশার গোল্লা? হঠাৎ মনে হয় দাদুর আলমারিতে ওঁর আঁকা ছবির বই দেখেছিলাম। বেশিরভাগই বেটাছেলে বা মেয়ের লম্বা লম্বা মুখ। সেই সব মুখগুলো ওই 'মরণের পারে' বইখানায় দেওয়া ক্যামেরায় তোলা বিদেহী আত্মার ছবির মতো। হঠাৎ দেখলে মনটা ছম ছম করে। আমাদের একতলার চোরকুঠুরি ঘরের ড্যাম্প ধরা আলো নেই মেঝে-দেয়ালের কথা মনে হয়।

এবার মা বলে, আপনি কি এসেছেন?

সঙ্গে সঙ্গে পেনসিলটা সাঁ করে ডাইনে উঠে গিয়ে সড়াৎ করে নেমে আসে বাঁয়ে—নীচের দিকে। সেখানে বিতিকিচ্ছিরি হাতের লেখায় ফুটে ওঠে, হ্যাঁ।

আমি অবাক। এত সুন্দর হাতের লেখা যে কবিগুরুর তাঁর এ কী হল। মারা যাওয়ার পরে বুঝি লেখাপত্র বন্ধ। তাই হাতের লেখার এমন অবনতি।

নারায়ণ কাকা প্রশ্ন করেন, আপনি কে?

পেনসিল অস্থির রগড়াতে রগড়াতে এধার ওধার ঘুরে বেড়ায়। কী যে মাথায় চেপেছে কবির। এমন করছেন কেন?

কাকা আবার, দয়া করে নামটি লিখবেন কি?

পেনসিল এবার এক জায়গায় থমকে কী যেন চিন্তা করে। তারপর কাগজের গায়ে হিজিবিজি কাটতে কাটতে হঠাৎ একটি নাম লেখে। এঁকাবেঁকা লেখা হয় 'মালতী'।

রবীন্দ্রনাথের বদলে এ কে! রেডিওয় সেদিন একটা গান হচ্ছিল, ওই মালতীলতা দোলে—। কবি কি সেই গানটাই নতুন করে লিখতে চেষ্টা করছেন। তাজ্জব ব্যাপার।

কাকা বলেন, আপনি কে?

আবার ত্বরিতে লেখা হল 'মালতী'।

রবীন্দ্রনাথ কি নিজে না এসে তাঁর গান থেকে টুক করে মালতীকে তুলে নিয়ে এখানে পাঠিয়ে দিলেন!

মা বলে, কোথায় বাড়ি ছিল?

সড়াৎ সড়াৎ লেখা হয়, আমি মলয়রে চিনি। পোটেরে চিনি। মলয় ভালো। পোটেটা খচ্চর।

এ কাকে পাঠালেন কবিগুরু। মলয় তো আমার ভাই। আর পোটে মানে আমাদের পাড়ারই নীহার কাকার এক ছেলে। মুখে পক্সের দাগ। স্কুল পালিয়ে টই টই ঘুরে বেড়ায়।

কিন্তু আপনার নিজের লোকের মুখে 'খচ্চর'!

এই ভাগীরথীর জল তরঙ্গে কত না সমাচার, আকথা এবং কু, বয়ে আসে মাঝি মাল্লা, বানিয়া, সাধারণ মানুষ, ছোটোখাটো জমিদার ইত্যাদি দিগরের মুখে। সে সব কথা ও কিচ্ছা আর পাঁচ মানুষের সঙ্গে রামপ্রসাদও শোনেন, মনে মনে চিন্তন করেন। তবে আর পঞ্চজনার চেয়ে একজন কবির প্রাণ বহু যোজনি তফাৎ বলে তাঁর মানসপটে বিচিত্র সব চিত্রকল্প আর বাস্তবতার ছবি আঁকা হয়। একটি চিত্রের সঙ্গে অপরটির ঘাত প্রতিঘাতে মনে মনে একরকম বিচার তৈরি হয়। তার নিরিখে অনেক কিছু প্রচারই বাস্তবে মেলে না। যেমন মেলেন না সদ্য নবাব সিরাজ, যিনি মাতামহের সিংহাসনে বসলেন এই সবে—১৫ এপ্রিল, ১৭৫৬, তাঁর সম্পর্কে হিসেব নিকেশ। মাঝখানে মাত্র চারটি দিন সিরাজ ছাড় দিয়েছেন। অতএব এ বাংলায় এখন নবীন শাসন। তরুণ এক নবাবের হাতে বাংলার ভার. যিনি মাতামহের মরণশয্যার পাশে কোরাণ স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করেছেন জীবনে আর কোনওদিন মদ্য ছোঁবেন না।

নদীর জল তরঙ্গে এমনই সব সমাচার কথা কয়। কথা কয় অনতি ইতিহাস। বলে যায় নতুন নবাবের হাজারো কিচ্ছে, যার অনেকর্কিছুই রামপ্রসাদের কাছে খাদ মিশানো বলে মনে হয়। মনে মনে যুক্তি পরম্পরায় মত নিরূপণ ঘটে। যুক্তির গায়ে যুক্তি পড়ে।

আসলে বাজারে খপর, সিরাজের সঙ্গে বানিয়া ইংরাজদের সম্পর্ক ভালো নয়। এ ব্যাপারটি আলিবর্দী বেঁচে থাকতেই মানুষের কানে উঠেছিল। কেননা মৃত নবাব ইংরাজদের দেওয়া এক পরোয়ানায় জানিয়েছিলেন যে তাঁর এই নাতিটি সর্বদাই আলিবর্দীর সম্মুখে ওই বিদেশিদের প্রশংসা করতেন এবং তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতি শুভকামনা জানাতেন।

১৭৫২ সালের মে মাসে আলিবর্দী যখন সিরাজকে তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে ঘোষণা দেন, সে বছরেরই সেপ্টেম্বর মাসে ইংরাজরা সিরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন হুগলির ফৌজদার আর জার্মানি বণিক খোজা ওয়াজিদের পরামর্শে। নবীন সিরাজ কিন্তু ইংরাজদের প্রতি যথেষ্ট সৌজন্য দেখান।

একেবারে হাল আর একটি কথা ভাগীরথীর স্রোত বয়ে এনেছে। সেটিও ভারী জরুরি। তা হল সিরাজ সিংহাসনে বসার পরে পরেই ইংরাজরা তাঁকে একখানি বিস্তারিত পত্র লিখে অভিনন্দন বন্দনা জানিয়েছে। নবাব অতি সাদরেই তা গ্রহণ করেছেন। নবাব ইংরেজদের পাঠানো প্রতিনিধি বা ভকিলকে খোলাখুলি জ্ঞাত করেছেন যে, তিনি ইংরাজগণের কিছু কর্মাকর্মের প্রতিবাদ করেছিলেন। নবাবের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতি এই চতুর বানিয়ার দল ইতিমধ্যেই অবজ্ঞা দেখাতে আরম্ভ করেছিল। ইওরোপে যুদ্ধ বাধার ডরে আর বৃদ্ধ নবাবের মরণের পর মসনদ নিয়ে গোলযোগের শঙ্কায় ইংরেজ ও ফরাসিরা তাদের দুর্গগুলো সারাইসংস্কার করতে উদ্‌যোগ নিয়ে বসেছিল। এ কারণে সিরাজ সচেতন রইলেও তাঁর কিছু করবার ছিল না। কেন না দিল্লির বাদশাহের কাছে খাজনা বকেয়া ছিল বিস্তর। মুঘল সম্রাটের প্রতিনিধি যে কোনও সময় বাংলায় হানা দিতে পারে। ফলে ইংরেজ আর ফরাসি দমন নিয়ে ভাবনাপত্র তুলে রাখতে হল।

রামপ্রসাদ মুহূর্মুহূ ডুব দেন গঙ্গার প্রাতঃকালীন জলে। ডুব দিতে দিতে এক একবার জলের তলে হেঁট হয়ে বসে রন। প্রাণায়ামাদি করার কারণে তাঁর দম ধারণ যথেষ্ট বলবন্ত ও স্বাভাবিক। সেই স্বভাবেই তিনি জলস্রোতের আবডালে বসে মাতঃ গঙ্গার প্রাণকথা শোনেন। অনুভব করেন এখান থেকে কত দূরে ওই রাজধানী মুরসিদাবাদে নব নবাব সিরাজের কার্যকলাপি অবয়ব আর অস্তিত্ব। টের পান এই বিচিত্র রূপিণী নদী জননীর অবর্ণনীয় ক্রীড়ানৈপুণ্য। আসলে জননীর গুণই এমনি। তিনি যেহেতু সংসারকে ধারণ করেন, তাই বাছাটির তাবৎ হেলদোল, দুঃখ সুখ, আনন্দকীর্তন সবই তিনি টের পান।

কিন্তু, এখানে একটিই নিদান জারি আছে গঙ্গার তরফে। সে বাক্য বুঝি বা একনায়কী তত্ত্ব হলেও ভাবী সংসারের মঙ্গলকারী। সেই উক্তি তাঁর স্বামী মহারাজ শান্তনুর প্রতি। দেবী সুরেশ্বরী বলছেন,

যত্তু কুর্য্যামহংরাজন্! শুভং বা যদিবাহশুভম্।
ন তদ্বারয়িতব্যাস্মি ন বক্তব্যা তথাহপ্রিয়ম্।।

হে রাজা, আমি শুভ বা অশুভ যে কার্যই করব, তাতে আপনি বারণ করতে পারবেন না কিংবা কটুকথা বলতে পারবেন না।

এখানেই গঙ্গার অনুশাসন-এর আরম্ভ আর সমাপন। এরপর আর কোনও বাক্য হয় না।

কিন্তু সেই বাক্যের পরেও যে আর এক মহাবাক্য এই জলতলে গুম গুম করে বাজে, আকাশে ঘনীভূত মেঘের কাছাকাছি।

সর্ব এব শুভঃ কালঃ সর্বদেশস্তথা শুভঃ
সর্বো জনস্তথা পাত্রং স্নানাদৌ জাহ্নবীজলে।।

গঙ্গার জলে স্নান করতে সকল কালই শুদ্ধ, সকল স্থানই শুদ্ধ, এবং সকল মানুষ অধিকারী। অস্যার্থ, ব্রাহ্মণ থেকে চণ্ডাল পর্যন্ত যে কোনও ব্যক্তি সকল সময়ে গঙ্গার সকল জায়গায় স্নানাদি করতে পারবে।

তাহলে এই হালিসহর কুমারহট্টে এত জাতপাতি প্রভেদ সত্ত্বেও এই মোক্ষম কথাটি নিত্য জেগে রয়। জেগে থাকে আকাশের মতো, অনিদ্র অবিচল।

স্নানান্তে ঘরে ফিরে প্রাতঃকালীন পূজা। পূজা বলতে মেটে মন্দিরে স্থাপিত ঘট পূজা। সে কাজও সারা হয় যথাকালে। রামপ্রসাদ এবার দং-কলম আর তালপাতার লিখনপট নিয়ে এসে বসেন বুনো বাসভূমির থেকে কিয়ৎ এড়িয়ে—বনের মধ্যেই, একটি পাকুড় গাছতলে।

নিবিড় প্রভাতি বনভূমে পাখি ডাকছে। দিঘল গাছেদের পাতাপত্রে মন্দ বাতাসের তাড়নায় চাপা রোল জাগছে। সর সর শব্দ হচ্ছে বৃহৎ এক গো-সাপের একাকী চলে যাওয়ায়। দূর দিয়ে এক গো-গাড়ি নড়বড়িয়ে পথ ভাঙছে। কোন পুকুরঘাটে পাটায় কাপড় আছড়ানোর দমাস দমাস আছাড়ি পড়ছে। একটি বাছুর মা'ব খোঁজে হাম্বা হাম্বা রব ছাড়ছে। প্রসাদ পত্রে কলম রাখেন দং-এ ডুবিয়ে। গীত লেখা হয় একখানি।

মন তুমি কী রঙ্গে আছ।
ও মন রঙ্গে আছ, রঙ্গে আছ।।

তোমার ক্ষণে ক্ষণে ফেরা ঘোরা,
দুঃখে রোদন সুখে নাচ।।
রঙের বেলা রাঙে কড়ি,
সোনার দরে তা কিনেছ।
ও মন দুঃখের বেলা রতন মানিক,
মাটির দরে তাই বেচেছ।।
সুখের ঘরে রূপের বাসা,
সেই রূপে মন মজায়েছ।
যখন সে রূপে বিরূপ হবে,
সে রূপের কী রূপ ভেবেছ।।

বুনো পথে গুটি গুটি এসে উপনীত হয় সেদিন গঙ্গার ঘাটের সেই বুড়ি—প্রসাদের ছেলেকালের ইয়ার দোস্ত গদাধরের মা জননী। তার হাতে পদ্মপাতে মোড়া কী যেন। আর মুখে হাসি।

প্রসাদ চোখ তুলে বলে ওঠেন, এসো গো পিসিমা!

বৃদ্ধার মুখে অবারিত হাসি আর দু'চোখে বিস্ময়।—এলুমই তো বাপ। ছেলের মুখে দু'টো মিষ্টি কতা শুনবো বলেই তো আসা।

এই বলে বুড়ি তার হাতে ধরা পদ্মপাতার মোড়কটি প্রসাদের দিকে বাড়িয়ে দেয়। রামপ্রসাদ চোখ বড় বড় করে বলে ওঠেন, পদ্মপাতে যখন মোড়া, তখন ব্যাপারটি মধুর বলেই মনে হচ্ছে।

—সে আমি কেমন করে বলি বাপ। তবে নিজের হাতে তোয়ের করে আনলুম কি না।

পাতার মোড়ক খোলেন প্রসাদ। অমনি চোখের সামনে প্রকট হয় পাতে রাখা গুচ্ছের নারকেল নাড়ু আর খানকয় মোয়া।

রামপ্রসাদের দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে ছলছল, ছলছল। কিছু সময় তিনি কোনও কথা বলতে পারেন না। বুড়ি সামনে বসে মিটি মিটি হাসে। হাসে আর দেখে ছেলের হাবভাব।

—ভারী গরিব মানুষ বাপ। গাছের একজোড়া নারকোল ঘরের আড়ায় তোলা ছিল। বউমা কুরে দিলে তাই দিয়ে কোনওমতে—

প্রসাদ দ্রব্যকটি পাত শুদ্ধু কপালে ঠেকান। চোখ মোছেন। তারপর নিবিড় স্বরে বলে ওঠেন। পিসি গো, তুমি তো আমার মা জননীর স্থানে। নিজ হাতে করে তোয়ের করে আমার জন্যে এনেছ। এর ঠাঁয়ে রাজভোগও মানায় না মা।

বুড়ি প্রায় নিদাঁত মুখে হাসি থই থই পুকুর ভাসিয়ে বলে, থালে আর কী করে বলি—কী ভাগ্যি আমার। ছেলের ঠাঁয়ে মায়ের আবার ভাগ্যি-অভাগ্যি কী।

—তাই তো মা। তবে ভাগ্যি কী তা জানিনে। তবে পুণ্যিটুকু বুঝি। এখন সেটি আমার হল।

বুড়ি কয়, তা বেশ কতা। তুই আমার সুমুখে একটুখানি মুখে দে বাপ। দেকে আমি নয়ন সাথোক করি।

রামপ্রসাদ পদ্মপাত থেকে একটি নাড়ু তুলে নিয়ে মুখে দেন। তারপর চোখ মুছে সেটি কতক তদ্‌গতভাবে চিবোতে থাকেন। প্রসাদ চিবোন, বুড়ি মহানন্দে মাথা নাড়ে। আকাশ পথে একটি উড়ন্ত চিল সাঁ করে টাল দিয়ে খানিক নীচে নেমে আসে। তারপর একটি বৃত্ত তৈরি করে উড়তে থাকে। উড়ন্ত চিল ভাবে, এখনকার এই আমিষ সংসারে, যখন মৃত নবাবের স্থানে চূড়ান্ত মাংসাশী দৌহিত্রটি উঠে বসেছে তখন, দেশের এ কী হাল। এমন একজনা মানুষ, এখানে এই নিভৃত জাঙালে বসে কেমন করে মাংস হতে বহু দূরে নিজেকে মগ্ন রেখেছে। হায়, এ সময়ে এই কারবার কী যে বেমানান।

চিলের এই মনস্তাপের অথবা চিন্তনের কথা আর কেউ না জানে জানুক, কিঞ্চিৎ বোঝেন এই কবি মানুষ, আর জানেন জননী জাহ্নবী। দেশকালের তাবৎ সমাচারে তাঁর দেহ বর্ণের রকমফের ঘটে। স্রোতের সম এবং ফাঁকে নতুন নতুন সুরোদ্ভব হয়।

সে কথা মনে করে এই আকাশচারী চিল বলে, যে মানুষ মদ মাংস বিনি থাকে না, সে হচ্ছে নাড়ুগোপাল।

তাই শুনে পাকুড় গাছ মাথা দোলায় আর বলে, হুঁ হুঁ, এই মানুষই তো নিকেচে—যে কালী সেই রাসবিহারী।

চিল তুচ্ছ করা হাসি হাসে, হুঁ, কোথায় অসি আর কোথায় বাঁশি।

পাকুড় ঝটকা দেয়, বাঁশি তো যুদ্ধকালেও বাজে রে খেপা।

চিল, সে হল বাঁশির বঠ্‌ঠাকুর। তার নাম ভেঁপু। আর কৃষ্ণের বাঁশি হল গিয়ে মধুর মুরলি ধ্বনি। দু'টির জাতই আলাদা।

—তাব আবার জাত-ধম্মের বিচার আছে নাকি!

চিল, তা যা বল্লে। আমি কাঁচা মাংস খেগো আর তুমি নিরিমিষ্যি বেধবা।

রামপ্রসাদ নাড়ু চিবোতে চিবোতে কন, তা পিসি, গদাধরকে সঙ্গে করে নিয়ে এলে না কেন? আমার ছেলেকালের মিতে বলে কথা। এক দেশে বাস কল্লেও কতদিন যে দেখা হয় না।

বুড়ি বিষণ্ণ মুখে বলে, বাবারে, তোকে দুখের কতা কী বলি বল দিকি।

—কেন কেন?

বুড়ি একটি লম্বা শ্বাস ফেলে বলে, ছেলের আমার কাল ব্যামো ধরেছে। যাকে বলে রাজযক্ষা। এই ঝাঁটার কাটির পারা হাত পা। বদ্যি বলেচে, যে কোনও সময়ে ছেলে মায়া কাটাবে।

রামপ্রসাদ অবাক নিঃশব্দে চেয়ে থাকেন বৃদ্ধার দিকে। বুকের নিধির নিদান হানা পাথর, সেই বুকেই বেঁধে নাড়ু, মোয়া খাওয়াতে এসেছে পরের ছেলেকে। ওধারে মুখে রক্ত ওঠা পুত্র দিন গুনছে। সংসারে বিশ্বজননীর কী লীলা। সেই লীলা বশেই বুড়ি সংসার থেকে আর একটি ছেলে চয়ন করল। এভাবেই হয়তো মানুষ নৈরাশে আশ খোঁজে। অকূলে কূল পায়। ভরা অমাবস্যায় চন্দ্রালোকের স্মৃতি সুখ মনে করে আনন্দ রচে।

জীবন তো আসলে এমনই।

চুয়ান্ন

মা গঙ্গাই সবকিছু জানেন। তিনিই যাবতীয় দেশকাল জানান রামপ্রসাদে। এখানে, এই এত দূর হালিসহরে বসে প্রসাদ দূর মুরসিদাবাদী যাবতীয় তত্ত্ব টের পান। ফলে তাঁর মনোযাতনা বাড়ে। কবির সহজেই ছোঁয়াচ লাগা চিত্তে বিচিত্র দোলাচল থরথর করে।

সেই মা জননী গঙ্গা তাঁর নিয়ম মোতাবেক হিসেব না কষে বয়ে চলেন। তাঁর স্রোতোমুখে মুরসিদাবাদের তপ্ত সমাচার প্রবাহিত হয়। সিরাজ সিংহাসনে আরূঢ় হয়েছেন যথাকালে। এবং কালের নিয়মে মাঝখানে এক মাসাধিক ঘটে গিয়েছে। এই সময়পতনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজদের সঙ্গে সিরাজের সম্পর্ক যথেষ্ট আড় হয়েছে।

কিন্তু এই গঙ্গা, যিনি একরূপে যেমন মাতঃ তেমনই অপরদিকে অতিমাত্রায় কামুকি প্রকৃতি। তা না হলে দেশজোড়া এত সন্তান তাঁকে মা বলে স্বীকার যায় কেমনকরে। তাঁর রূপ অতি মনোহারী। সেই রাজশ্রেষ্ঠ শান্তনু যখন মৃগয়াহেতু গঙ্গাতীরস্থ বনে একাকী ভ্রমণ করছিলেন, এক পরমাসুন্দরী দিব্যা রমণী জ্বলন্ত মূর্তি নিয়ে তাঁর সুমুখে উপস্থিত হলেন। সেই নারীর কান্তি পদ্মকোষবৎ।

এমত অবস্থায় দু'জনেই দু'জনার রূপমুগ্ধ। দেখে দেখেও নয়ন মেটে না। শান্তনু বললেন, সুন্দরী, আপনি দেবী? না দানবী? গন্ধর্বী? অপ্সরা?

কিংবা আপনি যক্ষী? না সর্পী? না মানুষী? দেববালিকাতুল্যে!

আপনি যেই হোন না কেন—ভার্যা মে ভব শোভনে। অর্থাৎ, আমার ভার্যা হোন।

গঙ্গা মৃদুহাস্যে রাজী হলেন। শুধু ওই একটি প্রস্তাব। আমি শুভ বা অশুভ যে কাজই করি না কেন আপনি বারণ করতে পারবেন না। করলে তৎক্ষণাৎ আমি আপনাকে ত্যাগ করে চলে যাব।

তথাস্তু। শান্তনু, যিনি জিতেন্দ্রিয় বলে খ্যাত ছিলেন, গঙ্গাকে পেয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন অতুল ভোগ আনন্দে। গঙ্গাও মানুষী মূর্তিতে ভার্যার মতোই সদা রাজার সঙ্গে রইতে লাগলেন এবং শান্তনুও সৌভাগ্যবশত দেবীর সঙ্গে নিয়ত কামব্যবহার করে চললেন।

বিপরীতে গঙ্গাও, যাতে করে শান্তনু কেবলমাত্র তাঁর সঙ্গেই রমণ করেন এমনভাবে শৃঙ্গারব্যবহার, কোমল নৃত্য, সম্ভোগ, অনুরাগ এবং রমণ বিষয়ে বিশেষ নৈপুণ্য দেখিয়ে রাজাকে সন্তুষ্ট করতে থাকলেন।

রমণে আচ্ছন্ন, আসক্ত শান্তনু এইভাবে বে-খেয়ালে কত না মাস, কত ঋতুনিচয় সেই দিব্যরূপা ত্রিপথগা নদী রমণীতে আসক্ত হয়েছিলেন তা তিনি নিজেও বুঝতে পারেননি। দিব্যরূপাপি সা দেবী গঙ্গা ত্রিপথগা নদী।

এই অবসরে গঙ্গাগর্ভে আটটি পুত্রসন্তান উৎপন্ন হয়েছিল। কিন্তু যখনই পুত্র জন্মায় গঙ্গা 'আমি তোমাকে সন্তুষ্ট করেছি' বলে প্রথমে তাকে জলে নিক্ষেপ করতেন। পরে স্রোতমধ্যে ডুবিয়ে দিতেন। এ খবর শান্তনু জেনেও জানতেন না যেন। ভয়ে তিনি গঙ্গাকে কিছু বলতেন না। এভাবে অষ্টম পুত্র জন্মালে শান্তনু আর্ত ক্রোধে বলে উঠলেন, মা বধীঃ

কাসি কস্যাসি কিঞ্চ হংসি সুতানিতি। আর পুত্র বধ করো না। তুমি কে? কার স্ত্রী? কি জন্য তুমি এদের বধ করছ রে পুত্রহত্যাকারিনী!

শর্ত অনুযায়ী গঙ্গা তখনই রাজনকে ত্যাগ করলেন। যাওয়ার আগে বলে গেলেন, বশিষ্ঠের অভিশাপগ্রস্ত আটজন বসুদেবতাকে গর্ভে নিয়েছেন তিনি। এই মর্ত্যলোকে শান্তনু ভিন্ন কেউই তাদের জনক হতে পারে না। আবার আমিও সে কারণে মানবী হয়েছি। আপনি তাদের পিতা হয়ে অক্ষয়স্বর্গের অধিকারী হলেন। আর আমিও সেই সপ্তসন্তানকে মনুষ্যজন্ম থেকে মুক্ত করেছি। এখন এই অষ্টম পুত্রটিকে আপনি পালন করুন। এ পুত্র মহানিয়মি আর গঙ্গার গর্ভজাত। আপনার মঙ্গল হোক। আমি এখন যাই। স্বস্তি তেহস্তু গমিষ্যামি পুত্রং পাহি মহাব্রতম্।

গঙ্গা শান্তনুকে পরিত্যাগ ও উদ্ধার করলেও তাঁর অগণ্য সন্তানদের মধ্যে রামপ্রসাদকে কখনও ছেড়ে যাননি। আহা! অগ্নিপুরাণের সেই বচনটি যদি প্রসাদের জন্য নির্ধারিত হয়, তাহলে সে এক পরম সার্থকতা।

অর্দ্ধোদকে তু জাহ্নব্যাং ম্রিয়তেহনশনেন যঃ।
স যাতি ন পুনর্জন্ম ব্রহ্মসাযুজ্যমেতি চ।

যে লোক উপবাসী থেকে নাভি পর্যন্ত জলে মগ্ন রেখে গঙ্গায় মরণ দেখবে, তার আর জন্ম হবে না। তার সাযুজ্যমুক্তি হবে।

পুরাণবচন রইলেও প্রসাদ মনে মনে বিশ্বাসের ভূমি থেকে এতখানি মেনে নিতে পারেন না। তাঁর মন বলে, গঙ্গার সলিল যেহেতু পুত, মেটে কলসিতে দিনের পর দিন সে জল ধরে রাখলেও তাতে কীট জন্মায় না, তাই তাতে মরণ হলে সে ভারী সুখের।

গঙ্গাই এসে খপব দিয়ে গেছেন এই ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১৫ এপ্রিল মুরসিদাবাদী সিংহাসনে বসবার পর থেকে সিরাজ খুব দ্রুত এগিয়ে চলেছেন। সে দৌড় রাজ্যশাসন ও রাজকর্ম প্ররোচিত। গঙ্গা নদীর খপর, মসনদে আরোহন করবার পরে পরেই একদিন তিনি তাঁর মহাপ্রতিদ্বন্দ্বী পিতৃব্য রমণীর সর্বস্ব লুণ্ঠন করেছেন। বিধবা ঘসেটি একাকিনী মতিঝিলের রাজপ্রাসাদে বাস করতেন। নবাব তাঁকে মহাসমাদরে প্রয়াত আলিবর্দীর মহিষীর সঙ্গে এক লপ্তে থাকার আবেদন জানালেন। সিরাজের ভঙ্গিটি ছিল নিবেদনের, কিন্তু নেপথ্য উদ্দেশ্য মতিঝিল দখল করা। ফলে তাঁর এই সবিনয় নিবেদন হয়ে দাঁড়াল বিনি বক্তপাতি এক সফল অভিযান। কে জানে, এর আসল রূপ হয়তো ঘসেটি বেগমকে নজরবন্দি করা। সে অনুমানও গঙ্গা নদীর খপরে আছে।

খপর আছে, এই মাসিমা ঘসেটির সঙ্গে তলে তলে ইংরাজদেরও যোগসাজশ আছে। মাসিমাটির মনোবাসনা ছিল সিরাজের বদলি আক্রামউদ্দৌলা অথবা পূর্ণিয়ার নবাব সৌকত জঙ্গকে নবাব করার। তা বাদে মাসিমা'র বিশ্বস্ত দেওয়ান রাজবল্লভ, লোকটি ভারী বিচক্ষণ আর বাঙালির ছেলে। পয়লা দফায় জাহাজি-ফৌজ দপ্তরে কেরানি, তারপর ঢাকায় ছোটলাটের খাস পেশকার। সেখান থেকে ধাপে ধাপে ঘষতে ঘষতে অবশেষে রাজা, ভারী চাট্টিখানি কথা নয়। এই রাজবল্লভ পুব অঞ্চলের বৈদ্য সমাজের মাথা-মস্তক। তিনি নাকি সে দেশের বৈদ্য সমাজের মধ্যে উপবীত ধারণ করার চল করেন।

এই রাজবল্লভ খাস ধনী ব্যক্তি। পুববঙ্গে লোকে কাউকে বড়লোকগিরি করতে দেখলে প্রবাদ কয়, বেটা সাক্ষেৎ রাজবল্লভের নাতি। সিরাজ তাঁর টাকাকড়ি আত্মগত করবার জন্যে ঢাকায় লোক পাঠালেন। চতুর ব্যক্তি রাজবল্লভ এমনটা ঘটবে আগে থেকে আঁচ করে পুত্র কৃষ্ণদাস বরাবর যাবতীয় সম্পদ নৌকায় করে ইংরাজদের আওতা কলিকাতায় পাঠিয়ে দিলেন। বাজারে খপর রটিয়ে দিলেন কৃষ্ণদাস পুরীধামে তীর্থে যাচ্ছেন। ফলে সিরাজ এক কপর্দকও পেলেন না।

রাজবল্লভ এধারে কাশিমবাজারের ইংরাজকুঠির কর্তা উইলিয়াম ওয়াটস'কে নিজ হস্তে রেখেছিলেন। সেই হাতের গুণেই কৃষ্ণদাস কলিকাতায় ইংরেজ আশ্রয়গত হয়েছেন। এধারে সিরাজের কানে খপর আসছে কলিকাতায় ইংরাজগণ দিব্য নবাবী চালে বাস করছে। দু'হস্তে ফুর্তির টাকা ওড়াচ্ছে। নবাবের সহচররা কানের গোড়ায় সর্বদাই বলতে লাগল কলিকাতার পথে ঘাটে ক্রোড় ক্রোড় টাকা পড়ে রয়। শুধু তুলে নিতে পারলেই হল।

সেই সঙ্গে আরও সমাচার—ইংরাজগণ নতুন করে গড় তোয়ের করছে নগরে। গঙ্গা নদীব খপর কিন্তু ভিন্ন কথা বলে। আসলে ইংরাজদের পিছনে আছে ফরাসি হানার ভয়। তাই তারা কলিকাতার উত্তরধারে বাগবাজারে কিল্লা ধাঁচের একটি ইমারতের মেরামতি কাজ ধরেছে। সেই বাড়ির নাম পেরিং। সিরাজ কিন্তু বে-খবরি। তিনি ইংরাজদের পত্র লিখে বললেন, তোমরা যে সব গড়বন্দি করবার আয়োজন করছ তা বন্ধ করো। মারহাটা খালটি ভরাট করে দাও। রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে পত্রপাঠ মুরসিদাবাদে ফেরৎ পাঠাও।

এতসব তোলপাড়ি সমাচারের মাঝখান থেকে মনে মনে সন্দ উঁকি দেয়, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কেন এত ঘন ঘন কলিকাতা যাচ্ছেন। কিংবা লোক পাঠিয়ে সেখানকাব কাদের কাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন!

এমনি সময়ে, এত সব উতরোলের মাঝখানে ভজহরির সঙ্গে এক মহাব্যক্তি এসে উপনীত হন প্রসাদের ভিটেয়। প্রাতঃকাল আরও খানিক গড়িয়েছে। মরণমুখী বন্ধু গদাধরের মা বিদায় নিয়েছে। ভজহরির সঙ্গে যিনি এসে উপস্থিত, তিনি বলরাম সেন। পাশের পল্লি বারেন্দ্রগলিতে নিবাস। এই নদে জেলার ডাকসাইটে কবিরাজ।

প্রসাদ উঠে দাঁড়িয়ে পায়ে হাত দিয়ে কবিরাজ মহাশয়কে আপ্যায়ন করেন। বলরাম হাত তুলে স্বস্তি জানান।

ভজহরি তড়বড়িয়ে বলে. কোবরেজ মশাইকে ধরে নিয়ে এলাম। উনি মুরসিদাবাদ নিয়ে অনেক তত্ত্ব করছিলেন আমার ঠাঁয়ে। তা আমি বল্লাম সে সব আমাব দাঠাকুর জানে।

কবিরাজ হেসে কন, কেমন আছ প্রসাদ? সংসারের খপর কি? তোমার মা জননীই বা কেমন আছেন?

এতগুলো প্রশ্নের জবাব প্রসাদ হেসে মাথা হেলিয়ে এক কথায় সারেন. আজ্ঞে আপনার আশীর্বাদে সবই কুশল।

—আমি সামান্য মানুষ। তোমার ওপর খোদ রাজা কেষ্টচন্দরের নজর আছে বাবা।

প্রসাদ মাথা নিচু করে বলেন, আজ্ঞে, আমি দীন ভিখারি। রাজার সঙ্গে আমার নজরদারি, সে তো অনেক দূরের কথা ঠাকুর্দা।

এই সম্বোধনে বলরাম মুহূর্তের জন্য আনমনে চলে যান। কেননা সংসারে মাতাল-বেতাল নামে রটিত এই রামপ্রসাদের সঙ্গে তাঁর জ্ঞাতিসূত্রে আত্মীয়তা রইলেও যোগাযোগ রাখেন না। এই কুমারহট্টের বৈদ্য পরিবারের পুরাপুরুষ গুপ্তবংশীয় এক প্রধান বৈদ্য ছিলেন রুক্মিণীকান্ত মজুমদার। তাঁর চিকিৎসাগুণলব্ধ 'কবিচন্দ্র' উপাধি ছিল। তাঁর এক কন্যের ধলহণ্ডীর বলরাম সেনের সঙ্গে 'দৈবযোগতঃ' বিবাহ হয়। সেই সূত্রে বলরাম সেন প্রসাদের জ্ঞাতিজ্যেষ্ঠ পিতামহ।

বলরাম মনে মনে জ্ঞাতিত্বের সুতোয় টান পাড়েন। কিন্তু যেহেতু সেটি প্রকাশ করা চলবে না, এবং যেহেতু তাঁর প্রয়োজন অন্যত্র, তাই ভিতরকার টান রপটানি সরিয়ে বলে ওঠেন, তুমি কি খপব জানো যে নতুন নবাব কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠি দখল করে সব ছারখার করে দিয়েছেন?

প্রসাদ মনে মনে বলেন, তাহলে সিরাজ আরও খানিক এগোলেন। ইংরেজদের কোণঠাসা করা আরম্ভ হল।

বলরাম বলেন, কাশিমবাজার আক্রমণ করে জয়ের পর এই নবাব এবার কলকেতার দিকে এগুচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে তিরিশ হাজার সৈন্য। আর সঙ্গী মীরজাফর, রায়দুর্লভ, মানিকচাঁদ, মীরমদন ইত্যাদি বলবান ব্যক্তি।

প্রসাদ মনে মনে কন, যুদ্ধ যুদ্ধ। কালীকাদেব্যা সমরে নেমেছেন। তিনি প্রত্যক্ষ রণ না করলেও পরোক্ষে তাঁর হাতচালনা চলছে। কৃষ্ণনগর পেরিয়ে কালনা বরাবর তিনি হুগলি এলেন। সেখান থেকে গঙ্গা পেরিয়েছেন। তারপরে চিৎপুরের খাল পেরিয়ে সিধে চলে এলেন হালসিবাগানে উমিচাঁদের বাগানবাড়িতে। সেখেনে রাতটি পার করে, যবনপঞ্জিকা মতে শুক্রবার শুভদিন দেখে, লালদিঘি বরাবর গোলা দাগতে শুরু করেছেন। বেলাবেলি নবাব কামান দেগে কলকেতার ইংরেজ দুর্গ দখল করে নিল। পরদিন সকাল না হতে দুর্গের ওপর গোলা পড়তে লাগল। ইংরেজ মহিলাদের নৌকো করে সরিয়ে দেওয়া হল। অনেক ভীতু বেটাছেলেও সেই সঙ্গে পলায়ন কল্লে। স্বয়ং গভর্নর ড্রেক সাহেবও অবশেষে সটকে পড়েছেন। এই অবস্থায়, কলকেতায় বিস্তর সাহেব-মেম পালাতে গিয়ে গাঙে ডুবে মরল। কলকেতায় এখন স্বধর্ম রক্ষে করতে আর নবাবের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে এক হলওয়েল সাহেবকে গভর্নর বানানো হয়েছে।

প্রসাদ এতক্ষণে কথা বলেন, তাবপর? তারপর মা গঙ্গা কি করলেন?

বলরাম অবাক নেত্রে একবার তাকালেন প্রসাদের দিকে। তারপর বলে উঠলেন, নবাব কেল্লা ঘিরে দখল করে নিলেন। কলকেতার নাম বদলে নতুন নামকরণ কল্লেন আলিনগর। হলওয়েল আর তাঁর কিছু সাঙ্গোপাঙ্গ নবাবের নির্দেশে কলকেতা দুর্গে বন্দী হয়ে রয়ে গেলেন। কলকেতা আর ইংরেজদের হস্তে নেই। এখন তা নবাবের অধিগত।

রামপ্রসাদ বলেন, আর? আর কি ঠাকুর্দা?

বলরাম কন, সে তো তুমি বলবে। বাকি খপর তো তোমার হাতে ভায়া।

রামপ্রসাদ গুনগুনিয়ে ওঠেন, চিকন কালোরূপা সুন্দরী, ত্রিপুরারি হর হৃদে বিহরে। অরুণ-কমলদল, বিমল চরণতল, হিমকর-নিকর রাজিত নখরে...

অনেক চেষ্টা চরিত্র করেও রবীন্দ্রনাথকে আনা যায় না। কিছুতেই সেই উড়ে আসা মালতী বিদেয় হতে চায় না। যতবারই তাকে সবিনয়ে চলে যেতে বলা হয় ততবারই সে কাগজের বুকে অস্থির পেনসিলের ঘোঁট পাকাতে থাকে। কীরকম যেন গোঁয়ার্তুমির ব্যাপার। নারায়ণ কাকা এবার আপনি আজ্ঞে থেকে তুমিতে নেমে আসেন। আসলে বোধহয় কতিপয় ভূতের সঙ্গে আপনি আপনি করলে তারা পরপর ভাবে।

নারায়ণ কাকা বলেন, তোমার নাম তো জানলাম। কোথায় বাড়ি ছিল বলো দেখি।

এবার কাজ হয়। সঙ্গে সঙ্গে পেনসিলে ছোট্ট একটি মোচড় পড়ে। আর অমনি আঁকাবাঁকা লেখা হয় গ-দা-ব-রি-মাঠ।

এ কথার মানে মানুষ কেন, কোনও ভূতও করতে পারবে না। তারপর তেমনই বিতিকিচ্ছিরি হাতের লেখা। কিন্তু আমার মাথায় তখনই কী অদ্ভুত চিড়িক করে। আমি বলে উঠি গদারপেড়ে মাঠ।

মানে, আমাদের এলাকার থেকে খানিক দূরে, উত্তর ধারে বিরাট এক মাঠ। সেখানে ফুটবল খেলা হয়। স্কুলের স্পোর্টস হয়। তার পাশে ছোট এক পুকুর বর্তমান। পুকুরধার ঘেঁসে ঠাসা পান বরোজ আর কিছু ফাঁকা ফাঁকা বেড়ার ঘর। এলাকায় পুরনো উদ্বাস্তু কলোনির মধ্যে ওটি একটি। ওই পুকুরটির নাম নির্ঘাৎ গদা। তার পাড়স্থ ওই বাস্তু এলাকা।

আমি বলি, গদারপেড়ে মাঠ?

পেনসিল খসখস করে। কী লেখে বোঝা যায় না। কাকা হেঁট হয়ে ভালো করে লক্ষ্য করে বলে ওঠেন, ঠিক আছে। ঠিক আছে। এবার তুমি যাও দেখি।

অমনি লেখা হয়, যামু না।

—কেন যাবে না?

--আমার ভালো লাগতাছে।

এ তো মহা মুশকিল। প্রেতাত্মার মানুষের সঙ্গ ভালো লাগছে। প্রেতলোকে কী মালতীর কোনও সঙ্গী-সাথী দলবল নেই! এমন একা একা থাকতে তার বুঝি ভালো লাগছে না।

কাকা বলেন, ঠিক আছে। আজ তুমি যাও। পরে আর একদিন এসো। তুমি বরং অন্য কাউকে পাঠিয়ে দাও।

আমি বলে উঠি, রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথকে পাঠাও।

পেনসিল খানিক থমকে যায়। তির তির করে কাঁপে। কী যেন ভাবে। তারপর টেরাবেঁকা আখরে লেখা হয়, হেইডা কেডা?

আমরা হতভম্ব। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এরকম মন্তব্য স্বপ্নেও ভাবা যায়! যাঁর ছবি বাঙালির ঘরে ঘরে, চায়ের দোকানে, ক্লাবে—তাঁকে নিয়ে এমন প্রশ্ন!

কাকা অপ্রস্তুত মুখে বলেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে। এবার তাহলে তুমি এসো।

মালতী এবার একটু মিইয়ে যায়। কী যেন চিন্তা করে। তারপর আস্তে সুস্থে লেখে, আবার কবে ডাকবা কও।

কাকা বলেন, তাড়াতাড়ি ডাকব।

মালতী সাঁ করে কাগজের মাথায় চড়ে বসে। তারপর লেখা হয়, জ্বালা। বড় জ্বালা।

পেনসিলের ভার যেন কমে যায়। কাত হয়ে হেলে পড়তে চায়। কিন্তু পড়ে না। কাকা আমার মা'র উদ্দেশ্যে বলেন, বউদি, এবার কাকে ডাকব?

মা খানিক ভাবে। আমার দিকে একবার দেখে। আমি কিছু বলতে পারি না। নতুন কোনও নাম আমার মনে আসে না চট করে। অমনি পেনসিল আপনা আপনিই নড়ে ওঠে। আমার মন বলে, যারা ছিপ ফেললেই টকাটক মাছ টোপ খায় তাদের বলা হয় মেছোরাশ। তাহলে নারায়ণ কাকার কি প্রেতরাশ?

এবার পেনসিলে গতি পড়ে। সেটি কিন্তু আগের মতো তুর্কিনাচন করে না। তার বদলে অনেক শান্ত আর ধীর লয়ে সে আগুপিছু করতে থাকে। কিংবা এক জায়গায় এসে খুব ধীরভাবে কী যেন চিন্তা করে। তারপর আবার গুটি গুটি চলা।

আমি মনে ভাবি, তাহলে কি এবার সত্যি সত্যিই রবীন্দ্রনাথ? এলে কি প্রশ্ন করব? ওঁর মতো মস্ত মানুষ, তাঁর সঙ্গে কথা বলা কী আমায় সাজে। তার ওপর ওঁর লেখাপত্র খুবই সামান্য নাড়াচাড়া করেছি। সত্যি কথা বলতে কী ওঁর উপন্যাসে দাঁত ফোটাতে পারি না। কেমন যেন বিলিতি বিলিতি মনে হয়। যাঁরা কথা কইছেন সবাই যেন আমার একেবারেই অচেনা। তাঁরা সব যেন দূর আকাশ থেকে উড়ে উড়ে কথা বলছেন। কেবল কবিতাগুলো—যা স্কুলে পড়ি বা পঁচিশে বৈশাখে স্কুলে বা পাড়ার ফাংশানে আবৃত্তি করি, সেগুলো বেশ ভালো লাগে। তবে আমার সবচেয়ে ভালো লাগে বিভূতিভূষণ। ওঁর 'পথের পাঁচালী', 'ইছামতি' আর বেশ কিছু ছোট গল্প পড়ে ফেলেছি আমার দাদুর সৌজন্যে। তারপরে তারাশঙ্কর। আর শেষকালে—সামান্য পড়া মানিক।

পেনসিল নড়া দেখে আমার বিভূতিভূষণের কথা মনে পড়ে। বইয়ে ওঁর ছবি আছে। মাথার পাশে সামান্য সিঁথি কাটা। কোনওমতে আঁচড়ানো চুল। পুরু ঠোঁটের ওপর সরু গোঁফ। কোঁচকানো চোখ। আর কপালের ঠিক মধ্যিখানে দু'টো ভুরুর জায়গায় খুব গভীর করে আঁকা ভাঁজ। যেন পাতলা ছুরি দিয়ে কেটে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

'অপু চমকিয়া উঠিয়া আকর্ণ-টানা জ্যা কে হঠাৎ ছাড়িয়ে দিয়া দেখিল তাহার দিদি জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতেছে। অপু চাহিতেই বলিল—হ্যাঁরে পাগলা, আপন মনে কি বকচিস বিড় বিড় করে, আর হাত পা নাড়চিস্?'

মনে মনে চমকে উঠি আমি। একলা হলেই হাতে একটা কঞ্চি নিয়ে কচাকচ বুনো গাছপালা, বিশেষ করে কচু গাছ ছত্রাকার করি। মনে মনে ভয়ঙ্কর যুদ্ধু যুদ্ধু ভাব হয়। সেই সময় আমিও তো ওইরকম বিড়বিড়িয়ে হুঙ্কার ছাড়ি। রিকশায় করে মা-বাবা বা কারও সঙ্গে কোথাও যাওয়ার সময় মনে করি, রাস্তার দু'ধারে সারিবাঁধা মানুষ আমায় দেখে হাত নাড়ছে। আমিও মনে মনে হাত নাড়ি। অনেকটা সেই একবার এক বিশেষ সিনেমা 'রাশিয়ায় নেহরু' দেখার কায়দায়। ওখানেও উনি গাড়িতে দাঁড়িয়ে যেতে যেতে দু'ধারের মানুষকে অমনি করে হাত নাড়ছিলেন।

এবার পেনসিলে লেখা হল ইংরেজিতে, Prof. J. L. Banerjee.

নারায়ণ কাকা প্রশ্ন করলেন, আপনি কোনও কলেজে পড়াতেন?

লেখা হল, বঙ্গবাসী।

একটুখানি চুপচাপ।

—কোন Subject বলবেন কি দয়া করে?

—Physics.

মা এবার প্রশ্ন করে, কীভাবে মারা যান?

উত্তর লেখা হয় ধীরে, unnatural death.

কাকা বলেন, আত্মহত্যা?

আর কোনও জবাব নেই। পেনসিলটা আলগা হয়ে যায়। তার গা থেকে ভার নেমে যায়।

পঞ্চান্ন

পিতামহ বললেন. অগ্ন আ যাহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে।

এর মানে হল, হে অগ্নি, তুমি আনন্দের জন্য এসো।

আমি হাঁ করে দাদুর মুখে চেয়ে থাকি। হচ্ছিল আমার পৈতে বা উপনয়নের কথা। সেখান থেকে হঠাৎ আগুন কেন! পৈতেয় অনেক হোম-যজ্ঞ হবে বলে কী! তাছাড়া আর কি হতে পারে?

দাদু এবার একটুখানি বিশদ হন।

—অর্থাৎ কিনা এককথায় এই আগুনই সব। মরণকালে যেমন লাগে, জন্মসময়েও। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে পরেই তো তাকে সেঁক-তাপ দিতে হয়। মায়ের গর্ভ থেকে বেরবার পর এই পৃথিবীর হঠাৎ উত্তাপের সঙ্গে মায়ের পেটের ভেতরকার গরমের বিস্তর লড়াই যুদ্ধ হয়। ফলে শিশু যাতে করে ধাতস্থ হয় সেইজন্যেই আগুন।

আমি বলি, কিন্তু সবাইকে তো মারা যাওয়ার পর আগুনে পোড়ানো হয় না। অনেককেই তো মাটিতে কবর দেওয়া হয়।

দাদু হাসেন, ঠিক কথা বলেছ। আসলে আগুনই তো অন্ন। অন্ন মানেই তো প্রাণ। পেটে ভাত না পড়লে আমার এই সব বক্তিমে বন্ধ হয়ে যেত। তাই তো বলা হল, তব শ্রিয়ো বর্ষস্যেব বিদ্যুতোহগ্নেশ্চিকিত্র উষসামিবেতয়ঃ যদোষধীরভিসৃষ্টো বনানি চ পরি স্বয়ং চিনুষে অন্নমাসনি। হে আগুন, তোমার বিচিত্র শোভাসমূহ জলবর্ষণকারী মেঘ থেকে আহরণ করা। সেই শোভা বিদ্যুতের মতো। তুমি যেন তখন বাঁধনছেঁড়া হয়ে উদ্ভিদ বন ইত্যাদি খুঁজতে থাক। তারা যেন তোমার মুখে অন্নের মতো। আর হ্যাঁ ভাই, অন্ন মানেই তো মাটি।

এতখানি বলে হাঁপরোগী দাদু একটু দম নেন। আর এত কথা শুনে আমি বারো আনা ধরতে পারি না। চার আনা নিয়ে লাট খাই মনে মনে। দাদুর এই এক অভ্যেস। যত খটমট শক্ত শক্ত কথা আমার সামনে উজোড় করে দেন। আর আমিও এসব শুনে শুনে এমন অভ্যস্ত যে আমার কাছে খুব স্বাভাবিক ভাবেই এ সব ঘটে যায়।

দাদু ডিবেয় দু-আঙুল ডুবিয়ে নস্যি তোলেন। কিন্তু নাকে দেন না। এটা ওঁর এক প্রকারের অভ্যেস। নস্যি নিয়ে দু-আঙুলে টিপে বসে থাকা, হয়তো এক আধ ঘন্টা বরাবর। তারপর পদার্থটার তেজ মরে যায়। নাকের কাছে তুলে যাচাই করতে গিয়ে দেখেন বিষয়টা ধুলোবৎ হয়ে গিয়েছে। ফলে আবার নতুন করে আঙুল ডোবানো। আবার খানিক সময় টিপে ধরে রাখা। সেইরকম টিপে ধরে বসে রয়েছেন আমার উপনয়নের আগের সন্ধেবেলা।

এ সন্ধে হল চোত মাসের মাঝামাঝি। বাইরে বসন্ত হাওয়ার দাপাদাপি। কে জানে এই হাওয়ার মাতনের মাঝখানে পড়ে আমাদের তেতলার ছাতের মধ্যিখানে টিনের মস্ত পাত্রে মাটি ঢেলে পুঁতে রাখা ফণীমনসা গাছটি একা একা কী করছে। সর্বাঙ্গে শানানো কাঁটার এধার ওধার বরাবর হু হু হাওয়া কেটে কেটে বয়ে যাচ্ছে। হাওয়ায় কাঁটা বিঁধছে না কাঁটায় হাওয়া! আমার কেন জানি ওই ফণীমনসার জন্যে ভারী মন কেমন করে। আর সেই ফাঁকে পিতামহ হেসে বলেন, আমি তোমার আচার্য গুরু হয়েছি বুঝলে। অবিশ্যি উপযাচক হয়ে।

আমি অবাক চোখ তুলে তাকাই। দাদু আবার বলেন, রোজ কিন্তু নিয়ম করে গায়ত্রী মন্ত্র পড়া চাই। আমি তোমায় সব শিখিয়ে দেবো।

আমি মনে ভাবি কাল রাত পোয়ালেই আমার পৈতে। বাড়িভর্তি লোকজন। কত সামগ্রী কেনা হয়েছে। তারমধ্যে বরবেশও আছে। গরদের জোড়। আর একটি টোপর। আমার চোখ ওই টোপরের দিকে। কেননা কাঁচরাপাড়া রেল কোয়ার্টারে থাকার কালে বিয়েবাড়িতে বর-বউ দেখে দেখে আমার কেবলই বিয়ে করতে সাধ হত। ফলে মাসকাবারির মালপত্র মুদির দোকান থেকে এলে মস্ত মস্ত কনকচূড় ধানের খইবোঝাই ঠোঙাগুলোর দিকে আমার নজর ধাওয়া করত। ওই ঠোঙা মাথায় পরে চেয়ারে বসে নিজ মনেই মিট মিট হাসতাম। ঠিক যেরকম গণেশকাকা, জগদীশ মেসোমশাইরা টোপর মালা পরে হাসেন। হাসেন আর আড়ে আড়ে তাকান।

বাইরে ছড়ানো উঠোনে ভিয়েন হচ্ছে। নৈহাটির নামকরা উড়িয়া ঠাকুর এসেছে দলবল নিয়ে। উনুন পাতার আগে ঠাকুরকে বড়ো মাটির সরায় করে আতপচাল, আনাজ, ফলমূল, পান-সুপারি, সর্ষের তেল ইত্যাদি সাজিয়ে ভুজ্যি দেওয়া হয়েছে। ঠাকুর সেটি গ্রহণ করে প্রকাণ্ড একজোড়া উনুন ফেঁদেছে। তাতে এখন বড় বড় পানতুয়া চড়েছে চ্যাটালো লোহার কড়াইয়ে। থই থই রসে ভাসন্ত টোপা টোপা পান্তুয়াদের থেকে থেকে রসের মধ্যে চেপে ধরা হচ্ছে ঝাঁঝরি দিয়ে। পান্তুয়ারা আস্তে আস্তে সাদা রং ছেড়ে ফিকে তামাটে, তারপর গাঢ় খয়েরি হয়ে উঠছে। ঠাকুর নির্বিকার গালে পান ঠুসে তাদের নাড়াচাড়া করছে। ভাবখানা এমন যে এমনটাই তো হয়। এর বাইরে আর কিছু নেই।

কানুবাবা এদিকে একা একশো হয়ে নেমতন্ন থেকে ধরে যাবতীয় কাণ্ডকারখানায় উন্মত্তপ্রায়। বেহালা থেকে আজ সকালেই এসে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের 'বেহালার দাদু'। আমার মেজো মা'র পিসেমশাই। পণ্ডিত কালীচরণ ভট্টাচার্য, ডাকসাইটে পুরোহিত এবং পণ্ডিত। গুপ্তপ্রেস পাঁজিতে তাঁর নাম ছাপা থাকে। ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ কাঠামোর উন্নতদর্শন বামুন। সেজন্যেই বন্ধু-স্বজনে তাঁর ডাক নাম 'কালো'। মানুষটির

ভারী বুদ্ধিধাঁধানো মুখের দিকে চেয়ে থাকতে ভালো লাগে। ফটফটে মাথাবোঝাই পাকা চুলের টঙে পাকানো শিখা, খড়গ নাসাগ্রে রোম আর নস্যির গুঁড়ো। আর অতি মনোহারী টানা টানা ডাগর দু-চোখ। তার কোণে টুক্ করে রক্ত ছিটে।

এই দাদু মানুষটি ভারী রসিক। ভাঁড়ার ঘরে দুপুরবেলা আমার দিদিমা, মা'র জেঠিমা ইত্যাদি কিছু মোটাসোটা রমণী একটু গড়াচ্ছেন। তিনি একবার ও-ঘরে উঁকি দিয়ে আমার মাতামহকে বিনীতভাবে বলে ওঠেন, আচ্ছা ছোড়দা, এই চিঁড়ে ভিজেনোগুলি কোত্থেকে আমদানি করলেন।

কিংবা, একদিন আমাদের বাড়িতে কী এক অনুষ্ঠানে এসে বাথরুম খালি না পেয়ে কলতলায় প্রবল বৃষ্টিতে ছাতা মাথায় দিয়ে চান করছেন।

পৈতে বাড়িতে যেন বিয়েবাড়ির ছটা। লোকজন দৌড়চ্ছে। জিনিসপত্র আনা হচ্ছে। বিভিন্ন কাজের লোক নানা কাজে বাবার সঙ্গে দেখা করতে আসছে। আমি ভিয়েনতলা থেকে চিলের ছাতে ম্যারাপ বাঁধা দেখছি অগণ্যবার। আমার কোনও কাজ নেই। কিন্তু সব কাজ আমাকে ঘিরেই।

মা বলে দিয়েছে বাইরে না বেরোতে। আর একটু আস্তে সুস্থে চলা ফেরা করতে। তার কারণ পড়ে গিয়ে বা ধাক্কা খেয়ে দেহের কোথাও চোট লেগে বিন্দুমাত্র রক্তপাত চলবে না। তাহলে পৈতে বন্ধ। খুঁতো শরীরে উপনয়ন হয় না।

আমি ভাবি, খুঁতো পাঁঠা কখনও বলিদানের যোগ্য হয় না।

কলকেতা নগর এখন নবাব সিরাজের অধিগত হওয়ার মুখে। নবাবের দখলে ইংরেজদের দুর্গ এল বলে। বহু ইংরেজ নারী-পুরুষ পলায়ন করেছে নবাবের তাড়নায়। কিছু মেম পালাতে গিয়ে গাঙে ডুবে মরেছে। হলওয়েল সাহেব গভর্নর বনেছেন নবাবের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে। কিন্তু তার পরে পরেই তিনি কলকেতা দুর্গে বন্দী হয়ে পড়েছেন। নগরের নাম কলিকাতার বদলি হয়ে নবাবের ইচ্ছায় আলিনগর। নবাব সিরাজের জয় হোক।

জ্ঞাতিসূত্রে ঠাকুর্দা কবিরাজ বলরাম সেন ভেষজরত্ন দেশকালের তত্ত্ব করতে এসে প্রসাদে মজে যান। বিশেষ করে সমাজে রটিত তাঁর এই কুলাঙ্গার নাতিটির অন্তর্জ্ঞান আর সদাশয় পাণ্ডিত্য দেখে। তিনি অনুভব করেন পলিত পুঁথির শরীরে এতকাল যা কর্ষণ করে আসছেন তার বাইরেও আছে যা তার নাম মহাজীবন। সে জীবন হাটে-মাঠে-বাটে-নদীতে ছড়িয়ে আছে। মিলে মিশে আছে এই সর্বধারণকারিণী প্রকৃতি মাতৃকার সংসার জুড়ে। সে সব তত্ত্বকথা অতি গুহ্য। লেখা নেই পুঁথির পাতে। নিবদ্ধ নেই পণ্ডিতের কূটকচালি অবয়বে। কিন্তু এই প্রাচীন বয়সে এসে বহুকালের সংস্কারী চিত্ত হতে পুরাতন ধারণাকে বিবাদী করে দেওয়া যে একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু এখন এই রামপ্রসাদের সুমুখে এসে কী বিড়ম্বনা। দেশের আগামী ভয়াবহতার সঙ্গে আরও এক অজানিত ত্রাস এসে বৃদ্ধ বলরামকে চিন্তিত করে। তিনি চোখ খুলেই দেখতে পান দ্বিপ্রহরগামী এই দিনটির পাশ দিয়ে আরও কতিপয় দিনের শিশু উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। তারা

খিলখিলিয়ে হাসছে। সে হাসিতে গাছে গাছে নবীন পত্রোদ্‌গম ঘটছে। জোড়া পাতার মাঝখানে ফুলকচি এখনও না ফোটা পাতার অংশটুকু কেটে নিয়ে শিশুরা মুখে পুরে জিভের তলে রাখছে। তারপর জিভে চাপ দিয়ে বিচিত্র এক কিচ কিচ শব্দ তোয়ের করছে। সে শব্দে কচিছানা পাখিদের সদ্য বোল ফোটা রোল। মহা আনন্দিত জাগরণ। মর্ত্যলোকের অতীত কখনও না শোনা এক নিরাবয়বী নাদ।

এই নাদটুকু মনে রেখে কিংবা তার জোয়ারে পড়ে বলরাম তাঁর এই পরিত্যক্ত নাতিটিকে বাড়িতে দুটি খাবার নিমন্ত্রণ করেন পরদিন দ্বিপ্রহরে। বলে যান, সকালেই চলে যেও। একসঙ্গে স্নান। একত্রেই ভোজন।

সেই কথা অনুযায়ী প্রসাদ-ভজহরি জ্ঞাতি পিতামহ ভেষজরত্নের দুয়ারে প্রাতঃকালেই উপস্থিত। দুয়ারের সুমুখে একজোড়া প্রশস্ত থাম। তার পিছনে গোলা পায়রার উঁকিঝুঁকি। চাপা বকবকম।

উঁচু দরজার ওপারে ছড়ানো উঠানে চাটাই বিছিয়ে হরিতকি, বহেড়া, দারুচিনি ও রাজ্যের শিকড়বাকড় পেতে রাখা। থরে থরে পাথরের পাত্রে রাখা বিবিধ ভেষজ। এক একটির বর্ণ এক এক। হরিৎ, পীত, নীল, রক্ত, সবুজ, খয়েরি, খর কালো—এমনই কত কী। সেইসব দ্রব্যের ঝাঁঝাল বাস এই দুয়ার হতেই টের পাওয়া যায়। ওখানে যা যা আছে সে সবই প্রকৃতি সঞ্জাত। ফলে এই যাবতীয় গন্ধ এক লপ্তি হয়ে, তাবৎ বিভিন্নতাকে একীভূত করে এক প্রাগৈতিহাসিক গন্ধ-সমারোহ তৈরি করেছে। আর এখানেই প্রসাদের মনে হয়, এ সংসারে মানুষ তথা সকল প্রাণীর কতবিধ না ব্যাধি-রোগ। এই বিশ্বপ্রকৃতি তার সন্তানকে আরোগ্য দিতে নিজের বুকেই কত না ওষধি সৃজন করেছে।

ভজহরি খাটো গলায় বলে, দাঠাকুর। এ আমরা কোতায় এলেম গো। রাজ্যের বনবাদাড় জড়ো করেছে। বিকট গন্ধ ছাড়ছে।

প্রসাদ শুধু বলেন, তাই তো।

অমনি বাড়ির ভিতরমহল থেকে কার পায়ের শব্দ উঠে আসে। উঠানের কোণে সটান সজিনা গাছে সকালবেলাকার পাখি ডাকে কিচিরমিচির। গোহালে হাম্বা দেয় বাছুর। দু'জন কবিরাজ সহকারী ব্যক্তি কাঁধের উত্তরীয় দিয়ে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে বাইরের পথ থেকে অন্দরে সেঁধোয়। দু'জনারই হাতে লতা দিয়ে বাঁধা কিছু শিকড়বাকড়াদি।

ভিতর হতে সেই পদশব্দ এবার উঠানের গায়ে তোলা নিচু পাঁচিলের দুয়ারে এসে থামে। একজন মাঝবয়েসি ব্যক্তি। মোটাসোটা চেহারা। খালি গা। হাতে থেলো হুঁকা। লোকটি ভুড়ুক ভুড়ুক টান দিচ্ছে আর ধোঁয়া ছাড়ছে।

দরজার ধারে দু'জনাকে দণ্ডায়মান দেখে থেলো হুঁকা প্রথমে মোটা ভ্রূ জোড়া নাচায়। তারপর বলে ওঠে, কোবরেজ মশাই এখন গঙ্গা নাইতে যাবেন। তিনি আমার খুড়োমশাই। আমার বাড়ি ভাজনঘাট। আমার বাল্যকাল থেকেই মাথার ব্যামো। বহু চিকিচ্ছে করে এখন খুড়োমশাইয়ের ঠাঁয়ে উপনীত আছি। দেখি উনি কী করেন।

এক দমে এতগুলো কথা বলে লোকটি আবার হুঁকার ভাবায় মুখ রাখে। ভজহরি বলে ওঠে, তার মানে উন্মাদ। মহাশয়ের নিবাস তো জানা গেল। এখন নামটি কী শুনি।

হুঁকা মুখ তুলে বলে, আমার নাম সিরিযুক্ত রামপ্রসাদ সেন। আমি গুড় খেতে ভারি ভালোবাসি।

ভজহরি চমকে তাকায় প্রসাদের মুখে।—অ দা-ঠাকুর। এ যে দেখছি দু'রকম দা-ঠাকুর। এ কোতায় এলাম গো।

হুঁকা বলে, ঠিক জায়গাতেই এয়েচেন। আমি দেখেই বুঝিচি আপনার সঙ্গের লোকটির আমার মতো একই দশা। উনি কি মানুষকে মারধর করা অবদি গড়িয়েছেন? আমি ওসব আগে করতাম। এখন মাথায় রোদ লাগলে অমনটি হয়। তখন রাম-রাবণ কাউকেই মানিনে, হুঁ।

ভজহরি বলে, এ তো ভারী বিপদ দাদা। চলো চলো, ঘরে চলো। রোদ উঠে গেচে অনেকক্ষণ। এরপর নির্ঘাৎ মারধর পড়বে।

হুঁকাধারী এবার হো হো অট্টহাস্য করে ওঠে। তারপর বলে যায়,

ক্রূরস্য শ্লেষ্মণা বৃদ্ধী রক্তস্য চ তথা পুনঃ।
বায়ুঃ ক্রূরভাবশ্চ দ্বাদশ্যাস্তু ভবেত্ততা।।

দ্বাদশী তিথিতে রক্ত ও ক্রূর শ্লেষ্মা বৃদ্ধি পায়। বায়ুও ক্রূর হয়।

ভজহরি সভয়ে বলে, বাপ্ রে, যে পাগল সমসকিতো বলে সে এই কামড়াল বলে। চলো দাদা, পাইলে যাই।

হুঁকা ক্রূর হাস্যমুখে কয়, হুঁ, আজ দ্বাদশী তিথি। আমি বুঝতে পারছি আমার বায়ু কেরমে কুপিত হচ্ছেন।

ঠিক তখনই ভিতরমহল থেকে কে যেন গলা তুলে বলে, কার সঙ্গে কথা কচ্ছিস রে রেমো?

হুঁকা চমকে ওঠে।—আমি কোনও কথা কইনি। এনারাই কইছেন। আমায় বকিয়ে মারছে গো। একজনা উন্মাদ—মানে গিয়ে তোমার শিররোগ। আর একটি, আর একটি, ঠিক ধত্তে পাচ্ছিনি।

ভিতর থেকে কথা বলা মানুষ খড়ম দাবড়িয়ে বাইরে আসেন। পরণে থান। কাঁধে গামছা। হাতে তেলের ডিবে। তিনি বলরাম কবিরাজ ও প্রসাদের ঠাকুর্দা সম্পর্কি। বলরাম কটাক্ষ রাখেন তাঁর কথিত ভাইপোর দিকে। তারপর রাগতঃ স্বরে বলে ওঠেন, ভিতরে যাও। তোমায় এখেনে আসতে কে বলেছে।

—আজ্ঞে কেউ না। আমি এমনি এমনিই এলুম।

—এবার এমনি এমনিই ভিতরে যাও।

—যে আজ্ঞে। থালে খুড়োমশাই, কাল তো ত্রয়োদশী। মানে হল গিয়ে—ওইদিন বার্তাকু ভক্ষণে নিষেধ আছে। বার্তাকী পাচনী বৃষ্যা কণ্ডুকৃদ্রক্তপিত্তনুৎ। ঠিক কিনা খুড়োমশাই।

এবার খুড়ো তেতে ওঠেন যথার্থই, তুই ভিতরে গেলি।

হুঁকা প্রায় লম্ফ দিয়ে পিছু হটে। আর হটতে হটতে বলে যায়, বর্ষাকালে বায়ু, পিত্ত, কফ, ত্রিবিধ দোষই যুগপৎ কুপিত হয়। ভূমি হইতে বাষ্প উত্থিত হয়ে বায়ু, মেঘ হইতে বারিপতন জন্য পিত্ত এবং বর্ষার জলে শ্লেষ্মা প্রাবল্য লাভ করে। এই ত্রিদোষজনিত কারণে জঠরাগ্নি দুর্বল হয়...

প্রসাদ ঠাকুর্দাকে প্রণাম করে কন, এ তো দিব্য পণ্ডিত ঠাকুর্দা!

বলরাম বলেন, নাগাড়ে অধ্যয়ন করে করেই ওর এ অবস্থা। মেধাসম্পন্ন ছাত্র ছিল। কিন্তু সবার ধারণক্ষমতা তো সমান নয়। চলো, এবার স্নানে যাওয়া যাক।

স্বভাবতই মনে ভাবা গিয়েছিল হাতের গোড়াতেই যে স্নানের ঘাট, সেখানেই যাওয়া হবে। কিন্তু বলরাম সে ঘাট ফেলে রেখে সিধে হন্টন ধরেন। ভজহরি প্রশ্ন করে, থালে আমরা কোন দেশে চানে চল্লাম ঠাকুর্দা।

বলরাম স্মিত গম্ভীর মুখে বলে, কাঞ্চনপল্লির ঘাট। এই তো, নিকটেই।

ভজহরি মনে মনে আঁক কষে পথ হন্টনের। এখান থেকে দু-আড়াই ক্রোশ তো বটেই। কোবরেজ মশাইয়ের বুঝি হাঁটুনে স্বভাব আছে। হাঁটলে শরীর ধাতে থাকে। তাই বুঝি বৃদ্ধ মানুষটির কাঠামো এখনও সটান মজবুত।

বামে ঈশ্বরপুরীর পাট বা চৈতন্য ডোবা ছেড়ে পথ ঘুরে যায় দখিনে। তারপর সিধে উত্তরমুখো হাঁটা। হাঁটতে হাঁটতে বলরাম বলেন, গত রাতে কলকেতার খপর এল। আমার মেজো শ্যালকের পুত্র, যে কিনা কালীঘাটে থাকে, এখানে এসেছে। সে বললে কলকেতা এখন সিরাজউদ্দৌলার হাতে পড়ে তছনছ হচ্ছে। ওদিকে হলওয়েল সায়েব নতুন গভর্নর বনে নিজেদের ঘাঁটি আগলানোর চেষ্টা করছিলেন।

প্রসাদ বলেন, শুনেছি এই সায়েব লোকটি লেখাপড়া জানা লোক। তার ওপর নিজের দেশ বিলেত থেকে পাস দেওয়া ডাক্তার।

বলরাম মৃদু ঝামটিয়ে ওঠেন, ওদের ওষুধ বলতে আছেটা কি? নাড়িজ্ঞান বলতে ও কম্মো।

প্রসাদ টের পান ভেষজবিশারদের মানে লেগেছে। তাছাড়া এ বৃত্তি তো তাঁর বাপও করে গিয়েছেন। অতএব এ নিয়ে বাগবিস্তারে কাজ নেই।

বলরাম বলেন, হলওয়েল সাহেব দুর্গের বাইরে যত সৈন্য ছিল সবাইকে ভেতরে আসতে আদেশ দিলেন। স্থির হল যাবতীয় লড়াই যুদ্ধ এখেন থেকেই হবে। সবাই বুঝল, যুদ্ধ শেষ হতে আর অধিক বিলম্ব নেই। তখন দুর্গের মধ্যে অন্ধকার ঘরে বসে ইংরেজরা দেখলে কেল্লার বাইরে আলোয় আলো। চারধারের সব বাড়িতে নবাবের সেনারা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। গভীর রাতে ইংরেজদের তিপ্পান্নজন পল্টন পালালে প্রাণভয়ে। বাকিরা গড়ে বসে মদ্যপান করে আতঙ্ক ভুলতে চাইল।

পরদিন কোনওমতে সকাল হল। নবাবের সৈন্যরা গোলা ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে আসতে লাগল। নবাবের দলে ফিরিঙ্গি আর ফরাসি সৈন্যও আছে। তারাও কামান দাগতে লাগল। আস্তে আস্তে দুর্গের তিনদিক নবাবের সৈন্যরা ঘিরে ফেললে। তখন ফোর্ট উইলিয়াম বুরুজের ওপর থেকে গুলি চালিয়ে ইংরেজরা নবাবের অনেকগুলো লোক মেরে দিলে। আবার নিজেদের তরফেও অনেক সৈন্য জখম হল, জনা পঁচিশেক মারা গেল। হলওয়েল পলায়ন করবেন বলে একখানি জাহাজ মজুদ রেখেছিলেন গাঙে। কিন্তু সেটি দুর্গের কাছে চড়ায় ঠেকে জলমগ্ন হয়ে বসে আছে। এদিকে হয়েছে কী, একজন ডাচ পল্টন প্রাণের ভয়ে পালাবার সময় দুর্গের থেকে গঙ্গায় যাওয়ার গুপ্ত ফটকখানা ভেঙে দিয়ে চলে গিয়েছে। আর অমনি সেই পথে নবাবের সৈন্যরা দলে দলে কেল্লার ভেতরে ঢুকে পড়ছে। এমনিকালে, সাহেব যখন ভাবছেন লড়াই করে প্রাণ দেবেন, তখন

নবাবের এক লোক এসে খপর দিলে, অস্ত্র ত্যাগ করলে কোনও অত্যেচারই করা হবে না। তাই হল। লড়াই থেমে গেল। নবাব সিরাজ একটি দোলায় চড়ে এসে নামলেন কেল্লার ভেতরে। হলওয়েল তাঁকে কুর্নিশ করলেন। নবাব দুর্গটা ঘুরেঘারে খানিক দেখে সাহেবকে বললেন, তোমাদের গভর্নর ড্রেক লোকটা নিরেট গদর্ভ। তারজন্যেই তো এমন সুন্দর নগরটা আমায় নষ্ট করতে হল।

ডাইনে কৃষ্ণরাইজির মন্দিরের নহবৎখানা। ঠিক সেখানেই বিপরীত দিক হতে গঙ্গাস্নান সেরে আসা তিনজন মানুষ কবিরাজ মহাশয়কে দেখে হেঁট হয়ে পেন্নাম করল। বলরাম হাত তুলে আশীর্বাদ জানালেন কতক আড়ষ্টভাবে। সেটি প্রসাদের নজর এড়াল না।

তারা খানিক এগিয়েছে। কবিরাজ হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে তাদের উদ্দেশে হেঁকে বললেন, ওহে, একজন একবারটি এসো তো। একটি কথা আছে।

বলা মাত্র চলন্ত তিনের একজনা ফিরে এল কবিরাজের কাছে। তিনি গলা খাটো করে বলে উঠলেন, একটি কথা যে না বললে নয়।

সে অবাক বলে ওঠে, বলুন আজ্ঞে, বলুন।

কবিরাজ নির্বিকার বলে যান, তোমাদের মধ্যে ওই তৃতীয় লোকটির আর ঘণ্টাখানেক পরমায়ু।

ছাপ্পান্ন

মুখের সামনে এমন একটি ঘোষণা শুনে বাজপড়া হতচকিত সেই তিনজনের একজনা। বাকি দু'জন খানিক এগিয়ে গেছে। এই একজন পড়ল মহা আতান্তরে। এ যে একেবারে নিদান হাঁকা হল। মাত্র ঘন্টাখানেক পরমায়ু ওই তৃতীয় ব্যক্তির। যেচে ডেকে নিয়ে এই বৃদ্ধ কেমন করে এ কথা শুনিয়ে দিলেন। তাছাড়া এমন একটি ঘোষণা, যা প্রায় গোপনে বলা হল, সেটি কোন মুখে বাকিদের জানায় এই তৃতীয়?

বলরাম কবিরাজ আর সময়ক্ষেপ না করে গঙ্গার দিকে হাঁটা ধরলেন। সঙ্গে অবাক রামপ্রসাদ আর ছানাবড়া চক্ষু ভজহরি।

ভজহরি প্রসাদের কানের কাছে মুখ এনে কয়, অ দাদা, আমার যে বুক কেমন কচ্চে।

প্রসাদ ভ্রূ কোঁচকান, কেন?

—যদি এবার আমার মুখের পানে চেয়ে হেঁকে বসেন—তোর হয়ে এল ছেলে। তোয়ের হ। থালে কি হবে।

—কী আবার হবে। তুই জিগ্যেস করবি—সময় কতখানি পাওয়া যাবে। বাস, ফুরিয়ে গেল।

—ফুরিয়ে গেল বললেই হল। তুমি যা হোক আচ্ছা মানুষ দাঠাকুর।

এই দু-কথায় বলরাম খানিক এগিয়ে পড়েন। আর চলতে চলতে পেছু না ফিরে তিনি বলে ওঠেন, আমার নিদান আজ অব্দি মিথ্যে হয়নি।

পা লম্বা করে প্রসাদ কবিরাজের নিকটে এসে পড়েন। সঙ্গে ভজহরিও। প্রসাদ বলেন, ঠাকুর্দা, যদি অপরাধ না নেন তাহলে একটি নিবেদন করি।

ভ্রূ বাঁক নেয় বলরামের।—কী নিবেদন শুনি।

প্রসাদ নত গলায় বলেন, বলছিলাম—লোকটিকে বাঁচার জন্যে কোনও ওষুধপালা দেওয়া যেত না কি?

পাকা ভ্রূ জোড়া এবার আস্তে আস্তে শিথিল হতে থাকে। এক জায়গায় এসে তারা সরল হয়ে যায়। বলরাম সংক্ষেপে একটি নিঃশ্বাস রাখেন। তারপর আগের মতোই স্বাভাবিক স্বরে বলে ওঠেন, কী করব ভায়া। আর যে সময় হাতে নেই। ওকে যেতেই হবে আর কিছু পরে। কেউ ওকে রক্ষে করতে পারবে না। মৃত্যু ওকে আস্তে আস্তে গ্রাস করে ফেলছে।

প্রসাদ শিহরিত হন এই দৃঢ় কণ্ঠস্বরেব সুমুখে। তিনি ব্যস্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন, কিছুই কি করবার নেই ঠাকুর্দা?

এবার কাষ্ঠহাসি হাসেন কবিরাজ, শিবেরও অসাধ্য।

গঙ্গার স্রোতে সকালের ক্রমে বেড়ে ওঠা রোদ পড়েছে। স্রোতের মুখে অবিরল ঝিকিমিকি ছুটে চলেছে। নদীর ওইপারে ত্রিবেণী। সেখানেও মানুষজন স্নানে মজেছে। এপারে ওপারে সূর্যকবচ আওড়ানো হচ্ছে। কেউ বা পূর্বপুরুষদিগে তর্পণ করছে মহানিষ্ঠায়। গাঙে নৌকা চলেছে। পসরা ও যাত্রীবাহী দুই। নৌকার মানুষজন কলকল বাক্য চালাচালি করছে। বাতাসে তামাকুর কড়া গন্ধ খেলছে। তারই মধ্যে একটি সুবৃহৎ বজরায় বেশ ক'জন লালসাহেব নিজেদের মধ্যে কী সব খটমট গম্ভীর আলোচনা করতে করতে বয়ে যাচ্ছে। সকালবেলাকার সূর্যের আলোয় তাদের মাথার পালক গাঁথা টুপিগুলো ঝিলিক দিচ্ছে। শ্বেত পালকে কোথা হতে যেন রক্তের ছিটা লেগেছে।

সেই ফাঁকে গঙ্গার স্রোত প্রসাদের কানে কানে কয়ে যায় দেশকালের গুপ্ত বিবরণ। মা বুঝি ব্যথার কুসুমগুলি বেটার মস্তকেই উবুড়চুবড়ি দিতে পছন্দ করেন। সেই পছন্দ মোতাবেক সেদিন রাত্তের বেলা কতিপয় ইংরাজ সেনা বেপোট মদ্যপান করে নবাবী পাহাদারদিগের সঙ্গে মারামারি বাঁধিয়ে দিলে। গোলমাল দেখে নবাবের প্রহরীরা ছুটে এল। দেখল মাতালদের বিচার করা সহজ কর্ম নয়। অতএব তাদের ধরে পাকড়ে নিয়ে গিয়ে ইংরাজদের নিজেদের গারদখানায় গাদাগাদি করে পুরে দিল। এ খপর নবাব সিরাজের জানার বাইরে। তিনি তখন অন্যত্র বিশ্রামরত ও নিদ্রিত। তবে এ ঘটনার পশ্চাতে আর কোনও কারুকার্য আছে কি?

কিন্তু নবাবের অজানিতে যারা ওই মানুষগুলিকে ওই গারদখানায় দাখিল করলে সেটি এমন কিছু পরিসরি নয়। রটনা হল, ওখানে ১৪৬ জন মানুষকে নাকি অন্ধকূপসম ঘরে বন্দি করা হয়। তাদের মধ্যে নাকি ১২৩ জন মৃত্যু দেখে। তারই মধ্য থেকে হলওয়েল এক জেনানা-সহ ২৩ জন ব্যক্তিকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে সমর্থ হলেন।

এখানে একটি সিধে তর্ক হয়। প্রথমত ওইপ্রকার এক ছোট ঘরে ১৪৬ জন পাটভাঙার দেহধারী বিদেশিকে কয়েদ করা—সে ভারী অসম্ভব বিষয়। তা ছাড়া প্রথমকাল হতেই কলিকাতায় বিদেশিদের সংখ্যা স্বল্প ছিল। তার ওপর বিগত চিৎপুর আর লালদিঘির পহেলা যুদ্ধে বিস্তর লোক মারা যায় ও পলায়ন করে। সব মিলিয়ে জনা খাটেক লোক থাকার কথা। আসলে, যাদের পরে আর কোনও তালাশপত্র পাওয়া যায়নি, ধরে নেওয়া হল, তারাই সব অন্ধকূপে মরেছে।

২১ জুন প্রাতে হলওয়েলকে অন্ধকূপ হতে খালাস করে নবাবের কাছে দাখিল করা গেল। নবাব রয়েছেন দুর্গের কাছেই এক সাহেবের বাড়িতে। তিনি উমিচাঁদের বাগানবাড়িতে আর ফেরেননি।

নবাব হলওয়েলের কাছে যাবতীয় বিবরণ শুনে চমকিত ও তাজ্জব বনলেন। তাঁর বোধ হল এই সাহেব ফেনিয়ে ফেনিয়ে অনেক বাড়তি বলছেন। আসলে গোটা ব্যাপারটি সিরাজের নিদ্রাবকাশের কালে ঘটে গিয়েছে। যে কোনও মরণই বেদনার। এক্ষেত্রেও সেই একই বাক্য ভিন্ন আর কিছু নেই। কিন্তু নবাব কী বুঝতে পেরেছিলেন এই হলওয়েল সাহেব ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নন! সাহেব এ নিয়ে মহা হেস্তনেস্ত বাঁধাবেন। ইতিহাস নিয়ে ছেলেখেলা করবেন।

কলিকাতা নগরীতে অনেক ধনসম্পাদাদি পাওয়ার আশা ছিল নবাবের। কিন্তু লবডঙ্কা। সামান্য কিছু নগদ অর্থ ছাড়া গুপ্তধনের কোনও সন্ধানশুলুকই পাওয়া গেল না। হতাশ ক্রুদ্ধ নবাব কিছু ঘরদোর পুড়িয়ে দিলেন। ড্রেকের আলয় মনে করে ভিন্ন একটি বাড়ি ভেঙে ধূলিকণা করলেন। আর কেল্লার চৌহদ্দির মধ্যে একটি মসজিদ গড়ার নির্দেশ জারি করা হল।

কলিকাতার দায়িত্ব—নবাব তুলে দিলেন রাজা মানিকচাঁদের হস্তে। এই ঘোষের ব্যাটা আদপে কোন্নগরের সন্তান। প্রথম জীবনে বর্ধমান রাজার গোমস্তাগিরি করতেন। বেহালায় তাঁর মস্ত বাগানবাড়ি। আলিবর্দীর আমলে তিনি তাঁর সেরেস্তায় কাজ নেন। প্রথমদিকে মানিকের সঙ্গে নবাবের প্রীতির সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু এই মানিক সুকৌশলী। তিনি আস্তে আস্তে ছল বিস্তার করে নবাবকে প্রায় ট্যাকস্থ করে ফেললেন।

২৪ জুন ১৭৫৬ সাল। কলিকাতা বিজয়ী নবাব সিরাজউদ্দৌলা রাজধানীর দিকে যাত্রা করলেন। সঙ্গে নিলেন কাশিমবাজারের কলেট আর ওয়াটস্-কে। পথিমধ্যে নবাবের তাঞ্জাম এসে থামল চন্দননগর-চুঁচুড়ায়। সেখানে ফারসি আর ডাচদের ঘাঁটি। সেখান হতে বেশ ভালোই পাওনাগণ্ডা হল নবাবের নজরানা-উপঢৌকনাদি। নবাব-মন্ত্রী-অমাত্যদের হেঁকে বললেন, ও হে শোন সব। আমার পানা বুদ্ধিমন্ত আর বাহাদুর একই লপ্তে আর কে আছে বল দেখি। আমি যুদ্ধ করলাম ইংরাজদের বিরুদ্ধে সেই লড়াইয়ের তাবৎ খরচপত্র তুলে নিলাম ফরাসি আর ডাচ্‌দের থেকে।

নবাব প্রত্যাবর্তন করলেন মুরসিদাবাদে ১১ জুলাই। দিল্লির বাদশাহ দ্বিতীয় আলমগিরকে পত্র লিখে জানালেন—তৈমুরলঙের পর তামাম হিন্দুস্তানে এত বড় জয় আর কারও নসীবে হয়নি।

সিরাজ দরবারে বসে সভাসদদের হেঁকে বললেন, এই টোপিওয়ালা ইংরাজদের তাড়াতে হলে কোনও অস্ত্রশস্ত্রের দরকার নেই। তার বদলে তাঁর একপাটি চটিজুতাই যথেষ্ট।

কিন্তু নবাব জানতেও পারলেন না, তাঁর স্বরচিত জয়ঢক্কার পাশাপাশি গঙ্গার দু-কূল জুড়ে শুধু বদনাম, নবাবের বেলাগাম বদনাম। সে কথা গঙ্গা মা রামপ্রসাদের কানে কানে বিস্তারে কয়ে গেল বৈকি।

তিনজনারই মুখে কথা নেই। তিনজনাই স্নানে নেমেছেন। প্রসাদ ভজহরির মন প্রথম থেকেই বিষণ্ণ হয়ে আছে। আহা, সেই অচিন মানুষটি বুঝি ঘরে গিয়ে গৃহদেবতাকে পূজা দিয়ে কিছু জলপানি নেবে। কিন্তু সে পর্যন্ত সময় হবে কী। কবিরাজ যে সপাট একটিমাত্র ঘণ্টার নিদান হেঁকে বসে আছেন। এতদসত্ত্বেও প্রসাদ ভজহরি দু'জনারই মনে মনে সন্দেহের দোলাচল। বৈদ্য রোগী দেখলেন না, দেখলেন না নাড়ি, আর অমনি কালান্তকি ঘোষণা দিয়ে বসলেন। এ কেমন করে সম্ভব। কী রহস্য আছে এর পশ্চাতে?

যেহেতু মন অবনত তাই বেরোবার পথ বলতে প্রসাদের সম্বল গান। ওটি হলেই অনেক ঝাপটা আর দোলন জুড়োয়। মন মনের স্থানে ফিরে আসে।

রামপ্রসাদ দেখেন গাঙে নৌকা চলছে হরেক। এক একটির পাল আবার বিচিত্র রঙা। কারও বা শাদামাঠা। এরই মধ্যে এপারের নাও ওপারে যেয়ে লাগছে। ওপার এপারে। যাত্রীদল কলকলিয়ে নামাওঠা করছে। প্রসাদের মনে নবীন এক গীত মুখ তোলে। দেদার গাঙের উতরোল হাওয়ায় তিনি কণ্ঠ পেতে দেন।

তারা তরী লেগেছে ঘাটে।
যদি পারে যাবি মন আয় রে ছুটে।
তারা নামে পাল খাটায়ে ত্বরায় তরী চল বেয়ে,
যদি পারে যাবি দুখ মিটাবি,
মনের গিরা দে রে কেটে।।
বাজারে বাজার কর মন,
মিছে কেন বেড়াও ছুটে।
ভবের বেলা গেল, সন্ধ্যা হল
কী করবে আর ভবের হাটে।।
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, বাঁধ বে বক এঁটে সেঁটে।
ওরে এবার আমি ছুটিয়াছি,
ভবের মায়া বেড়ি কেটে।।

সকালবেলায় সন্ধ্যার বিষাদ গান। আসলে কবির কাছে দিবা-সন্ধ্যার কোনও প্রভেদ নেই। আর এখানে কবির কোনও হাতও নেই। মনের গিরা কিংবা গেরো সতত বাঁধা রয় অলীক মহা খোঁটার সঙ্গে। সে দণ্ডের সঙ্গে জীব সংসারের আজব যোগ। সকলে তার তালাশ পায় না। এই খোঁজ তত্ত্ব বুঝি একমাত্র কবিদেরই বরাতে রয়। সেই বরাত অথবা যোগসাজোশের অন্তর্কথা কবিও জানতে পারে না।

বলরাম ঠাকুর্দার বাড়িতে পৌছে কলার পাতে দই-চিঁড়া আর ঘরে তৈয়ার মিষ্টান্ন নিয়ে সবে ঠাকুরমা হাজির হয়েছে, এমন কালে সদর দুয়ারে কোলাহল। দু-চার-দশ-কুড়ি মানুষের চিৎকার। কারও বা হাহাকার। ঠাকুরমার হাতে ধরা থাকে পাথরে থালায় সাজানো জলখাবারি সম্ভার। বলরাম উঠে দাঁড়ান।—চল তো প্রসাদ। কী হল দেখি।

গঙ্গার ঘাটে দেখা সেই তিনজনার দু'জন। সঙ্গে পাড়া পরিজন। সবার চোখে মুখে সরব বিস্ময় আর আশ্চর্য হওয়ার নমুনা।

বলরাম বারান্দার ওপর দাঁড়িয়ে সবার মুখের দিকে তাকান একে একে। মুখগুলি এখন তাঁর চাহনিপাতে আস্তে আস্তে জুড়োতে বসেছে। মুখর শব্দ বুঝি মনের অতলে মুখ লুকিয়ে ফেলল অকস্মাৎ।

সেই দু-জনার একজনা বলে ওঠে, ধন্যি কোবরেজ মশাই আপনার বাক্যি। সে মরণ দেখেছে।

দ্বিতীয়জনা বলে, আপনার নিদান মোতাবেক ঠিক একটি ঘণ্টার মধ্যেই তার প্রাণবায়ু গত হল। কী আশ্চয্যি!

একজন বলে ওঠে, কিন্তু আপনি বুঝলেন কেমন করে। আপনি তো তাকে স্পর্শমাত্র করেননি। বা নাড়ি দেখেননি।

কবিরাজ বলরাম শান্ত মুখে শূন্যে তাকান। তারপর কতক আত্মগত স্বরে বলে যান, লোকটিকে দেখামাত্র মনে হল ওর ডাক এসে গিয়েছে। তোমরা তিনজনাতে মিলে একত্রে গঙ্গা নেয়েছ। তারপর তিনজনাতেই নিজ নিজ কপালে গঙ্গামৃত্তিকার তিলক এঁকেছো। পথ চলে আসতে আসতে দু'জনার তিলক শুকিয়ে চড়চড় করছে। কেবল ওরটি বাদ। অর্থাৎ, তার দেহের তাপ কমে আসছে। ক্রমে শীতল হয়ে আসছে সর্বাঙ্গ। পাখি ওড়বার সময় হল, সময় আগত, দিন শেষ...

রাত শেষের মুখে ঠেলেঠুলে বিছানা থেকে তোলা হল আমায়। কী ব্যাপার, না দধিমঙ্গল হবে। তুলল আমার মাসিরা, জ্ঞাতি আত্মীয়া মহিলারা। বাবা দূরে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছে।

দোতলার বারান্দায় আসন পেতে বসিয়ে দাদুর কালো পাথরের বাটিতে ধবধবে চিঁড়ের গর্তে দই ঢালা। দু'ধারে সাজানো দু'টি পেট ভাঙা মর্তমান কলা। এক ধাবড়া কাঁচাগোল্লা।

মা আমার পাশে বসে বলল, আমি মেখে দেবো?

হতভম্ব ঘুমচোখো আমি মাথা হেলাই। বাবা কষে নস্যি নেয়। বারান্দার লম্বা লম্বা জানলার ওধারে এখনও নিকষ রাত্রি আর গোয়ালের ধারে ভিয়েনতলার জমজমে আলো ঠিকরোয়। আমি যেন এখান থেকেই দেখতে পাই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কড়াইয়ে, যাকে লোকে নৌকো বলে, ডাবা ডাবা রসগোল্লা, পানতুয়া খেলা করছে। ওধারে মস্ত সব বারকোশে ম্যাজিক হাতে ঝটাপট দরবেশ পাকানো নামছে। তাদের গায়ে তেল চুকচুক করছে। ঝাঁঝালো আলোয় দরবেশের গায়ে সাজানো লাল লাল বোঁদের দল চোখ মটকাচ্ছে।

আমার বড়মা শাঁখ হাতে রেডি হয়ে বসে আছে একটু তফাতে। বলছে, বামুনের পৈতে মানে আদ্ধেক বিয়ে। কেবল যা কনেটি নেই। মা'র দিদিমা ফরিদপুরি কুসুমকুমারী কোঁচকানো গাল ভেঙে যৎপরোনাস্তি হাসছেন আর ডিবে থেকে মুখে পান ঠুসছেন। তাঁর টকটকে লাল লাল দাঁতে পানের সবুজ খিল খিল করছে। আমার মা'র ঠাকুমা নলিনীসুন্দরী তাঁর ছোট্টখাট্টো আড়ার টঙে ঘোমটা দিয়ে উবু হয়ে বসে। তাঁর মাথার চুল বুরুশ কুচি। টুকটুকে ফর্সা গালের নিচে মস্ত এক আঁচিল। ভারী পয় পরিষ্কার মানুষ। গা দিয়ে সবসময় কীরকম সাবু সাবু গন্ধ বেরয়।

সবাই মিলে ফলার মাখা আমার মুখে তুলে দেয় একে একে। বড়মা টেনে টেনে শাঁখ বাজায়। কুসুমকুমারী উলু উলু লাল জিভ নেড়ে ঘন ঘন জোকার দেন। নলিনীসুন্দরী শুধু মিটিমিটি হাসেন। আমার এত ভোরে ওই চিঁড়ের ফলার খেতে মোটে ভালো লাগে না। সেই ভালো না লাগার ছুতো ধরে উঠোনের প্রকাণ্ড বেল গাছ থেকে দমাস করে এক ঐরাবত বেল মাটিতে পড়ে। কুয়োতলায় আজ রাত থাকতেই দাদুর ঝপাস ঝপাস চান চলে। রামশরণ কাকা কপিকলে কুয়ো থেকে জল টেনে তোলে আর গান গায় বিকট বেসুরে, ইচিক দানা, বিচিক দানা, দানে উপর দানা...কানু বাবা হেসে বলে, ব্যাটা বদ্ধ বেসুরো।

আমার বড়মামা কখন যে ঘুম থেকে উঠে এসেছে কে জানে। তার গলা আরও বাজ খাঁই আর বেসুরো। মামা বলে. মুখে অত বড়ো গোঁফ নিয়ে লতার গান গাইছে হনুমানটা।

সমস্বরে উলু পড়ে। বড়মামা গান ধরে, রামাইয়া বস্তাবইয়া, ম্যায়নে দিল তুঝকো দিয়া, ম্যায়নে দিল...

এত উলু ছাপিয়ে মামার বিকট হাঁড়ি গলা তেড়ে ফুঁড়ে ওঠে। বড় মামা একটু খাইয়ে। আমার না খাওয়া ফলারটা টেনে নিয়ে গপাগপ মুখে পোরে আর গায়, ম্যায়নে দিল তুঝকো দিয়া—

নিচে উঠোনে সামান্য এলাকা জুড়ে ছাউনি খাটানো হয়েছে। ওখানে যেহেতু মাটি, তাই একখানি করে ইট পেতে চৌকোণা বেদি তৈরি করা হয়েছে। আমার দাদু বেলাবেলি ওখানে বসে পড়েন। আমাদের মূল পুরোহিত বেহালার দাদু। আমার দাদুকে পট্টবস্ত্র পরে বেশ লাগছে। মাঝখানে সিঁথি কাটা পাকা চুল শীর্ণকায় আর লম্বা বৃদ্ধ পুরোহিতের তালে তালে মন্ত্রপাঠ করছেন। এখন চলছে নান্দীমুখের পর্ব। পূর্ব-পুরুষদিগকে জলদানের পালা। বিষ্ণুরোম্ ভরদ্বাজ গোত্র পিতা গোপালচন্দ্র দেবশর্মা তৃপ্যতামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা।

এইভাবে পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতমহ থেকে ধরে পিতামহী অমুকি দেবী, মাতামহী, প্রমাতামহী, বৃদ্ধ প্রমাতামহী আরও ইত্যাদি সকলকে নাম ধরে ডেকে ডেকে আবাহন। সবাই আপনারা আসুন, বসুন, জলপান করুন। শুধু জল নয়, সঙ্গে খাদ্যও আছে। অমুকা গোত্রা মাতামহী তৃপ্যতামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা—

তিল হল প্রেতগণের একমাত্র সলিড খাদ্য। বাকি সব জল, তুলসী, চন্দন, দু-এক ফোঁটা দধি, ছিড়িক ছিড়িক ঘৃত। অথচ ওঁয়াদের নাকের ডগায় পানতুয়া-রসগোল্লা ভাসছে! বড়কা বড়কা সাইজের রুই-কাতলা আমাদের ভাগের পুকুর থেকে ভোররাতে ধরে এনে উঠোনে চিৎপাত। তাগড়াই রেয়াজি খাসির মাংসের পাঁজা কুয়োতলায় ফেলে জলে রগড়াচ্ছে শিবদাসী পিসি আর রামশরণ কাকা। সারা বাড়ি পেঁয়াজ, আদা, রসুনের ঝাঁঝে আমোদিত। তারই মধ্যে সতিলগঙ্গোদকং, কানু বাবার হুই হুই চিৎকার, বাবার পিসিমা—আমার ভাইটির একধারে বসে নিরামিষ রান্নার ব্যবস্থা, বাড়ির দুয়ারে পরপর রিকশা এসে আত্মীয়স্বজন ঢেলে দেওয়া, মা'র নাগাড়ে দৌড়ঝাঁপ, সে এক হইরই ব্যাপার।

তবে দাদু কাজে বসার আগে ঘোষণা দিয়েছে, ও চঞ্চল ছেলে। ওকে তিনদিন তিনরাত দণ্ডিঘরে থাকতে হবে না। ও কাল ভোরেই গঙ্গায় দণ্ডি ভাসাবে।

ভাইটি এসে আমার গালে ছোট্ট একটি চুমো খেয়ে বলেছে, ভালো হল। তোতে আমাতে ভোরবেলা গঙ্গায় যেয়ে নেয়ে আসব।

অনুষ্ঠান বেদিতে এখন পুরোদস্তুর প্রেতলোকের দখলদারী। কত নাম না জানা, চোখে না দেখা পূর্বপুরুষ ওখানে একে একে এসে সার দিয়েছেন। আকাট উলঙ্গ সার সার তৃষ্ণার্ত নারী পুরুষ। হাত জোড় করে আছেন না দু-হাত তুলে আশীর্বাদ করছেন কে জানে। অন্ন দাও, জল দাও। আহা রে। রেডিওয় শোনা ভবানীচরণ দাসের সেই আর্ত গানটা মনে মনে তীর ছোঁড়ে, অন্ন দে, অন্ন দে, অন্ন দে গো অন্নদা...

ভেতর বারান্দা দিয়ে দোতলায় যেতে যেতে আমি শুনতে পাই মা'র ঠাকুমা নাতনিকে বলছেন, শোন্ মিলা, তোর ছেলেডার উড়ু উড়ু মন। সন্নিসী সন্নিসী ভাব। যজ্ঞের সময় গেরুয়া বস্ত্র পরালে পর সাত পা হাঁটামাত্র ওকে ধরে ফেলবি। আর একটি পা এগোলেই ও ঘর ছাড়বে।

আমি মনে ভাবি সেই বইখানার কথা, 'মৃত্যুর অর্থ পরিবর্তন। এই পরিবর্তন চেতনার এক স্তর হতে অন্য স্তরে বিবর্তন, আর বিদেহী আত্মার এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থা অবস্থান্তর। মৃত্যুতে জীবাত্মা জীর্ণবাসের মতো জীর্ণ জড়শরীর ত্যাগ করে। একেই মৃত্যু বলে।'

মনটা কেমন মেঘলা হয়ে যায়। অথচ বাইরে এত রোদ। একা একা চিলের ছাদে উঠে যাই। মাথার ওপর মস্ত ছড়ানো আকাশ। ওখান থেকেই কি পূর্বপুরুষরা নেমে এসেছেন আমাদের উঠোনে?

আমি একা একা ছাদে বসে রেডিওয় শেখা হেমন্তবাবুর গান গাই, জীবনের নদীতটে ঢেউ ভেঙে পড়ে, তারি সাথে আশা খেয়া টলমল করে...

সাতান্ন

উঠোনের বেদিতে বসে একনিষ্ঠ পিতামহ, আমার আচার্য গুরু উপনয়নের উপক্রমণিকা সেধে চলেছেন। তাঁর গলায় আজ শুভ্র নতুন উপবীত। ওদিকে আমার জন্মদাতা কানুবাবা নি-পৈতে অবস্থায় পাজামা-গেঞ্জি পরে গোটা বাড়ি দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। আমি জানি বাবার এই অসীম ক্ষমতার পেছনে আছে দোতলার শোওয়ার ঘরে প্রাচীন রাইটিং বুরোয় লুকিয়ে রাখা ঘোরতর খয়েরি রঙা তিনটি X-ধারী তরলের বড় বোতল। এ বিষয়ে বাবা নির্জলা। থেকে থেকে দোতলায় উঠে যাচ্ছেন। বোতল খুলে খানিক দ্রব্য ঢুক করে মেরে দিচ্ছেন। তারপর আবার দ্বিগুণ তেড়েফুঁড়ে কাজে লেগে পড়ছেন।

মা কেবল একবার নিচু গলায় বলেছিল, আজকের দিনটা বাদ দিলে হত না!

বাবার হুঙ্কৃত জবাব, অন্ধের কিবা দিন, কিবা রাত্রি।

উঠোনের ছোট মণ্ডপে মিষ্টান্ন ভিয়েনের পাশাপাশি দাদুর গলায় একান্ত পিতৃপুরুষ তর্পণ চলেছে, ওঁ যমায় ধর্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ। বৈবস্বতায় কালায় সর্বভূতক্ষয়ায় চ। ঔড়ম্বরায় দধায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে। বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ।

এই সব মন্ত্রের যে কী মানে আমি তো বুঝি না। তবে এই জোরে জোরে আউড়ে যাওয়ার সঙ্গে দিব্যি একটা সুররহস্য আছে। সেই রহস্য যে কী তাও জানি না। তবে আমার মনের ভেতর থেকে আর একটা আমি বেরিয়ে কী চমৎকার বয়ে যায় গঙ্গার ঘাটে।

বটের ঝুরি দুলছে এই চৈত্র মাসের হাওয়ার ঠেলায়। ছোট ছেলেরা ঝুরি ধরে শূন্যে দোল খাচ্ছে। তাদের পায়ের নিচে অশ্বত্থ তলায় নামিয়ে রাখা সার বেসার মেটে ঠাকুরদের মূর্তি। বেশিরভাগই জলে ভিজে রোদে পুড়ে ভাঙাচোরা রঙচটা। বলবান কার্তিকের দু'খানি হাত বাতিল হয়ে পচা কালো খড় বেরিয়ে পড়েছে। কালী ঠাকুরের জিভ ভেঙে সামান্য একটুকুন দন্তের ফাঁকে জেগে আছে। ভিখারিরা ঘাটের পথের পাশে বসে—দু'টি ভিক্ষে দাও গো মা—হাঁকছে। গঙ্গার জলে পয়সা খুঁজুনি মেথরপাড়ার বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা জলের গায়ে ভাঙা মেটে হাঁড়ি ঢেইয়ে ঢেইয়ে খুচরো পয়সা খুঁজছে। এটা একধরনের জলে থাপ্পড় মেরে মেরে পয়সা তোলা। মানুষজন গঙ্গায় পয়সা ফেলে তো। ওধারে হাইস্কুলে ক্লাস আরম্ভের আগে প্রেয়ারের ঘণ্টা। স্কুলের মাঠে ক্লাস ধরে ধরে লম্বা লাইন। সামনে বারান্দায় সব স্যার। আমাদের গেম থেকে ধরে গানের স্যার সদানন্দবাবু সরু গলা উচ্চে তুলে জনগণমন ছাড়ছেন। ছেলেরা গলা দিচ্ছে। মুশকিলটা হচ্ছে ক্লাস টেন যখন গাইছে, বিন্ধ্য হিমাচল, ক্লাস সেভেন হাঁকছে, জলধিতরঙ্গ। আবার ও পাশে ক্লাস ফাইভের দল প্রাণপণে জয় হে, জয় হে-এ-এ-এ। হেডস্যার নারায়ণবাবু চোখ বল্টু করে এধার ওধার দেখছেন। তাঁর ফর্সা টাকপ্রদেশে ক্রোধী ঘাম। এইসব এড়িয়ে গঙ্গার মাঝবরাবর একজন নিরিবিলি নৌকো ইলিশ মাছ ধরার বেড়জাল জলে ছাড়তে ছাড়তে মন্থর চলে যাচ্ছে। মাঝির ছেলেটির মুখে বিড়ি। হাতে জালের বোঝার লেজ।

দাদুর মন্ত্র উঠছে নামছে। পুরোহিত দাদু বলছেন, এবার শালগ্রাম শিলা ধৌত করুন মাস্টারমশাই।

মন্ত্র ওঠে পড়ে, ওঁ অকালমৃত্যুহরণং সবব্যাধিবিনাশনম্। বিষ্ণো পাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহম্!

ওধারে শ্মশানঘাটে নতুন মড়া এল রানাঘাট থেকে, লরি করে। বেশিরভাগ যুবকই হইরই করে বল হরি হাঁকছে। ঠিক সেই সময় লরির পাশ দিয়ে চলেছেন আমাদের স্কুলটিচার বলহরি মণ্ডল স্যার। অতি নাটাপ্রজাতির মানুষ, চোখে চশমা, ফুলপ্যান্ট শার্ট, সবে ধরেছেন ধুতি-পাঞ্জাবি ছেড়ে। চমকে মুখ তুলে তাকান। থার্ড পিরিয়ড ভূগোলের ক্লাস নিতে হবে ক্লাস টেন-এ। গোড়ার কথা পূব-পশ্চিম ইত্যাকার দিকগুলো ভুল হয়ে যায়। ভ্রূ কুঁচকে ভাবেন—নামটা জানল কী করে।

এবার আমার মাথা নেড়াকরণ আর কান বেধাঁনো। পরামাণিক যতীনকাকা এসেছে এ কর্মে। যতীনকাকা নবনগর কলোনিতে থাকে। আমার দাদুর চুল কাটতে বসে প্রায় চড়চাপড় খায়। দাদুর নিয়ম হল মাথার চুল মেলাতে মেলাতে যৎপরনাস্তি করে কাটতে হবে—চোখে প্রায় দেখা যায় না এমন কায়দায়। অথচ মাঝখানের সিঁথি বহাল রইবে। এরপর কুটুস কুটুস নাকের লোম, কানের লোম, হাতের রোঁয়া। প্রায় একেবারে নির্লোম মুনির গতিক। এই মুড়িয়ে কাটতে কাটতে বেসতর্কে যদি কোথাও একটুখানি খোঁচা লেগেছে অমনি দাদুর হাত যতীনের গায়ে চটাস চটাস, ওয়র্থলেস ওয়র্থলেস, বর্বর বর্বর।

আমি জানি বারবার মানে পরামাণিক। উঠোনে বেলতলার উল্টোধারে ফাঁকা স্থলে নিচু টুলে আমি কোরা ধুতি পরে, খালি গায়ে। বলি, লাগবে না তো?

যতীনকাকা পানরঙা লাল লাল দন্ত বার করে হাসে, তুমি টেরই পাবে না মনা।

মাথায় জল দিয়ে ভিজিয়ে ক্ষুরখানা হাতের তালুতে ঘষে নিয়ে কাজ শুরু করে যতীনকাকা। মাথার ওপর চ্যাঁকচোঁক, কুরকুর, কুরকুর। পাশ থেকে কারা যেন খিকখিক হাসে। ভাইটি বলে, ভয় নেই, ভয় নেই। এরপর একেবারে আমাদের গৌরাঙ্গ হয়ে যাবি ভাই।

মাথা সাফ। হাত দিয়ে চমকে উঠি আমি। এ কী! এ মাথাটা কার? একেই কি মুণ্ড বলে?

এবার কান বিঁধানো। মাসি আমার হাতে একটা বড় কলা ধরিয়ে দেয়। বলে, লাগলে এটা দিয়ে আচ্ছা করে মারবি।

ছুঁচটা আগুনে সেঁকে কানের লতিতে ঘি ডলে দেয় যতীনকাকা। তারপর কথা নেই বার্তা নেই প্যাঁক করে কানে বসিয়ে দেয়। উহহ্‌হ্‌। ভয়ঙ্কর লাগে। অমনি আমিও ভয়ঙ্কর রাগে যতীনের গায়ে কলাটা আছড়াতে থাকি। সে মুখ সরিয়ে হাসে আর বলে, রও বাবা, রও। এবার অন্য কান। এই কান ফোঁড়ার সময় কাকা একই লপ্তে ছুঁচের গায়ে পরানো হলুদ মাখানো সুতো পরিয়ে গিঁট মেরে দেয়। আমি ককিয়ে উঠি বিনি চোখের জলে দ্বিতীয় কান ছিদ্র করার সময়। গায়ের জোরে ছিরকুটে কলাটা হাঁকিয়ে চলি যতীনকাকা'র দিকে।

বেদির মাঝখানে কুশাসনে আমি। আমার ডাইনে আচার্যগুরু পিতামহ। পুরোহিত দাদুর গম্ভীর মন্ত্র উচ্চারণ। আসলে বসার আগে ভাইটি লুকিয়ে আমার মুখে দুটো পানতুয়া গুঁজে দিয়েছে।

পিতামহ আতপ তণ্ডুল ছড়াতে ছড়াতে বলছেন, ওঁ কর্তেব্যেহস্মিন্‌ শুভ উপনয়ন আচার কর্মণি পুণ্যাহং ভবন্তো...আমি শুনছি দাদু গাইছেন, মৌ বনে আজ মৌ জমেছে, বৌ কথা কও ডাকে...

আজকের দিনটি ভারী বিচিত্র পার হল রামপ্রসাদের কাছে। একে শুধু উত্থানপতনময় বললে কম বলা হয়। বললে ভাল, রোমাঞ্চকর।

ঠাকুর্দা বলরামের ভোজবিদ্যাসুলভ কোবরেজি নিদান বাকি দিনগুলির সঙ্গে মোটে মেলে না। আসলে পাঁচজনার সাক্ষাতে এ আজব হলেও একজন বৈদ্যের অভিজ্ঞ আর প্রকৃতিদত্ত চক্ষু, এমনটি সহজদৃশ্য নয়। বুঝি কোটিকে গুটিক বললেও এ ঘটনার নিষ্পত্তি হয় না। শুধু মনে প্রশ্ন হয়, নিজের সম্পর্কে ঠাকুর্দার কাছে কোনও খপর থাকে কী।

দুপুরের ভোজনাদি বেশ তরিবৎ করেই হয় ঠাকুরমার তত্ত্বাবধানে। সঙ্গে জোগান দিয়েছে পুত্রবধূগণ। নিরামিষ থেকে ধরে আমিষ, বহুতর পদ। পরিশেষে এক খিলি কর্পূর এলাইচ দেওয়া পান।

দিবানিদ্রার অভ্যাস প্রসাদের নেই। ঠাকুর্দা কবিরাজেরও। ফলে নিতান্ত গল্পগাছাতেই সময় পারণ।

বারান্দায় শীতলপাটি পাতা। তার উপর তিনজন। বলরাম ভুড়ুক ভুড়ুক তামাক টানছেন। চণ্ডীমণ্ডপে গোলা পায়রাগণ দ্বিপ্রাহরিক আলস্য কাটাচ্ছে বকবকম স্বরে। প্রসাদের মনে কিন্তু ঘুরে বেড়াচ্ছে আজ গঙ্গাতীরের ঘটনাটি। ঠার্কুদার চক্ষু বলিহারি। এর কাছে ইন্দ্রজালও হার মানে।

কবিরাজ বলেন, আজ তাহলে শাক খেলে দু-একপ্রকার, তাই তো।

ভজহরি সোৎসাহে বলে, সে আর বলতে। একে হল হিঞ্চে শাক, আর দুইয়ে বেতো শাক। দু'টিই আমরা হরবখৎ খেয়ে থাকি।

বলরাম, শাক দু'টি-একটি নিত্য খাবে। দেহের পক্ষে ভাল। শ্রীচৈতন্য শাক ভারী পছন্দ করতেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত-এ আছে, 'শাকেতে ঈশ্বর বড় প্রীত ইহা জানি, নানা শাক দিলেন প্রকার দশখানি।' তার পরেতে শ্রীগৌরাঙ্গ শাকভোজন করতে করতে বললেন, 'আমি ত' এমন কভু খাই নাই শাক, সকল বিচিত্র যত করিয়াছ পাক'।

রামপ্রসাদ হেসে কন, যথার্থ বলেছেন ঠাকুর্দা। আর ঠাকুরমা'র হাতের রান্না শাক পোলোয়া ফেলে খেতে হয়। আমার মনে পড়ছে কবিকঙ্কন চণ্ডী'র কথা।

প্রভুর আদেশ ধরি রান্ধয়ে খুল্লনা নারী
স্মরিয়া সর্বমঙ্গলা
ঘৃতে নালিতার শাক তৈলেতে বেথুয়া পাক
বোদালি হিলঞ্চ শাক কাটিয়া করিলা পাক।

কবিরাজ, বাঃ বাঃ।

প্রসাদ, আসলে ধনপতি সদাগর দশজনা বন্ধুবান্ধবকে ডেকে খাওয়াবেন বলে খুল্লনা সতীকে রাঁধতে বলেছিলেন। খুল্লনাও তাই উপাদেয় শাক রন্ধন করলেন। কেন না, তাঁদের, 'বনশাকে বড়ই পিরীতি' ছিল।

কবিরাজ, শাকরন্ধনের বর্ণনা আর একটু শুনি ভায়া।

প্রসাদ,

'পাটায় ছেঁচিয়া নেয় পলতার পাতা
রান্ধেন বেগুন দিয়া ধনিয়া পলতা।
...জবানী পুড়িয়া ঘৃতে করিল ঘন পাক
সাজ ঘৃত দিয়া রান্ধে গিমা তিতা শাক।
কোমল বেথয়া শাক করিয়া কেচা কেচা
নাড়িয়া চাড়িয়া রান্ধে আদা দিয়া ছেঁচা।
নারিকেল দিয়া রান্ধে কুমড়ার শাক।
একে একে দশ শাক করিলেন পাক।

বলরাম সশব্দে হেসে ওঠেন। তারপর মন্দ্রস্বরে বলে ওঠেন,

স্বচ্ছন্দ-বনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্যতে
অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে কঃ কুর্যাৎ পাতকং মহৎ।

বনমধ্যে স্বভাবজাত শাক দ্বারাই যখন উদর পূর্ণ করে জীবনধারণ করা যায়, তখন অকারণে এই পোড়া পেটের জন্য প্রাণী বধ করে মাংসভক্ষণ মহাপাপে লিপ্ত হবে কে?

প্রসাদ, তাহলে ঠাকুর্দা হিঞ্চে আর বেতো শাক নিয়ে দুটি কথা শুনি।

বলরাম, বললে যখন, তখন একটু পণ্ডিতি করি। হিঞ্চের সংস্কৃত নাম হল হিলমোচিকা। হিন্দিতে বলে তুরইল। আর লাতিন ভাষায় একে কয় Enhydra Fluctaus। ব্রাহ্মী শঙ্খধরাচারী মৎসাক্ষী হিলমোচিকা। অস্যার্থ, ব্রাহ্মী, শঙ্খধরা, আচারী, মৎসাক্ষী ও হিলমোচিকা এই পাঁচটি হল হিঞ্চের জাতি গোত্র।

ভজহরি, বাপ রে বাপ। এককোঁটা শাকের পেটে পেটে কত সমস্‌কিতো। তারপর আরও কী সব হিং টিং।

সে কথায় কান না দিয়ে বলরাম বলে যান, বেতো শাকের সংস্কৃত নাম হল বাস্তুকং। এর আরবি নাম হল—রোকবতুল বা বাজামেলকুতফ্‌। এটি দু'প্রকার বর্ণের হয়। যথা, শ্বেত ও রক্তবর্ণ। বৈদ্যকগণের মতে এটি শাকরাজ বা শাকশ্রেষ্ঠ। শ্রীচৈতন্য এই শাকের ভারী ভক্ত ছিলেন।

প্রসাদ, তবে নিরামিষ যে সবার চেয়ে ভাল তা নিয়ে কোনও তর্ক হয় না। শোনা যায় সম্রাট আকবর স্বয়ং নিরামিষ খেতেন। বলতেন, খোদার এই সুন্দর পৃথিবীতে এতশত খাদ্য থাকতে মিছিমিছি কেন এই পশুমাংস খেয়ে শরীরটাকে কবরখানা বানাই।

বলরাম, আর নিত্যি ভোজনান্তে এক খিলি করে পান খাবে। তাম্বুল অর্থাৎ পান খেলে সর্বরোগ বিনাশ হয়। বলা হয়ে থাকে এটি সুস্বপ্নসংবর্ধনম্‌, অর্থাৎ পান খেয়ে নিদ্রা গেলে বিস্তর ভাল ভাল স্বপ্ন দেখা যায়।

ভজহরি বলে ওঠে, আমার দাঠাকুরের নেকা একখানি পদ আচে। 'অপূর্ব সন্দেশ নামে এলাইচ দানা। ফুল-চিনি, লুচি, দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর ছানা।'

বলরাম বলেন, আসলে খাদ্যও তো একটা শিল্প ভায়া। ঘরের গৃহিণীরা আছেন। তাঁদের মতো বড় শিল্পী তুমি আমি কেউ নই।

প্রসাদ মাথা হেলান, ঠিক কথা। ঠিক। এমন করে বুঝি সত্যি কখনও ভাবা হয়নি। অথচ মহামায়ার চমৎকারী নিয়ে আমরা বুঁদ হয়ে আছি।

বলরাম, আরে ভাই, মা না থাকলে সংসার বলে কোনও পদার্থ থাকত কী! একা পুরুষ কী করবে। কতটুকু তার ক্ষ্যামতা।

প্রসাদ, তাহলে আমাদের দেশকালের তো একটি মা আছেন। তাঁর পরিচয় তো দেশমাতা। তাহলে দেশের এখনকার এই অবস্থা দেখে তিনি কী করছেন?

বলরাম, তিনি যা করবার তাই করছেন। তাঁর ইচ্ছেতেই একরকম ধরে নাও ইংরাজরা কলকাতা থেকে পালিয়ে সেখান থেকে চল্লিশ মাইল দক্ষিণে ফলতায় যেয়ে আশ্রয় নিলে। এককালে সেখানে ডাচদের ভাঙা আস্তানায়, একখানা মাটির কেল্লায় বাজ্যের ইংরাজ যেয়ে জড়ো হয়েছে বলে জানি। এসে পড়েছেন ওয়াটস্‌ আর কলেট সায়েব। ছাড়া পেয়ে এসেছেন হল্‌ওয়েল। আর ওয়ারেন হেস্টিংসও লুকিয়ে ডাচ্‌দের সঙ্গে যুক্তি করে ফলতায় এসে পড়েছেন। গভর্নর ড্রেকসাহেব এখানে তাঁর দপ্তর খুলে বসেছেন।

প্রসাদ, শুনেছি ফোর্ট উইলিয়াম নামে ইংরেজদের একটি জাহাজ ছিল। তাতে চড়ে বসে ড্রেকসাহেব নাকি ঘোষণা দিয়েছেন ওটাই তাঁর খাস সরকারি দপ্তর।

বলরাম, হুঁ, ওধারে ফলতার বিষাক্ত জল-বাতাসে আর বুনোবাদাড়ি স্থানে বহু ইংরাজও ও কম্মো পেয়েছে। তারা অপেক্ষা করছে কবে মাদ্রাজ থেকে সৈন্য এসে তাদের বলবন্ত করবে।

প্রসাদ, ইংরেজরা যে সেখানে দু-একটি করে জড়ো হচ্ছে এ নিয়ে নবাবের কোনও হেলদোল নেই। কিন্তু নবাবের মাসির বেটা শৌকত জঙ এধারে বাংলার নবাব হবেন বলে উঠে পড়ে লেগেছেন। তাঁর কর্ণে খপর গিয়েছে সিরাজ খামখেয়ালি সহকারে নবাবি চালাচ্ছেন। একদিন ক্রুদ্ধ হয়ে সভার মাঝখানে জগৎশেঠের মতো অমন মানী লোককে গালে কষে থাপ্পড় মেরেছেন।

বলরাম চিন্তিত মুখে কন, কে জানে, দেশের মা জননীর মনে কী আছে। কী আছে আমাদের কপালে।

প্রসাদ কথা বলেন এবার অন্য এক ঘুরপথে, আচ্ছা ঠাকুর্দা, আপনার মতো বৈদ্য হতে তো সবাই পারে না। আমার স্বর্গত পিতৃদেবও তো ভিষক-বৈদ্য ছিলেন। কই, তাঁর তো আপনার পারা চক্ষু ছিল না।

বলরাম কিছুক্ষণ মৌন থাকেন। তারপর আস্তে আস্তে বলে ওঠেন,

শব মুখে বিন্দুমাত্রং তত্তৈলং নিক্ষিপেদ্ যদি।

একযামং ভবেজ্জীবো নান্যথা শঙ্করোদিতং।

এর মানেটা বলো প্রসাদ।

প্রসাদ বলেন, আকোড় ফলের তৈল এক বিন্দু নিয়ে মৃত মানুষের মুখে যদি নিক্ষেপ করা যায় তাহলে এক প্রহরের মধ্যে সেই মনুষ্য বেঁচে ওঠেন।

বলরাম, এবার বলো এর অর্থ কী।

ভজহরি দু'হাতে মাথার রগ টিপে ধরে।

বলরাম বলেন,

গিরিকর্নীং শমীং গুঞ্জাং শ্বেতবর্ণাং সমাহরেৎ।

চন্দনেনান্বিতঞ্চৈব তিলকেন জয়ী নরঃ।

প্রসাদ, শ্বেত অপরাজিতার মূল, শমীকাষ্ঠ, কুঁচ আর শ্বেতবর্ণ সর্ষপ একত্রে পেষণ করে কপালে তিলক কেটে পরলে সেই মনুষ্য সবখানে জয়ী হয়।

ভজহরি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আহা, নবাব সেরাজ যদি এসব জানতেন তাহলে কোথাও যুদ্ধু বলে পদাত্থ থাকত না। তাছাড়া যেমন খুশি মরা মানুষকে বাঁচিয়ে তুলতেন। বুড়ো আলিবর্দী অব্দি গোর থেকে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াতেন।

বলরাম সশব্দে হেসে ওঠেন, তাহলেই দেখো প্রসাদ, আমাদের শাস্ত্রে কিংবা অশাস্ত্রে যে ইন্দ্রজালাদির তত্ত্ব স্বয়ং মহাদেবের মুখে বসিয়ে পার্বতীর কানে ঢেলে দেওয়া হয়েছে তার মাহাত্ম্যটা কী। এ শাস্ত্রে মৃত মানুষ বেঁচে ওঠে, জীবন্ত লোক পলকে মরণ দেখে। তারপরে আর কী চায় মানুষ! তা আমি ভায়া এ সবে না মনোনিবেশ করে মানুষে মন-প্রাণ সঁপে দিলাম। মানুষকে যথাসাধ্য উপলব্ধি করাই আমার স্বভাব হয়ে দাঁড়াল। তারই কিছু কিছু ফল হাতেনাতে পাই বৈকি।

আজ যেন কতদিন কত রাত পরে প্রসাদ নিজ সংসারখানির দিকে দু'চোখ মেলে চাইলেন। ধর্মপত্নী সর্বাণী ও তার কোলের পুঁটুলি ক্রমে বেড়ে ওঠা কন্যারত্নটিও যেন এই অবসরে হেলাফেলার বস্তু হয়ে গিয়েছে। রামপ্রসাদ অনুভব করেন, তাঁর কবিস্বভাবের কোথাও যেন একালষেঁড়ে স্বার্থপরতা বিলগ্ন হয়ে আছে।

কোলঙ্গায় জ্বলন্ত মৃদু পিদিমখানির আলোয় রামপ্রসাদ দেখলেন সর্বাণী তক্তাপোশের একধারে হাঁটু মুড়ে বসে কোলের সন্তানটিকে মাই দিচ্ছে। তাঁকে দেখে সে আলগোছে বুকে আড়াল দেয়। প্রসাদ দোর ভেজাতে ভেজাতে বলেন, তোমার সঙ্গে কথা কইতে এখন আমার শরম হচ্ছে বউ।

সর্বাণী চোখ তুলে বলে, সে কী কথা!

রামপ্রসাদ এসে পাশে বসে পড়েন। তারপর একটি হাতে গৃহিণীর কোমরে বেড় দিয়ে বলেন, এমনই পাপীষ্ঠ আমি যে ভাল করে কন্যের মুখ অবদি দেখলাম না।

—ও মা!

—হ্যাঁ গো, রাজরাজড়ার সঙ্গ করে আমার মাথাটা তপ্ত হয়ে গিয়েছে। আমি রাজ্যের বড় বড় চিন্তায় আপন ঘরখানি ভুলে বসে আছি। আমি মানুষ না পাষণ্ড।

সর্বাণী অমনি দখিন হাত তুলে প্রসাদের মুখের উপর চেপে ধরে। প্রসাদ সেই হাতখানি নিজের পানে টেনে নিয়ে গভীর চুমো খান। সর্বাণী হেসে বলে, পাগল কমনেকার।

প্রসাদ সর্বাণীর কাঁধের কাছে ঠোঁট রাখেন, তোমাতেই আমি পাগল সখী। কিন্তু খুকির কী নামপত্তর? সে খপরের কত দূর?

সর্বাণী হেসে বলে, সে তো তুমি জানো। আমি কী অতশত বুঝি।

প্রসাদ হেঁট হয়ে কন্যার কপালে একটি চুমো দেন। তারপর বলে ওঠেন, বেশ কথা। আমি ওর নাম দিলুম জগদীশ্বরী।

সর্বাণী হাসে, বেশ হল। আগেরটির নাম পরমেশ্বরী। আর পরেরজন জগদীশ্বরী।

রামপ্রসাদ গুনগুনিয়ে ওঠেন,

আমি তাই অভিমান করি।
আমায় করেছ গো সংসারী॥
অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই সংসার সবারি।
ও মা তুমিও কোন্দল করেছ,
বলিয়ে শিব ভিখারি॥

আটান্ন

জ্ঞান-ধর্ম শ্রেষ্ঠ বটে, দান ধর্মোপরি।
ওমা বিনা দানে মথুরা-পারে,
যাননি সেই ব্রজেশ্বরী॥
নাতোয়ানী কাচ কাচো মা,
অঙ্গে ভস্ম ভূষণ পরি।
ও মা কোথায় লুকাবে বল,
তোমার কুবের ভাণ্ডারি॥
প্রসাদে প্রসাদ দিতে মা,
এত কেন হলে ভারী।

যদি রাখ পদে, থেকে পদে,
পদে পদে বিপদ্ সারি॥
আমি তাই অভিমান করি—

গান ফুরোয়। কিন্তু সর্বাণীর মন ফুরোয় না। সে এমন কতশত গীত শুনে অভ্যস্ত তার এই অতিঘন মানুষটির কাছ থেকে। সব গীতের রহস্য তার কাছে ফর্সা হয় না। আদপে এই মানুষটির স্বভাবই এমন। সব কথাই ভারী আড়ে আড়ে গুপ্তভাবে কয়। এবার তোমার যা বোঝার বোঝো গে। কিন্তু এইমাত্র শোনা গীতটির এক ফাঁকে একটি শব্দ এসে জুড়ে বসেছে। সে হল 'নাতোয়ানি'। এর অর্থ কি?

সর্বাণী রামপ্রসাদের হাঁটুতে একটি চিমটি দিয়ে বলে, সবই তো হল। খাসা একখানি গান বল্লে। কিন্তু আমার যে তোমার ওই গানের মতো পদে পদে বিপদ হল।

প্রসাদ চোখ তুলে চান, সে আবার কী কথা!

সর্বাণী হাসে, ওই জায়গাটি আর একবার ফিরে বলো দিকি। ওই যে—নাতোয়ানী কাচ—

রামপ্রসাদ মস্করা মিটিমিটি মুখে বলে যান, নাতোয়ানী কাচ কাচো মা, অঙ্গে ভস্মভূষণ পরি।

—তা তোমার ওই নাতোয়ানী'র মানে কী শুনি।

এবার প্রসাদ সশব্দে হেসে ওঠেন। সে হাস্যে সর্বাণীর কোলের শিশুকন্যেটি নড়েচড়ে ওঠে। খোলা জানলা পথে একমুঠি বাতাস এসে উঁকি দেয়। দূরে কোথায় ঘর হারানো গাভী হাম্বা টানে। রামপ্রসাদ হাসতে হাসতেই কন হুঁ, আমার অর্ধাঙ্গিনীর শ্রবণটি দেখছি দিব্য টনকো। তা হল কী, আদপে এটি ফারসি শব্দ একটু মোচড় দিয়ে তোয়ের হল। আসল কথাটি হচ্ছে 'নাতান'। অর্থাৎ না তরান্। মানে, অশক্তি, সঙ্গতিহীন। শব্দের তো এক দু'রকম মানে হয় না গো। বৈয়াকরণরা না হয় সেটুকু সেরে দিলেন। কিন্তু কবি তো ব্যাকরণ-প্রকরণের অনেক তফাতে বসত করে। তাই সে বললে 'নাতোয়ানী'। এবার তোমার মতো মানে করে নাও গো। ভেবে নাও অশক্ত বা অপারগ—যেমনটি চাও। কবি বলছে, তোমার যদি মনে হয়, ভেবে নাও, মা জননী যে কাচান কাচতে বসেছেন সেটি এখন তাঁর ক্ষ্যামতার বাইরে। বাপ্ বাঃ, বেশ বড় বক্তিমে হয়ে গেল সখী।

সর্বাণী চোখ বড় বড় করে তার কর্তাটির কথা এতক্ষণ গিলছিল। এবার সে দু-হস্ত জোড় করে বলে, বাপ রে, কী পণ্ডিতঠাকুরের ঘর করচি আমি। শুধু পণ্ডিত নয় ভারী প্যাঁচোয়া। আজ থেকে তোমার নাম দিলুম প্যাঁচা। অবিশ্যি আর একটি কথাও বলার আচে।

প্রসাদ কৌতুকি বয়ানে বলেন, কী কথা শুনি।

সর্বাণী কোলে ঘুমন্ত জগদীশ্বরীর গায়ে আলতো হাত বুলোতে বুলোতে বলে, তোমার সেই গানটির কথা পুরো মনে নেই আমার। তবে এক জায়গায় এমনি একটি কথা লিখেছিলে।

প্রসাদ বিস্ময়ে বলেন, কী? কী কথা?

সর্বাণী নীচু স্বরে আউড়ে যান, আমি কখনও নাতান কখনও সাতান, কখনও বাকির দায়ে না ঠেকিরে—

রামপ্রসাদ বুকের আনন্দ দমন করে বলেন, কে বলে তুমি লেখাপড়া শেখোনি। কিন্তু আজ যে একটি কর্ম বাকি রয়ে গেল।

—কী কাজ?

—শিবাভোগ। বেচারিরা অপিক্ষে করছে।

—কিন্তু আজ যে ভজহরি নেই। তুমি তাকে আজ তাড়াতাড়ি খালাস দিয়েছ। সে তো ঘরে গিয়েছে।

—তাতে কী। তুমি তো আছ। আজ বরং তোমাতে আমাতেই কাজটি সেরে আসি।

সর্বাণী কন্যেকে কোল থেকে বিছানায় আলগোছে ঢেলে দেয়। গায়ে সদ্যবোনা কাঁথা মুড়ে দেয়। সে কাঁথার গায়ে রক্তজবার চিত্র আঁকা। রামপ্রসাদ আড় চোখে এ ছবি দেখেন। দেখেন আর ভাবেন মা জগদীশ্বরীর উপযুক্ত আবরণ হয়েছে এই রক্তজবা। দেশ রাষ্ট্রের উপযুক্ত সময়ে জগৎমাতার এই আচ্ছাদনই মানানসই।

একটি তামার থালায় করে বেলে মাছ আর ভাতের কয়েকটি মণ্ড পাকানো। আগে রামপ্রসাদ। পশ্চাতে সর্বাণী। নিকষ অন্ধকারে এ বনস্থলী এখন শুধুই জোনাকির আলোক্ষরিত। প্রসাদ চলতে চলতে মনে মনে বলেন, দেশের হৃদয়ে এখন কেবল যুদ্ধ আর যুদ্ধের দামামা বাজছে। আর এখন এই চতুর্ধারে অমরণধর্মা নিত্যা রাত্রিদেবীর পরিব্যাপ্তি ঘনিয়ে উঠেছে। এই দেবী এই বনভূমের যাবতীয় বৃক্ষাদি আর লতাগুল্মাদি নিজ চৈতন্যে প্রকটিত করেছেন। আহা, কী মনোহর রূপ এই রজনীর। হে দেবী, হে বিশ্বপ্রকৃতির রাত্রিময়ী দেবী, আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্না হোন। আপনার প্রসাদে এই যাবতীয় বৃক্ষশ্রেণিতে পাখিরা কী সুখেই না রাত্রিবাস করছে। ওই কৃপাময়ীর করুণায় আপামর গ্রামবাসী, গবাশ্বাদি পশুরা, পাখ-পক্ষীগণ এবং বাজপক্ষী ও কামার্থীরা মহাসুখে শয়ন করেছে। হে জননী রাত্রি, আপনি দয়াবতী, আপনি সংসারকে রক্ষা করুন। আপনি পরমাকাশ। সর্বব্যাপী জগতাত্মার কন্যা।

এই নিশীথে আপনার পরমাত্মীয় ক্রোধভৈরব। আপনি স্বয়ং উন্মত্তভৈরবী। আপনার ওপরেই দেশের নিগ্রহাদির ভার। এখন আপনিই বিচার করুন সন্তানদের বরাত।

পায়ে পায়ে দুইজনে এসে থামেন আঁধার বেলগাছটির তলে। সামনে মানকচু আর হরেক জাঙালের বনেই শৃগালদের নিবাস। কুলচূড়ামণি গ্রন্থে বলছে, বিল্বমূলে প্রান্তরে বা শ্মশানে বাপি সাধকঃ। মাংসপ্রধানং নৈবেদ্যং সন্ধ্যাকালে নিবেদয়েৎ॥

বিল্বমূল, প্রান্তর, শ্মশান—এইসকল স্থানে সন্ধ্যাকালে মাংস প্রধান নৈবেদ্য নিবেদন করতে হবে।

ফলে আয়োজনের ত্রুটি সামান্যই। মাংসের বদলে মৎস। মৎসও তো একটি প্রাণীর মাংস।

আদপে এখানে এই ভোজ্যগ্রহণ করতে যারা আসবে, তারা শিবারূপিণী উমা ও তাঁর পরিবারের দলবল। পশুরূপাং শিবাং দেবীং।

রামপ্রসাদ সর্বাণীর হাত থেকে থালাটি তুলে নেন। তারপর মন্দ্রস্বরে হেঁকে ওঠেন, আয়-আয়-আয়।

এক একটি আয় নাদ ত্বরিতে বনস্থলী দুলিয়ে দীঘল গাছপালাদের দেহকাণ্ড বেয়ে আকাশে উঠে পড়ে। কী এক শিরশিরানির অলীক অবয়ব বিমূর্ত হয়ে যায় অন্ধকারে। কোথা হতে অপরিচিত ধোঁয়ার আন্ডিল এসে ঘিরে ধরে চতুর্ধার হতে। ধূমস্তূপের বুকে অগণ্য জোনাই জ্বলে মিটিমিটি। তারই মধ্যে আলো আঁধারে খেলে বেড়ায় দেবী কালিকার সহস্রনাম। এই দেবী রুধিরপ্রিয়া, প্রচণ্ড প্রকৃতি ও কামকৌতুক-লালসার অনুবর্তিনী।

তিনি সর্বদা সানন্দা, আসবোৎসবমানসা। মধু, মাংস ও মৎসপ্রিয়া, পরমাবৈষ্ণবী, শ্মশানবাসিনী, প্রেতগণের নৃত্যমহোৎসবা, যোগপ্রভবা।

এই দেবীর সহস্রনাম। তিনি শ্মশানকালিকা থেকে ধরে একে একে কামসুন্দরী, কৃশোদরী, অপরাজিতা, অসিতা, অট্টহাস্যা, সুনাসিকা, গীতপ্রিয়া, মহালয়া, পুরাতনী, স্বধা, স্বাহা, নীলসরস্বতী, পদ্মমুখী, নির্লজ্জা, শ্রেয়সী, বংশিনী, সমরপ্রীতা, লোপামুদ্রা, অমোঘা, অনুবাদিনী, মানিনী, প্রগলভা, ভূশুণ্ডী, তিলোত্তমা, দুরন্তা, পঞ্চদশী, সর্ববর্ণময়ী...

প্রসাদ উচ্চকণ্ঠে ডাকেন, আয়-আয়-আয়। আয় মা মানিনী, পঞ্চদশী, উপেন্দ্রানী, তমিস্রা, চারুচরিত্রিনী, লাকিনী, সত্যা, বেদময়ী, রৌদ্রী, ভীমা, রণপণ্ডিতা, রক্তপ্রিয়া, পাশিনী, নীলা, কলকণ্ঠী, আনন্দমেখলা, মহাসুধা, লিঙ্গিনী, প্রেমা, দুষ্টা, শুক্রোৎসবা...

এই নামগুলি কালিকা বা উমা দেব্যার সহস্র নামাবলীর অংশ হলেও সেগুলি রামপ্রসাদের অন্তর্জগতে কবিতার ছটা তৈরি করে। তাঁর মন বলে, দেশকালের বুকে কান রাখতে বাধ্য এক কবি। প্রকৃতার্থে কবি তো কালের কাছে বলিপ্রদত্ত একজন কালাচারী। সে কালপ্রতিমার সাক্ষাৎ সন্তান। আজ দেশের এই অকাল কুয়াশা উতরোল সমাচ্ছন্নতায় কবির প্রাণ কেবলই ঘুরে ঘুরে যেতে চায় মুরসিদাবাদ, কলিকাতা আর অবশেষে ফলতার আকাশমণ্ডলে। সে আকাশে মেঘের অন্তরালে তারাদল মুখ লুকিয়েছে। তারাদের মিটিমিটি আলোক শরীরে উদ্বেল অবসন্নতা ভর করেছে।

দেশকাল। দেশকাল। সবার উপরে এই সত্যটি এখন জাগ্রত হয়ে আছে। কথিত আছে, একটি শিবা যথায় ভোজন করে, সেখানে সমস্ত দেবতার পরমদুর্লভ তৃপ্তি হয়। পশুশক্তি, নরশক্তি ও পক্ষীশক্তির অর্চনা করলে ব্যঙ্গকর্মও সাঙ্গত্ব লাভ করে। এ কারণে, সকল প্রযত্নে শিবার পূজা করবে।

রাজাদি ভয় উপস্থিত হলে, দেশান্তর ত্রাস সংঘটিত হলে, শুভাশুভ কার্য সকল চিন্তা করে বলি আহরণ করবে।

রাজাদিভয়মাপন্নে দেশান্তর-ভয়াদিকে।

হে শিবে তুমি কালাগ্নিস্বরূপিনী। তুমি মহাভাগা। এবং শুভাশুভ ফল ব্যক্ত করে বিশদিয়ে বলো। তোমার এই বলি গ্রহণ করো।

অন্ধকার দিগন্তে বেশ কয়েকটি পরিচিত চক্ষুদানা সবুজ নক্ষত্র হয়ে ফুটে ওঠে। তাদের আজ মহা অভিমান হয়েছে। এই প্রসাদ আজ কী যেন ভ্রমে পড়ে তাদের ভোগ দিতে বিলম্ব করেছে। তবে কিনা মার ঠাঁয়ে ছেলের শত অপরাধও মাপ, তাই জ্বলন্ত চক্ষুদল পায়ে পায়ে বিনি উতরোলে এসে থামে বেলতলার অদূরে বিলম্বি গাছতলে।

প্রসাদ আজ ভিন্ন রীতিতে ভোগ নিবেদন করেন। একটি অন্নদলা তুলে নিয়ে আকাশে ছুঁড়ে দেন। সেটি ভুঁয়ে পড়বার আগেই শিবাদল প্রথমে হতচকিত ও পরে সতর্ক। তারপরেই ঘটে যায় রণ বিস্ফোরণ। খ্যা খ্যা খ্যা, কাঁউ কাঁউ তর্জনে ছটোপাটা পড়ে যায়। কামড়াকামড়ি, খেয়োখেয়ি, খ্যা খ্যা সমরার্তনাদ বা উল্লাসে বনস্থলী কৌতুকে দুলে ওঠে। রামপ্রসাদ হা হা হা অট্টহাস্য করে ওঠেন চরাচর বিদীর্ণ করে। সর্বাণী তার স্বামীধনটির এই নবরূপ অবাক দেখে একধারে দাঁড়িয়ে।

আর একদলা খাদ্য ওড়ে আকাশে। মাটিতে নামে মূর্ত ক্ষুধা। এবার মহারণ আরও প্রগাঢ় হয়। আকাশে চকিত বিদ্যুৎ খেলে। কোথা হতে দমকা হাওয়া হয়। সেই অবসরে শিবাদের কামড়াকামড়ি আরও দুরন্ত হয়ে পড়ে। বিদ্যুতের আলোয় রক্তাক্ত মুখগুলি ঝকঝক করে। ধারালো সাদা দন্তের আগায় জীবশোণিত নাগাড়ে কটাক্ষ করে চলে। আকাশ হতে টিপি টিপি জল নেমে আসে। প্রসাদ একই চালে আর একটি মণ্ড ছুঁড়ে দেন। এবার একটি মাত্র শৃগাল সেটি পেয়ে যায়। অমনি বাকিরা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

মহাবল অসুরও ক্রোধে খুর দ্বারা ভূতল বিদীর্ণ করে নিজের উচ্চ পবর্তসকল দেবীর দিকে নিক্ষেপ করে তর্জন করতে লাগল।

পৃথিবী তার সেই সবেগ গমনে নিপীড়িতা হয়ে বিশীর্ণা হল আর সমুদ্র তার লাঙ্গুল তাড়নে উদ্বেলিত হয়ে সর্বস্থান প্লাবিত করলে।

তার কম্পিত শৃঙ্গ দ্বারা মেঘসকল বিদীর্ণ হয়ে খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল এবং শত শত পর্বত নিঃশ্বাসবেগে আকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়ে ভূপতিত হল।

এইরূপে ক্রোধে জ্বলন্ত মহিষাসুরকে সবেগে আসতে দেখে তাকে বধার্থে চণ্ডিকা ক্রুদ্ধা হয়ে পড়লেন। তিনি পাশ নিক্ষেপ করলেন। অসুর ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলাতে লাগল। এবং সে আরও একবার মহিষাকৃতি ধারণ করে ত্রিভুবন বিক্ষুব্ধ করে তুললে। জগন্মাতা চণ্ডিকা প্রবল ক্রোধে পুনঃ পুনঃ দিব্যসুরা পান করতে লাগলেন আর আরক্ত নয়না হয়ে অট্টহাস্য করে উঠলেন।

গর্জ গর্জ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহম।
ময়া ত্বয়ি হতেহত্রৈব গর্জিষ্যন্ত্যাশু দেবতাঃ॥

রে মূঢ়, আমি যতক্ষণ মধু পান করি, তুই গর্জন কর। আমি তোকে বধ করলে ইন্দ্রাদি দেবগণ এই স্থানে শীঘ্রই আনন্দধ্বনি করে উঠবেন।

দুপুরবেলাকার ন্যাড়া যজ্ঞির ব্যবস্থা বাড়িময়। আর কেমন বোকা বোকা নেড়া মাথার টঙে ছোট্ট শিখা, কান বেঁধানো অবস্থায় দাদুর পাশের আসনে বসে মন্ত্রপাঠ করছি। এসব মন্ত্রের মানে এক বিন্দুবিসর্গও বোঝার সাধ্যি নেই আমার। দাদু পত্রং-পুষ্পং বললে আমার মনে হচ্ছে হরেক গানের কথা। মনে হচ্ছে উনি আসলে মন্ত্র পাঠ করছেন না, গান গাইছেন।

কানু বাবা ঘন ঘন দোতলায় চড়ছে। নেমেও আসছে তাড়াতাড়ি। ওখানে বাবার কী কর্ম সেটা আমি জানি। ফলে বেলা যত চড়ছে বাবার চক্ষুও তত রাঙছে। কিন্তু কথায় কোনও বেচাল নেই। শুধু যা একটু বেশি আবেগ হয়ে যাচ্ছে কথার সমে ফাঁকে।

যেমন হঠাৎ করে আমাদের বাড়ি আলতা পরানো দিদি পটেশ্বরীকে জাপটে ধরে গেয়ে উঠছে, শ্যামা মা কি আমার কালো রে—

পটেশ্বরী দিদি ফর্সা মানুষ। মানে লাগছে তার। বলে উঠছে, কখনও জলে আছ, কখনও আগুনে। আমি কিছু বুঝিনে বাবা।

বেলা গড়ায়। প্রথমে মেখলার পৈতে গলায় ওঠে। তারপর একটিমাত্র সুতো। এই করতে করতে ছ'টি সুতোর গ্রন্থি। মাঝখানে সেই সন্ন্যাসীর হাতে বেলদন্ড নিয়ে সাত পা এগোনোর আচার। কাঁধে গেরুয়া ঝোলা। আমার বুক ঢিপঢিপ করে। শোনা আছে সাত টপকে আটে পা দিলেই আমায় গৃহত্যাগ করতে হবে। মা ঠিকঠাক আমায় ধরে ফেলতে পারবে তো! মা নার্ভাস হয়ে পড়বে না তো!

চারদিক থেকে উলু। শাঁখ। আমি এগোই। এক পা। দুই। তিন। বুক ছম ছম করে। হিমালয়ের নামটা শুনেছি। যাবার রাস্তা তো চিনি না। কী হবে।

চার। পাঁচ। ছয়। সাত—। সাতে পা রাখামাত্র মা আমায় দু-হাতে জড়িয়ে ধরে। বড়মা বলে ওঠে, জয় মা সিদ্ধেশ্বরী। জয় বাবা ভোলানাথ।

ভাইটি বলে, কী সুন্দর দেখাচ্ছে আমার ভাইটিকে। ঠিক যেন বিবেকানন্দ।

দিদিমা বলে, এবার তোমায় ঝুলি পেতে ভিক্ষে নিতে হবে। প্রথমে ভিক্ষে দেবে তোমার অন্নপিসি। ওই তোমার ভিক্ষে মা!

নতুন শাড়ি পরে স্বামী নিখোঁজ দুখিনী অন্ন পিসি একটি রেকাবিতে আতপ চাল, কিছু ফল, পৈতে আর একটি পুরনো রুপোর টাকা দিয়ে উপুড় করে আমার মেলে দেওয়া ঝুলিতে। তার আগে আমায় বলতে হয়, ভবতি ভিক্ষাং দেহি।

চাল-আনাজাদির সঙ্গে পুরনো রুপোর টাকার কোনও যুদ্ধ হয় না। সেটা তার নিজের স্বভাবমতো চাল-কলার ভেতরে লুকিয়ে পড়ে। আমার মনখারাপ লাগে। টাকাটা হয়তো অন্নপিসি যত্ন করে তুলে রেখেছিল। ওই রুপোর খণ্ডটির সঙ্গে তার নিরুদ্দেশ স্বামীর কি কোনও যোগ আছে? ওটি কি পিসির বিয়ের সময় তার হাতে ধরা লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে একমুঠি ধানের সঙ্গে রাখা ছিল?

এরপর আত্মীয় থেকে ধরে পাড়া-পরিজন অনেকেই প্রায় লাইন দিয়ে ভিক্ষে দেয়। আমার গেরুয়া ঝুলি ভরে ওঠে। শুধু চাল-আনাজ নয়। সোনার আংটি, কলম -এমনি কত কী। আমি কলমগুলোর সংখ্যা মনে মনে হিসেব করি। অনেকে আবার ছোট গীতাও দেন।

এরপর টোপর-জোড় সহ রাজবেশ। সেটা সামান্যক্ষণ। দাদু হাঁকেন, নাও হে বামুন, আবাব গেরুয়াটা পরে নাও। এবার তোমার আহারের ব্যবস্থা। তোমায় নিজেই রাঁধতে হবে তো।

তিনখানা ইটের ফাঁকে কিছু শুকনো বেল কাঠ গুঁজে আগুন জ্বালা হয়। তার ওপর মেটে সরা। তাতে আতপ চাল, দুধ, কাঁচকলা, রাঙা আলু আর গুচ্ছের গাওয়া ঘি দেওয়া হল। সামান্য সৈন্ধব লবণ। আমি ধোঁয়ার ঝাঁজে চোখ মুছতে মুছতে একটি বেলকাঠ দিয়ে অন্ন পাক করি। দাদু বলে দেন, এর নাম হচ্ছে চড়ু। এটিই তোমার খাদ্য এবেলা।

মা পাশ থেকে কাঠ দিয়ে নেড়েচেড়ে যতই সুখাদ্য করার চেষ্টা করুক, খাবারটা মুখে দেওয়ার মতো নয় তা আমি বুঝতে পারি।

পৈতে শেষে গেরুয়া ঘোমটা পরা আমার একহাতে বিল্বদণ্ডে লটকানো ভিক্ষের ঝুলি আর এক হাত মা ধরেছে। সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় দাদুর ঘরে আমার দণ্ডিঘর।

দক্ষিণের মস্ত জানালা বন্ধ। তার পাশে মেঝেয় কম্বলের বিছানা। পাশে গঙ্গা জলের বোতল। তেষ্টায় ওটি খেতে হবে।

রাতে, আমার ঘরের সামনে গিজগিজে মানুষ। আমার পাশে বসে মাসি। আমার ঘোমটা টানা মুখের পাশে বলে দিচ্ছে কখন মুখের উড়নি সরাতে হবে কখন বন্ধ। অর্থাৎ অবামুন-এর মুখ দেখা নিষেধ এই দণ্ডিঘরে। ব্রহ্মচারী বলে কথা। কত বুড়ো-বুড়ি মানুষ এসে আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছেন। আমি শিউরে শিউরে উঠছি।

হুড়মুড়িয়ে এসে পড়ে বন্ধুরা। সবার আগে সুবল। ও আমার পাশে বসে পড়ে বলে, খবর্দার, ভিন্ন জাতের মুখ দেখবি না আজকে।

আমি বলি, কী হবে?

সুবল গম্ভীর মুখে বলে, মহাপাপ হবে। তুই না বেম্মচারী।

বন্ধু সতে—সত্যপ্রকাশ মুখুজ্যে, বুধো, বিলু, স্বপন—এরা সব বামুন। আমায় ঘিরে বসে থাকতে এদের কোনও বাধা নেই। এক ফাঁকে মাসি আমার ঝোলা খালি করে, সোনাদানা, টাকা এক জায়গায় গোছায়—তুলে রাখবে বলে।

আমি বলি, পেনগুলো নিও না। আর বই।

সতে আমায় 'রামের সুমতি' বইটা দেয়। ওটি আমার প্রিয় বই। পড়তে পড়তে চোখে জল আসে কেবলি।

সুবল পাশ থেকে হেঁড়ে গলায় বলে, ঘোমটা দে, ঘোমটা দে।

আমি তার আগেই চোখ তুলি। দেখি দরজার ওপারে আমার ভারী প্রিয় বন্ধু, বয়েসে কিছু বড়, অশোক। পদবি মল্লিক। বাগদিদের ছেলে।

আমি দেখি অশোক আমার চোখের দিকে চেয়ে আছে। একগাল হাসিতে তার মুখ ভাসছে।

আমিও হাসি। হেসেই চলি। অমনি সুবল এক হেঁচকায় আমার মুখের ওপর গেরুয়া টেনে দেয়। অমনি সদ্য দুপুরবেলাকার চড়ুর গন্ধ, ঘিয়ের ঝাঁঝে আমার ওয়াক্ উঠে আসে। আমি তাড়াতাড়ি জলের বোতল টেনে নিই।

অনেক রাতে, যখন লোকজনের খাওয়াদাওয়া শেষ, বাড়িটা খানিক জুড়োয়। মা আর দিদিমা এসে সাবু ভিজনো আর কাটা ফল খেতে দেয় পাথরের থালায়। সঙ্গে একতাল মাখা সন্দেশ।

আমি বলি, পানতুয়া খাবো।

মা হাসে, দূর পাগল। তুই না এখন ব্রহ্মচারী। তোর জন্যে তোলা আছে। পরে খাবি।

আরও অনেক রাতে আমার ঘুম ভেঙে যায় নাক ডাকা আর নস্যির ঝাঁঝে। দেখি পিতামহ আমার পাশটিতে কাত হয়ে ঘুমোচ্ছেন। ঠিক যেন ছেলেমানুষটি।

জীবনে কখনও দাদুর সঙ্গে শুয়েছি বলে মনে পড়ে না। হুঁ, এখন তো শুধু দাদু নন, আমার আচার্য গুরুও। কিন্তু ভঙ্গিটি ছেলেমানুষী।

দাদু তো কখনও কারও সঙ্গে শোন না। আশ্চর্য!

উনষাট

বাইরে শেষ রাতের অন্ধকার। ভেতর ঘরেও তার ছটা। আমার গায়ে টুকটুক নরম হাতের ঠেলা। পাশে দাদুর নাকগর্জন। তাই বুঝি আস্তে আস্তে টোকা।

চমকে তাকাই। ভাইটির মুখ এ ঘরের অন্ধকারে খোলা জানলা দিয়ে বয়ে আসা রাস্তার লাইটপোস্টের আলোয় জড়িবুটি আঁকা রহস্যময়, মধুর। টিকলো নাকে পাতলা কালো ফ্রেমের চশমা একটু নেমে এসেছে। চুলের ঢেউয়ে আলোর চেয়ে অন্ধকারই বেশি খেলছে। ফর্সা টুকটুকে মুখে অকালবৈধব্য আর জোয়ান ছেলে বিয়োগের সদাই অভিমান মুখখানিকে আরও সাজিয়ে দিয়েছে যেন। ব্যথারও বুঝি এক ধরনের আলাদা সৌন্দর্য আছে।

আমি উঠে পড়ি। দাদুর ঘরে রাখা সাবেক ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় নিজেকে দেখে একেবারেই অচেনা মনে হয়। কামানো মাথা, গেরুয়া ধুতি উত্তরীয়, গলায় আড়াআড়ি যজ্ঞোপবীত। কপালের মধ্যিখানে ধ্যাবড়ানো হোমের তিলক আর দধি-হলুদের নকশা। বেঁধানো দু'কানে হলদে সুতোয় গেরো দেওয়া। কে ওই ছেলেটা? কী অদ্ভুত আলাভোলা নিষ্পাপ আর কেমন যেন বাড়তি পবিত্র পবিত্র ব্যাপার। আমার মতো মিচকে শয়তানের চেহারায় বুঝি ভাল ভাল মেকআপ করা হয়েছে। এই সেদিন দত্তপাড়ার মাঠে দেখা 'বিবেকানন্দ' সিনেমার মতো। কেন জানি দেখে মনে হচ্ছিল, যে লোকটি বিবেকানন্দ সেজেছে সে মোটেই সুবিধের নয়। কী যেন একটা গোলমাল চাপা দিয়ে রেখেছে ওইরকম টানা টানা চোখ আর পাগড়িটাগড়ি দিয়ে।

ভাইটি বলে, ঝোলটা নে। দণ্ডটা নে।

নীচে অন্ধকারে রিকশা দাঁড়িয়ে। মা এসে আমাদের তুলে দিয়ে যায়। বলে, এত ভোরে বেশি চান করিস না। ঠান্ডা লেগে যাবে।

আমার নাকে বাড়িময় ঘুরে বেড়ানো পোলাও-মাংসের গন্ধ। আমি বলে উঠি, আমি কিন্তু ফিরে এসে পোলাও-মাংস খাবো।

মা হাসে, ছি বাবা, আজ নয়। আজ যে তোর একাদশী।

আমি মিন মিন করে বলি, একাদশী।

রিকশা চলে। ভাইটির পাশে বসে অবাক দেখি আমার চেনা পাড়া, বাড়িঘর, গাছপালা পুকুরের সার লাইটপোস্টের আলোয় কীরকম নতুন নতুন, আশ্চর্য আশ্চর্য লাগছে। রাস্তায় কেউ নেই। শুধু একটা লাইটপোস্টের নীচে একজোড়া কুকুর পেছনে পেছন সেঁটে ঝটপট করছে। বাঁশতলার মুখে ডোবার ধারে পাতাভারী গাবগাছের ঘন সবুজ পাতার ফাঁকে টুকটুকে লাল পাতা। ছোট ছোট গাব ফলে গাছটা ভরে আছে। তার নিচে বৈঁচির ঝোপ আর কালকাসুন্দে। একটা মেটে হাঁড়া অকারণে উল্টে পড়ে আছে ওখানে।

রামপ্রসাদের ভিটের পেছন দিককার পথ দিয়ে যেতে যেতে দেখি একটা মুশকো ষাঁড় পুকুরধারের সরু রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছড়ছড় পেচ্ছাপ করছে। কী আশ্চর্য, কাল পৈতের অনুষ্ঠানের সময় বেদিতে মাটির ভাঁড়ে খানিকটা করে গোবর আর চোনা রাখা ছিল। ডানদিকে মস্ত এলাকাজোড়া বাগান আর জঙ্গল। তার ভেতর থেকে একটা সজারু বেরিয়ে এসে আমাদের রিকশার পাশ দিয়ে কী অবাক ঝুমঝুমি বাজাতে বাজাতে দৌড়ে যায়। ওদের গায়ের কাঁটায় নাকি চলার সময় ঘষাঘষিতে এমনটা নয়।

সামনে বাঁক পেরিয়ে ঠেলে-ওঠা রাস্তায় এবার ডাইনে যেতে হবে। একটু এগিয়েই বাঁ হাতে বাসন্তীতলা। ডাইনে আকাশ ধরা সাবেক লম্বা পাঁচিলের ওধারে ঝাঁকড়া আমগাছ। তার পাশ দিয়ে গোলাপজামের পাতারা গম্ভীর হয়ে আছে। বুড়ো শিবতলার মন্দির টঙে ত্রিশূল গাঁথা। ত্রিশূলের আকাশে এখন সামান্য ফিকে ফিকে স্বভাব। আর একটু এগিয়ে ডানদিকে জোড়া-শিবমন্দির। ভাঙাচোরা, ধ্বস্ত, পাল্লা নেই, দরজার ওপার অন্ধকারে ভাঙা টুকরো মস্ত শিবলিঙ্গ ধরাশায়ী। এখান থেকেই গঙ্গা দেখা দেয়। দূর থেকে ছানাকাটা অন্ধকারে নদীর জলে ভরভরন্ত দৌড় এই নিঝুমেও থমকে নেই। ডাইনে পুলিশ ফাঁড়ির বারান্দায় আলো জ্বলছে। কতগুলো বালির বস্তার ওপর একটা রাইফেল তাগ করা। পেছনে কোনও সেপাই নেই। বারান্দায় লম্বা বেঞ্চে এক বৃহৎ খাকি ভুঁড়ি হাঁ করে ঘুমোচ্ছে।

খাড়াই ঢালু এবড়োখেবড়ো পথ গঙ্গার দিকে। ডাইনে মস্ত বটতলের পেছনে কুণ্ডু কোম্পানির বালির পাহাড়ের গায়ে পরিত্যক্ত জীর্ণ মুড়ি কোঠা। ওখানে একদা নাকি গঙ্গাযাত্রায় মরো মরো মানুষদের খানিক সময়ের জন্যে রাখা হত। শোনা যায়, মরতে মরতে বাঁচো বাঁচো লোককে দিনমানে ওখানে রেখে, রাতের বেলা তাকে টেনে জলের ধারে নামিয়ে এনে, নাগাড়ে জল খাইয়ে দম আটকিয়ে মেরে ফেলা হত।

গঙ্গার ঘাটে শান্ত নিঝুমতা। রাস্তায় বাস-লরি নামেনি। ওপারে ডানলপ কারখানার কালো জেটিময় ঝাঁঝালো আলো। দু'টি-একটি ডিঙি রাতভোর গাঙ চষে চষে এখনও চরে বেড়াচ্ছে। খর কালো মাঝির মুখে টিমটিমে বিড়ির আগুন। আকাশ এবার আলো হওয়ার মুখে। ভাইটি বলে, একে বলে ব্রাহ্মমুহূর্ত। নে, এবার চান করি চল।

জলে নামি। শিরশির করে গা।

—ডুব দে। ডুব দে।

ভাইটি নাকে-কানে আঙুল দিয়ে ভুস ভুস ডুব দেয়। দেখাদেখি আমিও। জলের নীচে শোঁ শোঁ চাপা শব্দ শুনি।

পাড়ে উঠে ভাইটির কথামতো আমার বেলদণ্ডের গায়ে গেরুয়া ঝুলিটা বেঁধে জলে ছুঁড়ে দিই। আমার দণ্ডি ভাসানো হয়ে যায়। আমি দেখি গলায় লটকানো গেরুয়া ঝুলি পরে কাঠের লাঠিখানা মহা আনন্দে স্রোতের মুখে নাচতে নাচতে ভেসে যাচ্ছে উত্তর দিকে। ওইদিকেই তো আমার হিমালয়। আমার সেখানে যাওয়া হল না। বদলে আমার ভাসান দেওয়া ঝুলি-লাঠি চলে গেল অক্লেশে।

নেড়া মাথা। হাফ প্যান্ট। শার্ট। আবার পুরনো ভাবে। শুধু যা মাথায় হাত দিলেই কীরকম খাঁ খাঁ করছে।

বাড়ি বোঝাই মানুষজন আড্ডা গল্পে কাজে যখন ব্যস্ত, আমি চুপি চুপি ঢুকে পড়ি সিঁড়ির পাশে চোরকুঠুরির ভেতরে। ওটা পৈতেবাড়ির বাসী ভাঁড়ার। টিমটিমে বাল্‌ব জ্বলছে। মেঝেয় রাখা সার সার নৌকোয় পোলাও, মাংস, মাছ, পানতুয়া, রসগোল্লা ইত্যাদি। জামার কোঁচড়ে যথাসাধ্য পোলাও, মাংস, পানতুয়া তুলে নিই। আর প্যান্টের পকেটে খানতিনেক বৃহৎ মাছের মুড়ো, যা আমি মুখে দিই না। পাড়ার বন্ধু ভরতকে বলা আছে। ও নীচে—রাস্তায় থাকবে।

ফাঁকা ছাদে গত রাতের ম্যারাপ। কেউ নেই। আলসের ধারে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে বলি, নে, ধর।

একে একে তিনটি মুড়ো ছুঁড়ে দিই। ভরত লুফে লুফে নেয়। এবার নিশ্চিন্তে কোঠার সিঁড়িতে বসে কোঁচড় খুলে পোলাও-মাংস আর পানতুয়া খাই গপাগপ। নীচে লোকজনের কোলাহল, গল্প। কুয়োতলায় কাক ডাকছে কা কা। পাশের বাড়ির জানলা দিয়ে রবীনদার মাইকে লতা গাইছেন, মন ডোলে, মেরা মন ডোলে—। সুবলের উন্মাদ বাবা পাশের বাড়ির উঠোনে অট্টহাস্য ছুড়ছেন, এখনও বুঝতে পারোনি। হরির ছেলে। লক্ষ্মী ঠাকুর—মানে লক্ষ্মীকান্ত রায়চৌধুরী। আর সব গেঁড়ে ব্যাটাচ্ছেলে। ওই ওই, আকাশ থেকে পরি নামছে, নামছে, হা হা হা।

নীচে নেমে আসতেই আমায় ধরেপাকড়ে আহ্নিকে বসানো হয়। ট্রেনিং দেন শিমুরালির সত্য দাদু। সম্পর্কে আমার দাদুর কীরকম শ্যালক।

—কোশা থেকে কুশিতে জল নাও ভাই।

নিলাম। তারপর হুকুম হয়, এবার তিনবার আচমন করো ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু।

গঙ্গার জলে খাসা পোলাও-মাংসের গন্ধ। হাতটা তেলে ঘিয়ে জবজবে। একশো আটবার কর গুনে গায়ত্রী জপ করো এবার।

কর গোনার ট্রেনিং হয়। অনামিকার দ্বিতীয় খোপ থেকে আরম্ভ করে নিচে নেবে এবার কনিষ্ঠা বেয়ে ওপরে ওঠা। তারপর আবার অনামিকা, মধ্যমা হয়ে একেবারে তর্জনীর শেষ খোপ। এটুকু দশবার। মনে রাখতে হবে—আঙুলের করে অথবা নখের ডগায় ছোঁয়া চলবে না।

দুপুরে পাথরের থালে ফল সাজানো। বাটিতে সাবুমাখা। আবার সেই একতাল মাখা সন্দেশ। ঠুকরে ঠুকরে ফল মুখে দিই। বিচ্ছিরি সাবু চটকানো। কিন্তু সব কিছুতেই পোলাও-মাংস ঝলমল করে। শাঁখা আলুর টুকরো মাংসের মেটে হয়ে যায়। দূরে বসে আচার্য গুরু দাদু আর যত সব বুড়িগণ ব্রহ্মচারী ব্রত পার করা পবিত্র বালকের বিশুদ্ধ একাদশী প্রত্যক্ষ করেন। কানুবাবা সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে জড়িয়ে জড়িয়ে কান্না কান্না গান গায়, মধুর আমার মায়ের হাসি, চাঁদের মুখে ঝরে, মাকে মনে পড়ে আমার...

রামপ্রসাদী কণ্ঠে গীতের বদলে এখন সংস্কৃত শ্লোকোচ্চারণ। অথচ এখনও পেটে তরল পড়েনি। এ অবস্থায় দেবী দুর্গার অসুরদলনী সুরাপান করার আশ্চর্য প্রতিমা উপাখ্যান। জগন্মাতার এ এক অভিরাম ক্রোধ দিব্যা মূর্তি।

ওদিকে অন্ধকার বাদাড়ে ভোগ পিণ্ড নিয়ে মারামারি কামড়াকামড়ি। এক শৃগালের দন্ত-নখের প্রহারে অপরটির মুখ, কপাল রক্তাক্ত, ছিন্নভিন্ন। এই কালো অন্ধকারে আর মেঘ কৌতুকি টিপিরটিপির বৃষ্টির অবসরে সেই অন্ন পিণ্ড লুঠ করা পশুর দলকে পশুর চেয়েও ক্ষিপ্ত বলে মনে হয়। সেই উগ্রতার মোক্ষম সাজপত্তন তাদের শরীরে, এই অতর্কিত রুধির স্রাব। আহা, অন্ধকারের দোসর ওই রক্তপাত জীবনকে যেন আরও শতগুণ সাজিয়ে দিয়েছে। সর্বাণী মনে ভাবেন, তার স্বামীধনটির মাথায় দেশকালের যে ভবিতব্য আর ঘটে চলা চলচ্চিত্র আঁকা হয়ে চলেছে তার পরিণতি কী। সেখানেও কী এই রক্তলাঞ্ছনার লিখন বয়ে চলেছে। দেশের কপালে কী এর বাইরেকার কোনও তত্ত্ব নির্ঘোষ নেই!

প্রসাদ সর্বাণীর দিকে ফিরে তাকান। সর্বাণী দেখতে পায় তার পুরুষটির কপালে অজস্র চিন্তার ভাঁজে আকাশের চকিত আলো ঝলসে ঝলসে উঠছে। প্রায় আকর্ণ টানা চোখ দু'খানিতে এই নিবিড় রাত্রির চাঞ্চল্য আর পাষাণ দুই ভর করেছে। উন্নত ললাটে চিড়িক চিড়িক আলো পড়ছে। বনের মাথায় থাকে থাকে মেঘডম্বরু বাজছে গুমগুম, গুমগুম। দিগন্তে মুহুর্মুহু বিদ্যুতের চাবুক পড়ছে শপাং শপাং। শালপ্রাংশু সুঠাম এই রাজপুরুষি আকারখানির আবডালে যে অতি সাধারণ জীবন পার-করা এক মানুষ লুকিয়ে আছে সে কথা অপরিচিতে বিশ্বাস যাবে না। নিত্যি দেখে দেখেও যে আশা মেটে না।

প্রসাদ বলেন, বউ, বড্ড ইচ্ছে যাচ্ছে একটু কারণ পেসাদ পেতে। এমন পরিবেশ বলে কথা।

সর্বাণী হাসে, বেশ। থালে দ্রব্যটি আমিই নিয়ে আসি।

—হ্যাঁ, কালীর ঘরে সিকেয় মেটে হাঁড়ি টাঙানো আছে।

সর্বাণী টিপিটিপি জল মাথায় পিছনে যায়। রামপ্রসাদ পিছু হতে গুরু নিতম্বিনীর দ্রুত চলন দেখেন। দেখেন সামান্য ভিজা পিঠ ও .কোমরের খাঁজ এখনও কী সুঠাম। নিতম্বে রমন সম্ভারের অটুট সাজপত্তন। বাহু বল্লরীতে বিন্দু বিন্দু জল, আসলে স্বেদপতনের ছল।

রামপ্রসাদের মনে পড়ে কবি শ্রীজয়দেবের কথা। যদিও কালী-কৃষ্ণে কোনও প্রভেদ নেই, যদিও স্বয়ং কৃষ্ণ হলেন অর্ধনারীশ্বর তথাপি কবিতায় বা গীতে এ বাংলায় কৃষ্ণগীতি এড়ানো দায়। বিশেষ করে বাঙালির প্রেমকথা বিস্তারে কৃষ্ণকথার কোনও দোসর নেই।

সর্বাণীর টিপিটিপি, মন্দ মন্দ বৃষ্টিপতনের তল দিয়ে চলে যাওয়া দেখতে দেখতে প্রসাদের মন পলকে চলে যায় শ্রীজয়দেবে। শ্রীরাধা ও কৃষ্ণের অভিসার ও রতি সম্ভাষণে।

ভ্রূপল্লবং ধনুরপাঙ্গ তরঙ্গিতানি
বাণা গুণঃ শ্রবণপালিরিতি স্মরেণ।
তস্যামনঙ্গজয়জঙ্গমদেবতায়া---
মস্ত্রানি নির্জিতজগন্তি কিমর্পিতানি॥

রাধা শ্রীমতীই কামবিজয়ের মূর্তিমতি দেবী। তাঁর ভ্রূপল্লব হল ধনু, কটাক্ষ হল শর আর শ্রবণপ্রান্ত সেই ধনুর গুণস্বরূপ। হে কাম! এইসব অস্ত্রবলে ত্রিলোক জয় করে পুনরায় তুমি কি সেগুলি তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছ?

রামপ্রসাদ [illegible] কোথায় বজ্রপাত ঘটে। আর তখনই তার পিছু

ধরে প্রবল বৃষ্টিধারা নেমে আসে। আকাশ ঘন ঘন কটাক্ষ চমকায়। কোথা থেকে উন্মাদ হাওয়া ধেয়ে এসে বড় বড় গাছগুলিকে ছত্রভঙ্গ করতে থাকে। আর সেই অবস্থার ফাঁক দিয়েই ভিজে জাব সর্বাণী মেটে হাঁড়া হাতে ধরে নিয়ে আসে। কবি শ্রীজয়দেবের সূত্র ধরে রামপ্রসাদ সেই প্রলয়পয়োধিজলের চলচ্ছবি দেখতে পান। সেই প্রলয়ের কূটাভাস মুরসিদাবাদ ও কলিকাতার এখনকার পরিস্থিতির ছটা ফেলে।

কলিকাতা বিজয়ী নবাব এখন খামখেয়ালের চূড়ান্তে উঠেছে। ওধারে সিরাজের মাসির পুত্র শৌকত জঙ বাংলার নবাব হওয়ার স্বপন দেখছেন। গরিব সাধারণ প্রজাগণ কিন্তু জানে না কী উগ্রস্বভাবী সিরাজ-শৌকত। এই শৌকত একলম্ফে উচ্চে উঠে পড়তে চান। ফলে তিনি তলে তলে এক কোটি টাকা ঘুষ দেবেন বলে প্যাঁচ কষে দিল্লির বাদশার উজির ঘাজিউদ্দিনের নিকট থেকে বাংলা-বেহার-উড়িয্যার নবাবী করার এক হুকুমপত্র আনিয়ে বসে তাল ঠুকছেন। মূর্খ শৌকত জানে না—এটি ফরমান বা নিশান নয়, উজিরের হুকুমনামা মাত্র। তার বলেই শৌকত নবাবকে পত্রনিক্ষেপ করে বসে আছেন, তুমি অবিলম্বে মুরসিদাবাদ ছেড়ে ঢাকায় নিয়ে থাকো গে। তোমায় আমি প্রাণে মারাব বদলে কিছু মাসোহারার ব্যবস্থা করে দেব।

মীরজাফর গোপনে পত্র লিখে শৌকতকে বঙ্গদেশ আক্রমণ করার ইন্ধন দিলেন।

সিরাজ ওধারে পুরোদস্তুতর তোয়ের। তিনি বেহারের উপশাসক রামনারায়ণকে প্রস্তুত হওয়ার খপর করলেন। সৈন্য জোগাড় হল অন্যান্য দিক থেকে। নবাব সিরাজের সৈন্যবল যে কী বিশাল তা নিয়ে শৌকতের কোনও আঁচই ছিল না। অতএব মনিহারির নিকটে দু'তরফে ঘোর যুদ্ধ বাধল।

এ সমাচার ফলতায় ইংরাজদের সমীপে গেল। শুনে তারা যারপরনাই বিষণ্ণ হয়ে পড়ল। মাদ্রাজে জবর তলব পাঠাল ইংরাজ।

বাংলার এই প্রলয়পয়োধি স্রোতের আর এক পটে এখন সর্বাণী প্রসাদের প্রিয় কারণঘট বয়ে আনল, এইমাত্র। বৃষ্টিতে ভিজে ওই রমণীর পুষ্ট স্তনাভাস সমর অঙ্গনখানি আরও সঘন করে তুলেছে। তার দেহ পাকে কেবলই বিদ্যুৎ হানছে। সেই নীলাভ চাবুকের ছটায় সর্বাণীর প্রখর শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে।

চঞ্চলকুন্ডললিতকপোলা।
মুখরিতরশনজঘনগতিলোলা।

তার মনোহর কপোলে এক জোড়া কুণ্ডল দুলছে। আর নিতম্বের আন্দোলনে চন্দ্রহারের মনোহর ধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

রামপ্রসাদ বহুক্ষণ বা বহুকাল যেন পিপাসু এমতভাবে পাত্রটি গলার সুমুখে উবুড় দেন। তীব্র বৃষ্টিস্রোতের সঙ্গে বুঝি পাল্লা দিয়ে হাঁড়ার তরল তাঁর গলা বেয়ে অন্দরে নামতে থাকে। সর্বাণী অপলকে দেখে পুরুষটির রোমশ কবাট বুকে পানীয় পড়ছে বৃষ্টির সঙ্গে বিজড়িত হয়ে। তাঁর সপাট জানু জোড়ার গায়ে ধুতি চেপে বসেছে। নাভিস্থলে কোমল রোমপুঞ্জ কী এক আশ্চর্য প্রলোভন গণনা করছে।

সর্বাণী প্রসাদের বুকের কাছে এগিয়ে যায়। ঘন হয়ে দাঁড়ায় পুরুষপ্রবরটির সঙ্গে।

বিপুলপুলকপথুবেপথুভঙ্গা।
শ্বসিতনিমীলিতবিকসদনঙ্গা॥

সে রোমাঞ্চিত ও কম্পিত হয়ে কামতরঙ্গে ভেসে যাচ্ছে। ঘন ঘন শ্বাসপতন করায় আর নেত্র নিমিলিত হওয়ায় তার মদনাবেশ প্রকাশিত হচ্ছে।

ভিজে জাব সর্বাণী দখিন হাতখানি তুলে কড়ে আঙুলটি প্রসাদের সরোম বুকের মাঝখানে স্থাপন করলেন। প্রসাদ দেখলেন নিত্যাপরিচিতা এই গৃহিণী এখন বুঝি অপরিচিতা এক রমণী বিশেষ। এই বৃষ্টিধারায় তার অঙ্গের সুরভি আকন্দ ফুলেবও অতীত, অতীব আকর্ষণী মাদকতার দিকহারানো পাখি এক।

প্রসাদ এক হাতে সর্বাণীর পিঠে একটি বেড় দেন। টের পান, এই বিপুল বৃষ্টিভেজা তাণ্ডবেও রমণীর শরীরে কী হিরণ্যউত্তাপ ভর করেছে। ওই শীতল সিক্ত দেহেও তপ্ত স্বেদের দানাগুলি কী অবাক আলাদা করে চেনা যাচ্ছে। সর্বাণী অনুভব করে ঝাঁঝালো কারণবারির লোহার আগুন তার দিকে উবুড় হবে বলে তোয়ের হয়েছে। রামপ্রসাদ হেঁট হয়ে সর্বাণীর দুই রমণীয় স্তনের মধ্যখানে মুখ রাখেন। যেন কতকাল পরে এই আগুনমুখো পুরুষটির ঠোঁটের আস্বাদ পায় সর্বাণী। সে কাতরে ছটফট করে।

প্রিয়পরিরম্ভণরভসবলিতমিব পুলকিতমতিদুরবাপম।

মদুরসি কুচকলসং বিনিবেশয় শোষয় মনসিজতাপম্॥

ওগো প্রিয়তমে, আমি যে কামের আগুনে সন্তাপিত। আমার আলিঙ্গনে আশ্লেষে উচ্ছ্বসিত ও পুলকিত অতিদুর্লভ তোমার ওই স্তনযুগল আমার বুকে রাখ। আমার সন্তাপ পলায়ন করুক।

প্রসাদ সর্বাণীকে পাকুড় গাছটির সঙ্গে হেলান দিয়ে সবেগে পিষ্ট করতে থাকেন। তাঁর রোমাঞ্চিত ওষ্ঠজোড়া রমণীর নাভিমণ্ডল থেকে উত্থিত হয়ে স্তনবৃন্তে এসে মোচড় দেয়। সর্বাণী শিহরিত হয়ে পুরুষটিকে দু-হাতের বেড়ে প্রাণপণ ধরে নিজের সঙ্গে পিষ্ট করতে থাকে। মাথাসাজানো কোঁকড়া চুলের রাজত্বে দু-হাত দিয়ে খামচাতে থাকে। সর্বাণী তার উরুদেশে ডাকাতটির মন্থনদণ্ডের গর্জন অনুভব করে।

মঞ্জুতরকুঞ্জতলকেলিসদনে।

প্রবিশ রাধে মাধবসমীপমিহ

বিলস রতিরভসহসিতবদনে।।

ওহে রাধিকে, রতি আবেশে হাসিমুখে মনোহারি রতিকুঞ্জে মাধবের কাছে গমন করে বিহার করো।

ষাট

নিদারুণ বৃষ্টি আর ঝঞ্ঝাস্রোত দুটি নরনারীর উন্মত্ত সম্মীলন রোধ করতে পারেনি। আসলে দীর্ঘকাল রামপ্রসাদ প্রায়ই দূরে থেকেছেন দেশকালের হয়রানকারী ভাবনায়। এ ভাবনা প্রত্যক্ষের চেয়ে পরোক্ষেই। তবু তো তার মধ্যে নির্লিপ্তির অনুপ্রবেশ নেই। কবির চিত্ত সদাই তার নিজের স্বভাবে সময় দেখে। সময়ের বিচিত্র আন্দোলনের সঙ্গে সে দুলে ওঠে। প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে কিঞ্চিৎ খালাস হয়।

ভুঁয়ে পড়া দুটি কাদা-জল মাখামাখি শরীর যখন উঠে দাঁড়ায় তখনও বাজ বৃষ্টির একই ধারা। একই রীতিতে গাছগুলি দুলে চলেছে। শরীর দিয়ে শরীর গ্রহণ, এই প্রকৃতি

সজাগ হয়ে প্রত্যক্ষ করেছে। একজোড়া মানবশরীরের উন্মত্ত বিহার এক পার্থিব আর ঘুরপথি সময়ের চলচ্ছবি সৃষ্টি করেছে। কোথায় যেন অলখে ভিন্ন এক সময়ের রূপ পরিগ্রহ করে বসে আছে।

হাঁড়া থেকে প্রসাদ বাকি পানীয়টুকু গলায় উবুড় দেন। সর্বাণী এই প্রথম বুঝি শিথিল লজ্জার স্বভাব টের পায়। পরনের ভিজে কাপড়ময় কাদার অলঙ্কার হয়তো শরীরের লজ্জাস্থানগুলি আড়াল দিতে সাহায্য করে। সে চোখ না তুলে তার পুরুষটির প্রতি বলে, ডাকাত। ডাকাত।

পুরুষ এ গুনপনা বর্ণনে বিশেষ বিচলিত হন না। বরং পানোন্মাদনায় হা হা হেসে ওঠেন। সে-হাস্যে আকাশচারী বাজবিদ্যুৎ কুতুহলি দোহার দেয়। বৃষ্টিস্রোতে মাটি বরাবর সাময়িক জল বিস্ফোরণ ঘটে। তার মধ্যে সাঁতার দেয় অগুণতি কই, মাগুর আর শিঙি মাছ। মাছেরা যায় আর আড়ে আড়ে বলে, ও হে রামপেসাদ, তোমরা দুটিতে যেমন এই বাদলে ঘর ছেড়ে ভুঁয়ে নেমেছ, তেমনি আমরাও জল ছেড়ে ডাঙায় উঠেছি। তোমরা যেমন এই আকাশতলের সুখ আন্দোলন উপভোগ করছ, আমরাও বা কম কীসে। আমরাও দল বেঁধে নেমে পড়েছি সুখ লুণ্ঠন করতে।

প্রসাদ হাসতে হাসতে বলেন, এ বেশ ভাল হল বউ। এতকাল লড়াই-যুদ্ধ হত ছাদ আঁটা ঘরে। এখন নেমে এল একেবারে খাস মাটির পরে। আর কোনও আগল রইল না।

সর্বাণী আবার বলে, ডাকাত। ডাকাত।

প্রসাদ, ডাকাতি তো ঘরে হয় বলেই জানা আছে গো।

সর্বাণী, কেন বনে হয় না বুঝি। বরং বনের মধ্যেই তো ডাকাতি জবর হয়। কেড়েকুড়ে সব্বস্ব হরণ করে নেয় ডাকাতেরা।

প্রসাদ, তা বটে, তা বটে। তবে ডাকাতির তত্ত্ব ঘরে সিধেসাধা। আর বাইরে বিস্তর জটিল।

সর্বাণী, তা বটে। ডাকাতদের দলপতি বলেই এমন সিধে করে আমায় সমঝিয়ে দিলে।

প্রসাদ, তা হলে আমার মতো করে আর একটু সমঝাই।

সর্বাণী শুধু প্রশ্ন আঁকা চোখ দু'খানি তুলে ধরে।

প্রসাদ গেয়ে ওঠেন,

বাসনাতে দাও আগুন জ্বেলে
ক্ষার হবে তার পরিপাটি।
কর মনকে ধোলাই, আপদ বালাই
মনের ময়লা ফেল কাটি॥
কালীদহের কুলে চল,
সে জলে ধোপ ধরবে ভাল,
পাপ কাষ্ঠের আগুন জ্বাল
চাপায়ে চৈতন্যের ভাঁটি॥

সর্বাণী এবার ভিজে আঁচল মোচড়াতে মোচড়াতে বলে ওঠে, সত্যিই বটে। বাসনাতে আগুন দিয়েছ বটে। তার নমুনা তো এখুনি পাওয়া গেল।

প্রসাদ আকাশের মাতনে একবার তাকান, আমরা কি স্বার্থপরের পারা ব্যবহার কল্লাম।

সর্বাণী, স্বার্থপর! কেন?

প্রসাদ, ঘর-দোর এড়িয়ে একটি নব উন্মাদনার সোয়াদ নিতে কি আমরা অসময়ে মেতে উঠলাম।

সর্বাণী, সে আবার কী কথা! আমরা তো কাউকে বঞ্চিত করিনি।

প্রসাদ, ঘরে তোমার ফুলকচি কন্যে জগদীশ্বরী আছে। তাকে মাই দেওয়ার সময় কখন যে বয়ে গেল।

সর্বাণী, আসবার আগে তাকে দুধ খাইয়ে এসেছি। আমি জানি সে এখন ঘুমুচ্ছে।

প্রসাদ, তোমার পারা হিসেবি আমি আর দুটি দেখিনি। তুমি আছ বলেই আমি দিব্যি আছি। সংসার নিয়ে আমার কোনও চিন্তা নেই বউ।

সর্বাণী বলে, আমার কিন্তু একটি ভিন্ন কথা মনে হচ্ছে এখন। যদি তুমি ভরসা দাও তো বলি।

প্রসাদ প্রশ্ন চোখে এঁকে তাকান শুধু।

সর্বাণী বলে, ওই পঞ্চমুণ্ডি আসনখানির কথা কি মন থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে তোমার?

প্রসাদ বলতে গেলে চমকে ওঠেন। মনের ভিতরে বহুদিনের গুপ্ত সাধখানি আজ সর্বাণীর এই কথাপাতে আগুনের মুখ দেখে। তিনি বলে ওঠেন, রামকৃষ্ণধাম! সরকারি খতিয়ানেও তো তাই লেখা আছে।

—হ্যাঁ। সে কথাই বলছিলাম। সাবর্ণ চৌধুরী দিগরের বংশধর সেই মানুষটি তো মস্ত সাধক ছিলেন। তান্ত্রিক সাধক।

প্রসাদ, বউ, আমি তো পুরোদস্তুর তান্ত্রিকও নই আবার সাধকও নই। আমি কালীর বেটা হয়ে দু-চার কিসিম কবিতা রচি। তাতে সুর ছেনে গান করি মহা আনন্দে।

সর্বাণী, কিন্তু তোমার যে ভারী সাধ ছিল রামকৃষ্ণ সাধকের ওই পীঠে বসে আপন মনে মায়ের নাম করবে।

প্রসাদ, তা ছিল বৈকি।

সর্বাণী, স্থানটি তোমার চোখের সুমুখেই গড়-জঙ্গল আর পতিত হয়ে পড়ে আছে।

প্রসাদ, হ্যাঁ, ওই তো, আমাদের সুমুখেই তো পতিতখানি পড়ে আছে। সে কতকাল আগেকার কথা। সাধক রামকৃষ্ণ আজ থেকে বহুকাল আগে গত হয়েছেন। তিনি ছিলেন সাবর্ণ বংশের বিদ্যাধর রায়চৌধুরির প্রপৌত্র। অর্থাৎ কিনা নাতির ছেলে।

সর্বাণী, জমিটি তো জাঙলা হয়ে পড়েই আছে। ওখানে তো ওই বংশের আর কেউ বসে সাধনা করলে না।

প্রসাদ, কিন্তু আমি তো আর ঝপ করে ওখানে বসে পড়তে পারি না। আমার বসবার কোন হক নেই যে।

সর্বাণী, বেশ তো। যাতে হক হয় তার ব্যবস্থা করতে খেতি কি?

প্রসাদ, তা হলে কী বলছ, হাত পেতে ওঁয়াদের কাছে জমিটুকুন চেয়ে নেবো!

সর্বাণী, পঞ্চমুণ্ডিখানা তো এমনি এমনিই পড়ে আছে। ওটির মালিক এখন সেই রামকৃষ্ণ সাধকের ছেলের বউ সুভদ্রাদেবী। ভারী ভাল মানুষ।

প্রসাদ, তুমি কী করে চিনলে?

সর্বাণী, ফি বচ্ছর দুগ্গোৎসবে নেমতন্ন করেন যে। নবমীর দিন ও বাড়ি পেসাদ পাই।

প্রসাদ কিঞ্চিৎ চিন্তিত স্বরে বলেন, আর যাই হোক—তুমি যেন ভুলেও ও-জমিটুকু হাত পেতে চেয়ে নিও না। হোক না সাধনপীঠ। কিন্তু অপরের জমি তো।

সর্বাণী মুখ নীচু করে মাটি দেখে। তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলে, আমার চাইতে হবে নাকো।

প্রসাদ, তার মানে!

সর্বাণী, আমার মন বলছে জমিটি উনি তোমার হাতে নিজেই তুলে দেবেন।

প্রসাদ, মন বলছে!

সর্বাণী আর কোনও কথা না বলে ঘরের পানে ফিরে চলে। আর তখনই ঝড় জলের প্রকোপ কমে আসে। হাওয়ার শনশানির মুখে হাত পড়ে। বিদ্যুৎ ঝিলিকও থেমে থেমে সময় নিয়ে ঘটে। গোটা বনভূমে ডাগর ব্যাঙের পাল গলা ছেড়ে ডাক তোলে প্রকৃতি দুলিয়ে। দূরে কোথায় শিবাদল হাঁকে। রোল তোলে ঝিঁঝির দল মহা আনন্দে। সংসার বুঝি জুড়িয়েছে। সারাদিনের তাপঝাল এখন ক্ষান্ত।

রামপ্রসাদ চোখ তুলে তাকান নিঝুম ঝিঁ ঝিঁ উচ্চকিত পঞ্চমুণ্ডি আসনের দিকে। কতদিন আগে প্রতিষ্ঠিত ওই পীঠ এখন অব্যবহৃত পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে একধারে। ঝুরিগুলি টলমল দুলছে নিকষ অন্ধকারে। সেই দোলন বলে দিচ্ছে অতি গুহ্য আর জটিল তন্ত্রাচার তত্ত্ব। তার অনেকগুলিই দুরূহ আর অনতিক্রম্য।

ইড়া পিঙ্গলাস্থিত প্রাণসমূহকে সুষুম্নায় প্রবেশ করাতে হবে। সুষুম্না হল শক্তি। প্রাণরূপ জীব হল শিব। এ দুটিতে মিলে এবার সঙ্গমে রত হবে। এর নাম সিধে কথায় মৈথুন। বীর্যপাতের সময় যে-সুখ হয় তার চেয়ে কোটিগুণ সুখ হয় এই রমণে। সাধারণ মৈথুনে তেজের ক্ষয় হয়। দেহ অবসিত হয়। তাকে বলা যায় গর্দভেরই মতো রমণ।

ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং নিত্যাং কামানন্দশিখোপমাম্।

কামজনিত যে আনন্দ হয় তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আনন্দতুল্য হল কুণ্ডলিনীর ধ্যান।

এ কথা মনে হতে প্রসাদ মনে মনে চমকে ওঠেন। এইসব তত্ত্বকথার সঙ্গে তাঁর জীবনধারা যে মেলে না। তাঁর ঘর, সংসার, অন্নসংস্থান মিলিয়ে মিশিয়েই তো কবিতার সঙ্গে দিনাতিপাত। এমনকী একটু আগেও স্ত্রী সর্বাণীর সঙ্গে ঝঞ্ঝা-বৃষ্টিতাড়িত উদোম আকাশতলে, গাছপালা আর কিছু তথাকথিত প্রাণীদের সাক্ষ্য করে যে রতিলীলা ঘটে গেল তার নাম বুঝি রস-আনন্দ। এই আনন্দ একেবারেই জাগতিক। এই আনন্দ উপভোগের পরে কোথায় অবসাদ! কোথায়ই বা তেজের ক্ষয়। এ তো নতুন করে উজ্জীবিত হওয়া। প্রসাদের মনে হল এই আনন্দকে কবিতায় দূরের কথা, মুখেও প্রকাশ করা যায় না।

রামপ্রসাদের মধ্যে এক আশ্চর্য উতরোল জেগে ওঠে। যদি এ কথা সত্য হয় যে মৈথুনেনন বিনা মুক্তির্নেতি—মৈথুন বিনা মুক্তি লাভ ঘটে না, তা হলে তার জন্যে এত আয়োজন বা ছক কেন।

যোনিং বিনা মহেশানি সর্বপূজা বৃথা ভবেৎ—যোনি পূজা ভিন্ন অন্য সমস্ত পূজাই নিষ্ফল—এই যদি সার সত্য হয় তা হলে তন্ত্রাচারীর সংসার থেকে কী কাজ!

রামপ্রসাদ বুনো ভিটের আওতা ছেড়ে পথে যান। বৃষ্টি থেমে গেলেও মাথার আকাশে বিদ্যুৎ এখনও রেহাই দেয়নি। সেই আকাশতল বরাবর তিনি ভারী বিচলিত গতিকে পথ হাঁটেন।

বাঁয়ে বুড়ো শিবের মন্দির। পথের দু'ধারে গাছপালা, ঝোপেঝাড়ে ভিজে স্বভাবের আঁকড়ে-বাঁকড়ে জোনাই জ্বলছে। ব্যাঙ ডাকছে। প্রসাদ একা এসে উপনীত হন নিবিড় বিস্তৃত গঙ্গার ধারে। এই বর্ষার অন্ধকারে গঙ্গার কলকল মৃদু কোলাহলের বুকে ঢেউ ভাঙছে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে স্রোত উচ্চারিত হচ্ছে। সেই স্রোতের বুকে অগণ্য চক্ষু জ্বলছে কালো আকাশের দিকে, কটাক্ষপাত করে। প্রসাদ সেই কটাক্ষের মাঝখানে নিজের তীব্র আর এখন কিঞ্চিৎ নাচার চক্ষুজোড়া পেতে দেন।

প্রসাদ এই নিরালম্ব জনপ্রাণীহীন রাত্রির গঙ্গায় চক্ষু হেনে হেঁকে ওঠেন. শোন্ মা গঙ্গা, ভাল করে তা হলে শুনে নে। মনে করিসনে এ মাতালের প্রলাপ।

গঙ্গা জননী কিংবা কন্যে মুখ টিপে হাসে। ছিমিছিমি স্রোতের ভিতর থেকে রিনরিনে সুরেলা স্বরে বলে, বল্ বাপ! কী বলবি বল্ না।

প্রসাদ টলোমেলো স্বরে বলেন, তুই আমায় যেমন রাজ্যের খপরপত্তর দিস, আমারও তো তোকে কিছু দেওয়ার থাকতে পারে। পারে কি না।

গঙ্গা কন্যে এবার কলকলিয়ে হেসে ওঠে, বাপ রে বাপ, ছেলের মান যে খুব ভারী। বল্ ছেলে বল্।

রামপ্রসাদ আকাশে দু'হাত ভাসিয়ে দেন।

জানিলাম বিষম বড়,
শ্যামা মায়েরই দরবার রে।
সদা ফুকারে ফরিয়াদী বাদী না হয় সঞ্চার রে॥
আরজ বেণী যার শিরে,
সে দরবারের ভাস্য কি রে,
দেওয়ান যে দেওয়ানা নিজে,
আস্থা কি কথার রে॥
লাখ উকীল করেছি খাড়া,
সাধ্য কী মা ইহার বাড়া,
তোমায় তারা ডাকে, আমি ডাকি,
কান নাই বুঝি মা'র রে॥
গালাগালি দিয়ে বলি,
কান খেয়ে হয়েছে কালী,
রামপ্রসাদ বলে প্রাণ কালী
করিল আমার রে॥

পরদিন সকাল থেকে বাড়ির আত্মীয়কুটুম পাততাড়ি গোটাতে আরম্ভ করে। আমাদের সদরে একে একে রিকশা এসে লাগে। মানুষ তুলে নিয়ে যায়। আবার ফিরে আসে। এইরকম খেপে খেপে বাড়ি ফাঁকা হতে থাকে। কেবল রয়ে যান ক'জন। আমার দিদিমা আর কতিপয় বৃদ্ধা।

বেহালার দাদুর রিকশায় বেশ কিছু পুঁটলি আর গাঁঠরি ওঠে। ওঠবার আগে আমার দু'গালে দু'টি সশব্দে চুমো খান। তারপর তাঁর সেই গমগমে গলা ভাসিয়ে বলে ওঠেন, দু'বেলা মন দিয়ে সন্ধ্যা-আহ্নিকটা করো ভাই। এতে তোমার শরীর, মন দুই ভাল থাকবে। মনে থাকবে তো?

আমি মাথা কাত করি। দাদু এবার ফতুয়ার পকেট থেকে একটি গহনার ডিবে বার করেন। ঢাকনা খুলে একটি সোনার আংটি বার করে আমার ডান হাত টেনে নিয়ে পরিয়ে দেন।

—এটা তোমার দিদি পাঠিয়েছে। আমি আশীর্বাদ ছাড়া আর কিছু দিলুম না কিন্তু।

রিকশা উড়ে যায়। পেছন থেকে মাথার ওপর ধবধবে কুচি কুচি চুলের পেছন বাগে ধারালো শিখার ন্যাজ জেগে থাকে। আমি নিজের মাথার পেছনে হাত দিই। নেড়া মাথার পেছনে পুঁচকে টিকিটা লিকলিক করছে।

আমি—হাফ প্যান্ট, নেড়া মাথা, শার্ট, খালি পা এবার বাড়ি থেকে সটান বেরিয়ে উধাও। যেন কতকাল বন্দিদশা পার করে এবার হাঁপ ছাড়লাম। যাব কোথায়? কোথাও তো বটে। তা সেই বটে আমায় একলা একলা টেনে নিয়ে গেল বাড়ির পেছনে মস্ত পুকুরের পাড়ে। সার সার খেজুর গাছে কাঁচা-পাকা ফলের থোলো ঝুলছে। গাছের নীচে চোত মাসের রোদের উচ্ছিষ্ট ছায়া। বৈঁচির ঝোপ। ভয়ঙ্কর কাঁটা শানানো বুনো ফল গাছ। পাকা পাকা দেখে ফল ছিঁড়ি আর মুখে দিই। টক টক, মিষ্টি মিষ্টি। কী চমৎকার স্বাদ।

পুকুরের ওপারে ক্ষিতীশ দাদু জলচৌকি পেড়ে হুইল খাটিয়ে মাছ ধরতে বসেছেন। পাশে বাগদি পাড়ার ভেনো। সে চার, চা এসব জোগান দিচ্ছে। আমি পুকুর পাড় বেয়ে ঘুরতে ঘুরতে ওধারে এলাম। মাঝখান বরাবর একটা উঁচু বাঁধ দিয়ে আর একখানা ছোট পুকুর আলাদা করা। ওটা ক্ষিতীশ দাদুদের। সেই বাঁধ ধরে লাফাতে লাফাতে এগোই। সামনে দাদুদের মস্ত বাগান। আম, জাম, বাতাবি লেবু, খেজুর, চালতা, নারকোল—কী নেই। তাদের মাঝখানে ঢ্যাঙা একজোড়া তাল গাছ দু'টি বোন হয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। তাদের টঙে ফিরফিরে বাতাস হচ্ছে।

পেছনে গিয়ে দাঁড়াতেই ক্ষিতীশ দাদু মস্ত চোখজোড়া পাকিয়ে আমার দিকে ফিরে তাকান। কী চমৎকার—সিনেমার ছবি বিশ্বাস ধাঁচের চেহারা, ফর্সা রং, কাঁধের কাছে কী বাহারি খাঁজ। আমার দিকে কটাক্ষ করে বলে ওঠেন, এখানে কী মনে করে।

আমি বলি, এমনি।

—হুঁ এমনি। পৈতের জন্যে গরুটা বাঁধা ছিল। এবার খালাস পেয়েছে।

আমি প্রশ্ন করি, মাছ খাচ্ছে দাদু?

এবার ধমক, উঁ উঁ উঁঃ। কথা বলবি না। মাছ পালাবে।

আবার প্রশ্ন, জলের তলায় মাছ কি শুনতে পায়?

আবারও কড়কানি, তুই চুপ করবি!

লম্বা বহর করে সুতো ফেলা বেশ খানিক দূরে। একজোড়া হুইলের দু'টি ফাতনা পাশাপাশি সোদর ভাইসম জলের বুকে জেগে আছে। সাদা দেহে লাল-সবুজ রঙা সুতোর গয়না। দাদুর পাশে একটা থলিতে নানা চার রাখা। কী চমৎকার ভাজা ভাজা গন্ধ বেরচ্ছে ওখান থেকে। আমারও একটু খেতে ইচ্ছে করছে।

পাশে বসা ভেনোর পাড়ায় অপর নাম ঠোঁটকাটা। আসলে ওপর ঠোঁটের একস্থান থেকে কে যেন খাবলে তুলে নিয়েছে। তার ফাঁক দিয়ে দন্ত দেখা যয়। একে নাকি গন্না কাটা বলে।

ভেনো বলে, কী দাদু, একটুখানি খোল ভাজা দেবো?

দাদু গম্ভীর বলেন, দে।

ভেনো থলির ভেতরে হাত ভরে একমুঠো খোল ভাজা তুলে নেয়। তারপর ছিটিয়ে দেয় ফাতনার আশেপাশে।

একটু পরেই ফাতনায় টুকটুক। ভেনো বলে, চুপচুপ। এবার টক টকাটক, টক টকাটক। তারপর সাঁ করে ডুব। অমনি দাদু দু'হাতে ছিপ তুলে হ্যাচাং টান। ছিপের হুইলে কিরকির, কিরকির শব্দ। সোঁওও করে সুতো বয়ে যায় দূরে। ওপারের মেটে রাস্তায় একজন লোক সাইকেল থেকে নেমে তটস্থ চেয়ে থাকে এই দিকে। ভেনো উত্তেজিত উঠে দাঁড়িয়ে—কতক দম বন্ধ অবস্থায়। দাদুর হাতে ধরা ছিপের ডগা বেঁকে গিয়ে জলমুখো। দাদু চোখ পাকিয়ে একটু বেঁকে দাঁড়িয়ে বলে ওঠেন, ভেনো, কলটা মুখে ধর। মুখে—

ভেনো অমনি দাদুর পাশ থেকে হাঁপানির ফোঁকা কলটা তুলে নিয়ে তাঁর হাঁ মুখে গুঁজে দেয়। তলার পাম্পটা ফ্যাঁস ফ্যাঁস কপচায় ভেনো। দাদু খপাত খপাত টেনে নেন ওই রবারের বলের ভেতরে পোরা দম। তারপর হুইলের চাকা ঘুরিয়ে সুতো গোটাতে থাকেন।

জলের মধ্যে হুলুস্থুল হতে থাকে। হঠাৎ একটি শূন্যে লাফ। মস্ত এক রুই লাফ দিয়েই আবার জলে সেঁধোয়। তার লেজের কাছে আর কানকোর পাশে লালচে ছোপ। কে যেন পটেশ্বরী দিদির আলতার তুলি ওখানে ছুঁইয়ে দিয়েছে।

মাছটা খেলিয়ে খেলিয়ে যখন ঘাটের আওতায় আসে তখন সে রীতিমতোন এলিয়ে গিয়েছে। ঘাটের আওতায় জল কলমির ঝোপে তার লালচে লেজখানা কী চমৎকার মুচড়ে মুচড়ে উঠছে। লেজ দিয়ে জলে ছবি আঁকছে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। চওড়া কানকোয় রোদ পড়ে ঝিকমিক করছে। অতি শান্ত আর সুশীল চোখজোড়া কীরকম আর্ত ভেসে আছে জলের গায়ে। সেই চোখ এইমাত্র ফোঁকা কল টানা ক্ষিতীশ দাদুর দু চোখের কাছাকাছি।

ভেনো বলে ওঠে, দাদু, মাছটার পেট ভর্তি ডিম আছে। বেশ বড়া হবে।

আমি ভাবি, তার মানে আরও কত মাছের প্রাণ ওর পেটে।

একষট্টি

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' বইখানা রামপ্রসাদ লাইব্রেরি থেকে প্রায় জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে এলাম ওখানকার হর্তা-কর্তা-বিধাতা নিমাইদার কাছ থেকে, আমার বাবার কার্ডে। বাবা বইপত্রে নেই। আমার মায়ের নিজের নামে ছাড়াও বাবার কার্ডটা আছে। ফলে দু-দু'খানা বই সর্বদাই মার দখলে। এত বড় সংসার সামলে মা যে কী করে এত বই পড়ে। আমাদের পাড়ার হলা কাকা অর্থাৎ হলধর দত্ত, আমার দু'ভাইবোনকে নিত্য পড়াতে আসেন। যেহেতু তিনিও গভীর বইপড়ুয়া, তাই মার বই বদলানোও ঘটে যায়।

মুশকিলটা অন্যত্র। দু'খানা বই, সে রোগা কিংবা মোটা, তিন থেকে চারদিনেই মা'র পড়া শেষ। আজ পড়ছে 'ঘরের ছেলে বাহিরে', বোধহয় ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়-এর বই তো কাল পড়া হচ্ছে সতীনাথ ভাদুড়ির 'জাগরি'। পরদিন হেমিংওয়ের, 'ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ সি।' দিবারাত্রি এই হাড় কালি করা খাটনির ফাঁকে মার দু'টি নেশা, বই পড়া আর নীচু সুরে রেডিও শোনা। বাংলা, হিন্দি সব গান। রাতে রেডিও সিলোন শোনা চাই।

বইখানা পড়ে আমার ভেতরটা যে কীরকম করতে লাগল। আমি একরকম ঘোরের মধ্যে পতিত হলাম। রাতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও সাপের শিস কানে আসে। আমাদের এই মস্ত ছায়া ছায়া বাড়ি ঘিরে থাকা ঝুপসি হরেক গাছ বেয়ে, উঁচু উঁচু নারকোল আর তালগাছদের ঝামর পাতা ছুঁয়ে, হেথা হোথা ডোবা-পুকুরের জলে, এমনকী আমার বাবা-মা'র নিত্যি ঝগড়া ডামাডোলের গায়ে গায়ে কত যে সাপ শিস দিয়ে চলেছে ঘন গভীর রাতেরবেলা। সাপেরা কেমন যেন পাকে পাকে জড়িয়ে ধবছে আমার চারপাশ। কিন্তু কেউ আমায় স্পর্শ করছে না। এ এক অদ্ভুত খেলা। এমনকী নারায়ণ কাকার প্লানচেট-এ আত্মা নামানোর চেয়েও রহস্যময়।

এই অবস্থাটা কাউকে বলতে পারি না। বলতে পারি না একখানা বই পড়ে এমন ঘোরালো অবস্থা কী করে ঘটে। এমন সময় কার কাছে যেন শুনলাম আমাদের স্কুলের বাংলার গৌরীবাবু স্যারের সঙ্গে লেখকের যোগাযোগ আছে। স্যারকে গিয়ে বলতেই তিনি ওঁর খাতা খুলে কলকাতা টালা পার্কের ঠিকানা দিয়ে দিলেন। বাড়ি এসে কী সব ইনিয়েবিনিয়ে লিখলাম। মনে হল, চিঠির শেষে একটা গুরুতর প্রশ্ন করা উচিত। অতএব প্রশ্ন হল, মানুষ দুঃখের মধ্যে কীভাবে আনন্দ পেতে পারে।

কিন্তু আমার নিজের তো সেরকম কোনও দুঃখ নেই। তা হলে কি বাবা-মা'র খণ্ডযুদ্ধই ঘুরপথে আমাকে দিয়ে এ কথা লিখিয়ে নিল!

চিঠিটা লিখে দাদুকে দেখালাম। উনি মন দিয়ে পড়লেন। তারপর পাকা ভ্রূ জোড়া ঠেলে তুলে বললেন, হুঁ, ভারী কঠিন আর জটিল প্রশ্ন। সুখের চেয়ে দুঃখের কথার ওজন ঢের ভারী।

চিঠিখানা ডাক বাক্সে দিলাম নিজহস্তে। কেবল খামের ওপরে তাঁর ঠিকানাটা কেন জানি দাদুকে দিয়ে লিখিয়ে নিলাম।

তারপর বেশ ক'টি দিন কেটে গেল। আমাদের বাড়ি যেমন ছিল তেমনই রইল। সাধু থেকে ধরে নিত্যি লোকসমাগম। সেইসব লোকের মধ্যে একদিন এসে পড়লেন

লখনউ-এর দাদু—বিনয় মুখোপাধ্যায়। চেহারায় বাঙালির ব নেই। মাথাবোঝাই ধবধবে সাদা চুল, উল্টে আঁচড়ানো। খদ্দরে পাজামা-পাঞ্জাবি। চোখে সোনালি রঙা মিহি চশমা। কিন্তু কথার আড়ে হিন্দির হ নেই। বহুকাল লখনউ-এর বাসিন্দা।

এই দাদুর আরেক পরিচয় রাজনীতিবিদ। একটু বামঘেষাঁ বা না-কংগ্রেসি কোনও পার্টির নেতা। শুধু নেতা নয়, এম পি! আমি এম পি কী জিনিস জানি না। কিন্তু যখন শুনতে পেলাম উনি গোটা পৃথিবী চষে বেড়ান তখন একেবারে বোকা বোকা আর সিধে প্রশ্ন করে বসি, তা হলে কোন দেশটা আপনার সবচেয়ে ভাল লেগেছে? অমনি স্পষ্ট উত্তর, সুইৎজারল্যান্ড। আমি অবাকের চেয়ে অবাক। কেন না বইয়ে পড়েছি সেই দেশটা নাকি সত্যিকারের ভূস্বর্গ।

বিনয় দাদুর সঙ্গে আমার মাতামহ দাদু এসেছেন। এধারে আমার গাপ্পিক দাদু। বেশ আসর জমে গেল। তার মধ্যে উপসর্গের মতো আমি স্বভাবসিদ্ধ হাঁ করে বুড়োদের গল্প গিলছি। আলোচনা হচ্ছে, গান্ধি, নেহরু, মার্কস, লেনিন। প্রায় সবই রাজনীতির কথা। বিনয় দাদু বললেন, ক'দিন আগে ইংরেজি কী এক খবরের কাগজে নেহরুর সঙ্গে একটি দিন কাটানো অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখেছেন নামকরা এক ব্যক্তি। তিনি লিখছেন, সকালে প্রাতরাশের টেবিলে নেহরুর প্রিয় খাদ্য আস্ত মুরগির রোস্ট দেওয়া হয়েছে। বাবুর্চি হেঁসেল থেকে একটি একটি করে হাতেগরম রুটি এনে দেবে, এটাই নিয়ম। একটা রুটি যদি কম গরম থাকে, তা হলে নেহরু প্লেটসমেত চাকরটির মুখে ছুঁড়ে মারবেন।

একবার বিদেশে কী এক সভায় আমন্ত্রিত ভারতের প্রধানমন্ত্রী। গেটে প্রহরী সামান্য আটকেছে। সঙ্গে সঙ্গে বেদম রেগে জবাব, নেহরু, নেহরু।

অর্থাৎ আমি নেহরু। এই নামেই আমায় পৃথিবী চেনে।

আমার অমনি মনে পড়ে যায় নেহরু-দেখার কথা। তখন আমি খুবই ছোট। পর পর দু'দিন নেহরু দেখা হল। একদিন বোধহয় বিকেলের দিকে উনি একটা খোলা জিপ বা ওইরকম কোনও গাড়িতে করে আমাদের কাঁচরাপাড়া স্কুল বাড়ির সামনে সামান্য সময় দাঁড়ালেন। রাস্তার দু'ধারে দাদুর স্কুলের ছেলেরা মালা হাতে দাঁড়িয়ে। দাদুর স্কুল কর্মচারী গণেশ কাকা আমায় কোলে করে ওঁর দিকে তুলে ধরল। আমি গাঁদা ফুলের হলুদ মালাটা ওঁকে পরিয়ে দিলাম। ঝাপসা মনে পড়ে, উনি দু'হাত জোড় করে কী সুন্দর সাজানো হাসিতে মুখ আলো করে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি ঠিক যেন একটি বড়সড় পুতুল বা মূর্তিকে মাল্যদান করছি।

পরে দাদুর কাছে শুনেছি ঘটনাটা কল্যাণী কংগ্রেসের সময়। তখন কাঁচরাপাড়ায় একটা এয়ারপোর্ট তৈরি হয়েছিল। একদিন সকালে আমি ছাদে ঝুঁকে রাস্তা দেখছি। হঠাৎ নীচে হইচই। দেখি সেই এয়ারপোর্টের দিক থেকে একটা খোলা গাড়ি সাঁ সাঁ করে আসছে। তাতে ধুতি-চাদর-সানগ্লাস পরে ঢ্যাঙা বিধান রায় একধারে বসে আছেন। আর পণ্ডিত নেহরু উল্টোদিকে সটান দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছেন জনগণকে।

দাদু বলেন, ভদ্দরলোক ইংরেজিটা লিখতে জানেন বটে। 'ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া'। পলিটিকস্ না করে লিটারেচার নিয়ে থাকলে দেশের কাজ হত।

এম পি দাদু মন্তব্য মন্তব্য করেন, হুঁ, প্ল্যানিং মডেলগুলো পি সি মহলানবিশ'কে দিয়ে করালেন। পরে বললেন, একজন ইকনমিস্ট'কে দিয়ে করানো উচিত ছিল। এটা আমার

ভুল। কিন্তু যা হয়ে গিয়েছে তা নিয়ে বলে আর লাভ কী? দেশের যা ক্ষতি হওয়ার তা তো হয়ে গিয়েছে।

দাদু বলেন, খুব ইমোশনাল।

একদিন দুপুরে দাদু বাইরের ঘর থেকে আমায় ডাকলেন, তোমার একখানা চিঠি এসেছে।

আমি দৌড়ে গেলাম। আমার হাতে একটা পোস্টাপিসের হাল্কা সবজে খাম তুলে দিয়ে দাদু মিটিমিটি হাসলেন।

খামটা খুলে দেখি বেশ বড়সড় একখানা প্যাডের কাগজে এপিঠ ওপিঠ জোড়া চিঠি। নীল কালিতে লেখা। ওপরে ডান দিকে—টালা পার্ক, কলিকাতা, ফোন-৫৬-৩০৭৬। আর বাঁয়ে ওঁর হাতের লেখার কায়দায় ছাপা 'তারাশঙ্কর'।

চিঠি শুরু হচ্ছে, 'কল্যাণীয়েষু... তোমার পত্র পেয়েছি। পত্রখানি পড়ে মনে একটু কষ্ট পেয়েছি।'

আর পাঁচটি প্রকৃতির মতোই কুমারহট্ট হালিশহরের প্রকৃতিজোড়া এখন শীত ঋতুর রাজ্যপাট। বাংলা মতে পৌষ মাসের মাঝখান। ইংরেজি নিয়মে জানুয়ারির সবে গোড়া।

ইতিমধ্যে বাংলার ওপর দিয়ে কিছু ঘটনার আন্দোলন ঘটে গিয়েছে। মাত্র কতিপয় মাসজোড়া সে কাহিনি। এ সকলই কতক কতক রামপ্রসাদ অবহিত আছেন চলমান ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে চলতে চলতে। সে চলন অবশ্যই মা গঙ্গার সৌজন্যে, তাঁর স্রোতমুখে। এই অলীক ব্যাপার বাস্তবতা পায় যখন সেই জলপথে ভেসে যাওয়া মাঝি-মাল্লা আর বানিয়া দিগরের কথা ওঠে।

মাত্র এই কতিপয় মাসের সমাচার বলে—নবাব সিরাজের কলিকাতা দখলের কিয়ৎকাল পরে রবার্ট ক্লাইভ নামে এক ইংরেজ কর্নেল এসে উপনীত হয়েছেন এ দেশে। এই ব্যক্তি আদপে ছিলেন কোম্পানির নৈকষ্য কুলিন কেরানি। সম্প্রতি ফরাসি-ইংরেজ যুদ্ধে এই কেরানিপ্রবর মসি ছেড়ে অসি ধরেছিলেন। একটি নয়, একের অধিক যুদ্ধে ফরাসিদিগে গোহারান হারিয়ে এই নবীন ক্লাইভ বেশ নাম করে ফেলেছেন। সেইসব সমর শেষে তিনি নাকি দূর দক্ষিণের মাদ্রাজ শহরে এসে উপস্থিত। সেখানেই তাঁর কানে গেল ইংরেজরা কলিকাতা নগর হাতছাড়া করে বসে আছে। এই সদা, ১৭৫৬ সালের ১৬ অক্টোবর ক্লাইভ আর ওয়াটসন রণতরী সাজিয়ে কলিকাতা ফিরে পেতে পাড়ি দিলেন। মাদ্রাজ থেকে কলিকাতা, পথ ভারী কম নয়। পুরো দুটি মাস লেগে গেল। কিন্তু সিধে কলিকাতায় না এসে তাঁদের জাহাজ এসে থামল ফলতায়। সেই ফলতা, যেখানে অনাহারী, রোগজীর্ণ ইংরেজ সাহেবগণ পড়ে আছেন। সেই ব্যথিত সাহেবরা তরতাজা ক্লাইভকে দেখে যেন ধড়ে প্রাণ পেল। সাহেব ঝটিতি সব পরিস্থিতি জানবুঝ করে নিয়ে কলিকাতার গভর্নর খোদ রাজা মানিকচাঁদকে পত্রাঘাত করে বসলেন। মানিকচাঁদকে ক্লাইভ খুলে লিখলেন, কী কারণে তিনি এই ফলতায় আগমন করেছেন। সে চিঠির বয়ান ছিল কিঞ্চিৎ দুর্বিনীত। রাজা মানিক তো পত্র পড়ে চক্ষু চড়কে। তিনি সেই পত্রখানি অনেক মেজে-ঘষে সাহেবের কাছে ফেরত যাত্রা করিয়ে বলে পাঠালেন, এ চিঠি নবাবের কাছে পাঠানোয় কিছু আদব-বহির্ভূত কথা আছে।

ক্লাইভ তোয়াক্কা না করে বললেন, তিনি এখানে নবাবের পদবন্দনা করতে আসেননি। অতএব তাঁর পত্র শীতলতার বদলে উষ্ণতাকেই বেছে নিয়েছে। তাই এবার মানিকচাঁদ বরাবর না হয়ে পত্র গেল নবাবের কাছে। সঙ্গে গেল একই ধারায় লেখা সেনানাবিক ওয়াটসনেরও এক পত্র। গতিক দেখে রাজা মানিক নিজের দুর্গটি সারাই করে রাখলেন। আর হাজার দুই সৈন্য নিয়ে রওনা হলেন বজবজ মুখে। এই বজবজই হল কলিকাতা প্রবেশের একমাত্র পথ।

এ ধারে, পচা স্থান ফলতায় থেকে ক্লাইভেরও জ্বরজারি। ফলে এ জায়গা অবিলম্বে ত্যাজ্য।

কিন্তু এতসব ঘনঘটার মাঝখানে বলতে গেলে হঠাৎ করে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছ হতে জরুরি তলব এল। তলব বয়ে এনেছে রাজার খাস গোমস্তা, এই কুমারহট্টেরই সুখময় বন্দ্যো।

রামপ্রসাদ সেদিন সন্ধ্যায় গঙ্গার ধারে বিনি কারণে ঘুরছেন। সঙ্গে ভজহরি। এমন সময়ে একটি বজরা এসে ঘাটে ভিড়ল। তার ভিতর থেকে ঝটিতি নেমে এলেন সুখময়। প্রসাদকে দেখে তাঁর চোখে মুখে যেন সোয়াস্তির বাতাস।

—বাঃ, তোমার কথাই ভাবতে ভাবতে আসছিলাম। আর অমনিই দেখা পেয়ে গেলুম।

প্রসাদ চোখ পাতেন বন্দ্যোর চোখে।

বন্দ্যো বলেন, হুঁ, চারদিকে কেবল যুদ্ধু যুদ্ধু ভাব। তারই মধ্যে শ্রীল শ্রীযুত রাজাবাহাদুর তোমার কাছে একটি নিবেদন করে পাঠিয়েছেন।

এই বলে জেব থেকে সুখময় একখানি তুলোট কাগজে লেখা পত্র বার করে প্রসাদের দিকে বাড়িয়ে দেন।

—বাড়িতে যেয়ে পহিলে পত্রখানা পড়বে।

প্রসাদ অবাক বলেন, কী লেখা আছে ওতে?

বন্দ্যো হাসেন নদীর আলো-আঁধারের তলে। —মোদ্দা কথা হল—রাজার ভারি সাধ তুমি অনতিবিলম্বে একখানি বিদ্যেসুন্দর রচনা করে ফেলো।

প্রসাদ চমৎকৃত স্বরে বলেন, বিদ্যাসুন্দর।

হ্যাঁ হে, তাই। দেশের এই হালহকিকতে হয়তো রাজা একটু প্রাণে বাতাসে ধরাতে বাসনা করছেন।

—কীরকম বাতাস! এতো মনে হচ্ছে কু-বাতাসের প্রস্তাব।

—সে আমি কেমন করে বলি। রাজারাজড়ার মনে আমি সামান্য গোমস্তা হয়ে কী প্রকারে সেঁধবো বলো?

ভজহরি পাশ থেকে বলে, ও আপনি ভেবো না গোমস্তা ঠাকুর। আমার দাঠাকুরটি সাক্ষোৎ সরস্বতীর খাস তালুকি।

বন্দ্যো হাসেন, সে তো জানি রে পাগলা। রাজা মানুষ চিনতে ভুল করেন না।

প্রসাদ ভ্রূ কুঁচকে বলেন, আপনাদের রাজা তা হলে আমায় এই চিনলেন বাঁড়ুজ্যে মশাই। বিদ্যাসুন্দর মানে তো কামকলার একেবারে হদ্দমুদ্দ।

সুখময় এবার রহস্যময় চোখ কুঁচকে হাসেন, হুঁ, বোধহয় রাজার কানে গেছে মাত্র ক'মাস আগে তোমার গৃহিণী একটি কন্যে প্রসব করেছেন। মানে তুমি দিব্য রসে-বশেই আছ ভায়া।

ভজহরি দন্ত বার করে অন্ধকারে হাসে। ঘাবড়িও না দাঠাকুর। তুমি ইচ্ছে গেলে না পারো কী। একবার দৎ-কলম নিয়ে বসে পড়ো দিকি।

সুখময় হেসে হেসে কন, হক কথার এক কথা। কিন্তু একটি কথা মনে রেখো প্রসাদ, ভারতকবি যে ইতিমধ্যেই একখানি বিদ্যেসুন্দর রচনা করে বসে আছেন। সেটির রসে অতীব বাড়বাড়ন্ত। ফলে রাজা কী দুই কবির মধ্যে যুদ্ধ বাঁধাতে মনস্থ করেছেন।

প্রসাদের মন বলে, হ্যাঁ যুদ্ধই বটে। দেশকালের অবস্থার সঙ্গে দুই কবির কবিতা-সমর না হলে ষোলকলা পূর্ণ হয় না।

ভজহরি ফুট দেয়, হ্যাঁ দাদা, তোমার তো মনে আছে সে কথা।

প্রসাদ, কী কথা?

ভজহরি, ভারতকবি'র বিদ্যেসুন্দর রাজা কেষ্টচন্দর কাত করে রেখেছিলেন। তা থেকে নাকি রস গড়িয়ে পড়ছিল। তুমি পারবে, তো সেই লেখার সঙ্গে সমান জোয়াল টানতে। জবাবটি আমিই দিই। পারবে হাজারবার পারবে। তোমার ক্ষ্যামতা কম কিসে!

প্রসাদ আর কোনও মন্তব্য করেন না। নদী ধারের কালো বাতাসে তাঁর মাথার সাপ আঁকা চুলে গুঞ্জরণ ওঠে। সুচারু শোভন দাড়ি ও গুম্ফে কাঁপন জাগে।

প্রসাদ টের পান তাঁর শরীরের অন্দরে কী এক অজানিত ক্রোধসর্প মাথা তুলেছে। সরু ওষ্ঠ হতে রক্তজিহ্বা তীক্ষ্ম বিদ্যুতের শিখা হয়ে চিড়িক চিড়িক নিঃশব্দ হাঁকাড় দিচ্ছে। রাজার আদেশ আর একই লপ্তে এই সেদিন তাঁর 'মিতা' বলে সম্ভাষণ দু'টিই বুকে হাঁটু দিয়ে চেপে বসেছে। এখন কোনটিকে বুকে তুলি। বুক না শির?

প্রসাদ একটি নিঃশ্বাস রাখেন উতরোল গঙ্গার বুকে। তারপর বলে ওঠেন, চল্ রে ভজা। ঘরে যাই চল্।

রামপ্রসাদ চূড়ান্ত আনমনে পথ চলেন। পিছু পিছু রাজার গোমস্তা। খানিক চলে তিনি বিদায় নেন। কেন না তাঁকে যেতে হবে নিজ বাড়ির দিকে।

ভজহরি কথা বলে, কী দাঠাকুর, একেবারে ভোম মেরে গেলে যে।

প্রসাদ গম্ভীরে কন, তুই বুঝতে পারছিস না আমার এখন কী রাজ দায়। ইদিকে সংসারের চাপ বলছে, বড় কন্যে পরমেশ্বরীর পাত্র দেখো। মেয়ের বিয়ের বয়স পেরিয়ে গেলে যে পাতকি হব।

ভজহরি গলা তুলে বলে, ও কাজ তোমার নয়। থালে আমরা আচি কি কম্মে। তুমি শুধু নেকাপড়া করবে আর গান গাইবে। কিন্তু একটি কতা যে না বলে পাচ্চিনি।

—কী কথা।

—বললে তুমি গোঁসা হবে না তো।

—নিশ্চয়ই মন্দ কথা নয়।

—খারাপ কী ভাল তা আমি কী করে জানব?

—ঢং না করে বলে ফেল দিকি।

ভজহরি এবার কিঞ্চিৎ সরে আসে প্রসাদের কাছে। তারপর গলা ভারী করে বলে ওঠে, বলছিলাম তোমার বিদ্যেসুন্দরের কথা। যেটা তুমি লিখবে এখন।

—বিদ্যাসুন্দর নিয়ে তুই আবার কি বলবি শুনি!

—ছোটো মুখে একটা বড়ো কথা।

—শুনি।

ভজহরি ঢোক গিলে বলে, ওই যে এক্ষুনি পরমেশ্বরীর বে-র কতা কল্লে। তাই বলছিলাম যদি ওইরকম একটি ব্যাপার দিয়ে তুমি শুরু করো।

প্রসাদ চমকে ওঠেন। দাঁড়িয়ে পড়েন পথের মাঝখানে। চৌদিকে ঝোপঝাড় হতে ঝিঁ ঝিঁ ডাকে। শৃগালরা উলুকশুলুক দেয়। মাথার উপর জোনাকি আর মশার দল ঘূর্ণি দেয়। রামপ্রসাদ বলে ওঠেন, তুই আমার চেয়ে বয়সে কনিষ্ঠ না হলে তোর চরণধুলো নিতাম।

ভহজরি লম্ফ দেয়, ছি দাদা ছি! শেষে কি পাতকি হব আমি?

প্রসাদ, ওরে মুখ্যু, তুই জানিসনে কী কথা বললি আমায়।

—কী বল্লাম দাঠাকুর?

—আমায় গোড়ার সুতোটা ধরিয়ে দিলি।

ভজহরি মিচকি হেসে কয়, একেই বলে সঙ্গদোষ দাঠাকুর। দিনরাত তোমার সঙ্গ করে করে আমার চরিত্তিরটি বয়ে গেছে।

রামপ্রসাদ আপন মনে বলে যান, প্রথমে নিয়ম মোতাবেক গণেশ, সরস্বতী, লক্ষ্মী আর কালীকে বন্দনা। আর তারপরেই মূল কাব্য আরম্ভ। পহেলা বিষয়টি হবে বিদ্যার পাত্রান্বেষণে মাধব ভাটের কাঞ্চিপুর গমন।

ভজহরি বলে, বেশ হবে। দিব্যি হবে।

প্রসাদ আপন মনে কবিতা খোঁজেন। অন্ধকারে হাঁতড়ে বেড়ান আলোকময় কবিতার শরীর। আপনার মনে বিড়বিড় করেন এক-আধটুকরো প্রক্ষিপ্ত চরণ।

বাবুজি কুর্নিস মেরা বর্দ্ধয়াঁন বিচ ডেরা
নাম তো হামারা মাধোঁ ভাট।
আরজ্ করোগে পিছে ঘড়ী এক বৈঠে নীচে
আর তো লাগায় তোম হাট॥
আয়া হোঁ যো চড়ে ঘোড়া তস্‌দিয়া পায়া হোঁ বড়া
ওলোকেন ভুল গেয়া সব।
খেলাফ না কহোঁ বাবু তোম্‌নে মুঝে কিয়া কাবু
মেই রোই তুঝে দেখা যব॥
চিন্‌লিয়ে দেওকে এয়্‌সে আপকে সুরত যেয়াসে
দুনিয়ামে পয়দা কিয়া সোহি।
দেখাহাঁ মুলুক কেত্তা ছত্রিয়েমে রাজা যেত্তা
তেরা মোকাবিলা নাহি কোহি॥

বাষট্টি

॥ অথ গনেশ বন্দনা ॥
পরম পুরুষ প্রহুঁ পুনঃ পুনঃ প্রণমহুঁ
পর্বতেশ-পুত্রী- প্রিয় সুত।
বিভু বেদবিদাম্বর বিনায়ক বিঘ্নহর
বারণ বদন গুণযুত ॥

'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের মুখপাত আরম্ভ হয় এভাবে গণপতি বন্দনার হাত ধরে সকালি দাওয়ায়। সবে আচমন। মূল কাণ্ডে প্রবেশ করতে এখনও বিলম্ব আছে। আসলে এই আদিরস সম্পৃক্ত মূল সংস্কৃত আখ্যানটি রামপ্রসাদ পাঠ করেছেন বহুদিন আগেই। কিন্তু যেহেতু তাঁর পথাচরণ একেবারেই ভিন্ন, কালিকাপ্রতিমার আধার অবলম্বন করে তাঁর যাবতীয় কবিতা অভ্যাস ও সৃজন, তাই সাহিত্যের ওই ভিনপাড়ায় তাঁর যাওয়ার কখনও দরকার পড়েনি। এমনকী, একটি রুচিগত প্রশ্নও যেহেতু এখানে আছে, তাই রামপ্রসাদ একপ্রকার অপরাগতার শিকার। তথাপি রাজ উপরোধ। এবং এও কবিতার এক অজানিত পথে অভিযান। অতএব কবির কাছে এ এক ছোটখাটো সমরও বটে।

আর কী আশ্চর্য, দেশকালের ললাটে ঠিক এই মুহূর্তেই মহাবিস্ফোরণের গর্জন গুমরোচ্ছে। ইংরাজ আর বাংলার নবাবে মুখোমুখি সংঘর্ষের প্রস্তুতিনাট্য চলছে মহা তোড়জোড়ে। দেশ এখন সত্যকার এক পরীক্ষার দুয়ারে অপেক্ষা করছে। কখন কী হয়, কী অর্জন হয়, তা কেউ বলতে পারে না এ সময়ে। এ খপর বয়ে আসছে দিল্লির মসনদের অব্যবস্থিত দোলাচল খেলাসমান যমুনার স্রোতোপুঞ্জে। অবশেষে ত্রিবেণী সংগমে, ত্রিবারির জলখেলা মিশ্রণে, দেশের ললাটে 'ত্রি' কথাটির বল্লম গিয়ে বিঁধেছে।

আহা, তৃতীয়য়ের কী মহিমা! ত্রিকাল, ত্রিনয়ন, ত্রিবেণী, ত্রিযামা, বিল্বপত্রের ত্রিদল, ত্রিপুণ্ডক, তৃতীয় প্রহর, ত্রিবিধি, ত্রিসন্ধ্যা, ত্রিদণ্ড, ত্রিগুণ, তিনপণ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, তিনপুরুষ, ত্রিকচ্ছ, ত্রিকড়ি, ত্রিকন্ট, ত্রিকণ্ঠ, ত্রিকর্ম, ত্রিকাটা, ত্রিশৃঙ্গ, ত্রিকোণ, ত্রিভুজ, ত্রিগণ, ত্রিগম্ভীর ত্রিগর্ত, ত্রিজগৎ, ত্রিতাল, ত্রিবীজা, ত্রিবৃৎ, ত্রিবেদ, ত্রিভঙ্গ, ত্রিভাগ, ত্রিমণ্ডলী, ত্রিমদ, ত্রিমধু, ত্রিলিঙ্গ. ত্রিলোক, ত্রিপথগা এই জননী গঙ্গা, ত্রিসাবিত্রী, ত্রিশূল...

ত্রি-এর এতশত মহিমা সরিয়ে রেখে এখন রামপ্রসাদের বুকে ওই ত্রিশূলখানিই গিঁথে আছে। এটি শূলবৎ আর তিন অগ্রভাগ হল সূক্ষ্ম। আদপে এটি শিবাস্ত্র হলেও অসুরদলনে দেবীর হাতে বিরাজিত।

রামপ্রসাদ জানেন এ মানবজীবন বহু স্থূল ও তরল পরীক্ষাসংকুল। ঠিক যেমনটি এখন এই দেশ। দিল্লির মসনদে করাল গ্রাস ঘিরে এসেছে সেই কোনকালে মহামতি আকবর গত হওয়ার পর থেকে। সেই ছায়ার অবশেষ এ বঙ্গভূমেও জারি হয়ে বসে আছে। গর্জন ঘনাচ্ছে ফরাসি, ইংরাজ ও নবাবি আওতায়। কখন যে কী হয়, তা কেউ জানে না। কিন্তু দেশের এই পরীক্ষা সাজানো হাল-হকিকতের মাঝখানে কবির জন্য এই বিদ্যাসুন্দরের নিদানও অতি চমৎকারী। যেমন আশ্চর্য এই সেদিন দ্বিতীয় কন্যারত্ন ভূমি দেখার পরেও প্রসাদের বিচিত্র কামযাপন। আর সেই কামক্রীড়ার প্রায় পরে পরেই রাজার এই উপরোধ।

প্রসাদের মনে সংশয় ঘনায়। এই নিভৃত নির্জন বনভূমিতে সে ক্রীড়ার সাক্ষী একমাত্র বৃষ্টিময়ী উন্মত্ত প্রকৃতি। আর তো কেউ ছিল না ধারে পাড়ে।

ঠিক এখানে এসেই প্রসাদের মনে একটি তর্ক মুখ তোলে। তন্ত্রাচার ও বৈষ্ণবতত্ত্বে আপাতদৃষ্টিতে দুস্তর ফারাক রইলেও, কোথায় যেন মিলমিলন্তি খেলার নির্ভার আত্মীয়তা লুকিয়ে রয়। দু'টি তত্ত্বসাধনারই প্রাণবিন্দুতে নারী-পুরুষ বিরাজ করছে। তন্ত্রে যেমন বিচিত্র রমণ কেলিময় সাধনার উপাচার তেমনই বৈষ্ণব তত্ত্বে সেই একই চিহ্নের দাপট। আসল তত্ত্ব বুঝি, দেহ বাদ দিয়ে কোনও সাধনাই সার্থক নয়। তবে কিনা সে পথেও দুরূহতার বীজ আছে। দেহকে মূল আধার ভেবে সেই দেহকেই ভুলে যাওয়া।

পাপাত্মা মৈথুনে যস্য ঘৃণা স্যাদ্ রক্ত রেতসোঃ।

পানে ভ্রান্তির্ভবেদ্ যস্য ভেদবুদ্ধিশ্চ সাধকে।

মৈথুনে যার ঘৃণা, রক্ত ও রেতঃপানে যার ভ্রান্তি ও সাধনে যার ভেদবুদ্ধি, সে ব্যক্তি মহাপাপিষ্ঠ।

আবার কবি শ্রীজয়দেব বর্ণন করেছেন, আহা! কামের কী বিচিত্র গতি। প্রহৃত হলে মানুষমাত্রেই কষ্টানুভব করে। কিন্তু শ্রীহরি যদিচ শ্রীমতীর ভুজলতাতে আবদ্ধ, স্তনভারে নিপীড়িত, নখরাঘাতে বিক্ষত, নিতম্বতাড়নে বিষম আহূত এবং রাধাকর্তৃক কেশকর্ষণে সংযমিত ও অধর সুধাপানে বিমোহিত, তথাপি তিনি অনির্বচনীয় রসাস্বাদ করে হর্ষপ্রাপ্ত হলেন।

এই দুইয়ের মধ্যবর্তী যামে এখন রামপ্রসাদের বিচরণ। সময় ও স্বদেশের ধ্বস্ত দালানকোঠার আঁকেবাঁকে ঘাস গজিয়েছে, অশ্বত্থ-শিশু মুখ বার করেছে, মসজিদে আল্লাহতালার জন্য ফুকার উঠছে, দেবমন্দিরে শঙ্খঘণ্টার নাদ বিস্তৃত হচ্ছে, গঙ্গার পরপারে গির্জায় খ্রিস্ট ভগবানের আরাধনায় ঘণ্টা বাজছে। এমতকালে কবি কামকলা নামে প্রথম রিপুটির হাতেপায়ে ধরছেন। কিছু করার নেই আদেশের চেয়েও বড় কথা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে 'মিতা' বলে ডাকেন। রাজার এই ভালবাসার মুখ অবশেষে ত্রিশূল সমাহার দেখছে। দেখছে সেই অস্ত্রটির ত্রি-মুখে কী অলীক মোহমায়ার রক্তমহিমা ছলছল করছে।

গণেশ বন্দনান্তে সরস্বতী বন্দনা। তৎপরে অথ লক্ষ্মী বন্দনা। অবশেষে কালীবন্দনা।

কলিকাল-কুঞ্জর-কেশরী কালী নাম।

জপিলে জঞ্জাল যায়, যায় যোগ্যধাম॥

কাল কর পৃথক চিন্তহ মনে এই।

লকারে ঈকার দীর্ঘ খড়্গা বটে সেই॥

আসল কথাটি অন্যত্র, কুমারীতন্ত্র তা বলে বসে আছে। বলছে স্পষ্ট অকপটতায়।

দেবতাগ্রে তু সম্ভোগে দেবতাপ্রীণনং ভবেৎ।

সম্ভোগং তু পুরস্কৃত্য দেবীং হৃদি বিসর্জয়েৎ॥

দেবতার সুমুখে কুলশক্তির সঙ্গে রতিসম্ভোগ করলে তাহা দেবতার কাছে প্রীতিপ্রদ হয়ে থাকে। রতিকর্ম অবশেষে দেবীকে নিজ হৃদয় মধ্যে বিসর্জন করবে। এতে তুমি কৃতার্থ হবে বটে। এ নিয়ে আর চিন্তার আবশ্যক কী।

কে জানে, এ হয়তো বা দুরাত্মার ছল খোঁজার অপর নাম। এ নিয়ে অধিক মনোতর্কে লাভ নেই।

ভজহরি কোথা থেকে গুঁড়ি মেরে অদূরে বসে পড়েছে কখন, প্রসাদ তা খেয়াল করেননি। তার কোলে গামছার কোঁচড়ে মুড়ি আর নারকেল ফালা।

প্রসাদ তার দিকে তাকাতে সে অমনি নিপাট দন্ত বার করে।

প্রসাদ ভ্রূ কুঁচকে বলেন, কী হল, কাজ নেই!

ভজহরি মস্করার মুখে কয়, কাজ তো এখন তোমারই দা ঠাকুর। যাকে বলে মহাকাজ।

প্রসাদ, বাগানে যেয়ে বেগুন গাছগুলোর গোড়া খুঁড়ে দে। আগাছা সাফ কর।

ভজহরি, আর? আর কী কী কর্তে হবে?

প্রসাদ, ডোবায় এক-দু'বার খ্যাপলা দে। ঘরে মাছ নেই।

ভজহরি, আর?

প্রসাদ এবার তেড়ে ওঠেন, আর এখেন থেকে বিদেয় হতে হবে। এক্ষুনি। না হলে পিঠে চ্যালা ভাঙব।

ভজহরি নির্বিকার মুড়ি চিবোতে চিবোতে বলে, সক্কালবেলা দুটি মুড়ি খাচ্ছি, তাও তোমার সইছে না।

প্রসাদ আর কোনও কথা না বলে কঞ্চির কলম তুলে নেন। মেটে দোয়াতে কলম ডোবান। তারপর কালীবন্দনার শেষ পংক্তিটি লেখা হয়।

ত্রিগুণ জননী তব নিরখিয়া পদ।
উথলে করুণা সিন্ধু অঙ্গ গদ গদ॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপামই।
আমি তুয়া দাস-দাস-দাসী-পুত্র হই॥

সকালবেলা বেলার দিকে হাঁটন ধরে। পাখির ডাকের রকম বদলে যায়। বদল ঘটে বনজ বাতাসের। ওপারের পথ দিয়ে একদল বালক গঙ্গাস্নান সেরে হু দিতে দিতে ঘরে ফেরে। তার পাশ দিয়ে জনৈক বৃদ্ধ পণ্ডিতের শ্লোকোচ্চারণ এই সদাই নির্জনে কাঁটা জাগায়। বোঝা যায় মানুষটি বয়ঃপ্রাপ্ত হলেও গলার সুর এখনও পুরোপুরি মরে-হেজে যায়নি।

প্রসাদ কলম চালনা করেন। ঊর্ধ্বে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা—'জাগরণান্ত'। তস্য নিম্নে—'বিদ্যার পাত্রান্বেষণে মাধব ভাটের কাঞ্চিপুরগমন।'

বীরসিংহ মহামতি হৃদয়ে চিন্তিত অতি
দুহিতার যোগ্য পতি কই।
রূপে গুণে কুলে শীলে সর্বশ্রেষ্ঠ এ সকলে
বিশেষত বিদ্যালাভে জই॥

ওধারে সংসার, ব্যস্তসমস্ত সর্বাণী। দুপুরের রাঁধনবাড়নে সামান্য আয়োজনেও একটু এপাশ ওপাশ করে নতুন কিছু রাঁধে সে। সঙ্গে শাশুড়িমাতাও হাত লাগান। এই যেমন আজ মাতাঠাকুরানি ওল কোঁড়ার সঙ্গে ডাইলের বড়া আর নারিকেল দিয়ে একপ্রকার ঘণ্ট প্রস্তুতের তরিবত করছেন। শিশু জগদীশ্বরীকে কোলে নিয়ে বালিকা পরমেশ্বরী দাওয়ায় বসে একা একা কাঁই বিচি খেলছে। তার দাদা রামদুলাল বুঝি টোলে গিয়েছে।

শান্ত প্রভাতি উঠোনে পাখি ডাকছে। নিমগাছটির বুকে এক চড়ুই পরিবার নতুন বাসা পত্তনের জোগাড় করছে। মানকচুর ঝাড়ে তিতির ঘুরছে। একজোড়া টিয়া উড়ে এসে বসেছে বেলগাছের ডালে। তারা এ ওর মুখে ঘন ঘন ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে। লাল টুকটুকে পুরু ওষ্ঠ মটকিয়ে ক্যাটর ক্যাটর বাক্ চালাচালি করছে।

এক টিয়া কয়, কী ছিরি সংসারের বাবা।

দ্বিতীয় মুখ মটকায়, ছিরি না ছিবি। থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়।

—হুঁ, একটু উল্টে পাল্টে নিত্যি কচুঘেঁচুর পদ।

—পাকা মাছপত্তর তো ঘরে ঢোকে না। নিত্যি গুলে, বেলে আর তিলে পুঁটির ঝাল।

—সংসারের কত্তা যদি উড়ুনচণ্ডে হয় তা হলে তো এমনই ঘটে।

—মদ খাচ্ছে, গীত গাইছে, হা হা হাসছে। দিব্যি আছে বাপু।

দাওয়ার একেবারে দখিনধারে বসে রামপ্রসাদ থেকে থেকে গালে হাত ভেরে আকাশপাতাল ভাবছেন। ঘাড়ের কাছে গোট করা কুঞ্চিত চুলের গোছে অভ্যাসমতো হাত বোলাচ্ছেন। নিমডালে নতুন বাসা পত্তনি পাখিরা ঠোঁটে করে ঘাস-বিচালি, শুকনো পাতানাতা বয়ে আনছে আর আড়ে আড়ে প্রসাদকে দেখছে। তারা ভাবছে এমন ঘাড়গুঁজো বেটাছেলে আর দু'টি দেখিনি এ দিগরে বাপু।

রামপ্রসাদ কলম বাইছেন,

দশম দিবস গৌণ এত বলি মাতা মৌন
স্বস্থানে প্রস্থান কৈলা শিবা।
শ্রীকবিরঞ্জনে কয় রজনী প্রভাতা হয়
নিদ্রাভঙ্গে দেখে ধীর দিবা॥

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠিতে সিধেসাপটা সম্বোধন করেছিলাম 'দাদু'। ফলে জবাবটিও সেইরকম সুরেই এসেছে। ভারি সুন্দর হাতের লেখার নকশা পড়তে পড়তে আর দেখতে দেখতে ভাবছি, উনি তো সত্যিই আমার দাদু। ওঁর জবাব অন্তত তাই বলে দিচ্ছে। হ্যাঁ, একটু চাপা ধমকও আছে বইকী।

'কেন ভাই পথের জন্য কেন আমায় কাঙালের মতো পত্র লিখেছ।... তবে একটা জায়গা আছে যেখানে বড় ছোট আছে ভাই। সেটা বয়সের বেলা। আমি ৬৯ বছরে পড়েছি। তুমি কত তা জানিনে। সেই দাবীতে আমি বড়, এবং সেই দাবীতে বলি—ভাই খুব বেশি পরিশ্রম করতে পারিনে। অথচ কাজ আমার বড় বেশি। সেই কারণে উত্তর দিতে দেরি হল। এবং সেই কারণেই অনেকের চিঠির উত্তর দেওয়া হয় না। চিঠি হারিয়ে যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দু-চারজন এমন প্রগলভ হয়ে চিঠি লেখে যে তার উত্তর দিতে ভাল লাগে না।'

'দুঃখের মধ্যে আনন্দ পাবার পথ আছে কি না জিজ্ঞাসা করেছ। পথ আছে বইকি। পথ আছে। প্রথম পথ সময় দ্বিতীয় পথ সাধনা। জীবনে যত দুঃখ মানুষ পায় সময় তা ভুলিয়ে দেয়। মনে থাকে না।'

'আর এক সাধনার পথ—সে পথ অভ্যাসের পথ, যেভাবে হাঁস জলের সঙ্গে যে-দুধ মিশে আছে—সেই দুধটুকু অনায়াসে খেতে পারে—জলটা বাদ পড়ে যায়।'

'কথাটা সহজ হল না। কারণ সহজ নয়। দুঃখের মধ্যে আনন্দ পাওয়া কঠিন এবং জটিল ব্যাপার। কারণ পরস্পরের ধর্মই বিপরীত। তবু মানুষ পারে। এবং যারা অতিমাত্রায় জীবধর্মী বা জৈব তারা পারে। তারা খুঁজে নেয়।'

'আমার আশীর্বাদ নাও। ইতি শুভার্থী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।'

চিঠির পাক খুব কড়া। হজম করা সহজ নয়। কিন্তু আমাদের বাড়িতে অনেকবার দেখেছি বাবার পোষা হাঁসগুলো কীরকম জল-দুধ একসঙ্গে মিশিয়ে দিলে শুধু দুধটা খেয়ে নেয়। জলটা পড়ে থাকে।

সে যাক গে—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আমার দাদু। একটু ঘুরপথে আত্মীয়তাও আছে—এরকম প্রচার আমি করে চললাম বন্ধুদের কাছে। তাতে অবশ্য বিশেষ লাভ হল না। বন্ধুরা প্রায় কেউই ওঁর নাম শোনেনি। তবে বড়রা চিঠি দেখে আমায় বেশ খাতির করলেন। আমাদের স্কুলের বাংলার স্যার শশাঙ্কবাবু তো আমার চিবুক ধরে আদরটাদর করে একসা।

আসলে এই বিনি কারণে মিথ্যে কথা বলার আমার একটা স্বভাব আছে। একবার ক্লাসে রাসবিহারী স্যার গল্প বলতে বললেন। সেদিন উনি না পড়িয়ে ঘুমোবেন। আমি বাস্তব বানানো গল্প বলতে আরম্ভ করলাম। রাস্তার ইলেকট্রিক তারে একটা ছেলে লাইটপোস্ট বেয়ে কাটা ঘুড়ি আনতে গিয়ে কীভাবে মারা গেল তার ভয়ঙ্কর বিবরণ। তারের সঙ্গে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে—। সবাই হো হো করে হেসে উঠল। স্যারের টিপিন ঘুম কড়কে গেল। বন্ধুরা আমার নাম দিল প্যাঁচা।

আর একবার বাবা-মা'র সঙ্গে কাঁচরাপাড়ার এক হলে ফাংশন শুনতে গিয়েছি। সব নাম করা 'অনুরোধের আসর'খ্যাত শিল্পী। প্রতিমা, শ্যামল, সতীনাথ, সন্ধ্যা, হেমন্ত কে নেই। হেমন্ত যখন গাইতে বসলেন তখন অনেক রাত। স্টেজের পাশে ওঁর স্ত্রী বেলা আর প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় বসে আছেন। হেমন্ত স্টেজে পাতা শতরঞ্চিতে বাবু হয়ে বসে। হারমোনিয়াম। পাশে তবলা। উনি সেই গানটা—মালতী ভ্রমরে করে ওই কানাকানি, তাই শুনে মনে হয় তোমারেই জানি আমি জানি-কী সুন্দর অল্প অল্প দুলে দুলে গাইছেন। আর ওই জায়গাটায়—জানি আমি জা আ আ আ আ আ নি—বলে তবলার দিকে মুচকি হেসে ডান হাতটায় ঝোঁক দিচ্ছেন। উইংসের পাশ থেকে বেলা, প্রতিমা মধুর হাসছেন।

তা বন্ধুদের বললাম, হেমন্তবাবু সম্পর্কে আমার পিসেমশাই হন। বললাম মানে রীতিমতো বলে বেড়াতে লাগলাম। তবে ব্যাপারটার মধ্যে একটুখানি বাস্তব আছে। আমার বাবার সেজো মাসিমা, যিনি নৈহাটিতে থাকেন, তাঁর এক জামাই হলেন তারাজ্যোতি মুখোপাধ্যায়। উনি হেমন্তবাবুর আপন ভাই। চেহারা অতখানি লম্বা না হলেও মুখের ভাব প্রায় একইরকম। আমার এই পিসেমশাই সাহিত্যিক আর ভারি ভাল মানুষ। কী শান্ত আর সুন্দব। তা ওই সূত্রেই বন্ধুদের কাছে হেমন্তবাবু আমার পিসেমশাই—এ কথাও রটনা দিলাম—দেখা হলেই তিনি আমার বাবার ডিবে থেকে নস্যি নেন।

এই মিথ্যে কথা বলা কিংবা উদ্ভট কাজ করতে আমার কেন যে এত ভাল লাগে তা

আমি নিজেই জানি না। এর জন্য অন্য লোকজন প্রায়ই অস্বস্তিতে পড়ে যায় .ন ভাবি, এমন কাজ আর কখনও করব না। কিন্তু আবার ফিরে আসি নিজের স্বভাবে।

দুপুরবেলা যখন বাড়ির সবাই ঘুমে তখন ভাইবোনদের নিয়ে আমার উদ্ভট কাণ্ড শুরু হয়। পৈতের গেরুয়া ধুতি, উত্তরীয়, ঠাকুরঘরের দড়িতে টাঙানো থাকে। সেগুলো টেনে নিয়ে পরলাম। মাথায় কাপড় পেঁচিয়ে পাগড়ি। আর পাড়ার গুজাকাকা—যিনি মেকআপ করেন যাত্রা-নাটকে আর ম্যাজিক দেখান—তাঁর কাছ থেকে চেয়ে-চিন্তে নিয়ে আসা গোঁফ-দাড়ি আঠা দিয়ে মুখে সেঁটে চোখে দাদুরই বাতিল চশমা পরে তৈরি। ভাইবোন ভরদুপুরে দোতলার ঘরে দাদুকে দিবানিদ্রা থেকে তুলে বলে, রামকৃষ্ণ মিশনের এক সাধু এসেছেন।

দাদু অমনি ধড়মড়িয়ে মেঝেয় পাতা মাদুর থেকে শোওয়া অবস্থায় উঠে বসলেন। কই—কই? কোথায় কোথায়?

আমি তখন সাধু সেজে দাদুর দরজার বাইরে। সামনে এগোতে সাহস নেই, দাদুর চোখে হাই পাওয়ার থাকলেও। দাদু বলছেন, আসতে আজ্ঞা হোক মহারাজ, আসতে আজ্ঞা হোক—

আমি দোরে দাঁড়িয়ে শুধু গম্ভীর গলা করে, হুমম্, হুমম্—

দাদু সেবাকে বলেন, ওরে কম্বলের আসনটা পেতে দে না ভাই।

আসন পাতা হয়। আমি সেটা টেনে খানিক তফাতে নিয়ে আসি। তারপর উবু হয়ে বসি।

দাদু চোখে চশমাটা জুত করে পরে নিয়ে হাতজোড় করে বলেন, তা মহারাজ, আপনি কি বেলডাঙ্গা মিশনের? মানে, আগে তো কখনও পায়ের ধুলো দেননি।

আমি শুধু, হুমম্—

দাদু করজোড়ে আমার দিকে যতই ঝুঁকে পড়ে আমায় জরিপ করতে চান আমি ততই সরে সরে বসি।

—মহারাজ, তা হলে আপনাকে একটু শরবত দিতে বলি?

আমি, হুমম্—

পেছন থেকে ভাই-বোনেরা খিকখিক চাপা হাসি হাসে। দাদুর সন্দেহ ঘনীভূত হয়। সামনে যথাসম্ভব ঝুঁকে আমার গোঁফ-দাড়ি মুখ আর গেরুয়া বেশ মাপতে মাপতে বাঁ হাত বাড়িয়ে তালপাতার পাখাটা আস্তে করে তুলে নেন। তারপর একবারমাত্র-বানচোত কোথাকার—বলে পটাং পটাং পলকা পাখার বাড়ি আমার দিকে। রোগা মানুষ আর রোগা পাখা।

আমি তিড়িং লাফ দিই।

সেদিন রাতে হঠাৎ বাবার বিনি পয়সার টেলিফোনে আমার নতুন দাদু তারাশঙ্করকে ধরব বলে একা একা তৈরি হই। মনে ধাঁধা- কী বলব ওঁকে। কী দিয়ে শুরু করব! অতবড় মানুষ, আমার সঙ্গে কথা বলবেন তো!

তেষট্টি

টেলিফোনের ওধারে এক মহিলার গলা, হ্যালো।

আমি এপার থেকে, হ্যালো। আচ্ছা, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন?

—তুমি কে বলছ?

—আমার নাম...। আমি হালিসহরে থাকি।

—হ্যাঁ, তা ওঁর সঙ্গে কী দরকার?

—না, মানে একটু কথা বলব। উনি আমায় চেনেন।

ওপারে বিস্ময়, চেনেন! আচ্ছা, একটু ধরো তো তুমি।

এবার আমার বুক ঢিপঢিপ। কী হয়, কে জানে। কথা বলবেন তো। নাকি বকুনি। ঘরে ঘোলাটে ষাট ওয়াটের বাল্ব জ্বলছে। ড্যাম্প ধরা ঘরের প্রাচীন দেওয়ালে বিন বিন ঘাম ফুটছে। উঁচু কড়ি-বরগার সিলিং-এর মাঝখান থেকে বড় বড় ডানাওয়ালা ফ্যান ঘুরছে কমানো গতিতে। সাবেক পাঁচ টাকা দিয়ে নাকি কেনা দেওয়াল ঘড়িটার বুক থেকে ভারী টকটক শব্দ উঠছে। পেতলের পেণ্ডুলামটা তাব পেটের কাছে মেপে মেপে দুলে চলেছে। বাইরের রাস্তায় সাইকেলের ক্রিং। বার বাগানে তুমুল ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। পাশের বাড়ির রবীনদার সেই আজব সারাইঘরের জানালা-বন্ধ ওপার থেকে রেডিও'র গান উড়ে আসছে। হেমন্তবাবু গাইছেন, না এ চাঁদ হোগা না তারে রহেঙ্গে...

অমনি টেলিফোনের ওপার থেকে গম্ভীর গলা, হ্যালো-ও।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠি, দাদু, আমি হালিশহর থেকে বলছি...। চিনতে পেরেছেন?

একটুখানি চুপ। তারপর, হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। তুই তো আমায় চিঠি লিখেছিলি?

—হ্যাঁ দাদু। আপনি কেমন আছেন?

—আমার শরীর ভাল নেই।

—কী হয়েছে?

—বুড়ো মানুষ তো। অনেক ব্যামো রে ভাই।

—ওযুধ খেয়েছেন?

এবার সামান্য হাসি, হ্যাঁ হ্যাঁ। তা বল কী বলবি।

—আপনি কি এখন লিখছেন?

—হ্যাঁ, লিখছিলাম তো।

—দাদু, আপনি কি হাঁসুলিবাঁক বইতে লেখা ওইসব শিস-দেওয়া সাপ দেখেছেন?

—দেখেছি বৈকি। ওদের শিস শুনেছি।

—শুনেছেন!

—হ্যাঁ, তা না হলে লিখব কেমন করে।

—এখন আপনি কী লিখছেন?

—উপন্যাস তো ও বেলা লিখি। এ বেলা যুগান্তরের লেখা।

—গল্প?

—না. না, ওসব আমাদের গ্রাম-দেশের কথাবার্তা। ধারাবাহিকভাবে যুগান্তর-এ বেরুচ্ছে।

এবার আমার প্রশ্ন পাল্টায়, আচ্ছা, আপনি রামেশ্বর রায়কে দেখেছেন?

আবার চাপা হাসি, না দেখলে লিখলাম কেমন করে!

—আমার ওই জায়গাটা খুব ভাল লেগেছিল। ওই যে, ওনার স্ত্রী বিকেলবেলা গা ধুয়ে এসে ছাদে বসেছেন। সন্ধে হচ্ছে। দূরে সাঁওতাল পাড়ায় মাদল বাজছে। রামেশ্বর ওনাকে কবি জয়দেব পড়ে শোনাচ্ছেন। কী সুন্দর।

—তোর ভাল লেগেছে?

—খুব।

—বেশ, তা হলে এবার ছাড়ি।

—আবার লিখবেন এখন?

—হ্যাঁ, তারপরে পুজোয় বসব।

—এত রাত্তিরে পুজো! কী পুজো দাদু?

—ও সে তুই বুঝবিনে রে পাগলা।

—আমি কিন্তু আপনাকে আবার একদিন ফোন করব।

—বেশ তো।

কথা ফুরোয়। বাইরের ঝিঁ ঝিঁ ডাক আমার চারদিকে ঘোর করে আসে। কড়িকাঠে ঘুনপোকা কিরকির, কিরকির হুল চালাতেই থাকে। ইঁদারাতলায় কে যেন কপিকল খড়খড়ায়। বাবা এখনও অফিস থেকে ফেরেনি। রোজই প্রায় গভীর রাত হয়। কোথায় কোন কোন দেশে বাবা টেলিফোনের কেবল্ ফল্ট সারাই করিয়ে বেড়ায়। তারপর কোনওরকমে লাস্ট ট্রেন ধরে হালিশহর স্টেশনে নেমে গ্যারেজ থেকে সাইকেল নিয়ে বাড়ি ফিরবে নিঝুম বুনো পুকুর রাস্তা বেয়ে।

বাইরে টিপটিপ বৃষ্টি। ঘন রাত। পুকুরময় শতেক অলিগলি। ডগডগে মানকচুর পাতে বৃষ্টি টলটল। পুকুরধারে সর্দার ব্যাঙের গলা, আর সব ব্যাঙ ছাপিয়ে—যেন বাজ কড়কাচ্ছে। পথের পাশে বেশির ভাগই সাবেক কোঠা—তাও গোনাগুনতি। অগুনতি বুনো ঝুপসি বাগান। এমনি এমনি ফেলে রাখা কে বা কাদের জমিতে মানুষপ্রমাণ জঙ্গল। সেইসব জাঙালে কত না লুকোছাপা শাঁখালুর লতা। শাদাটে লতার ডাঁটি দেখলে আমি ঠিক চিনতে পারি। একটা ছোট হাত শাবল দিয়ে খুঁড়ে বড় বড় আলু তুলি। তারপর তাকে পুকুরের জলে বেশ করে ধুয়ে ছুরি দিয়ে কেটে কেটে খাই। আর আছে আঁশফল গাছ। গোল গোল কালোজাম ধাঁচের দেখতে। এমনিতে খুব আঁশটে মেছো গন্ধ। কিন্তু খেতে বেশ। ওইসব বাদাড় থেকে কত কুঁচ ফল নিয়ে সেগুলো ভেঙে কৌটো বোঝাই করি। বঁইচি ফল তুলে কোঁচড় ভরি। কুলকুলি তলায় কালো রঙের পুরনো গাছ ঠেঙিয়ে মধুকুলকুলি আম পাড়ি। ছোট্ট ছোট্ট গোল গোল কাঁচা আম। কিন্তু কাঁচায় কী মিঠে। বিনি নুনেই দিব্যি খাই। প্রকাণ্ড চালতা গাছের তল থেকে পাকা হলুদ চালতা কুড়িয়ে তেল-নুন-কাঁচালঙ্কা চটকে মাখি। কী দারুণ খেতে! আর আছে পাকা খেজুর। হলুদ বর্ণ ছেড়ে ঝাড়বোঝাই পাকা খেজুর এখন তামাটে রঙা। কী মিষ্টি খেতে। এইসবের মধ্যে দিয়ে আমার কানু বাবা সাইকেল টলমলিয়ে জোরে জোরে প্যাডেল করছে। পকেট থেকে খয়েরি দ্রব্যভরা বোতলটা হুইহুই কোন পুকুরে ফেলল। প্রাচীন কোনও বাড়িতে এক বৃদ্ধ একা বসে রাত জেগে রেডিও সংগীত সম্মেলনে বড়ে গুলামের মালকোষ শুনছেন। ও

ঘরে ডিম লাইট জ্বলছে। বাবা জোরে মোড় ঘুরল। তারপরই ঝমঝমিয়ে জল নামল। বাবা বাড়ির সামনে সাইকেল বাইতে বাইতে এসে লম্বা হাঁক দিল আমার ছোটবোন সোমার উদ্দেশ্যে, মা আ আ আ আ...

আমি এতক্ষণ বিছানায় শুয়ে মনে মনে কাকে যেন বলে চলেছিলাম, বাবাকে বাড়িতে ফিরিয়ে দাও...ফিরিয়ে দাও। মা জানলার ধাপে অন্ধকারে একা বসে। ও ঘরে বড়মার হাই-অ্যা-অ্যা-অ্যা। দাদুর শ্বাসকাশি। মা নেমে যায়। অন্ধকারে।

আমিও চুপি চুপি। বাইরের ঘরে তক্তপোশে বাবা জামাপ্যান্ট-সহ চিৎপাত। সারা গায়ে মাথায় কাদা। হয়তো দু-একবার পড়ে গিয়েছে।

মা হেঁট হয়ে বাবার পা থেকে ভিজে জাব জুতো খোলে। মোজা টেনে নিঙড়োয়। বাবা সুরেলা গলায় গড়িয়ে জড়িয়ে গায়, তাজমহলের মর্মরে গাঁথা কবির অশ্রুজল...শুভ্র মেঘের দল...

বাবার সবই হয়। কেবল শচীনকর্তার উচ্চারণটা বাদ পড়ে যায়।

রামপ্রসাদ যখন বিদ্যাসুন্দর বাইছেন আপন নিবিষ্ট মনে তখন গঙ্গার তরঙ্গ বয়ে আনছে রাজারাজড়া আর সাহেবি-সমাচার। সে-সমাচারের কেন্দ্রে এখন রবার্ট ক্লাইভ নামে প্রাক্তন কেরানি থেকে উঁচুতে-ওঠা এক জেদি ব্যক্তি।

এই ক্লাইভ মেজর কিল্‌প্যাটরিক ও দলবল সমেত বজবজে এসেছে। ক্লাইভ লোকটি যতখানি না যোদ্ধা তার চেয়ে অধিক উচ্চাভিলাষী। মনে মনে এবং প্রকাশ্যে তাঁর গর্বিত ঘোষণা আছে, শুধু কলিকাতা পুনরুদ্ধার নয়, কোম্পানির জন্য এমন এক পাকা ব্যবস্থা তিনি করতে চান, যা আগের চেয়ে শুধু ভালই হবে না, আগে যা কখনও হয়নি এবার তাই হবে। তাঁর আরও ধারণা, সিরাজ একজন অতি দুর্বল নবাব। দরবারের খাস ব্যক্তিরা নবাবের প্রতি খুবই বিরূপ।

ক্লাইভ এ বাংলার সঙ্গে অপরিচিত নন মোটেই। ১৭৪৯-'৫০ সালের শীত ঋতুতে তিনি কলিকাতায় এসেছিলেন। তখনই এই আদপে বানিয়ার মনে দাগ রেখেছিল বাংলার বিপুল ঐশ্বর্যের খনি। বানিয়া ইংরাজ আর তার রক্তজাত এই ক্লাইভ প্রধানত ব্যবসার লাভ-ক্ষতি নিয়েই ভাবিত। আর এই সূত্রেই দূর হতে মাদ্রাজ কাউন্সিল তাঁকে নির্দেশ জারি করেছে, মসির সঙ্গে অসিও ব্যবহার করতে হবে। নবাবের দিকে অবিলম্বে আক্রমণ শানাতে হবে! নবাবকে এমনভাবে ধ্বস্ত করতে হবে যাতে করে তিনি ইংরাজদের ব্যবসাবাণিজ্য আক্রমণ করতে সাহস পাবেন না।

বজবজে ক্লাইভের লীলা অনন্য। তাঁর পরেই পরেই ওয়াটসন সাহেব এসে উপনীত জাহাজপত্র সমেত। তখনও দুই মিতে একে অপরের মুখে দেখেননি। ক্লাইভের আক্রমণ লক্ষ্য মানিকচাঁদ। মানিকচাঁদ মনে মনে ক্লাইভ ও তাঁর বাহিনীকে একটু তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করলেন। এদিকে ক্লাইভ তাঁর বাছাই সেনা নিয়ে যখন গঙ্গা বরাবর মানিকচাঁদকে ধাওয়া করলেন, তখন মানিক তাঁর দু'হাজার সেনা নিয়ে প্রতি আক্রমণ করলেন। কিন্তু ইংরাজের গোলা তীরবেগে ধেয়ে এসে তাঁর মস্তকের পাগড়ি উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। তিনি পলায়ন করলেন। সন্ধের পর নবাবি ফৌজ সব চম্পট দিলে। বজবজ কেল্লা কতক বিনি যুদ্ধেই ইংরাজদের হাতে এসে গেল।

ক্লাইভ তো ক্ষান্ত দিতে আসেননি। তিনি এবার পথ ধরলেন কলিকাতার। যাওয়ার আগে বজবজের কেল্লাটি ধুলোয় গুঁড়িয়ে দিলেন—পাছে আর নবাবি সেনারা সেখানে ফিরে এসে ঘোঁট না পাকাতে পারে।

জলপথে চলতে চলতে গঙ্গার একধারে পড়ল মেটেবুরুজের মাটির কেল্লা, যে-স্থানের নাম আলিগড়। আর ওধারে শিবপুরের থানা দুর্গ। ইংরাজের ভয়ে কেল্লাজোড়া এমনি এমনিই ফাঁকা হয়ে গেল। ক্লাইভ তাঁর সেনাপত্র নিয়ে নেমে পড়লেন মেটেবুরুজে। ওয়াটসনও জাহাজ নিয়ে এগোলেন। মেটেবুরুজ হতে ক্লাইভ কলিকাতার দিকে অগ্রসর হলেন।

অগ্রসর হলেন, আর অধিকারও করে নিলেন কলিকাতা। সবই যেন চোখের পলকে ঘটে যেতে লাগল। কলিকাতা নগরি যেন প্রেতপুরী এখন। অমন স্বর্ণখচিত নগর এখন হীন, ছন্ন। সেই প্রায়-শ্মশানে বসে ক্লাইভ নবাবের দিকে যুদ্ধ হেঁকে বসলেন। তিনি ঠাঁই নিলেন বরাহনগর প্রান্তরে তাঁবু গেড়ে। এই স্থান জলা-জংলা। দিবসেতেও বুনো বরাহ ধাওয়া করে।

ক্লাইভ এখানে বসেই হুগলির ডাচদের দমন করার যুক্তি আঁটলেন। কেননা ওটিও এক ক্ষুদ্র কণ্টক। ওয়াটসন আর ক্লাইভ দুই তরফে ঘুঁটি সাজালেন। খবর গেল হুগলিতে। সেখানে কান্নার ধুম পড়ে গেল। ইংরাজি জাহাজ হুগলি দুর্গের সুমুখে এসে থামল। নেমে এল গোরা সৈন্যর দল। ওধারে জাহাজ হতে নাগাড়ে গোলাবর্ষণ চলল দুর্গের দিকে। মাঝরাতের পর দুর্গ দখল করল ইংরাজ। ইতিমধ্যে নবাবের হাজার দুই সেনা, যারা এই দুর্গ পাহারা দিয়েছিল, পলায়ন করেছে। ইংরাজরা হুগলি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ক্ষার করল। ঘরবাড়ি একটিও আর টিকে রইল না।

এধারে নবাব সিরাজও বসে নেই। তিনি ইতিমধ্যে লোকলস্কর-সহ উপনীত হয়েছেন ত্রিবেণীতে। তাঁর সঙ্গী চল্লিশ হাজার ঘোড়সওয়ার, ষাট হাজার পায়ে-চলা সেনা, পঞ্চাশটি হাতি আর ত্রিশটি কামান। এ খপরে ইংরেজরা কিঞ্চিৎ চিন্তিত হয়ে পড়লে। কেননা নবাবের বাহিনী তাদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক ভারী। বাজারে প্রচার, নবাব কলিকাতা যাবেন। কিন্তু মাঝপথে বরাহনগর, যেকালে ক্লাইভ বসে, তাই তাঁর সেনা যাওয়ার পথ হল বারাসতের এবড়ো-খেবড়ো পথ ধরে, দমদমা হয়ে কলিকাতা।

তার আগের দিন বিকেলবেলা নবাব বজরা সাজিয়ে গঙ্গায় নামলেন খানিক দূর দেখে কিংবা বেড়িয়ে আসতে। কে জানে, এমনও হতে পারে সেনাদি যাবে স্থলে আর তিনি যাবেন জলে।

সারাটি দিনমান বিদ্যাসুন্দর রগড়ে রামপ্রসাদ এসেছেন সান্ধ্য গঙ্গাস্নানে। এমনটি নিত্যি ঘটে না। যেদিন শরীর উত্তপ্ত হয়, সেদিনই গঙ্গা তাঁকে টেনে আনে নিজ ক্রোড়ে। স্নানও হয় আর টাটকা-টাটকি দেশের খপরপত্রও কিছু জোটে। আজ প্রসাদ একাই গঙ্গায় এসেছেন। ভজহরিকে ঘরেই রেখে এসেছেন।

নিজেকে জুড়াবার জন্য যেমন এই গঙ্গা তেমনই অন্তরকে শীতল করার উপায় শুধুমাত্র নিজ গীতে। তাই প্রসাদ আবক্ষ জলে দাঁড়িয়ে দু'হাত ঊর্ধ্বে তুলে গীত রচেন।

ভূতের বেগার খাটিব কত।
তারা বল আমায় খাটাবি কত॥

আমি ভাবি এক, হয় আর,
সুখ নাই মা কদাচিত।
পঞ্চদিকে নিয়ে বেড়ায়,
এ দেহের পঞ্চভূত॥

সন্ধ্যার আঁধারে যে-বজরাটি ত্রিবেণীর দিক হতে ধীর লয়ে বয়ে আসছিল, সেটি এবার থমকে থেমে যায়। থামে প্রসাদী গীতের থেকে খানিক তফাতে। অন্ধকার কালো স্রোতে সেই গম্ভীর বজরা আস্তে আস্তে নোঙর গাড়ে।

প্রসাদ প্রথম চরণখানি আবার ফিরে গান।... তারা বল আমায় খাটাবি কত...।

বজরায় মৃদু আলো জ্বলে। আলোর একটি দীঘল শিখা বজরার ক্ষুদ্র জানলা গলে বাইরে এসে নামে। নেমে যায় গঙ্গার স্রোত বরাবর। এ অন্ধকারে সেই আলোর বহর জলের বুকে তীর কী বল্লম তার হিসেব কষবার জো রয় না এই নিঃসীম চরাচরে। আলোর গতি মোতাবেক সে চিরকালই অন্ধকারের বিবাদী। সেই বিবাদ-ঝগড়ার অন্তরালে কোনখানে একপল বোঝাপড়ার অতীত ভালবাসা গুপ্ত হয়ে রয়, তার আঁক-কষা জীবজগতের সাধ্যে নেই। এমনকী নিঃস্বার্থ গাছপালা লতাপাতাও নাচার।

রামপ্রসাদ আপনার মনে আপনার গীতখানির বীজ বপন ও ফলন ঘটান। নিজ সৃজনের ফল নিজেই আস্বাদন করেন। আপনার মধ্যে বুঝি আপনাকে টুঁড়ে বেড়ানোর এ এক অচিন খেলা। প্রসাদ নিজেব রচিত পদে নিজেই অবাক বলেন, আমি ভাবি এক, হয় আর...

বজরার ছায়া ছায়া আর কিঞ্চিৎ আলোমাখা বৃহৎ অবয়ব থেকে একটি ক্ষুদ্র আকার ভূমিষ্ঠ হয় স্রোতের বুকে। সেই পলকা ডিঙাখানি ভেসে পড়ে জলে।

এধারে সিরাজের পায়ে-চলা বাহিনীও বসে নেই। তারা জোরকদমে এসে পৌঁছেছে উমিচাঁদের হালসিবাগানের অট্টালিকার বড়োসড়ো বাগানে। সেখানে তাদের ছাউনি পত্তন হয়েছে। আর সেখানেই ইংরাজের একজোড়া দূত এসে উপনীত হয়েছে। তাদের বচনে শান্তির কথা আর মনে মনে নবাবের ফৌজিবহরের খবরতালাশ করা। ক্লাইভ বানিয়ার মনের ভিতরে একটিই তত্ত্ব—নবাবটিকে যদি একবার যে কোনওমতে কব্জা করা যায়।

রোগা-পাতলা ডিঙাটি ধীরে এসে ভেড়ে আঘাটার পাশে। তার ভিতর থেকে একজন মাথায় পাগড়ি রোগাসোগা ব্যক্তি লাফ দিয়ে তীরে নামে। লোকটি নামামাত্র জোড়হস্ত। রামপ্রসাদ ব্যাপার-বিষয় দেখে কিঞ্চিৎ অবাক। কে এই লোক এমত মনাবস্থাতে তিনি ডুব দেওয়া সেরে ঘাটে ওঠেন। গামছা দিয়ে বেশ করে গা-মাথা মুছতে থাকেন। আকাশের এক কোণে, বহু দূরে সদ্য লণ্ডভণ্ড হুগলির কালো আকাশপটে পোড়া দগ্ধ অঙ্গার লেখা। সেই আগুনপোড়া লিখন বুঝি দেশকালের দীর্ঘশ্বাসকে খানিকটা অন্তত এঁকে দিয়ে বসে আছে।

লোকটি পায়ে পায়ে রামপ্রসাদের দিকে এগিয়ে এল। তারপর সেই একই হস্তজোড় গতিকে মাটির দিকে যথাসাধ্য অবনত হয়ে বলে ওঠে, ঠাকুর, একটি নিবেদন ছিল।

প্রসাদ ভ্রূ কুঁচকে তাকান একবার। মনে মনে লোকটিকে জরিপ করেন।

সে এবার বলে, নবাব আমায় বলে পাঠিয়েছেন—যদি কিরপা করে একটিবার তাঁর বজরায় উঠতে আজ্ঞা হন।

প্রসাদ অবাক কন, নবাব! মানে!

—আজ্ঞে বঙ্গেশ্বর নবাব সিরাজদ্দৌলা স্বয়ং আপনার সাক্ষেৎ প্রার্থনা করছেন মহাশয়।

প্রসাদ আবারও কন, নবাব! কোথায়?

সে পাশ ফিরে অতি বিনীত অবস্থায় গঙ্গায় নোঙর করা বজরাকে ইঙ্গিতে দেখায়। দেখায় আর চোখে যথাসম্ভব প্রার্থনার বিনতি বইয়ে চলে।

প্রসাদ একপল ভাবেন। তারপর বলে ওঠেন, চলো দেখি।

সামান্য সময়ের মধ্যে ছোট তরী এসে ছোঁয় নবাবী বজরাকে। লোকটি আগে উঠে পড়ে তড়াক্ দিয়ে। তারপর একটি ক্ষুদ্র সিঁড়ি নীচে নামিয়ে দেয়। প্রসাদ সেটি বেয়ে ওপরে উঠে যান।

দোতলার বিরামঘরে ধূপ জ্বলছে চন্দনগন্ধী। আর উড়ছে আতরের খোশবাই। ঘর বললে ভুল হবে। এটি প্রকৃতপক্ষে মস্ত মস্ত জানালা-আঁটা বারান্দা সমান। বিদেশি পুরু কাচের ঘেরে বাতি জ্বলছে। তার ওধারে দণ্ডায়মান যুবক যে বঙ্গাধিপ, তা বিশ্বাস করতে বিলম্ব হয় না প্রসাদের। সেই যুবকের মুখমণ্ডল ভারি লাবণ্যময়। সাজানো ভ্রু'র নীচে একজোড়া টানা টানা আর কতক বিহ্বল কুতূহলি চক্ষু। পরনে মখমলের সফেদ জোব্বা আর মাথায় এক পাগড়ি ধাঁচের টুপি। তাতে কিছু মানিকপত্র গাঁথা। বাম কাঁধ থেকে বুকের ওপর আড়াআড়ি নেমে আসা খয়েরি রঙা উত্তরীয়টি কোমরে বাঁধা পুরু বস্ত্রবন্ধের সঙ্গে এসে মিশেছে। গলায় একটি তিননরি হার। যুবকের নাসিকাভঙ্গি বাজতীক্ষ্ণ। আর ঠিক তার নীচে চমৎকার করে ছাঁটা আর নেমে যাওয়া দু-টুকরো বিরহি গোঁফের বাহার। পাতলা কোমল অভিমানী ঠোঁটজোড়া স্মিত হাসিমাখা। নবাবের আদবি জোড়হস্ত দেখতে দেখতে প্রসাদ ভাবেন—কী কোমল ওই আঙুলগুলি। এ হাতে তরবারি ও রক্তধারা কেমন করে মানিয়ে যায়।

—আপ তসরিফ রাখিয়ে জি।

নবাবের শান্ত অনুরোধ। রামপ্রসাদ বজরার পাটায় বিছানো নরম গালিচায় দু'পা মুড়ে বসেন। বসেন নবাবও, অপর প্রান্তে, সবিনয়ে আর মহা কুতূহলি মুখ সাজিয়ে। তারপর আধা খেঁচড়া ভাষায় বলে ওঠেন, এক গীত শুনাইয়ে জি। বহুত মধুর আপনার গান।

প্রসাদ সামান্য হাসেন। তারপর বলেন, আমার গান আপনার পছন্দ হল কেমন করে!

নবাব হাসেন, সুর, আপকো সুর বহুত মিঠা। বহুত উমদা।

প্রসাদ এবার ধন্যবাদসূচক কুর্নিশ জানান প্রশংসার জবাবে। তারপর মনে মনে গান খোঁজেন। কেন না তিনি জানেন, এই নবাব তাঁর রচিত খাসগীত, যা বাংলা ভাষায় বাঁধা, যথাযথ সমঝে উঠতে পারবেন না। অতএব পুরনো শিক্ষা মোতাবেক বিভাষী গীত।

গঙ্গার স্রোতে সন্ধ্যা আরও গড়িয়ে বা ঘনিয়ে ওঠে। দূরে কাছে কয়েকটি সশস্ত্র নৌকা নবাবি বজরাখানি পাহারা দিয়ে চলে। এই অন্ধকারে তাদের বন্দুকের সঙ্গীনগুলি ঝকঝক করে। ঝিকিমিকি চঞ্চল দেখায় প্রহরায় থাকা মানুষের চক্ষুশলাকা। ওপার থেকে দেবমন্দিরে সন্ধ্যারতির শাঁখ ঘণ্টা ভেসে আসে। রামপ্রসাদ বাম কানে হাত চাপা দিয়ে গান ধরেন, ও জালিম, প্যারে জালিম, আজ মুঝে খালাস দো তুমহারা মহব্বতি আগ সে—

সান্ধ্য পূরবীতে বাঁধা এই গজল শুরু হওয়ামাত্র নবাবের তরফ থেকে মৃদু বাধা। প্রসাদ দেখেন বঙ্গেশ্বর একটি হাতে বারণ এঁকে ওপরে তুলে ধরেছেন।

প্রসাদ অবাক তাকিয়ে প্রসঙ্গ বুঝতে চান। তার আগেই নবাব বলে ওঠেন, ও গানা নেহি। যো আপ-আপ, যে গানা গাইছিলেন কুছ পহিলে, ও গীত। ওহি শুনাইয়ে।

মুহূর্তে প্রসাদ পরিস্থিতি বুঝে ফেলেন। তিনি ধরতে পারেন তাঁর রচিত যে-গীত আপামরের কাছে হাটখোলা আর অপার আদরের, তা ওই ভিনমার্গী বাংলার নবাবকেও ছুঁয়ে দিয়েছে। মনে মনে চোখে জল আসে প্রসাদের। জগন্মাতার কাব্যকলার কী বিচিত্র স্বভাব। অতএব ফেলে আসা গীতেই তিনি ফিরে যান।

ও মা ষড়রিপু সাহায্যে তায়,
হোলো ভূতের অনুগত।
আসিয়া ভবসংসারে, দুঃখ পেলেম যথোচিত।
যার সুখেতে হব সুখী,
সে মন নয় গো মনের মতো॥
চিনি বলে নিম খাওয়ালে,
ঘুচলো নাকো মুখের তিত।
কেন ভিষক্ প্রসাদ, মনে বিষাদ,
হয়ে কালীর শরণাগত॥

চৌষট্টি

পৌষ মাস অর্থাৎ শীত ঋতুর রাজাপাট, কখন যে ঘুরে গিয়েছে অন্যমনে অন্যখালে। প্রকৃতির গায়ে কুয়াশার অভিনিবেশ প্রাতেও ও সন্ধ্যায়—যে সবই এখন সদ্যস্মৃতি। প্রকৃতির গায়ে মাথায় এখন বসন্ত ঋতুর ছটাপটা। দিঙ্মণ্ডলে কাঁচা নিমফুলের গন্ধে এসে মিশেছে জুঁই-বেলি-চামেলির উতরোল, এ বুঝি কুসুমেরই দিন শুধু। বাতাসের ঝাপটায় আজ বুঝি সুবাসেরই মহা উৎসব।

মদনমহীপতিকনকদণ্ডরুচিকেশরকুসুমবিকাশে।
মিলিতশিলীমুখপাটলিপটলকৃতস্মরতূণবিলাসে।।

কন্দর্প দেব এখন এই বসন্ত ঋতুতে নরপতি রূপে বিরাজ করছেন। প্রস্ফুটিত নাগকেশর তাঁর স্বর্ণছত্র, আর ভৃঙ্গবেষ্টিত পাটলি-কুসুমদল তাঁর বিলাস তূণীররূপে শোভা পাচ্ছে।

বসন্ত নরপতি হলেন ঋতুরাজা। তাঁর এবং দেশের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের উপরোধে এই বিদ্যাসুন্দর রচনার প্রাণপাত। একেই বলে দ্বিবিধ প্যাঁচ। তার ওপর দেশের গায়ে এখন বিচিত্র বন্যকাঁটার আক্রমণ তাড়না। মুরসিদাবাদে নবাবি সিংহাসনের গায়ে ক্রমাগত কুটিল আঘাত পড়ে চলেছে। মুরসিদাবাদ—মুরসিদাবাদ—নবাব সিরাজ। সেই তরুণ নায়কটির মনোহর মূর্তি এখনও রামপ্রসাদের অন্তঃকরণ জুড়ে বসে আছে। সেদিন সন্ধ্যারাতের আবছায়া দীপালোকে সেই শান্ত সুধীর কন্দর্পসমান মূর্তিখানি প্রসাদের বুকে জেগে রয়। কে বলে ওই মানুষটি নারীধর্ষী কিংবা প্রখর বিকৃতভাবী অত্যাচারী। কারা রটনা দেয় ওই

যুবক নিঠুরতার মুখর মূর্তি। তাঁর চোখে সেদিন সন্ধ্যায় যখন প্রসাদের গানের ঘোর ঘনাল তখন জাতি ধর্ম-ভাষা-সহবত সবকিছুই গঙ্গার জলে গেল। সব মিলে-মিশে এক হয়ে সংসারের একমাত্র সত্য মানবতার জীবন্ত-মূর্তিখানি প্রকটিত হল। প্রসাদের কবিতার সুরেই যেন একলপ্তি হয়ে গিয়েছে ওই শাসকমূর্তি। পাথরের মূর্তি কখন যে রূপ বদলে মেটে হয়ে গিয়েছে তা কে জানে। নবাবও যেন প্রসাদের মনের একপাশে মনখানি পেতে দিয়ে বলছেন, আসিয়া ভব সংসারে, দুঃখ পেলেম যথোচিত—যার সুখেতে হব সুখী—সে মন নয় গো মনের মতো...

সে-রাত্রে নবাব এগিয়ে এসে প্রসাদের দু'খানি হাত নিজ হস্তের খোড়ে ধারণ করেছিলেন। তাঁর ডাগর দু-চোখে রক্তাভা আর ঠেলে আসা জলের রোধ। কীভাবে সিরাজ এই গ্রাম্য কবির গীতে ভেসে যাচ্ছিলেন তা কে জানে। তবে ভাষাহীনতাই যে তাবৎ ভাষা সে-কথা তাঁর চোখ বলে দিচ্ছিল। নবাব শুধু একবার প্রসাদকে বিহ্বল অনুরোধ করেছিলেন, মুরসিদাবাদি রাজসভায় তাঁকে যেতে। তাঁর সাদর আতিথ্য গ্রহণ করতে। কিন্তু রামপ্রসাদ সবিনয়ে সে-অনুরোধ সরিয়ে দিয়েছেন।

সে-রাত্রে নবাবি বজরা প্রসাদের চোখের সুমুখ দিয়ে আস্তে আস্তে ভেসে চলে গেল কলিকাতার দিকে। রামপ্রসাদ গঙ্গাতীরে একা দাঁড়িয়ে দেখলেন, বজরার মৃদু আলোর রেশ কীভাবে গঙ্গার জল সইতে সইতে ক্রমে অপসৃত হচ্ছে। এই চরাচর সাজানো বিপুল অন্ধকারে। নদীর স্রোত কলকল স্বরে সেই আলোর মলিন ছবিখানি ধরে রাখতে রাখতে আবার হারিয়ে ফেলছে। নিশীথিনীর গম্ভীর, মগ্ন-রূপ জলস্রোতে আলোর সন্তাপ আঁকতে আঁকতে দূরে চলে যাচ্ছে। বাংলার ভাগ্যাকাশে আজ কী যে নিদান বেখে গেল ওই নামমাত্র আলোর পুঞ্জ।

রামপ্রসাদের কলমে বিদ্যাসুন্দরী আখর ভেঙে ভেঙে চলে—কবিদর্শনে কামিনীগণের কামোদ্দীপন।

কুলের কামিনী কুঞ্জরগামিনী
কি অপরূপ রূপসী।
নাভি সরোবর পীন পয়োধর
বদন বিমল শশী।।
দশন মুকুতা মৃদুহাস্যযুতা
অমিয়া জড়িত ভাষা।
সুনীল উৎপল লোচন চঞ্চল
বেসোরে ভূষিত নাসা।

অতঃপর মালিনী-সহ সুন্দরের পরিচয়। অথ বিদ্যার রূপবর্ণন। অথ মালঞ্চ বৃত্তান্ত। মালিনীর পুষ্পচয়ন ও হাটে গমন। সুন্দরের মাল্যগ্রন্থন। আর তার পরেই যখন লেখা হয়—কবির মালা-সংক্রান্ত পরিচয় লিখন, তখন প্রসাদ ভারি চমৎকৃত হন মাত্র দু'টি পংক্তি লিখে। লেখা হয়,

যতনে লইয়া কবি ফুল্ল সরসিজ।
প্রতি দলে দলে লিখে সবিশেষ নিজ।।

আবার এই অধ্যায় লিখতে লিখতেই এক স্থলে মনে ক্রোধ-ক্ষোভ তরঙ্গ তোলে। কলম লেখে,

নপুংসক মন তবু সুখে করে ক্রীড়া।
পাণিনী ব্যবসা যার তার চিত্তে ব্রীড়া।।

আহা বিদ্যাব্যবসার যদি এমত গতি হয়, তা হলে একজন কবির আর কী বা করার থাকতে পারে। মাথার ওপর রাজনির্দেশ বা আব্দার। ফলে কবির কলম আনপথে ভ্রমে। সে ভ্রমণ অতি বিচিত্র আর আনখ। তাই তো মনে হয়,

শ্রীকবিরঞ্জন বলে জলনিধি উথলিলে বালির বন্ধন কোথা থাকে।।

দেশকালের অবস্থা গতিকে এখন সত্যই বুঝি জলনিধি উথলানো ধারা।

কলিকাতার একেবারে নিকটে উমিচাঁদের হাল্‌সিবাগানের দুর্গের চতুর্ধারে নবাবের তাঁবু পড়েছে। ইতিমধ্যেই সেই বাগানবাড়িতে নবাব যেয়ে উপনীত। সেখানে তলব পড়েছে ক্লাইভের দূতদের। এই দূতদ্বয় আসলে নবাবের সমীপে কিছু সন্ধিপ্রস্তাব রেখেছিল। সেই প্রস্তাবের পহেলা শর্ত হল নবাবকে অবিলম্বে কলিকাতা ছেড়ে চলে যেতে হবে।

নবাবের কাছে ক্লাইভের পাঠানো দুই সাহেব দূতের সঙ্গে ছিলেন সুপণ্ডিত আর ফার্সি-আয়ত্ত কায়স্থকুলাধিপতি রাজা নবকৃষ্ণ দেববাহাদুর। তখনও নবকৃষ্ণের রাজদন্ত তেমন ফোটেনি। কিন্তু এই দরবারে কোনও ফল হল না।

১৭৫৭, ফেব্রুয়ারির ৫ তারিখ। ক্লাইভ তাঁর সেনাদল নিয়ে এসে পড়লেন হাল্‌সিবাগানের কাছে। তখন প্রাতঃকাল। চারিধারে ঘন ধানক্ষেত। সেই ক্ষেত্র হতে কুয়াশার ধূম ঘনাচ্ছে তো ঘনাচ্ছেই। সাহেবের দল সেই কুয়াশা প্রহেলিকার মাঝখানে দিশেহারা, চঞ্চল। এমতাবস্থায় নবাবি ফৌজ হাউই ছুড়ল আকাশ বরাবর। সাহেবদের বারুদের শকটের ওপর সেই হাউই এসে পড়ল। বিস্ফোরণ হল মহা। অমনি দু-তরফে তুমুল লড়াই আরম্ভ হল। আলো-আঁধারি রহস্যে এই যুদ্ধ যেমন আন্দাজি তেমনই মারমুখী। কে যে কোন তরফ চেনা দায়।

এখানে ক্লাইভের একমাত্র বাসনা হল নবাব সিরাজকে কোনও গতিকে ধরে পাকড়ে নিয়ে আসা। এই মূল নিধিটিকে একবার কবজা করতে পারলেই কাজ সারা। তা হলে আর যুদ্ধ-বিগ্রহ করতে হয় না। কিন্তু সে স্থলে নৈরাশ্য। ফলে ইংরাজকে পিঠটান দিতে হল। সেই পিছুপথে নবাব বাহিনীর সঙ্গে ইংরাজদের যে ছোটখাটো যুদ্ধ ঘটল সে বড় কম নয়। মারাঠা খালের পাশেই নবাবি কামান মজুদ। মারা পডল বেশ কিছু গোরাপল্টন, জাহাজি গোরা আর দিশি সিপাহি। জখমও হল বিস্তর। বেহাত হয়ে গেল একজোড়া উৎকৃষ্ট কামান। ক্লাইভ এসে ঠাঁই নিলেন ফোর্ট উইলিয়ামে।

সেই সুরক্ষিত দুর্গ হতে ক্লাইভ নবাবকে পত্র লিখলেন। সে-পত্রে নিজেদের বলদর্প আর ভয়-প্রদর্শন।

এতে বুঝি ফল হল খানিক। নবাবি ফৌজ মনে মনে এবং প্রকাশ্যে ভীত হয়ে পড়ল। নবাবকে বাধ্য হয়ে কলিকাতার আশেপাশেই আবার স্থান পাল্টাতে হল। আর তারপর থেকেই দু-তরফে সন্ধির জন্য হরেক দর ও দস্তুর হতে লাগল। সেই দস্তুরের এক দখলিকার দখিন দেশের ফরাসি জেনারেল বুসি। নবাব পত্র লিখে বুসির সাহায্য প্রত্যাশী। কিন্তু ফরাসিগণ সিরাজকে প্রত্যাখ্যান করল। এ ধারে খাস দিল্লির দুয়ারে ভয়ঙ্কর আহম্মদশা আব্দ আলি। এই জটিল অবস্থায়, দেশ ও জাতির এই বিরল গিঁট পড়া

অবস্থায়, নবাব সিরাজ আর কোনও দিশা পেলেন না। অবশেষে ইংরাজদের যাবতীয় দাবি মেনে নিয়ে নবাব সন্ধিপত্রে দস্তখত করে তাঁর শিলমোহর দেগে দিলেন।

শিলমোহরি ফলং হল, গোটা বাংলায় ইংরাজ কুঠিবাড়ি তুলে যথাইচ্ছা ব্যবসা করতে পারবে। ইংরাজদের ·: যা ক্ষতি হয়েছে সে-সবেরই খেসারত দেবেন নবাব। তা বাদে—ইংরাজগণ কলিকাতায় কেল্লা নির্মাণ করবেন এবং টাঁকশাল বসিয়ে হিন্দুস্থানি রূপেয়া, সিক্কা ছাপবেন।

সবার ওপরে আর এক পাকা ব্যবস্থা হল, যেটি কিনা যেচে কালশমন কোলে তুলে নেওয়ার তুল্য। মূঢ় আর চপলমতি নবাব বুঝি ক্রমে এক চক্রে পতিত হতে লাগলেন। চারিধার হতে তাঁকে ষড়যন্ত্রের ধূম ঘিরে ধরতে লাগল। সেই নিয়মে নবাবের দরবারে ইংরাজদের একজন খাস প্রতিনিধি নিযুক্ত হলেন। সেই ব্যক্তি উইলিয়ম ওয়াটস্। এই সাহেব হলেন সাক্ষাৎ কালকূট। নবাবি দরবারের তাবৎ খবর ইংরাজদের চালান করাই তার প্রধান কর্ম।

চপলমতি নবাব ইংরাজদের প্রতি ঘোষণা দিয়ে বসে আছেন, আমার যারা শত্রু, তারা তোমাদেরও শত্রু। আর তোমাদের যারা অ-মিত্র তারা আমারও শত্রু। ক্লাইভ এমতাবস্থায় চন্দননগরের দিকে নজর দিলেন। শর্তানুযায়ী, এক্ষেত্রে নবাবের অনুমতি নেওয়ার কথা। কিন্তু ক্লাইভ সে পথে না হেঁটে সোজা চলে গেলেন চন্দননগরের পাশে গেরিটি বাগানে। সেখানে তাঁর তাঁবু পড়ল। হুগলির ফৌজদার নন্দকুমার তা দেখেও দেখলেন না। ক্লাইভ চন্দননগর ঘিরে ফেললেন। গোলা দাগা আরম্ভ করলেন। এধারে নবাব মুরসিদাবাদে বসে। ফরাসিদের পাশে নবাব সৈন্য বরং না দাঁড়িয়ে পিছটান দিল। ফরাসিদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ বাঁধল। সবকিছুর পর গোলাদাগা। এবং চন্দননগরের যুদ্ধ। ইংরাজদের জয়।

ঘড়িয়াল ক্লাইভ জানেন, ঘরের শত্রু বিভীষণই এখন নবাবের হাল। তাঁকে তাঁর অমাত্য-সান্ত্রীবর্গ কেউই মনে মনে সইতে পারছে না। তলে তলে তারা প্যাঁচ কষছে। তারা জানে এই তরুণ নবাব মানসিক দোলাচলে থাকেন সদাই। তাই তিনি এদের সঙ্গে থেকে থেকেই দুর্ব্যবহার করেন। তার ওপর আছে ক্লাইভের নিত্য প্যাঁচ ও আবদার, ওয়াটস্-মারফত। সে-ব্যবহারের বাস্তব নাম শীতল চাবুক—যা অহর্নিশি পড়ে চলেছে নবাবে পিঠে, ওয়াটস্ হয়ে, ক্লাইভের তরফ থেকে।

এই অবস্থার নাম যদি জলনিধি উথলানো না হয় তা হলে আর কী যথাযথ বর্ণন হতে পারে। সেইসূত্রে মালিনী ও বিদ্যা পরস্পরের কথোপকথন গাঁথতে গাঁথতে বলে যায় বিচিত্র দেহকথা, কাম সঞ্চালন। সেই দখিনা বাতাসে বিদ্যার কাছে সুন্দরের চিত্রমালা হয় অভিরাম স্বপ্নসওদাগরি।

বদনে বিরাজ বাণী বিদ্বান বিপুল।
পঞ্চবক্ত্র পদ্মযোনি প্রায় সমতুল।।
দৃষ্টিমাত্র মম দেহে দহে দিবানিশি।
বৃদ্ধার বাসনা হয় বাঁচে কি রূপসী।।

এরপর মালিনীর সুন্দর-নিকটে বিদ্যার বার্তা-কথন ঘটে। সে বারতায় স্থূল দেহসর্বস্ব আন্দোলন।

তব পত্র পাবামাত্র শিহরিল সর্বগাত্র।

চেতনা রহিত পড়ে মহী।
সখী ডাকে পরিত্রাহি রামা করে আই ডাহি
মরমে দংশিল কাম-অহি।।
অবশেষে বিদ্যা ও সুন্দরের দর্শন ঘটে।
শুভক্ষণে উভয়ত মুখবিলোকন।
দৃষ্টি-শর পরস্পর জর জর মন।।

আর এখানেই বিদ্যাদর্শনে সুন্দরের মোহপাত হয়। সে মোহ কাম উত্থিত চিরকেলে সংসার নিয়মি। এখানে এসে রামপ্রসাদ ছন্দ বদলে ভিন্ন তালে চলে যান।

দন্তাবলি শিশুঅলি কুন্দকলি মাঝে।
ভুরু অনু কামধনু হেমতনু সাজে।।
নীলগিরি শুকপুরি তনুপরি ভৃঙ্গ।
মঞ্জুরব মনোভব মহোৎসব রঙ্গ।।

মধ্যখানে বিদ্যা-কর্তৃক ভগবতীর স্তব। এবং বিদ্যার বাসরসজ্জা। সেই শয্যায় খাটের দুইপাশে যেমন দুই দুই তাকিয়া, চিকন, মশারি, ভৃঙ্গার সুবাসিত বারি, তেমনি নানা ভক্ষদ্রব্য।

ভক্ষদ্রব্য নানাজাতি মণ্ডা মনোহরা।
সরভাজা নিখতি বাতাসা রসকরা।।
অপূর্ব সন্দেশ নামে এলাইচদানা।
ফুল চিনি লুচি দধি দুগ্ধ ক্ষীর ছানা।।....
কৌটা ভরা ছাঁকা চুণ-কর্পূরের সঙ্গ।
এলাইচ জায়ফল জইত্রি লবঙ্গ।।

রামপ্রসাদ এখানে এসে মনে ভাবেন বিদ্যাসুন্দরের কাব্যচ্ছলে নিজ বংশ পরিচয় কিঞ্চিৎ লিখে রাখতে দোষ কী। কালের তরঙ্গে হয়তো এ কাব্য হারিয়ে যাবে, কিন্তু কবির পরিচয়টি তো লোকে মনে রাখবে।

ধনবন্ত মহাকুল পূর্বাপর শুদ্ধ মূল
কৃত্তিবাস তুল্য কীর্তি কই।
দানশীল দয়াবন্ত শিষ্ট শান্ত গুণানন্ত
প্রসন্না কালিকা কৃপাময়ী।।
সেই বংশ সমুদ্ভুত ধীর সর্বগুণযুত
ছিল কত কত মহাশয়।
অনচির দিনান্তর জন্মিলেন রামেশ্বর
দেবীপুত্র সরল হৃদয়।।
তদঙ্গজ রামরাম মহাকবি গুণধাম
সদা যারে সদয়া অভয়া।
প্রসাদ তনয় তার কহে পদে কালিকার
কৃপাময়ি মরি কুরু দয়া।।

অতঃপর বিদ্যাসুন্দরের বিচার এবং তৎপরে উভয়ের বিবাহ। এখানে এসে প্রসাদ

কেবলই সর্বাণীর কথা মনে করেন। সর্বাণী, সর্বাণী, তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আর চৈতন্য আচ্ছন্ন করে থাকা এই রমণী। বেশির ভাগ সময়ে নীরবতাই তার সাজ। কিন্তু তার দেহ যখন কথা বলে তখন যেন ত্রিলোক একাকার হয়ে যায়। অতএব শৃঙ্গারে পরস্পরের উক্তি।

কাতর কামিনী বদন যামিনী
নাথ মলিন হি ভেল।
মুকুতা জৈসন সোহত ঐসন
সরম জল উপজেল।।

সর্বাণীর শ্রম রস কিংবা কাম জলের স্মৃতিসুখ, সঙ্গমের মুহূর্তে, এখানে প্রসাদকে চালিত করে। তিনি দেখতে পান সেই বিপরীত শৃঙ্গারের চিত্রখানি। এক্ষেত্রে কিছু নাট্য ও সংযমের ছল ঘটে। যুবতীকে বিপরীত রতি দান করতে বললে সে যেন নেকাঢঙ্গ ও লাজে দাঁতে কাটা অবস্থা! সত্যিই কী পুরুষের কাজ রমণী পারে।

সাঁতারে হাঁপায়্যে শেষে স্রোতে ঢাল গা।
সেইরূপ চেষ্টা পাও মনে আছে যা।।...
লাজের দুয়ারে ধনী ভেজায়ে কপাট।
প্রবর্ত প্রকৃত কার্যে তবু নানা ঠাট।।
বিগলিত জঘনে সঘনে বেনী দোলে।।
যেন পূর্ণশশী পূর্ণশশী করে কোলে।।

আমার বড়মা গিরিনন্দিনী দেবীর এবার বুঝি পাট তোলবার সময় হল। আজ বেশ ক-মাস তিনি শয্যে নিয়েছেন। আমাদের বাড়ির বাইরের ঘরের মেঝেয় পুরু করে লেপ-তোষক পেতে, তার ওপর অয়েল ক্লথ বিছিয়ে তাঁর শয়ান। বয়েস তো কম নয়। দাদুর কথায় প্রায় একশোর এপারে ওপারে।

আমার কেন জানি মনে হয়, তাঁর এই শয্যা নেওয়ার পেছনে দাদুর কিছু প্রত্যক্ষ প্ররোচনা আছে। নিজের শরীর সর্বদাই খারাপ। ফলে তাঁর খোলাখুলি আতঙ্ক, আমার মা কী আমি চলে গেলে এ বয়েসে পুত্রশোক সইতে পারবে।

একদিন তো দুম করে বলে বসেন, মা, ঢের হয়েছে। অনেক বেঁচেছ। জানো না বুঝি, বেশিদিন বাঁচলে অনেক শোকতাপ পেতে হয়।

বড়মা নির্বিকার ফ্যালফেলে চোখে বলে, তা তো বটেই বাবা।

দাদু নাছোড় বলে ফেলেন, এবার তুমি মরে আমায় বাঁচাও দিকি।

বড়মার উদাসী জবাব, তাই তো। আমি মরলে তুই তো বাঁচবি বাপ।

দাদুর চোখে জল ছলছল, বাঁচবোই তো। একশোবার বাঁচবো।

বড়মা আমার দিকে ফিরে তাকায়, সেই গানটা বল না বাবা। ওই যে সেই—দিনদুকুরে চুরি করে রাত্তিরে তো কথা নাই—

এই না বলে বিছানায় শয়ান বড়মা প্রায় সুর নেই আর কতক বেটাছেলে স্বরে গেয়ে ওঠে, বাঁশি শুনে আর কাজ নাই সে যে ডাকাতিয়া বাঁশি—

দাদু ছলছল চোখে কেন যে আমার দিকে তাকান।

বড়মা [illegible] দুরশ কুচি পাকা মাথা নেড়ে নেড়ে

শচীনকর্তার গান গেয়ে চলে, সে যে দিন দুপুরে চুরি করে রাত্তিরে তো কথা নাই. ডাকাতিয়া বাঁশি—

গান শেষে বড়মা দুটি ইচ্ছে ব্যক্ত করে ছেলের কাছে। প্রথম হল, তাঁর চান্দ্রায়ন প্রায়শ্চিত্ত করাতে হবে। আর দ্বিতীয়, মৃত্যুর পর যেন বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করা হয়।

আমার কিন্তু মনে ঘুরছিল, এই তো সেদিন আমার উপনয়নের সময় যখন বাড়ি ভর্তি লোকজন, নীচের দালানে আনন্দ নাড়ু পাকানো হচ্ছে সার সার মেটে মালসায়, বড়মা দারুণ আনন্দে হাত তালি দিয়ে গাইছে, ডাকাতিয়া বাঁশি. .। সেই বৃদ্ধা আজ অয়েল ক্লথের বিছানায় শুয়ে মাথা নেড়ে নেড়ে সেই একই গান বলছে। আর শেষকালে নিজের শেষ সাধের কথাটি বুড়ো ছেলেকে জানিয়ে রাখছে। নাড়ুটার নাম যদি আনন্দ হয়, তা হলে এই গানমাখানো অন্তিম ইচ্ছেটির নামও তো আনন্দ।

আমার মনটা কেমন টনটন করে। এই বুড়ি মানুষটি অনেকদিন পৃথিবীতে রয়েছেন। কত কী দেখেছেন, সয়েছেন। এবার সব ফেলে রেখে থানের খুঁটে ডাকাতে বাঁশির আনন্দ সুরটুকু বেঁধে নিয়ে বুঝি পাট তুলবেন। তারপর তিনি আত্মা হবেন। সে অবস্থানটিব নাম বুঝি পরপার। জীবন আর বেঁচে থাকার ওপার।

তাঁর ইচ্ছেমতো পুরোহিত-নাপিত উপনীত আমাদের বাড়ি। জোগাড়যন্ত্র সবই আমার কানুবাবা আর মা। বিছানায় শয়ান অবস্থাতেই যতীনকাকা এসে ক্ষুর শান দিয়ে বড়মার মাথাটি নেড়া করে দেয়। বিষ্টুকাকাদের একটি এঁড়ে বাছুর মূল্য ধরে দিয়ে কেনা হয়। বড়মা শুধু কাঁপা হাতে তার লেজ ধরে নাকি বৈতরণী পেরোন। পাড়ার কবিরাজ পণ্ডিত মহাশয় হুঁ হাং মন্ত্র পাঠ করে বড়মা'র পরিত্রাণের ব্যবস্থা করেন। প্রায় বিনি প্রচারে আর বাইরের লোকের অনুপস্থিতিতে খুব নিরিবিলিতে আমাদেব বড়মা'র চান্দ্রায়ন-প্রায়শ্চিত্ত ঘটে। তবে পুরোহিত আর পরামাণিক দু'জনেই বেশ মোটা দক্ষিণা আর তৈজসাদি পেয়ে যান। বড়মা নিশ্চিন্তে বিছানায় শুয়ে থাকেন। আর থেকে থেকে আমার মাকে অভ্যাসমতো ডাক দেন, মিলা, ও মিলা—

মা ওদিক থেকে ছুটে আসে সংসার সামলাতে সামলাতে। দেহে সাড় নেই বলে কাপড় নষ্ট করে ফেলেছে বড়মা। মা তখন পুরনো শাড়ি ছিঁড়ে অনেকগুলো টুকরো করে। সেগুলো নিয়ে অনেকটা কৌপিনের মতো করে তাঁকে পরিয়ে দেয়। বেটাছেলে সাধু-সন্ন্যাসী ছাড়া আর কারও জন্যে যে কৌপিন হয় তা আমি এই প্রথম দেখি। দেখি মা বারবার দৌড়ে এসে সেগুলো বদলে দিয়ে যাচ্ছে। নেড়া মাথা বড়মা এখন পুরুষ-নারী দুইয়ের অতীত মুখ নিয়ে চুপটি করে শুয়ে রন।

দাদু এসে মাঝে মাঝে পাশে উবু হয়ে বসেন। হেঁট হয়ে ডাকেন, মা ও মা।

অনেক পরে পরে, কী এক আশ্চর্য অতল থেকে, বড়মা আলগোছে রা দেন, কী বাপ আমার।

—কেমন আছো মা? কী কষ্ট হচ্ছে বলো তো।

বড়মা বেশ খানিক পরে ভেসে ওঠেন, কই, না তো। কষ্ট। না তো।

দাদুর চোখে জল টলটলায়। তাঁর নস্যির টিপ ধরা হাত চশমার কাঁচ মোছে ঘন ঘন। মা এসে ঘরে ধুনচি রেখে যায়। বাবা অফিসে। মাঝে মাঝে ফোন করে খবর নেয়।

পটেশ্বরী দিদি এসে পড়ে সাতসকালে—মা'র পাঠানো খবরে। এসে শোনে প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গিয়েছে। অমনি সে মা'র কানের পাশে কয়, প্রায়শ্চিত্তির করলে হয় সারে নয় সরে।

বড়মা অমন চুপটি করে থাকতে থাকতেই সট্‌কে পড়েন আমাদের চোখের সামনে। দাদু তাঁর ডান হাতের কবজিখানা ধরে চোখ বুঁজে বসে আছেন। মস্ত দেওয়াল ঘড়িটা টকটকিয়ে চলেছে। বাইরে সকালবেলাকার আলো। সবখানে কী আশ্চর্য চুপটি করে থাকা। খোলা জানলায় ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া।

আমি এই প্রথম কাউকে মরে যেতে দেখছি। এতদিন সেসব বইয়ে পড়েছি।

দাদু আস্তে করে মা'র হাতখানা বুকের ওপর নামিয়ে রাখেন। তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। তিনি ছেলেমানুষের মতো ডুকরে কেঁদে ওঠেন।

আমার এই প্রথম কাউকে মরে যেতে দেখার অভিজ্ঞতা পাকা হয়। দেখা হয়, একজন বুড়ো মানুষ এতক্ষণ ধরে রাখা হাতখানা কীভাবে আলগোছে নামিয়ে রেখে তাঁর অতিবৃদ্ধা মা'কে বিদায় দেন। তারপর হাহাকার করে ওঠেন, মা-মা গো—

পঁয়যট্টি

সারা বাড়িময় গব্য ঘৃত আর আতপ চাল ছোঁয়ানো গন্ধ। সেইসঙ্গে বাসি হয়ে আসা রজনীগন্ধা। দেওয়ালে বাবার তোলা বড়মা'র হাসিমুখ ছবির নীচে ধূপ জ্বলছে। বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধশান্তি মিটে গিয়েছে। আত্মীয়স্বজন ইত্যাকার লোকজন প্রায় চলে গিয়েছে। শুধু রয়ে গিয়েছে আমার দিদিমা, মা'র দিদিমা কুসুমকুমারী, আর দেশ থেকে আগত কামিখ্যে কাকা।

বড়মা চলে গেল এই সদ্য অক্টোবরে। সামনে পুজো। এখন হাওয়ায় সামান্য হিম হিম। দাদুর মাথায় পাকা বিনবিনে চুল, নেড়া মাথার চালে। বাবা এখনও অফিস ফেরতা একখানা করে রজনীগন্ধার মালা এনে বড়মা'র ছবিতে পরিয়ে দেয়। আমরা--ভাইবোনেরা বাগান থেকে শিউলি ফুল কুড়িয়ে এনে ওঁর ছবির সামনে একখানা টুলের ওপর ছড়িয়ে দিই।

গোটা বাড়িতে গব্য ঘি আর আতপের অলৌকিক গন্ধ ঘুরে বেড়ায় শ্রাদ্ধ মেটার পরেও। কাজের দিন সন্ধের ঝোঁকে বাবা, রামশরণ কা[illegible] রঙিন বৃষ কাষ্ঠখানা গঙ্গার আঘাটায় গিয়ে পুঁতে দেয়। সঙ্গে আমি আর ভাই মলয়। মলয়কে বড়মা সবচেয়ে ভালবাসত। নিজের পাত থেকে সন্দেশ তুলে রাখত। রোজ সকালে মিছরির শরবত পাথরের গ্লাসে ওর জন্যে বরাদ্দ থাকত। পটেশ্বরী দিদি ওকে ডেকে বলে দিয়েছে, সন্ধের পর একা কোথাও না বেরোতে—টানা একবছর। বৃষ কাষ্ঠখানা আমি আর ভাই মলয় গিয়ে মাঝেমধ্যে দেখে আসি।

সন্ধেবেলা—গঙ্গার চরে পোড়া পোড়া রঙা কাশফুলের বাদাড় পলকা হাওয়ায় টাল খাচ্ছে। বড়মার বেরষো কাঠ, সেখানা আঘাটায় একা দণ্ডায়মান। মাথায় শোলার টোপর বাতাসে বেঁকে গিয়েছে। গলায় শুকনো রজনীগন্ধার মালা। চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে জোয়ারের ঠেলে আসা জলে।

রঙিন বাহারি ঢ্যাঙা কাঠখানা কী চমৎকার রংদার নকশা সাজানো। তিন তিনটে ধাপ। নীচের লম্বা ধাপটা দেহের নীচ এলাকা। তারপর মাঝখানেরটায় বুকের কাছে ছোট্ট একটা

খোপ। সেখানে প্রদীপ দেওয়া হয়েছিল। সেই খোপ ঘিরে খাসা নকশা। কত ফুল কাটা আর রহস্যময় প্রতীক আঁকা। একেবারে শেষ ধাপ ওপরে। ঠিক মানুষের বা কোনও প্রাণীর মুখ নয়—অথচ মুখ। মাঝখানে জগন্নাথ ধাঁচের একজোড়া ড্যাবা ড্যাবা চক্ষু। কীরকম বিস্ফারিত চেয়ে আছে বড়মা, ছানি কাটানো ঘষা কাঁচের চশমা এঁটে।

মলয় ভয়ে ভয়ে বলে, দাদা বড়মা'র ভয় কচ্ছে না।

আমি অবাক হয়ে বলি, কেন? ভয় করবে কেন.

—ওই যে, একলা একলা জলের ধারে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি হাসি, ধুর, ওটা বড়মা কে বললে। ওটা তো বৃষ কাঠ।

মলয় শঙ্কিত স্বরে বলে, বড়মা চশমাটা পরে আমার দিকে চেয়ে আছে।

আমি দেখি বৃষ কাষ্ঠ চোখের মতো নকশা আঁকা জায়গাটায় বড়মার মুখের আদলের নাম-গন্ধ নেই। ভাই কি তা হলে স্বামী অভেদানন্দের সেই বইয়ে দেওয়া চশমা পরিহিত বিদেহী আত্মাকে দেখছে?

নদীর স্রোতে সন্ধে এসে পড়ে। ঝাঁ ঝাঁ করে আবছায়া ঘিরে ফেলতে থাকে সমস্ত চরাচর। চরার কাশফুলের রাজত্বে কালসিটে ঘনায়। আকাশে টুপটাপ তারা জ্বলে ওঠে। বৃষ কাঠময়ী গিরিনন্দিনী সেই অন্ধকারে খিলখিলিয়ে হাসেন। হাসেন আর গান, সে যে দিনদুকুরে চুরি করে রাত্তিরে তো কথা নাই—ডাকাতিয়া বাঁশি...। গঙ্গার অন্ধকার, কাশফুলের কালোয় হেলান দিয়ে ঘষা কাঁচি চশমার ওপার থেকে তাঁর অতিবৃহৎ চক্ষুজোড়াও হাসতে থাকে। অভেদানন্দ বলে যান, 'আমরা নিদ্রার সময় যেমন স্বপ্নলোকে থাকি, মরণের পরেও ঠিক তাই। অর্থাৎ আত্মারা তখন মনোময় জগতে বাস করে। সেই প্রেতলোক তথা মনোলোকে তারা সবকিছুই করে...।'

আমার দাদু তাঁর পুরু চশমার কাচের পরপার থেকে গঙ্গার জলে অপলকে তাকিয়ে থাকেন।

অসূর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ।।

আমার মা'র বাবা পূর্ণচন্দ্র দাদু প্রশ্ন করেন, এর মানে কী মাস্টারমশাই?

দাদু রহস্যজনক হাসেন, মানে হল, এমন সমস্ত লোক বা স্তর আছে যেখানে অনন্তকাল ধরে অন্ধকার রাজত্ব করে। এ স্থানে সূর্য বা ভিন্ন কোনও গ্রহের আলোই পড়ে না। যারা আত্মার আসল রূপটি বুঝতে পারে না তারাই মরণের পর ওইসব অন্ধকার লোকে যায়।

আমি বুঝতে পারি না কোথা থেকে কী হচ্ছে। আর এসব কথার মানেই বা কী। আমি মলয়ের একটা হাত চেপে ধরি।

দাদু রহস্যজনক হেসে বলেন, তা হলে তোমায় হুইটম্যানের একটা কবিতা বলি। And as to you, Life, I reckon you are the leavings of many deaths. No doubt I have died myself ten thousand times before.

পূর্ণচন্দ্র গম্ভীর স্বরে বলে যান, ওহে জীবন, আমার জানা আছে যে তুমি আসলে বহু মরণের পর পড়ে-থাকা স্মৃতিচিহ্ন শুধু। এ তো খুবই নিশ্চিত যে এর আগে আমি বহুবার মৃত্যুবরণ করেছি।

দাদু, তা হলেই বোঝো ব্যাপারটা।

আমি কিন্তু বুঝতে পারি না ব্যাপারটা কী। কোথা থেকে এসে এই গঙ্গার ঘাটে সন্ধে পেরনো কালে আমার জোড়া দাদু এতসব কূট প্রশ্ন পাড়ছেন। আর তাই শুনে নদীর কাদায় পোঁতা আমার বৃষকাঠ বড়মা খিল খিল করে ডাকাতিয়া বাঁশির গান গাইছেন।

বাবা গলা চড়িয়ে বলছে, ইন্ডিয়া-চায়না যুদ্ধ বেঁধেছে। হুঁ, লাদাখ-নেফা বর্ডারে।

দাদু চোখ তোলেন, সে কী কথা। হিন্দি-চিনি ভাই ভাই। তা ভাইয়ে ভাইয়ে শেষকালে যুদ্ধ।

পূর্ণদাদু, ম্যাক্‌মোহন লাইন।

দাদু, হুঁ, বর্ডার ডিসপিউট না হাতি।

পূর্ণদাদু, এই তো সেদিন চিনের প্রাইম মিনিস্টার চৌ এন লাই এ দেশে ঘুরে গেলেন। কাগজে ছবি বেরল। নেহরুর কাঁধে কাঁধ দিয়ে মোটা মোটা মালা পরে হাসছেন।

বাবা, মনে হচ্ছে আবার সেই সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের মতো ব্ল্যাক আউট হবে।

দাদু, চিনেরা নিউক্লিয়ারে বেশ পাওয়ারফুল।

পূর্ণদাদু, আর আমরা পঞ্চশীল-পঞ্চশীল করে নিজেদের সোল'কে পাওয়ারফুল ভাবছি।

অভেদানন্দ, সোল-সোল। একটি বাচ্চা মেয়ে দেখছে তার ভাই যখন মারা যাচ্ছে তখন তার দেহের চারদিকে একটা কুয়াশাময় জিনিস। ইউরোপে বিজ্ঞানীরা তার ওপর গবেষণা করে বস্তুটার নাম দিয়েছেন 'এক্টোপ্লাজম' বা সূক্ষ্ম বহিঃসত্তা।

বাবা এবার চিৎকার করে ওঠে, নিকুচি করেছে আপনাদের অক্টোপাস-ফাস। দেশে এখন যুদ্ধু বলে কথা।

গঙ্গার বুকে একটি চড়ুইভাতি নৌকো ভেসে যায়। তাতে মাইক লাগানো। সেখানে পান্নালাল গেয়ে যান,

কে হর হৃদি বিহরে।
তনু রুচির, সজল ঘন নিন্দিত,
চরণে উদিত বিধু নখরে।।
নীলকমলদল, শ্রীমুখমণ্ডল,
শ্রমজল শোভে ওই মা'র শরীরে।
মরকত মুকুরে, মঞ্জু মুকুতাফল,
রচিত কিবা শোভা মরি মরিরে।।..

পিতামহ সহর্ষে বলে ওঠেন, বাঃ বাঃ। এ তো রামপ্রসাদের সমর-সংগীত। দেশে যুদ্ধ বেঁধেছে। ঠিক সময়েই ঠিক গানখানি দিয়েছে। বলিহারি বলিহারি—

নৌকোটা পুরো গানটি না শুনিয়ে উত্তরে মুরসিদাবাদের দিকে বয়ে চলে যায়।

শ্রমজলের অর্থ যদি ঘর্ম হয়, তা হলে সে জলবিন্দু এখন তিন-তিনটি দেহে। প্রথম সেনজ রামপ্রসাদ— দেশকালের ভাবনার পাশাপাশি বিদ্যাসুন্দর-এ উন্মত্ত জর্জর হয়ে আছেন। দ্বিতীয় আর তৃতীয়জনা যথাক্রমে নবাব সিরাজ ও ক্লাইভ।

রামপ্রসাদের চলেছে নিজের সঙ্গে সমর। এ কাব্য গড়ে তোলা তারই অন্য নাম। মনে

মনে শত ধিক্কার ঘটে পণ্ডশ্রম বলে। সবার জন্য সবকিছু নয়—এ কথা রাজাকে বোঝাবার অবকাশ নেই।

অথচ এই নৃপতি কৃষ্ণচন্দ্র ঘন ঘন কলিকাতা যাতায়াত করছেন। যোগ রাখছেন নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রীদের সঙ্গে। নদিয়ারাজের কষা-আঁক কোন সিদ্ধান্তের দিকে যাচ্ছে তা রহস্যময়।

নবাব ক্রমে একা হয়ে পড়ছেন। তাঁর প্রথম ক্ষতি—ফরাসিদের পরাজয়। এখানে ক্লাইভ মহা দাগা দেগেছেন। কেননা তাদের প্রতিজ্ঞা ছিল, 'একজন মাত্র ফরাসি জীবিত থাকিতেও ইংরাজ নিবৃত্ত হইবে না।' সে-প্রতিজ্ঞা তারা রেখেছে। নিজ দেশের কল্যাণকামনায় সিরাজ নবাব প্রথমত ফরাসিদের পাশে চেয়েছিলেন। আর বাসনা ছিল দেশে চিরস্থায়ী শান্তিসংস্থাপন।

কিন্তু চৌধারে বিক্ষিপ্ততা। লুকোছাপা, গোপন মন্ত্রণা। ইতিমধ্যে মহারাজ মানিকচাঁদ, যিনি কলিকাতার রক্ষক থেকে ভক্ষক হয়েছিলেন, তাঁকে নবাব কারান্তরালে পাঠালেন। বিস্তর মিনতির পর দশ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড দিয়ে মুক্ত হলেন তিনি। মানিকচাঁদের এই দুর্দশায় অন্যেরা ভীত-চিন্তিত হয়ে পড়ল। তারা রায়দুর্লভাদি ক্ষমতাবানগণ। ঘন ঘন গুপ্ত মন্ত্রণা ঘটতে লাগল। আশ্চর্যের কথা, যারা এই মন্ত্রণাভিসন্ধির নায়ক, তারা কেউ কারও শোণিতসংস্রবী অথবা বান্ধব নয়। যথা, জৈন জগৎশেঠ, মুসলমান মীরজাফর, বৈদ্য রাজবল্লভ, কায়স্থ দুর্লভরাম, সুদখোর উমিচাঁদ, প্রতিহিংসাশ্রিত মানিকচাঁদ। এই স্বার্থবাদীর দল নিজ নিজ পৃষ্ঠ বাঁচাতে ঘোঁট পাকিয়েছে।

রামপ্রসাদ মনে মনে ভারী অবনত হয়ে পড়েন যখন তিনি শোনেন নবরঙ্গ-কুলধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রও এ যড়যন্ত্রে সামিল। তিনিও গোপন মন্ত্রণায় সেঁধিয়ে পড়েছেন। আর এ কথা শুনে অর্ধবঙ্গাধিকাবিণী নাটোরের রানি ভবানী তাঁকে সংকেতে সুপরামর্শ দেওয়ার জন্য শাখা সিন্দুর উপহার পাঠিয়েছেন—

হায়, এ যড়যন্ত্রে বর্ধমান রাজের পরে পরেই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নাম ওঠে। এই নদিয়ারাজ-এব সামাজিক প্রভাব অপরিমেয়। সমাজে প্রচারিত আছে—বাংলাদেশে যে ব্রাহ্মণ কৃষ্ণচন্দ্রের দান করা ভূমি অথবা বৃত্তি ভোগ না করেন, তিনি ব্রাহ্মণই নন।

ফরাসিদের বিদায় দান—সিরাজের কাছে বজ্রপাত সমান। তেমনই সিরাজ জানেন, ইংরাজরা যে কোনও মুহূর্তে মুরসিদাবাদের দিকে রওনা হতে প্রস্তুত। ক্লাইভের বাণিজ্যতরণীর অন্তরালে গোলা-বারুদ, ওপরে ধানের বস্তা, তাব উপর চড়ন্দার চল্লিশজন নিপুণ সেনাপুরুষ। এই বাণিজ্য তথা রণডিঙ্গার নাম 'সপ্তডিঙ্গা মধুকোষ।'

অথচ কী পরিহাস! এসবের নেপথ্যে আলিনগরের সন্ধিপত্রখানি গঙ্গার হু হু বাতাসে নৌকার পাল হয়ে দুল দুল করে। দোল খায় নবাবের মনতুষ্টির জন্যে কর্নেল ক্লাইভের প্রতিজ্ঞাপত্র।

'I Colonel Clive, Sabut Jung Bhadur, Commander of the English Land Forces in Bengal do solemnly declare in presence of God and our Saviour, that there is peace between the Nabob Seerajah Dowla and the English. They the English will inviolably adhere to the Articles of the Treaty made with the Nabob : That as long as he shall observe his agreement the English will always look upon his enemies as their

enemies and whenever called upon will grant him all the assistance in their power.'

—12 February, 1757.'

ক্লাইভের ছদ্মবেশী বাণিজ্যতরণীর নামটি যে কী অভিনব। অনেকটা কবিতার কাছাকাছি এই 'সপ্তডিঙ্গা মধুকোষ'। আহা, ভৈরবী কবিতার কী বিচিত্র ছল। বাহিরে শান্তশীল বাণিজ্যের মূর্তি আর অন্দরে মারণযুদ্ধের গর্জন অপেক্ষায় তোয়ের হয়ে থাকা গোলা, বন্দুক, কামান। এ দেশে এখন এক বিকৃত বলিদান-পর্ব সমাগত। সেই বিচিত্র বলিদানের ঘোর মন্দ্রস্বর মাটির তলে ধূমায়িত হচ্ছে। সেই ধোঁয়ার প্রতিপক্ষ এক মহাজ্যোতির্ময় নিষেধ সত্তা, পুনঃ পুনঃ বারণ করছে।

বলিদানং বিনা দেব্যা হিংসা সর্বত্র বর্জিতা। বলিদান ব্যতিরেকে আর সর্বত্র হিংসা বর্জন করবে।

ওধারে কুমারীকল্প বলে বসে আছেন,
ছাগে দত্তে ভবেদ্বাগ্মী মৎসে দত্তে কবির্ধ্রুবম্।
মহিযে ধনবৃদ্ধিঃ স্যান্মৃগে ভোগফলং লভেৎ।।
খগে দত্তে সমৃদ্ধিঃ স্যাদ্ গোধিকায়াং মহাফলম।
নরে দত্তে সমৃদ্ধিঃ সাদিষ্টসিদ্ধিসিদ্ধিরনুত্তমা।।

ছাগ বলিদান করলে বাগ্মী হয়, মৎস বলি দিলে নিশ্চয়ই কবি হয়, মহিষ বলি দিলে ধনবৃদ্ধি হয়, মৃগ বলি দিলে ভোগফল লব্ধ হয়, পক্ষী বলি দিলে সমৃদ্ধি হয়, গোধিকা দিলে মহাফল লাভ হয়, নরবলি প্রদান করলে সমৃদ্ধি ও অনুত্তম ইষ্টসিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই বিচারটির সুমুখে দাঁড়িয়ে রামপ্রসাদ মনে ভাবেন, তিনি তো মৎস বলি কখনও দেননি। তার বদলে মৎস ভক্ষণ করে থাকেন। অতএব বিধান মোতাবেক তাঁর কবি হওয়া হল কৈ!

শেষত, নরবলি প্রদান করার মহাফল বুঝি দেশে ঘটে চলা বিপর্যয়ের পাকে পাকে জড়িয়ে আছে। সমৃদ্ধির বদলে ক্রমাগত ধ্বংস আর অনিষ্টের প্রবল দাপট ধূমায়িত হয়ে চলেছে।

জীবন ও কবিতার সঙ্গে এমত কুলাচার বিধানের যে কী আশমান-জমিন কটাক্ষ। যেমন বিড়ম্বিত শ্রমপাত এখন এই বিদ্যাসুন্দর বরাবর। তবে হ্যাঁ, কবিতায় তো কোনও গরল নেই। বরং আনন্দ আছে। সেই আনন্দে, রতিসুখের-চেয়েও মহাসুখে কিছু আগে যে-ছন্দপাত ঘটে গেল তাতে কিঞ্চিৎ সুখানুভব ঘটে বৈকি।

কাতর কামিনী বদন যামিনী
নাথ মলিন হি ভেল।
মুকুতা জৈসন সোহত ঐসন
সরম জল উপজেল।।...
কণতি পরভৃত মনহি কৃতহৃত
উয়ল নিরমল ছন্দ।
মধু বিভাবরী হে বর সুন্দরী
মলয়নিলগতি মন্দ।।

রামপ্রসাদ এখানে এসে নিজেই চমৎকৃত হন। কিয়ৎ আগে 'শ্রমজল' অর্থাৎ ঘাম কথাটি লেখা হয়েছিল। আর এখানে লেখা হল 'সরম জল'। আপাত গোপনীয়, রমণীর অতিলজ্জার আড়াল এই কথাটুকু কী খাসাই না উতরে গেল কবির কলমে।

এমনই হয়। কবিতায় কলম বাইতে বাইতে ক্বচিৎ এমন কিছু উপহার ভেসে আসে। তখন আর কিছু না হোক একটুকরো আনন্দ পাওয়া যায়। এ আনন্দের ভিন্ন কোনও নাম নেই। যেমন আনন্দ তোটক ছন্দে যখন লেখা হল—

শ্রমনীরে শরীর সমস্ত ভাসে।
কবি ধীর সমীর সুধীর ভাষে।।
কবিরঞ্জন তোটক ছন্দ ভনে।
করুণাঙ্কুরু কালি সুদীন জনে।।

আসলে বুঝি রামপ্রসাদের জীবনে এই জল কথাটি বহুতর উপসর্গে বিরাজ করে। তার কারণ হয়তো এই গঙ্গার দেশে বসবাস। এই গঙ্গা প্রসাদী কবিতা ও সংসারযাপনকে কীরকম বেড় দিয়ে ঘিরে রেখেছেন। গঙ্গার এই নিয়মেই বুঝি মেয়ে পরমেশ্বরীর বিয়ের কথা পাকা হয় ত্রিবেণীতে। সম্বন্ধের জোগাড়যন্ত্র সবই করেছে ভজহরি। সঙ্গে দোয়ারকি দিয়েছে রামতনু দিগরে।

পাত্রটি ভাল। চতুষ্পাঠীতে পড়ে-শুনেও বিদ্যাব্যবসায় নামেনি। তার বদলি সে এলাকায় ছোটখাটো ব্যবসাপাতি করছে। বিশেষ করে জিরাট-বলাগড় অঞ্চলে সে নাও কারিগরদিগে হরেক কাঠ জোগান দেয়। প্রসাদ জানেন, বাংলার অতি প্রাচীন এই নৌকা শিল্পের কখনও দাঁড়ি পড়ে না। ফলে ভাবী জামাতা বাবাজীবনও তার ভবিতব্যটি দিব্য গড়ে তুলতে পারবে।

কন্যার ভাবী বাসরসজ্জার বর্ণনা তো বিদ্যাসুন্দরে বলা হয়েছে। কী আশ্চর্য, এই কবিতামালা রচনার কালেই পরমেশ্বরীর বিবাহের খপর পোক্ত হল।

সুন্দরীর সহচরি ভালো জানে চর্য্যা।
রতনমন্দিরে করে মনোহর শয্যা।
দুই দুই তাকিয়া খাটের দুই পাশে।
রূপবতী বিদ্যাবতী মনে মনে হাসে।।

ঠিক এইখানে, এই বিদ্যাসুন্দর আর দেশের অনতি ইতিহাসের দোলাচল দুলদুল করে গঙ্গাবক্ষে। রামপ্রসাদের বক্ষপটে সেই তরুণ নবাবটির ছল ছল চক্ষু সহকারে গীত শোনার শান্ত সন্ধ্যাকালটি ভাসতে থাকে। ভেসে যায় কালের কবাট বুকে শান্তি কথাটি। কে আদপে শান্তিপ্রিয়, ইংরোজ না সিরাজ।

নদীর জলে ওয়াটসনকে লেখা নবাবের এই সেদিনের এক পত্র দোল খায়। নবাব লেখেন, 'তোমরা হুগলি লুঠপাঠ করেছে এবং আমার প্রজাবর্গের সঙ্গে লড়াই করেছ—এ কাজ নিশ্চয়ই সওদাগরের উপযুক্ত হয়নি। অগত্যা আমায় মুরসিদাবাদ ছেড়ে হুগলির নিকটে আসতে হয়েছে।.. এই প্রদেশবাসী ইংরোজরা যদি বণিকের মতো ব্যবহার করে, আদেশ পালনে যত্নশীল থাকে এবং আমাকে উত্যক্ত না করে, আমি তাদের ক্ষতির কথার বিচার করে তুষ্টিসাধন করব—এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পার।'

'তুমি খ্রিষ্টিয়ান। বিবাদ-সঞ্জীবিত না রেখে শান্তি সংস্থাপনে বিবাদের মীমাংসা করে

ফেলা কত কল্যাণকর তা অবশ্যই জ্ঞাত আছ। কিন্তু তোমরা যদি কোম্পানির অন্যান্য বণিকের বাণিজ্য স্বার্থ বিনষ্ট করে যুদ্ধ করতে দৃঢ়সংকল্প হয়ে থাক, তাতে আমার কোনও অপবাধ নাই। সেরূপ সর্বনাশজনক যুদ্ধকোলাহলের অশুভ ফল প্রত্যাহৃত করার উদ্দেশ্যেই এই পত্র লিখছি।”

সিরাজের এই শান্ত উদার পত্রখানি আজ বিষণ্ণ গঙ্গার স্রোতে ছলছলাৎ করে। এই নবীন নবাব বুঝতে পেরেছেন ক্রমাগত যুদ্ধ মানে দেশের সর্বব্যাপী অহিত ও অকল্যাণ। দেশের ধারক শিল্প ও বাণিজ্যের বিপুল ক্ষতি। সিধে কথায় একের অনাচারে দশের সর্বনাশ। হায়, দেশমাতার মনে যে কী আছে।

দেশে এখন এক বিরল সমাবেশ। একধারে নবাব, আর ধারে ক্লাইভ, আর মধ্যখানে ওয়াটসন। এই তৃতীয় ব্যক্তি সিরাজের দরবারে এক কুচক্রি কাঁটা। গত ৭ ফেব্রুয়ারি আলিনগরের সন্ধি ঘটল। আর ঠিক তার একমাস পর ৭ মার্চ ইংরাজ চন্দননগরে শিবির গাড়ল। নবাবের সাক্ষাতে একদিন বাইবেল চুম্বন করে প্রভু খ্রিষ্টের পবিত্র নাম স্মরণ করে ক্লাইভ-ওয়াট্সন যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করেছিলেন, তা ভোরের শিশিরের মতো মিলিয়ে গেল। ইতিহাসে এই যুদ্ধের নাম চন্দননগরের অলৌকিক যুদ্ধ। ফরাসিরা পরাস্ত হয়ে কেউ পালাল, কেউ-বা নির্বিকাব প্রাণ হারাল। সংবাদ পেয়েও সিরাজ ফরাসিদের রক্ষা করতে পারলেন না। তিনি তখন আহমদ শাহ আবদালির আক্রমণ-ত্রাসে বিভ্রান্ত। তবু তিনি চেষ্টা করলেন ফরাসিদের রক্ষা করতে। কিন্তু মহারাজা নন্দকুমারের মতো নিমকহারাম নবাবকে পথে বসালেন।

আহা, ক্লাইভের কী অপার মহিমা! তিনি নিজে লিখে রাখলেন কী কটাক্ষ কৌশলে চন্দননগর ধ্বস্ত করা হল।

'At a Select committee, held 10th April, 1757

Present

Colonel Robert Clive, Major Kilpatrick, J. Z. Holwell Esqr.

We the servants of East India Company should always be grateful to that noble minded and wealthy native merchant of calcutta-OMIC-HAND. It was though his agency that we succeded to secure the assistance and co-operation of Dewan Nun-Coomar Phoujdar of Hooghly. If these troops were not withdrawn, it would have been highly improbable to gain the victory.'

বিদ্যাসুন্দর-এ যুদ্ধবিগ্রহ হয় না। এখানে দুই নর-নারীর রহস্যময় জীবনযাপন। বিদ্যার গর্ভধারণ সখীগণের নানা যুক্তি থেকে ধরে রানির বিদ্যাপ্রতি ভৎর্সনা, রানি-সহ বিদ্যার বাক্‌চাতুরী, সখীগণের বাক্‌ছল, কোটালের ভূমিকা ও বিনয়, চৌর্য সংবাদার্থ কোটালিনির অন্তঃপুরে গমন ও রানির সঙ্গে কথোপকথন, কোটালের চোর অন্বেষণে সজ্জা...

সাজে কোতোয়াল লে খঞ্জর ঢাল
দো আঁখিয়া লাল সোবান পতঙ্গ
চড়ে গজতুঙ্গ ঘুমাও ত' অঙ্গ
সেতাব করি।...
কহি কহে আঁট ইসে আগু হাঁট

মুড়ায়ে গা ঝাঁট হারাম কি হাড়
আভি গাঁড় ফাড় মারো উস্‌কা গাঁড়
দোহাই তেরি।।
কহে কবি রাম হোঁ পামর হাম
তারা তেরে নাম পড়া হোঁ লাচার
ওহি পদ সার মুঝে কর পার
শমন কো ডরি।।

ছেষট্টি

শ্রীকবিরঞ্জনে ভণে কবিতা অদ্ভুতা।।

সত্যই অদ্ভুত এই কবিতাকলার রীতি। সে যেমন কালী আধারিতা ছটা ধারণ করে, তেমনই আরবি, ফার্সি, সংস্কৃত ও বাংলা মিশেল বিচিত্র বিদ্যাসুন্দরী লীলা প্রকটিত করে। একজন কবিকে বুঝি এখানে নিঃসহায় বনে যেতে হয়। তাঁর লীলাকলম তাঁকে বইয়ে নিয়ে চলে অপরিজ্ঞাত কোনও এক দেশে।

সেই অলীক দেশখানি এখন বুঝি মূর্ত হয়ে বসে আছে কালের দুয়ারে, যার নেপথ্য সুর কেবল যুদ্ধ আর যুদ্ধ। বাংলার নবাবের আকাশসমান ললাটে এখন ত্রিপুণ্ড ত্রিশূলের ছায়া আঁকা। পরপক্ষে ইংরাজ ক্লাইভ ও তাঁর দলবল। মধ্যখানে নবাবের নিমকহারাম বান্ধবের পাল।

বিদ্যাসুন্দরে—শহরে চৌরধরনার্থে কোটালের দৌরাত্ম্য, চৌর অন্বেষণ ইত্যাকার কক্ষ বেয়ে অবশেষে অথ চৌর্য ধরন।

কেহ বলে সামান্য মানুষ নহে চোর।
বিদ্যা বলে পরাণ-পুতুলি বটে মোর।।

অতঃপর সুন্দরের বন্ধন দৃষ্টে বিদ্যার খেদোক্তি, কোটালের প্রতি বিদ্যার বিনয়োক্তি, চৌরদৃষ্টে রানির বিদ্যার প্রতি বিলাপাদি পার হয়ে রাজা সহ চৌরের ব্যঙ্গোক্তি।

রাজা বলে নিয়া যাও মশানে বাঘাই।
কবি কহে গোটা দুই বচন শুনাই।।

আহা, এ পক্ষে মহারানি ভবানী দেবোত্তর ভূমিদান পত্রসমূহে বরাবরই যে বচন লিখে রেখেছেন তার কথা কী এই যুদ্ধকামী দু-তরফ মনে রেখেছে।

দেবস্ব হারিণো যে চ যে চ তদ্বিঘ্নকারকঃ।
নরকান্নিষ্কৃতি স্তেষাং নাস্তি কল্পশতৈরপি।।

দেবস্ব হরণকারী বা তদ্বিঘ্নকারক জন শতকল্পেও নরকের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে না।

আদপে এ দেশে দেবস্ব বা রাজস্ব সকলই এক মহিমার। ভূমির তত্ত্বকোষ বুঝি সেই কথাই বলতে চায়। রাজার ভূমি চষে যে-প্রজা সে-ও তো ওই মাটির অন্ন গ্রহণ করে। সেই ভূমির প্রাণৌষধি জলের বদলে কখনও রক্ত মানায় না। শোণিত স্রোতের লোনা স্বাদ মাটি সইতে পারে না। তার কাছে সকল জীবরক্ত স্বাদ একাকার। এমনকী নবাবকে ঘিরে থাকা তাবৎ কুচক্রীর রক্তও।

অবশেষে ওয়াটস্ এক নৈশকালে অবগুণ্ঠিত অবস্থায় শিবিকাযোগে মীরজাফরের অন্দরমহলে উপস্থিত। সেই সাহেবের সম্মুখে মীরজাফর পরম পবিত্র ধর্মপুস্তক কোরান মাথায় রেখে, এক হস্ত প্রাণাধিক বড় ছেলে মীরনের মাথায় স্থাপন করে, অপর হাতে কলম ধরে স্বাক্ষর করলেন, 'ঈশ্বর এবং পয়গম্বরের দোহাই দিয়া শপথ করিতেছি, যতক্ষণ প্রাণ ততক্ষণ এই সন্ধিপত্রে অঙ্গীকার পালন করিতে বাধ্য থাকিলাম।'

এই গুপ্ত সন্ধিপত্র লয়ে মীরজাফরের অনুচর ওমর বেগ জমাদার কলিকাতায় উপনীত হল। ক্লাইভ যুদ্ধের জন্য তোয়ের হয়ে নবাবকে পত্র লিখতে বসলেন।

নবাবের কানে গেল গুপ্ত সন্ধিপত্রের কথা। তিনি মীরজাফরকে কয়েদ করবার আয়োজন করতে লাগলেন। কিন্তু মীরের বাড়ি গোলাবারুদে পূর্ণ। অতএব তাকে ধরা সহজ হল না। ওয়াটস্ বেগতিক দেখে বায়ুসেবনের ছল করে রজনীযোগে অশ্বারোহণে পলায়ন করলেন। সিরাজ সেনাপতি ওয়াট্স্নকে পত্র লিখতে বসলেন। ইতিমধ্যে নবাবি ছাউনি পড়ে গিয়েছে পলাশির প্রান্তরে।

'...ওয়াটস্ এবং কাশিমবাজারের কুঠিয়ালরা বায়ু সেবনের ভান করে রজনী যোগে পলায়ন করেছে। ইহা প্রতারণার স্পষ্ট লক্ষণ,—সন্ধিভঙ্গের পূর্বসূচনা। তোমার অজ্ঞাতসারে যে এ রূপ কার্য সংঘটিত হয় নাই, তা আমার বিলক্ষণ বোধ হচ্ছে। এরূপ যে ঘটবে তা আমি চিরদিনই আশঙ্কা করতাম। তোমরা বিশ্বাসঘাতকতা করবে বলেই আমি পলাশী হতে ছাউনি উঠিয়ে আনতে সম্মত হতাম না।"

"যাহা হউক, আমার দ্বারা যে সন্ধিভঙ্গ হল না এ জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমরা ধর্ম প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, ঈশ্বর এবং পয়গম্বর তার সাক্ষী। যিনি প্রথমে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবেন, তিনিই সেই মহাপাপের শাস্তি ভোগ করবেন।'

চতুর্ধারে রাজবিপ্লব। সেই মহাপ্লাবিত বারিধিতে সিরাজের সিংহাসন বটপত্রের মতো ভাসমান।

মনে মনে নিরতিশয় বিপর্যস্ত সিরাজ বুঝতে পারলেন, এখন তাঁর একমাত্র কাজ যে কোনও উপায়ে সিংহাসন রক্ষা করা। তিনি পরামর্শের জন্য পাত্র-মিত্র-অমাত্য সকলকে ডাক পাঠালেন। ওধারে ইংরাজ সিরাজের এই গুরুতর পত্রখানি নিয়ে, বিশেষ করে তার শেষাংশ নিয়ে, নিয়তির মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। ফারসি পত্র ইংরাজের মননের কাছে চাপা বিস্ফোরণের গর্জন ধ্বনিত করল।

'I praise God, that the breach of the treaty has not been on my part : God and his prophet have been witnesses to the contract made between us and whoever first deviates from it will bring upon themselves the punishment due to their actions.'

কিন্তু কূট দাবার চালে পটু ইংরাজ ইতিহাসের খাতায় সিরাজকে বিশ্বাসঘাতক ও প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী হিসাবে লিখে রাখল।

'The Nabob behaved with all the faithlessness of an Indian statesman and with all the levity of a boy whose mind had been enfeebled by power and self-indulgence. He promised, retracted, hesitated, evaded.

বিদ্যাসুন্দরে অতঃপর সুন্দরের কালীস্তুতি। এখানে এসে রামপ্রসাদ বুঝি পথ পান, বর্ণবিভাজনের হাত ধরে। ফলে 'ক' বর্ণ হতে যাত্রারম্ভ।

'ক' : কৃতাঞ্জলি কহে কবি কালি কপালিনি।
কালরাত্রি কঙ্কালমালিনী কাত্যায়নি।।...
'ঘ' : ঘনাঘনরূপা দেবী ঘননিনাদিনি।
ঘেরিল কোটাল বেটা ঘোর শব্দ শুনি।।...
'চ' : চামুণ্ডা চণ্ডিকা চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনি।
চতুর্দল ক্রমে চক্রভয়বিভেদিনি।।
'জ' : জন্মভূমি জননী জনক জনার্দন।
জাহ্নবি জকার পঞ্চ দুর্লভ বচন।।...
'ঝ' : ঝিকিমিকি খড়গ করে ঝেকে উঠে ঢালী।
ঝাটা পড়ে গায় ঝাট রক্ষা কর কালী।।..
'ট' : টঙ্কার ধনুক শব্দ টোটাই না বলে।
টল টল কাঁপে দেহ টাঙ্গি মারে গলে।।..
'ঢ' : ঢক্কা বাজে ঢোল বাজে ঢেকা মারে ঢালি।
ঢঙ্গ বেটা ঢেমন বলিয়া দেয় গালি।।.
'র' : রণরসে রত রমা রুক্মিনী রোহিনী।।...
রাক্ষসসংহারকর্ত্রি রাঘবরমনি।।...
'ল' : লহ লহ লোলজিহ্ব ললিতবদন।
লীলায় বধিলা যত দুষ্ট দৈত্যগণ।।
'হ' : হুত্যা হই হুতাশে হিংসার তুমি মূল।
হরপ্রিয়ে হৈমবতি হও অনুকূল।।
হা করিয়া হান হান কাট কাট ডাকে।
হুঙ্কারে হিয়া ফাটে পড়েছি বিপাকে।।

এতক্ষণ এই বর্ণ বিভাজনের পথ ভাঙতে ভাঙতে কবির চিত্তে কেবলই বণদামামা বেজে চলেছে। লেখনী বুঝি আর নিজ আয়ত্তে থাকছে না। কবিতা নাম্নী কালিকায় দনুজদলনী দাক্ষায়নী মূর্তি লেখনী বরাবর নৃত্য করে। দেবীর রোষানল ভারি তীব্র। তিনি শ্মশানবাসিনী এবং রাক্ষস সংহারকর্ত্রী। তিনি ডাকিনী সহিত মহাশ্মশাসনে উরেন। তিনি খল খল হাস্যনিনাদিনী এবং খেচরপালিনী। তাঁর চঞ্চল পদ ভরে বিষধর ফণী চমকায়। এই বিশ্বজননী দিগম্বরী, দনুজদলনী ও দুর্গতিহারিণী। তিনি বিশ্ববিভূদারা, ভুবনপালিনী ও মহেশ মোহিনী। এই জননী সদাই রণরসে রত; যোগেন্দ্রঘোষিতা, যজ্ঞসমূলঘাতিনী। তিনি যোগরূপা রাঘবরমণী। লহ লহ লোলজিহ্ব এই জননীর ললিতবদন ও তিনি শিবে শবাসনা।

শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই।।

অতঃপর সুন্দরকে কালিকার অভয়দান ও মশানে মাধব ভট্টের আগমন হতে আরম্ভ করে আরও কিছু অধ্যায়যাপন। কবির বিমোচন শ্রবণে রানির বিদ্যার প্রতি বিনয়---এ স্থলে এসে কবির লেখনী অকস্মাৎ 'একাবলীছন্দ' দেখতে পায়।

বাঁচিল সুকবি সুন্দর চোর।

সাধুচিত্তে নাহি সুখের ওর।।
বিদ্যার গোচর সকলে কহে।
কমলিনী কথা মিথ্যা এ নহে।।...
হাসি হাসি কহে যতেক আলি।
সকলি কেবল করেন কালী।।
কাতর শ্রীকবিরঞ্জনে কয়।
তরাও তারিণী শমন ভয়।।

এইভাবে পদ হতে পদান্তরে যেতে যেতে বিদ্যাকর্তৃক বারোমাস বর্ণন।

দিবা যায় গৃহনাটে রজনীতে বুক ফাটে
আবেশে বালিশ চাপে কোলে।
যে সুখ পতির সঙ্গে প্রসঙ্গ কি তার সঙ্গে
ঘৃতের সুস্বাদ কোথা ঘোলে।।...
হেদে প্রাণনাথ কবি মকরে প্রখর রবি
এই মাস বিখ্যাত ভুবনে।
প্রাতঃস্নানে মহাপূণ্য করে যেবা সেই ধন্য
পারে লোক জিনিতে শমনে।।...
একাল বিলম্ব কর পশ্চাতে যাইবা ঘর
দাসীবাক্যে কান্ত হও শান্ত।
শ্রীকবিরঞ্জনে কহে গমন বারণ নহে
দেশে যাওয়া হইল নিতান্ত।।

রামপ্রসাদের দেশে যুদ্ধ-নির্ঘোষ আর বিদ্যাসুন্দর এ দুটি ঘটনাই একই লগ্নে এসে থমকে দাঁড়ায়। কবির কাব্যপাত এখন প্রায় শেষপথে উপনীত হলেও যুদ্ধের ছন্নমেঘ এখন নিবিড় থেকে নিবিড়তম। এই গ্রীষ্মদিনের আকাশে কখনও ক্কচিৎ বসন্তের রক্তনির্ঘোষ উঁকি দিলেও, বাহিরের আর আর সংসার বলছে ভিন্ন রঙ্গ। সেই রঙ্গের এক কানাচে মেয়ে পরমেশ্বরীর বিবাহ আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে। সে সবই সামলেছে ভজহরি-রামতনু দিগরে। দিন ধার্য হয়েছে আগামী আষাঢ় মাসের ১২ তারিখ। এখানে আবার পঞ্জিকাকার বলছেন, এই মাসে বিবাহ হলে কন্যা ধনধান্য ভোগরহিতা হয়।

এ প্রশ্নে রামপ্রসাদ মনে মনে সংগোপনে হাসেন। এই পরমেশ্বরী তো দরিদ্র বাপের সংসারে এতকাল কষ্টেই বাড়ল। লোকে ভাবে মেয়ের বাপের সঙ্গে রাজারাজড়ার খাতির। কিন্তু আদপে যে নামে পদ্মদিঘি হলেও ঘটি ডোবে না। এখন কালের হাতে সমর্পণ করা ছাড়া আর কী বা গতি। এই তো সংসারের নিয়ম। চারাগাছ মেয়ে বাপ-মা'র বুক খালি করে অপরিচিত সংসারে যেয়ে ঢোকে। ক্রমে একদিন সে ওই সংসারেরই বৃক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। তার শোণিত স্রোতে নবনূতন প্রাণ মুকুলিত হয়।

কোথায় যেন পড়া হয়েছিল—সদা বক্রঃ সদা ক্রুরঃ সদা পূজামপেক্ষতে। / কন্যারাশিপ্রিয়ো নিত্যং জামাতা দশমো গ্রহঃ।।

নবগ্রহের যেমন বক্রতা, ক্রুরতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য আছে তেমনই এই জামাতা হলেন সেই যাবতীয় গুণধারী। তিনিও একটি গ্রহস্বরূপ।

এ কথা মনে হতে প্রসাদ মনে মনে গা ঝাড়া দেন। মন বলে, হায়—জামাতা কখনও কী পুত্রবৎ হয় না।

এবার—বিদ্যার শ্বশুরালয় গমনার্থ মাতৃনিকটে প্রার্থনা। তৎপরে রাজার প্রতি বিদ্যার প্রবোধবচনাদি সম্পন্নান্তে এবার বুঝি সত্যই শেষের কূল।

সুন্দরের দক্ষিণকালিকা মূর্তি সংস্থাপন এবং শব সাধনোদ্‌যোগ। এ পরিচ্ছেদে বিস্তারিত বিবরণ ঘটালে—গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি, গানে হবে ব্যস্ত। অতএব সোজাসুজি শবসাধন। এখানে রামপ্রসাদ কল্পনার পাখ ছেড়ে জীবনের বাস্তবতার কাছে হেঁট হন। কেননা এই সাধনরীতি তাঁর নিজদেহে সাধা আছে। প্রসাদ জানেন, এই বীবসাধন কুজ অথবা মঙ্গলবারে রাত্রির এক প্রহর গতান্তে করণীয়। পূজোপকরণ বলি, সামিষান্ন, গুড়, ছাগল, সুরা, পিষ্টক, পায়স, হরেক ফল ও স্ব স্ব কল্পোক্ত নৈবেদ্য চিতাস্থলে আনয়ন করে সাধক শস্ত্রপাণি আত্মতুল্য গুণবিশিষ্ট হবেন।

অতএব—

বীরার্দন মন্ত্র কবি লিখিল ভূতলে।
যে চাএ বচন কহে মহা কুতূহলে।।...
অঘোর মন্ত্রেতে শিখা বান্ধে ততক্ষণ।
সুদর্শন মন্ত্র করে হৃদয়ে রক্ষণ।।.
মূল মন্ত্রে শবানন পূজে মহাকবি।
ঘোটকারোহণ ক্রমে বৈসে যেন রবি।।

এই শবসাধনে নব শিবত্ব পেয়ে যায়। অবশেষে তাই ঘটেও। 'পুত্র পদ্মনাভকে রাজ্য দিয়া বিদ্যাসুন্দরের স্বর্গারোহণ' পর্ব রচিত হয়। এবং লেখনী দাঁড়ি টানে 'অষ্টমঙ্গলা' দিয়ে।

নমো বিশ্ববিভাবিনী দক্ষযজ্ঞ বিনাশিনী
জনমিলা পর্বতেশ ঘরে।
কার্তিকেয় জন্মহেতু ভগ্নরাশি মীনকেতু
তদবধি অনঙ্গাখ্যা ধরে।।...
...কহে কালিকার পদে
কৃপাময়ী কুরু দয়া।।

পরিশেষে রামপ্রসাদ টেনে টেনে লেখেন, 'সমাপ্তশ্চাযং গ্রন্থ:'।

এধারে ভাবী ইতিহাসের খাতায় লেখা হয়—'জামিন উসকে ওহি দোনো মহাজমান, মজকুরা হয়ে।'

হায়, মীরজাপর কোরান স্পর্শ করেও ইংরাজদের বিশ্বাস জন্মাতে পারেননি। তিনি যখন ইংরাজের সঙ্গে সন্ধিপত্র দাখিল করেন, এমনকী মস্তকে কোরানধাবণ ও নিজ পুত্রের মস্তকে হাত রাখেন, তখন উমাচরণ ও জগৎ শেঠকে জামিন থাকতে হল।

রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দর রচনান্তে যেন আপন ঘরে ফেরেন। আর অমনি নিচু আর বিলম্বিত স্বরে গুনগুনান,

আমার সনদ দেখে যাবে।
আমি কালীর সুত, যমের দূত।
বল গে যা তোর যম রাজারে।।

সনদ দিলেন গণপতি, পার্বতীর অনুমতি,
আমার হাজির জামিন ষড়ানন,
সাক্ষী আছে নন্দীবরে।।
সনদ আমার উরস্ পাটে,
যেন্নি সনদ তেন্নি টাটে,
তাতে স্ব অক্ষরে দস্তখৎ,
করেছেন দিগম্বরে।।

সাতসকালে দাদুর ঘরে রেডিওয় দেশাত্মবোধক গান। বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনতে বেশ লাগে। বাইরে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা স্বভাব, বন্ধ জানলার ওপারে। সাবেক খড়খড়ির ফাঁক গলে ভোরবেলা থরথর করছে। রেডিওয় সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় গাইছেন, ভারতকন্যা জাগো, জাগো শক্তিরূপে...। পরে পরেই হেমন্তবাবু গেয়ে উঠলেন, এ মাটি সোনার মাটি, এই দেশেতে সোনা শুধু ফলে—সে কথা ইতিহাসে বলে.. ।

এইসব গানের চারধার ঘিরে রয় মস্ত হিমালয়। ধবধবে সাদা বরফের কোনও অন্ত নেই। হু হু কনকনে হাওয়া ঘূর্ণি চক্কর দিচ্ছে প্রকাণ্ড সব শিখরের বুক বরাবর। বহুদূর থেকে সূর্যের লালচে ঘোর জানান দিচ্ছে—এবার আমি এলাম বলে। তারই মাঝখানে, সীমান্তের এপারে ওপারে রাতজাগা কামান, মর্টার, ট্যাঙ্কের ঠাণ্ডা নলগুলো একে অন্যের দিকে তাক করে আছে তো আছেই। বরফের নীচে ট্রেঞ্চগুলোব নিঝুম খোপে খোপে ওয়ারলেস বিপ বিপ করছে। এইসব ঘিরে আর জড়িয়ে মড়িয়েই সন্ধ্যা-হেমন্ত 'দেশবন্দনা' করে চলেছেন। পণ্ডিত নেহরু দিল্লির তিনমূর্তি ভবনে প্রাসাদের লনে শীর্ষাসন প্র্যাকটিস করছেন। মেয়ে ইন্দিরা তাঁর ছেলেদের নিয়ে ফুলবাগানে হুটোপাটি করছেন। সকালবেলা ফুটন্ত গোলাপের আভা তাঁর তরতাজা চোখে মুখে।

আমার কানুবাবার বাগানে অজস্র গোলাপের মধ্যে একটির নাম প্রিয়দর্শিনী। বিরাট আকৃতির সুন্দরী গোলাপ। কিন্তু কোনও গন্ধই নেই। আমার গিরিনন্দিনী বড়মা বারান্দায় টাঙানো ছবির ভেতর থেকে হাসি মুখে বলছে, আগে দর্শনধারী, পরে গুণবিচারি।

রেডিওর 'দেশবন্দনা' ফুরোয়। যেহেতু আজ শুক্রবার, তাই এখন গান্ধিচর্চা। বিজনবালা ঘোষ দস্তিদার ছাড়া কণ্ঠে গেয়ে উঠছেন, বন্ধুগণো মিল কহো প্রেমসে, রঘুপতি রাঘব রাজারাম—। এবপর কে একজন গান্ধি বিষয়ে বললেন। তারপরেই গান্ধিজি'র প্রার্থনান্তিক ভাষণের অংশবিশেষ। প্রথমে রেকর্ডের সামান্য খ্যাড়খেড়ে। তারপরেই খুব নিচু আর ফিসফিসে গলায় একজন বৃদ্ধ হিন্দিতে কী সব বলে যেতে লাগলেন। ভাষণ আবার এরকম হয় নাকি। তিনি যেন আপন মনে নিজেকে শোনানোর স্টাইলে কিছু বলে চলেছেন। ভারি পলকা আর রয়ে সয়ে খুব আস্তে আস্তে কিছু একটা বক্তব্য দাঁড় করাবাব চেষ্টা করছেন। মাঝে মাঝেই কথা আটকে আটকে যাচ্ছে। খানিক আমতা আমতা। আবার সেই আত্মবিলাপ জাতীয় ভাষণ। আমার কেন জানি মনে হয়—গান্ধিজি এইমাত্র গরম গরম দু-খানা রুটি আর ঢেঁড়শের তরকারি খেয়ে এসেছেন। কথা বলতে বলতে গালের পাশে দু'চারটে ঢেঁড়শের দানা পাকলে নিচ্ছেন।

কানুবাবা ভেতর বাগান থেকে হাঁক ছাড়ে, রামশরণ...রামশরণ। সেই কখন এক কাপ কড়া করে চা চেয়েছি।

রামশরণ কাকা রান্নাঘরে গোঁফ গলায়, বলি হাঁ বউদি, চা কী হোবে না হোবে না।

মা বলে, ভিজতে দিয়েছি। কড়া না হলে—

দাদু কুয়োতলায় ঝপাং ঝপাং জল ঢালেন আর লাইফবয় রগড়াতে রগড়াতে তেড়ে গীতা আওড়ান, ন চ শ্রেয়ে হনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে। ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজং সুখানি চ।।

হে কৃষ্ণ, যুদ্ধে আত্মীয়গণকে হত্যা করিলে মঙ্গল হইবে, ইহা অনুভব করিতেছি না। আমি যুদ্ধে জয়লাভ চাহি না, রাজ্য এবং সুখভোগও কামনা করি না।

দাদু গলা খুলে বলছেন, হুঁ হুঁ বাবা, এর নাম অর্জুনবিষাদযোগ। মহাভারত, মহাভারত। একখানা বই লেখা হল বটে।

রামশরণ কাকা বলে, লাও বাবা, ঘরে—বাইরে আখুন যুদ্ধ। দাদা আবার জলদি চা না পেলে তুলকালাম হবে।

পাশের বাড়ির উন্মাদ বৃদ্ধ রায়চৌধুরী জমিদার অট্টহাস্য করেন, "হা হা হা, এখনও বুঝতে পারোনি। লক্ষ্মীঠাকুর, হরির ছেলে। বড়শের জমিদার লক্ষ্মীকান্ত রায়চৌধুরী। 'কালঃ সৃজতি ভূতানি কালঃ সংহরতি প্রজাঃ।' শহরের অনতিদূরে দক্ষিণ অঞ্চলে কতকগুলি গ্রামের নাম বেহালা। খিদিরপুরের পোল হতে তিনটি প্রশস্ত রাজমার্গ তিনদিকে প্রবাহিত হয়েছে। পশ্চিমস্থ পথে মুচিখোলা প্রভৃতি কাটিগঙ্গার তীরস্থ নির্জন সুতরুশোভিত উপবনোপম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বসতি আছে। এক্ষণে লখনউ রাজ্যের সিংহাসনচ্যুত নবাব ওই দিকে বাস করেন ও তাঁহার বহুলকর্মচারীগণ ওইদিক অধিকার করেছে।"

দাদু কানখাড়া করে শোনেন। তারপর বলে ওঠেন, বাঃ। খাসা মেমরি তো। প্রতাপচন্দ্র ঘোষ মশাইয়ের 'বঙ্গাধিপ-পরাজয়' থেকে হুবহু কোট কল্লেন যে। এ উপন্যাসটি যদ্দুর মনে পড়ে প্রথম প্রকাশিত হয় বঙ্কিমবাবুর আমলে, ১৮৬৯ সালে। গ্রন্থকার বইটি ডেডিকেট করেছিলেন তাঁর বাল্যবন্ধু কালীপ্রসন্ন সিংহিকে।

বাগানের নারকোল গাছের ডগে রোদ পড়েছে। ডাবের কাঁদি ঝুলছে। ঝুলছে সেই কবে কার প্রতাপ ঘোষের উৎসর্গপত্র—'আপনি বঙ্গভাষার প্রচারক আবার আমার বাল্যকালের আত্মীয়, বিশেষে ওই রায়গড়ে রাতদিন একত্রে বাল স্বভাব-সুলভ নিরীহ ক্রীড়া করিয়া অতীব গ্রীষ্মের প্রখর সূর্য্যতাপ হইতে শ্রান্তি পাইয়া যথেষ্ট আনন্দ পাইয়াছি। এই গ্রন্থখানি আপনাকে অর্পণ করিলাম। গ্রন্থকার। ২ আশ্বিন, সন ১২৭৫।'

বেহালা। বেহালা। আমাদের বেহালার দাদু সেই কালো বামুন পণ্ডিত কালীচরণ ভট্টাচার্য। ঢ্যাঙা সুঠাম—শিবলিঙ্গের মতো চেহারা আর টানা রক্তাভ দু'চক্ষু। পাকা বিনবিনে মাথার টঙে পাকানো শিখা। খড়্গ নাকের ডগায় নস্যি-মাখানো বড় বড় রোম। আমার পৈতে দিলেন। বড়মা'র বৃষোৎসর্গ করালেন।

বাবা বলে, কিছু মনে করবেন না বাবা। আপনি এ বেলার কথা ও বেলা ভুলে যান। কিন্তু এসব কচকচানি তো দিব্যি মনে রাখেন।

দাদু, কী করি বলো! আমি তো আর তোমার মতো অমুক স্কুলের সেক্রেটারি, তমুক প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট নই। আমার জীবন বইয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

বাবা, হ্যাঁ, আমার আবার ছোটবেলা থেকেই বইয়ের ওপর ফুটবল লাফায়। এই করতে করতে তো ইস্টবেঙ্গল ক্লাব অব্দি গেলাম।

দাদু, যার যা স্বভাব। অর্থাৎ—মর্দ্দিতো লঙ্ঘিতো বদ্ধঃ পীতো যদ্যাপি সাগরঃ। গর্জত্যুচ্চৈ স্তথাপ্যেষ জড়াত্মানো হি নিস্ত্রপাঃ।।

বাবা, মানে!

দাদু, নানাভাবে তিরস্কৃত আর অপমানিত হলেও নির্লজ্জ ব্যক্তি কখনওই তার স্বভাব পরিত্যাগ করে না।

বাবা, আপনি কী আমার চেয়েও নির্লজ্জ।

দাদু হো হো হেসে ওঠেন। তারপর বাবার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে শান্ত গলায় বলে ওঠেন,

Being your slave, what should I do but trend
upon the hours and times of your desire ?
I have no precious time at all to spend
Nor services to do, till you require :

কানুবাবা গলা খুলে গেয়ে ওঠে,
সময় তো থাকবে না গো মা,
কেবল মাত্র কথা রবে।
কথা রবে, কথা রবে মা
জগতে কলঙ্ক রবে
ভাল কিবা মন্দ কালী,
অবশ্য এক দাঁড়াইবে।
সাগরে যার বিছানা মা
শিশিরে তার কি করিবে।।

দাদু হই হই করে বলে ওঠেন, বাঃ কানু বাঃ। সেক্সপিয়র-সাহেবের সঙ্গে রামপ্রসাদকে কী খাসা মিলিয়ে দিলে হে।

সাতষট্টি

দেশজুড়ে সকাল থেকে চৌপর দিন যুদ্ধ। চিন কখনও এগোয়, কখনও পিছোয়। বরফের দেশে কেমন করে যে গরম গুলি-গোলা ছ্যাঁক্ ছ্যাঁক্ খাপ খাইয়ে নেয় সে-তত্ত্ব আমার মাথায় ঢোকে না। আমি মনে মনে কল্পনা করি সম্রাট চণ্ডাশোকের যুদ্ধ, পর পর পানিপথের যুদ্ধ, আর এই করতে করতে পলাশির যুদ্ধের ঘনঘটা। রবিবার রাতে রেডিওয় 'ছায়াছবির গান' অনুষ্ঠানে প্রায়ই শ্যামল মিত্র'র একখানা গান দেয়। কি হল রে জান, কি হল রে জান, পলাশি ময়দানে নবাব হারাল পরাণ। হায় হায় হায় রে, কি হল রে জান...।

গানটা যখন বাজে তখন আমাদের এই হালিসহরের অট্টালিকা ঘিরে পড়ি পড়ি শীতের কুয়াশা-ঘোর। আমি ঘরের ভেতর থেকেই টের পাই কুয়াশার জমজমাট দল ঠাকুরপাড়ার ঠাসা পান-বরোজ, ঘোরালো বাগান আর পুকুর থেকে ঘোঁট পাকাতে পাকাতে উঠে গুড়িসুড়ি ঢুকে পড়ল ক্ষিতীশ দাদুদের প্রকাণ্ড বাগানে। সাবেক হিমসাগর, বোম্বাই, পেয়ারাফুলি, গোলাপখাস, ইত্যাকার আমগাছের অলিগলি দিয়ে তারা ফিসফাস উঁকি দেয়। কানে কানে কী সব শলা করে। মাথা তুলে দেখতে চায় ক্ষিতীশচন্দ্রের দোতলা

গোলাপি রঙা বাড়ির দিকে। ও বাড়ির দোতলার ঘরে এখন কম পাওয়ারি আলো জ্বলছে। মস্ত লম্বা টানা ছাদের ওপর গুরুগম্ভীর ও-বাড়ির জামাই বাবাজীবন। ঘরে টেবিলের ওপর পড়ে আছে তাঁর লেখার কাগজ-কলম। তামাকের গড়গড়া। আর কিছু খাদ্যদ্রব্য। তাঁর এই এক স্বভাব। লিখতে লিখতে বারবার কিছু খাবার মুখে দেন। গড়গড়া টানেন। খানিক লেখেন। খানিক পায়চারি করেন। শ্বশুরবাড়িতে এসেও লেখার কামাই নেই।

কিন্তু আপাতত প্রবন্ধ-উপন্যাস ছেড়ে অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রকে একখানি উত্তেজিত পত্র লিখে এইমাত্র কলম রেখেছেন।

'...যেখানে বরদা ভট্টাচার্যের মতো ব্যক্তি আমাকে জুয়াচোর বলে, যে স্থানে রামকৃষ্ণ ও ব্রজনাথের মতো লোক আমার পিতাকে জালসাজ বলে, যে দেশে বসন্ত ও চণ্ডী ভট্টাচার্যের মতো লোকের সঙ্গে দলাদলি এবং যেখানে বড়বাবুর মতো সহোদরের মুখদর্শন করিতে হয়, সে দেশের সঙ্গে আমি আর কোনও সম্বন্ধ রাখিব না।...'

তার মানে নৈহাটি কাঁটালপাড়ার কথা হচ্ছে! বাইরে থেকে দেখলে কে বলবে মাথায় বিঁড়ে আঁটা, শামলাধারী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবটির বুকের ভেতরে এতসব রাগী বৃত্তান্ত। অথচ এই পত্র লেখার আগে তিনি লিখেছেন, 'এক্ষণে-কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবে। মহাভারতে চারিটি পর্বে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। দুর্যোধনের সেনাপতিগণের নামক্রমে ক্রমান্বয়ে এই চারিটি পর্বের নাম হইয়াছে ভীষ্মপর্ব, দ্রোণপর্ব, কর্ণপর্ব ও শল্যপর্ব।'

ক্ষিতীশদাদু'র আমবাগান থেকে বরফে-মোড়া চিন-ভারত সীমান্ত কত দূরে হলেও এখন বুঝি ভারি কাছাকাছি। সেখানে ট্রেঞ্চের তলায় ভারতের সৈন্য দল। হামাগুড়ি বসে বা শুয়ে বেতারে খবর শুনছে। কেউ বা ওয়ারলেস যন্ত্রে কান রাখছে। বিপ বিপ বিপ। কোঁ ও ও ও। ট্রেঞ্চের ওপরতলে সেনারা সারা গায়ে বুনো লতাগাছ বেঁধে পাথরে বুক দিয়ে উপুড় হয়ে অস্ত্র তাগ করে তৈরি। থেকে থেকে মাথার ওপর দিয়ে আগুনের গোলা উড়ে যাচ্ছে। দিল্লির তিনমূর্তি ভবনেব এক প্রকাণ্ড ঘরে রেডিওয় লতা মঙ্গেশকর গাইছেন, অ্যায় মেরে বতনকে লোগো, জরা আঁখমে ভর লো পানি, যো শহিদ হুয়ে হ্যায় উনকি, জরা ইয়াদ করো কুরবানি...! প্রধানমন্ত্রী নেহেরুজি সে গান শুনে ফোঁপাচ্ছেন। ভাবছেন, পর পর দু'টো পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মডেল রাশিবিজ্ঞানী মহলাবিশজি'কে দিয়ে বানিয়ে কী ভুলই না করেছি। রাও-এর মতো অর্থনীতিবিদকে ডাকলে এমন ভরাডুবি হত না। হায়, গান্ধিও নেই। তিনি এখন রাজঘাটের মহাসমাধিতে।

প্রায়ই আসেন শৈলদাদু, ভীমাচরণ মিত্র, আমাদের হেডস্যার নারায়ণবাবু, কাঁচড়াপাড়া থেকে সাইকেলে কেরোসিন বাতির আলো হ্যান্ডেলে সেঁটে ভূপেন দাদু, সাবর্ণ পরিবারের হরিচরণ রায়চৌধুরি, বিলিতি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ধবধবে ধুতি-পাঞ্জাবি আর ভারি সুদর্শন বৃদ্ধ যোগেশ দাদু, কাঁচরাপাড়ার সিংহিওয়ালা মস্ত দরজা আর লাল অট্টালিকার বাসিন্দে স্থানীয় চেয়ারম্যান বিজয়বসন্ত নন্দী, কবিরাজ রাসবিহারী শাস্ত্রী, অদ্ভুত আর উদ্ভট গল্প বলিয়ে পশুপতি দাদু—এমনি সব মানুষ।

ভীমাচরণ—আমাদের ভীমদাদু তাঁর মোটাসোটা ধুতি-শার্ট পরা শরীর সামান্য দুলিয়ে বলে ওঠেন, এ দেশে আর দ্বিতীয় গান্ধি হলেন না! হলে ভাল হত।

যোগেশ দাদু তাঁর টুকটুকে গোলাপি ঠোঁট মটকে বলেন, সে কী হয়! কেউ কাউকে replace করতে পারে? গান্ধি গান্ধিই।

আমার দাদু পুরু চশমার ওধার থেকে বলেন, পণ্ডিত নেহেরু কী খাসা বলেছিলেন তাঁর বেতার বক্তৃতায় বলুন দিকি। The light has gone out of our lives and there is darkness everywhere and I do not quite know what to tell you and how to say it. Our beloved leader, Bapu, as we call him, the father of our nation, is no more.

হরিচরণ বলেন, শেষটি ভারি খাসা। A mad man has put an end to his life.

দাদু, বিড়লা হাউসের রোজকার প্রার্থনা সভায় তিনি ঘড়ি ধরে আসেন। কিন্তু সেদিন দশ মিনিট দেরি হল। রোজকার মতো বিকেল সাড়ে চারটেয় তিনি আহার করলেন আভা গান্ধির হাতে। ছাগলের দুধ, সেদ্ধ করা আনাজপাতি, কমলালেবু, আদাকুচি এইসব। খেতে খেতে কথা কইছিলেন ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে। প্যাটেল-নেহরুতে তো তখন আদায় কাঁচকলা। আর ছিলেন মনিবেন—প্যাটেলের মেয়ে ও সচিব। কথা শেষে তিনি তাড়াতাড়ি চপ্পল পরে হাঁটতে আরম্ভ করলেন প্রেয়ার গ্রাউণ্ডের দিকে, আভা আর মনুর কাঁধে দু'হাত রেখে, যাদের তিনি বলতেন, My walking sticks. চলতে চলতে তাদের সঙ্গে মস্করা করছেন। বলছেন, আভা, তোমরা তো আমার time keepers, কিন্তু আজ ঘড়ির দিকে বোধহয় নজর দাওনি।

যোগেশ দাদু, মাঠে নেমে পড়লেন গান্ধি। শ-পাঁচেক মানুষের জমায়েত প্রায় রোজকার মতো। সকলে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে ডায়াসে ওঠার পথ করে দিতে লাগল। কেউ বা পা ছুঁয়ে প্রণাম! তারই মধ্যে লোকজনের ভিড়ে কনুই ঠেলে যে-লোকটি তাঁর সামনে চলে এল সে গড্‌সে। নুয়ে পড়ে প্রণাম করার কায়দা করল। মনু তাকে বাধা দিয়ে তার একটি হাত চেপে ধরল। লোকটি তাকে ধাক্কা মেরে দু-ফিট দূরে ফেলে দিল। তখনই সে পর পর দু'বার গুলি করল।

দাদু, হ্যাঁ, প্রথম বুলেট তাঁর পায়ে লাগল। গান্ধি তখনও মাটিতে দাঁড়িয়ে। দ্বিতীয়টি বেঁধার পরেই তাঁর সাদা কাপড় রক্তে ভেসে যেতে লাগল। তাঁর মুখ ফ্যাকাশে। হাত আলগা, এক হাত অবিশ্যি আভার গলা জড়িয়ে। গান্ধি বলে উঠলেন, হে রাম। এবার তৃতীয় দফা গুলি। তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। পা থেকে চামড়ার চপ্পল ছিটকে গেল। চশমা ঠিকরে পড়ল।

হরিচরণ দাদু একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে ওঠেন, সত্যি সত্যিই আলো নিবে গেল। The light has gone out...

রেডিওয় সানাই, ঢ্যাম কুড় কুড়। সংবাদ বিচিত্রা শুরু হয়। দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের গমগমে আর খবর-মাখানো গলায় ঘোষণা আরম্ভ করেন। তাঁর গলায় চিন-ভারত যুদ্ধের আঁচ গমগম করছে।

রাজদ্রোহের মতো মহাপাপ সংসারে আর কী বা আছে। সেই পাপের নীল আগুনের শিখা এখন দপদপাচ্ছে দেশ-কালের ললাটে। এ-আগুনের অপর স্বভাব বুঝি অশনিতাড়ন। সেনজ রামপ্রসাদ তাই মনে করেন। মনে মনে গর্জন হয়, সিংহাসন অর্থে যুদ্ধ। আর যুদ্ধার্থে সিংহাসন। কী বিচিত্র বিপরীত সমাহার। আর সেই সমাবেশের নাম

যদি সমর হয়, তা হলে প্রকৃতির নিয়ম যথাযথ রক্ষিত হয়। এই ঘটনার মাঝখানে যে-বস্তু বা বিষয় নিয়ে উতরে তার নাম শুধুই সিংহাসন।

যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থ বলছেন—

বিশেষশ্চাথ সামান্যমাসনং দ্বিবিধং মতম্।

সিংহাসনং বিশেষাখ্যং সামান্যং সুগজাদিকম্।।

অস্য অর্থ, আসন সাধারণত দুইপ্রকার। এক সাধারণ ও অপর অসাধারণ। তাদের মধ্যে সিংহাসন 'বিশেষ' বলে ও অন্য আসন 'সামান্য' বলে বিবেচিত হয়েছে।

অতএব, এই মেঘাবৃত বাংলার সিংহাসনের আশেপাশে জটিল অন্ধকারের তলে বেশ কিছু বিবাদী আর বৈরী চরিত্র ক্রীড়া করে। তারা ক্ষুদ্র ইঁদুর হলেও, প্রখর দন্তপাতি দিয়ে সিংহাসনের শরীরে ক্ষত রচনা করে। সেইসব যাবতীয় ক্ষত দেশের দেহপটে অযুত গোপন রক্তস্রাবী মুখ ফোটায়। সুবর্ণ সিংহাসনের শিরা-উপশিরায় রক্তধারা বিচলিত হয়ে পড়ে। যুক্তিকল্পতরু আবারও বলছেন—

সিংহাঙ্কাসনধারণাচ্চ সুচিরং সংজাতমুর্চ্ছামিব

ক্ষিপ্রং চন্দনবারিণা সকুসুমঃ সেকোনুগৃহ্নাতু গাং।।

যথাবিহিত সিংহাসনের অন্যথা করলে রাজার মরণ অবশ্যম্ভাবী। প্রত্যেক রাজারই নিজের জন্য সিংহাসন প্রস্তুত করার ব্যবস্থা হয়েছিল। কেন না অপরের আসনে উপবিষ্ট রাজা এবং আসন-শূন্য রাজা শত্রু দ্বারা নিহত হন, এই হল শাস্ত্রীয় উপদেশ।

কলিকাতা হতে মুরসিদাবাদ বহু দূরের পথ। তারই নিরিখে রণযাত্রার যথাযথ আয়োজনাদি সম্পন্ন হল। মা গঙ্গা সেসব খপরই রামপ্রসাদের কানে তুলে দেন। খপর হয় ১২ জুন কলিকাতার ফৌজ চন্দননগরের ফৌজের সঙ্গে এসে মিলল। চন্দননগরে দুর্গ রক্ষার জন্য মাত্র দেড়শো জাহাজি গোরা পিছনে রেখে ১৩ জুন গোটা ব্রিটিশ দল যুদ্ধযাত্রা করল। 'গোরা লোগ' গুলি-গোলা বারুদাদি লয়ে দুইশত নৌকায় চড়ে বসল। আর 'কালা আদমি' দিগরে গঙ্গার তীর বরাবর বাদশাহি পথ বেয়ে পদব্রজে রওনা হল।

পথিমধ্যে হুগলি ও কাটোয়ার দুর্গে, অগ্রদ্বীপ এবং পলাশি'র ছাউনিতে নবাবি সিপাহ সেনানি তোয়ের হয়ে বসে আছে। তারা যদি স্বাভাবিক কর্ম করত তা হলে হুগলির কাছেই ইংরাজ সেনা পঞ্চত্ব পায়। কিন্তু তারা হাত তুলে বসে রইল। এমনকী পথও ছেড়ে দিল। এর নেপথ্যে নবাবের বিরুদ্ধে মুরসিদাবাদের গুপ্ত মন্ত্রণা।

বিদ্রোহের সমাচার পেয়ে নবাব সিরাজ গ্রেফতারের বদলে মীরজাফরকে নিজ পক্ষে আনবার যুক্তি করতে লাগলেন। তিনি বলতে গেলে স্বদেশের স্বার্থে মীরজাফরকে আহ্বান করে পাঠালেন। কিন্তু ভীরু মীরজাফর সে-ডাকে রা দিলেন না। তখন খোদ নবাবই ১৫ জুন শিবিকাযোগে মীরজাফরের ভবনে উপনীত হলেন। মীরজাফর লজ্জার মাথা খেয়ে বার হলেন। নবাব তাঁকে বিবিধ বাক চতুরালি করে, মুসলমানি গরিমার উদাহরণ দিয়ে, নবাব আলিবর্দির মৃত নামের দোহাই দিয়ে, পামর ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে প্রেম-বন্ধন ছিঁড়ে ফেলার জন্য উত্তেজিত করতে লাগলেন। তখন পুনরায় পবিত্র কোরান এল। মীরজাফর তাঁর অন্নদাতা মুসলমান নরপতির সামনে স্বয়ং আর এক মুসলমান স্বরূপ জানু মুড়ে শপথ আওড়ালেন, আমি ঈশ্বরের নামে, পয়গম্বরের নামে ধর্মত শপথ করে স্বীকার হচ্ছি,

যাবজ্জীবন মুসলমানের সিংহাসন রক্ষা করব। প্রাণ থাকতে বিধর্মী ফিরিঙ্গির সহায়তা করব না।

তরলমতি সিরাজ জানতেন না হিন্দু ব্রাহ্মণের পাদস্পর্শ করেও মিথ্যাচার করতে পারে। মুসলমান কোরান মাথায় ধারণ করে কিংবা ফিরিঙ্গি বাইবেল চুম্বন করেও মিথ্যা আচরণ করতে পারে। আসলে মিথ্যা বিষয়টি তো হিন্দু কী মুসলমানের ধার ধারে না।

সিরাজ বুঝি কোনওমতে গৃহবিবাদের মিটমাট করে পলাশি ক্ষেত্রে সমবেত হওয়ার উদ্‌যোগ করতে লাগলেন। তাঁর মনে আশা ঘনাল, স্বয়ং মীরজাফর যখন ফিরিঙ্গি-বর্জন করেছে তখন এবার আর ইংরাজদের নিস্তার নেই। এখানে আবার গোল বাঁধল সেনাদের বকেয়া মাহিনা নিয়ে। সেটিও মেটালেন নবাব। রায়দুর্লভ, মীরজাফর, মীরমদন, মোহনলাল আর ফরাসি সেনানায়ক সিনফ্রেঁ এক এক সেনাদলের দায় নিলেন। সিরাজ অগ্রসর হলেন।

মীরজাফর গোপনে ক্লাইভের সঙ্গে পত্র যোগাযোগ রেখে চললেন। সেই যোগসাজশের ফলে অজয় আর ভাগীরথীর সম্মিলনে, কাটোয়ার দুর্গে, নকল যুদ্ধ হল। দুর্গদ্বারে নাট্যাভিনয় হল। একদা বর্গি হেঙ্গামার কালে বীরত্বের লীলাভূমি-এই কাটোয়ার দুর্গ অভিনয়াচার দেখাল। নবাবের সেনা দল নিজ হস্তে চালে আগুন দিয়ে দুর্গ ছেড়ে পলায়ন করলে। দেশের লোকজন প্রাণভয়ে পলায়ন করায় এত চাউল ইংরাজদের হাতে এল যে, তা দশসহস্র সিপাহি বচ্ছরভর খেয়ে শেষ করতে পারবে না।

ক্লাইভ কাটোয়ার সৈন্যশিবির স্থাপন করলেন। প্রথমে মনে ভেবেছিলেন, এই গ্রীষ্মে সহজেই নদী পার হতে পারবেন। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি যে সহজ নয়, তা বুঝে তিনি ভারি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাঁর কাছে মীরজাফরের নিকট হতে একইসঙ্গে দু'খানি পত্র এসে পড়ল। তিনি সেই পত্রদ্বয় পাঠ করে—বর্ধমানের মহারাজা যাঁর সঙ্গে নবাবের অসদ্ভাব—তাঁকে পত্র লিখে সহস্রাধিক অশ্ব চেয়ে পাঠালেন। চিন্তিত ক্লাইভ ২১ জুন, মঙ্গলবার, সামরিক সভার বিশেষ অধিবেশন ডাকলেন। সেখানে প্রধান আলোচনার বিষয় হল, নদীপার হয়ে বাহুবলে সিরাজকে এখনই আক্রমণ করা সঙ্গত, নাকি আরও সংবাদ গ্রহণের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

"Whether in our present situation, without assitance and on our own bottom, it would be prudent to attack the Nabob or whether we should wait till joined by some country power ?"

ক্লাইভ ২২ জুন অপরাহ্ন তক্‌কো যুদ্ধযাত্রা করলেন না। তিনি মীরজাফরকে খপর করলেন। তাঁর উপদেশ এখানে অতীব জরুরি। সেই উপদেশ এল। এবং ২২ জুন অপরাহ্নে ক্লাইভের সেনাদল গঙ্গা পার হল। অলখে ভরসার আলো দেখাল মীরজাফরের সংকেত।

সেনাদল দলে দলে অগ্রসর হয়। এদিকে আকাশ মুচড়ে বৃষ্টি। পলাশি মাত্র সাড়ে সাত ক্রোশ দূর—অগ্রদ্বীপের এই বিপরীত পার থেকে। গলদঘর্ম ইংরাজ সেনা বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে দ্রুত ছুটে চলল। অবশেষে রাত্রি এক ঘটিকার সময় তারা এসে উপনীত হল পলাশির আমবাগানে।

ওধারে সিরাজও বসে থাকবার পাত্র নন। তিনি মনকরা ছেড়ে, আরও দক্ষিণে অগ্রসর

হয়ে ভাগীরথী যে স্থলে অশ্বক্ষুরবৎ বক্র ধারায় প্রবাহিত, তার পুবে তেজনগরের খোলা মাঠে শিবির গাড়লেন। এটি প্রান্তরের উত্তর দিক। তার ডাইনে মাটির স্তূপ আর একজোড়া প্রাচীন সরোবর। সিরাজ সেনাদলের বিপুল বাদ্যগর্জনে বহুদূর অবধি বনভূমি প্রতিশব্দিত হচ্ছে। ক্লাইভ টের পেলেন, শত্রু অতি নিকটে।

এই রাত বিষমে প্রসাদের দু'চোখে নিদ্রা নেই। এ ঘরের দেওয়ালের ওপারে সঘন আকাশ। যে কোনও সময়ে আকাশ মুচড়ে উঠতে পারে। ঝেঁপে জল আসতে পারে এ মহিমগুলে।

একই ঘরে আজ ক'দিন শয্যা পৃথক। একজোড়া তক্তপোশ দুই দেওয়ালের ধারে। ওধারে শিশুকন্যা লয়ে সর্বাণী, খোলা জানলার ওই পারে অথৈ কালো আকাশ বুঝি নিখাদ করালবদনী। এই আকাশেরই স্তবমূর্তি এখন ওই আকাশের সমীপবর্তী অনন্ত ধ্যান বিভামগ্না কালী রমণী। অতএব ওই মহা দেবীর ধ্যান বলে দেয়—

শুক্লেন ধ্যানযোগেন কবিতা বশবর্তিনী।
পীতেন ধ্যানযোগেন স্তম্ভয়েদখিলং জগৎ।
কৃষ্ণাভা শত্রু মারণে ধুম্রাভা বৈরিনিগ্রহে।।

শুক্লবর্ণ ধ্যান করলে কবিত্ব শক্তি আয়ত্ত হয়। পীতবর্ণ ধ্যান করলে সমগ্র জগৎ স্তম্ভিত হয়। শত্রুর মারণকার্যে কৃষ্ণবর্ণ ও শত্রুনিগ্রহ উদ্দেশ্যে ধুম্রবর্ণ ধ্যান করবে।

অতঃপর এই দেবী তথা মাতা বসুমতী ও দেশ জননীর বিপুল বিশ্বব্যাপী প্রকটিত মূর্তিরহস্য কে-বা ভেদ করতে পারে। শ্রীমহাদেব লক্ষ লক্ষ সহস্র বার দেবীকে নিষেধ করেছেন দেবী কালিকার দুর্লভ এবং সর্বকামনাভীষ্ট ফলপ্রদ কবচ বিষয়ে প্রশ্ন না করতে। কিন্তু দেবী নাছোড়। অতএব তাঁর প্রতি প্রীতিবশত শ্রীমহাদেব সে বিবরণ বলতে বসলেন।

শ্রীমহাদেব বললেন, গোপনীয়ং প্রযত্নেন স্বযোনিবদ্বরাননে। এই অতিদুর্লভ কবচ স্বযোনিবৎ গোপন রাখবে।

কালী পূর্বদিকে পালন করুন কপালী দক্ষিণ দিকে রক্ষা করুন। কুল্লা পশ্চিমে এবং কুরকুল্লা উত্তরে, বিরোধিনী ঐশানীতে, বিপ্রচিত্তা অগ্নিকোণে, উগ্রা নৈঋতে, উগ্রপ্রভা বায়ুকোণে, দীপ্তা মস্তকে, নীলা মুখমণ্ডলে, ঘনা কণ্ঠে, বলাকা হৃদয়ে, মাত্রা নাভিতে, মিতা জঙ্ঘা-যুগলে, মুদ্রা ধ্বজে এবং ব্রহ্মাণী প্রভৃতি মহাদেবীগণ সর্বত্র সর্বদা আমায় পালন এবং রক্ষা করুন।

এই দেবীর কাল পার্বণ এখন এ বঙ্গদেশে উপস্থিত। এই মূর্তি ভিন্ন আর কোনও রূপ এখন মনে পড়ে না।

ফলে মদ্যপানাবেশে আঘূর্ণিত লোচনত্রয় হওয়ার কারণে তাঁর অতিমাত্র শোভা সমুদ্ভাসিত হয়েছে। তিনি মাংস ও অসৃগ্‌রূপ দুগ্ধখণ্ডে বিচ্ছুরিত মধু অতিমাত্র পান করে মত্তভাবাপন্না হয়ে অট্টহাস্য সহকারে সখীগণকে 'কাল কাল' এবং 'কহ কহড' সম্ভাষণ করছেন। তিনি নৃত্যবশে সাতিশয় উদ্দামভাবাপন্ন এবং মহাহাস্যোন্মাদে পরমামোদিত মহাভৈরবের আনন্দলহরীস্বরূপ।

আবারও রামপ্রসাদের মনের কাছাকাছি একখণ্ড শ্লোক—

বিবাদে চরণে দ্যুতে বিদ্যায়াং কবিতাগমে।
রাজ গেহে বিচারে চ সর্বত্রেদং পঠেন্নরঃ।।

বিবাদ, যুদ্ধ, দ্যুতক্রীড়া, বিদ্যা, কবিতাগম, রাজগৃহ, বিচার—সর্বখানে এই কবচ পাঠ করবে। কবচ আর কবিতায় কী আশ্চর্য সখ্য।

পলাশির আম্রকাননে আজ মুষলধার বৃষ্টি। ঘোর ঘোর আমগাছেদের মাথায় মাথায় বৃষ্টির তুরঙ্গ ছুটছে তাথৈ তাথৈ। কৃষ্ণ মেঘসম্পন্না ওই আকাশ এখন তমোগুণে ব্যবচ্ছিন্না। ওই আকাশ এখন সমুদয় তত্ত্বের সাগরস্বরূপা। তিনি অপারা, অর্থাৎ তাঁর ইয়ত্তা বা অবধারণ নেই। সহজে তাঁকে পাওয়া যায় না। তিনি গহ্বরা, অতীব দুর্বিজ্ঞেয় স্বরূপা।

আমবাগানের মাথা নেড়ে-চেড়ে একসা করছে এই বর্ষারাতের ঘোর জলতাণ্ডব। বাগানের কাছেই বাম দিকে, গঙ্গার ওপরেই প্রাচীন-ঘেরা ছোট এক পাকা কোঠা। নবাব এ-ধারে শিকারে এলে এখানেই বিশ্রাম করতেন। ক্লাইভ ও তাঁর সেনাধ্যক্ষরা সেখানে যেয়ে উঠল। আর তখনই খপর হল—সুমুখে, মাত্র দেড় মাইলের মধ্যে, নবাব সিরাজ সৈন্যসামন্ত নিয়ে অপেক্ষামান।

'It consisted of 650 European infantry, 150 artillery men inculding 50 seamen, 2100 Sepoys and a small number of Protuguese, making a total of something more than 3000 men.'

অতি নিকট থেকে সিরাজ সেনানির সশব্দ বাদ্যবৃন্দ গভীর রাতের বৃষ্টিধারাকে ঘা দিচ্ছে ক্রমাগত। বৃষ্টির কুচিগুলি সেই বাদ্যগর্জনে আরও খান খান হচ্ছে। তুরী, ভেরি, কাড়া, নাকাড়ার সঙ্গে অজস্র সানাই উদ্দাম নৃত্য করছে। এমত অবস্থায় নবাব সিরাজদ্দৌলার দু'চোখে নিদ্রা নেই। তিনি একা নির্জন পটমণ্ডপে বসে প্রহর গণনা করছেন—চিন্তাজর্জরিত বিষণ্ণ বয়ানে। ঘরে অতি স্তিমিত এক প্রদীপ জ্বলছে। নবাবের হাতের আওতায় ফরশির নল গড়াচ্ছে। এমন সময়, বলতে গেলে হঠাৎই এক তস্কর এসে চুপিসাড়ে তাঁর সমুখ থেকে ফরশি তুলে নিযে পালাল। নবাব সদ্য ঘুম কিংবা স্বপ্নভাঙা পাখির মতো তার পশ্চাদ্ধাবন করলেন। বাহিরে এসে দেখলেন তাঁর পাহারাদার পরিচারকবর্গ কে কোথায় পলায়ন করেছে তাঁকে একা ফেলে। সিরাজ মর্মপীড়িত নিঃসঙ্গ কণ্ঠে স্বগত উক্তি করলেন, 'হায়, না মরিতেই ইহারা আমাকে মৃতের মধ্যে গণ্য করিয়া লইয়াছে।'

সিরাজের মাথার ওপরে নিবিড় মেঘস্রাব। মাণিক্যখচিত উষ্ণীষে বৃষ্টিবিন্দু টলটল করছে। তাঁর মাথার ওপরে এই আকাশময়ী দেবী এখন সত্যই ভাস্করা, অর্থাৎ সকল প্রভার আকর। তিনি শেখরা, সকলের শ্রেষ্ঠা। তিনি সমুজ্জ্বলা, বিজ্ঞানজ্যোতিস্বরূপা। তিনি শশাঙ্কা, অমৃতের আধার। তিনি মৃতাস্থি, অর্থাৎ প্রলয়কালে আপনাতে সমুদয় আহরণ করে থাকেন। তিনি মৃগেন্দ্রবাহনা, অর্থাৎ নিজ হিংসাধর্মকে আপনার আয়ত্তে এনেছেন। তিনি অগ্রজা, সকলের আগে জন্মেছেন। তিনি অতীতা, অর্থাৎ ত্রিবেদের পার। তিনি কপালখণ্ডধারিণী, অর্থাৎ সকলের অদৃষ্টের পরিচালন করে থাকেন।

হায়, সিরাজের অদৃষ্টের দিকে এই দেবী একবার দৃষ্টি দান যদি করেন। কেননা তিনিই তো সকল সৌভাগ্যস্বরূপিনী।

আবার তিনিই তমোন্ধকারযামিনী ও উগ্রকারিকা। তাঁর দ্বারাই মহাপ্রলয়াদি সংঘটিত হয়। কিন্তু তিনি যে সকলের মাতা। নমামি মাতরং সতীম্। অতএব প্রসন্না হও। আমাকে রক্ষা কর। জয়েশ্বরী ত্রিলোচনে প্রসীদ দেবী পাহি মাম্।

অন্ধকারে, বৃষ্টিজর্জর স্বপ্ন-কল্পনায়, কবিরঞ্জনের কণ্ঠ বেজে ওঠে বাইরের আকাশপথে। জন্ম নেয় তাঁর অগোচরে, পৃথিবীর তাবৎ মহৎ কবি কতিপয়ের অনুভূতির অনুপাতে, সমরসঙ্গীত। সমর বা যুদ্ধসঙ্গীত প্রসাদী কণ্ঠে এই প্রথম সৃষ্টির আলো দেখে। অথচ চারিধারে কী ঘোর অন্ধকার।

গুরুতর পদভর, কমঠ ভুজগবর,
কাতর মূর্চ্ছিত ওই মহী রে।।
কে হর হৃদি মাঝে বিহরে।
তনু রুচির, সজল ঘন নিন্দিত,
চরণে উদিত বিধু নখরে।।

আটষট্টি

লক্ষবাগ—পলাশির এই আম্রকানন।

জনশ্রুতি মতে এই বাগিচা লক্ষ বৃক্ষে সাজানো। এ তরফে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন মনে মনে উপনীত হন, 'লাখ উকিল করেছি খাড়া'। অর্থাৎ এক লক্ষ গীত ও কবিতা রচনা। লক্ষ্য পূর্ণ হতে এখনও বুঝি কিছু বাকি। যেমন বাকি বীরাচারী সাধক মৃত রামকৃষ্ণ রায়চৌধুরীর পঞ্চমুণ্ডি আসনটির ওপরে সমাসীন হতে। সে বিষয়ে সর্বাণী ওই রায়চৌধুরী বাড়ির বর্তমান প্রধানা সুভদ্রাদেবীর সঙ্গে কী সব কথাবার্তার আভাস দিয়ে রেখেছে।

কিন্তু সে সবেরই নেপথ্যে, আজ এই গঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে, প্রসাদ টের পেলেন জলের শব্দে কালের অভিপ্রায় আর এই এখনকার পরিস্থিতির আশ্চর্য বিবরণ।

আজ, ১১৭০ হিজরি, ৫ শওয়াল, বৃহস্পতিবার, ২৩ জুন, ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ, প্রাতঃকাল। পলাশির এই আমবাগানের পিছনে গঙ্গা নদী। এই বাগিচার পশ্চিম-উত্তর কোণ বরাবর ক্লাইভের মৃগয়ামঞ্চ। ক্লাইভ তার পাশে—লক্ষবাগের উত্তর ধারের খোলা প্রান্তরে ব্যূহ রচনা করেছেন। এ ধারে নবাব সিরাজ অতি প্রত্যূষেই মীরজাফর, ইয়ারলতিফ ও রায়দুর্লভকে শিবির থেকে অগ্রসর হতে আদেশ করেছেন। আদেশ হল, অর্ধচন্দ্রকারে ব্যূহ রচনা করে আস্তে আস্তে আম্রবন বেষ্টন করে ফেলতে হবে।

এই বিবরণ সিরাজের দরবারস্থ কূট ষড়যন্ত্রী লিউক স্ক্র্যাফ্টন কী চমৎকারই না দোয়াত-কলম করে রাখছেন ছবির মতো। সে ছবি ভেসে আসা কচুবিপানাবৎ নেচে যাচ্ছে নদীস্রোতে। '...When the soubah's army appeared marching from their fortified camp...and what with the number of elephants all covered with scarlet cloth and embroidery; then horses with their drawn swords glistering in the sun; their heavy cannon drawn by vast trains of oxen; and their standard flying, they made a most pompous and formidable appearence. And their disposition as well as the regular manner in which they formed seemed to speak greater skill in war than we expected from them.'

আর এই রণপরিবেশের বিপরীত কোটিতে রামপ্রসাদের মনে মনে ঠিক একই সংগ্রামের ধ্বনি বিজ বিজ বুড়বুড় মুখ তোলে। সেখানে একমাত্র আধার বিমূর্ত কালিকা রমণী, যিনি শ্রমরসে টুবু টুবু নিমজ্জিতা। সমাজে রচিত তথাকথিত রমণী সাধারণের সারাৎসার এক জ্বলন্ত বিন্দু। এই নারী, আজ দেশ ও কালের ঊর্ধে, তাঁর প্রকাণ্ড

আকারখানি মেলে দিয়ে বসে আছেন। পলাশির আমবাগানে যে চিত্র এখন থরথর করছে তার অভিরাম চিত্রকল্প রামপ্রসাদের বুক হতে উদ্‌গিত হয়। প্রসাদ নিজের সমীপে নিজেই বিহ্বল হয়ে পড়েন। এমনকী আশ্চর্যও।

হুঙ্কারে সংগ্রামে ও কে বিরাজে বামা।
কামরিপু-মোহিনী ও কে বিরাজে বামা।।
তপন দহন শশী, ত্রিনয়নি ও রূপসী,
কুবলয়দল-তনু শ্যামা।
বিবসনা এ তরুণী, কেশ পড়িছে ধরণী,
সমর-নিপুণা গুণধামা।
কহিছে প্রসাদ সার, তারিণী সম্মুখে যার,
যমজয়ী বাজাইল দামা।

...তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, তুমিই বষট্‌কার ও অকারাদি স্বরবর্ণ, হে অপরিণামি নিত্যে! তুমি বরুণবীজ বা প্রণব, তুমিই হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত এই প্রকার ত্রিবিধমাত্রা রূপে অবস্থিতা।

বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোহস্য জগন্ময়ে।।

সৃষ্টিকালে তুমি এ জগতের সৃষ্টিস্বরূপা, পালন সময়ে তুমি স্থিতিরূপা এবং জগতের পরিণাম অন্ত সময় উপস্থিত হলে তুমিই সংহারস্বরূপা।

আবার কী রহস্যে তুমি নিমজ্জিতা থাকো তা ভেদ করে কার সাধ্য। হে মহেশানি, তুমি পূর্ণোদরী, বিজয়া, শাল্মলী, লোলাক্ষী, বর্তুলাক্ষী, সুদীর্ঘমুখী, দীর্ঘজঙ্ঘা, উর্ধকেশী, বিকৃতমুখী, জ্বালামুখী, উল্কামুখী, চুল্লীমুখী, বিদ্যামুখী।

তুমি মহাকালী, ত্রৈলোক্যবিদ্যা, আত্মশক্তি, সরস্বতী, ভূতমাতা, লম্বোদরী, দ্রাবিণী, নাগরী, খেচরী, মঞ্জরী, রূপিনী, কাকোদরী, পূতনা, যোগিনী, শঙ্খিনী, গর্জিনী, কালরাত্রি, বজ্রিনী, সুমুখেশ্বরী, মাধবী, বারুণী, বক্ষোবিদারিণী, সহজা, লক্ষ্মী ও মায়া।

তোমার যথাযথ ষোড়ান্যাস সম্পন্ন করতে পারলে বহুবিধ প্রাপ্তির মধ্যে, কবিতালহরী তস্য দ্রাক্ষারসপরম্পরা—দ্রাক্ষারসধারার মতো রসময়ী কবিতালহরী উৎসারিত হয়। কবিতার সংসারে ধুম জোয়ার আসে।

কিন্তু রামপ্রসাদের বক্ষ জুড়ে এখন শক্তিপুটিত রণরঞ্জিত মূর্তি। সে প্রকৃতি মূর্তি গুরুতর সংহার জারিত। হা হা অট্টহাস্যময়ী সে ওই মনমোহিনী। ঢল ঢল তড়িৎঘটা ও মণিমরকত-কান্তি ছটাময়ী। তাঁর শিরোভূষণ শশিখণ্ড। তিনি সুজঘনে এবং স্বমস্তা স্বধাসা মাভৈঃ তাঁর ভাষা। তিনি মার মার রবে ধাবমানা। তবু তাঁর রূপে আলো হয় ক্ষিতি।

ঠিক এই মুহূর্তে কবিতার আর একটি খণ্ড যেন বা উড়ে আসে কোথা থেকে। মনে মনে হিমধারাবৎ রক্তস্রোত গুঞ্জরিয়া ওঠে। কবিরঞ্জনের মনে মনে দৎ-কলম প্রাণ পেয়ে যায়।

আরে ওই আইল কে রে ঘনবরণী।।
কে রে নবীনা নগনা লাজ বিরহিতা,
ভুবন-মোহিতা,
এ কি অনুচিতা কুলের কামিনী।।

কুঞ্জরবরগতি আসবে আবেশ,
লোলিত রসনা গলিত কেশ,
সুর-নর-শঙ্কা করে হেরি বেশ,
হুঙ্কার রবে রে দনুজ-দলনী।।

এই কবিতা লহরীতে আপাতত দ্রাক্ষারস তপ্ত শোণিত উপগত হয়েছে। বাংলার ত্রিলোকজুড়ে কবিতাময়ীর কী আশ্চর্য পদসঞ্চার। তিনি এখন আনন্দভৈরবী, পরমানন্দ ভৈরবী, তীব্রা, পুরসুন্দরী, মহাসপ্তদশী, ধীরা, ত্রিপুরমালিনী, রক্তা, অনুত্তমা, চিত্রাঙ্গী, ভ্রামরী, বেগবতী, আত্মযোনি, লিঙ্গগীতি, কৌশিকি, চক্রিনী, দুষ্টা, শুক্রস্নাতা, অতিশুক্রিনী, কৃত্তিকা, সারদা, আত্মবিদ্যা, স্বয়ম্ভুকুসুমস্নাতা, বিরোধিনী, প্রেতপাণিসুমেখলা।

ঠিক এখনই ইংরাজদের মনে শঙ্কা নবাবের ওই অর্দ্ধচন্দ্রবৎ চক্রব্যূহ যদি আম বন ঘিরে ফেলে কামানে আগুন দেয় তা হলে সর্বনাশের আর বাকি থাকবে না। তাই সাত তাড়াতাড়ি সাহেবের গোরাপল্টন চৌ দলে ভাগ হয়ে পড়ল। তাদের কর্তা হলেন যথাক্রমে কিলপ্যাট্রিক, মেজর গ্রান্ট, মেজর কুট ও কাপ্তান গপ। মাঝখানে 'গোরা লোগ', বাঁয়ে-ডাইনে 'কালা আদমিগণ।' তাদের সুমুখে ছযখানি কামান। ওধারে মীরমদনের সিপাহিদল সুমুখের সরোবর তীরে এসে জমেছে। একধারে ফারসি-বীর সিনফ্রেঁ, একপাশে বাঙালি বলবন্ত মোহনলাল। মাঝখানে দাঁড়িয়ে বাঙালি সেনাপতি মীরমদন সেনা চালনার দায় নিলেন।

আজ সাত প্রত্যুষেই ক্লাইভ শিকারবাড়ির টঙে উঠে দূরবীন কযে দেখে নিয়েছেন নবাব বাহিনীর হালচাল। দেখার পর থেকে তিনি ভারি চিন্তিত। তিনি দেখে নিয়েছেন--নবাববাহিনী প্রকৃতই সমুদ্রবৎ বিশাল। টের পেয়েছেন, সেনা দিয়ে আধো-চাঁদ ঘিরে থাকার মানে কী। সাহেবের তাবৎ সৈন্য হিসেব কযলে নবাবের বিপুল বাহিনীর বিশ ভাগের এক ভাগও নয়।

নবাবের বাহিনী ওধার থেকে আস্তে আস্তে অগ্রসর হচ্ছে। সেখানে রয়েছে ভরা কোটালবৎ যথেষ্ট আস্তরণাবৃত রণহস্তী, যথাশিক্ষিত অশ্বসেনা এবং সুগঠিত আগ্নেয়াস্ত্র। ক্লাইভ অনুভব করলেন—সিরাজের ব্যূহ সত্যিই ভেদ করা সহজ কর্ম নয়।

সকাল আট ঘটিকায় যুদ্ধনাট্য আরম্ভ। সরোবরের ধার থেকে পহেলা গোলা দাগলেন ফরাসি বীর সিনফ্রেঁ। তাঁর চিত্তে এখনও সদ্য পরাভবের প্রতিহিংসা জাগ্রত হয়ে আছে লুকোছাপা অঙ্গারবৎ।

অতঃপর মীরমদন। তিনি এবার কামানে অগ্নি ইন্ধন রাখলেন।

হুঁ ফট্ স্বাহেতি মন্ত্রেণ ভূর্মিং চ পরিশোধয়েৎ। ততঃ পবিত্র বজ্রভূমে প্রণবং পূর্বমুদ্ধরেৎ।।

কামানের গোলার মুখে ওই তন্ত্রোক্ত ফট্ আদি ধ্বনি চতুর্গুণ উল্লাসে জম জম করে ওঠে। পলাশির এই আমবাগ এখন 'মাতৃকাবর্ণিনী।' তাঁর ললাটদেশ সিন্দুররাগরঞ্জিত। তিনি মদোন্মাত্তা, সুবেশা, চারুহাসিনী।

কামান গোলার শব্দগর্জনে অনিরুদ্ধ সরস্বতীর পরামন্ত্র তথা ঘোরকালী মন্ত্র উলসে ওঠে। কামান বলে, গুম্-গুম্-গুম্-গুম্-গুম্...

তন্ত্রচক্রে বর্ণন্যাস ঘটে দেবীর আবাহনে—অং আং ইং ঈং উং উং ঋং ঋং...এং ঐং ওং ঔং অং অঃ কং খং গং ঘং

ঙং চং ছং জং ঝং...

হে শুচিস্মিতে, এইসব যাবতীয় যুদ্ধ ও শব্দ উপাচার তোমার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হলেও এই ডাকিনী, রাকিনী, কাকিনী. শাকিনী, হাকিনী ইত্যাদি বীজ যোযশাদি অক্ষবে অক্ষরে এখন ওই রণভূমে জেগে উঠেছে।

অতঃপর নবাবের সৈন্যদলের দখিনধার হতে অজস্র ধারায় গোলাবৃষ্টি আরম্ভ হল। কিন্তু অনেক গোলা বিফল শূন্যে উড়ে গেল। ঊর্ধ আকাশপথে সেইসব গোলা উডতে উড়তে গঙ্গায় যেয়ে পড়তে লাগল। জলে-আগুনে বিচিত্র ভাবসম্মিলনে বুম্ বুম্, ঙং ঙং. ঝং ঝং বর্ণমালা বিভ্রম দেখতে লাগল। পলাশির লক্ষ আমবাগান সাজানো সবুজ পাতাদের মাথায় মাথায় ছুটন্ত আগুন গোলা মহা আনন্দে ত্রাসের ভঙ্গিতে নৃত্য করতে লাগল। আকাশব্যাপী অতীতের আতসবাজির ছটা—এই মেঘাবৃত সকালবেলাতেও প্রতীয়মান হতে লাগল।

এইভাবে যুদ্ধ চলতে থাকল আধঘণ্টা, নাগাড়ে। মুহুর্মুহু কামান চলে। গোলা ছোটে। ক্রমাগত মানুষ ধরাশায়ী হতে থাকে। দেখতে দেখতে দশজন গোরা, কুড়িজন কালা সিপাহি, মৃত্যুর শীতল ক্রোড় দেখল। বিপরীতে ইংরাজের কামানও সমানে পাল্লা দিয়ে যায়। তাদের আক্রমণে ও পীড়নে নবাবসেনাও মাটিতে শুয়ে পড়তে থাকে। কিন্তু বস্তুত তাতে করে নবাব দলের তেমন কিছু এল গেল না। কেননা সে পক্ষে গোলন্দাজদিগের তিলমাত্র ক্ষতি হল না। তারা প্রতি মিনিটে গোলাব ঝাঁক পরিবেশন করে চলল। এখন পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী ইংরাজের একজনের স্থলে নবাবের দশজন নিহত হলেও বিশেষ কিছু ক্ষতি সাধন হল না। এভাবে প্রায় প্রতি মিনিটে একজন করে লোক হত হতে থাকলে ক্ষুদ্র ইংরাজ দল আর কতক্ষণ টিকতে পারে। ঘোরতর চিন্তিত ক্লাইভ এ অবস্থায় সমস্ত সৈন্যকে আত্মরক্ষার্থ আমবাগানের মধ্যে আশ্রয় নেওয়ার আদেশ দিলেন।

নবাবের দল এ দৃশ্য দেখল। দেখা মাত্র উল্লসিত। তারা আরও অগ্রসর হল। উপর্যুপরি আগুন বর্ষণ করতে থাকল। কিন্তু হায়, তারা এতক্ষণ আম গাছের শাখা-প্রশাখার সঙ্গে যুদ্ধ করছিল। গাছের সঙ্গে বল পরীক্ষা তো মিছিমিছি শূন্যে তাড়না। কেননা ইংরাজ সেনা ইতিমধ্যে গাছেদের আড়ালে বাঁধের নিচে বসে পড়েছে। সেখান থেকে তারা আক্রমণের জবাব দেওয়াব যথাসাধ্য চেষ্টা করে চলেছে।

এ পরিস্থিতি দেখে, বিশেষত নবাব সেনার এমন যুদ্ধোৎসাহ দেখে, ক্লাইভ বিশেষ চিন্তিত অবস্থায় আমিব বেগকে তলব করে রাগত স্বরে বলে ওঠেন, কই, তোমার প্রভু যে বলেছেন—সৈন্যসামন্ত সকলেই নবাবের বিপক্ষে, সামান্য একটু যুদ্ধের উদ্যম হলে পর তারা নিজেই কার্য শেষ করবে। এখন যে দেখছি সকলই বিপরীত।

আমির বেগ নিবেদন করলেন, যারা আক্রমণে অগ্রসর হচ্ছে তারা মীরমদন আর মোহনলালের অধীন। তারাই কেবল সিরাজের অনুরক্ত। তাদের পরাজিত করতে পারলেই কর্ম শেষ। অন্যেবা পূর্ব কথা মতো কাজ করবে।

আসল ব্যাপার বিষয় হল মীরজাফরাদি প্রবীণ সেনাপতি নিজ নিজ সৈন্য-সহ নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করছেন। যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করব না, ইংরাজ পক্ষে যোগ দেব না—এই

হল মীরজাফরের প্রতিশ্রুতি মোতাবেক কার্য। দেখতে দেখতে বেলা ১১টা বাজল। গলদঘর্ম ক্লাইভ সামন্তদের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করলেন—আম্রকানন থেকে এভাবে সারাদিনভর গোলাবর্ষণ চলুক। ও তরফ ব্যতিব্যস্ত থাক। নিশীথে নবাবের শিবির আক্রমণ করা হবে।

অতএব যুদ্ধ জারি থাকে। কিন্তু ক্লাইভের মনে মনে একটি কূট ভাবনা মাথা তোলে—অনেক পরে। মনে হয়, মীরজাফর আর তাঁর সঙ্গী দুই আসলে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন কোন পক্ষ শেষাবধি জেতে। যদি দেখা যায় ইংরাজ পরাস্ত হচ্ছে তা হলে তাদের উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ে যুদ্ধ জেতার বাহাদুরিটা আদায় করা যাবে। অর্থাৎ কেউ তাদের বিশ্বাস করে না। বলা বাহুল্য, বিশ্বাসঘাতকের বরাতই এমন। তারা কারও কাছে বিশ্বাস্য নয় অতি সহজে।

এই মধ্যাহ্নে একপ্রস্থ বৃষ্টি হয়ে গেল। তারই মধ্যে যুদ্ধ চলতে লাগল। ইংরাজরা তাদের বারুদ রক্ষা করতে পারল আমবাগানের প্রাকৃতিক ছাউনির দৌলতে। কিন্তু নবাবের বিস্তর বারুদ ভিজে গেল। মীরমদনের কামানগুলি নিথর হয়ে পড়ল। মীরমদন ভাবলেন, ইংরাজদেরও বারুদের অবস্থা তাঁদের মতো। সেই ভেবে তিনি বিপুল বেগে ইংরাজদের দিকে ধাবিত হলেন। ঠিক তখনই, তাঁর শিথিল কামান অবস্থায়, ইংরাজদের একটি গোলা এসে তাঁর উরুস্থল ছিন্নভিন্ন করে দিল।

মোহনলাল যুদ্ধ করতে লাগলেন। আহত মীরমদনকে সবাই ধরাধরি করে সিরাজের সুমুখে এনে রাখলে। কিন্তু তিনি অধিক কথা বলতে পারলেন না। তিনি শুধুমাত্র বলতে পারলেন, শত্রুসেনা আম্রবনে পলায়ন করেছে। তথাপি নবাবের প্রধান সেনাপতিগণ কেউই যুদ্ধ করছে না। তারা নিজ নিজ সৈন্য-সহ চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

'He was immediately carried to the Nawab and having uttered a few words, expressive of his own loyalty and the want of it in others died in his presence.'

বিহ্বল সিরাজ মীরজাফরকে ডেকে পাঠালেন। মীরজাফর অনেক চিন্তাভাবনা ও বিলম্ব করে, প্রাণাধিক পুত্র মীরণ এবং পাত্র অমাত্যদের সঙ্গে নিয়ে অবশেষে নবাবের পটমণ্ডপে এসে উপনীত হলেন। তাঁর ভাবনা ছিল, হয়তো বা নবাব তাঁকে বন্দি করবেন; কিন্তু তার বদলে সিরাজ তাঁর সুমুখে রাজমুকুট নামিয়ে রেখে ব্যাকুল বলে উঠলেন, যা হওয়ার যথেষ্ট হয়েছে, তুমি ভিন্ন এই রাজমুকুট রক্ষা করে এমন কেহ আর নাই। মাতামহ জীবিত নেই। এখন তুমি তাঁর স্থান গ্রহণ কর। মীরজাফর, মরহুম আলিবর্দীর নাম স্মরণ করে আমার মানসম্ভ্রম ও প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা করো।

মীরজাফর অতীব সম্ভ্রমে রাজমুকুটের প্রতি কুর্নিশ জানিয়ে বুকের উপর বিশ্বস্ত হাত রেখে বললেন, অবশ্যই শত্রুজয় করব আমরা। দিবা প্রায় অবসান হয়েছে এখন। সিপাহিরা দিনভর যুদ্ধ করে ক্লান্ত। আজ তারা শিবিরে গিয়ে বিশ্রাম করুক। প্রভাতে আবার যুদ্ধ করলেই হবে।

সিরাজ বলেন, নিশাকালে ইংরাজ আক্রমণ করলে যে সর্বনাশ হবে।

মীরজাফর সগর্বে বলেন, আমরা রয়েছি কী করতে!

একেই বলে মতিভ্রম। সিরাজ মনে মনে হতক্লান্ত। প্রায় মানসিকতার চূড়ান্ত ধ্বস্ত অবস্থা। এ অবস্থায় তিনি যুদ্ধরত সেনাদলকে শিবিরে ফিরে আসার আদেশ জারি করতে

বাধ্য হলেন। মহারাজা মোহনলাল তখনও মহাবিক্রমে শত্রু সেনার দিকে ধেয়ে চলেছেন। তিনি সসম্ভ্রমে বলে পাঠালেন, মাত্র আর দু-চার দণ্ডের মধ্যেই যুদ্ধ শেষ হবে। এখন কী পিছু ফেরার সময়। ফিরলে সর্বনাশ ঘটবে। এ খপরে মীরজাফর শিউরে উঠলেন। তিনি হরেক কৌশল ঠাউরে নবাবকে বোঝাতে বসলেন এবং সফল হলেন! মোহনলালের কাছে আবার নির্দেশ গেল, ক্ষান্ত হও! শিবিরে ফিরে এসো।

মোহনলাল রোষে, দুঃখে, ভেঙে পড়লেন। এ যেন প্রায় জিতে আসা বীর যোদ্ধার হাত হতে অস্ত্র কেড়ে নেওয়া। কিন্তু তাঁর কী-বা করার আছে। সামান্য এক মনসবদার হয়ে কেমন করে সেনাপতির নির্দেশ লঙ্ঘন করা যায়।

মীরজাফরের মনোবাসনা পূর্ণ হল। তিনি তখনই ক্লাইভকে পত্র লিখলেন, মীরমদন গতাসু হয়েছেন। আর লুক্কায়িত থাকা নিষ্প্রয়োজন। ইচ্ছা হয় এখনই, অথবা রাত্রি তিন ঘটিকার সময় শিবির আক্রমণ করবেন। তা হলেই কার্য সিদ্ধি হবে।

মোহনলালকে সদলে শিবিরে ফিরতে দেখে ইংরাজসেনা আমবন থেকে বাহিরে আসতে লাগল। ক্লাইভ এ সময়ে মৃগয়ামঞ্চের কক্ষ মধ্যে পোশাক পরিবর্তন করছেন। 'Some say he was asleep; which is not improbable considering how little rest he had for so many hours before; but this is no imputation either against his cocrage or conduct.'

ক্লাইভ উন্মুক্ত প্রান্তরে, সেনা মধ্যে প্রবেশ করলেন দ্রুত। তিনি এবার স্বয়ং সেনাচালনার ভার তুলে নিলেন। এই দেখে অনেকেই পলায়ন করতে লাগল। কেবলমাত্র ফরাসি বীর সিনফ্রেঁ আর মোহনলাল রুখে দাঁড়ালেন। সঙ্গে তাঁদের সেনাদল। তারা প্রাণপণ যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগল।

এ ধারে চতুর রাজদুর্লভ সেনাদের পলায়নের খপর নিয়ে সিরাজকে ক্রমাগত উত্তেজিত করতে লাগলেন—পলায়ন করতে। নবাব কিছুই বুঝতে পারছেন না কী করবেন। বাইরে ছত্রভঙ্গ অবস্থা। সেনাদল যে যেমন পারছে যুদ্ধ করছে। মাথার ওপর কর্তৃত্ব করার মতো কেউ নেই! তদুপরি—নবাবের সৈন্যদের ভরসা মান্ধাতা আমলের গাদা বন্দুক। ক্লাইভের সেনাহস্তে হাল আমলের গোলা-অস্ত্রাদি। এ অবস্থা-বিভ্রমে, এলোপাথাড়ি যুদ্ধ অলীকতার মাঝে, নবাব সেনাদল যেমন তেমন যুদ্ধ জারি রেখেছে কেবল। সমর পরিচালকের অভাবে মালবহন করার গো-গাড়িগুলি, ঘোড়সওয়ারদের অশ্বগুলি, সামনে এসে পড়ে কাদায় আটক হতে লাগল। লড়িয়েরা পশ্চাতে পড়ে গেল। ক্লাইভের গোলায় শ'য়ে শ'য়ে গরু-ঘোড়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হতে লাগল।

সিরাজ স্থির করলেন—এমত অবস্থায় পলাশিতে পরাস্ত হয়ে কী লাভ! তার চেয়ে মুরসিদাবাদে ফিরে গিয়ে রাজধানী রক্ষা করাই কর্তব্য। সিরাজ তখনই এক তেজি উটের পৃষ্ঠে চড়ে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করলেন। সঙ্গে দুই সহস্র অশ্বারোহী।

'সিরাজদ্দৌলানে যব লস্করকা ইয়া হাল দেখা, নেয়ায়েৎ খৌফ্‌মন্‌ হো খসুস তালা আদুসে। কেঁওকে বহুত কমলোগোঁকে আপনা দোস্ত জান্‌তা থা...কৈ ঘড়ি-ভড় রোজ কী রহথা কে খোদভি ভাগ নিক্‌লা।'

নবাব মনসুরোল-মোলক-সিরাজদৌলা-শাহকুলী খাঁ-মীরজা-মোহম্মদ-হায়বৎজঙ্গ বাহাদুর যখন রণক্ষেত্র ত্যাগ করলেন তখন অপরাহ্নকাল।

কুমারহট্টের একানড়ে বাস্তুর অদূরে বুনো জাঙাল-সমৃদ্ধ বিভুঁইয়ে বসে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ মহানন্দে স্বরচিত সমরসংগীত উপভোগ করেন।

কামিনী যামিনী—বরণে রণে এল কে।
উলঙ্গ এলোকেশী, বাম করে ধরে অসি,
উল্লাসিতা দানব-নিধনে।।
পদভরে বসুমতি, সভীতা কম্পিতা অতি,
তাই দেখে পশুপতি পতিত চরণে রণে।।
দ্বিজ রামপ্রসাদে কয়, তবে আর কি রে ভয়,
অনায়াসে যম জয়। জীবনে মরণে রণে।।

যুদ্ধ যুদ্ধ। চিন-ভারত যুদ্ধ। যখনই রেডিও চলে তখনই সেই একই খবর।

তারই মাঝখানে আমার পিতামহ তাঁর গমগমে স্বরে কী সব পদ্য আউড়ে যান। ইংরেজি, সংস্কৃত ভাষায়। বাংলা পদ্য মোটে নয়। আমি ভাবি, বাংলায় এত সব নামকরা কবি। রবীন্দ্রনাথও কি তাঁর মনে পড়েন না!

পাড়ার ইংরেজি পাগল আর অমৃতবাজারে প্রায়ই পত্র লেখক শ্রীদেব বসুদাদু এসে, তাঁর মুদ্রাদোষ, ফিস ফিস করে বলেন, বুঝলেন মাস্টারমশাই Poet SHIRLEY সায়েবের কোনও জুড়ি নেই।

দাদু ভ্রূ কুচকিয়ে কন, হুঁ। তা কোন কবিতাটা এখন আপনার মনে চাগাড় দিচ্ছে শুনি?

শ্রীদেব দাদু পাকা বিনবিনে মাথা আর লম্বা লম্বা সাদা দাড়িতে আঙুল চালাতে চালাতে বলেন, THE LAST CONQUEROR.

দাদু উল্লসিত অবস্থায় যেন তুড়ি লম্ফ দেন।

Victorious men of earth, no more
Proclaim how wide your empires are,
Though you bind in every shore
And your triumphs reach as far
As night or day,
Yet you, proud monarchs, must obey
and mingle with forgotten ashes, when
Death calls ye to the crowd of common men.

শ্রীদেব দাদু হাততালি দিয়ে বলেন, ধন্য, ধন্য মাস্টারমশাই। কী আপনার রেসিটেশন। কী অ্যাকসেন্ট।

দাদু মৃদু হাসেন, আসলে উচ্চারণ ঠিক না হয়ে যায় কোথায়। রাঁচি জেলা স্কুলে যখন পড়তাম, সবে বাপ মরা অবস্থায়, মেজো কাকার আশ্রয়ে, উইলিয়াম টিপিং ছিলেন আমাদের হেডমাস্টার। আবার উনিই ইংরেজি পড়াতেন। সামনে দাঁড় করিয়ে জিভের তলায় উড পেনসিল চেপে ধরে উচ্চারণ শেখাতেন। ফলে ওযাজ এর বদলে ওঅজ। তারপরে ধরুন—মাদার, ফাদার—শেষের, আর, উচ্চারণ প্রায় না হওয়ার মতো। মানে সাইলেন্ট।

শ্রীদেব দাদু হেসে বলেন, তবে আমার এখন এক টুকরো বাংলা পদ্য মনে পড়ছে। বলব?

—নিঘ্‌ঘাৎ বলবেন, নিঘ্‌ঘাৎ।

শ্রীদেব দাদু সাদা দাড়ি দুলিয়ে কন, সূর্যোদয় হল আজি পশ্চিম গগনে। হেস্টিংস ডিনার খান কান্তের ভবনে।

দাদু চোখ কুঁচকে ঝুঁকে পড়ে বলেন, রবি ঠাকুর নিশ্চয়ই নয়।

—মোটে নয়। মোটে নয়। এ এক অখ্যাত কবির রচনা।

দাদু এবার গলা নামিয়ে অন্যমনস্ক গলায় বলেন, আসলে আমাদের দেশে বিখ্যাত কবিদের আড়ালে কত সব অচেনা অজানা কবি রয়ে গিয়েছেন। কেউ গাছতলায় বসে গান, কবিতা লিখেছেন, আর সেগুলোই সংসারে থেকে গিয়েছে। তাঁরা আসলে নিজের আনন্দের জন্যেই লিখে গিয়েছেন। প্রাতিষ্ঠানিকতার তোয়াক্কাই করেননি।

আমার অমনি মনে পড়ে যায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই চিঠিখানার কথা। ওই যে, শেষকালে লিখলেন, 'আশীর্বাদ করি—সেই গ্লানিহীন আনন্দে রহো'। এই দ্বিতীয় চিঠিখানা এল সেদিন, আমার বিজয়ার প্রণামের জবাবে। সেখানে আর একটা কথা ছিল—'আমাদের দেশের সাধুরা বলেন—আনন্দ রহো।'

তা হলে আনন্দেরও ভাগাভাগি থাকে। মানে পরিষ্কার দু'টো ভাগ। একটার সঙ্গে গ্লানি জড়ানো, আর একটা ঝাড়া হাত পা।

তা হলে আমার কানু বাবা, এই যে সুযোগ পেলেই অমৃত গলায় ঢালেন, তার সঙ্গে কি কোনও গ্লানি বা দুঃখু জড়িয়ে আছে! বাবার মতো এরকম তরতাজা প্রাণ মানুষ খুব একটা দেখেছি কী! আমার দু'চার বন্ধুদের বাবাদের কথা ভাবি। তাঁরা সব আর পাঁচ সাদাসাপটা একমেটে মানুষ। বাবার মতো এমন বহুরঙা মানুষ তাঁরা নন। কী রকম ভদ্র, ধীর স্থির, গোছানো ব্যাপারস্যাপার। তাঁরা শীতকালে মোজা, মাফলার, সোয়েটার, কোট প্যান্ট। কানু বাবা প্রবল শীতেও ইঁদারা জলে হুড়হুড়িয়ে চান। তারপর প্রায় পা থেকে মাথা অবধি বডি পাউডার। তারপর হাওয়াই শার্ট-প্যান্ট। সাইকেলে চড়ে সোজা হালিসহর স্টেশন। ট্রেনে বাবার একটা দল থাকে। সব কমবয়েসী। কেউ কলেজ, কেউ সবে চাকরি। বাবার জন্যে সিট রাখা থাকে জানলার ধারে। বসেই বাবা বন্ধ জানালা খুলে দেয়। হু হু বেদম হাওয়ার মুখে শীতের চাবুক খেতে খেতে বাবা অফিস যায়। যেতে যেতে আবৃত্তি করে। গান গায়। পুরো রাস্তাটা জমে যায়।

বাবার সঙ্গে এক দু'বার কলকাতা যেতে যেতে আমার এইসব কাণ্ড দেখা হয়েছে। একবার কে একজন বলেছিল, এ আপনার ছেলে! এমন শান্তশিষ্ট!

বাবা চোখ পাকিয়ে বলেন, শান্ত! কে বললে তোমায়। বাড়িতে দেখলে টের পেতে।

বাবা তো ঠিকই বলেছে। আমি কখনও হাঁটি না। সব সময়েই দৌড়ই। দোতলা থেকে নীচে নামতে এতগুলো সিঁড়ি টপকাই মাত্র তিন লাফে। প্রথম ধাপ থেকে লাফ শুরু হয়। আমার পারুলবালা দিদিমা আমার মা'কে প্রায়ই বলে, খুব ছোটবেলায়, ও যখন আমাদের বাড়ি আসছে—আমি আগেভাগে আলনাটা খালি করতাম। ও তো ঘরে ঢুকেই টান মেরে মেরে সব কাপড়চোপড় ফেলে দেবে।

এও বুঝি একধরনের যুদ্ধ, যেটা এখন দেশে লেগেছে। তবে আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একতরফা। বাবার হাতে মার খাওয়া, সে তো ভয়ঙ্কর। বাবার যখন তখন শাসনও সাঙ্ঘাতিক। বাপী বদছেলে। পড়াশোনা করে না। এই বয়স থেকে বিড়ি খায়। ও তোমায় ডাকতে আসে কেন?

এ নিয়ে আমাদের রোয়াক থেকে কোমরে বাঁ পায়ে ইস্টবেঙ্গলের সেন্টার ফরওয়ার্ডের এক সপাট কিক। লিকলিকে আমি উড়ে যাই। ছিটকে পড়ি উঠোনের মাঝখানে, দোফলা আমতলায়। আমি সঙ্গে সঙ্গে জামা প্যান্টের ধুলো ঝেড়ে দে দৌড়। বাবার মার খেলে আমার চোখে জল আসে না। গায়ে ব্যথা হয় না।

বাবার দেওয়াল আলমারিতে রাখা কিছু বই থেকে সেদিন 'প্রিয় বান্ধবী' বইটা দুপুরে লুকিয়ে পড়ে ফেল্লাম। লেখক প্রবোধ সান্যাল। টের পেয়ে সে রাতে বেদম মার। চুলের মুঠি ধরার ফলে খামচা খামচা চুল ওপড়ায়। মুখে সজোরে ঘুঁসি মারায় নীচের ঠোঁট ফুলে ঢোল। কিছু খেতে গেলেই ঢেলাটা কামড়ে ফেলি। আমি বুঝতে পারি না, বইখানা পড়ায় কি এমন অপরাধ হল।

বাবা দোতলার ঘর থেকে তৈরি অবস্থায় চিৎকার করে আবৃত্তি করে, আমি বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা, চির উন্নত শির—বলবীর। কবিতাটার মধ্যে শাসন, ত্রাসন, এইসব কথাগুলো আছে। সবমিলিয়ে একটা যুদ্ধ যুদ্ধ পরিবেশ।

অথচ এই বাবা-ই যখন মধুর স্বরে গায়, পাগলা, মনটারে তুই বাঁধ, তখন কীরকম যুদ্ধবিরতির ফাঁকে ভয়ঙ্কর মনখারাপ করা উদাস কনকনে হাওয়া হয়। লাদাখ সীমান্তে গুম গুম কামান গর্জায়। বরফে বরফে ছয়লাপ ওই যুদ্ধ-এলাকায় রেডিওয় কোনও বাঙালি সেনা কান পেতে শোনে আর এক যুদ্ধের গান।

শঙ্কর পদতলে, মগনা রিপুদলে,
বিগলিত কুন্তল জাল।...
নিগম সারিগম, গণ গণ গণ,
মবরব যন্ত্র মণ্ডন ভাল।
তা তা থেই, দ্রিমকি দ্রিমকি,
ধা ধা ডম্ফ বাদ্য রসাল।।
প্রসাদ কলয়তি হে শ্যামা সুন্দরি!
রক্ষ মম পরকাল।
দীন-হীন প্রতি, কুরু কৃপালেশ,
বারবার কাল করাল।।

এটা রাত পৌনে এগারোটার লাইভ প্রোগ্রাম। গাইছেন পান্নালাল।

ঊনসত্তর

রাত পৌনে এগারোটার লাইভ প্রোগ্রামে পান্নালাল ভট্টাচার্য প্রথম গানটি রামপ্রসাদী গেয়ে থামলেন। কী আশ্চর্য, বোধহয় ভারত-চিন যুদ্ধুর কথা মাথায় রেখে এই যুদ্ধ অথবা সমর-সংগীত।

তারপরে ওঁর সেই বিখ্যাত মন দুখিয়ে দেওয়া গান। এটিও রামপ্রসাদী। গোটা গানটি ভারী কান্না জড়ানো। শুনতে শুনতে মন হু হু করে। সুরটি বুঝি সকাল বেলাকার। ললিত বিভাস। একতালা। সে যাই হোক, এই রাতেরবেলাতেও সকালবেলার যত দুঃখু, বেদনা, হাহাকার সবকিছু একলপ্তি করে মনের চোখ দিয়ে জল ঝরে অবিরল।

আশার আশা, ভবে আসা
আশা মাত্র হল।
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে, ভ্রমর ভুলে র'লো।
নিম খাওয়ালে চিনি বলে,
কথায় করে ছলো।
ও মা-মিঠার লোভে তিত মুখে,
সারা দিনটা গেল।
খেলবি বলে ফাঁকি দিয়ে নাবালে ভূতলে।
একি খেলা খেলালে মাগো,
আশা না পূরিলো।।
প্রসাদ বলে, ভবের খেলায়,
যা হবার তা হল।
এখন সন্ধ্যা বেলায় কোলের ছেলে,
ঘরে নিয়ে চলো।।

রেডিও'র ভেতর থেকে মিহি এস্রাজ, বেহালার সঙ্গে পান্নালাল যখন গানটি গেয়ে চলেন তখন যেন তিনি গায়ক নন, অতি দুখী শ্রান্ত এক মানুষ, গানের সঙ্গে বুকের যাবতীয় জমে থাকা কান্না উজাড় করে দিচ্ছেন। ঠিক যেমন, এখন এই রাতের বেলা লাদাখ সীমান্তে বরফে মোড়া ট্রেঞ্চে ঘর-বিরাগী সেনাদল তটস্থ, ঘুম নেই, আগুনে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সজাগ। হু হু বাতাসে তুষার উড়ছে। নতুন করে বরফ জমছে স্তরে স্তরে। কোথাও তুষার গলার খবর নেই। তবু পান্নালালের বুকের বরফ পাথর গলে-গলে যাচ্ছে। গান শুনতে শুনতে আমার আফিংপ্রাপ্ত পিতামহ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠেন। ও ঘর থেকে আমার কানুবাবা জড়িয়ে জড়িয়ে বলে যায়, প্রসাদ বলে, ভবের খেলায় যা হবার তা হল-ও-ও-ও—

এরপর ঘোষণা গম্ভীর কণ্ঠে। পান্নালাল ভট্টাচার্যের পরের গান—। গান হয়, ওপার আমায় হাতছানি দেয়, যেতেই আমায় হবে..

এর দু-তিনদিন পরে—দুপুরবেলায় 'অনুরোধের আসর'-এর শুরুতে আচম্বিতে ঘোষণা—আমরা গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি—সংগীত শিল্পী পান্নালাল ভট্টাচার্য...

প্রথম গানটি তাঁকে দিয়েই শুরু। রূপালি চাঁদ যাদু জানে...। আধুনিক বাংলা গান।

এদিকে তাঁর ছাত্র দুর্গাকাকা, আমাদের গৌরীপদ স্যারের দাদা, তখুনি কাঁদতে কাঁদতে ছুটে ট্রেন ধরলেন। কলকাতায়, নেপাল ভট্টাচার্য ফারসট লেন-এর বাড়িতে।

ভালো রাঁধতে পারতেন বলে, আগের দিন দুপুরে বাড়ির সবাইকে চিংড়ি মাছের মালাইকারি রেঁধে খাইয়েছেন। তারপর রাতেরবেলা গলায় লুঙ্গি বেঁধে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলে পড়েছেন। ট্যারা চক্ষু দু'খানি এখন ভারী মায়া মায়া, আধখোলা। সামান্য ফাঁক ঠোঁটের আবডাল গলে একটুখানি জিভ দেখা যায়। সলাজ কালীমূর্তির আদলে হলেও এক ফোঁটা জিভ।

আমার মনে পড়ছে সেবার রামপ্রসাদের ভিটেয় গান করতে আসার সময়কার ছবিগুলো। বাঁ হাতটি সামান্য এলিয়ে দুলে-দুলে হাঁটছেন দুর্গাকাকাদের মেটে উঠোনে।

পরনে ধুতি-শার্ট, হাতা গোটানো পরিপাটি করে। পায়ে চটি। রোগা মানুষটি কুচকুচে ব্যাকব্রাশ চুল সমেত দুলে দুলে হাঁটছেন। বয়েস মাত্র তিরিশের ওধারে।

পরদিন আনন্দবাজারে যে খবরটা বেরল তাতে এক চমৎকার ভাষা। লেখা হল—উদ্বন্ধনে মৃত্যু। প্রথমে তো কিছুতেই উচ্চারণ করতে পারি না। কেবলই উধন্ধনে, উধন্ধনে বলি। অনেক পরে সমস্যাটা খোলসা হয়। গলায় দড়ি জাতীয় কিছু না বলে এরকম একটি চমৎকার আর গম্ভীর শব্দ। আমি একা একা পুকুরধারের আঁদাড়ে ঘুরি আর আপন মনে বিড়বিড় করি, উদ্‌বন্ধনে—উদ্‌বন্ধনে—

পুকুরের আকাশে মেঘ ভেসে যায়। হরেক ছবির মেঘ। তার মধ্যে একখানা মেঘ পান্নালাল হয়ে দুলতে দুলতে ক্ষিতীশ দাদুর বাগানে বোম্বাই আমগাছের মাথা টপকে চলে যায় বঙ্কিমবাবুব শ্বশুরবাড়ির গোলাপি ঘরের মাথায়। সেখানে, ওই ঘরের লাগোয়া ছাদে, বাবু দুপুরের ভাত খেয়ে ভাজা মৌরি আর সুপুরি চিবোতে চিবোতে পায়চারি করতে করতে আপন মনে বিড়বিড়োচ্ছেন, 'এতদিনে সব ফুরাইল। সন্ধ্যাকালে যখন নগেন্দ্র দত্ত মধুপুর হইতে পাল্কীতে উঠিলেন, তখন এই কথা মনে মনে বলিলেন, 'আমার এতদিনে সব ফুরাইল।...যতদিন মানুষের আশা থাকে, ততদিন কিছুই ফুরয় না, আশা ফুরাইলে সব ফুরাইল।'

পান্নালালের মেঘ-মূর্তি আকাশ পটে গেয়ে ওঠে, আশার আশা ভবে আসা, আশা মাত্র হলো...

দাদু খবরের কাগজ থেকে চোখ তুলে বলেন, অমৃতবাজার পান্নালালের খবরটা ছোট করে ছেপেছে।

কানুবাবা ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাড়ি কামাতে কামাতে আয়নার ভেতর দিয়ে দাদুর দিকে তাকায়। তারপর কতক অকারণেই বলে ওঠে, এই তো দেশের অবস্থা।

দাদু বলেন, দেশের অবস্থা মোটেই সুবিধের নয়। পণ্ডিত নেহরু যে কী চাইছেন তা ভগা জানে।

আমি জানি দাদু ভগবান কথাটিকে ছোট করে 'ভগা' বলেন।

বাবা বলে, পণ্ডিত নেহরু গোড়া থেকেই প্যাঁচে পড়েছেন। আপনি শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর কথাটাই ধরুন না কেন।

দাদুর মুখের চেহারা অমনি বদলে যায়। পাল্টে যায় গলার স্বর। তিনি বলে ওঠেন, শ্যামাপ্রসাদের অস্বাভাবিক মৃত্যু কাশ্মীরে বন্দি অবস্থায় ১৯৫৩-তে হল। কথাটা হচ্ছে A death in detention and detention without trial। নেহরু পর্যন্ত কোনও নিরপেক্ষ তদন্ত করিয়ে উঠতে পারলেন না।

বাবা, তা হলেই বলুন।

দাদু, আমাদের মাস্টারমশাই ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি শ্যামাপ্রসাদেরও teacher ছিলেন। ডক্টর মুখার্জি তখন আমাদের গভর্নর, একটি সাঙ্ঘাতিক বক্তৃতা দিয়েছিলেন শেরিফের ডাকা শোকসভায়। বক্তৃতায় তিনি বললেন, What has added to the poignancy of our grief is that he died in detention।

বাবা, যে ঘরে তাঁকে রাখা হয়েছিল, সেটা তাঁর মতো নিমোনিয়া রোগীর পক্ষে যম। ঠান্ডা, স্যাঁতসেঁতে। তার ওপর কাশ্মীরের মতো শীত।

দাদু, হ্যাঁ, প্লুরিসি-র পেশেন্টকে স্টেপটোমাইসিন দেওয়া হল। সো কলড্ একটি বিশ্রী নার্সিংহোমে তাঁকে রাখা হয়। সেখানে রাজদুলারী টিকু নামে একজন মাত্র নার্স তাঁকে দেখাশুনো করছিলেন। তিনি পরে বলেছিলেন, শেষ অবস্থায় যন্ত্রণায় কাতর হয়ে শ্যামাপ্রসাদ একজন ডাক্তার চাইছিলেন। কিন্তু কোনও ডাক্তার তখন ছিলেন না। সেই নার্স তখন ঝাড়ুদারকে ধরে পাকড়ে একজন জুনিয়র ডাক্তারকে ডাকান। তিনি এসে আসল ডাক্তারকে ফোন করেন। কিন্তু তিনি আসার আগেই রুগি expired। রাত তখন দু'টো পঁচিশ।

বাবা, যে ঘরে তাঁকে রাখা হয় সেটা কনকনে ঠান্ডা। পেঁচা আর সাপে ভর্তি।

আমাদের বাড়ির ছাদের কার্নিশে প্রায় রোজ রাতে একজোড়া মস্ত ভুতুম পেঁচা এসে বসে। বসে বসে থেকে থেকে হুম্ হুম্ রব করে।

আমাদের গোয়ালঘর থেকে মাঝে-মাঝেই একটি জাতসাপ উঠোনে নেমে ঘুরে বেড়ায়।

অস্বাভাবিক মৃত্যুর সঙ্গে সাপ পেঁচার কোন যোগ আছে কি?

কুমারহট্ট হালিসহরের অপরাহ্ন-আঁকা আকাশে, মেঘ মেঘ পথের অলখে, যখন পলাশির এক দিবসের মাত্র যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে রাজধানী মুরসিদাবাদ অভিমুখে নবাব সিরাজ উটপৃষ্ঠে যাত্রা করেছেন, তখন সেই হুবহু ছবিখানি মেঘে মেঘে আঁকা হচ্ছে। নবাব ভারী কাতর, বিচ্ছিন্নমনা আর কিছু সাথী থেকেও একাকী। প্রসাদ দেখছেন, তরুণ নবাবের মুখমণ্ডল খর কালো—যেন বা বাসি রক্তের পড়শি। তাঁর মনি-মানিক-খচিত উষ্ণীষ সুমুখে নুয়ে পড়েছে।

রামপ্রসাদ লিখছেন, যুদ্ধ সবে অতীত সমরসংগীত। দেশে যুদ্ধ এখন না রইলেও তার চিতার আগুন এখনও মরেনি।

রাগিনী মল্লার। তাল খয়রা।
সদাশিব—শবে আরোহিনী কামিনী,
শোভিত শোণিতধারা মেঘে সৌদামিনী।।
একি দেখি অসম্ভব, আসন করেছে শব,
মূর্তিমতী মনোবব ভব-ভামিনী।।
রবি শশী বহ্নি আঁখি, ভালে শশী শশিমুখী,
পদনখে শশিরাশি গজগামিনী।
শ্রীকবিরঞ্জন ভনে, কাদম্বিনী রূপ মনে,
ভাবয়ে ভকত জনে, দিবস-রজনী।।

সর্বাণী এসে দাঁড়ায় দিঘল ঘোমটা টেনে প্রসাদের প্রাকৃতিক পটমণ্ডপ এই বুনো ঝোপ-জাঙালের দোসর প্রকাণ্ড ছাতিমতলে। এখানে অপরাহ্নের আলো এখনও যায়নি। গাছেদের ডালে-পাতায় বৈকালিক পাখিরা আলাপ করছে। তাদের এক-একপ্রকার রব এক-এক মহিমা দিয়ে সাজিয়ে দিচ্ছে এ বনভূমিকে। শব্দের রূপপ্রকার যে কী মহিম সে-কথা এই শব্দধারিণী প্রকৃতি বুঝেও বুঝতে পারছে না। একেই বুঝি পেয়েও হারানো বলে।

সর্বাণী একা নয়, সঙ্গে দুই ব্যক্তিও বটে। তারা দূর হতে ভুঁয়ে নুয়ে দণ্ডবৎ রাখে। আর

অমনি রামপ্রসাদের বুকে অনতিস্মৃতি ঝলসে ওঠে। স্মৃতি বলে—কৃষ্ণনগর, কৃষ্ণনগর। রাজবাড়ির অতিথিশালায় সেই একটি প্রভাত এবং সেখানে হাজির কবিবর রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র।

সুমুখে বিনীত দণ্ডায়মান ওই মানুষজোড়া সেদিন রামতনু আর ভজহরিকে কী বিপদেই না ফেলেছিল। সাতসকালে রাজসড়কের ওপর একটি মরা গরু আর শকুন ঝাঁক। মরা প্রাণী তো তেড়ে আসতে পারে না। তার বদলি তাড়া করেছিল শকুন পাল। কৃষ্ণনগরের এই পটুয়ার আশ্চর্য শিল্প কারসাজিতে মৃত গরুর অস্তিত্ব ও মৃতত্ব নিয়ে কোনও সংশয় ঘটেনি সেদিন। স্মৃতিধর প্রসাদের নাম দু'টিও মনে পড়ে যায়। বাপটির নাম মহাদেব আর পটুয়ার সহকারী বেটার নাম বুঝি গণেশ। এই হালিসহরের কুমোরপাড়ায় রাজার দেওয়া ভূখণ্ডে তাদের একখানি কুঁড়ে আছে। তারা সেখানে বচ্ছরান্তে ঘুরে যায়।

সর্বাণী চলে যায় তাদের এখানে পৌঁছে দিয়ে। এটিই যেন তার কাজ ছিল। আর সে চলে যাওয়ামাত্র সেখানে এসে পড়ে ভজহরি। সে এসে তখনই কী যেন বলতে চাওয়া মুখে কুলুপ আঁটে। গোল গোল চক্ষুসমেত সদ্য উপনীত বাপ-বেটাকে দেখে।

প্রসাদ কতক আনমনা বলে ওঠেন, ভালো আছ তো তোমরা?

মহাদেব পটুয়ার চোখে-মুখে এই প্রশ্নের জবাব ঘনতর ত্রাস আর বেদনা হয়ে ফুটে ওঠে। তার ক্ষুদ্রাকৃতি দু'চোখ, কাঁধ ছোঁয়া কুঞ্চিত বাবরির ঝাড়সমেত বলবন্ত কাঠামোয় কী যেন নেই—কী যেন নেই ফাঁকা হাওয়া। সেই না থাকার কিংবা হারানোর বিবরণ মানুষটির গোটা অবয়বে মুচড়ে উঠতে-উঠতে কোথাও বা থমকে গিয়েছে। আর বার হওয়ার পথ পাচ্ছে না।

প্রসাদ আনমনা ছিলেনই। সেই গতিকেই আবার বলে ওঠেন তিনি, সব কুশল তো?

মহাদেব এ-কথার জবাব না দিয়ে আকাট দাঁড়িয়ে থাকে। তার মুখে কোনও রা ফোটে না। তার বদলে তার বেটা গণেশ কথা বলে, আজ্ঞে আমরা তো এ সময়ে এখেনে আসিনে। আমাদের আসা বলতে ফাগুন-চোত।

ভজহরি বলে, তা এখন এমন অকালে এলে কেন শুনি।

গণেশ কয়, আজ্ঞে দেশে যা আকাল।

ভজহরি, আকাল না যুদ্ধ।

গণেশ, আজ্ঞে, বাবা বলেচে ইটি আকাল। তাই বলছি।

প্রসাদ গম্ভীর মুখে বলে ওঠেন, তা হলে এমন একখানি পদ যদি তোয়ের হয়, তাতে বলা যেতে পারে এই আকালের কথা—একটু ভিন্ন ভাবে।

মহাদেব এবার কথা বলে, বলুন আজ্ঞে। আমরা শুনি।

প্রসাদ আত্মগত কন, সবার আসার আশা, ঘুচায়েছে আশা-বাসা, জীবনে নিরাশা, ফিরে না যায় বাসে।

মহাদেব এবার যেন বিহ্বল হয়ে পড়ে। তার ঠোঁট ফুলে-ফুলে ওঠে অভিমানী বালকের পারা। সে কথা বলে অতি নিম্ন স্বরাভাসে, আজ্ঞে, এ কবিতার চিত্র তো আমি সাত জন্মেও গড়তে পারব না। তবে আপনার ঠাঁয়ে সেদিন কেষ্টনগরে আমি সাধ করেছিলাম, আপনার একখানি পট যদি আঁকতে পারি।

প্রসাদ তাকান মহাদেবের প্রতি, আমার পট! কী হবে এঁকে! রাজারাজড়ার পট আঁকলে তবু কথা ছিল। লোকে দেখবে। দেখতে চাইবে। চিরকাল ইতিহাসের পাতে রয়ে যাবে।

মহাদেব বলে, আজ্ঞা রাজাদের পট আঁকার সাধ্যি আর ইচ্ছে কোনওটিই আমার নেই। আর তা ছাড়া রাজাদের পট আঁকার লোক তো বিস্তর মজুদ আছে। আঁকছেও অনেক। দিশি রাজা, সায়েব রাজা, সকলেরই ছবি আঁকা হচ্ছে। এমনকী যুদ্ধুর ছবিও আঁকছে। তবে কিনা, সে ছবি আঁকছে সায়েব পোটোরা। আর সে-সকল ছবি কত জবরজঙা, রংচঙা। আমার সাধ্যি কী তার ধারে-পাড়ে যাই। তবে কিনা পণ্ডিতমশাইদের ঠাঁয়ে শুনেছি, সমস্ত কলাবিদ্যার মধ্যে চিত্র হল প্রধান।

রামপ্রসাদের নিবিড় মুখমণ্ডলে যেন বা আলো চমকায়। তিনি বলে ওঠেন, হ্যাঁ, কলানাং প্রবরং চিত্রং ধর্ম কামার্থ মোক্ষদম্।

ভজহরি কয়, আমি বৃদ্ধ মানুষদের ঠাঁয়ে শুনিচি, সেকালে আমের রস দিয়ে ছবি আঁকা হত। মানে, বোধহয় আমআঁটির রস।

প্রসাদ, হ্যাঁ, ঠিক কথা। নারায়ণ নামে এক মুনি ছিলেন। তিনিই এক তত্ত্বটি উদ্ভব করেছিলেন। তিনি যখন তপস্যা করছিলেন তখন অপ্সরাগণ এসে তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করার চেষ্টা করে। তাতে তিনি প্রলুব্ধ হলেন না। বরং ওই আমের রস দিয়ে অসামান্য রূপবতী রমণীদের চিত্র এঁকে বসলেন। তখন ওই দিব্যাঙ্গনারার লজ্জা পেয়ে পালাল। ওই চিত্রে উর্বীতে অর্থাৎ পৃথিবীতে অঙ্কিত হয়েছিল বলে তার নাম হল উর্বশী।

মহাদেব একটানা প্রসাদের এই বিবরণ শুনে এবার মুখ তোলে, আজ্ঞে ঠিকই বলেছেন। তবে কিনা আমিও সেই পুরনো নিয়মে পট আঁকি। ভাতের মণ্ড বেশ করে চটকে নিয়ে সাদা থান কাপড়খানির গায়ে ভালো করে মাখিয়ে নিই। তারপর সেটি রোদে শুকিয়ে নিয়ে তার ওপর মসী দিয়ে পট আঁকি।

ভজহরি, শুধু এই!

মহাদেব, আরও আছে। তিনরকমের ইটের গুঁড়ো, তিনভাগ মাটি, গুগ্‌গুল, মোম, যষ্টিমধু, মুরুক, গুড়, মহারজন আর তেল। এদের সঙ্গে তিনভাগ আগুনে পোড়া চুন মিশিয়ে সবগুলো একত্রে মেশানো হয়। তারপর কাঁচা [illegible] গুঁড়োর সঙ্গে বালি দিতে হয়। শেষকালে এই দ্রব্যগুলি গাছের বাকলের জলে ভিজিয়ে রাখি টানা একমাস। তারপরে এই জলে পট আঁকবার কাপড় ভেজাই। এতে পট আঁকলে একশো বছরেও পট নষ্ট হবে না।

প্রসাদ বলেন,

অপি বর্ষশতস্যান্তে ন প্রণশ্যেত্তু কর্হিচিৎ।

গণেশ কয়, আমাদের ঝুলিতে এই কাপড়, রং তুলি সবই আছে।

প্রসাদ বলেন, তা যদি আঁকতে হয় আঁকো। তবে বাপু যেমন আছি তেমনি এঁকো। রাজাগজাও আঁকতে হবে না আবার জটাধারীও করতে হবে না। যা দেখবে, তাই আঁকবে। চিত্রে সাদৃশ্যকরণ বলে একটি কথা আছে।

মহাদেব বলে যায়, কাল সকালে কাজ শুরু করব আজ্ঞে। এখন তো দিনের আলো ফুরিয়ে এল।

রামপ্রসাদ গীতের পাতে হেঁট হয়ে লেখনি তুলে নেন। গীত রচিত হয়—

নলিনী নবীনা মনোমোহিনী।
বিগলিত চিকুরঘটা, গমনে বরটা,
বিবসনা শবাসনা মদালসা।।
ষোড়শী ষোড়শ কলা, কুশলা সরলা,
ললাটে বালার্ক বিধু, শ্রুতিতলে ব্রহ্মা বিধু,
মনুজ্ঞা মধুরমুখী, মধুর লালসা।।...

পরদিন সকালের প্রথম আলোর মাঝখানে রামপ্রসাদের পট আঁকা আরম্ভ করে মহাদেব পটুয়া। পাশে থেকে পুত্র গণেশ তুলি ও এটা-সেটা এগিয়ে দেয়। প্রসাদ আপন মনে পাকুড়তলে বসে সমর সংগীতে বয়ে যান—পাতড়ার পাতে। কলম টগবগ নৃত্য করে। দেহে রক্তস্রোত চনমন করে।

ওধারে গতকাল অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকা পর্যন্ত পলাশি ময়দানে যুদ্ধ ঘটেছে। অবশেষে মোহনলাল ও সিনফ্রেঁ বিশ্বাসঘাতক নবাব সেনানির ওপর বিরক্ত ও হতাশ হয়ে সমরাঙ্গন পরিত্যাগ করেছেন। ক্লাইভ এসে উপনীত হয়েছেন নবাব সিরাজের ফেলে যাওয়া খাঁ খাঁ পটমণ্ডপে। পলাশির যুদ্ধ নামক তামাসার শেষ চিত্রপটখানি উদঘাটিত হয়েছে। ইংরাজ যুদ্ধবিশারদ মহামতি Col. Malleson তাঁর ইতিহাসের হাত খাতায় লিখে রাখছেন, 'It was not a fair fight'.

অপবদিকে, গত অপরাহ্নে সিরাজ পলায়ন করেছেন নিজ রাজধানীর দিকে। বাজারে খপর এবং প্রচার, নবাব দিবা দুই ঘটিকার সময় পলাশি হতে পলায়ন করে সেই রজনীতেই রাজধানীর মহিলামণ্ডলীর বস্ত্রাঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। পরদিবস প্রাতঃকালে, অর্থাৎ '৬ মাহ সাওয়াল রোজ জুমাকো দো তিন ঘড়ি দিন চঢ়ে মনসুরগঞ্জ আ পহুঁছা।'

পিপীলিকা নিতান্ত ক্ষুদ্র কীট, তথাপি বহু সহস্র পিপীলিকার সমবেত শক্তির কাছে রণশার্দুলকেও পরাজয় স্বীকার করতে হয়। সিরাজের ক্ষেত্রে তাই ঘটল। মনসুরগঞ্জ রাজপ্রাসাদে নবাব উপনীত হওয়ামাত্র তাঁর পরাজয় কাহিনি দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল। লুণ্ঠন ভয়ে, যে যথায় পারল পলাতক হতে লাগল। নবাব রাজধানী রক্ষার্থ পাত্র-মিত্রদের পুনঃপুনঃ আহ্বান করতে লাগলেন। অন্যের কথা বাদ রাখলেও সিরাজের শ্বশুব ইরিচ খাঁ পর্যন্ত পলায়ন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি তাঁর ধনরত্ন সহকারে পলাতক হলেন। নবাব অবশেষে সেনা যোগাড়ের জন্য গুপ্ত ধনাগার উন্মুক্ত করে দিলেন। '...but with all that treasure, he could not purchase the confidence of his army, he was employed in lavishing considerable sums among his troops to engage them to another battle.'

মহাদেব পটুয়ার হাত চলে। সে চিত্রে যা অদলবদল করে তা সামান্য। উপবিষ্ট বামপ্রসাদকে কতক কৃতাঞ্জলি দাঁড় করিয়ে দেয়। আর সুমুখে সেই একই ভঙ্গিতে এনে দেয় গত অপরাহ্নে এক ঝলক দেখতে পাওয়া সর্বাণীকে। সেও কৃতাঞ্জলি! আর দু'জনারই সদ্য স্নান সারা দেহ, কাপড়চোপড়।

রামপ্রসাদের রাজকীয় সুন্দর মুখচ্ছবি পটুয়ার তুলিতে ঝলমলায়। তাঁর দীর্ঘ নাসা,

আয়ত চক্ষু আর সুঠাম বক্ষপাট। কুঞ্চিত কেশরাশি ঘাড় তক্কো। আর মুখে বাহার করে ছাঁটা সুচারু গোঁফ-দাড়ি। ঠোঁটের আড়ে কামদ চাপা হাসি ও রহস্য।

প্রসাদ লেখেন যুদ্ধগীতি—
ও কে রে মনোমোহিনী।
ঐ মনোমোহিনী।।
ঢল ঢল ঢল তড়িৎঘটা, মণি-মরকত-কান্তি ছটা,
এ কি চিত্ত ছলনা, দৈত্য, দলনা,
ললনা নলিনী-বিড়ম্বিনী।।

সিরাজ স্থলপথে যাত্রা করলেন জনহীন প্রাসাদ ছেড়ে, পথের ফকিরের মতো। সঙ্গে একজন মাত্র পুরাতন প্রতিহারী আর চিরসহচরী লুৎফউন্নিসা বেগম, ছায়াবৎ পশ্চাতে পশ্চাতে অনুগমনকারিণী।

সিরাজ ভগবানগোলা থেকে নৌকা ছাড়লেন। পদ্মার বিপুল তরঙ্গ ভেঙে শিশুকালের লীলাস্থলে গোদাগাড়ির নিকটস্থ মহানন্দা নদীর বুক বেয়ে উজান ঠেলে উত্তর দিকে ধাবিত হলেন। তাঁর লক্ষ্য বিহারের পাটনা। সেখানকার শাসক রাজা রামনারায়ণ ভারী সাহসী ও প্রভুভক্ত। তাঁর সেনাবল ও সাহায্য লয়ে আবার নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানো যাবে, এই বাসনা। আশা, আবার হৃত সিংহাসন ফিরে পাওয়া যাবে।

ওধারে ক্লাইভ পেয়ে গিয়েছেন মীরজাফরের অভিনন্দন বার্তা। সে পত্র পেযে দাদপুর থেকে তিনি পত্রোত্তর দিলেন।

'I congratulate on the victory which is yours, not mine. I should be glad if you would join me with the utmost expedition. We propose marching tomorrow to complete the conquest...I hope to have the honour of procaliming you Nabob.'

মহাদেব তুলির টানে প্রাণ দেওয়ার চেষ্টা করে চলেছে কবিরঞ্জনের পটচিত্রে। আশা করা যায় এ চিত্র শতবৎসরাধিক জীবন্ত রইবে। পুত্র গণেশ ভাবছে, বাবা যদি রাজারাজড়ার চিত্র আঁকত তাতে করে কী লাভ হত। তার বদলে এমন এক গনগনে মানুষ মূর্তি, যার ছটা রাজার চেয়ে কম নয়, এঁকেই বাবা বুঝি [illegible]জের কাজ করছে। রামপ্রসাদ যথারীতি নিমজ্জিত তাঁর হালে আবিষ্কৃত সমরগীতে।

শ্মশানে বাস, অট্টহাস, কেশপাশ-কাদম্বিনী।
বামা সমরে বরদা অসুর দরদা
নিকটে প্রমোদা প্রমাদগণি।।
কহিছে প্রসাদ না কর বিবাদ
পড়িল প্রমাদ স্বরূপে গণি।
সমরে হবে না জয়ী রে ব্রহ্মময়ীরে
করুণাময়ীরে বল জননী।।

রাজধানীতে পঁহুছে মীরজাফর দেখলেন শিকার হাতের বাহিরে। ফলে তিনি লোক-লস্কর পাঠালেন সিরাজের খোঁজে।

এধারে যুদ্ধে আহত মোহনলালকে হাতের কাছে পাওয়া গেল। কিন্তু তাঁকে মুক্ত করার সাহস হল না মীরজাফরের। তাঁকে বিদ্রোহী সেনানায়ক মহারাজা রায়দুর্লভের হাতে

তুলে দিলেন তিনি। রায়দুর্লভ বিলম্ব না করে, তাঁর ধনসম্পদ হরণ করে তাঁর জীবননাশ করে মীরজাফরের অস্বস্তি নিবারণ করলেন।

জনশূন্য নয়, শত্রুশূন্য রাজধানীতেও মীরজাফর কিন্তু মসনদে বসতে সাহস পেলেন না। তিনি ক্লাইভের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

অবশেষে ক্লাইভ এলেন, দুইশত গোরা এবং পাঁচশত কালা সিপাহি আগুপিছু সাজিয়ে। তিনি মনে ভাবছেন, রাজপথের দু'ধারে যত লোক সমবেত হয়েছে, তারা যদি মনে করে তা হলে কেবল লাঠিসোঁটা আর ইট দিয়েই ইংরাজ নিধন সেরে ফেলতে পারে।

অতঃপর, 'Col. Clive took Mir-Jaffer's hand and led him to the musnud। কোম্পানি বাহাদুরের প্রতিনিধি স্বরূপ ক্লাইভ সবার আগে মীরজাফরকে 'নজর' প্রদান করলেন। তাঁকে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার সুবেদার সম্বোধনে অভিবাদন করলেন।

এধারে সিরাজের বার্তা পেয়ে মসিয়ঁ লা রাজমহলের পথে মুরসিদাবাদে উপস্থিত হওয়ার প্রস্তুতিতে। কিন্তু রাজা রামনারায়ণ অর্থাদি প্রদান করতে দেরি করায় তিনি যুদ্ধযাত্রা করতে পারেননি। তিনি যখন সসৈন্যে ভাগলপুরের কাছাকাছি তখন সিরাজ মহানন্দার স্রোত অতিক্রম করে কালিন্দীর প্রবাহে পড়েছেন। কিন্তু তাঁর নৌকা যেকালে বখরা বরহাল নামে প্রাচীন পল্লির নিকটে এল, অমনি তাঁর গতিরোধ হল। নাজিরপুরের মোহানা পার হতে পারলেই বড় গঙ্গায় প্রবেশ করা যায়। কিন্তু এখন এই নাজিরপুরের মোহনা প্রায় নির্জলা বিশুষ্ক। 'Sirajudowla was obliged to stop at Bahral as the Nazirpore mouth was found closed'।

প্রসাদী রণসংগীত বলে,
রবিসুতা মন্দাকিনী, মধ্যে সরস্বতী মানি,
ত্রিবেনীসঙ্গমে মহাপুণ্য লাভে।
তরুণ শশাঙ্ক মিলে, ইন্দিবর চাঁদ গিলে,
অনলে অনল মিলে অনল নিভে।...

সত্তর

সোম-মৌলি-প্রিয়া নাম, রবিজ মঙ্গল ধাম,
ভজে বুধ বৃহস্পতি হীন কর্মনাশা।
হরিণাক্ষী হরিমধ্যা, হরিহর ব্রহ্মারাধ্যা,
হরি-পরিবার সেই, ভজে দিগ্বাসা।

গীতের শেষটুকু লিখে মনে পড়ে যায় প্রথম চরণটি। এরকমই ইদানীং ঘটছে। কখনও মনে আসে মধ্যচরণ। কভু শেষাংশ। আবার কখনও, যা স্বাভাবিক, অর্থাৎ প্রথম পঙ্‌ক্তি, তাই লেখা হয়। এখানে হল শুরু হতে সমাপন।

অতএব প্রথম চরণ যদি বলে, নলিনী নবীনা মনোমোহিনী। বিগলিত চিকুরঘটা, গমনে বরটা, বিবসনা শবাসনা মদালসা।

এবার আবারও এক নতুন খেলা। গীতের শেষে তার গায়ে গহনা পড়ে। সেই অলঙ্কারের নাম : রাগ, ললিত। তাল : রূপক।

সুর-তালের গহনার চেয়ে যে ভাষা-অলঙ্কারের কোনও জুড়ি নেই। রাজমহিষীর নানা মণি-মরকত জড়িত অলঙ্কার ভূষণের চেয়ে বহু কোটি গুণ মহার্ঘ এই অনাহত নাদ বর্ণবৎ শব্দ। তার হিসাব কষতে বসলে অগাধ বারিধির সুমুখে চিত্রে অর্পিত হয়ে থাকতে হয়। রামপ্রসাদের মনে হয়, কবিতা কিংবা গীতে শব্দচয়ন ও নিরূপণ হল সবার আগে। কী লিখব, কেন লিখব ইত্যাদির সঙ্গে কেমন করে লিখব বিষয়টি জড়িয়ে রয় আষ্টেপৃষ্ঠে। একজন কবির আজীবনও বুঝি এই খাটিত্ব নির্বাচনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। বাগানের ফুল গুনে শেষ করা যায় না। এক-এক ফুল এক-এক জাতির।

সেই ফুলবাগানে ঘুরতে ঘুরতে হরিণাক্ষী জাতীয় সংস্কৃত শব্দ চয়ন করা গেলেও নিজের কাছে নিজেই অবাক বনতে হয় 'দিগ্বাসা'। ব্যাকরণের কচালে, দিক্ বাসঃ যাহার—বহুব্রীহি, তিনি তো অর্থ মোতাবেক স্বয়ং শিব। তা হলে বুঝি এই সিধে কথাটি বক্রভাবে উপস্থিত করার অপর নাম শিল্পকলা। দিগরূপ বস্ত্র। সেই ক্ষণে তো নির্বস্ত্র বা বস্ত্রহীনতাও এক অভিনবব বসন। এ বস্ত্রে কোনও আড়াল রয় না। দিগম্বর, নগ্ন থেকে ধরে 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্যে—অঙ্গ দিগ্‌বাস—কথা জোড়া মনে ভাসে। আহা, ভাষার মতো শিল্পকলার কোনও দোসর হয় না। এই ভাষা বুঝি কবির অজানিতে কলম হতে লেখার পাতে আলো দেখে। এ এক অভিরাম রহস্য। ঠিক তেমনই বুঝি কোনও দোসর হয় না এই পটুয়া মহাদেবের। সকাল থেকে দুপুরের অগ্রমুখ পর্যন্ত পটের বুকে তুলি টেনে চলে সে। সামান্য খোঁজখাঁজেও পটুয়া ভারি সতর্ক। নিখুঁত নামে কথাটি কোনও শিল্পেই খাটে না। সেই একই নিয়মে মহাদেব তুলি চালনা করে যায়। যেমন করে গীত রচনা করেন এই প্রসাদ কবি। এবং এখন, সদ্য পলাশির যুদ্ধ অবশেষে এই সমরসংগীত।

রামপ্রসাদ গীত রচেন কলমের তুলি বেয়ে। তেমনই মহাদেব পটুয়া তাঁর পটচিত্র আঁকে সুমুখে বসে। দু'টিই আদপে এককথার পাকে বাঁধা, শিল্পং কৌশলং শীল্‌সমাধৌ। যাবতীয় শিল্পই কৌশলোৎপন্ন বস্তু। সেই সব যাবতীয় কৌশল মানুষের চিত্তবৃত্তির একাগ্রতা থেকে জন্ম নেয়। এ কাজ কোনও নকল বা অনুকৃতি নয়। এ হল সৃষ্টি। বিশ্ব নিখিলের সৃষ্টির আদি কথাটি তার বুকে লেগে।

এই সৃষ্টির বিপরীত নাম মৃত্যু। আপাতত সিরাজের ললাটে সেই মহামহিম মরণের লিখন বুঝি জ্বলজ্বলন্ত। নাজিরপুরের বিশুষ্ক মোহনায় ঁার নাও চলে না। এই বখরা বরহাল নামে সাবেক গ্রামের কাছে তাঁর নাও আটক পড়ল। নাজিরপুরের এই মোহনা পার তাঁর বড় গঙ্গায় প্রবেশ করার বাসনায় কাঁটা পড়ল। এই বিশুষ্ক জলপথের ধারে ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত নবাব অবশেষে স্বাভাবিক নিয়মে কিছু খাদ্য এবং পানীয়ের আশায় নাও হতে তীরে নামলেন। আর নাবিকরা ছাড়া ছাড়া হয়ে নদীমুখের সন্ধানে বার হল। কোথায় পথ, কোথায় এই আটক-হাল থেকে মুক্তির হদিশ?

অতএব কি আশ্চর্য, বুক ফাটা তৃষ্ণা আর আকাট ক্ষুধা এখন বঙ্গেশ্বরের একমাত্র হৃদিভূষণ। তৃষ্ণা তৃষ্ণা। ক্ষুধা ক্ষুধা। হায় তৃষ্ণা। হায় ক্ষুধা। বাংলার ভাগ্যবিধাতা আজ কী হতভাগ্য।

এখানে—এই বিশুষ্কপ্রায় নাজিপুরের খালধারে বাংলার নবাব ক্ষুধা-তৃষ্ণায় বিভ্রান্ত, দিশাহারা। সেই ঠিক হারানো কালে খালের ধারে দাঁড়ানো এক প্রবীণ বটবৃক্ষ কোটরবাসী প্রাচীন পেঁচা কটাক্ষ-সহ স্মৃতিরোমন্থন করে। সে বৃদ্ধ জর্জর অথচ মহানাদি স্বরে বলে যায়,

প্রতাপাদিত্য ভূপাল ভালং মম বিলোকয়।
স্বেদেন প্রোঞ্ছিতাঃ সন্তু বিধে র্দুর্লেখপঙ্ক্তয়ঃ।।

রাজা প্রতাপাদিত্য হলেন প্রতাপশালী সূর্যসমান। এই সূর্যের প্রতি কোনও এক শ্রান্ত ভিক্ষুক চেয়ে আছে। বলছে—তুমি এমন করে আমার কপালের দিকে দৃষ্টিপাত করো যাতে করে বিধি এখানে যে দুর্ভাগ্যসূচক অক্ষরমালা লিখে গিয়েছেন তা যেন কপালের ঘর্মবিন্দুর দ্বারা ধুয়ে মুছে যায়।

পরিশেষে—হায়, হায়। সিরাজ চমকে ওঠেন। পরক্ষণেই মন বলে, ওই বৃদ্ধ গাছের কোটরে প্রবীণ এক কালপেঁচা ডেকে ডেকে কথা কইছে। ডাকছে, না হতচ্ছিন্ন নবাবের প্রতি শ্লেষ্মাজর্জর কটাক্ষ করছে।

কোষবদ্ধ তরবারির গায়ে ত্বরিতে হাত পড়ে স্বভাবমতো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আত্মমর্যাদা এসে রুখে দেয়। মনুষ্যের বদলে, ও হে নবাব, তুমি কিনা শেষে নিরীহ বৃদ্ধ প্রাণী বধ করবে! তার চেয়ে আকাশের মাঝখানে তাতাল সূর্যকে আঘাত করা যে তোমার কাছে ফুৎকারবৎ।

প্রবীণ পেঁচা আবার কয়, তোমার তো আর সময় নেই নবাব। অগ্রহায়ণ মাস আবার ফিরে আসতে বহু দেরি। তা না হলে তোমায় বলতাম, দিনে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের পূজা এবং সন্ধ্যাকালে চন্দ্রকে অর্ঘ দান করবে। এ কর্মটি করা উচিত অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বিতীয়া তিথিতে। কেন না এর নাম হল মনোরথ দ্বিতীয়া।

মনোরথ দ্বিতীয় সা শুক্লা চৈব নরোত্তমম্।

পেঁচা তার কথার পাদটীকা দেয়, তোমায় এ কথা বললে বেমানান হয় না। কেন না তুমি তোমার মাতামহর আদ্যশ্রাদ্ধ কালে বামুন পণ্ডিতদিগরে সভাপণ্ডিত মারফৎ যে নিমন্ত্রণ পত্র ছেড়েছিলে তার ভাষা ছিল দেবভাষা সংস্কৃত। ফলে, তুমি আপাতত জাতপাতের বাইরে।

পটচিত্রে স্বেদবিন্দু ফোটানোর বদলে সদ্য গঙ্গাস্নান সারা রামপ্রসাদ ও সর্বাণী ফুটে ওঠেন ক্রমে। স্নান শেষে, সদ্য জল থেকে উঠে, দু'জনারই কাপড়-চোপড় ভিজে। দু'জনারই অঙ্গে প্রায় লেপটে বসেছে।

অতএব মার্কণ্ডেয় যদি বলেন, অতঃপর প্রবক্ষ্যামি চিত্রসূত্রং তবানঘ। তাঁর মতে, কলার মধ্যে চিত্রই প্রধান। চিত্রকলা ধর্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গী ফলদায়ক। কিন্তু প্রসাদের কূট মনে একটিই চিন্তা ঘুরঘুর করে। এই চিত্র সর্বাণী দেখবে। এবং কটাক্ষপাত করে যা বলে উঠবে সেটি ওই চার ফলের মধ্যে তৃতীয়ে ইঙ্গিত করবে। কেন না, এই পটে সর্বাণীর সুউন্নত ভিজে জাব স্তন, নিতম্ব, জঘন সবই পরিদৃশ্যমান। তেমনই, সর্বাণীর চোখে, এই পটে তার বরটির সুঠাম বাহু যুগল আর দৃঢ় উরুজোড়াই যথেষ্ট। পর নারীর কামকে আপনিই নিমন্ত্রণ করে ডেকে নিয়ে আসবে।

মার্কণ্ডেয় আরও বলছেন, পুরুষপ্রবর পাঁচ শ্রেণিতে বিভক্ত। হংস, মালব্য, ভদ্র, রুচক ও শশক। তারপরেও আবার আকারের আয়তন আছে।

কিন্তু বরাহমিহির উবাচ, গবাক্ষরন্ধ্রগত সূর্যরশ্মিতে ধূলির মতো যে সূক্ষ্মতর পদার্থ দেখা যায় তার নাম পরমাণু। এই পরমাণুটিকে বুঝতে হবে রজ, বালাগ্র, লিক্ষা, যূক, যব ও অঙ্গুল দ্বারা।

কিন্তু এত সব উপাদানে ভারি খটমট ভার। অতএব হে কবিরঞ্জন, তোমার বিদ্যাচচ্চড়ি মগজ থেকে কিঞ্চিৎ দ্রবণ ঢেলে বিষয়টিকে একটু তরল করো না কেন। রামপ্রসাদ মিটিমিটি হাসেন আর মনে মনে কন, রজ মানে তো ফুলের রেণু, ধূলিকণা। বালাগ্র, ধরে নাও অভিনব বা কোমল। লিক্ষা—সোজা কথায় অষ্টত্রসরেণু পরিমাণ, যূক এর অর্থ দাতা ইত্যাদি হলেও এখানে সুবিধার্থে ধরে নাও সমাহিত যোগী। কালীর বেটা রামপ্রসাদের সখী, সহচরী সর্বাণী হাড়ে-হাড়েই জানে তার ওই যোগীত্বের পরিমাণ। যব-এর অর্থ এখানে বুঝি সুর বা যবজাত সুরা, না হলে প্রসাদে মিলবে কেন! আর শেষকালে ওই অঙ্গুল অর্থ নিয়ে কচকচানি কিছু অতিরঞ্জন হয়ে যাবে।

তার চেয়ে ওই পটুয়া মহাদেব তার মনের ভাবের মতোই পট আঁকুক। আমি আমার মতো গীতে যাই। যুদ্ধের গান। কালিকাদেব্যার আধারে যুদ্ধ আরোপ।

এখন সকাল গড়ানে নামলেও এ-গীতে রামকেলি ছাড়া আর কিছু মানায় না। সঙ্গে তাল—আড়া।

ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে,
গলিত চিকুর আসব আবেশে।
বামা রণে দ্রুতগতি চলে, দলে দানবদলে,
ধরি করতলে গজ গবাসে।।
কে রে কালীয়—শরীরে রুধির শোভিছে,
কালিন্দীর জলে কিংশুক ভাসে।
কে রে নীলকমল শ্রীমুখমণ্ডল,
অর্দ্ধচন্দ্র ভালে প্রকাশে।।

মহাদেব পটুয়ার মনঃসংযোগ থেকে থেকে টুটে যায়। যে কবি মানুষটির চিত্র সে আঁকতে বসেছে তাঁর মুখের ভাব-স্বভাব যদি এত ঘড়ি ঘড়ি বদলে যায় তা হলে তো মহা খিটকেল। এখন যদি মুখের ভাব বলে—জ্বল জ্বল, আগুন জ্বল তো পরমুহূর্তেই সে মুখ কী নিপাট করুণ, অথবা করুণায় টুবু টুবু। একই মুখে জল ও আগুনের খেলা—এ ভারী গোলমেলে। লোকটি যে সিধে সরল ভদ্রজন, এমন কথা কোনও পাগলও বলবে না।

মহাদেব মনে ভাবে, এর চেয়ে রাজাগজার পট আঁকা ঢের সিধে।

অকস্মাৎ সিরাজের চোখে পড়ে একটি প্রাচীন মসজিদের চূড়া। ওটি যখন আছে তখন মানুষ আছে নির্ঘাৎ। ওখানেই খাদ্য-জল মিলতে পারে। আর তা বাদে ওখানে নিশ্চয়ই কোনও ফকির-সন্ত আছেন। যেখানে একটু পানি। এক ফোঁটা খাদ্য।

সিরাজ ওইদিক পানে হাঁটা ধরেন অবসন্ন শরীরে, একাকী। আর তখনই হঠাৎ চোখে পড়ে এই খালের ধার ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে সটান বেত বন। একত্রে গাঁতি দিয়ে দাঁড়ানো এই বেতগাছের দল যেন নিজের কর্তব্য কী তা সঠিক জানে। আপাতত এই মরা খালের খাতে তারা নিষ্কর্মা। ঠিক তখনই ওই খালধারে দাঁড়ানো বৃদ্ধ বট এর কোটর থেকে বিচিত্র কর্কশ হাস্য উলশিয়ে দেয়। হতশ্রান্ত সিরাজ নবাবের স্বভাবমতো আবারও ঘুরে দাঁড়ান। তবে এবার আর তরবারির কোষে হাত যায় না।

নিথর শুনশান এই প্রাণহীন খালধারে এখন বুঝি গোটা প্রকৃতি নিরেট নিস্পন্দ। কোথাও কোনও হৃদপিণ্ডের সাড়া নেই। কাদা কাদা জলহীন খালে কাদাখোঁচা পাখি

চরছে। দু'একজন লোভী মাছরাঙা কাদায় বৃথাই ঠোঁট বিঁধছে। মাছের বদলে কপালে দুই এক গেঁড়ি-গুগলি মিলছে।

কী হল প্রকৃতির?

বটগাছের দিক হতে কথা উড়ে আসে উড়ন্ত ধূলিমুখে।

সর্বেষামপি বৃক্ষাণাং কার্যজ্ঞো বেতসদ্রুমঃ।
নম্রীভূয়াবতি প্রাণান্ নদীপুররিপূদয়ে।।

উড়ন্ত ধূলির মুখে কথা ওড়ে, বেতগাছই হল একমাত্র গাছ যে নিজের কর্তব্য নির্ণয়ে একান্ত পটু। সে যেহেতু নদীর ধারে জন্মায় তাই সে নদীর স্বভাব-গতিক জানে। সে যখনই দেখে নদীর ঢেউরূপ শত্রু উপস্থিত হয়েছে অমনি সে অবনত হয়ে যায়। আসলে বেতগাছের গড়নই এমন যে কোনও ধাক্কা পড়লে সে সটান হয়ে না থেকে নত হয়ে পড়ে। অথচ বড় বড় গাছগুলি ওই নীচু না হতে পারার দরুণ নদীর স্রোতের ধাক্কায় ভূপতিত হয়।

অর্থাৎ কিনা—ভেবেচিন্তে কাজ করলেই মানুষ বিপদ হতে পরিত্রাণ পায়।

সিরাজ এই প্রায় আকাশবাণী শুনতে শুনতে ভাবেন, তবে কী মীরজাফর, ক্লাইভ দিগরের পদানত হওয়া সমুচিত ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে মনের ভিতর হতে আর এক গুপ্ত মন বলে দেয়, কভি নেহি। ইনশাল্লা—কভি নেহি।

আর এখানেই, এই মসজিদে প্রবেশের সামান্য পরে পরেই নবাবের ওপরে নেমে এল সংহার পর্বের গৌরচন্দ্রিকা।

এই মসজিদবাসী এক ফকির, সিরাজকে পানি এগিয়ে দিল। সিরাজ যখন হাহা ছাতির আগুন নেবাতে মুখের সুমুখে পানপাত্র তুলে ধরলেন তখনই ফকিরের নজর গেল তৃষ্ণার্তর পায়ের দিকে। কী আশ্চর্য। কী অবাক। ওই পাদুকা জোড়া তো সামান্য মানুষের পায়ে ওঠে না। কী মহার্ঘ। কত বিচিত্র মণিমুক্তা-খচিত ওই জুতা জোড়া। অথচ সে এক নিতান্ত মলিনমুখো হতক্লান্ত পথিক বুঝি। কোথা থেকে এল এই বিচিত্র তরুণ যুবা!

ফকির, এই আসছি—বলে দ্রুত চলে গেল খালধারে। এবং সেখানে বিচ্ছিন্ন, বিভ্রান্ত নাবিকদের দু-কথা জেরা করেই জানতে পারল তৃষ্ণাকাতর যুবার আসল পরিচয়।

মসজিদের অতি নিকটে নবাব খোঁজা লোকলস্কর মজুদ রয়েছে। রয়েছে মীর দাউদ ও মীরকাসিমের সেনাদল। চোখের পলকে, কিছু অর্থের বিনিময়ে তারা মসজিদে চড়াও হল বহুমূল্য পাদুকাধারী এক অনজান যুবককে যাচাই করতে। কেন না ফকিরের কথায় শুধু ইশারা আছে। আছে অনুমান! সে তো আর বঙ্গেশ্বরকে কখনও চোখে দেখেনি। সেই ইশারার সূত্রেই কাজ সারা হয়ে গেল। যারা চেনার তার চিনে ফেলল।

চিনল এবং বন্দি করে ফেলল প্রায় নিরস্ত্র, একখানি তরবারি সম্বল, নিঃসঙ্গ নবাব সিরাজকে। সিরাজ বলে উঠলেন, অর্থ দেব। যত চাও, অর্থ দেব। আমার মুক্ত করে দাও।

মীরকাসিমের সেনাদল এবার তাঁর নৌকা আক্রমণ করল। অর্থলোভী মীরকাসিম বেগম লুৎফউন্নিসার অঙ্গ থেকে বহুমূল্য রত্ন খচিত অলঙ্কারাদি হরণ করল। হায় এবং হায়—নবাবের প্রকৃত সুহৃদ মসিয়ে লাঁ এখন বন্দি নবাবের থেকে মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থান করছেন।

'Monsr. Law and his party came down as for as Rajmehal to Surajud-daula's assistance and were within three hour's march when he was taken.'

আবারও একটি হায় এই আগামী লিখনের জন্য। ক্লাইভ কি এখন জানেন আগামী 26th July, 1757, তাঁকে Court-এর কাছে হুবহু এই ভাষাতেই পত্র লিখতে হবে?

ক্লাইভ না জানুন মরা খালধারের ওই নিঃসঙ্গ বট ও সেই বুড়ো পেঁচা এই সব ভবিষ্যত আগে ভাগেই জেনে বসে আছে। তারা জানে, ভিক্ষাচরঃ সোহপি কপালপানির্ললাটলেখো না পুনঃ প্রযাতি।

অন্নপূর্ণার স্বামীধন মহাদেব। তাকে ভিক্ষা করে জীবন বাইতে হয়। এও তো ললাটের লিখন।

মরা খাল এই গোলমেলে উক্তি সইতে না পেরে বলে, কী সব নিরর্থক বকছ বলো দিকি! কার সঙ্গে কী! সিরাজ-এর সঙ্গে মহাদেব?

প্রবীণ বট শ্লেষ্মা ঘড়ঘড় হাসে, আরে বাপু, গুণে না হোক রূপে তো মেলে কতক কতক।

এদিকে মীর দাউদ মহা উল্লাসে এই মহা খপর মুরসিদাবাদে প্রায় লম্ফ দিয়ে প্রেরণ করলেন। মীরজাফর, ক্লাইভের গলায় গলায় অবস্থায় এখন হীরাঝিল প্রাসাদে মন্ত্রণা ফাঁদছেন। সমাচার আসামাত্র তাঁর ভবিষ্যত বুঝি আরও পোক্ত হয়ে গেল। সিরাজকে বেঁধে আনতে যুবরাজ মীরন সৈন্যাদি-সহ রাজমহল ধাওয়া করলেন।

শেষের আগে—'১৫ সওয়াল ১১৭০ হিজরিকো আপ্‌নে নৌকরুণকি কয়েদ্‌মে মুরশিদাবাদ আয়া।'

১৫ সওয়াল, ৩ জুন নিজের ভৃত্য ও আত্মজনদের ক্রমাগত প্রহার লাঞ্ছনায় জর্জরিত ও প্রায় জীবন্মৃত সিরাজউদ্দৌলা বন্দি অবস্থায় মুরসিদাবাদে নীত হলেন।

"Be warned by example. O ye men of understanding and view well the revolutions of foutune. Place not your reliance upon the world's success, for it is uncertain and inconstant, like a publc figure, who goes daily from house to house."

আমার কানু বাবার স্মৃতিশক্তি বা মেমরি দেখার মতো। টি টি এম পি বা টেনেটুনে ম্যাট্রিক পাস একজন রাত জেগে পাতার পর পাতা ইংরেজি নোটস্ শ্রেফ মুখস্থ করে অফিসের এক পরীক্ষায় সদ্য পাস করে ফেলল। আমার পিতামহর মতো পণ্ডিত মানুষ এরকম অদ্ভুত ব্যাপার দেখে অবাক বলে ওঠেন, বুঝলে হে কানু, আবৃত্তি সর্বশাস্ত্রানাং বোধাদহপি গরিয়সী।

বাবা ছানাবড়া চক্ষে কয়, এর মানে কী?

দাদু বলেন, মানে বুঝে আর দরকার নেই। তুমি বরং 15th August 1947-এর মাঝরাত্তিরে পণ্ডিত নেহরুর ভাষণটা একটু বলো দিকি।

বাবা ঠোঁক মটকে হাসে, আমার টেস্ট করছেন!

দাদু, ধরে নাও—একরকম তাই।

কানু বাবা এবারে স্বভাবমতো প্রথমে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। তারপর চোখ বুঁজে মনে মনে বইয়ের পাতা ওল্টানোর ব্যবস্থা করে। একটু পরেই বাবার গলা গমগমিয়ে

ওঠে—'Long years ago we made a tryst with destiny and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.'

এবার দাদুর চক্ষু ছানাবড়া হওয়ার পালা—পুরু চশমার ওপার থেকে।—বাপ রে, কী সাঙ্ঘাতিক।

বাবা, কোনটা শুনি?

দাদু, দু'টোই। যেমন নেহরুর বক্তৃতা—যেন কবিতা শুনছি। আর তেমনি তোমার গড়গড়িয়ে বলে যাওয়া।

বাবা, আপনি তো আমার বিদ্যে জানেন। কোথাও একটু কবিতার টাচ্ থাকলে, দু'বার পড়লে আমার মুখস্থ হয়ে যায়।

দাদু, আপিসের যে পরীক্ষায় পাস করলে সেই সব টেকনিক্যাল নোটস্-এ কীরকম কবিতার টাচ্ ছিল শুনি!

বাবা খানিক চুপ মেরে যায়। অনেকটা ভ্যাবাচ্যাকা। তারপর কী সব ভেবে বলে ওঠে, ওই ভদ্রলোক কেন যে রাজনীতি করতে এলেন! লেখালেখি করলেই তো পারতেন।

দাদু গম্ভীর গলায় বলেন, ক্ষমতার অলিন্দ। ওটা এমনই সাংঘাতিক যে তার কাছে সাহিত্যফাহিত্য সব শিশু।

আমি মাঝখান থেকে বলে উঠি, ভগা জানে।

বিকেলবেলা দত্তপাড়ার মাঠে গাদি খেলতে যাই। আমাদের দলপতি মুকুলদার বোন বুড়ি। সে এক অদ্ভুত ডাকাতে মেয়ে। আমায় যেমন ওদের পেছনবাগানে দুপুরবেলা ডেকে নিয়ে গিয়ে তেঁতুল মাখা খাওয়ায় তেমনি সাইকেলের কেরিয়ারে আমায় বসিয়ে সবুজ সংঘ মাঠে মকুলদাদের ফুটবল টুর্নামেন্ট দেখাতে গিয়ে যায়। ফ্রকের ট্যাঁকে গোঁজা রুমালে থাকে ভেজানো নুন-মাখা পাতিলেবু। হাফটাইমে প্লেয়াররা খায়।

অনেক দিন দেখছি, আমরা যখন মাঠে খেলি ঠিক তখনই একটা বাঁধা সময়ে মুকুলদার বোন নীলুদি ওদের খোলা ছাদে এসে দাঁড়ায়। মিশকালো, কিন্তু মুখখানা ঠাকুর ঠাকুর। একটু পরে রাস্তা দিয়ে সাইকেলে চড়ে আমাদের পাড়ার বেচুদা। ধুতি, শার্ট, চোখে চশমা—কোঁকড়া চুল। বেশ দেখতে। ঠিক এক জায়গায় এসে বেচুদার ঘাড় ঘুরে যায়। দোতলার ছাদ থেকে নীলুদি মিষ্টি হেসে লম্বা করে ঘাড় কাত করে। সাইকেল চলে যায়। নীলুদিও নেমে এসে মাঠ পেরিয়ে কোথায় যেন চলে যায়। রোজই এরকম।

ব্যাপারটা কী! ক'দিন দেখার পর একদিন দেখি নীলুদি একটু এগিয়ে পাশের গলিতে ঢুকল। ওদিকে কোথায়! আমি অনেকটা তফাত রেখে পিছু নিলাম। গলির শেষে ও পাশে ঝোপঝাড় পেরিয়ে, পুকুরধার ছেড়ে একেবারে ভাটবাগান। ওখানে—একধারে পান বরোজ, আর এক ধারে ঘন গাছপালা মোড়া বাগান। দেখি বেচুদা সাইকেলে হেলান দিয়ে লম্বা করে ধোঁয়া ছাড়ছে আর নীলুদি সামনের হ্যান্ডেলে হাত রেখে অনর্গল কি সব বকে যাচ্ছে। এই বকবক করতে এমন নিরিবিলিতে আসার কী দরকার?

কথা বলতে বলতে হঠাৎ নীলুদি ঘাড় ঘোরায়। আর অমনি খেজুর গাছের আড়ালে ঘাপটি দিয়ে থাকা আমার ঝাঁকড়া মুণ্ডু দেখতে পায়। বেচুদাও দেখে। আমি অমনি ছুট। দৌড়তে দৌড়তে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি নীলুদি আমায় তাড়া করেছে। আবছা বিকেলের

হাওয়ায়, দৌড়নোর তালে তালে তার মা-কালীর মতো চুল উড়ছে। কালো মিশ মুখ বেয়ে ঘাম টোপাচ্ছে। বড় বড় চোখ জোড়া আরও মস্ত হয়ে আমায় পেছনে থেকে গিলতে আসছে।

আমার সঙ্গে দৌড়ে পারবে কেন! আমি গলির মুখে এসে রাস্তা বদলে একেবারে আন্‌কা দিকে পালাই।

বাড়ি ঢুকতে ঢুকতে শুনি মা কালীর গলা, অসভ্য, ভারি অসভ্য ছেলে। ছিঃ ছিঃ—

পাঁচিলের ধারে বসে পড়ি। বুঝি নালিশ হচ্ছে মা'র কাছে।

বাড়ি ঢুকতে ঢুকতে শুনি দাদুর ঘরে গমগমিয়ে রেডিও বাজছে। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র মহাভারতের যুদ্ধের গল্প বলছেন। সেখানে ভারি চমৎকার আর সহজ করে বলছেন জরাসন্ধ বধের কথা।

কৃষ্ণ তখন জিগ্যেস করলেন, 'বেশ কথা, যুদ্ধ তো হবেই মহাতেজা মগধরাজ জরাসন্ধ। তা হলে আপনি ঠিক করুন আগে কার সঙ্গে যুদ্ধ করবেন।' জরাসন্ধ বললেন, 'আমি এখন মহাবলী ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাই।' কৃষ্ণ রাজি হলেন। এবার যুদ্ধের প্রস্তুতি চলতে লাগল। একজন পুরোহিত এসে প্রথমে জরাসন্ধের জন্যে যুদ্ধে যাওয়ার আগে যাবতীয় মাঙ্গলিক কাজ সারলেন। তাঁর জন্যে স্বস্ত্যয়ন করলেন। এরপর যুদ্ধ আরম্ভ। জরাসন্ধ তাঁর মাথা থেকে কিরীট খুলে ফেলে বেশ পোক্ত করে নিজের কেশবন্ধন করে ফেললেন। পুরাকালে বল নামে অসুর যেমন ইন্দ্রের প্রতি ধাওয়া করেছিলেন ঠিক সেভাবেই মহাতেজা জরাসন্ধ ভীমের দিকে ধাবিত হলেন। ভীমও তেড়ে গেলেন। দু'জনে দু'জনার হাত চেপে ধরে, দু'জনার পা দু'জনে পায়ে পায়ে পিষ্ট করে দিয়ে মাটিতে তাল ঠুকে, সেই প্রকোষ্ঠখানা কম্পিত করে দু'জনা ভীষণ শব্দ করলেন। তারপর দু'জনাতে দু'জনার বাহু বেষ্টন করে একে অপরের মাথায় পদাঘাত করলেন। ঠিক তারপর একে অন্যের বুকে আঘাত করলেন। যুদ্ধটা এমন হচ্ছে, ঠিক যেন দু'টি মত্ত হাতি মেঘের মতো গর্জন করতে করতে লড়াই করছে।

আজ তা হলে এই অব্দি থাক। এই বলে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ মহাভারতের ঝাঁপি বন্ধ করলেন।

দোতলায় দাদুর ঘরে রেডিও থামল। শ্রীদেবদাদু চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলছেন, তা হলে মাস্টারমশাই Hemingway সায়েব তো লেখকদের জন্যে সাঙ্ঘাতিক কথা বললেন।

দাদু বলেন, হ্যাঁ, এই লেখকটি তো যুদ্ধক্ষেত্রে correspondent এর কাজ করতে করতে কলম চালিয়েছেন। যুদ্ধ আর কলম, ভাবুন ব্যাপারটা।

শ্রীদেবদাদু, হুঁ, লেখক হতে গেলে বিস্তর পড়তে হবে। তার একটা সামান্য নমুনাও দিলেন হেমিংয়ে।

দাদু, ওঁকে জিগ্যেস করা হল, 'Should a writer have read all of those?' তাঁর উত্তর হল, 'All of those and plenty more. Otherwise he doesn't know what he has to beat, there in no use of writing anything that has been written before unless you can beat it.'

আমি এ সব কথার মানে এক বর্ণ বুঝতে পারি না। তবে কেবলই মনে হয় যুদ্ধ মানে কীরকম মেঘ মেঘ অবস্থা। আর ওই মেঘলা থমথমে ব্যাপারটার সঙ্গে হেমিংওয়ে নামটা কেমন ছাড়ো ছাড়ো হলেও জড়িয়ে থাকে।

একাত্তর

নিজেকে নিয়ে, হরেকরকম বিচিত্র আর উদ্ভট ভাবনা, আমার সবসময় মাথা বোঝাই থাকার ব্যাপারে আমি এবার একটুখানি অবাকই। কেন যে এমন হয়।

রেডিও'তে গান্ধির প্রার্থনান্তিক ভাষণের অংশবিশেষ শুনে যেমন মনে হয় এইমাত্র তিনি গরম-গরম সেঁকা দু'খানা রুটি আর ঢেঁড়শের তরকারি খেয়ে এলেন। কথা বলার সময় প্রায় দাঁত নেই, মুখের একপাশে পড়ে থাকা ঢেঁড়শের দানাগুলো পাকলে নিচ্ছেন। সেইরকম বিধান রায়ের ছবি দেখলে মনে হয়, উনি নিশ্চয়ই মাথায় আমার দাদুর মতো মহাভৃঙ্গরাজ তৈল মাখেন। নেহরুর ছবি দেখলে আমার বাবা যে বস্তু পান করেন তার আদল পাই। তবে বস্তুটা বাবার মতো ঝাঁঝালো নয়। একটু যেন পন্ডস্ স্নো-এর গন্ধ মাখানো। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের ছবিতে পরিমল নস্য।

কে জানে, হয়তো প্রত্যেক মানুষের জন্যে আলাদা আলাদা খাবার কিংবা গন্ধ অনেকটা এইরকম ভাবে বরাদ্দ থাকে।

তবে অন্যরকম একটা ব্যাপার ভাই মলয়ের জন্যেও বরাদ্দ হল, আমাদের বড়মা গিরিনন্দিনী দেবী মারা যাওয়ার পরে পরেই। সে সকাল হোক কিংবা রাত্তির, মলয় দেখ না দেখ বলে উঠত, আমি বড়মা'র দোক্তার গন্ধ পাচ্ছি। বড়মা'র গায়ের গন্ধ পাচ্ছি। কথাটা শুনে মা বলে, দূর, কী সব বলছিস! ও ঘরে বেশি যাস না তো।

মলয় কিন্তু বড়মা যে-ঘরে থাকত, সে-ঘর বাদেও এ বাড়ির যে কোনও ঘরে ওইরকম বাস টের পেত। দোতলার ঘর-বারান্দায়, এমনকী বাইরের বাগানেও। এই কাণ্ডটা বেশ ক'মাস ধরে জারি ছিল।

এ ব্যাপারে আমার কিন্তু মনে হয়েছিল, এ বাড়িতে দু'জন নস্যি লেনেওয়ালা। আমার দাদু আর কানু বাবা। নস্যি আর দোক্তার গন্ধ অনেকটা কাছাকাছি। আমার ভাইয়ের সঙ্গে বড়মা'র খুবই ভালোবাসাবাসির টান, সব সময় কাছাকাছি থাকা, সব মিলিয়ে এরকম মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। এখানে অবিশ্যি স্বামী অভেদানন্দ তাঁর 'মরণের পারে' বই নিয়ে হাজির হতে পারেন আমার যত সব উদ্ভট চিন্তা বরাবর।

ভারি গোলমেলে এই বইয়ের কথাবার্তা। আমার কাঁচা মাথা আর পাকা স্বভাব হলেও, বইটার পঁচানব্বই ভাগ কিছুই ধরতে পারি না। এই বইয়ে একটা ভূমিকা আছে। সেখানে এক জায়গায় লেখক বলছেন, 'যেমন দিন যায় ও রাত্রি আসে, যেমন সুখ যায় ও দুঃখ আসে, তেমনি জন্ম হয় ও মৃত্যু আসে। আলো-ছায়ার এই রহস্যময়ী খেলার আর শেষ নাই।'

এই আলো আলো, ছায়া ছায়া যে অবস্থার কথা বলা হল, আমার মনের অবস্থাও এই আত্মা-টাত্মার ব্যাপারে হুবহু এক। একটা দোলনায় বসে ক্রমাগত সামনে পেছনে ওপর নীচ দুলে চলার ব্যাপার। এইরকম দুলতে-দুলতে মলয়ের টের পাওয়া বড়মা'র দোক্তার গন্ধ, গান্ধির ভাষণে ঢেঁড়শের দানা পাকলানো, হেমন্তবাবুর পরিমল নস্য—সবটাই যেন এই সাঁ করে ওপর পানে উঠছে, আবার ধাঁ করে পেছনে সেই খানিক ওপর দিকেই চাগাড় দিচ্ছে, কী মুশকিলের ব্যাপার।

পাড়ার শৈলকুমার দাদু এসে আমার দাদুর ঘরে জমজমাট গল্পের আসরে অবাক এক ঘটনা বলেন।

সেবার হল কী, আমাদের পাড়ার ধীরেন কাকারা কোথায় সপরিবারে বেড়াতে গেলেন। আমাদের তিন বন্ধুকে দায়িত্ব দিলেন পালা করে ওঁদের দোতলা পুরনো বাড়িতে রাতে শোওয়ার। কেবল বললেন, একতলায় শুয়ো বাবা। দোতলায় না থাকাই ভালো। তা আমার বাই চাপল, মানা যখন করেছেন তখন ওই দোতলাতেই শোব। গরম কাল। বাইরে ফটফট করছে জোছনা। দোতলার টানা বারান্দায় মাদুর না পেতে শুয়েছি। তখন রাত কত কে জানে, হঠাৎ একটা বিটকেল শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। চোখ চেয়ে দেখি মস্ত-মস্ত জানলাগুলোর একটা দিক থেকে কীরকম কিরকির শব্দ হচ্ছে। দেখি জানলার মাঝখানের কাঠে জানলা বন্ধ করার যে ছোট্ট পাখার মতো কল বা ফিরকি, সেটা আস্তে আস্তে ঘুরছে। ভাবলাম, হাওয়া বুঝি। ও মা, আমি উঠে বসতেই দেখি ফিরকিটা ঘোরার স্পিড বাড়াল। কী হল? উঠে গেলাম। কাছে যেয়ে দেখি একেবারে বনবন করে ঘুরছে—ঠিক যেন টেবিল ফ্যানের ব্লেডের মতো। খপাৎ করে হাত দিয়ে চেপে ধরতেই সেটা থামল। অমনি পাশের জানলার ফিরকি ঘোরা চালু হল। ছুটে গিয়ে সেখানা চেপে ধরি। সঙ্গে সঙ্গে বারান্দার ছ'খানা জানলার সবগুলো ফিরকি বাঁই-বাঁই করে ঘুরতে লাগল। আমি একবার এটা চাপি, আর একবার ওটা। সে এক হুলুস্থুলু কাণ্ড। এই করতে করতে রাত কাবার হয়ে গেল। আমি ঘেমে নেয়ে নীচে নেমে এলাম।

ভীমদাদু বলেন, তারপরের দিন যে শুল সেদিন কী হল?

শৈলদাদু মিচকে হেসে কন, পরদিন শুয়েছিল চার ফুটিয়া জটে দত্ত। সেদিন আর ফিরকি ঘোরেনি। বেঁটে খপ্পুরে ছেলে দেখে ভূতেরা ক্ষমাঘেন্না করে দিয়েছিল।

এইরকম করতে করতে, ভূতের কাণ্ড থেকে চিন-ভারত যুদ্ধ—কী না হয় দাদুর আড্ডায়। হতে-হতে গানের কথা এসে পড়ে। জ্ঞানগোসাঁই পাগল আমার দাদু বলেন, সেবার—মানে তখন সবে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়র লেগেছে। সন্ধে হলেই কারফিউ আর ব্ল্যাক আউট, সেইসময় আমাদের কাঁচরাপাড়ায় গাইতে এলেন জ্ঞানবাবু। হাইন্ডমার্শ হলে লোক ধরছে না। যাকে বলা যায় লিভিং লিজেন্ড তো। তা পর্দা উঠল। স্টেজে আলোর বান ডাকল। দেখলাম দু'ধারে জোড়া তানপুরো ছাড়ছেন দু'জন। মাঝখানে জ্ঞানবাবু, অনেকটা কীরকম তটস্থ আর এলোমেলো বসে আছেন। তানপুরো সুর ধরে আছে নাগাড়ে। জ্ঞানবাবু এইবার গাইবেন-গাইবেন ভাব। কিন্তু দুঃখের কথা কী বলব, পরিষ্কার করে একটা সা-ই লাগাতে পারলেন না গোসাঁইজি। অথচ আমরা দেখছি কী আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন, সুরের মুখটা ধরতে। যাকে বলে গোটা শরীর দিয়ে চেষ্টা করছেন পর্দাটা লাগাতে। কিন্তু এত পান করেছেন যে, একবারও সা হল না। গানের গ হল না। জ্ঞানগোসাঁই ফেল করলেন।

ভীমদাদু মিটিমিটি হেসে বলেন, রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীদের এসব বদগুণ নেই। সব গঙ্গাজলে চান করা, দুধসাদা শালমোড়া দিব্য চেহারা। হারমোনিয়াম ধরলেই প্রায় সমাধিস্থ হয়ে পড়েন।

শৈলদাদু বলে ওঠেন, আমাদের হালিসহর সংগীত প্রতিযোগিতায় সেবার পঙ্কজ মল্লিক বিচারক হয়ে আসার কথা। এলেনও। কিন্তু গাড়ি থেকে নামলেন কাছা গলায়। সদ্য ওঁর মা গত হয়েছেন। কিন্তু তা হলেও কথার দামটা দেখুন।

রবিবার সকালের 'সংগীত শিক্ষার আসর' আমাদের রেডিও'য়। পরিচালনা করছেন পঙ্কজকুমার মল্লিক। আসর আরম্ভ করার ধরনটাই একটি সুরে ভরা শিবস্তোত্র দিয়ে।

ব্রহ্মগ্রন্থিজ মারুতানুগতিনা
চিত্তে ন হৃদ্ পঙ্কজে।
সুরিনামানুরঞ্জকঃ শ্রুতিপদং
যোহং স্বয়ং রাজতে।।
যস্মাদ্ গ্রামবিভাগ-বর্ণ-রচনালঙ্কারজাতিক্রমো।
বন্দে নাদ তমুদ্ধুরজগন্নীতং
মুদে শঙ্করং।।

নমস্কার। আশা করি আপনারা সকলে কুশলে আছেন। আজ আসর আরম্ভ করব প্রথমে রবীন্দ্রনাথের একটি গান দিয়ে। অনেকেই চিঠি লিখে গানটি পরিবেশন করতে অনুরোধ করেছেন।

শুনতে শুনতে মনে হচ্ছে পঙ্কজকুমার এইমাত্র ক'খানা গরম-গরম জিলিপি খেয়ে আসরে এলেন। রোববার সকালে তো প্রায়ই আমাদের বাড়িতে জিলিপি আনা হয়। জিলিপিতে কামড় দিলে মুখটা যেরকম রস থইথই জড়িয়ে যায় ওনার মুখটাও ঠিক সেইরকম। অন্তত কথা শুনে, সামান্য ঝোল টানা শুনে, সেইরকম লাগছে।

পঙ্কজকুমার, পাশে যাঁরা আছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে খুব বিনীত বললেন, সুর দিন।

সুর পড়ল। গান শুরু হল।

নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়, খুলে যাবে এ দ্বার
খুলে যাবে এ দ্বার—নাই নাই ভয়।
জানি জানি তোর বন্ধন ডোর ছিঁড়ে যাবে বারেবার
ছিঁড়ে যাবে বারেবার—

এই 'ছিঁড়ে যাবে' কথাটি পঙ্কজকুমার এমন ঝাঁকুনি দিয়ে উচ্চারণ করেন, যেন সত্যিই একটা বাঁধন সজোরে ছিঁড়ে ফেললেন এইমাত্র।

এটাও তো মনে হয় এই যুদ্ধের কালে দেশাত্মবোধক গান। কথাটা রেডিও শুনে শেখা। সত্যিই, রেডিও আমাদের অজান্তে কত সব সুন্দর কথা তৈরি করে।

এরপরেই তো উনি শ্রোতাদের চিঠির উত্তর দিতে বসবেন। আমার খুব ইচ্ছে করে ওঁকে একটা চিঠি লিখতে। রেডিওয় উনি আমার নাম বলবেন। হয়তো উত্তরও দেবেন। কিন্তু কী প্রশ্ন করব ওঁকে? গান নিয়ে তো কোনও প্রশ্নই আমার জানা নেই। তা ছাড়া গান মানে তো সবসময়েই উত্তর।

নবাব সিরাজ যখন ভৃত্যবর্গের হাতে কয়েদগ্রস্ত হয়ে রাজধানীতে নীত হলেন, যাকে বলে বন্দিগতিকে, তখন কবিরঞ্জন রামপ্রসাদও একপ্রকার বন্দি পটুয়া মহাদেবের সুমুখে। হতশ্রী বন্দি ওই যুবকের কোমরবন্ধে তরবারির বদলে শিকল আর দুই হস্তে জোড়বাঁধন—সে-ও লোহার। পটুয়ার হাতে তুলি আর মগ্ন দু'চোখে প্রসাদকে কয়েদ করে রাখা।

পলাশির রণাঙ্গনে যুদ্ধ শেষ হলেও প্রসাদী লেখনী জুড়ে এখনও যুদ্ধের পরিকীর্ণতা। কবিতার বিচিত্র সংসারে এই রণসংগীত, এই প্রথম ফুটে উঠেছে এক নিতান্ত গ্রামীণ বাঙালি কবির মানসপটে।

ও কে ইন্দিবর—নিন্দি কান্তি, বিগলিত বেশ,
বসন-বিহীনা কে রে সমরে।
মদন-মথন উরসী, রূপসী
হাসি হাসি বামা বিহরে।।
প্রলয়কালীন জলদ গর্জে,
তিষ্ঠ তিষ্ঠ সতত তর্জে,
জনমনোহর শমন সোদরা
গর্ব খর্ব করে।।
শস্ত্রে শস্ত্রে প্রথম দীক্ষা,
প্রথম বয়স বিপুল শিক্ষা,
ক্রুদ্ধ নয়নে, নিরখে যে জনে,
গমন শমন নগরে।
কলযতি প্রসাদ হে জগদম্বে,
সমরে নিপাত রিপু-কদম্বে,
সংবর বেশ, কুরু কৃপালেশ,
রক্ষ বিধুব-নিকরে।।

রাগিনী খাম্বাজ ও ঢিমে তেতালায় নিবদ্ধ, এই গীত আজ দ্বিপ্রহরের এই সময়ে বুনোগড় জাঙাল কবিরঞ্জনের ভিটার অনতিদূরে চিত্রের অতীত কোনও চিত্রকথা বুঝি বলতে চায়। সেখানে এই সদ্য গীতের কথা, সমান জনমনোহর কথাটি ব্যক্ত হতে চায়। স্থাপিত হতে চায় ইন্দিবর-নিন্দি-কান্তি শব্দবন্ধ। সেইসঙ্গে তাঁর সহচরী তথা ঘরণী সর্বাণী মদন-মথন উরসী রূপসী পর্যন্ত না গেলেও তিনিও ভারি হেলা ফেলার নন। বিশেষ করে তাঁর মোহময়ী চক্ষুজোড়া। প্রসাদের পানে নির্দ্বিধ চাহনি মেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মহাদেব মনে ভাবেন—দু'জনাতে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কিছু কি বলতে চাইছেন?

সেই কথকতার আবডালে এই জাঙালি আওতা স্থানময় হরেক লতা ও গাছের বুনো-বুনো ঝাঁজ বিকীর্ণ হচ্ছে। মিলে-মিশে যাচ্ছে লতাগুল্মের সঙ্গে পোকা-মাকড়ের দেহরস-নিঃসৃত এক-একরকমি বাস। ঝোপ থেকে ঝোপান্তরে হঠাৎ ছুটে যাওয়া গন্ধগোকুলের শরীরের উগ্র গন্ধ। এইসব প্রাকৃতিক কিংবা প্রকৃতিমাখানো বিবিধ বাস বুঝি কালের সাক্ষী হয়ে রয় চিরকালই। কিন্তু কোনও শিল্পীর লীলাতুলিকায় তা ধরা পড়তে চায় না। হয়তো যে মানুষ চিত্র দেখে এখানে তারও এক দায় থেকে যায়। সে দায় কল্পনাশক্তির। তাকেও তো ভাবতে হবে। সেও তো শিল্পীর উল্টোবাগে দাঁড়ানো এক দ্রষ্টাশিল্পী।

কিন্তু হায়, ঠিক এই সময়ে দুর্ভাগা সিরাজের পটচিত্র কেউ যদি এঁকে রাখে, তা হলে কেমন হয়। কেমন হয়, সেই বিকশিত ফুলসম সুকুমার দেহ-কান্তির ঠিক এখনকার মহানির্যাতিত হাল-হকিকত এঁকে রাখলে! আহা, কী করুণ, আর মলিন ওই দিব্য-সুন্দরকান্তি। চোখের তলে অত্যাচার পীড়নের গভীর কালি, আক্ষৌরী মুখে, সদ্যোস্ফূট বিন বিন কচি দাড়ির আঁচড়, আত্মীয়সম ভৃত্য-অমাত্যগণের যথেচ্ছ প্রহার লাঞ্ছনার দগদগে চিত্রপট—আপাদমস্তক। এই কী তরুণ কন্দর্প, বাংলার এই সেদিন নবাব সিরাজ!

তাঁকে এ অবস্থায় রাজধানীতে দেখে প্রজাগণ ভারী শোকগ্রস্ত। তারা সহানুভূতির চাপা উচ্ছ্বাসে দগ্ধ হতে থাকে। যারা এ কথা ভাবে তারা ওজনদার মানুষ নয়, সাধারণ নাগরিক। সে-কথা ইতিহাসের পাতে অমনি লেখা হয়।

'...several Jammadars, as he passed their quarters, were so penetrated with grief and anger, as to prepare to rescue him, but were prevented by their superiors.'

কিন্তু ইতিহাসের সংসার ও বাজারে মহাকুতুহলি খপর, 'সিরাজদ্দৌলার কী হইল?'

কী হল পরিণতি সেই নবীন নবাবটির? কোথা হতে কেমন করে কোথায় নীত হলেন তিনি? সংস্কারবদ্ধ মানুষের কাছে সিরাজের কর্মফল জাতীয় নিদানের অনুমান। হায়, বঙ্গাধিপের জীবন এখন তাঁর অমাত্য ভৃত্যের কৃপা-করুণার দিকে চেয়ে আছে। আর সেখানে এক ঘাতকের অস্ত্র তৃষ্ণার্ত অপেক্ষা করে রয়েছে।

ঠিক এ-মুহূর্তে সংসারের অপর প্রান্তে কবিরঞ্জন রচেন,

এলো চিকুরভার, এ বামা,
মার মার মার রবে ধায়।
রূপে আলো করে ক্ষিতি, গজপতিরূপ গতি,
রতিপতি মতি মোহ নাহি পায়।।
অপযশ কুলে কালী, কুল নাশ করে কালী,
নিশুম্ভ নিপাতি কালী, সব সেরে যায়।
সকল সেরে যায়, এ কি ঠেকিলাম দায়,
এ জন্মের মতো বিদায়।।

এই যদি প্রসাদী বিবরণ ঘটে যুদ্ধ ও যুদ্ধপট, তা হলে এই মার-মার-মার হুঙ্কার তো সিরাজের দিকেই এখন প্রধাবিত। নবাবের তথাকথিত ও বিশেষ উদ্দেশ্য প্রচারিত অপযশ এখন নিবারিত হবে হায়। সেই ষড়যন্ত্রী ঘাতকদলের কাছে এই নবাব তো সাক্ষাৎ নিশুম্ভ। তাকে এখন মানে-মানে সরাতে পারলেই সকল উপসর্গও জুড়িয়ে জল হবে। সেরে ফেলা আর পাপ বিদায় করা, ও তরফের এখন এই হল মূল কাজ।

কিন্তু সিরাজের কী হল? আর পাঁচ সাধারণ মানুষ যাই বলুক না কেন, খোদ ক্লাইভ সাহেব কেমন করে বলছেন, তিনি কিছু জানেন না। সে কথা তিনি মনে মনে মকসো করে রাখছেন, পরবর্তীতে মহাসভার সামনে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় কী বলবেন। সে খপর তাঁর সাক্ষ্যনথিতে কী প্রকারে লেখা হবে তা-ও ঘটে থাকছে।

'His Lordship know nothing of it till next day.'

এমনকী ভবিষ্যতের ইতিহাসের পাতে কী বিবরণ লেখা হবে তারও ছক কষা থাকছে। বলা হচ্ছে, 'In Justice to the memory of Colonel Clive, I think it requistie to state that none of the native historians impute any participation in the death of Sirajuddowla to him.'

ইংরাজ ইতিহাস লেখকগণ একজোট হয়ে চেষ্টা করে যাচ্ছেন ক্লাইভের কলঙ্কমোচনের জন্য। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও কলঙ্ক এমনই বস্তু, যাব নেপথ্যে সত্য বর্তমান, তা তো চাপা থাকে না। পলাশির রণাঙ্গনে জয়ী মীরজাফর যখন অতীব উৎফুল্ল হয়ে মহা ঘটা-সহকারে বিজয়োৎসব করবেন বলে তোড়জোড় কবছেন, তখন এই ক্লাইভই তাঁকে

সে অবসর না দিয়ে তখনই সিরাজকে কয়েদ করার পরামর্শ দিয়ে উত্তেজিত করতে লাগলেন। নতুন নবাব রাজধানীতে দ্রুত উপনীত হলেও ক্লাইভ তা করলেন না। তিনি নগরোপকণ্ঠে কয়েক দিবস যাপন করলেন। এর পশ্চাতে তাঁর অবশ্যই অভিসন্ধি বর্তমান। কেননা—পলাশির যুদ্ধ তো আদপে যুদ্ধের অভিনয়।

'This is the battle in which India was lost for the Islam '

ক্লাইভ তো জানেন, সিরাজ পলায়ন করার ফাঁক পেলেই নির্ঘাৎ ইংরাজদের চিরকেলে শত্রু ফরাসিগণের সঙ্গে মিলেমিশে ইংরাজ সর্বনাশ সেরে ফেলবেন। অতএব আপনাকে বাঁচানোর দায় মাথায় রেখেই ক্লাইভের এই পরামর্শ।

এই সাহেবটির মূল ত্রাস আসলে ওই ফরাসি। অতীতে মসিয়ঁ লা'কে সিরাজের দরবার থেকে বিদায় করার জন্য তিনি বহু কৌশল করেছিলেন। তাঁরই কূটবুদ্ধির কারণে মসিয়ঁ আজিমাবাদে তাড়িত হলেন। যাবার কালে তিনি সিবাজকে বলে যান—প্রয়োজন পড়লে নবাব যেন তাঁকে খপর করেন।

কিন্তু এ কথা তো সত্য যে, সিরাজকে ধরপাকড় করার সময়ে ক্লাইভ আর মীরজাফর দু'জনাতেই গঙ্গার পশ্চিম তীরে আর মীরণ পূর্ব তীরে অবস্থান করছিলেন। এমতকালেই রাজমহল হতে খপর হল সিরাজ ধৃত হয়েছেন। এ-সমাচারে চক্রান্তীর দল আনন্দে বিহ্বল হলেও সিপাহিগণ হাহাকার করে উঠল এবং উত্তেজিতও হয়ে উঠল।

'(When) news came to the city that Sirajudowla taken, the report excited murmurs amongst a great party of the army encamped around.'

বন্দি সিরাজকে ঠিক কবে, কখন এবং কোথায় এনে দাখিল করা হচ্ছে এ নিয়ে ভারি সতর্ক ফিসফাস চাপাঢাকা তোড়জোড়। কেউ যেন জানতে না পারে কোনও কিছু। অতঃপর সেই হিসাবেই কারারক্ষীবর্গ তাঁকে গভীর নিশীথে দস্যু তস্করের তরিকায় শিকলে বেঁধে এনে দাখিল করলে মীরজাফরের ঠাঁয়ে। হায়, যে রাজপ্রাসাদে এই নবাবটি কিছুকাল আগেও অখণ্ড প্রতাপ আর আভিজাত্য সহকারে বসবাস করতেন সেখানেই তাঁকে বন্দি অবস্থায় উপস্থিত হতে হল। এ মর্মদ্রাবী দৃশ্য দেখে মীরজাফর সামান্য সময়ের জন্যও বিগলিত হয়ে পড়লেন। তিনি চোখে হাত চাপা দিয়ে সিরাজকে এখনই অন্যত্র নিয়ে যেতে আদেশ করলেন।

'In this manner, they brought him, about midnight as a common felon, into the presence of Meer Jaffier; in the very PALACE which few days before had been the seat of his own residence..'

জগদম্বার কোটাল, বড় ঘোর নিশায় বেরুল,
জগদম্বার কোটাল।
জয় জয় ডাকে কালী, ঘন ঘন করতালি,
বম বম্ বাজাইয়া গাল।

রামপ্রসাদ আজ এই মহানিশীথে যখন রণসংগীতে নিমজ্জিত হয়ে আছেন, ঠিক তখনই হতশ্রী নবাবের মাথার ওপর মহাকাল দন্ত ঘর্ষণ করে চলেছেন। এই মধ্য নিশিথীনি, এই তো জগদম্বার কোটাল বার হওয়ার প্রকৃত কাল। এ বড় ঘোর নিশা। এ রাত্রি ভূত, ভৈরব, বেতালদিগের জন্য ধরে রাখা আছে। তারা তাথিয়া তাথিয়া নৃত্য কলরোলে গালবাদ্য করছে বব বম্, বব বম্। এই অন্তিম মুহূর্তটির সাক্ষী হয়ে থাকছে

পটুয়া মহাদেব। পুত্র তার সঙ্গে দোয়ারকি দিচ্ছে। অদূরে একজোড়া পিদিম জ্বলছে। আর এই অবসরে ঘরের কাজ সেই কখন সারা, নিদ্রাকাতরা সর্বাণী তার স্বামী ধনটিকে ডাকতে এসেছে।

কিন্তু সর্বাণী কোনও কথা কইতে পারে না। সে এসে প্রদীপের আলোর বাইরে এক গাছতলের কানাচে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রয়। একইসঙ্গে একজোড়া মগ্ন শিল্পীর আশ্চর্য স্বপ্নঘোর দেখে সে অবাক হওয়ারও বহু উর্ধ্বে চলে যায়। আর কী আশ্চর্য, এই মধ্য নিশীথে গানখানি বলছে সকাল বেলাকার বিভাস রাগিনীর বিবরণ। সেখানে তাল নিপাট ও জটিল—একতাল।

ভক্তে ভয় দেখাবারে, চতুষ্পথ শূন্যাগারে,
ভ্রমে ভূত ভৈরব বেতাল।
অৰ্দ্ধচন্দ্ৰ শিরে ধরে, ভীষণ ত্রিশূল করে,
আপাদলম্বিত জটা-জাল।।
শমন সমান দর্প, প্রথমেতে জলে সর্প,
পরে ব্যাঘ্র ভল্লুক বিশাল।
ভয় পায় ভূতে মারে, আসনে তিষ্ঠিতে নারে,
সম্মুখে ঘুরায় চক্ষু লাল।।

এ অবস্থায়, নিশাকালে সিরাজকে খানিক আগে ছিন্নবিচ্ছিন্ন দেখে দিশেহারা মীরজাফর পাত্রমিত্রদিগকে জরুরি তলব করে ডেকে নিলেন। তারা সকলেই এ সময় হিরাঝিল প্রাসাদে দাখিল ছিল রাজকার্যে। মীরজাফর ঝটিতি তাদের সঙ্গে জরুরি পরামর্শে বসলেন। বিষয় একটিই। সে হল সিরাজ। সিরাজকে নিয়ে কী করা সমীচীন এখন।

কেউ, যাঁরা এই সিরাজের নাম শুনলে পর্যন্ত এই সেদিনও প্রকম্পিত হতেন, এই মন্ত্রণাসভায় তাঁর নামে যথেষ্ট হেলাফেলা অশ্রদ্ধা দেখাতে লাগলেন। কেউ বলে, যাবজ্জীবন কারাগারই উপযুক্ত। একমাত্র মীরণ বলল, এই সিরাজ যতকাল জীবিত থাকবে, কারান্তরালেও, ততকালই ধিকিধিকি অশান্তির আগুন জ্বলবে রাজ্যময়। যখন তখন, যথা তথা রাজবিপ্লব উপস্থিত হবে। ফলে এই নরাধমকে হত্যা করাই যথার্থ।

এখানে মীরজাফর অধীর হয়ে পড়লেন ক্লাইবের জন্য। কিন্তু কোথাও সেই মার্তণ্ড। তিনি ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে যথারীতি নিভৃতে অবস্থান করছেন। এবং নীরবে। অথচ তাঁর কৃপাকটাক্ষ বিনা এত বড় কর্ম কী করে হাসিল করেন মীরজাফর!

কিন্তু এ সংসারে কোনও কাজই পড়ে রয় না। সে জন্য লোকও মিলে যায়। যদিও 'Jaffar himself gave no opinion.'

অতঃপর সেই ব্যক্তি, মহম্মদী বেগ, 'Who from his infancy had been cherished by Mahubat Jung and Serajdowla from whose grandmother he had received a portion with his wife from charity, offered to execute the horried deed.'

হায়, এই মহম্মদী বেগ অনতি অতীতে নবাব সিরাজেব দ্বারা বহুবার বহু ভাবে উপকৃত। ঋণী। আপাতত সে সব অতিপ্রাকৃত বিস্মৃত হয়ে দাঁড়াল।

মহম্মদী বেগ খড়গ হস্তে কারাকক্ষে প্রবেশ করামাত্র সিরাজ চমকে উঠলেন। কে? মহম্মদী বেগ? তুমি! তুমিই কী অবশেষে আমায় বধ করতে এসেছ! এরা কী আমায়

আমার জন্মভূমির এক কানাচে দিনকতক বেঁচে থাকবার সুযোগ দেবে না! যৎসামান্য গ্রাসাচ্ছাদন ছাড়া আর কোনও চাহিদাই যে আমার নেই।

মহম্মদী সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে খড়গ হস্তে সিরাজের দিকে পায়ে পায়ে এগোয়।

সিরাজ আর্তস্বরে বলেন, না-না, আমি বাঁচতে পারি না। তা কখনও হতে পারে না। আমি যে হোসেনকুলিকে হত্যা করেছি। সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত আজ আমার জীবন দিয়েই তবে হোক।

মহম্মদীর কাছে এ সবই সমুখে মৃত্যু দেখা প্রাণীর প্রলাপ। বিলাপ।

সিরাজ, এস মহম্মদী এস। না না, খানিক রহ! আমায় একটু পানি দাও। পানি। আমি একবার শেষ নমাজটি করি।

আর সময় দেওয়া গেল না। সময় বড় অমূল্য নিধি। মহম্মদীর খড়গ তখনই সিরাজের স্কন্ধে প্রচণ্ড বেগে নেমে এল। সিরাজ রক্তাক্ত পড়ে গেলেন কক্ষ মধ্যে। মহম্মদী উন্মাদবৎ তাঁর ওপর উপর্যুপরি খড়গ হেনে চলল। খড়গাঘাত ব্যর্থ যদি হয়—এ ভয় হত্যাকারীরও থাকে।

—আর নয়, আর নয়—হোসেন কুলি। তোমার মরহুম আত্মা শান্তি লাভ করুক হোসেন—

সাহেবরা ইতিহাসেব পাতে লিখে রাখেন, 'Enough!-enough!-Hussein colly, thou art revenged.'

চমকিত প্রসাদ ভাবেন. হায়. এমন মর্মদ্রাবী হত্যা দৃশ্যও তা হলে কবিতার অতীত নয়। আহা, কবিতার মহিমা সত্যই অপার। পটুয়া মহাদেব পটের বুকে এবার সমাপনের আঁচড় রাখে।

প্রসাদ বলে ভালো বটে, এ বুদ্ধি ঘটেছে ঘটে,
এ সঙ্কটে প্রাণে বাঁচা দায়।।
মরণে কি আছে ভয়, জন্মের দক্ষিণ' হয়,
দক্ষিণাতে মন লয় কর দৈত্যরায় '
ওহে দৈত্যরায়, ভজ এই দক্ষিণায়,
আর কি কাজ আশায়।।

মধ্যরাতের কলকল গঙ্গাস্রোত বলে যায়, 'Siraj-ud-dowla was more unfortunate than wicked.'

বাহাত্তর

'পলাশির যুদ্ধজয় আমাকে কী অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছিল তা একবার চিন্তা করে দেখুন। একজন নবাব আমার অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল, একটি সমৃদ্ধ নগরী আমার দাক্ষিণ্যপ্রার্থী, এই নগরীর ধনীশ্রেষ্ঠ মহাজন ও সওদাগরেরা আমাকে খুশি করতে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। নবাবের কোষাগার শুধু আমার জন্যই খুলে দেওয়া হয়েছে—আমি দু'পাশের স্তূপীকৃত সোনা ও হিরে জহরত দেখে যাচ্ছি।'

আগামী ১৭৭২ সালে পার্লামেন্টারি কমিটির সুমুখে সাক্ষ্যদান কালে ক্লাইভ যা বলবেন সে সব কথা এ-মুহূর্তে নিহত সিরাজের থেকে দূরে—ভাগিরথীর পশ্চিমে বসে

মনে মনে মকসো করছেন। এই সাহেব তাঁর দূরদৃষ্টিবশত ভালো করেই জানেন যে, সদ্য পলাশির পর থেকেই বাংলায় অর্থনৈতিক ধস নামতে শুরু করেছে।

কিন্তু ক্লাইভ এখনই, এই যুদ্ধ ও সিরাজ অবসানে এমনই চিন্তিত যে লন্ডনের সিলেক্ট কমিটিকে তিনি ঝটিতি পত্র লিখছেন, 'আমার দৃঢ় ধারণা বাংলায় আপনাদের যে উপনিবেশ গড়ে উঠছে তার গুরুত্ব চিন্তা করে আপনারা যে শুধু তাড়াতাড়ি বেশিসংখ্যক সৈন্যসামন্ত ও উপযুক্ত কর্মচারী পাঠাবেন তা নয়, এখানকার শাসন চালানোর জন্য যোগ্য তরুণদের পাঠাতেও ভুলবেন না।'

হালিসহর-কুমারহট্টে রামপ্রসাদ-সর্বাণীর পট আঁকার প্রায় একক যুদ্ধ ফুরল। মহাদেব পটুয়া পটখানি হাতে করে তুলে ধরে রামপ্রসাদ ও নিকটে ঘোমটাবতী দাঁড়ানো সর্বাণীর দিকে।

সর্বাণীর চোখের সুমুখ দিয়ে একটি রাত পুইয়ে গেল দুই উন্মত্ত শিল্পীর আপনাতে ডুবে থাকা ঘোরের কানাচ বরাবর। আর এই সদ্য সকালের রোদের মাঝখান দিয়ে অদূরের পঞ্চবটির ঝুরি বেয়ে দুলদুল করে দুলছে এক টুকরো আশ্চর্য বাক্য, শিল্পং কৌশলং শীল্‌সমাধৌ।

ব্যাকরণের নিপাতনে শিল্প শব্দটি নিষ্পাদিত হল। হয়ে দাঁড়াল সমাধির, চিত্তবৃত্তির একাগ্রতার সাধন। একাগ্রতা না ঘটলে শিল্প ঘটে না। আর তার ফলে কৌশল থেকে জাত হয় এই শিল্পবস্তুটি। মানুষের চিত্তবৃত্তির একাগ্রতা না থাকলে এমনটি ঘটে না। এটি কোনও অনুকৃতি নয়। এর নাম সৃষ্টি।

পঞ্চবটির ঝুরি দোলনে এই অলৌকিক কথাগুলি হাওয়ায় দোলে। আর দোলে শিল্পী-শিল্পী-শিল্পী।

রামপ্রসাদের লেখনিতে এখন এই সদ্য সকালের বিভাস রাগিনী। গীতিকবিতার অলখে তাল বাজছে—ঢিমে তেতালা।

অকলঙ্ক শশি-মুখী, সুধাপানে সদা সুখী,
তনু তনু নিরখি, অতনু চমকে।
না ভাব বিরূপ ভূপ, যারে ভাব ব্রহ্মরূপ,
পদতলে শবরূপ, বামা রণে কে।।
শিশু-শশধর ধরা, সুহাস মধুর ধারা,
প্রাণ ধরা ভার ধরা আলো করিছে।।
চিত্তে বিবেচনা কর, নিশাকর দিবাকর,
বৈশ্বানব নেত্রবর-কর ঝলকে।।

পটুয়া মহাদেবের তুলে ধরা পটখানির দিকে চোখ তুলে তাকান প্রসাদ, কলমখানি নামিয়ে রেখে পাটার পরে। আড়চোখে একবার দেখেন অদূরে দাঁড়ানো সর্বাণীকে। তারপর মৃদু হেসে বলে ওঠেন, বেশ হয়েছে ভায়া। তোমার নাম মহাদেব কিন্তু কামে তুমি ভারি গৌরবাস্পদ শিল্পী।

মহাদেব লজ্জিত চোখে তাকায়, আপনার যে মূর্তিটি নাগাড়ে দেখে গেলাম, সেটি তো তুলিতে ধরতে পারলাম না। সেটি আঁকি আমার সাধ্য কী।

প্রসাদ অবাক বলেন, সে আবার কীরকম কথা ভায়া!

মহাদেব বলে, আজ্ঞে আমি এঁকেছি আপনার বারমহলের পট। ভেতরের লীলা আঁকার সাধ্যি নেই আমার।

প্রসাদ, ভেতরের লীলা। সে তো তোমারও, তোমার চোখে-মুখেও তার ছটা পড়েছে।

মহাদেব, তা হবে আজ্ঞে। তবে আপনি কী লিখছেন তা তো জানিনে বুঝিনে আমি। শুধু এটুকু বুঝেছি আপনার বুকের মধ্যে মহা তোলপাড় চলছে এখন।

প্রসাদ অমনি গলা তুলে গেয়ে ওঠেন,
বামা অট্ট অট্ট হাসে, তিমির কলাপ নাশে,
ভাবে সুধা অমিত ক্ষরে।
ভ্রমে কোকনদদল, মধুকর চঞ্চল,
লঘুগতি পতিত যুবতি অধরে।।
সহজে নবীনা ক্ষীণা, মোহিনী বসনহীনা,
কি কঠিনা দয়া না করে।
চঞ্চলাপাঙ্গ প্রাণ হর, বরষতি শর খর,
কত কত শত শতরে।।
কহে রামপ্রসাদ কবি, অসিত মায়ের ছবি,
ভাবিয়া নয়ন ঝরে।
ও পদ-পঙ্কজ-পল্লবে বিহরতু,
মামক মানস আশ ধরে।।

গান শেষ করে প্রসাদ বিচিত্র হাসেন। তাঁর আকর্ণ প্রায় রক্তিম চক্ষুজোড়া কী এক গূঢ় রহস্যে মজে থাকে। বয়ামে রাখা পুরনো তেঁতুলের আচারের মতোই সে রহস্যের বর্ণ, এ কথা ধরতে পারে মহাদেব। সে শুধু বুঝতে পারে না, বিনি কারণ পানে এই মানুষটির কেমন করে এমন নেশাঘোর হয়। কী প্রকারে চোখে না দেখা ইন্ধন ছাড়া এমনি দাউ দাউ আগুন ঘটে চলে একজন মানুষের অন্তর ও বাহিরে। তা হলে চোখে দেখার অতীত যে কত কিছুই বিরাজ করে এ জগৎ সংসারে সেই কথাটি সংসারে সত্য প্রতিষ্ঠা করবে কখন, কীভাবে!

প্রসাদ কন, তুমি খানিক আগে বলেছিলে বারমহল, ভেতর মহলের কথা।

মহাদেব, যে আজ্ঞে।

প্রসাদ বিমর্ষ শ্বাস রাখেন, সে কথার তত্ত্ব কী আমিও খোলসা করে বলতে পারি, না ধত্তে পারি। তবে ওই যেটুকু যেমন হয়, গান-কবিতা দিয়েই হয়। সেটিও যে কেমন করে ঘটে তা আমি বুঝতে পারিনে। সেটি আমার আয়ত্তে নেই।

মহাদেব, যথাত্থ বলেছেন আজ্ঞে। আমারও সেই একই কথা। পট আঁকতে আঁকতে কিংবা মূর্তি গড়তে গড়তে ভাবি শুধু ওটি গড়বার কথা। তার বেশি কিছু ভাবতে পারিনে।

প্রসাদ, সেটাই তো রহস্য। আমাদের কাজ গড়ে যাওয়া মাত্র। তার বেশি আর কিছু নয়। পরেরটুকুতে আমাদের কোনও হাত নেই।

মহাদেব, তাই তো। তাই তো। কাজ করার, করি। কিন্তু তারপরে আর কিছু জানিনে। কিন্তু আপনার এই গানটি শুনে মনে হল যেন গোটা একখানি ছবি দেখতে পেলাম। যদিও সব কথাগুলো আমার কাছে পরিষ্কার নয়, তবুও যেটুকু বুঝলাম—

প্রসাদ, সব কথা বোঝার দরকার আছে কী?

মহাদেব, তা তো জানিনে। আর আপনার মতো অত ভাবতেও পারিনে।

প্রসাদ মৃদু হাসেন, তুমিও ভাবো মহাদেব। ভাবনার বাইরে তুমি আমি কেউ নই। তবে কি না সেই ভাবনার কথাটি আমরা কেউই জানতে পারিনে। জানলেই আর রহস্য থাকে না। সব ফুরিয়ে যায়।

মহাদেব কতক না বোঝা মুখ নিয়ে বলে, তা হবে।

সর্বাণী এতক্ষণ পর কথা বলে, একটা কথা কইছিলাম।

রামপ্রসাদ চমকে তাকান। তারপর অপ্রস্তুত মুখে বলেন, ও মা, তুমি! তুমি কখন এলে?

সর্বাণী ক্লান্ত হাসে, আমি কখন এসেছি সে কথা না হয় পরে বলবখন। এখন একটি ভিন্ন কথা বলি।

—কী কথা শুনি।

সর্বাণী ঘোমটা আরও খানিক টেনে দিয়ে বলে, ওদের দুই বাপ-ছেলেকে আজ দুপুরে দু'টি ভাত খাইয়ে দেওয়ার কথা বলছিলাম।

প্রসাদ অপ্রস্তুত মুখে কন, ছি ছি। এ কথা বলার কথা তো আমারই। কিন্তু আজ কী রান্না হবে গেরস্তঘরে শুনি।

সর্বাণী বলে, গেঁড়ি কচুর সঙ্গে চুনো মাছ দিয়ে ডালনা, মুগের ডাল, পুঁই মেটুলির চচ্চড়ি আর আলুভাতে। শেষপাতে আমড়ার অম্বল।

মহাদেব পোটো হেসে ওঠে, খাসা খাসা। কোথায় লাগে রাজভোগ। এ তো সাক্ষাৎ দেবীভোগ।

প্রসাদ মিচকি হেসে কন, তোমাদের বউঠান খ্যানে খ্যানে দেবীও হয়ে দাঁড়ান, হুঁ।

সর্বাণী বুনো পথ বরাবর চলে যায়। যাওয়ার আগে হেসে বলে যায়, থালে এবার থেকে রোজ দু'জনাতে মিলে একসঙ্গে গঙ্গা নাইতে যাব। মানে—ওই পটে যেমন আছে, ঠিক তেমনি।

মহাদেব বলে, কেষ্টনগরে যখন ফিরব তখন দেশের না জানি কী হাল। গেল কালই গঙ্গা নাইতে যেয়ে শুনে এলাম নবাব সিরাজকে হত্যে করা হয়েছে। সে কী ভয়ঙ্কর কথা। খোদ নবাবেরই যদি এমন হাল হয় থালে আমাদেব মতো সাধারণ মানুষের কী অবস্থা হবে—এ দেশে।

রামপ্রসাদ খানিক চুপ করে থাকেন। নিজের বুকের কাছে মাথা হেঁট করে কী যেন ভাবেন। তারপর নিচু সুরে। আস্তে আস্তে কেটে কেটে বলে যান,

মা গো আমার কপাল দোষী।
জনমি ভারতভূমে মা!
কি কর্ম করিলাম আসি।
আমার এ কুল ও কুল দুকুল গেল,
অকুল পাথারে ভাসি।।
শ্রীরামপ্রসাদ বলে ভাবতে নারি দিবানিশি।
ও মা যখন শমন জোর করিবে
দুর্গানামে দিব ফাঁসি।।

পরের হরণ পরগমন মনে তখন হাসি খুশী।
সাজাই যখন করে রোদন
প্রসাদ নয়ন জলে ভাসি।।

মহাদেব দু'টি হাত বুকের কাছে রাখে। বুকে হাত চেপে বলে, যা বল্লেন সে সবই এখানে এসে বাজল। দেশের হাল যা, তা আপনার ওই দু-কলিতে বাঁধা পড়ল। আর সেই বিবরণখানি একেবারে বুকের মধ্যিখানে এসে ঘা দিল। আমার সাধ্যি কী নিজের এই এখনকার বুকখানির ছবি আঁকি!

প্রসাদ উঠে দাঁড়ান, সামনে এগিয়ে যান। তারপর দু'হাত বাড়িয়ে মহাদেবকে নিজের বুকের সঙ্গে টেনে নেন। পটুয়াপুত্র অবাক হয়ে এই বিহ্বল ছবিখানি দেখে আর ভাবে, আহা বাবা যদি যুগলের এমন একখানি পট আঁকতে পারত।

রামপ্রসাদ আপন মনে বলে যান, বলিদানং বিনা দেব্যা হিংসা সর্বত্র বর্জিতা।

অদূরের দুলন্ত পঞ্চমুণ্ডির ঝুরি নিচয় সমস্বরে বলে যায়, দেবীর উদ্দেশ্যে বলিদান ছাড়া আর সবখানে হিংসা বর্জন করবে।

ঝুরি সকল আবার বলে, অস্য মন্ত্রপুরস্কারং নিন্দাঞ্চৈব বিবর্জয়েৎ।

অন্যমন্ত্র পুরস্কারে নিন্দাও বিবর্জন করবে।

রাত গভীরে রামপ্রসাদ সর্বাণীর দেখা হয় টিমটিমে প্রদীপালোকে, ঘরের দৌহদ্দিতে তক্তপোশে। শিশুকন্যাটি আজ মা জননীর কাছে অন্যত্র।

সর্বাণী পান সাজতে সাজতে হেঁট মুখে বলে, তোমার ঠাঁয়ে একটি জরুরি কথা ছিল। এখন কি শোনবার মতো মন আছে তোমার?

প্রসাদ আপন মনেই বসেছিলেন রাজ্যের চিন্তাস্রোত মাথায় নিয়ে। সর্বাণীর এই রীতির কথায় তাঁর বুঝি চমক ভাঙে। তিনি চোখ তুলে তাকান পান সাজুনি ঘরণির দিকে।

সর্বাণী বলে, তোমার জন্যে একটি খপর আছে।

প্রসাদ বলে, কী খপর?

সর্বাণী হাত বাড়ায় পাশের ছোট দেরাজের দিকে। তারপর সেটির দোর খুলে একখানি গুটিয়ে পাকানো তুলোট কাগজ বার করে। তারপর বলে, সাবর্ণ চৌধুরি বংশের তরফ থেকে এখানা তোমার জন্যে গেল কাল এসেছে। আমায় ডেকে পাঠিয়ে ও বাড়ির সুভদ্রাদেবী এটি তোমার হাতে তুলে দিতে বলেছেন।

প্রসাদ অবাক বলেন, কী ওখানা?

সর্বাণী কাগজখানি প্রসাদের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, একখানি দলিল।

রামপ্রসাদ কাগজটি হাতে নিয়ে প্রদীপের পলতে উসকে দেন। আর তখনই রহস্য পরিস্কার হয়। দলিলের লিখন যা বলছে তার মূল কথা হল, এটি একখানি দানপত্র। দাতা রামকৃষ্ণ রায়চৌধুরির পুত্রবধূ পরম ভক্তিমতি মহিলা সুভদ্রা দেব্যা। এই কাগজে লেখা হচ্ছে, একদা এই পঞ্চবটি ও পঞ্চমুণ্ড আসন স্থাপনা করেন রামকৃষ্ণ। তিনি স্বয়ং ছিলেন বীরাচারী তান্ত্রিক। এতকাল এই সিদ্ধপীঠ-সমেত ভূখণ্ড পরিত্যক্ত, পতিত হয়ে পড়ে আছে। ওখানে পা রাখতে আর পাঁচজন মানুষ সাহস পায় না। অতএব সুভদ্রা দেবী 'কালীর বেটা রামপ্রসাদের' হাতেই ওই পীঠ তুলে দিতে ইচ্ছা করে এই দলিল সম্পাদিত করলেন। এ শুভকর্ম তিনি চিন্তামযী তারা'র ইচ্ছাতেই সম্পন্ন করলেন।

রামপ্রসাদ দলিল পাঠ করতে করতে অন্যমনে ভাবেন, এই রামকৃষ্ণের কথা তাঁর বিশদে জানা না রইলেও একেবারে অপরিচিত নন। তাঁর জন্ম সম্ভবত ১৬৫২ খ্রিস্টাব্দে। তিনি একজন তেজী সাধক ছিলেন। কিন্তু রামপ্রসাদের সঙ্গে তাঁর প্রভেদ বিস্তর। সে বিসম্বাদ যে প্রধানত কবিতাময় সংসারযাপন এ কথা পঞ্চজনায় জানে।

প্রসাদ কাগজ হতে মুখ তুলে বলেন, তা হলে আমার জীবনের আর এক পর্ব এবার বুঝি শুরু হতে চলল বউ।

সর্বাণী বলে, তাই বলে অষ্টপ্রহর যেয়ে ওখানে বসে থাকবে তা যেন না হয়। থালে আমরা বাঁচব কেমন করে!

প্রসাদ উঠে দাঁড়ান তক্তাপোশ ছেড়ে। তারপর সিধে চলে যান সর্বাণীর কাছে। সে কিছু বোঝবার আগেই রামপ্রসাদ তাকে দু'হাতের বেড়ে কোলে তুলে নেন। বিনি বিলম্বে তাকে এনে সপাটে ফেলে দেন বিছানায়।

সর্বাণী আড়ষ্ট বলে, কী করছ, কী করছ—

রামপ্রসাদ সর্বাণীর দুধেল স্তনযুগলে মুখ রাখেন। সর্বাণী শিউরে ওঠে। প্রসাদ সেই পর্বতদৃঢ় বুকে মুখ রেখে বলে ওঠেন, দেখি আমার জীবনের আর এক পর্ব তা হলে কেমন করে শুরু হয়। সব শুরুরই একটি মুখ চাই তো।

সর্বাণী অস্ফুটে বলে, ডাকাত ডাকাত। কিন্তু একটি কথা যে না বলে পারছিনে।

প্রসাদ কাতরে বলেন, বলো দেখি।

সর্বাণী হাঁসফাঁস গতিকে বলে, তুমি যখন বসে বসে আপন মনে পদ্য লেখো, গান রচো, তখন তোমায় নুকিয়ে-নুকিয়ে দেখে আমার আশ মেটে না যে।

প্রসাদ বলেন, কেন বলো দিকি?

সর্বাণী তার স্বামীধনাটির ঝাঁকড়া মাথা দু'হাতে আঁকড়ে ধরে বলে, তা বলতে পারব না। তবে ওই সময় তোমায় যেন দেখতে আরও সুন্দর লাগে। কীরকম চিনি না, চিনি না ভাব...সুন্দর...ভারি সুন্দর...

আর এই সুন্দরের বিপরীতে নবাব সিরাজ মহম্মদী বেগের উপর্যুপরি খড়গ হেনে চলার জবাবে কেবলই 'আর না'—'আর না' বলেছিলেন। সেও বুঝি আর এক মহিমময় সুন্দর। মহম্মদী উন্মত্তের পারা আচরণ করে চলেছিল। অবশেষে এই বদ্ধ কারাকক্ষ হতে সিরাজের তরতাজা আত্মা, যার অঙ্গে কোনও ক্ষতের দাগ নেই—এই পাপিষ্ঠ পৃথিবীর সঙ্কীর্ণ আঁধার কূপ থেকে পাখা মেলল। তারপর ধেয়ে গেল আকাশ পথে অমরাবতীর দিকে। কিন্তু হোসেন কুলি হত্যার বিলাপ তাঁর বুকের অন্তিম ক্ষত হয়ে রয়। 'This is perhaps a solitary instance of a native of Hindoostan expressing a consciousness of guilt of his death bed. Being absolute predestinarians they lay the fault to fate and after a life spent in every species of attrocity, pass their last moment in tranquility.'

উজ্জ্বল সকাল এক। মুরসিদাবাদের রাজ সড়কে এক হাতি চলেছে। তার পৃষ্ঠে শুইয়ে রাখা সিরাজের রক্তবিক্ষত বীভৎস মৃত শরীর। হাতি ঘুরছে রাস্তায় রাস্তায়। নগরবাসী দেখছে। চোখে হাত চাপা দিচ্ছে। তাদের সকলকে এরকম ধরে বেঁধে প্রত্যয় করানো হচ্ছে—নবাব সিরাজ আর বেঁচে নেই।

হাতি এগোয়। আগুপিছু কুতুহলি মানুষজন চলে। যেতে যেতে প্রাণীটি এসে হঠাৎ থেমে যায় এক স্থানে। সিরাজের মৃত শরীর থেকে কয়েক বিন্দু রক্ত ওইখানে পড়ে টপ টপ। আজ হতে তিন বছর আগে ঠিক এই স্থানেই সিরাজ হত্যা করেছিলেন হোসেন কুলি খাঁকে।

হাতি চলতে থাকে। চলে চলে। এবার সে এসে থামে সিরাজের পুরনো বাড়ির সুমুখে। অমনি চতুর্ধারে শোরগোল ওঠে। ছেলের মৃত শরীরের খপর পেয়ে সিরাজের মা জননী আমিনা বেগম খালি পা, এলোমেলো পোশাক, ছুটে এসে হাতির পায়ের সামনে আছড়ে পড়েন। শববাহী হাতি অমনি পা মুড়ে বসে পড়ল। মা জননী দু'হাত পেতে ছেলের তালগোল মাংসপিণ্ড এমত দেহখানি বুকে করে রাজপথে পড়ে রন। অবস্থা বেগতিক দেখে মীরজাফরের অনুচর কদম হোসেন গায়ের জোর খাটিয়ে আমিনা বেগমকে তুলে লয়ে অন্তঃপুরে কারারুদ্ধ করলে।

অবশেষে ওই দলাপাকানো রক্তাক্ত দেহখানি হাতির পিঠ হতে তুলে নিয়ে বাজারের চকের মধ্যে নিক্ষেপ করা হল। হায়, কারও একবার মনেই হল না শবদেহের ওপর অন্তত একখণ্ড বস্ত্র আড়াল দেওয়া উচিত ছিল।

দেহখানি বাজারের চকে পড়ে রইল ঢের খানিক সময়। মানুষ যেতে আসতে থমকে দেখে সুন্দর এক যুবার অনিন্দ্য দেহ এখন বিকৃত জরদ্গব দলায় এসে থমকেছে। অবশেষে মীর্জা-জৈন-উল্-আবেদিন নামে এক সহৃদয় ওমবাও এগিয়ে এলেন। তিনি দেহখণ্ডটি তুলে বেঁধে নিলেন এক বস্ত্রখণ্ডে। তারপর সিধে খুশবাগ। সেখানে মাটির নীচে প্রিয়তম নাতির জন্য অপেক্ষা করে আছেন নবাব আলিবর্দী খাঁ। অতএব তাঁর পাশেই সিরাজের গোর হল। শুনশান রাত নিঝুমে সেই কবরের ওপর একটি মেটে পিদিম জ্বলল। চিরাগের আলো পড়ল সিরাজের কপালে।

জগদম্বার কোটাল বড় ঘোর নিশায় বেরুল, জগদম্বার কোটাল—

আমাদের বাড়িতে কখনও মদের আসর দেখব বলে ভাবিনি। তবে আজ ব্যাপারটা কীরকম একতরফা হয়ে দাঁড়ায়। কানুবাবা আসরে আছে, কিন্তু ছুঁয়ে দেখার মতো পরিস্থিতি নেই। আসলে আজ সন্ধের এই আসরে যিনি আসবপতি তিনি পাটনার দাদু সত্যকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়। আমার কানুবাবার খুড়তুতো খুড়োর ছেলে এই প্রবাসী বৃদ্ধ। আমার দাদুর কাকাব ছেলে। এঁর বাবা নামকরা উকিল আর মদ্যপ ছিলেন।

তবে এই দাদুটি যেমন রূপবান, তেমনি বক্তিয়ার আর গানে কবিতায় দড়। আমাদেব বাড়ি মাঝে মাঝে আসেন। থেকে যান টানা এক দেড়মাস। ধবধবে সাদা শার্ট প্যান্ট। টকটকে প্রায় লালচে রং। মাথায় টাকেব পাশে পাকা ফিনফিনে চুল। অনেকটা ছবিতে দেখা বুড়ো আংলা'র অবন ঠাকুরের মতো দেখতে।

দাদু দোতলার বারান্দায় বোতল-গ্লাস নিয়ে বসেছেন। সামনে আমার কানু বাবা, পাড়ার জটাই দাদু, বাবার ফুটবল আব ইস্টবেঙ্গলি বন্ধু গড়গড়ি কাকা। মা চাপা লিবঙ্গি নিয়ে একতলার রান্নাঘর থেকে দাদুর জন্যে ডালের বড়া আর অন্যদের চা এনে দিল। পাটনাই দাদু গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন, শুকরিয়া বিটিয়া, শুকরিয়া।

নিপাট সরল জটাই দাদু বাবার মুখের দিকে চেয়ে যেন আরও নিপাট বনে যান। বাবা বলে, চা খান কাকা।

পাটনাই দাদু এবার গম্ভীর বনেদি গলায় হাঁক ছাড়েন, ফির দেখিয়ে অন্দাজে গুলে অফশানিয়ে গুফতার/রখ দে কোয়ি পয়মানহ্ ও সহ্বা মেরে আগে।

জটাই দাদু চমকে ওঠেন সেই বাজপতনের শব্দে। মুখ ফসকে বলে ফেলেন, বাপ রে।

দাদু এবার গলা নামিয়ে বলেন, আমার সামনে রাখো সুরার পাত্র আর মদ অতি যত্ন করে। তারপরে টের পাবে আমার মুখ দিয়ে কেমন বাক্যি ঝরছে।

গড়গড়ি কাকা মাথা নেড়ে-নেড়ে বলেন, বাহ্-বাহ্।

জটাই দাদু মিনমিনে গলায় বলেন, তবে সামনে ও সব কী রাখা হয়েছে? চন্নামেত্তর!

পাটনাই দাদু চোঁও-ও করে গেলাস খালি করেন। তারপর আবার বলে যান ওহে কানু, এই দ্রব্যটি পেটে পড়তে আজ আমার মির্জা আসাদুল্লা খান গালিবের কথা ভারি মনে পড়ছে যে।

কানু বাবা মহা উৎসাহে বলে, বলুন কাকা, আরও বলুন।

—সাবিৎ হুয়া হ্যায় গর্দনে মিনা পে খুলে খল্ক/লর্জে হ্যায় মৌজে ম্যায় তেরী রফতার দেখ কর। এই পৃথিবীর যতসব খুনখারাবির দায় এসে পড়ে শেষমেষ মদের ঘাড়ে। মদের ঢেউ কেঁপে উঠছে তোমার গতি দেখে।

দাদু প্রায় অট্টহাস্য করে ওঠেন, তা হলে—এখন আমি কী করি ফাদার কানু। এই তো সবে দু'পাত্তর চড়ল। এর মধ্যেই যদি মদের ঢেউ কেঁপে-কেঁপে ওঠে তা হলে আমার গতি কী হবে।

গড়গড়ি কাকা বলে, আমার মতো বে-আক্কেলে লোকও আপনার শায়ের শুনে কেঁপে-কেঁপে উঠছে। কী করি বলুন দিকি।

দাদু বলেন, তা হলে শোনো বলি। এই গালিব লোকটা ভারি অদ্ভুত। যেমনি মাতাল তেমনি পাগল। দিশি মদ তিনি টাচ করতে পারতেন না। বিলেত থেকে 'পুরনো টম' নামে এক আগুন আগুন মদ আসত তাঁর জন্যে। তো তখনকার দিনে এর দাম ছিল এক ডজন চব্বিশ টাকা। সিপাহি বিদ্রোহের সময় বাজারে আগুন লাগল। অমনি ওই সুরার দাম বেড়ে এক লাফে ষাট টাকা হয়ে গেল। তখন বেচারি গালিবকে বাধ্য হয়ে স্বদেশি ধরতে হল। কারণ মদ ছাড়া জীবন বাঁচবে কী করে! সেই অবস্থায় তিনি তাঁর এক বন্ধুকে পত্র লিখছেন। লিখছেন, অনেকদিন ধরে অব্যেস, রাত্তিরে ফরাসি ছাড়া কিছুই চলে না। নইলে ঘুম আসতে চায় না। যদি সাহসী ভগবৎতুল্য, দিলদরিয়া মহেশ দাস ফরাসি-রঙা দিশি মদ, গন্ধে অতুল্য, না পাঠাত তা হলে বাঁচাই কঠিন হত।

কানুবাবা হঠাৎ কী যেন ভাবে। তারপর চোখ বড় বড় করে বলে, আপনার গালিব আর আমাদের এই হালিসহরের রামপ্রসাদ, খুব একটা তফাত দেখছি না দু'জনাতে।

দাদু বলেন, তা হলে হয়ে যাক একখানা রামপেসাদি। দেখি কোথায় গালিব আর কোথায় তোমাদের রামপ্রসাদ।

কানু বাবা অমনি তার মিঠে আর চড়া গলা ছেড়ে দেয় চোখ বুঁজে।

ওরে সুরাপান করিনে আমি,
সুধা খাই জয়কালী বলে।
মন-মাতালে মাতাল করে,
মদ-মাতালে মাতাল বলে।।

গুরুদত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি মশলা দিয়ে মা,
আমার জ্ঞান—শুঁড়িতে চুয়ায় ভাঁটি,
পান করে মোর মন মাতালে।
মূল মন্ত্র যন্ত্র ভরা, শোধন করি ব'লে তারা, মা,
রামপ্রসাদ বলে এমন সুরা
খেলে চতুর্ব্বর্গ মেলে।।

পাটনাই দাদু গলা ছেড়ে হইহই করে ওঠেন, বলিহারি, বলিহারি। মরে যাই, মরে যাই। তা হলে গালিব কী বলছেন শোনো। জব ম্যায়কদহ্ ছুটা তো ফির অব ক্যা জগহ্ কী কয়েদ মসজিদ হো মদরসহ্ হো কোয়ি খানকাহ্ হো। অস্যার্থ, সরাবখানাই যখন আর থাকল না, তখন আর ঠাঁই নিয়ে কী কথা? মসজিদ, মাদ্রাসা, মঠমন্দির যে কোনও জায়গায় তো চলে।

গড়গড়ি কাকা বলে ওঠেন, বাপ রে কী ডজ করে বল নিয়ে দৌড়।

দাদু কন, আরে বাবা শোনো বলি। একবার কে একজনা গালিবকে বললে, যারা মদ খায়, আল্লা তার প্রার্থনা শোনেন না। তার জবাবে গালিব বলে বসলেন, ভাই রে, যার মদ আছে সে আবার কীসের জন্যে প্রার্থনা করবে?

জটাই দাদু এবার বলেন, কোথায় আমাদের রামপেসাদ আর কোথায় ওই মোচলমান কবি—

অমনি পাটনাই হাঁক পড়ে, একবার জনাকয়েক গোরা পল্টন সেনা তাঁর বাড়িতে ঢুকে পড়ে তাঁকে ধরে নিয়ে যায় তাদের কর্নেলের কাছে। কর্নেল শুধোলেন। তুমি মুসলমান? গালিব বললেন, জী আধা। মদ খাই, শুয়োর খাই না।

সবাই বাহ্ বাহ্ করে ওঠে, জটাই দাদু বাদে।

গড়গড়ি কাকা বলেন, কিন্তু কানু যে গানটা গাইলে তার মধ্যে মদের জন্মকথা আছে।

বাবা চোখ তোলে কীরকম?

গড়গড়ি কাকা বলে যান, আরে বাবা—ওই যে গাইলি না—'গুরু-দত্ত গুড় ল'য়ে, প্রবৃত্তি মশলা দিয়ে'—তার মানে কি? মানে হল মদ বানানোর ফর্মুলা। গুড়ের সঙ্গে বাখর, এই সব মশলা মিশিয়েই তো মদ বানানো হয়। মানে, রাম।

পাটনাই দাদু হাসতে হাসতে বলেন, বাপ আমার—মদ না খেয়েও কেমন ফর্মুলা ধরে ফেলছে। তাও আবার পাঁড়মাতাল রামপেসাদ থেকে। এ বেশ ভালো কথা। রামপ্রসাদ আর গালিব, দু'জনাতেই বদ্ধ মাতাল। মাতাল না হলে এমন সব বস্তু লেখা যায়।

কানুবাবা বলে, তাই তো, তাই তো।

দাদু গর্জে ওঠেন, হম্‌কো উনসে ওয়াফা কী হ্যায় উম্মিদ্। জো নহি জানতে ওয়াফা ক্যা হ্যায়। আমি তাদের কাছেই বিশ্বাস আশা করি, যারা জানে না বিশ্বাস বস্তুটা কী?

ওধারে, দাদুর ঘরে, রেডিও ফুঁড়ে অকস্মাৎ গান হয়। রামপ্রসাদী। মনে হয় কমলা ঝরিয়ার কণ্ঠে।

নিতান্ত যাবে দিন এ দিন যাবে,
কেবল ঘোষণা রবে গো।
তারা নামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গো।।

এসেছিলাম ভবের হাটে, হাট করে বসেছি ঘাটে,
ও মা শ্রীসূর্য্য বসিল পাটে নায়ে লব গো।।
দেশের ভরা ভরে নায়, দুঃখী জনে ফেলে যায়,
ও মা তার ঠাঁই যে চায়, সে কোথায় পাবে গো,
প্রসাদ বলে পাষাণ মেয়ে, আসন দে না ফিরে চেয়ে,
আমি ভাসান দিলাম গুণ গেয়ে, ভবার্ণবে গো॥

তিয়াত্তর

রাতের রেডিওয় 'ছায়াছবির গান' অনুষ্ঠানে আমাদের নৈহাটির শ্যামল মিত্র, আর সকলের রবিদা, কী বিষণ্ণই না গাইছেন, মীরজাফরের দাগাবাজি নবাব ধরতে পারল মনে, সৈন্যসমেত মারা গেল পলাশির ময়দানে, ফুলবাগে মোলো নবাব খোশবাগে মাটি, চাঁদোয়াটা লয়ে কাঁদে মোহনলালের বেটি, কী হল রে জান, কী হল রে জান, পলাশির ময়দানে ওড়ে কোম্পানির নিশান, হায় হায় হায় রে—কী হল রে জান...

রাত দশটার দিকে সময় টাল খাচ্ছে। আমাদের তিনতলা প্রাচীন কোঠাবাড়ি ঘিরে সেই কবেকার অন্ধকার থম ধরে আছে। ঝোপঝাড়, আগান-বাগান আর এই অট্টালিকার প্রতিটি ইঁট থেকে গা ঝাড়া দিয়ে সেইসব প্রাচীন অন্ধকারেরা আস্তে-আস্তে একে-একে আড়ামোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়াচ্ছে। এ ওর দিকে তাকাচ্ছে। চোখ মটকাচ্ছে। হাসছে। তারা বলাবলি করছে, এ বাড়ির ইঁটগুলো কেমন পাতলা-পাতলা আর আয়তক্ষেত্রাকার। হালিসহরে একটা করে বাড়ি মানে একটা পুকুর। ওই পুকুরের মাটি তুলে ইঁট বানিয়ে এই অট্টালিকা তোয়ের হল। সে কী আজকের কথা।

অন্ধকারেরা একই কথা রোজ বলাবলি করে। সেসব কথায় আমাদের সাবেক উঠোনি বেলগাছ সায় দেয়। পুরনো বাজপড়া নারকোল গাছের গায়ে কাঠঠোকরা ধারালো ঠোঁট বেঁধাতে-বেঁধাতে বলে—এ বাড়ির দোতলার ওই পুবমুখো ঘরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে কলিকাতা, সুতানুটি আর গোবিন্দপুর এই তিন গ্রাম মাত্র তেরশত টাকায় বিক্রি করবার সাফ কোবলার খসড়া তোয়ের হল। আমাদের এই বাড়ির সামনে, মস্ত বাগানে সাহেবদের একজোড়া তেজি ঘোড়া বাঁধা। তাদের দানাপানি দেওয়া হয়েছে। ঘোড়াদ্বয় বলছে—পাঁচু শক্তি খান। পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায় হলেন পাঁচু শক্তি খান। মোগল সম্রাট হুমায়ুনের সেনাদলে তিনি নিজ বীরত্ব দেখালে পর বাদশা উপাধি দিলেন 'শক্তি খান'।

সেনা থেকে অবসর নিয়ে তিনি যে এই হালিসহরে এক 'সমাজ' প্রতিষ্ঠা করলেন তার সাক্ষী এ বাড়ির খড়খড়ি-আঁটা জানলায় হিলহিল করা হাওয়ারা। তারা সাক্ষী দেয় হরবখত, বঙ্গদেশে কনৌজ হতে আসা পাঁচজনা বামুনের এক প্রধান ব্যক্তি সাবর্ণ গোত্রজ বেদগর্ভের অধস্তন পঞ্চদশতম পুরুষ এই পঞ্চানন বা পাঁচু শক্তি খান। এত কিছুর পরেও আমাদের বাসনমাজুনি পাগলি সরস্বতী দিদি দুলে-দুলে গান গায়, পাঁচু পাঁচ ছাগলের মা, বোম যটকে, ওইইই আমগাছে গিয়ে আটকে।

শ্যামল মিত্রের গানখানা এবার ভারি কান্না অভিমানের ধাঁচে বলে ওঠে, এই খবরটা দিও রে ভাই দেশের প্রতি ঘরে ঘরে, সৈন্যসমেত দিল পরান নবাব দেশের তরে...হায় হায় হায় রে—কী হল রে জান...

রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন জানেন, সিরাজ নিহত এবং মাতামহের পাশে কবরে নিঃসীম নিদ্রিত। এ খপর এখন গোটা দেশবাসী জানে যে সুবাহ্ বাংলা-বেহার-ওড়িশার নবতম নবাব হলেন নবাব সুজা-উল-মুল্ক হিসামুদ্দৌলাহ্ মীর জাফর আলি খান বাহাদুর মহাবৎ জঙ্গ। মহাবৎ জঙ্গ তস্য প্রভু মালিক আলিবর্দী খানের উপাধি। এর অর্থ হল : যুদ্ধে প্রচণ্ড।

কিন্তু এখানে, এই হালিসহরে সদ্য হাতে পাওয়া সাধক রামকৃষ্ণ তান্ত্রিকের পঞ্চমুণ্ডির আসন সম্পর্কে মনে মনে যেন কুতূহলের কিঞ্চিৎ শিথিলতা প্রমাণ হয় এখন। সেই একদা রামকৃষ্ণ একজন নেহাতই তন্ত্রসাধক বাদে আর কিছু নন। আর এই রামপ্রসাদ, শব আরাধনা করলেও একজন আপাদমস্তক কবি। তাঁর কালী আধারিত গীত-কবিতায় বুঝি কভু কভু কবিত্ব অতিক্রম করে গিয়েছে আধারভূতা শক্তি দেব্যাকে। বিশেষ করে এই সদ্য শেষ পলাশির যুদ্ধকালে বাংলা গীত ও কবিতায় এক অভিনব সংযোজন—সমরসঙ্গীত, এই সবে ঘটে গেল। কবিতার সংসারে এ এক অভিরাম বিদ্যুচ্চমক। মানুষের এই সংসারে আনন্দ-দুঃখ-শোক তো অহরহ ঘটে। কিন্তু যুদ্ধ এক বিরল ঘটনা। বিশেষ করে এই পলাশি এমন এক ঘটনা, যা দেশকালের মূল বরাবর নাড়া দিলে। বিদেশি বানিয়ার হাতে দেশকে বেচে দেওয়ার কল করলে। নামেই মীরজাফর নবাব, আসল চাবিকাঠি রইল ইংরাজের দখলে।

সে রাতে সর্বাণীকে প্রসাদ বলেছিলেন জীবনের অপর এক পর্ব আরম্ভ করার কথা। সে পর্ব ওই সদ্য পাওয়া পঞ্চমুণ্ডির কথাই তখন ইঙ্গিতে এনেছিল। কিন্তু এখন মনে হয়, এই বিরাট বিপুল কবিতার সংসারে আরও কত কিনা ঘটতে পারে। কবিতা ও কালিকার কোনও অন্ত নেই।

এই অন্তহীনতার প্রমাণ দাখিল হল আজ সকালের কিছু পরে। একজন অন্ধ আর বৃদ্ধ মানুষ এক কিশোরের হাত ধরে এসে উপনীত হল প্রসাদের দোরগোড়ায়। দূর হতে দু'খানি হাত জোড় করে নমস্কার রাখলে সে। তারপর দাওয়ার কানাচে বসে পড়ে বললে, বাবা রামপেসাদ, বহুদূর থেকে তোমায় ঠাঁয়ে এলাম একটি বিশেষ কারবারে। তা পেথমেই বলে রাখি, আমি আর আমার এই ভাইপোটি আজ দুকুরে তোমার বাড়িতে দু'টি পেসাদ পাবো।

রামপ্রসাদ বলেন, কিন্তু আমি তো বামুন নই। তুমি কী জাত তা তো জানিনে। তবে আমার নিজের কোনও জাতপাত নেই বাবা। বলতে পারো—আমি ম্লেচ্ছরও অধম।

বৃদ্ধ হেসে ওঠে, ভয় নেই বাপ। আমি বাউনও নই আবার মেলেচ্ছও নই। একটা মাঝামাঝি রফা করতে পারো।

প্রসাদ নড়েচড়ে বসেন, মানুষটির রসবোধ দেখে। বাঃ বাঃ। তা প্রথম দফেই তোমার সঙ্গে ভালোই রফা হয়ে গেল বাপু। এবার বলো কী হুকুম।

বৃদ্ধ কয়, আমার নাম লক্ষ্মীনারায়ণ দাস বাবা। আমি জন্ম অন্ধ। পথে-পথে গান গেয়ে ভিক্ষে করে বেড়াই। আর আমার এই ভাইয়ের বেটা সুখলাল আমার সঙ্গে থাকে।

প্রসাদ বলেন, লক্ষ্মীনারায়ণ আর সুখলাল। বেশ নাম।

বৃদ্ধ বলে, আমার বয়েস গেছে। কিন্তু আমার ভাইপোটির খাসা কণ্ঠ। আদপে ও-ই বেশি গায়। আমি সঙ্গে খঞ্জনি বাজাই। তাতে যা আয়পয় হয় আমাদের চলে যায়। সংসার বলতে আমরা এই দু'জনা। ওর বাপ-মা দু'টিই গত হয়েচেন।

—কী গান গাও তোমরা শুনি?

—আজ্ঞে হরিনাম। আর দু'চার কলি কেত্তন। কিন্তু তোমার ঠাঁয়ে এলুম বাপু তোমার একখানি গান নিতে।

রামপ্রসাদ অবাক, আমার গান নিতে! মানে!

—মানে খুব সিধে বাপ। নদে জেলার পথে-পথে আমার মতো অনেক ভিখিরি তোমার গান গেয়ে রোজগার করে। সংসার রক্ষে করে।

প্রসাদ এবারেও অবাক, বটে!

লক্ষ্মীনারায়ণ তার আঁধার চোখ দু'খানি দুলিয়ে হাসে, বাপু হে, ফুল ফুটলে মৌমাছির দল তার খপর পায় বৈকি। তোমার গান রাজা-রাজড়ারা শুধু শোনে তরিবত করে। তাতে তেনাদের কী ভাব হয়, সে কথা তেনারাই কইতে পারেন। তবে আমার মতো গরিবের পেটে যে গান অন্ন দেয় তার মহিমে আমি কেমন করে ব্যক্ত করি তোমার ঠাঁয়ে।

শ্যামল মিত্রের গাওয়া এই সিনেমার গানখানা যে আমায় কী দিল তা-ও তো আমি কাউকে বুঝিয়ে বলতে পারি না। বিদেশ-বিভুঁই হল হায়রে দেশের মাটি, গোবিন্দপুর কাঁদে রে ভাই কাঁদে সুতানুটি, কী হল রে জান, কলজেটারে লুটে নিল কোম্পানির কামান, পলাশির ময়দানে ওড়ে কোম্পানির নিশান—হায় হায় হায় রে, হায় হায় হায়...এই চিন-ভারত যুদ্ধুর কালে আজ কিছুদিন হল সকালবেলা থানা থেকে ভ্যান রিকশোয় চোঙা লাগিয়ে মাইক ফুঁকে বলে যাচ্ছে, সন্ধের পর থেকে গোটা এলাকা 'ব্ল্যাক আউট' থাকবে। বাড়ির ইলেকট্রিকও বন্ধ থাকবে।

তাই হচ্ছে। রোজই সন্ধে নামলে রাস্তার লাইট নিবছে। বাড়ির আলোও বন্ধ। লণ্ঠন জ্বলছে গোটা কতক। গোটা বাড়ির পরিবেশটা শরৎচন্দ্রের সেই বহুরূপী সাজা গল্পের মতো। কোথায়, কোন ঝোপে-ঝাড়ে বুঝি সাজা বাঘটা লুকিয়ে আছে। তার মলাটের মধ্যে আছে শ্রীনাথ বহুরূপী। ছমছম, থমথম করছে সর্বত্র। আজ বড়মার কথা বড্ড মনে পড়ছে। এমনি সময়ে তাঁকে ঘিরে কত সব গল্প, কথা। বেশির ভাগই আমাদের না শোনা।

সেইরকম একটি না শোনা গল্প বড়মা এখন বলছে দেয়ালে টাঙানো ছবির ভেতর থেকে।

একবার হল কী, মহারাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় এক দিগ্‌গজ পণ্ডিত এসে বললেন, মহারাজ, আমি কত বড় পণ্ডিত আপনি সেটি বিচার করুন। রাজা ব্যাপার না বুঝে তলে-তলে কালিদাসকে খপর কল্লেন। পরদিন সকাল না হতে কালিদাস কল্লেন কী, একজন ভিখিরি সেজে কাঁধে মাছ ধরার জাল নিয়ে পণ্ডিতের কাছে যেয়ে হাজির হলেন। পণ্ডিতমশাই ভাবলেন ওটি বুঝি ছেঁড়া কাঁথা। বল্লেন, ভিক্ষো তে কন্থা শ্লথা। ওহে ভিক্ষুক, তোমার কাঁথাখানি যে ছিঁড়ে উলকুটি ধুলকুটি। ভিক্ষুক সাজা কালিদাস জবাব দিলেন, ন হি, শফরিবধে জালম। এটি কাঁথা নয়, মাছ ধরার জাল। পণ্ডিত বল্লেন, অশ্নাসি মৎসান্? সে কি কথা, তুমি মাছ খাও? তে বৈ মদ্যোপদংশাঃ। আজ্ঞে যেদিন আমি মদ খাই, সেদিন তার সঙ্গে টাকনা দিয়ে মাছ খাই। পিবসি মধু? তুমি মদ খাও? কালিদাস কন, সমং বেশ্যয়া। হ্যাঁ, যখন বেশ্যাবাড়িতে থাকি তখন মদ খাই। তুমি বেশ্যাবাড়িও যাও? আজ্ঞে, যখন আমি আমার শত্রুদের হারিয়ে দি সেদিন মনের আনন্দে সেখানে যাই। তব কিং

রিপবঃ? তোমার আবার শত্রুও আছে? আজ্ঞে, আমি যাদের ঘরে সিঁদ কাটি তারা আমার শত্রু। তা হলে তুমি একজন চোর? আজ্ঞে, পাশা খেলবার জন্যে আমি লোকের বাড়িতে চুরি করে থাকি। পণ্ডিত চোখ চড়কগাছে তুলে কন, ত্বয়ি সকলমিদম? এই সব অপকম্মই তুমি করে থাকো? ভিখিরি সাজা কালিদাস মিচকি হেসে বল্লেন, আমার মতো একজনা দুরাত্মা মানুষের কোনটি ভালো আর কোনটি মন্দ তা বিচার করার খ্যামতা কোথায় পণ্ডিতমশাই। নাস্তি নষ্টে বিচারঃ।

ডাকসাইটে পণ্ডিত তো এমন একজন হাভাতে ভিখিরির বাক্যি শুনে অবাক। এ লোকটি শুধু মুখে-মুখে জবাবই দিলে না, কোথাও কোনও ছন্দভঙ্গও কল্লে না। পণ্ডিত তখন মনে মনে ভাবলেন, যে দেশে একটি ভিখিরির এত জ্ঞানগম্যি সে দেশে রাজসভার পণ্ডিতেরা না জানি কত বিদ্বান। এই না ভেবে পণ্ডিতটি সে রাতেই মানে মানে সটকে পড়লেন।

গল্পটা একই সঙ্গে সোজা আর কঠিন। সব কথার মানে বোঝা যায় না। যেমন বেশ্যাবাড়ি মানে কী? নিশ্চয়ই কোনও খারাপ বাড়ি। ওটা আর বড়মার কাছে জানা হল না আমার।

দাদু হঠাৎ করে আমায় বলে বসেন, অঙ্কে তো পণ্ডিত তুমি। কী করে যে ক্লাস টেন থেকে ইলেভেন-এ উঠবে। টেন অবদি অঙ্ক। ওটা টপকালে আমি বাঁচি।

আমি জানি, টেন আসতে এখনও দেরি। তার আগেই দাদুর ভাবনা। কথাটা বাবার কানে যেতে বলে ওঠে, সব সময় অন্যমনস্ক। তার ওপর বড় বাড়াবাড়ি রকমের চঞ্চল। কী যে ওর কপালে আছে।

আমি জানি আমার কপালে কী আছে। মাথাটা বেশিরকম চুলে ঢাকা থাকায় সেটা সহজে দেখা যায় না। একেবারে রাজার তিলকের মতো, কপালের ওপর এলাকায় মস্ত একখানা কাটা দাগ। অনেক ছোটবেলায়, সেই কাঁচরাপাড়ায় দাদুর ইসকুল কোয়ার্টার থাকার সময়, ওপরের সিঁড়ি থেকে একেবারে নীচে গড়িয়ে পড়ার ফল। চৌকাঠে লেগে মাথার সামনেটা নাকি সাদা আর হাঁ। এটা আমার মা'র বর্ণনা। আমি নাকি এরপর এক ফোঁটা কাঁদিনি। যত কান্না মা'র জন্যে বরাদ্দ হল।

দাদু আবার বলেন, তা হলে বলতো, বড় হয়ে তুমি কী হবে?

আমি একটু চুপ করে থাকি। তারপর বলি, একটা মিষ্টির দোকান দেবো। ঠিক আমাদের মণি মান্নার মতো।

দাদু হো হো হেসে ওঠেন। সে হাসিতে এ বাড়ির আঁধার আঁধার কড়িকাঠ দোলে। দুলে ওঠে জানলার ওপারে কামিনি গাছের সবুজ আর শক্ত ফলগুলো। ঝামর সুপুরি গাছের মাথা পেরিয়ে সে হাসি ঠাকুরপাড়ার দিকে উড়ে যায়। উড়তে-উড়তে পান বরজের ভেতরে সেঁধোয়। পটল গাছের অলিগলি আর তেজি লঙ্কা ঝোপের ভেতরে পড়ে কীরকম পথ হারায়। নীচের থেকে চমৎকার দুব্বো ঘাসেরা তাই দেখে মিটমিট করে হাসে। হাসে, আর এ ওর গায়ে ঠেলা মারে। তাই দেখে আমাদের তেতলার ছাতের আলসেয় উপবিষ্ট একজোড়া মস্ত ভুতুম পেঁচা এ ওর দিকে গোলগোল চোখে সন্দ সন্দ তাকায়। সে চোখ মণি মান্নার প্রকাণ্ড রসগোল্লার মতো—যাকে বাইরের লোকে রাজভোগ বলে ভুল করে।

জোড়া প্যাঁচার মধ্যে বেটাছেলেটি বলে, হুমম্, কত দেখলুম, কত খেলুম। কিন্তু মণি মান্নার রাজভোগ কখনও খাইনি যে।

তার মেয়েমানুষটি অমনি বলে, আমার ভারি বয়ে গেছে খেতে। নামে রসগোল্লা আর কর্মে রাজভোগ—এ আবার হয় নাকি।

—হুমম্, তার চেয়ে বেঁচে থাক আমার লাড্ডু। সে কি আজকের খাবার? তা হলে বলি শোন, টিকাকার নারায়ণ বলছেন, বর্ষোপলাঃ করকাস্তত্তুল্যানামেলাকর্পূরশর্করা-লবঙ্গ-তণ্ডুল-পিষ্ট-রচিতানাং গোলকানামতীবৃত্তানাং লড্ডুক-বিশেষাণাম্। আহা, কর্পূর দেয়া লাড্ডু কী উপাদেয়।

—রাখো তোমার লাড্ডু। যত সব ভিখিরিদের খাদ্য। আসল লোকটা হল রাজার কবি। সে থাকত রাজসভায়। আর ওই বেটা গরিব টীকাকার—সে থাকত বাইরে, মানে লড্ডুকপ্রিয় সমাজে। সে কী করে জানবে নলরাজার বিয়ের বরযাত্রীদের খাবার সময় বরফ খেতে দেওয়া হল। কর্পূরের গন্ধমেশানো গোলাকৃতি বরফ। তার সঙ্গে আবার এলাচ-শর্করা-লবঙ্গ-তণ্ডুল-পিষ্টক মেশানো। খাবারের রচনাটি একবার দেখোসে।

—হুমমম্। একেই বলে খাদ্যশিল্প। তবে মণি মান্নার রাজভোগ একটিবার খেয়ে দেখতে হবে।

আমি ভাবি, আমার দোকানে রসগোল্লা যেমন থাকবে, তেমনি লাড্ডুও।

দাদু হাসি থামিয়ে বলেন, তা ভালো, তা ভালো। বামুনের ছেলে, ময়রা হবে। এ-ও তো একরকমের শিল্পবিপ্লব।

আমি অবাক তাকাই তাঁর চোখের দিকে। পুরু কাচের ওপারে ঝকঝকে দু'টো চোখ। দাদু বলেন, অনেককাল আগে RUSKIN বল্লেন, There is no wealth but life আবার তারও পরে গণতন্ত্রকে বলা হল It means a levelling down. সেই কবে BLATCHFORD সাহেব একখানা বই লিখলেন Merrie England. সেখানে তিনি একজন Gentleman-কে Collier করতে চাননি, বরং উল্টোটা, মানে Collier কে Gentleman করতে চেয়েছিলেন। যেমন আমাদের গান্ধি—Who did not want to make the Brahmin an untouchable, but the outcast touchable. ছাদের আলসেয় বসে বেটাছেলে ভুতুম একটা কবিতা বলে যায় গড়গড়িয়ে।

I dream'd
That stone by stone I reared a sacred fane
A temple, neither Pagod, Mosque, nor Church,
But loftier, Simpler, always open doored
To every breath from heaven and Truth and Peace
And love and Justice came and dwelt therein.

দাদু কান খাড়া করে পদ্যটা শোনেন। তারপর ছোট্ট এক টুকরো নিশ্বাস ফেলে বলেন, বাঃ বাঃ, Tennyson.

আমার সব যেন কেমন গোলমেলে মনে হয়। সবাই শক্ত শক্ত কথা বলে। এর চেয়ে আমার রসগোল্লার দোকান অনেক সোজা কথা।

আমি বাইরের উঠোনে নেমে গিয়ে দাঁড়াই। ঘুরঘুটে অন্ধকার আমার সারা গায়ে চেপে বসে। আকাশ বরাবর একটা প্লেন গড়িয়ে যায়—অনেক দূর দিয়ে। লেজে পুট পুট

আলো জ্বলে। আমি শুনতে পাই বাবা দোতলার ঘরে, ঝুপসি অন্ধকারে দিব্যি গলা ছেড়ে গাইছে,

কবি রামপ্রসাদ হাসে,
আনন্দ সাগরে ভাসে,
সাধকের কি আছে জঞ্জাল।
বিভীষিকা সে কি মানে, বসে থাকে বীরাসনে,
কালীর চরণ করে ঢাল।।
জগদম্বার কোটাল, বড় ঘোর নিশায় বেরুল,
জগদম্বার কোটাল ..

এই অন্ধ ভিখিরির সঙ্গে কথা বলতে বলতে রামপ্রসাদ মনে মনে ভেবে কূল পান না কেমন করে তাঁর গান ইতিমধ্যেই নদে জেলার গরিব ভিখিরি মানুষের মুখে যেয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, অন্নও জোগাচ্ছে। অতঃপর একটি সরল সত্য তাঁর মনে সাব্যস্ত হয় যে, এ জন্য স্বয়ং মা গঙ্গাই দায়ী। তাঁর স্রোতোমুখে যেমন পলাশির যুদ্ধ-সমাচার মাঝি-মাল্লা বরাবর কিংবা শুধুই জলে জলে এসে দাখিল হয়েছে তাঁর কাছে, ঠিক হয়তো সেই একই প্রকারে তাঁর কবিতা ও গীত লোক হতে লোকান্তরে চারিয়ে গিয়েছে। আহা, কী ভাগ্যি এই গ্রাম্য বুনো কবির! কালীর বেটা রামপ্রসাদ এখন পঞ্চজনার বেটা সাব্যস্ত হয়েছে। বিশেষ করে পিতা-মাতা যদি নিরন্ন হতশ্রী হয়, তাকে অন্ন জোগান দেওয়ার ওকালতনামা তো উপযুক্ত পুত্রের ওপরেই বর্তায়।

লক্ষ্মীনারায়ণ এবার যেন কতক কাতর স্বরে বলে, তা হলে বাবা একখানি গান যদি দাও। তোমার গান মানে অন্নদান। কী বাপ, বলি দেবে তো!

এ কথার সঙ্গে সঙ্গে রামপ্রসাদের দু'চক্ষু ছল ছল করে উঠেছে। কতকাল পর বুঝি মরা চোখে জোয়ার এল। সেইসঙ্গে প্রসাদের মনে মনে উঁকি দেয় কন্যে পরমেশ্বরীর বিবাহের দিন পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে। আগামী আষাঢ়ের ১২ই কন্যা সম্প্রদান। আহা, কী অপার রহস্যময়ী এই প্রকৃতির লীলাবৈভব। এতকাল যে কন্যেটি বাপ-মায়ের সংসারে আদর-সোহাগের নিগড়ে বাঁধা ছিল, সে কিনা চোখের পলকে ভিন্ন হয়ে যাবে। শুধু গোত্র ভিন্ন নয়, আকার, প্রকার এমনকী মনখানিও পৃথক হয়ে যাবে। মন, মন, মেয়ের মন হয়ে পড়বে ঘরনি। তারপর একদিন ঘরনি হতে জননী। আর এইটিই তো নারীর আসল রূপ। এই রূপকাহিনির একেবারে প্রথম পাতে এসেই রামপ্রসাদের বুকের মাঝখানটি টনটন করে। মায়ের জন্যে যদি নাড়ি ছেঁড়া ধন কথাটি লেখা থাকে তা হলে বাপের তরফে কোন কথাটি রাজসাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে?

বৃদ্ধের সঙ্গের ছেলেটি রামপ্রসাদের চোখের দিকে চেয়ে বাপের হাতে আস্তে করে চাপ দেয়। ছেলের স্পর্শে বাপ বুঝতে পারে তার কথার কী ফল ফলল এইমাত্র।

রামপ্রসাদ নিজের বুকে একখানি হাত রেখে টের পেতে চান এইমাত্র কী ঘটে গেল এখানে। ঘটল অথচ সে কথার কোনও নিষ্পত্তি হল না। তা হলে এখন বাপের তরফ তোলা থাক। মা জননীর কথাই হোক। তা না হলে এ বিশ্ব ভুবন যে রসাতলে যাবে।

রামপ্রসাদ কিশোর সুখলালের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বলেন, তোমার নামের মাত্রা তো সুখ দিয়ে ছেলে। তা হলে আমি পহেলা দফেতে দু'টো দুখের কথাই বলি।

সুখলাল অবাক হয়ে প্রসাদী বাক্য শোনে। প্রসাদ কন, আমার হয়েছে জবর বিপদ। না হলাম সংসারী, না বীরাচারী। এমন একখানি শক্তপোক্ত পাঁচমাথার আসন পেয়েও সেদিকে আজ অবদি মন গেল না। লোকে বলে কালীর বেটা। কিন্তু আমি যে কালীর পেট ফুঁড়ে না বেরিয়ে পিঠ বরাবর ভূমিষ্ঠ হয়েছি, সে খপর কে রাখে?

লক্ষ্মীনারায়ণ অবাক বলে, পিঠ বরাবর!

প্রসাদ হাসেন, তা নয় তো কী! পেট থেকে পড়লে দিনরাত কালীর পদতলেই বসে রইতাম। কিন্তু তার বদলে পিঠ দে বেরিয়েছি বলে কালীকে অবলম্বন করে কবিতা রচি। গান বলি।

লক্ষ্মীনারায়ণ চঞ্চল চোখের মণি ইদিকউদিক করতে করতে খানিক অসহায় বলে, এ তো ভ্যালা প্যাঁচে পড়া গেল। ভ্যালা প্যাঁচ—

প্রসাদ বলে ওঠেন, থাক থাক, আর প্যাঁচে কাম নেই। এবার সিধে বাত বলি। তবে ওই যে বল্লাম প্রথমে দু'টো দুখের কথা হবে।

লক্ষ্মীনারায়ণ আড়ষ্ট স্বরে বলে, তোমার মায়ের গান হবে তো বাপু?

প্রসাদ সামান্য হাসেন, হ্যাঁ গো, তা ভিন্ন আর কী-বা জানি আমি। তবে এখেনে তোমার ওই মায়ের কথাই কিঞ্চিৎ ভিন্ন ভাবে। অর্থাৎ মেয়ে বিদায়ের গান। আমার কন্যেটিও তো বিদায়ে বসেছে। মা পরমেশ্বরী আমার। কন্যে উ... মায়ের বুক খালি করে দিয়ে স্বামীর ঘরে বিদেয় হচ্ছে। দেখি, কী হয় এখন।

রামপ্রসাদ আস্তে-আস্তে দু'চক্ষু মোদেন আর বলেন, আমি বলি। আর তোমরাও আমার সঙ্গে বলো দিকি। গান হয়,

ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার।
ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে,
কি শুনি দারুণ কথা দিবসে আঁধার।
বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে বসে মহাকাল,
বেরোও গণেশমাতা ডাকে বারবার।।
তবে দেহ পাষাণ, এ দেহে পাষাণ প্রাণ,
এই হেতু এতক্ষণ, না হলো বিদায়।।
তনয়া পরের ধন, বুঝিয়া না বুঝে মন,
হায় হায় এ কি বিড়ম্বনা বিধাতা।।
প্রসাদের এই বাণী, হিমগিরি রাজরাণী,
প্রভাতে চকোরী যেমন নিরাশা সুধার।।

গান ফুরোয়। আজ এই প্রভাতবেলা বয়ে যাওয়া অলীক এক ক্ষণে এই নবীন গীতখানি ললিত রাগিনীতে বাঁধা হয়। তারা দু'জনাতে প্রসাদের পাশে-পাশে গলা রাখে নাগাড়ে। গানখানি গাওয়া হয় পর পর বেশ ক'বার। এবং এ কথা আশ্চর্য জাদুকরিতে সা- স্ত হয়, যে দু'জনার চোখের পাতে জল টলছে তাদের একজনা অসংসারী বৃদ্ধ, আর অপরজনও এখনও সংসার না হওয়া কিশোর। দু'জনার কাছে কন্যে রতন, সে কেমন রতন তার কোনও হিসেব নেই। তবুও এমন হয়। বেহিসেবীর ঠাঁয়েও কখনও-কখনও দুঃখ সুখের পাকাখাতা দাখিল হয়। সেই খাতায় বাপ-মা এ সব অতীত হয়ে কোথা হতে দমকা হিমগিরি বাতাসের অচেনা ঝাপট এসে পড়ে।

রামপ্রসাদ মনে ভাবেন, কবিতার এই নতুন বাঁকটিও তা হলে অবশিষ্ট ছিল! না জানি আরও কত অবাকতর আলো এখনও জ্বলতে বাকি। সত্যিই, কবিতার সংসারে কোথাও দাঁড়ি পড়বার কথা লেখা থাকে না।

জীর্ণ ভাঙা সরাই-খানার রাত্রি দিবা দুইটি দ্বার,
তারির ভিতর আনাগোনা—দুনিয়াদারি চমৎকার।
রাজার পরে আসছে রাজা, সজ্জা কতই বাদ্য ধূম—
তুচ্ছ সে সব—কয়দিনই বা—তার পরে তো সব নিঝুম।।

এ পর্যন্ত বলে আমার কানুবাবা ব্ল্যাক আউট মোড়া অন্ধকার ঘরের তক্তপোশে গদাম করে একটি কিল বসায়। দাদু ও ঘর থেকে বলে ওঠেন, কী হল? কী হল?

বাবা গমগমিয়ে বলে, একটু ওমর খৈয়াম হল। তবে মূল পারসি তো জানি না। তাই কান্তিচন্দ্র ঘোষ-এর তর্জমা। বইখানা আমাদের বিয়েতে পেয়েছিলাম। কাঁচরাপাড়ার এক বন্ধু দিয়েছিল।

দাদু এবার কষে এক টিপ নস্যি নেন। তাঁর সামনে লণ্ঠন জ্বলছে। ওধারে পটেশ্বরী দিদি ডাবা পেড়ে পান সাজছে। দাদু বলে ওঠেন, বইখানার একখানা খাসা ভূমিকা লিখেছিলেন প্রমথ চৌধুরী। হুঁ, রবীন্দ্রনাথেরও একটুকরো আশীর্বাদী বরাদ্দ ছিল।

বাবা জড়িয়ে জড়িয়ে হাসে। হাসে আর বলে যায়—

বচন-বাগীশ পণ্ডিতেরা বিজ্ঞভাবে নাড়ুন শির,
স্মরণ রেখো বন্ধু আমার—জীবন কভু নহে স্থির,
এই কথাটাই সত্য ভবে, বাকী যা সব মিথ্যা, ভুল,
সৃজন বোঁটায় আর ফোটে না ঝরলে পরে আয়ুর ফুল।।

দাদু মাথা নেড়ে বাঃ বাঃ করেন। তারপর আর এক দফা নস্যি নিয়ে বলে ওঠেন, কে বলবে হাজার বছর আগেকার কথাবার্তা, ভাবনা-চিন্তা এসব! ইংরেজরা আমাদের যতই নিক, দিয়েছে অনেক। এক ইংরেজ সাহেব খৈয়ামকে খুঁজে বার করলেন। তারপর তাঁকে অনুবাদ করলেন। তা না হলে আমরা বঞ্চিত হতাম।

বারান্দার অন্ধকার আর আলো বরাবর রান্নাঘরে যেতে যেতে আমার মিলা মা নিচু গলায় বলে, বাড়িতে এত মানুষ। পদ্য হচ্ছে, হইহই হচ্ছে। কিন্তু একজন বসে বসে সময়ে অসময়ে মদ খাচ্ছে। ছেলেপুলেরা শিখবে কী!

কথাটা যার দিকে সেই কানুবাবার হাসির শব্দ গর্জে ওঠে আঁধারের রহস্য আর ব্ল্যাক আউট ছিন্ন করে। বাবা বলে, হ্যাঁ, তাই তো, ছেলেবেলা থেকে এত গান-বাজনা শিখলে। কিছু করতে পারলে জীবনে! কোথায় গেল তোমার ইমন, সারং, দরবারি, ভৈরবী?

মা আরও নিচু, খানিক ভিজে-ভিজে গলায় বলে, হ্যাঁ, সবই আছে। যায়নি কিছুই। ইমন, দরবারি নিয়ে থাকলে ওরা মানুষ হত না। বয়ে যেত সব।

দাদু ও ঘর থেকে বলে যান, ঠিক বলেছ মা। যথার্থ কথা বলেছ। তুমি আসলে জগদ্ধাত্রী। আমাদের না ধারণ করলে আমরা যে সকলে একসঙ্গে বয়ে যেতাম। মা হওয়া কী মুখের কথা!

বাইরের ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে আমাদের আমতলার উঠোনে একজোড়া বেড়াল

ছোঁক-ছোঁক করে। অন্ধকারে তাদের চোখ জ্বলে। জ্বলে জোনাকির অগুণতি মিটমিট। বার রাস্তায় একটা সাইকেল উড়ে যায় ক্রিং ক্রিং বাজাতে-বাজাতে। গোয়ালের টিনের চালে ভাম বেড়াল দুম দুম হেঁটে যায়। নারকোল গাছের মাথায় হঠাৎ করে হাওয়ার ধাক্কা হয়। ক্ষিতীশ দাদুদের অট্টালিকা, বাগান সব পেরিয়ে হাওয়াটা সিধে চলে যায় মাদরাল পেরিয়ে নৈহাটি-কাঁঠালপাড়ার দিকে। রেললাইনের টানা তারের পাশ কাটিয়ে বরদা ব্রিজ-এর মাথার ওপর দিয়ে ঘোঁট পাকাতে পাকাতে অবশেষে গাঙ চিলসম এসে নামে প্রকাণ্ড কোঠাবাড়ির মাথায়। একধারে দোতলা বাড়ি। ছোট সরু সিঁড়ি, গোল গোল ঘুলঘুলি, আঁধার আঁধার গা ছমছমে সুড়ঙ্গ পথ যেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই বাঁ হাতে তাঁর শয়নকক্ষ। টেবিলের ওপর সেজ জ্বলছে। পাশে এলিয়ে পড়ে আছে গড়গড়ার নল। দোয়াতদানে ঘন ঘন কলম নামছে উঠছে। লেখা হচ্ছে 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের 'উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ : বিষবৃক্ষ কি?' কলম বলছে, 'যে বিষবৃক্ষের বীজ বপন হইতে ফলোৎপত্তি এবং ফলভোগ পর্যন্ত ব্যাখ্যানে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা সকলেরই গৃহপ্রাঙ্গণে রোপিত আছে। রিপুর প্রাবল্য ইহার বীজ; ঘটনাধীনে তাহা সকল ক্ষেত্রে উপ্ত হইয়া থাকে।'

হাওয়া শুধু ওই অট্টালিকার রন্ধ্রে নেই, আছে এখানেও—আমাদের এই বাড়ির উঠোনে, দুয়োরে, বাগানে। সে শুধু ঘোঁট পাকায় না, আরও কিছু দায় সারে। সেই নিয়ম মোতাবেক সে এবার আমাদের উঠোন কোণে পঞ্চমুখী জবা গাছটির গা বেয়ে উঠতে থাকে। সরসরিয়ে উঠে যায় লাউডগা সাপ হয়ে। ঘর থেকে দাদু একই কথা রিপিট করেন, তুমি না ধারণ করলে আমরা যে সকলে একসঙ্গে বয়ে যেতাম মা। মা হওয়া কি মুখের কথা?

জবা গাছের ঝাঁকড়া শরীর ফুঁড়ে মিঠে-মিঠে হারমোনিয়াম-বেহালার সুর পড়ে। কীরকম দুঃখু-দুঃখু, আনন্দ-আনন্দ। তারপর তার ভেতর থেকে, এই অন্ধকারে, থোকা-থোকা কালসিটে রক্তজবার পাশ থেকে ঘোমটা-পরা কমলা ঝরিয়া টুকি দিয়ে মুখ জাগান। চোখে নিকেলের গোল চশমা। কমলা ঝরিয়া আমার দাদুর শেষ কথাটি টুক করে তুলে নেন। তারপর চারধার থেকে ঘনিয়ে ওঠা মিঠে-মিহি সুরে গলা পেতে দেন।

মা হওয়া কি মুখের কথা।
কেবল প্রসব করলে হয় না মাতা
যদি না বুঝে সন্তানের ব্যথা।।
দশমাস দশদিন, যাতনা পেয়েছেন মাতা।
এখন ক্ষুধার বেলা শুধালে না
এল পুত্র গেল কোথা।।
সন্তানে কুকর্ম করে, বলে সারে পিতা-মাতা।
দেখে কাল প্রচণ্ড করে দণ্ড,
তাতে তোমার হয় না ব্যথা।।
দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে,
এ চরিত্র শিখলে কোথা।
যদি ধর আপন পিতৃধারা,
নাম ধরো না জগন্মাতা।।

তারা দু'টিতে, খুড়ো-ভাইপো—লক্ষ্মীনারায়ণ আর সুখলাল, দুপুরের ভোজন সেরে আর গলা অবদি নূতন গানখানি পান করে এবার চলে যাবে বলে তৈয়ের হয়। দু'জনারই চোখ ছলছল করছে।

লক্ষ্মীনারায়ণ হাত জোড় করে বলে, অনেক দিলে বাবা। বিস্তর দিলে। এই একখানি গানেই আমাদের অন্ন জোগাড় হয়ে যাবে গো। তোমায় কী বলি বলো দিকি?

রামপ্রসাদ হাসেন, কী আবার বলবে। গানখানা বলতে বলতে চলে যাও। তাতেই হবে।

সুখলাল হেঁট হয়ে পা স্পর্শ করে রামপ্রসাদের, আশীর্বাদ করুন, যেন গাইতে পারি।

প্রসাদ হেসে তার মাথা ছোঁন, আবার কী চাই। আমরা একটু গাইতে পারলেই তো বর্তে যাই। তাই নয়।

সুখলাল ধরা গলায় বলে, আপনার গানখানির মতোই—ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার—

তারা দু'টিতে চলে যায় অপরাহ্নের তল দিয়ে, বুনো জাঙালি মোহমায়ার ভিতর দিয়ে শ্লথ পায়ে। পশ্চিম আকাশে আলো এখন টকটকে তাতাল। সূর্য নামতে এখনও খানিক বিলম্ব। রামপ্রসাদ সেই চলে যাওয়া মানুষ দু'টির গলায় সদ্য তুলে নেওয়া গানখানির ললিত রাগিনীর অসময় শুনতে পান, 'ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে, কি শুনি দারুণ কথা দিবসে আঁধার...

চুয়াত্তর

'কি শুনি দারুণ কথা দিবসে আঁধার...'

কন্যাবিদায়ের বেদনা বিবরণ মরকত মণি দিয়ে মোড়া এই বিজয়া সঙ্গীতখানি রচনা হওয়া মাত্র তারা দু'টিতে গলায় ধারণ করে নিয়ে গেল। লক্ষ্মীনারায়ণ-সুখলাল—খুড়ো-ভাইপো, জোড়া ভিখারি। আদপে ওই বৃদ্ধ ছেলেটির জ্যাঠা হলেও, পরিচয়ের সময় কেন যে এক ধাপ নেমে খুল্লতাত হয়ে দাঁড়াল তা নিয়ে রামপ্রসাদের কোনও মাথাব্যথা নেই। বরং শেষমেশ একটি কথা সাব্যস্ত হল, যে কবির কবিতা-গীত নিরন্ন ক্ষুধাতুরের মুখে অন্ন জুগিয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখে তার বুঝি সংসারে আর কোনও জুড়ি রয় না। এর অতীত আর কী বা চাই।

তারা চলে গেল অপরাহ্ন কালে। দিনের মায়া অমনি ফুরল। আস্তে আস্তে পাখির ডাক বদলে গেল। প্রসাদের বাস্তু ঘেরা বিচিত্র বনস্থলে-আসন্ন রাত্রির মহিমা ক্রমে খুঁটিগাড়ির তোড়জোড় আরম্ভ করলে। বনভূমে অজস্র বিচিত্র গাছপালা দিগর যার যার, তার তার গুণধারী গন্ধ বিতরণ শুরু করলে। কেউ মিঠে, কেউ বা কটু কষায়। কেউ আবার গুরুতর মদ্যগন্ধি।

দূরে তুলসীমঞ্চে সর্বাণীর হাতে পিদিম পড়ল। শঙ্খ বাজল পর পর টেনে টেনে তিনবার। আর ঠিক তখনই রামতনু গঙ্গো আর ভজহরি এসে উপনীত হল। রামতনুর গলায় ঝুলন্ত ঢোলবাদ্য। আর ভজহরির হাতে খঞ্জনি। দু'জনার মুখেই মিটিমিটি হাসি। অদূরে বীরাচারী রামকৃষ্ণের এখনও উত্তপ্ত পঞ্চমুণ্ডির আসন। ঝোপঝাড়ময় স্থানটিতে গাছতলে একটি মেটে পিদিম দিয়েছে সর্বাণী। এই প্রথম সূত্রপাত—দখলিস্বত্বের প্রতীক আলো। তার মনে কী আছে কে জানে। সে কী চায় তার স্বামীধনটি এ সমাজে তন্ত্রাচারী

সাধক হিসেবে চিরকাল প্রতিষ্ঠিত থাকুক। তা যদি হত তবে সেদিন রাত জেগে ঠায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষুক জোড়াকে গান দেওয়া দেখত না। সব মিলিয়ে এ এক রহস্যঘোর। কিংবা রহস্যেরও অতীত আর কোনও দুস্তর ব্যবধান। এ বিষয়টি বুঝি বাক্যে প্রকাশ হয় না। সংসারের নাছদুয়ার দিয়ে সে পলাতক হয়। সংসারে হয়তো এটুকু রহস্য থাকা ভালো। তা না হলে সেখানে টান-ভালোবাসা বলে কোনও বস্তু থাকে না। সংসার আর জাঙালে কোনও তফাত রয় না। কবিতার দুরন্ত সংসারে রহস্য পাথার সাগরকেও লজ্জিত করে। মহাশূন্যাকাশকে বলে—তফাত যাও।

রামতনু প্রথমে গলা খাঁকারি দেয়। তারপরে বলে ওঠে, হুঁ, অনেকদিন পরে এলুম।

ভজহরি কথার দোহার রাখে, বেশ সেজেগুজেই এলাম আমরা।

রামপ্রসাদ দু'জনার মুখে চোখ রাখেন। তারপর বলেন, তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু ভজা, আমার দ্রব্য আনিসনি যে বড়। আমায় কি তোরা নিরিমিষ্যি করে দিলি!

ভজহরি মিচকে মিচকে হেসে হাতে ধরা একটি বৃহৎ ঝোলা তুলে দেখায়। তারপর মাথা দোলাতে দোলাতে কয়, আছে আছে। সব ব্যবস্থা আছে। তোমার তরল আর আমার শুকনো। কোনও ত্রুটি রাখিনি দাদা।

রামতনু বলেন, ভেবেছিলাম এ সব মোদো মাতালদের সঙ্গ ত্যাগ করব। তারপর দেখলাম বাজনা না বাজিয়ে বাজিয়ে হাত আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাই চলে এলুম আর কী।

রামপ্রসাদ গলা চড়িয়ে হুঙ্কারবৎ বলে ওঠেন, তা হলে বার কর ভজহরি। খামোখা সময় বইয়ে দিয়ে কি লাভ?

ভজহরি-রামতনু দু'জনাতেই বসে পড়ে মাটিতে। পিদিমের বাঁকা আলোয় তাদের চোখ ঝকঝক করে। অদূরে, পাঁচমুণ্ডি আসনতলে প্রদীপের শিখা লকলক করে। তাকে ঘিরে বুনো পোকার ঝাঁক ওড়ে। দুলন্ত ঝুরি সকল সাঁঝ বাতাসে দুল দুল করে। গঙ্গার দিক হতে উড়ে আসা থেকে থেকে হাওয়ার দমকে পঞ্চবটির গম্ভীর আনন্দ হিল্লোল ঝুরিদের শরীর বরাবর দোল খায়। রামপ্রসাদ ভাবেন শবসাধন সম্পন্ন হয়েছে। এখন বুঝি ওই পাঁচমাথা তাঁকে ডাক পাঠাচ্ছে। ডাক দিয়ে বলছে, এখানে তুমি অধিষ্ঠিত হও। এই তোমার উপযুক্ত স্থান। কিন্তু বুকের ভিতরকার অথৈ কবিতাতরঙ্গ স্রোত বলে যায়, 'শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা।'

আসলে এই কবিতাময়ী রমণী মূর্তি তো অবয়বহীন নিরাকারা। তাকে চোখে দেখা যায় না। অনুভবে তার ধ্বনি বাজে। সে ধ্বনির বিমূর্ত রূপ অন্তর অম্বরে উদিত কালো মেঘের মতো। তার বুকে থেকে থেকে তড়িদাঘাত ঘটে চলেছে মাভৈঃ শব্দে। এ তড়িচ্ছটা অভিরাম— 'নৃত্যতি মানস শিখী কৌতুকে বিহরে।' এই নিরাকারা কবিতার সাধন রপটানি চলেছে রামপ্রসাদের জীবন জুড়ে। বুঝি বা জন্ম জন্মান্তরের সাধ এই বিড়ম্বিত জীবন। যদিও জন্ম ও জন্ম অন্তর সম্বন্ধে মনে মনে খটকা যথেষ্ট। তথাপি, কত্তক কথার কথা এই শব্দবন্ধ, যার আদিমতম সত্য অনুধ্যান হল, 'হৃদিপদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে।'

ভজহরি ঝোলা থেকে দ্রব্য বার করে। একখানি খর কালো মেটে হাঁড়া—যার নাম মধুভাণ্ড। সেখানা আলগোছে ভুঁয়ে নামিয়ে রাখে সে। আর রাখে ঘরে যেয়ে বৌঠানের কাছ থেকে মেগে আনা পিতলের গেলাস। এতকাল তো মেটে পাত্রেই কারণপান ঘটে এসেছে। আজ বুঝি একটুখানি নতুন ব্যবস্থা।

প্রসাদ কুতূহলি বলেন, বলি হ্যাঁরে ভজা, হঠাৎ পেতলের পাত্তর কেন! কী ব্যাপার বল দিকিনি?

ভজহরি হেসে কয়, নবাব-রাজারা শুনিছি সোনার পাত্তরে খায়। তা তাদের চেয়ে তুমিই কম কীসে।

রামতনু ফুট দেয়, তা ছাড়া দেশে এখন যুদ্ধ নেই। প্রজারা মহা শান্তিতে আছে সব। আর তা বাদে, তুমি রাজাগজা না হলেও একজন কবিরাজ তো বট। আজ না হয় ভিখিরিপনা নাই বা করলে।

রামপ্রসাদ হেসে কন, তা হলে আমার বিদ্যাসুন্দর থেকেই একটু বলি। তোমবা হোঁ এসা জান, যে কহোঁ সো কহা মান, তোম সকোগে তাও হামারে সাথ--

কমলা ঝরিয়া জবা গাছের ফুল-পাতার ফাঁক দিয়ে মুখ বার করে যে গানখানা গাইছেন তার সুর তো সেই রামপ্রসাদী। কিন্তু গানের কথাবার্তাগুলো ভারি খটমট। তা হলেও কিছু কিছু বোঝা যায়—যতই আড়ে আড়ে বলা হোক না কেন।

এখানে আবার আমায় নিয়ে একটা ব্যাপার আছে। বাপ কা বেটা বলে যে একটা কথা আছে, সেটা আমার দিকে মাঝে মাঝে তাগ করলেও আমি জানি, আমি বাপ-মা কারও বেটা নই। তা হলে আমি কার বেটা! দাদুর কথায়, ভগা জানে।

সেই দাদুরই আবার সেই একই কথা একটু ঘুরপথে। ভেবেছিলাম লেখক হব। মডার্ন রিভিউ ইত্যাদি পত্রিকায় কিছু লেখালেখিও করেছি একসময়। মানে সেই তরুণ বয়েসে, স্কুলে মাস্টারি করতে করতে। একবার ভাবলাম গায়ক হব। তা সিধে চলে গেলাম বহরমপুরে। সেখানে গিয়ে জ্ঞান গোঁসাইয়ের কাকা রাধিকা গোঁসাইয়ের কাছে আশ্রয় নিলাম। টানা দেড় বছর ধরে একটি মাত্র রাগই দিলেন—ভৈরবী। ভারী চমৎকার বন্দিশ। আব উন চিত্ না ধরো।

এই বলে দাদু তাঁর রোগা ঢ্যাঙা কাঠামোয় খড়-বিচুলির গায়ে কিছুটা মাটি দেওয়ার চেষ্টা করেন। বাঁ কানে হাত রেখে উবু হয়ে বসেছেন। পুরু চশমার ওধারে বড় বড় চক্ষু মুদেছেন। তারপর ডান হাত সামনে মেলে দিয়ে তান ধরেছেন শ্লেষ্মা কাতর অথচ দিব্যি গম্ভীর গলা ছেড়ে, আ আ আ...আব উন চিত্ না ধরো'

এই রাতের বেলায়, দেশে যুদ্ধকালীন ব্ল্যাক আউটের মাঝখানে কবেকার একজন রাধিকা গোঁসাই কোন দূর বহরমপুরে তাঁর ভাইপো জ্ঞেনুকে, মানে তারপব ডাকসাইটে হওয়া জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদকে, গান শেখাচ্ছেন ভারি যত্ন করে। আর কী আশ্চর্য, রাধিকা গোঁসাই, পট আঁকিয়ে যামিনী রায়, আমার পিতামহ সব প্রায় একরকম দেখতে! একই ছাঁচে ঢালা মনুষ্যমূর্তি। রোগা ঢ্যাঙা লিকলিকে চাবুক। রাঢ় দেশের ছিরি ছাঁদ।

কিন্তু এই থম ধরা রাতের বেলায় সকাল বেলাকার ভৈরবী। বাঃ, তাও তো কেমন মানিয়ে যাচ্ছে! একটুও বেখাপ্পা মনে হচ্ছে না। আবার আদরের ভাইপো জ্ঞেনু, কাকা রাধিকা গোঁসাইকে দু-বেলা ভাত রেঁধে দিচ্ছেন কত যত্ন করে। রাতের বেলায় পা টিপে দিচ্ছেন। বড় গোঁসাই সেবা নিতে নিতেও ঘোরগ্রস্তের মতো বলে যাচ্ছেন, পর্দাটা যত্ন করে লাগা বাপ। ভৈরবী অতি তোয়াজি রাগ। তাকে খাতির যত্ন করতে হয়।

পিতামহ বলছেন, অবশেষে কিছুই হল না। না হল পড়াশুনো, না গান চর্চা।

কানু বাবা বিজড়িত গেয়ে চলেছে, জীবন আমার বিফলে গেল, কোনও কাজেই লাগল না হে—যদি গোকুলচন্দ্র ব্রজে না এল—

দাদু কান খাড়া শুনতে শুনতে বলেন, অতুলপ্রসাদ। বড় বিরহী আর দুঃখীর জীবন। স্ত্রী'র সঙ্গে আজীবন বনল না।

বাবা ঠকাস করে গ্লাস খালি করে। তারপর সেই একইরকম জড়ানো আর খানিক নুয়ে পড়া গলায় বলে, আমারও কী মিল অতুলপ্রসাদের সঙ্গে। নিজের স্ত্রীর সঙ্গে আজীবন বিবাদ। হুঁ, জীবন আমার বিফলে গেল...

কিন্তু কমলা ঝরিয়া গাইছেন, দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে, এ চরিত্র শিখলে কোথা, যদি ধর আপন পিতৃধারা, নাম ধরো না জগন্মাতা, মা হওয়া কি মুখের কথা...

তা হলেও, আমি বাপ-মা কারও বেটা না হলেও, রামপ্রসাদ কোথায় একটি বিবাদ বাঁধিয়ে রেখেছেন। এই কথাটা ধরতে আমার কোনও অসুবিধে হয় না। আমি অতএব, আমার দু'চোখের বালাই অঙ্ক-জ্যামিতির উপপাদ্য না সম্পাদ্যর মতো নিজের মতো নিজেই হব। তাই দাদুর একটু আগেকার কথাটা টেনে নিয়ে বলি, তা হলে আমি লেখক হব। আমার তারাশঙ্কর দাদুর মতো।

দাদু হেসে ওঠেন, ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তোমার সঙ্গে চিঠি চালাচালি হয়। টেলিফোনে বাতচিত হয়। বাঃ। কিন্তু ভাই, কেউ তো কারুর মতো হয় না। তোমায় তোমার মতো হতে হবে।

—আমার মতোই তো হব। তবে কেমন করে হব?

খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা, পাতা কেটে আঁচড়ানো চুল আর গলাবন্ধ জম্পেশ সোয়েটার পরা Earnest Miller Hemingway জবা গাছি কমলা ঝরিয়ার রামপ্রসাদী পাশ থেকে চোখ কুঁচকে মিটিমিটি হাসেন। আমি মনে মনে বলি, 'What is the best early training for a writer?'

অমনি উত্তর হয়, 'An unhappy childhood!'

আমি তো অবাক। হেমিংওয়ে কি অন্তর্যামী! বাবা-মা'র বিসম্বাদ নিয়ে আমার মনে কখনও কখনও চাপা মনখারাপি মেঘলার কথা তিনি টের পেয়ে বসে আছেন!

'Do you think I will be a writer?'

'How the hell should I know? May be you have no talent. May be you can't feel for other people. You've got some good stories if you can write them.'

'How can I tell?'

'Write. If you work at it five years and you find you're no good you can just as well shoot yourself then as now.'

'I couldn't shoot myself.'

'Come around then and I'll shoot you.'

কমলা ঝরিয়া মিহি আর চড়া গলায় বলে ওঠেন, সন্তানে কুকর্ম করে, ব'লে সারে পিতা-মাতা, দেখে কাল প্রচণ্ড করে দণ্ড, তাতে তোমার হয় না ব্যথা...

বুনো ঝোপ যেমন গন্ধ ছিটোচ্ছে তেমনই হরির লুঠ পড়ছে জোনাকির। ভজহরি কলকে বার করে দিব্য কয়েক সুখটান দিয়ে খঞ্জনি ধরেছে। তনু ঢুলকি ধরেছে ঢোল।

অদূরে পঞ্চবটির বীরাসনে পিদিম জ্বলছে মৃদু। রামপ্রসাদ মধুভাণ্ড হতে উপর্যুপরি পান করে চলেছেন পিতলের গেলাসে। পান এবং গান একই লপ্তে চলেছে। আজ প্রসাদ কন্যাবিদায়ের গান তুলে রেখে ধরেছেন একখানি আগমনী। এ কথা তো সত্য যে কন্যাবিদায় হয় সংসারের নিয়মে। আবার বৎসরান্তে সে বাপ-মা'র কাছে চলে আসে দেখাশোনা করতে। আবার যায়। আবার আসে। এই তো চক্রবৎ বিধান।

আজ শুভনিশি পোহাইল তোমার
এই যে নন্দিনী আইল,
বরণ করিয়া আন ঘরে।
মুখশশী দেখ আসি, দূরে যাবে দুঃখরাশি,
ও চাঁদমুখের হাসি, সুধারাশি ক্ষরে।।...

গীতখানি বাঁধা হল রাগিনী মালশ্রীতে। নিশি পোহানোর বয়ান। কিন্তু সুরের গাঁথনি নিশীথিনির ঠাটে। রামপ্রসাদের কন্যার বিবাহ লগ্ন তো রাতে। তাই বুঝি অজানিতে এমন একখানি সুর বয়ে এল গঙ্গার স্রোতমুখে। অভিরাম বাতাসে। দেশে আর যুদ্ধ-বিগ্রহ নেই এমন নিঃশঙ্ক মহাশ্মশানী মণ্ডলে।

এমন গানের সময়পটে অদূরের ভিটের দিক হতে রাতের রাঁধন-বাড়নের মৃদু মৃদু রোল ভেসে আসছে। শোনা যাচ্ছে, ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার ভ্রমর গুঞ্জন। পরমেশ্বরীর আসন্ন বিবাহ নিয়ে তার পাড়াঘরের সখীদের সঙ্গে আনন্দ মস্করা। আর তারই পাশাপাশি কচি কন্যে জগদীশ্বরীর থাকে থাকে উলসে ওঠা কাঁদন। শিশুছানা তো সদাই মাকে খোঁজে। মায়ের স্তনে মুখ রাখলেই সে ঠান্ডা। কিন্তু সর্বাণী যে রাঁধনে ব্যস্ত। তারই ফাঁকে বুঝি সে ভাল বুঝে উঠে চলে যাচ্ছে জগদীশ্বরীর ঠাঁয়ে, দাওয়ার বাঁশের আড়ায় খাটানো বেতের ধামা দিয়ে তৈরি দোলনার পাশটিতে। জননী বুঝি এখনকার এই গানখানির মতো হেঁট হয়ে কন্যের মুখশশী বিহ্বল হয়ে দেখছে। ভাবছে ওই চন্দ্রমুখের হাসি কী অফুরান সুধারাশি বর্ষণ করে চলেছে। প্রসাদ এই আবহের ঘেরে গান গাইতে গাইতে ভাবছেন, সর্বাণী এখন কন্যেকে মা মা বলে ডাকছে। ডাকছে, মা, মাগো, মাগো। এই মেয়েই আবার সময় কালে তাকে ডেকে ডেকে সাড়া নেবে, মা, মা, মা—

শুনিয়া এ শুভ বাণী, এলোচুলে ধায় রাণী,
বসন না সংবরে।
গদ গদ ভাব ভরে ঝর ঝর আঁখি ঝরে,
পাছে করি গিরিবরে, অমনি কাঁদে গলা ধোরে,
পুন কোলে বসাইয়া, চারু মুখ নিরখিয়া
চুম্বে অরুণ অধরে।
বলে জনক তোমার গিরি, পতি জনম ভিখারি,
তোমা হেন সুকুমারী, দিলাম দিগম্বরে।।...

ঢোলুনচি রামতনু তাল রাখতে রাখতে থাকে থাকে আহা আহা করে। গাঁজাড়ু ভজহরি পরমানন্দে খঞ্জনির ঠেকা রাখে। তার বিভোর এধার ওধার দোল খাওয়ার ফাঁকেফোকরে টুকটাক জোনাই ওড়ে। আর কোথা থেকে একটি বহু রঙা প্রজাপতি এসে এই তিনজনার মাথার ওপর দিয়ে পিড়িক পিড়িক খেলে বেড়ায়।

প্রজাপতি বলে, আমার আলো নেই তো কী হবে। ডানায় কত রংদার নকশা আছে।

জোনাকির দলের মাথা এক রানি জোনাই মুখ মটকে হাসে, নকশা তো শুধু নকশাই। আলো কই। আলো না হলে তোর নকশার রং দেখবে কেটা শুনি!

প্রজাপতি শূন্যে লাট দেয়, আমার ভারি বয়ে গেল—কে দেখল, কে দেখল না।

রানি মিটিমিট হাসে, তোর বড় রঙের গুমোর।

প্রজাপতি, আগে দর্শনধারী, পরে গুণ বিচারি।

বানি, তবে বলি শোন, আমার গুণে রাতকানার চোখে নজর হয়। সে তোর ডানার রং দেখতে পায়।

প্রজাপতি চমকে বলে, সে আবার কী কথা!

জোনাকি খানিক বিষণ্ণ হাসতে চায়, হুঁ, সেজন্যে অবিশ্যি আমার ক্ষুদ্র প্রাণটুকু মানুষের উদরে যায়।

প্রজাপতি, সে কীরকম শুনি!

জোনাকি, একটি কাঁঠালি কলা নিয়ে, তার মধ্যে একটি গোটা জোনাকিকে ভরে দিয়ে রাতকানাকে কোঁৎ করে গিলিয়ে দাও। বাস, অমনি সে রাতের বেলা দিব্যি ফটফটে দেখতে পাবে।

প্রজাপতি, আহা রে, প্রাণ দিয়ে চোখ পাওয়া।

ওধারে মহাধর্মী, যড়যন্ত্রী আর সিরাজ নিপাতনে এই সেদিন ইন্ধনদাতা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র নদীয়ার সুখসাগরে এক কালিকা মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেই দেবীর নাম সিদ্ধেশ্বরী। এই মাতৃকা মূর্তির চোখের পানে চাইলে প্রথমটায় বুক ধড়াসে। মহারাজা এখন পরমানন্দে নিজ রচিত একখানি গান ধরেছেন।

অতি দুরারাধ্যা তারা ত্রিগুণা রজজুরূপিনী।
না সরে নিঃশ্বাস পাশ, বন্ধনে রয়েছে প্রাণী।।
চমকিত কি কুহক, অজিত এ তিন লোক।
অহংবাদী জ্ঞানী দেখে তমোর জোতে ব্যাপিনী।।
বৈষ্ণব মায়াতে মোহ, সচৈতন্য নহে কেহ,
শঙ্কর প্রভৃতি পদ্মযোনি।।
দিয়া সত্য জ্ঞানানুবোধ, কর দুর্গে দুর্গতিরোধ
এবার জনমের শোধ মা কালী বলে ডাকি জননী।।

জোনাই রানি মিট মিট হাসে, বাপ রে, গানের কী শব্দ। যেন কড় কড়াত্ বাজ পড়ছে।

প্রজাপতি কয়, তমোর জোতে ব্যাপিনী। কথাটি এই এখনটির, মানে এই রাত্তিরটির সঙ্গে, খাসা মানিয়ে গেল।

আমি যে কী গোলমেলে অবস্থার মধ্যে পড়েছি তা আমিও জানি না। এই কথাটা এমন ভাবে বললে লোকে ছিটিয়াল বলতে পারে। তাই কাউকে বলতে পারি না। মনে মনে একলা একলা ঘণ্ট পাকিয়ে চলি।

দাদুকে আমার মিষ্টির দোকান দেওয়া থেকে ধরে হঠাৎ করে তারাশঙ্করের আন্দাজে লেখক হওয়ার কথা, সঙ্গে সঙ্গে দাদুর মোক্ষম জবাব, এক সাহেব লেখক হেমিংওয়ের প্রসঙ্গ তুলে, সবই কীরকম জট পাকিয়ে দেয় মনের মধ্যে। তার সঙ্গে আছে দুখি

ছেলেবেলার কথা। আমার বাবা মা'র মধ্যে প্রায় সদাই গণ্ডগোল-এর সূত্রে আমার মনখারাপ হলেও সে তো সবসময়ের জন্যে নয়। এমনিতে তো আমি খাসা আছি। খাইদাই, বনেবাদাড়ে, শ্মশানে, গঙ্গার ধারে একা একা ঘুরে বেড়াই। সে নিয়ে বাবার কাছে প্রায়ই আড়ংধোলাই হয়। কিন্তু তাতে করে হেমিংওয়ে সাহেবের কথা মতো unhappy childhood আমার নেই। লেখক হতে গেলে ওটা নাকি জরুরি! কিন্তু কী করব, যা আমার নেই তাই নিয়ে মনে মনে বুজগুড়ি কাটার দরকার কী!

তার চেয়ে আমার নতুন দাদু তারাশঙ্করই ভালো। কী সুন্দর করে আমায় বিজয়ার চিঠি দেন। 'আমাদের দেশের সাধুরা বলেন—আনন্দ রহো। আশীর্বাদ করি সেই গ্লানিহীন আনন্দে রহো।'

এখন ক্ষিতীশ দাদুদের মস্ত বাগানে এই ভরদুপুরে একলা একলা ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ করে চালতা গাছের নীচে বেশ বড়সড় একটা পাকা চালতা পেয়ে গেলাম। আমার গিরিনন্দিনী বড়মা চালতাকে বলতা চালদা। মাঝখানে একটা থ-এর তফাত।

ক্ষিতীশ দাদুদের বাড়ির সবাই এখন দুপুরের খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুমোচ্ছে। কেবল ও বাড়ির থুরথুরে ঝুরঝুরে বুড়ি নিবাসী পোড়ো পাঁচিলের গা থেকে শুকনো ঘুঁটে খুলছে। পাকা সোনা গায়ের রং, দড়ি পাকানো চেহারা, মাথায় এক বস্তা তুলো তুলো কোঁকড়ানো ধবধবে চুল, আর চোখ দু'খানি ইদিক-উদিক। বুড়ির মুখে সবসময় হাসি। সবাই বলে নিবাসীর স্বভাব নাকি ভালো ছিল না অল্প বয়েসে। আমি এর মানে বুঝি না। যে মানুষ এমন করে ছ'মাসের শিশুর মতো সবসময় হাসতে পারে তার চেয়ে ভালো স্বভাব আর কি হতে পারে?

আমায় দেখে নিবাসী মুখ ভাসিয়ে বলে ওঠে, কী ধন, এই ভর দুকুরে একা একা ঘুরতিছ যে।

আমি হাতের চালতাখানা তুলে দেখাই, এই দেখো।

—ও মা, কী খাসা চালদা। কমনে পেলে ভাই?

আমি আঙুল তুলে দূরের চালতা গাছটা দেখাই। বুড়ি বলে, একটুক তেল, নুন আর কাঁচা নংকা চটকে মাখলি ভারি খাসা নাগে।

আমি চালতাটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলি, মেখে আনো না। তোমাকেও দেবো।

নিবাসী এক মুখ হাসি আর চালতা নিয়ে ঘুমন্ত বাড়ির দিকে চলে যায়। ও বাড়ির জামাই, আমার রাজলক্ষ্মী দিদির গুরুগম্ভীর বর সবে গতকাল এখানে এসেছেন। মস্ত হাকিম। মস্ত লেখক। কিন্তু তাঁর মনে এখন ভারি আনন্দ আর রাগ দু'টিই। আনন্দের কারণ মেয়ে শরৎকুমারীর সদ্য একটি ছেলে হয়েছে। আর রাগের বিষয় দাদা সঞ্জীবচন্দ্রের ছেলে যতীশচন্দ্র—যে কি না পুলিশের সাব ইন্সপেক্টরের চাকবি করা সত্ত্বেও কাকা বঙ্কিমের কাছ থেকে মাসোহারা ত্রিশ টাকা নেয় আর নবাবি করে।

বঙ্কিম পরপর একজোড়া চিঠি লিখছেন। প্রথমটি দাদাকে।

'শ্রীচরণেষু, শরতের গতকল্য একটি পুত্র হইয়াছে। প্রসবকালে...প্রাণবিয়োগ...রক্ষা পাইয়াছে।...'

এবার রাগের চিঠি লেখা হচ্ছে ভাইপো যতীশকে।

'কল্যাণবরেষু, তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি একশত টাকা বেতনের চাকরি করিতেছ। এক্ষণে আমার নিকট কোনও সাহায্য প্রত্যাশা করা অন্যায়। যাহারা ঐ বেতনের চাকরি

করে তাহারা সকলেই আপন আপন পরিবার বিনা কষ্টে প্রতিপালন করিয়া থাকে। আমি এ মাসে কোনও খরচ পাঠাই নাই ও পাঠাইব না। তোমার পিতার জন্য কোনও চিন্তা নাই। তিনি মনে করিলেই আমার নিকট থাকিতে পারেন। ইতি তাং ৬ অক্টোবর। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।'

এই না লিখে বঙ্কিম জেব থেকে ৩০ টাকা বার করে আলাদা করে সরিয়ে রাখলেন ভাইপোকে ডাকে পাঠাবেন বলে। এটা প্রতি মাসেই বরাদ্দ। এবার বঙ্কিম পাঁজি বার করলেন। এখান থেকেই সিধে কর্মস্থলে যেতে হবে। 'পাঁজি দেখিয়া বারবেলা বাদ দিয়া' যাত্রা করতে হবে।

দাদু গম্ভীর মুখে বললেন, তা হলে বঙ্কিমের মতো যুক্তিবাদী লোকও বারবেলা মানতেন!

শ্রীদেবদাদু পাকা দাড়ি নেড়ে শুধু বলেন, তাই তো।

দাদু চিন্তিত মুখে বলেন, হুঁ, এত বড় একজন অথরের এমন সংস্কার।

ভরদুপুরের এই গাছগাছাল মোড়া বাগানের পশ্চিম কোণ থেকে ছোট্ট এক ফালি মেঘ হয় আকাশ কোণে। স্কুলের সংস্কৃত স্যার হর পণ্ডিতমশাই পাকা দাড়ি দুলিয়ে বলে ওঠেন, অমোঘা পশ্চিমা মেঘা। মানে—পশ্চিমে মেঘ হলে বৃষ্টি অনিবার্য।

আকাশ গুড় গুড় করে। পাঁচিলের ওপার গলে নিবাসী বুড়ি হাতে চালতা মাখা বাটি নিয়ে বাগান টপকায়।

ঘরের কোণে রাখা হারমোনিয়াম পেড়ে বঙ্কিম তাঁর দলনী বেগমের ন্যায় গুন গুন স্বরে রামপ্রসাদী ধরেন।

মন তুমি দেখ রে ভেবে।
ওরে আজি অব্দ শতান্তে বা
অবশ্য মরিতে হবে।
ভবঘোরে রয়ে রে মন ভাবলিনে ভবানীভবে।
সদা ভাব সেই ভবানী-পদ
যদি ভবপারে যাবে।।

বঙ্কিম পত্নী রাজলক্ষ্মী সবে বাপের বাড়ি ভাত খাওয়া সেরে দোতলায় উঠে দেখেন তাঁর ডাকাবুকো স্বামীধনটি অসময়ে হারমোনিয়াম পেড়ে রামপেসাদি ধরেছে। দুপুরের কাক ডাকছে ছাদের লাগোয়া প্রকাণ্ড বাগানে। পুরনো আমগাছে, চালতে গাছের পাতায়, পুকুরধারে দণ্ডায়মান টকটকে লাল পালদে মাদারের রক্ত এসে ছুঁয়ে দিয়েছে। সবুজ পাতায় লালের হস্তক্ষেপ। সেই হাত তাড়না বলছে, বঙ্কিম এখনই কেন এই মরে যাওয়া গীত গাইছেন। এখনও কত লিখতে হবে। কত ব্যথা-বেদনা পেতে হবে। আনন্দ উশুল করতে হবে।

বরের গুনগুন গীত শুনে রাজলক্ষ্মী ভাবছে, ভবঘোরের কথা তো বেশ কথা। এই ঘোরে আছেন বলেই মানুষটি লিখতে পারছেন। রামপ্রসাদ সেনও তার বাইরে নন। তাই তো এমন সব গীত রচতে পারেন।

বঙ্কিম গাইতে গাইতে টের পান তাঁর পরিবারের শরীরের সুগন্ধ। বড় এলাইচ দেওয়া পানের সুবাস। তিনি গীতের আড়ে আড়ে মনে মনে বলে যান, '...এক জনের প্রভাব আমার জীবনে বড় বেশি রকমের---আমার পরিবারের। আমার জীবনী লিখিতে হইলে তাঁহারও লিখিতে হয়। তিনি না থাকিলে আমি কি হইতাম, বলিতে পারি না।'

আগমনী গীত হচ্ছে রামপ্রসাদের উন্মত্ত অধীর কণ্ঠে। সে স্বর কিঞ্চিৎ উচ্চগ্রামী আর সামান্য ভাঙা ভাঙা। এখন আবার এলানো এলানোও বা। কেননা ইতিমধ্যে যথেষ্ট কারণপান ঘটে গেছে। ঘটে চলেছেও।

সর্বাণী এসে দাঁড়ায় বুনো জাঙালি স্থলে—আমলকি গাছটির তলে। তার আঁচলে ও গালে সদ্য বাটা হলুদ লেগে। সামান্য দীপালোকে সেই হলুদ রং খানিক রক্তমাখা মাংস খণ্ড।

সর্বাণী দেখছে তার স্বামীধনটি গীতখানি গাইতে গাইতে আর মুহুর্মুহু পান করতে করতে উঠে দাঁড়িয়েছে। কিঞ্চিৎ টাল অটাল পায়ে এগিয়ে চলেছে অদূরে পিদিম রাখা পঞ্চমুণ্ডি বীরাসনের দিকে। সর্বাণী চমকে মুখে কাপড় চেপে ধরে। তা হলে কি অনর্গল অবিরল কবিতার সংসার হতে এবার বিদায়সম্পাত? এখন কী তবে পাঁচ মাথার সিদ্ধাসনে বহে অহর্নিশি জপতপ আর মুণ্ডমাল সাধন! এতদিনের চেনা মানুষটি হঠাৎ করে বদলে যাবে তা হলে! কেন যে মরতে সাবর্ণ জমিদারদের থেকে একরকম মেগেই দান চেয়ে নেওয়া হল! হায় হায়, এ কী হল! কী হয়ে গেল হায়! মানুষটির স্বভাব বদলে গেলে সংসারের কী হাল হবে এখন! এমন দামাল মানুষ জুড়িয়ে জল হয়ে গেলে পর এই সংসারটির নাম কী আর সংসার রইবে! সংসারের বিপরীত নাম কী মহাশ্মশান!

পাশ থেকে ভজহরি পিতলের পাত্রে পানীয় জুগিয়ে চলে। ভজহরিও এমন উন্মাদনা আর কখনও দেখেছে কী! এ কি পানের গুণ না গানের? আহা, তার এই দাদাটির দিকে ইতিমধ্যেই তো সারা হয়ে বসে আছে শবসাধন, চিতাসাধন, শক্তিসাধন, মহাশঙ্খের মালা, বিল্বমূল। এখন শুধু বাকি পঞ্চমুণ্ড। তা হলে কী হবে! কি হবে পরিণাম?

পাঁচমাথা গাছে পাঁচের অগ্রণ্য ঝুরিগুলি দুল দুল, টলমল দোল খায় অন্ধকারের হাঁ গাল বরাবর, ক্ষীণ দীপের কাঁপা কাঁপা আলোয়, ঝিমি ঝিমি বাতাসে। বন ঝোপের অন্তরাল হতে শিবাদল হুয়া হুয়া হাঁকার ছাড়ে। রাত্রির ঘনঘটায় সে হুঙ্কার ক্ষুধার আবহ রচনা করে দেয়। এনে দেয় আঁধারের বুকে শব্দের জড়িবুটি আঁকা রহস্য।

রামতনু ঢোলকে সম রাখার ফাঁকে ভাবছে, মেয়ে বিদায়ের আগে কেমনতর বেখাপ্পা এই আগমনী গীত! গান খাসার অধিক হলেও এটি কি একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?

সেনজ রামপ্রসাদ পায়ে পায়ে উপনীত হন পাঁচমাথা বীরাসনের সুমুখে। তারপর বিনি মুখবন্ধে সটান চড়ে বসেন তার ওপরে। এতকাল ধরে ঝোপ জাঙালে হেলায় পড়ে থাকা অথচ এখনও উত্তপ্ত আসনটি অতর্কিতে নব জন্ম দেখে। তার অন্দরে প্রোথিত মনুষ্যাদি পাঁচ প্রাণীর পাঁচ-পাঁচটি মুণ্ড নড়েচড়ে বসে। তারা একে অপরের ধড়হীনতা দেখে আর খিলিখিলি, খলখল হাস্য বিনিময় করে। নেপথ্য হতে কবিতা রূপিনী দেবী কালিকার আচরণ বর্ণন করে এই আপাতসুপ্ত গভীরা রজনীর কৌশিকী চন্দ্রবদনী নিরাকারা মূর্তি।

বন্ধুককাঞ্চননিভং রুচিরাক্ষমালাং
পাশাঙ্কুশৌ চ বরদাং নিজবাহুদণ্ডৈঃ।
বিভ্রাণমিন্দু-শকলাভরণং ত্রিনেত্রম্
অর্ধাম্বিকেশমনিশং বপুরাশ্রয়ামি।।

যাঁহার বর্ণ বন্ধুকপুষ্প ও তপ্তস্বর্ণতুল্য, যিনি শশীধরা, ত্রিলোচনা এবং স্বীয় চারিহস্তে সুচারু রুদ্রাক্ষমালা, বরমুদ্রা, পাশ ও অঙ্কুশ ধারণ করেন, সেই দেবীকে আমি সদা আশ্রয় করি।

পদতলে বীরাসন। তার ওপর দাঁড়িয়ে রামপ্রসাদ সুমুখের অন্ধকারে দু'হাত মেলে দেন। দু'হাত বরাবর অন্ধকারকে গ্রহণ কিংবা আকর্ষণ করেন। তারপর সদ্য গড়ে ওঠা আগমনী গীতখানির বাকিটুকু গেয়ে ওঠেন।

যত সহচরীগণ, হয়ে আনন্দিত মন,
হেসে হেসে এসে ধরে করে।
কহে বৎসরেক ছিলে ভুলে,
এত প্রেম কোথা থুলে,
কথা কহ মুখ তুলে, প্রাণ মরে মরে।।
কবি রামপ্রসাদ দাসে, মনে মনে কত হাসে,
ভাসে মহা আনন্দসাগরে।
জননীর আগমনে, উল্লাসিত জগজ্জনে,
দিবানিশি নাহি জানে,
আনন্দে পাসরে।।

অদূর হতে সর্বাণী স্বস্তির শ্বাস ফেলে বলে, ডাকাত ডাকাত। আহা, ডাকাতির সঙ্গে কবিতার বেমিল রইলেও ঘুরপথে কী মিলমিলন্তি খেলা!

আমি ভারি আনন্দেই আছি। আমি কানু বাবা মিলা মা'র এত সব বিসম্বাদ এড়িয়ে খাসা আছি। আমাদের এই তিনতলা—সাবেক সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের মস্ত অট্টালিকার দেয়ালে দেয়ালে যাদের ছবি লটকানো তারা এখন কেউ এখানে নেই। দেয়ালে চল্লিশ ইঞ্চি। বেশিরভাগ ছবিই আঠারো বাই বারো।

এই আমাদের ভদ্রাসন। ওধারে একটি বাড়ি পরেই গোলাপি রঙা বঙ্কিমচন্দ্রের শ্বশুরবাড়ি। এ পাড়ার নাম চৌধুরীপাড়া হলেও জনান্তিকে পাগল পাড়া। প্রায় প্রতি ঘরে একজন করে পাগল মজুদ।

এখন এই রাতনিঝুমে, চারধারে কেউ কোথাও নেই অবস্থায়, এই আস্ত মস্ত এবং স্বয়ং বাড়িটা চতুর্ধারের দীঘল গাছ, আগান-বাগান, পুষ্করণ্যাদি সর্বাঙ্গ দিয়ে ঠেলে সরিয়ে উচ্চগ্রামী আর কিঞ্চিৎ ভাঙা হলায় গাইছে—

সাধো আছে মা মনে।
দুর্গা বলে প্রাণ ত্যাজিব।
জাহ্নবী জীবনে।
